"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

শারদীয় ১৯৭৮

সংবাদ সংগ্রহে

—পর্যবেক্ষক।

কলকাতার সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সি-এম-ডি-এ-তে অনেক সাংবাদিককেই আসতে হয়েছে। কারণ অনেকগুলি, তবে একটা বড় কারণ হল, কলকাতা সম্বন্ধে দুর্বলতা। কলকাতা নিয়ে খবর করতে সকলেই চান—এবং যখন সি, এম, ডি, এ-র কাজকর্ম সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা হয়, তখন কিন্তু আমরা সমালোচনাটা সেই ভাবেই নিই। অর্থাৎ ভালবাসার শহরে কাজ বিলম্ব হবে কেন? ত্রুটি থাকবে কেন?

জবাব দিতে গিয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রায় সময়ই দিতে পারি নি। তবে চেষ্টা করেছি।

নতুন সরকার আসার পর সি, এম, ডি, এ এবং কলকাতা সম্বন্ধে আগ্রহটা বেড়ে গেছে। কারণ, এখনকার নীতি অনুযায়ী জনগণের সঙ্গে এই সংস্থার সম্পর্কটি আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। যেমন স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করে বস্তী উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। শিয়ালদার রূপান্তর এবং পুনর্বিন্যাস করার ব্যাপারে জনগণের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। এবং আপনারা জানেন যে, এই সহযোগিতা পাওয়াও যাচ্ছে। "জনগণ আমাদের আস্থা দিয়েছে", কথাটা সেদিন বললেন শ্রীপ্রশান্ত শূর, একটি নতুন বাজারের জন্মদিনে।

এখন যে জিনিসটা দরকার সেটা শহর-সচেতনতা বা নাগরিক সচেতনতা।

যেমন ধরুন, কলকাতার রাস্তাঘাট খুব ময়লা থাকে। কিন্তু আমরা যদি যেখানে-সেখানে দিবারাত্র ময়লা না ফেলে সকাল আটটার মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলা শুরু করি? কারণ দিনে একবার হয়তো কর্পোরেশনের পক্ষে এলাকানুযায়ী জঞ্জল অপসারণ অসম্ভব নয়, কিন্তু দিনে দশ-পনেরোবার তো কিছুতেই সম্ভব নয়। কর্পোরেশন জল দিতে পারে কিন্তু জলের অপচয় বন্ধ করার দায়িত্ব আমাদের।

বাসের টিকিট, মাটির ভাঁড়, শালপাতা, সিগারেটের টুকরো একজন দু'জন নয়, লক্ষ লক্ষ লোক লক্ষ লক্ষ বার ছুঁড়ে ফেলছি শহরটার গায়ে। ফলে শহরময় নোংরার পরিমাণ বাড়ছে।

বড় বড় রাস্তাঘাট, জলের ট্যাংক, বস্তী উন্নয়ন এসব করুক সি, এম, ডি, এ। কিন্তু জনগণের যে একটা কর্তব্য আছে এবং সুযোগ দিলে তাঁরা যে সেই কর্তব্য পালনে কুণ্ঠিত নন, তার প্রমাণ শিয়ালদা উল্টাডাঙ্গার ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। বহুলোক চিঠি লিখে প্রকল্পটি যে কি ধরণের হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাঁদের মতামত দিয়েছেন। এবং সবচেয়ে আশার কথা সি, এম, ডি, এ সেগুলো গ্রহণও করেছেন। সি, এম, ডি, এ-র চিন্তায় নতুন নির্দেশের ছোঁয়াচ।

পরিচয়

বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ১-৩ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৫ অগাস্ট-অক্টোবর ১৯৭৮

শারদীয় সংখ্যা

গুহ। আশিস সান্যাল। কালীকৃষ্ণ গুহ। স্বদেশরঞ্জন দত্ত। মুকুল গুহ। গৌরাঙ্গ ভৌমিক। রবীন সুর। অনন্ত দাশ। সুতপা ভট্টাচার্য। সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভ বসু। গোবিন্দ ভট্টাচার্য। শুভাশিস্ গোস্বামী। অভিজিৎ সেনগুপ্ত। শংকর দে। বিপ্লব মাজী। পিনাকীনন্দন চৌধুরী। দিলীপ সেন। সামসুল হক ৩৪১—৩৬৮

স্কেচ

রামকিঙ্কর বেইজ ৩০৭/৩১৩

নীরদ মজুমদার ১৮৪

প্রচ্ছদ

সুবোধ দাশগুপ্ত

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। সুশোভন সরকার। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয় ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ থেকে প্রকাশিত।

অন্যতম গুরু টলস্টয়

অন্নদাশঙ্কর রায়

টলস্টয় আমার অন্যতম গুরু। কী জীবনে কী শিল্পে। যেমন রবীন্দ্রনাথ। দুজনে এঁরা বন্ধনীভুক্ত। কেউ কারো চেয়ে বড় বা ছোট নন। ষোল বছর বয়সে আমি টলস্টয়ের 'তেইশটি কাহিনী' পুরস্কার পাই। তার একটি বাংলায় অনুবাদ করে 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়। আর রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' পড়ি তাঁর নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির কিছুদিন পরে। যখন আমার বয়স দশ কি এগারো। "ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে" বুঝতে কষ্ট হয়, মুগ্ধ হয়ে পড়ি "একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদি গড়।" বারো বছর বয়সে 'সবুজপত্র' হাতে পাই। 'ঘরে বাইরে' বুঝতে পারিনে, 'সবুজের অভিযান' মুখস্থ করি। 'প্রবাসী'তে পড়া হয়ে যায় 'বলাকা' ও 'পলাতকা'র বহু কবিতা।

টলস্টয়ের সেই কাহিনীগুলির ভিতর দিয়ে তিনি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন জীবনের মূলনীতি ও জীবনদর্শন। কিন্তু আমি চাই রস ও আনন্দ। বছর কয়েক পরে আমার নজরে আসে 'আনা কারেনিনা'। তন্ময় হয়ে পড়ি। সব কথা যে বুঝি তা নয়, কতই বা বয়স! আঠারো কি উনিশ। আরো কিছুদিন পরে পড়ি 'হোয়াট ইজ আর্ট?' সব কথা বোঝা আরো কঠিন। মোটামুটি হৃদয়ঙ্গম হয় যে আর্ট হবে সত্য ও শিব। সুন্দর না হলেও চলে। ওদিকে আমি রাশি রাশি কন্টিনেন্টাল নাটক নভেল পড়ছি। জীবনের সত্য মিথ্যা ভালো মন্দ পাপ পুণ্য সুন্দর অসুন্দর মিছিল করে চলেছে। কী তার বৈচিত্র্য!

কী তার আকর্ষণ! জীবনকে আমি আর্টের দর্পণে নিরীক্ষণ করব, না ধর্ম ও নীতির নিকষ দিয়ে কেবল শুভটুকুই আর্টের বিচারে সোনা বলে যাচাই করব ?

পঞ্চাশোর্ধ্বে টলস্টয় বনে না গেলেও বানপ্রস্থ নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের যৌবনের ভরা গঙ্গা তাঁর অমনোনীত হয়েছিল। সেই ভরা যৌবনের সৃষ্টিকেও তিনি নীতির বিচারে খাটো মনে করতেন। তাই রসের বিচারেও খাটো। এতে কিন্তু আমার মন সায় দেয়নি। ভালো মন্দের বিবেক তাঁর মতে সমাজের বেলায় যেমন শিল্পের বেলাও তেমনি। ভালো কবিতা, ভালো গান, ভালো ছবি, একথা যখন বলব তখন কি এই কারণে বলব যে কবিতাটা বা গানটা বা ছবিটা লোকহিতকর, শিক্ষাপ্রদ, নীতিসম্মত ? মানুষের সহজাত রসবোধ ও রূপবোধকে দমন না করে এরকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। আর্টের সংজ্ঞাকে সঙ্কুচিত করে তাকে ধর্মশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্রের সীমানার ভিতরে আনতে গেলে যা হয় তা যেন চীনদেশের মহিলাদের লোহার জুতো পরানো। সুন্দরীকে সতী বানানোর এই সাধু অভিপ্রায় আর্টকে এত উচ্চে তুলে নিয়ে যাবে যে তাকে আর আর্ট বলে চেনা যাবে না। তার চেয়ে হতে দাও না কেন তাকে অসতী ? হোক না সে আনা কারেনিনা ?

আমি 'আনা কারেনিনা'কেই আর্টের আদর্শ ভাবি। 'সমর ও শান্তি' তো অনেকের মতে এ যুগের মহাকাব্য 'ইলিয়াড'। আমার মতে ওর সঙ্গে সমান বলে গণ্য হতে পারে একমাত্র ডস্টয়েভস্কি রচিত 'কারামাজভ ভ্রাতৃগণ'। 'ইলিয়াড'-এর পর 'অডিসি' লেখাই ছিল প্রত্যাশিত, কিন্তু 'আনা কারেনিনা' আর একখানি 'অডিসি' নয়। তা সত্ত্বে সে উপন্যাস একালের পাঁচ-সাতখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের অন্যতম। তাকে কোনো কারণেই খাটো করা যায় না। যে দুটি সোপানের উপর দাঁড়িয়ে টলস্টয় বিশ্বসাহিত্যের উচ্চতম স্তরে উঠেছিলেন সে দুটি যদি তাঁর পায়ের তলা থেকে সরে যায় তবে তাঁর উচ্চতাই বা থাকে কোথায় ? কেনই বা লোকে তাঁর বাণী শুনবে ? তিনি প্রায়শ্চিত্ত করে ঋষি হয়েছেন বলে ?

ঋষি টলস্টয় এর পরে শিল্পের সাধনা ছেড়ে জীবনমরণের প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করেন। বেদ উপনিষদ্ গীতা বাইবেল কোরান বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে অধ্যয়ন করেন। চার্চের ভাষ্য ত্যাগ করে সরাসরি যীশু-কথামৃত আস্বাদন করেন। যীশুর বাণী আদি খ্রীস্টানদের মতো অনুসরণ করেন। কোনো কারণেই নরহত্যা করা চলবে না, মানুষ-

মাত্রেই তোমার ভাই ও তোমার পিতার সন্তান। হিংসার প্রতিরোধ হিংসা দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্জিত অন্ন গ্রহণ করবে, অপরের পরিশ্রমের ফল থেকে তাকে বঞ্চিত করবে না। চাষীর মতো পোশাক পরে মুচির মতো জুতো তৈরি করা হল টলস্টয়ের নিত্যকর্ম। তবে এর থেকে তাঁর কোনো আয় ছিল না, চলত অন্য আয়ে। জমিদারির স্বত্ব তিনি স্ত্রীকে লিখে দেন। কিন্তু গ্রন্থস্বত্ব সর্ব-সাধারণকে দিতে চাইলে পরিবারের কাছ থেকে দুস্তর বাধা পান। শেষে এইভাবে রফা হয় যে ঋষি হবার পূর্বে তিনি যেসব গ্রন্থ লিখেছিলেন সেসব গ্রন্থের স্বত্ব স্ত্রীকে লিখে দেন, সেই গুলিই তাঁর সোনার খনি। বাস একান্নে। কিন্তু খেতেন নিরামিষ।

কপিরাইট না থাকায় ঋষির বাণী দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে যায়। ধনী ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানরা তাঁতে বোনা কাপড়ের চাষীর পোশাক পরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। দেখলে চেনা যায় কে কে টলস্টয়পন্থী। কে কে উচ্চতর শ্রেণী থেকে নেমে এসেছেন। দেক্লাসে বা ডিক্লাসড। টলস্টয় মাঝে মাঝে মস্কো যেতেন। একবার সেখানকার এক থিয়েটারে ঢুকতে গিয়ে বাধা পান। দরোয়ান বলে, "এই চাষা! তুই এর বুঝবি কী? এসব তোদের জন্যে নয়।" কে একজন ব্যাপারটা দূর থেকে লক্ষ্য করে ছুটে আসেন। বলেন, "সর্বনাশ! মানুষ চিনতে পারো না? ইনি কাউণ্ট লেও টলস্টয়।" দরোয়ান লজ্জায় ভয়ে জড়সড়। টলস্টয় তাকে সাধুবাদ দেন। "তুমি ঠিকই চিনেছ যে আমি একজন মুজিক। তুমিই ঠিক চিনেছ, আর কেউ নয়।" চাষী বলে তাঁকে ভুল করাতেই তিনি মহা খুশি।

রুশদেশে যেটা ছিল একটা কাল্ট সেটা দক্ষিণ আফ্রিকায় এক ভারতীয় ব্যারিস্টারের কাছে হয়ে দাঁড়ায় জীবনযাপনের এক শ্রেয়স্কর পন্থা। তাঁর সহচরদের নিয়ে তিনি স্থাপন করেন টলস্টয় ফার্ম। এঁরা সবাই হন সত্যাগ্রহী। এই পন্থা অবলম্বন না করলে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকেও পরে কেউ মহাত্মা গান্ধী বলত না। তিনিও ভারতে ফিরে এসে দক্ষিণ আফ্রিকার জের টেনে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করতেন না, টলস্টয় ফার্মের জের টেনে সাবরমতী সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতেন না, হাতে কাটা সুতো দিয়ে তাঁতে বোনা খদ্দর প্রচলন করতেন না। ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন গান্ধীজী বলেন, "আমার হাতে যদি শাসনক্ষমতা পড়ত তা হলে

আমি টলস্টয়ের বোকা আইভানের মতো রাজত্ব চালাতুম।" টলস্টয়ের প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর মনের অতলে কাজ করছিল।

টলস্টয়ের আপন দেশে যাঁর আবির্ভাব ঘটে তিনি গান্ধী নন, লেনিন। গুরু টলস্টয় নন, মার্কস। তাঁর পন্থা টলস্টয়পন্থা নয়, মার্কসপন্থা। রুশ দেশের বিপ্লবীরা টলস্টয়কে বিদেশে রপ্তানি করে মার্কসকে স্বদেশে আমদানি করেন। সেইভাবেই তাঁরা অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। আর অন্য ভাবে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন গান্ধীজী, টলস্টয় যাঁর পথপ্রদর্শক। রাশিয়ায় যা পরিত্যক্ত হয় ভারতে তা গৃহীত হয়। অবশ্য তার সমস্তটা নয়, সব সময়ের জন্যে নয়।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধীজীও টলস্টয়ের মতো বলতেন আর্মি মন্দ, পুলিশ মন্দ, কোর্ট মন্দ, জেল মন্দ, এর প্রত্যেকটিই হচ্ছে পীড়নের যন্ত্র, এই চারটি স্তম্ভের উপর যে দাঁড়িয়ে আছে সেই রাষ্ট্রও মন্দ। এমন এক সমাজ চাই যেখানে আর্মি নেই, পুলিশ নেই, কোর্ট নেই, জেল নেই, সুতরাং রাষ্ট্রও নেই। অথচ শান্তি আছে, শৃঙ্খলা আছে, ন্যায়বিচার আছে, বিচারে সাজাও আছে, কিন্তু তা কায়িক নয়। আর তার উদ্দেশ্য সংশোধন। গান্ধীজী টলস্টয়ের মতো এই আদর্শ সমাজকেই বলতেন *কিংডম অব গড, ভগবানের রাজ্য, সাধারণ পরিভাষায় রামরাজ্য।* পরে এই কথাটির কদর্থ হয়। রাম এখানে ত্রেতাযুগের রাজা রামচন্দ্র নন, ভগবানের অন্যতম নাম।

ইংরেজ চলে গেলে স্বরাজ হবে, কিন্তু স্বরাজ হলে কি আর্মিও তুলে দেওয়া হবে, পুলিশও তুলে দেওয়া হবে, কোর্টও উঠিয়ে দেওয়া হবে, জেলও উঠিয়ে দেওয়া হবে? গোড়ায় গান্ধীজীর বিশ্বাস ছিল তাই, কিন্তু একটু একটু করে তিনি উপলব্ধি করেন যে ছোটোখাটো একটা সৈন্যদল রাখতে হবে, তেমনি ছোটোখাটো একটা পুলিশ। বিচার যদিও প্রধানত গ্রাম্য পঞ্চায়তেই হবে তবু হাইকোর্ট থাকাও দরকার, আর জেল না বলে তাকে শোধনাগার বলাই ভালো, সেও থাকবে ছোটখাটো আকারে। মার্কসবাদের যেমন রিভিসন হয়েছে বলে শোনা যায়, করেছেন যাঁরা তাঁরা রিভিসনিস্ট, টলস্টয়বাদেরও তেমনি রিভিসন হয়েছে, করেছেন স্বয়ং গান্ধীজী। এ ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। তাঁর একটা অপোজিসন ছিল, সেই অপোজিশন হিংসায় বিশ্বাস করত, তাকে ক্ষমতার আসনে বসিয়ে না দিলে সে শান্তি দিত না, শৃঙ্খলা রাখত না, আদালতের হুকুম না হলে তাকে জেলে আটক করা যেত না। তা হলে কি

কংগ্রেস প্রাদেশিক সরকারগুলিকে পদত্যাগ করতে হত? এ সমস্যা দেখা দেয় কংগ্রেস যখন প্রথমবার প্রাদেশিক সরকারে সমাসীন হয়। গান্ধীজী তার আগেই কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কংগ্রেস ছাড়লেও কংগ্রেস তাঁকে ছাড়বে না। তিনি সেবাগ্রামে বসে পলিসি বাতলে দেন। অপোজিশন যখন তুঙ্গে ওঠে তখন তাকে ক্ষমতার আসনের ভাগ না দিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে অপোজিশনেরই সরকার গঠনের পালা, কিন্তু সংখ্যা-লঘু দল তো সরকার গঠন কবতে পারে না। তাই ইংরেজ সরকারের কর্মচারীরাই রাজত্ব চালান। পরীক্ষা করে দেখা গেল এটা একটা স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। মতবাদের রিভিসন চাই।

মুসলিম লীগকে ক্ষমতার একাংশ ছেড়ে না দিয়ে দেশের একখণ্ড ছেড়ে দেয় কংগ্রেস। তারপর বাকি খণ্ডের জন্যে যে সংবিধান রচনা করে তা গান্ধীবাদী বা টলস্টয়বাদী সংবিধান নয়। গান্ধী ততদিনে নিহত। তাঁর শিষ্যরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আর টলস্টয়ের শিক্ষা তো তাঁর নিজের দেশেই অচল, ভারতে তার প্রয়োগ করতে যাবে কে? লোকে সফলকেই পূজা করে, বিফলকে নয়। স্বাধীন ভারতে লেনিনেরই কদর বেড়ে যায়, গান্ধীভক্তদের অনেকেই মার্কস-লেনিন উপাসনা আরম্ভ করেন। আমার এক প্রিয় বন্ধু একাধারে গান্ধীবাদী ও মার্কসবাদী। আরেক বন্ধু গান্ধীবাদ থেকে সরে যেতে যেতে মার্কসবাদী বনে গেছেন। আবার এটাও লক্ষণীয় যে পাকা কমিউনিস্টরাও কথায় কথায় সত্যাগ্রহ করছেন, এই তো সেদিন একজন মরণপণ ঘোষণা করলেন।

রাজনৈতিক প্রয়োজনে গান্ধীজী টলস্টয়পন্থা থেকে বেশ কিছুদূর অপসরণ করলেও অর্থনৈতিক কার্যক্রম থেকে বিচ্যুত হন নি। কায়িক শ্রম, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অন্ন উপার্জন, চরকার সুতো তাঁতে বুনে বস্ত্র উৎপাদন ইত্যাদি তাঁর জীবনের শেষদিনটি অবধি রক্ষা করেছিলেন। এখনো তিনি বেঁচে আছেন সেই কার্যক্রমের ভিতর দিয়ে তাঁর অনুগত শিষ্যদের মধ্যে। টলস্টয়ের প্রভাবও এই ভাবে বেঁচে আছে। মুজিকের পোশাক পরে এঁরা এখনো ঘুরে বেড়ান। এর নাম পদযাত্রা। আদি খ্রীস্টানদের মতো এঁদের বিশ্বাস স্বর্গরাজ্য একদিন আসবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এঁদের পুত্রকন্যাদের নিয়ে। যদি কারো পুত্রকন্যা থাকে। তারা আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত সন্তানের মতো জীবন-যাপন করতে চায়। কেউ হবে এঞ্জিনিয়ার, কেউ হবে ডাক্তার। এসব কাজ

তো মন্দ নয়। শ্রেণীচ্যুত হতে একজনেরও ইচ্ছা নেই। শ্রমিকদের মধ্যে কৃষকদের মধ্যেই বরং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মধ্যবিত্ত হতে আগ্রহ। ইংরেজী-মাধ্যম স্কুলগুলোর সংখ্যা যে বেড়ে যাচ্ছে তার একটা কারণ শ্রমিক-কৃষকরাও তাদের সন্তানদের সেখানে পড়তে পাঠাচ্ছে। তারাও প্রথমে হাফপ্যান্ট ও পরে ফুলপ্যান্ট পরছে। স্কুলে যারা যাচ্ছে না তারাও।

টলস্টয়ের নিজের ঘরেই বিদ্রোহ মাথা তুলছিল। তাঁর এক ছেলে তো সোজা গিয়ে আর্মিতে যোগ দেয়। যেটা সব চেয়ে নৃশংস রেজিমেন্ট সেই ব্ল্যাক ওয়াচে। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। টলস্টয় অসহায়। আরেক ছেলে তো কঠিন অসুখের সময় তাঁকে দেখতে আসবে না। সে বলে তার বাবা আগেভাগেই বিখ্যাত সাহিত্যিক হয়ে তার বিখ্যাত সাহিত্যিক হবার পথরোধ করে বসে আছেন। বিপ্লবের পরে আরেক ছেলের মন্তব্য, "এর জন্যে দায়ী হচ্ছেন বাবা। তিনিই তো বিপ্লবের নাটের গুরু।"

এদেশেও যদি কোনোদিন বিপ্লব ঘটে তবে যাদের সর্বস্ব যাবে তারাও হয়তো বলবে, "এর জন্যে দায়ী হচ্ছেন বাপু। তিনিই তো বীজ বুনে গেছেন।" সেটা যে নেহাৎ একটা ভ্রান্ত ধারণা তা নয়। এসটাব্লিশমেন্ট বলতে যা বোঝায় তা কেবল একমুঠো ইংরেজ নয়। ইংরেজরা চলে গেলেও ভারতীয়রা থাকে ও তারাই রাষ্ট্র চালায়। রাষ্ট্রকেই উৎখাত করতে হবে এটা গান্ধীপূর্ব কংগ্রেসের পলিসি ছিল না। এটা আমরা মডারেটদের মুখে বা এক্সট্রিমিস্টদের মুখেও শুনিনি। শুনিনি যাঁদের সন্ত্রাসবাদী বলা হয় তাঁদের মুখেও। এটা গান্ধীজীর মুখেই শোনা। তাঁর মৌল আপত্তি বিদেশী কর্তৃত্বে নয়, যে সীস্টেম তারা গড়ে তুলেছে তারই অস্তিত্বে। সেটা নির্জলা মন্দ। স্বদেশী কর্তৃত্ব হয়তো অপেক্ষাকৃত কম মন্দ। কিন্তু মন্দত্বের জড় তাতে মরে না। যেমন মিলের কাপড়ে মরে না। তাদের গড়া সীস্টেমটাকেও ঢেলে সাজতে হবে। যাতে তার সাহায্যে মানুষ মানুষকে উৎপীড়ন না করে, শোষণ না করে। এক্ষেত্রে লেনিনের উদ্দেশ্য ভিন্ন নয়। উদ্দেশ্য একই, কিন্তু উপায় বিভিন্ন। আর উপায় বিভিন্ন বলেই একজনের ধ্যানের রাষ্ট্র প্রোলিটারিয়ান রাষ্ট্র, আরেকজনের ধ্যানের রাষ্ট্র ননভায়োলেণ্ট রাষ্ট্র। গান্ধীজী কোনোদিন শাসনকার্য করেননি, আমি করেছি। করার আগে আমারও ধারণা ছিল যে ননভায়োলেণ্ট রাষ্ট্র সম্ভব, কিন্তু করার পরে আমার ধারণা বদলায়। কম ভায়োলেণ্ট রাষ্ট্র হবার নয়। তার জন্যে চাই সত্যি সত্যি স্বর্গরাজ্য। মানবপ্রকৃতির গভীরতম রূপান্তর। আমি বিবর্তনবাদী। বিবর্তনসূত্রে মানব হয়তো হিংসাপ্রতিহিংসার

ঊর্ধ্বে উঠবে। কতক লোককে সাধনা চালিয়ে যেতে হবে, দুঃখবরণ করতে হবে। অধিকাংশ লোককে শিক্ষিত করতে হবে। চলতি অর্থে নয়। হঠাৎ একটা গণসত্যাগ্রহ বা একটা বিপ্লব এসে পথসংক্ষেপ করতে পারে, তবু রাষ্ট্র ওইটুকুতেই শুকিয়ে যাবে না। তার সেবা করবে সেই আর্মি, সেই পুলিশ, সেই কোর্ট, সেই জেল।

শিল্পী টলস্টয় ব্যর্থ হননি। ঋষি হবার পরেও লিখেছেন 'রেসারেকশন', তৃতীয় মহত্তম উপন্যাস। অন্তত গোটা দুই অবিস্মরণীয় গল্প, 'প্রভু ও ভৃত্য' আর 'আইভান ইলিচের মৃত্যু'। কিন্তু টলস্টয় না পারলেন মহাযুদ্ধ ঠেকাতে, না পারলেন মহাবিপ্লব এড়াতে। একটার লজিকাল পরিণতি অপরটা। আশি বছরে দেহত্যাগ না করে আরো সাত বছর বেঁচে থাকলে দেখে যেতেন তাঁর ব্যর্থতার দৃশ্য। কিন্তু আরো তিন বছর টিকে থাকলে দেখতেন গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের অহিংস অভিযান। তাঁরও পরোক্ষ সার্থকতা।

শিল্পী টলস্টয় ও ঋষি টলস্টয়, একজন মানুষকে দু ভাগে বিভক্ত করা যায় না। 'সমর ও শান্তি' লেখার বয়সেও তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ও বিবেকের তাড়না যথেষ্ট প্রবল ছিল। 'আনা কারেনিনা' লেখার বয়সে আরো তীব্র হয়। তাঁর সাংসারিক সাফল্যের চূড়ায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে মানবজীবনের অন্বিষ্ট যশ নয়, বিভব নয়, মানসম্মান নয়, রাজক্ষমতা নয়, ভোগবিলাস নয়। মৃত্যু অপেক্ষা করছে তার আত্মাকে এক অজানা লোকে নিয়ে যেতে, যেখানে সে নিঃসম্বল। কিংবা সে একেবারেই অস্তিত্বহীন। পরপারে অন্তহীন শূন্যতা। করণীয় তা হলে কী? যীশু যা বলে গেছেন, ঈশ্বরকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা। ভালোবাসা যদি সত্য হয় তবে হত্যা করা কখনো সত্য নয়, কোনো কারণেই শ্রেয় নয়, শোষণ করা কখনো সত্য নয়, কোনো কারণেই শ্রেয় নয়। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা দিচ্ছে এর বিপরীত শিক্ষা, খ্রীস্টীয় শিক্ষার সঙ্গে সে সভ্যতার মূলেই বিরোধ। খ্রীস্টধর্মে যারা বিশ্বাস করে তারা সে সভ্যতায় বিশ্বাস করতে পারে না। সে সভ্যতায় যারা বিশ্বাস করে তারা খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাস করতে পারে না। খোসাটা আসল নয়, শাঁসটাই আসল। খাঁটি খ্রীস্টান হতে হবে। খাঁটি খ্রীস্টানের সঙ্গে খাঁটি বৌদ্ধের বা খাঁটি মুসলমানের বা খাঁটি হিন্দুর মূলত কোনো ভেদ নেই। গান্ধীজীকে তিনি তাঁর সমর্থন জানিয়ে, উৎসাহ দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে চিঠি লেখেন সে চিঠি যথাস্থানে পৌঁছয় তাঁর মৃত্যুর পরে। বলতে গেলে সেই তাঁর শেষ উইল ও

টেস্টামেন্ট। পার্থিব বিষয় সম্পত্তির নয়, জীবনের বাণীর ও ব্রতের। গান্ধীজীকে লেখা সে চিঠি দেশ ও ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষকেই লেখা। যারা বর্তমান সভ্যতার মিথ্যামূল্যগুলোর মোহে মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট।

শিল্প কি কেবল শিল্পকেই সার করবে? মানবজাতির জীবনমরণের সমস্যা নিয়ে ভাববে না, সমাধান নিয়ে মাথা ঘামাবে না? এ বিষয়ে টলস্টয়ের সঙ্গে আমার মতভেদ আজীবন। তাজমহল গড়ার কাজও কতক মানুষকে করতে হবে। চারদিকে দুর্ভিক্ষের হাহাকার সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্মে তৎপর হতে হবে, তন্ময় থাকতে হবে। শিল্পের দেবী ঈর্ষাপরায়ণা। সব মানুষের কর্তব্য নির্দেশ করতে গিয়ে কতক মানুষের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এরা যা সৃষ্টি করছে তা সব মানুষের পক্ষে ও সব মানুষের জন্যে। এরা যদি না করে তো আর কেউ করবে না। শিল্পীরা তাদের স্বধর্ম নিয়েই থাকবে, সেটাও ধর্ম।

টলস্টয় গ্রামে বাস করতেন, চাষী ও কারিগরদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। সেই পথ দিয়ে তীর্থযাত্রীরা যাতায়াত করত, সন্ন্যাসী ফকির জিপসি-দেরও আসাযাওয়া ছিল। এই যে চিরন্তন স্বদেশ একে ছেড়ে তিনি বিদেশেও যেতেন না, একবার গিয়ে অস্বস্তি বোধ করে অল্পদিনের মধ্যে ফিরে আসেন। তাঁর এই বিদেশবিমুখতার সঙ্গে যোগ দেয় নগরবিমুখতা। নগরগুলো তো বিদেশেরই অনুকরণ। সেখানে গেলেও তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। তবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার জন্যে তাঁকে মস্কোতেও বাসা নিতে হয়েছিল। বছরের কয়েকমাস সেখানে কাটাতেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় পড়ে থাকত ইয়াসনিয়া পলিয়ানায়। রবীন্দ্রনাথের যেমন শান্তিনিকেতনে। বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সকলেই মস্কোতে বা সেন্ট পিটার্সবার্গে। অনেকেই প্যারিসে বা দক্ষিণ ফ্রান্সে বা ইটালিতে বা জর্মানিতে। টলস্টয় এঁদের দেখতে পারতেন না, তাঁর ধারণা দেশের লোকের নাড়ির সঙ্গে এঁদের যোগ নেই, এঁরা লিবারল হলে শৌখীন লিবারল, বিপ্লবী হলে পুঁথি পোড়ো বিপ্লবী। লিবারলদের মুখে যখন ব্যক্তিস্বাধীনতার বা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের খৈ ফুটত তখন তিনি বলতেন, যুদ্ধকালে কনসক্রিপশন কী করে তার সঙ্গে খাপ খায়? যারা রাষ্ট্রের হুকুমে নরহত্যা করে তারা তো তাদের বিবেক হারিয়ে বসেছে। রাষ্ট্রের পায়ে মাথা বিকিয়ে দিয়েছে। পশ্চিম থেকে যন্ত্র আমদানি করে তার পায়ে আত্মবলি দিলে সেটাও তেমনি মারাত্মক। চাষী আর কারিগরকে কলমজুর বানিয়ে প্রগতি হবে, এটা মায়া।

তাঁর সমাধান ছিল চাষীকে আপনার বলতে একটুকরো জমি দিতে হবে,

যেখানে চাষীরই মালিকানা। জমিদারেরও নয়, রাষ্ট্রেরও নয়। দেশের বুদ্ধিজীবীরা তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন না। তাই বুদ্ধিজীবীদের উপরে ছিল তাঁর অবজ্ঞা। তা ছাড়া কেই বা তাঁর মতো জমিতে গিয়ে চাষবাস করতে রাজি? তা হলে তো তাঁরা আর বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য হবেন না। বুদ্ধিজীবীকে তিনি বানাতে চান চাষী। ওঁরা কিন্তু চাষীকে বানাতে চান বুদ্ধিজীবী। রাষ্ট্রের সঙ্গে, চার্চের সঙ্গে, শিল্পীদের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মতবিরোধেই কেটে যায় তাঁর শেষজীবন।

পরিবারের সঙ্গেও তেমনি। গৃহত্যাগ করে তিনি কোথাও চলে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পথের ধারে এক রেলস্টেশনে ঘটে দেহত্যাগ। সব দেশের মানুষ তাঁর জন্যে কাঁদে, সব শ্রেণীর মানুষও। একমাত্র তুলনা গান্ধীজীর নিধন।

তাশখন্দ থেকে কলকাতা

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

'সোভিয়েট ল্যাণ্ড-নেহরু' পুরস্কারের কল্যাণে অতি সম্প্রতি আবার সোভিয়েট দেশের কতগুলো অঞ্চল ঘুরে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে দেখে এলাম উজ্‌বেকিস্তানের রাজধানী তাশ্‌খন্দ-এর প্রায় আন্‌কোরা নতুন ভূগর্ভ রেল। দেখেই মনে হল কলকাতার কথা, যার 'মেট্রো' বানানো নিয়ে অজস্র অসুবিধার বোঝা আমাদের এই দুর্গত শহরকে বইতে হয়েছে এবং হচ্ছে। উপায়ান্তরও নেই, অথচ কবে এবং কিভাবে এবং কি চেহারা নিয়ে এবং কতটা সুশৃঙ্খল কায়দায় (যথেষ্ট বিদ্যুতের জোরে) তা চালু হবে, সে বিষয়ে কেউই আশ্বস্ত নয়। এমনকি যারা কর্তৃপক্ষীয় তাদেরও অসংকোচে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আশ্বাস দেবার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই। শেষ পর্যন্ত তালে-গোলে একটা কিছু দাঁড়াবে হয়তো বেশ কয়েক বছর বাদে, এই ভেবে দিনগতপাপক্ষয়ে পরিশ্রান্ত কলকাতার মানুষ মন থেকে সরিয়ে রাখে এই পাতাল রেলের প্রসঙ্গ, কিন্তু পারে না যখন বহুবিধ খোঁড়াখুঁড়ি এবং বাধ্য হয়ে রাস্তা বদলের সামনাসামনি তাকে দাঁড়াতে হয়।

অনেকদিন আগে যখন শুনতাম যে কলকাতার মাটি বড্ড নরম, একটু খুঁড়লেই জল, তাই ভূগর্ভ রেল এখানে অচল। তখনই লেনিনগ্রাদে গিয়ে অবাক হলাম সেখানকার অপরূপ 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' দেখে—যে-লেনিনগ্রাদ দাঁড়িয়ে আছে নিছক জলার ওপর, যার আশেপাশে সর্বত্র জল, সমুদ্রের শাখা যে শহরের ভিতর পর্যন্ত ঠেলে এসেছে! অধুনা যখন কলকাতাতেই

ভারতবর্ষের প্রথম ভূগর্ভ রেলের পরীক্ষা স্থিরীকৃত হল, 'cut and cover' কায়দায় গভীর খনন ব্যতিরেকেই তা বানানো যাবে জানা গেল, তখন স্বভাবতই সকলের ধারণা যে আজকের যন্ত্রযুগে এ এমন একটা কিছু অভাবনীয় কাণ্ড নয়—তাই সাময়িকভাবে কিছু যন্ত্রণা বইতে হলেও এর প্রয়োজন মোটামুটি সবাই মানল। মুশকিল এই যে, কোনো কিছুই যেন আমাদের দেশে সহজ, সুষ্ঠু, শোভন পদ্ধতিতে চলে না—কলকাতা 'মেট্রো' র উদয়াচল আর অস্তাচল কোথায় তার সন্ধানে একধরনের নিরুদ্দেশযাত্রা যেন আজ চলেছে।

সম্প্রতি কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা শ্রীশিবপ্রসাদ সমাদ্দার-এর সৌজন্যে তাঁর লেখা জমকালো নাম দেওয়া 'Calcutta Is' গ্রন্থটি দেখলাম। লেখক কলকাতাকে ভালোবাসেন। কলকাতাকে নিয়ে সাধারণত আমাদের বাঙালী মনে যে অহংকার আছে তা তাঁর লেখায় পরিস্ফুট, সরকারী চাকরি করেও সাহিত্যের মায়া কাটাতে পারেন নি বলে কিছু পরিমাণে রচনায় তার ছাপ। অনেক তথ্য জড়ো করেছেন বইটিতে, কেন যে কলকাতার বিড়ম্বনা এমন দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কারণ সন্ধান করেছেন, মনে হয় নিজেও একটু ঝুঁকি নিয়ে সরকারী কর্মচারীর পক্ষে দুঃসাহসিক ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা একটু-আধটু করেছেন। সবই বেশ, কিন্তু কলকাতার দুর্দশা দূর যে বাস্তবিকই হবে এবং সেজন্য যথাযথ কাজের আয়োজন প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়েছে, তা বই পড়ে বোঝা গেল না। আমাদেরই বামপন্থী বন্ধুরা পশ্চিম বাংলা রাজ্য এবং শহর কলকাতার কর্মভার বৎসর কালের বেশি হাতে নেওয়ার পরও মনে ভরসা এসেছে বললে অনৃতকথন হবে।

তাশখন্দ-এর 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' রেল দেখে তাই বাস্তবিকই চমৎকার একটা কিছু দেখে যে-আনন্দ তা যেন বিকৃত হয়ে গেল, ভাবলাম কেবল কলকাতার কথা: 'দুর্গত আমাদের এই শহর কি শুধু তার জীবন্মৃত অথচ কেমন যেন আশ্চর্য জাদুমন্ত্রে নিয়ত ধাবমান অস্তিত্বের উদ্ভট গরিমা নিয়েই তুষ্ট থাকবে?'

আজকের সমাজ ও তার সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন বিনা কলকাতার মতো সমস্যাজীর্ণ শহরের ভবিষ্যৎ যে একেবারে অন্ধকার, তা বুঝেও আমরা বুঝতে চাই না। একথা খাটে আমাদের গোটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে—কিন্তু সে আলোচনা থাক। এদিক-ওদিক একটু-আধটু মেরামতির কাজ চালিয়ে কতটা কলকাতাকে খাড়া করানো যেতে পারে, সেদিকেও যদি

নজর ঠিকভাবে থাকত, তাহলে অন্তত আজকের মারাত্মক অবস্থা দেখা যেত না। ১৬৬৪ সালে লণ্ডন শহরে একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল; ঐতিহাসিকদের মতে সেটা এনেছিল 'বিপরীতে হিত', কারণ ঐরকম আকস্মিক দুর্ঘটনায় সবচেয়ে ঘিঞ্জি এলাকাগুলো নিঃশেষ না হয়ে গেলে শহরের চেহারা আরও বহুকাল নোংরা আর আধুনিক জীবনযাত্রার পক্ষে অচল পরিস্থিতিতে বাঁধা হয়ে থাকত! দুটো বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা গেছে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত বহু শহরকে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে; পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস-র ক্ষেত্রে পরম প্রযত্নে ঐতিহাসিক সৌধগুলিকে অবিকল পুর্বের আকারে অবিকৃত ভাবে বানানো হয়েছে, আর সেজন্য আশ্চর্য কারুকৌশল আর অপরিসীম পরিশ্রম করতে হয়েছে। ভাবলে শিউরে উঠতে হয়—কলকাতা কি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আবার নতুন ভাবে গড়ে উঠতে পারবে না? এখানে কি চাই একটা বিপর্যয় যার পর মনের মতো শহর গড়ে তোলা যাবে? অবান্তর এবং ভীতিপ্রদ এসব ভাবনা, কিন্তু কলকাতাকে দেখলে যারা কলকাতাকে ভালোবাসি তারা আঁতকে ওঠা ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতির সন্ধান সহজে পাই না।

যদি কেউ দেখান, 'ঐ তো বানানো হয়েছে হাওড়া ব্রিজের কাছে উড়ন-পুল', তো মনে হয়: এত অল্পে সন্তুষ্ট কলকাতার মানুষ [উল্টো-ডিঙ্গিতে একটা ছোট্ট, একেবারে বাজে, কাঠের পুল বানিয়ে প্রথম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা (১৯৬৭) কিছু বাহবাও পেয়েছিল!], তাদের মুখে একটু হাসি ফোটাবার প্রকৃত প্রচেষ্টা হয় না? কলকাতার মতো মহানগরীর পক্ষে হাওড়া ব্রিজের মুখে যে যানবাহন ব্যবস্থা এবং হাওড়া স্টেশনে ঢোকবার যে সামান্য একটু আয়োজন সম্প্রতি হয়েছে তা এতই তুচ্ছ, এতই সীমিত, এতই রিক্ত, এতই নিরাভরণ যে তাতে অল্প একটু সুরাহা ছাড়া নগরজীবনে কোনো রূপান্তরেরই আভাস আসে নি। আশ্চর্য নয় যে এই 'fly-over'-এর নিচেই নিঃস্ব ঘরছাড়া মানুষের অসুন্দর সমাবেশ প্রতিনিয়ত যেন স্বার্থমগ্ন শ্রেণীসমাজের সকল অহংকারকে নিদারুণ লজ্জা দিয়ে ঘোষণা করছে দেশের সর্বব্যাপ্ত দারিদ্র্যের কঠোর আত্মপ্রকাশ: 'সাহস আছে অস্বীকার করতে আমার অস্তিত্ব?'

কলকাতা অন্তত একটা বড়াই করতে পারে যে ভারতবর্ষের জীবনের সব চেয়ে বাস্তব যে সত্য—যা হল দুঃখ আর দৈন্য আর এমন ব্যাপক বঞ্চনা যা শ্রেণীসভ্যতার মূলীভূত প্রবঞ্চনারই বিপুল বিঘোষণ—সেই সত্যকে দৃষ্টির

পরিধি থেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয় এখানে। নয়া দিল্লী আর বোম্বাইয়ের স্থানবিশেষে সেই সত্যকে 'সংগোপনে' রেখে বিদেশী 'ট্যুরিস্ট' সংগ্রহ ও সম্মোহনের অসার্থক প্রয়াস অন্তত কলকাতায় অচল।

বারবার তাশ্‌খন্দ-এর কথা মনে হচ্ছে। কারণ প্রথম দেখি ঐ শহর ১৯৫৪ সালে, যখন তার চেহারায় মধ্য এশিয়ার প্রাক্তন ছবি বেশ কিছুটা ছিল (আজও আছে তবে খুবই অল্প, প্রায় 'museum piece'-এর মতো, জাদুঘরে ধরে রাখার মতো অবস্থায়)—আবার দেখি ১৯৬৮, ১৯৬৯, ১৯৭৪ সালে, যখন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত শহরকে নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে, যে-সজ্জাকে মনোমোহিনীর মতো হাস্যকর বিশেষণ দিতেও সংকোচ আসে না। মধ্য এশিয়ার ঐতিহ্য-ঐশ্বর্যের সঙ্গে অধুনাতন জগতের নগর-পরিকল্পনার যথাসম্ভব সামঞ্জস্য ঘটিয়ে নবনির্মাণের উদ্দীপনা তখন দেখেছি, এই সেদিনও আবার দেখলাম। মরুভূমির দেশ বলে যেখানে সম্ভব সেখানেই ঘনবৃক্ষরাজির শোভা সৃষ্টির প্রয়াস চতুর্দিকে, এমনই এক প্রশস্ত অথচ শুকনো ডাঙ্গায় সযত্নে গড়ে তোলা এবং এখন প্রকৃতই সুরম্য, বিস্তৃত উদ্যানে দেখলাম কার্ল মার্ক্‌স্‌-এর বিপুল প্রস্তর প্রতিমূর্তি, তার নীচে দেবনাগরী থেকে চীনা প্রভৃতি নানা হরফে খোদাই করা : 'দুনিয়ার মজদুর এক হও!' শহর ঘুরতে হলে কেবলই চোখে পড়বে ফোয়ারা আর ফোয়ারা, সবই যন্ত্রে অহোরাত্র চলছে, সাজানো খাদ দিয়ে জল বয়ে চলেছে, ফোয়ারার মধ্যে খেলছে নানারঙের বৈদ্যুতিক আলো। একজায়গায় মস্ত একটা এলাকা জুড়ে রয়েছে বহুবিধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, যা ভূমিকম্পে ভেঙে-পড়া তাশ্‌খন্দকে নতুন করে বানানোর স্মৃতিকে ধরে রেখেছে—কবে আরম্ভ হল পুনর্নির্মাণ আর কবে শেষ হল, সে-খবর পাথরে আঁকা রয়েছে। পুনর্নির্মাণে অংশ নিয়েছিল সোভিয়েট সংঘের প্রতিটি রাজ্য, আর তাশ্‌খন্দ এবং উজ্‌বেকিস্তান কখনও ভুলবে না (যেমন ভুলবে না তুর্কমেনিস্তান এবং তার রাজধানী, ঐ-একই-বিপদে দীর্ণ, আশ্‌খাবাদ) যে সোভিয়েটের সর্বত্র সবাই এগিয়ে এসেছিল সংকটাপন্ন তাশ্‌খন্দ-এর আর্তি নাশ করার জন্য। মনে পড়ে গেল ১৯৭৪ সালে সমরকন্দ-এ আন্তর্জাতিক সভা সেরে তাশ্‌খন্দ-এ উজবেকিস্তানের প্রধান কম্যুনিস্ট নেতা কমরেড রশীদভ্‌-কে বলেছিলাম যে 'সমবেত নিরাপত্তা' ('collective security') বলতে সোভিয়েট কি বোঝে তার পরিচয় মেলে তাশ্‌খন্দ-এর এই পুনর্গঠনে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে কত আঘাত খেয়েছে পশ্চিমবাংলা আর

বিশেষ করে কলকাতা শহর—পঞ্চাশের মন্বন্তর, যা ছিল মানুষেরই অমানুষিকতার নিদর্শন; ব্রিটিশের যুদ্ধায়োজনের প্রধান ভারতীয় কেন্দ্র হিসাবে কলকাতার বুক দুমড়ে দিয়ে রাস্তা ভেঙে, বিশাল মিলিটারি 'কন্‌ভয়'-এর অবিরাম নিষ্পেষণ; সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র আর আমাদেরই নিজস্ব দুর্বলতা ও অপরাধের ফলশ্রুতি যে দেশবিভাগ ও তার পূর্বে এবং পরে যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ তার ধাক্কা; পাকিস্তান সৃষ্টির পর বারবার পূর্ব বাংলা থেকে অগণিত অসহায় মানুষের মর্মন্তুদ উপস্থিতি ও হাহাকারের আক্রমণ ইত্যাদি সর্বভারতীয় সমস্যার সাক্ষাৎ শিকার হয়ে থেকে কলকাতার দুর্দশা ক্রমশ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে এমন এক বিন্দুতে, যেখানে মানসিকতাই যেন অসাড়, মানাবক ব্যঞ্জনাই যেন বিমূঢ়। আমরা বাঙালীরা বুক চাপড়ে অপরকে দোষ দিতে নিজেদের প্রায় অভ্যস্ত করে ফেলেছি বলে এই নিদারুণ পরিস্থিতির জন্য নিজস্ব দায়িত্ব একরকম অস্বীকার করার চেষ্টা প্রায়শ করে থাকি। এটা সমুচিত না হলেও সম্পূর্ণ অসঙ্গত নয়, কারণ সারা দেশের বোঝা বহন করেও বাস্তব সহায়তা ও সহযোগিতা আসে নি পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে সঙ্গীন সংকট-সময়ে। আসবে কেমন করে, যখন আমাদের সমাজব্যবস্থাতেই রয়েছে গোড়ায় গলদ—কেমন করে এখানে প্রত্যাশা করব তাশ্‌খন্দ-এর অভিজ্ঞতা, যেখানে গোটা সোভিয়েট দেশ ঝাঁপিয়ে পড়ে অচিরে ভাঙা শহরকে শুধু জোড়া নয়, তাকে নতুন নয়নাভিরাম সাজে সাজিয়ে তুলেছে।

তাশ্‌খন্দ সম্বন্ধে লিখতে বসি নি। লিখতে চাই কলকাতা নিয়ে—কিন্তু না বলে পারছি না একটু তাশ্‌খন্দ নিয়ে। সেই শহরে এবং তার অনতিদূরে গ্রামাঞ্চলেও দেখলাম, যে মুসলমান মেয়েরা একদা ঘোড়ার লোমে বানানো 'পরঞ্জা' বা বোর্‌খা দিয়ে মুখ না ঢেকে পরপুরুষের চোখের সামনে বেরোলে মোল্লার হুকুমে পাথরের আঘাতে মৃত্যুদণ্ড পেত, তারা 'কলেকৃটিভ্‌ ফার্ম' থেকে বিজ্ঞান আকাদেমি পর্যন্ত সর্বত্র সতেজে বিচরণ করছে, বিজ্ঞানীদের মধ্যে তারা শতকরা পঞ্চান্ন জনের মতো, অকুণ্ঠ তাদের ব্যবহার, প্রবল আত্মবিশ্বাসে সবাই যেন ভরা, যে-কাজ করছে তা ছোট বা বড় হোক না কেন। তাশ্‌খন্দে চমৎকার এক প্রদর্শনীতে উজ্‌বেকিস্তানের অগ্রগতির বিবরণ বিধৃত হয়ে রয়েছে—সেখানে এবং লেনিনের স্মৃতিতে উৎসর্গিত সংগ্রহালয়ে উজ্‌বেক মেয়েরা যখন বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ দিচ্ছিল তখন তাদের স্বচ্ছন্দ সাবলীল ব্যবহার দেখে ভাবা যেত না তারা আসছে সাধারণ মুসলমান পরিবার থেকে, যেখানে কিছুকাল আগে পর্যন্ত ছিল এমন মধ্যযুগীয় আবহাওয়া যা আমাদের

দেশের তুলনায়ও ছিল অনেক বেশি পিছিয়ে-পড়া। এই লেনিন মিউজিয়ম পুরোনো আর নতুন স্থাপত্যের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে এক অতি সুশোভন সৌধ; ভিতরে এবং বাইরে তার রূপসজ্জা এবং তথ্যসমৃদ্ধিতে পরিমিতি আর প্রাচুর্যের সুঠাম সম্মিলনে প্রসাদগুণ যেন বিকীর্ণ হচ্ছে। শুনলাম যে তাশ্‌খন্দে বিস্তীর্ণ এক চত্বরে সমুচ্চ পাদভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত লেনিনের মূর্তি যিনি গড়েছেন, তিনিই হলেন কলকাতা শহরকে দেওয়া লেনিন-মূর্তিরও ভাস্কর। বিপ্লবের পূর্বে শহর বলে ভাবাই শক্ত ছিল তাশ্‌খন্দ-কে; আজও কলকাতার চেয়ে তাশ্‌খন্দ অনেক ছোট; সমাজবাদের সোনার কাঠির স্পর্শ বিনা তার আজকের চেহারা কল্পনাই করা যেত না—যে-চেহারা সদ্য দেখে এসে দুঃখী কলকাতার মায়া যেন নতুন করে মনে আঘাত দিল।

বৃহত্তর কলকাতায় যত লোক বাস করে, পৃথিবীর বহু সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিবাসী-সংখ্যা তত নয়। খাস কলকাতা শহরের জনসংখ্যা মোঙ্গোলিয়া তো বটেই, এমনকি (মার্কিন দাক্ষিণ্যে পরাক্রান্ত) ইজ্‌রায়েল-এর চেয়েও বোধহয় বেশি। যে কোনো দেশের সবচেয়ে দামী মূলধন তার জনশক্তি যদি হয় তো আমাদের ভারতবর্ষ ও শহর কলকাতার মতো এলাকার পক্ষে দীনহীন হয়ে থাকার অর্থ নেই। কিন্তু প্রায় নিয়তির মতোই যেন আমাদের দুরবস্থা—'চিরদিন আছি ভিখারীর মতো জগতের পথপাশে' বলে বিলাপ করেছেন আমাদের কবি, আজও পুরুষকার বলে তাকে রোধ করার সাহসিকতা ও সঙ্গতি দেখাতে আমরা পারি নি। জোড়াতাড়া দিয়ে, নানারকম ছোটোখাটো মেরামতি চালিয়ে কলকাতাকে চালু রাখার চেষ্টা ছাড়া কিছু এখনও সম্ভব হয় নি। 'সি-এম-ডি-এ' পাঁচ বছরে দুশো কোটি টাকার উপর খরচ করে জলসরবরাহের পরিমাণ বুঝি প্রায় দ্বিগুণ করেছে—কিন্তু জলের পাইপগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহুকালের পুরোনো আর তার ফাটল দিয়ে এবং আমাদের স্বভাবগুণে সেই জলের একটা বৃহদংশ নষ্ট হয়ে যায়। শহরে ছড়ানো বস্তিদের মধ্যে একাংশে 'সি-এম-ডি-এ'-র কল্যাণে কিছু উন্নতি নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু জানা গেছে যে বর্তমান অবস্থায় বস্তি উচ্ছেদ সম্ভব নয়, বস্তিবাসীদের পক্ষে নিতান্ত সামান্য পাকাবাড়িতেও ভাড়া দিয়ে থাকা সম্ভব নয়, শহরের গায়ে নোংরা ঘা হয়ে থাকলেও আজকের সমাজে বস্তিগুলোর একটা দামী অর্থ-নৈতিক ভূমিকা রয়েছে নিম্নবিত্তদের আশ্রয় রূপে—বস্তি ভেঙে দিয়ে সকলের জন্য বাসযোগ্য গৃহের আয়োজন কর্তব্য বটে কিন্তু তা সাধ্যের বাইরে। কবে যে তা সাধ্য হবে বর্তমান সমাজব্যবস্থায়, তা বলা দুষ্কর—আর বস্তিবাসীদের

মাথার উপর তবু একটা আচ্ছাদন আছে, যারা থাকে খোলা রাস্তার আশেপাশে এবং সম্প্রতি যাদের আবার কলকাতা এবং উপকণ্ঠে দেখা গেছে কাতারে কাতারে, তাদের কি ব্যবস্থা করে কোথায় এবং কিভাবে হবে? সর্বদেশেই অবশ্য সকলের জন্য গৃহনির্মাণের সমস্যা খুবই জটিল—আমাদের মতো দেশে তো কথাই নেই—কিন্তু এ নিয়ে সমস্যাজর্জর কলকাতার যে দুর্ভোগ, তার উপশমের লক্ষণই বা কোথায়?

বর্ষাকালে এটা লিখতে বসে সংকোচ হচ্ছে বলতে যে 'সি-এম-ডি-এ' কলকাতার রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে থাকার যন্ত্রণা একটু কমিয়েছে—মাঝে মাঝে মনে হয় সে-যন্ত্রণা পূর্ববৎ তো বটেই, পূর্বের চেয়েও বিষম! কতকগুলো রাস্তা একটু চওড়া নিশ্চয়ই করা হয়েছে—প্রধানত গাড়ি যারা চালিয়ে যায় তাদের সুবিধার্থে এবং পদচারীদের অসুবিধা বাড়িয়ে—কিন্তু বিদেশের (এবং কিছু পরিমাণে এদেশেরও) বিভিন্ন মহানগরে চওড়া, পরিচ্ছন্ন রাস্তার তুলনায় কলকাতা একেবারে দীন—এমনকি অনেক ধুমধড়াক্কা করে দমদম বিমান-ঘাঁটিতে যাবার যে রাস্তা বানিয়ে তাকে ঘটা করে 'ভি-আই-পি' রোড বলা হল, তারও চেহারা রীতিমতো নিরেশ। শহরের জঞ্জাল সরানো ব্যাপারে একটু-আধটু উন্নতি সম্ভবত হয়েছে, কিন্তু নোংরার ডাঁই প্রায় সর্বত্র এবং তাকে সরাবার ব্যবস্থার অজস্র গলদ সকলেরই চোখে পড়ে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই এতে, কারণ জনসংখ্যা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শহর সাফ রাখার মুশকিল বহুগুণ বেড়েছে। আর রাস্তা বাড়ানো বা চওড়া করা যে কতো কঠিন তা বোঝা যায় যখন শুনি যে শহরের আয়তনের তুলনায় চলাচলের খোলা রাস্তা যেখানে শতকরা কুড়ি হওয়া উচিত সেখানে কলকাতায় আছে শতকরা মাত্র ছয় ভাগ! একেবারে আদি থেকে কলকাতা বেড়ে উঠেছে অরাজক কায়দায়—বিদেশীশাসনে কয়েকটা বাছাই-করা এলাকা ছাড়া অন্যত্র কোনো প্রকৃত নিয়মকানুন মানার তেমন চেষ্টা হয় নি—মস্ত একটা গ্রাম-ও-শহরের সমাবেশ যেন এখানে হয়েছে, "chance-erected, chance-directed" (কিপলিং-এর ভাষায়) এর ইতিহাসে, এখানে পাশাপাশি রয়েছে দৈন্য আর ঐশ্বর্য, "Palace, byre, hovel/Poverty and pride/Side by side", এ-শহর হল 'pestilential', 'নানা রোগের ডিপো'। Moorhouse-এর কলকাতা-বিষয়ক যে বই কয়েক বছর আগে একটু চাঞ্চল্য তুলেছিল—'সাহেব'রা আমাদের চেয়ে লেখে ভালো (কারণ তারা লেখে নিজের ভাষায়!) আর তারা না লিখলেও আমাদের টনক নড়ে না—কিন্তু তাতে কিপলিং-এর

টীকা ছাড়া খুব বেশি ছিল মনে হয় না। তবে দামি কথার উপরই লেখক জোর দিয়েছিলেন বলে ধন্যবাদার্হ—একেবারে অভাবনীয় দারিদ্র্য এবং প্রায়-অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্যের পাশাপাশি সহাবস্থান (যা মুরহাউস কলকাতায় দেখেন) যে নোংরামির চূড়ান্ত তা তিনি জোর গলায় বলে আমাদের লজ্জা দিয়েছিলেন। বহু দশকের অবহেলা, বিদেশী শাসনের শেষ অধ্যায়ের বিকট যন্ত্রণা, আমাদের নিজস্ব, ব্যাপক অপদার্থতা এবং ধনবাদী সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত আনুষঙ্গিকতা মিলে কলকাতার যে অসহনীয় সংকট, তা থেকে ত্রাণ সহজে মিলবে কেমন করে ?

কলকাতাকে নিয়ে কিছু মেরামতি কাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনতিদূর ভবিষ্যতে বেশ কিছুটা ঢেলে সাজাবার পরিকল্পনা একসঙ্গে না চালাতে পারলে সুরাহা সম্ভব মনে হয় না। মেরামতি কাজ অন্তত কিছু পরিমাণে সুচারুভাবে করতে হলে দরকার জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সাময়িকভাবে ক্লেশ স্বীকারে তাদের প্রস্তুতি—যা শুধু সম্ভব, যদি বাস্তবিকই, অদূর ভবিষ্যতে প্রকৃত উন্নতির প্রতিশ্রুতিতে তাদের আস্থা কর্তৃপক্ষ অর্জন করতে পারে। কলকাতায় দেখেছি 'স্টুডেন্ট্‌স্‌ হেল্‌থ হোম'-এর মতো কল্যাণব্রতী সংস্থা পাতাল-রেলকে স্বাগত জানাল, কিন্তু তারা শহর-সংস্কারের ব্যাপারে জনসমর্থন সংগ্রহ বিষয়ে উৎসাহ দেখিয়ে পরে নিজেরাই পশ্চিমবাংলার মাঝেমাঝে উন্মাদনাপূর্ণ অথচ আসলে কেমন যেন নিরাশ ও নিষ্কর্মা আবহাওয়ার চাপে নিরুৎসাহ ও নিশ্চেষ্ট হয়ে গেছেন। দেখেছি এবং প্রকাশ্যে অনুযোগ করতে গিয়ে বিড়ম্বিত হয়েছি যে কলকাতায় প্রবলভাবে সক্রিয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই শহরের পুনরুজ্জীবন প্রয়াসে কেন যথাসম্ভব হাত মিলাবেন না ? জানি না আজ পশ্চিমবাংলার বামপন্থী সরকার কর্তৃত্বে আসীন হওয়ার ফলে এ ধরনের কাজে সর্বজনের সহযোগিতা চাওয়া এবং সুসংহত করা হবে কিনা। মুরহাউস-এর গ্রন্থে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সম্পর্কে কিছু প্রশস্তি ও প্রত্যাশার উল্লেখ ছিল। ভরসা করা হয়তো একেবারে অমূলক নয় যে বহু বিলম্ব ঘটে গেলেও কলকাতা নিয়ে অবশেষে কিছু মৌলিক চিন্তা ও সঙ্গে সঙ্গে আপাত প্রয়োজন মিটাবার সর্ববিধ প্রচেষ্টা ঘটবে।

কলকাতা শহর হিসাবে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ার অনেক কারণ যে আছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু সেগুলোকে অজুহাত আর অছিলা ধরে নিয়ে চোখের সামনে শহরকে ভেঙে পড়ে যেতে দিই—আমরা কেমন করে ? 'দিল্লী' কিছু করল না বলে বুক চাপড়ে, অপরকে অভিশাপ

দিয়ে, নিজের দোষ আর দুর্বলতার দিক থেকে নজর সরিয়ে রেখে, এক-ধরনের সস্তা আত্মসন্তুষ্টি যে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে আছে, তা বললে কেউ রুষ্ট হলে নাচার। নানাদিক থেকে আঘাত আমাদের ওপর পড়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু 'বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা। বিপদে আমি না যেন করি ভয়', এ-ই কি ঠিক নয়? নিজেরা আন্তরিক চেষ্টায় নামলে ফল কি হয় না? নিশ্চয়ই হয়, কারণ আমাদেরই স্মরণে রয়েছে যে ১৯২৪ সালে মিউনিসিপাল নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করার পর যখন চিত্তরঞ্জন দাশ হন 'মেয়র' এবং সুভাষচন্দ্র বসু হন প্রধান কর্মকর্তা, তখন বেশ কয়েক বৎসর নগরপালিকার কর্তব্য সুসম্পন্ন হয়েছিল, নগরবাসীর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিকে নজর পড়েছিল, কলকাতার আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কর্পোরেশন-এর, 'চোরপোরেশন' নামকরণ তার পরবর্তী ঘটনা। যদি আমরা বাস্তবিকই চাই তো পারি আমাদের শহর ও রাজ্যের ইতিহাসের মোড় ঘোরাতে।

সম্প্রতি মস্কো আবার দেখে বুঝলাম ঐ বিস্তীর্ণ শহর জুড়ে অগণিত বাসগৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য কল্যাণকর্মের বহর বাড়ছে, ১৯৮০ সালের নির্দিষ্ট 'অলিম্পিক' ক্রীড়া-উৎসবের জন্য শহর শান্ত উদ্দীপনা নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে। সেখানে শুনি তারা স্থির করেছে একটা সীমার বাইরে মস্কো-কে বাড়তে দেওয়া হবে না। দেশের অর্থব্যবস্থার প্রয়োজনে বিকাশ অবশ্যই ঘটতে থাকবে, কিন্তু অতিকায় শহর বানিয়ে নতুন সংকট এড়িয়ে চলতে হবে। আমরা কলকাতাকে একেবারে অনিয়ন্ত্রিতভাবে এলোপাথাড়ি বেড়ে যেতে দিয়েছি। আর প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে ক্রমবর্ধমান নিঃস্বের দল এখানে ছুটে এসে যত্রতত্র শুধু মাথা গুঁজে থাকা এবং দিনগুজরানের মতো জায়গায় জড়ো হয়েছে, দুঃখী মানুষের এই বন্যাকে উদ্দাম উন্মাদ করে তুলেছে পশ্চিমবাংলারই (এবং বাংলাদেশের) অসংখ্য দুর্গতদের একান্ত বিশৃঙ্খল উপস্থিতি। আগে মাঝে-মাঝে প্রস্তাব হয়েছে যে 'অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু' ('এই আরম্ভের ফলে যেন মঙ্গল হয়') বলে কল্যাণীর মতো যে নগরীর পত্তন হয়েছে, সেখানে এবং রাজ্যের অন্যত্র কিছু পরিমাণে সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরিত করা হোক, যানবাহনের সমুন্নতির ফলে যাতায়াত ও যোগাযোগ অব্যাহত থাকুক। কলকাতার গুরুত্ব ও গৌরব তাতে খণ্ডিত হবে না, হ্রাস পাবে না। কিন্তু প্রতিবারই এসেছে প্রচুর প্রতিবন্ধক, এবং কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে পরিপূর্ণ অসাফল্য। এ-বিষয়ে পরিকল্পনা বলে কোনো বস্তুরই সন্ধান পাওয়া যায়নি, এবং তারই ফলশ্রুতি হল যে হাওড়ার মতো কলকাতারই সংলগ্ন এবং নানা

কারণে শিল্পকেন্দ্ররূপে বিকশিত হবার অপার সম্ভাবনাপূর্ণ অঞ্চলও ক্রমশ পূর্বের থেকেও দুর্গত হয়ে পড়ল, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প যখন দেশে বাড়তির পথে, তখন হাওড়ার মতো বিশ্বকর্মার পীঠস্থান দীনহীন হতে লাগল। এ-বিষয়ে দিল্লীর মুখ চেয়ে বসে না থেকে বারকোটি মানুষের পশ্চিমবাংলা রাজ্য নিজের পায়ে ভর দিয়ে এগোবার সাহস ও সংকল্প দেখাল না।

হয়তো আজ এ সমস্ত বিষয়ে গভীর চিন্তা ও কর্মের প্রচেষ্টা আরম্ভ হচ্ছে। কিছু হয়ে থাকলে তার বিবরণ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার দরকার আছে, যাতে তাদের ভাঙা মনে আবার আশার সঞ্চার হয়। তা নইলে তো অধোবদনে শুনে যেতে হবে এদেশেরই অনেকের সমালোচনা যে কলকাতার দুঃখী চেহারার জন্য প্রধানত দায়ী হল বাঙালি চরিত্র—মনোমত এবং কার্যক্ষম সরকার যদি আজও পেয়ে না থাকি (বা অতি সম্প্রতি পেয়ে থাকি), তাহলে সেটাও তো আমাদের দুর্বলতা, বিধিনির্দিষ্ট নিয়তি নিশ্চয়ই নয়! কেবল অজুহাত দেখিয়ে কাউকে বোঝানো যাবে না—নিজেকেও তুষ্ট করা যাবে না। কেন আমাদের কাঁদুনি গাইতে হয় যে কলকাতা পৌরসভার আয় হল বোম্বাইয়ের এক-তৃতীয়াংশ। এমনকি ভারতের বহু দ্বিতীয় পর্যায়ের শহরের চাইতেও কম? কেন শুনতে হয় যে কলকাতা কর্পোরেশনের যা আয়, তার বহুলাংশ যায় কর্মচারীদের বেতনে, অথচ তাদের অনেকে নাকি খাতায় নামমাত্র সই করেন, কাজের গণ্ডগোলে থাকেন না? কেন কলকাতা বন্দরের বাণিজ্যে বিশ বছর ধরে বিপুল অবনমন বিষয় 'ফরাক্কা' ছাড়া অন্যান্য বহু সম্ভাব্য নিরাকরণ ব্যাপারে পশ্চিমবাংলা প্রকৃত মনোযোগ দিতে পারে নি? কেন আজও হলদিয়া প্রভৃতি প্রকল্প বিষয়ে পশ্চিমবাংলারই কর্তৃপক্ষের মনে যেন বিচিত্র অনীহা? 'The fault, dear Brutus, is not in thy stars but in thyself…'

কলকাতাকে আমরা অনেকে ভালবাসি। সন্দেহ নেই, কিন্তু যে-ভালোবাসায় শুধু হা-হুতাশ, তাতে শান্তি নেই, স্বস্তিও নেই। আর এই ভালোবাসাকে পরিমাপের কোনো বাস্তব মাপকাঠিও নেই—মাঝে মাঝে মনে হয় এই ভালোবাসার ভড়ংটা ভুয়ো, আর তাই বুঝি 'কলকাতার কড়চা' আছে, কাব্য তেমন নেই, অন্তত সুবোধ্য সুন্দর কাব্য প্রায় নেই (কেউ কি লণ্ডন সম্বন্ধে Wordsworth-এর মতো বলে উঠেছেন: This city doth like a garment wear/The beauty of the morning, কিম্বা কল্পনা করেছেন ভোরবেলার নিথর নিস্তব্ধ শহরকে: like a nun, breathless

in adoration ?)। হয়তো অবিচার করছি, হয়তো বা আমাদের আধুনিক কবিতায় আছে বহু সুরম্য ইঙ্গিত যা ইতরজনের বোধগম্য নয়। তা যাই হোক, ইতিমধ্যে কলকাতাকে 'দু চক্ষে ঘেন্না' করেও ইংরেজ 'ভালোবেসেছে'। বড়োলাট কর্জন সাহেবের মতো—'মুসলমানের মুর্গী পোষা'-র মতো সে-ভালবাসা, যতদিন ব্রিটিশ স্বার্থের চমৎকার আকর ছিল এই শহর, ততদিনই। এজন্য, নিজস্ব দরকার মতো, কিছু কাজও যে ইংরেজ করে নি তা নয়; গোলামি প্রথা রাখতে গেলে গোলামের জীবনধারণকে অন্তত সম্ভব করতে হয়। তাই যে কলকাতার পানীয় জলের এত দুর্নাম, সেই কলকাতায় ১৮৭৪ সালে জলের প্রশংসা সমসাময়িক বিবরণে, পাওয়া যায়। তাই আরও আগে, নগর পত্তনের কিছু পরে, ভাগীরথীতীরে 'প্রাসাদনগরী' ('City of Palaces') বলে কলকাতার খ্যাতি। তাই যতদিন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা, ততদিন শহর হিসাবে এর শীর্ষাবস্থান সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ছিল না। এজন্যই ব্রিটিশ বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় ভারতীয় কেন্দ্রস্থল বলে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ইংরেজের চোখে এ শহরের মর্যাদা লুপ্ত হয় নি। এজন্যই ১৯৩৪ সালের বড়দিনের সময় খাস ইংরেজ-পরিচালিত দৈনিকে লেখা হয়েছিল যে ট্যাঁকে যদি টাকা থাকে যথেষ্ট পরিমাণে, তাহলে 'ক্রিসমাস' কাটাবার পক্ষে সবচেয়ে চমৎকার জায়গা হল কলকাতা! ভাবতে পারা যায় না আজ এ-ধরনের কথা; শুধু অল্প একটু সান্ত্বনা মেলে এই দেখে যে একটু বুদ্ধিমান বিদেশী 'ট্যুরিস্ট'-কে লোভ দেখাবার জন্য পর্যটনব্যবসায়ীদের প্রচার-পত্রে বলা হল যে যদি ভারতবর্ষের জীবন্ত সংস্কৃতি-সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক জাগৃতির উগ্র উদ্দীপক ছবি দেখতে হয় তো কলকাতাই হল গন্তব্য, দিন যাপনের গ্লানি একটু বেশি হলেও ক্ষতি কি ?

কলকাতার দৌলত শোষণ যারা করেছে তারা হয় ইংরেজের মতো নিছক বিদেশী, নয় ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা মাড়োয়াড়ী, ভাটিয়া, গুজরাটি, পাঞ্জাবী ইত্যাদি। এদের কেউ কেউ কলকাতা সম্বন্ধে একটু মায়া অনুভব করে, কিন্তু তাদের প্রাণের টান অন্যত্র। তাই বোম্বাইয়ের মতো স্থানীয় ধনপতিরা কলকাতার মঙ্গলসাধনে বা শহরের স্বস্তি ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ব্যস্ততা বিশেষ দেখায় নি—প্রথম জীবনে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই কলকাতার উপর নির্ভরশীল হয়েও বিরলা-পরিবারের বহু-বিজ্ঞাপিত পরোপচিকীর্ষা কলকাতায় ছিটে-ফোঁটার বেশি বর্ষিত হয় নি। পূর্ব বাংলা থেকে আসা, অনেক সফল বাঙালিও কলকাতাকে 'দেশ' বলে কখনও মনে করে নি। এটা

'বাসা'-মাত্র, দুদিনের জন্য বাঁধা ঘর, যা ফেলে যেতে কষ্ট নেই। কলকাতাকে বোধহয় ভালোবাসে যাদের বলা হয় 'কল্‌কত্তিয়া', ধর্মে মুসলমান, মুখে একটু-বিকৃত উর্দু বুলি, কবিতায় নেশা, বস্তিতে বাস, কলকাতা ছাড়া নিজস্ব বলতে 'দেশ' যাদের নেই—যাদের একজন নেতা আমায় লিখেছিলেন প্যারিস থেকে, বছর বাইশ আগে, যে কেবলই মন কেমন করে পাটোয়ার বাগানের প্রস্রাবে নোংরা-করা ধুলোভরা সরু গলির জন্য! বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি থেকে যারা আসে বৃহত্তর কলকাতায় 'পেট্‌কা ওয়াস্তে', কলকাতা তাদের কাছে 'দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘর' ছাড়া কিছু নয়। আছে নিশ্চয়ই কিছু কবি, কিছু সাহিত্যিক, যারা কলকাতাকে 'ভয়ঙ্কর' ভালোবাসেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য আর তাদের প্রভাব 'নাস্তি'।

হাজার কথা যখন মাথায় আসে তখন তাকে সাজিয়ে বলা শক্ত। স্পষ্ট করে কিছুই তাই বলা হল না—কিন্তু না-ই হোক। মাত্র কদিন আগে তাশ্‌খন্দ্ দেখে, আর্মীনিয়ার রাজধানী য়েরেভান্ শহর দেখে, এস্তোনিয়ার রাজধানী তালিন্ দেখে, আর গোটা সোভিয়েটের কেন্দ্রস্থল মস্কো দেখে (সব কটাই পুরনো অথচ নতুন শহর) কেবলই মনে পড়েছে কলকাতার কথা। তারই কিছু কথার ছাঁদে ধরে রাখার চেষ্টা করলাম—কদর্থ কেউ করবেন না ভরসা রেখে।

ছাড়িয়া না যান মোর মৈষাল বন্ধু রে

ভাওয়াইয়া অঞ্চলের লোকগীতি ও কথা

নীহার বড়ুয়া

পরিচিতি

হিমশৈল-নন্দন 'সাংপো' (TSANOPO) তার পূর্বমুখী দীর্ঘ অভিযানের পথ ঘুরিয়ে 'দিহাং' (DIHANG) রূপে নিম্নমুখী পথে নেমে এলো ভারতের পুর্ব সীমান্তে। পূর্ব প্রান্ত থেকে 'দিবাং' ও 'লুইত' (DIBAN-LUHIT) ছুটে এলো তার দিকে—তাদের সাদরে বুকে তুলে নিল 'দিহাং'। মিলনমুগ্ধ মঙ্গোল 'জনজাতি' 'বড়ো' বা 'ভুল্লুং-বুথুরা' (BHULLAN-BUTHUR) বলে সাদর সম্ভাষণ জানাল। আর্যগোষ্ঠী শান্তনুকুলনন্দন 'ব্রহ্মপুত্র' বলে তাকে বরণ করে নিল।

ভুল্লুং-বুথুরের বিপরীতমুখী যাত্রা সুরু হল—অ-সম রাজ্যের বক্ষ বেষ্টন করে। অসমের পশ্চিম প্রান্তবর্তী অঞ্চলে এসে—সাগরের আহ্বানে আবার তাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হল। তার বাঁ দিকের 'মেঘালয়ে'স্থিত 'গারোপাহাড়ে'র ছড়িয়ে থাকা অংশকে পাশ কাটিয়ে, দক্ষিণদিকে বাঁক নিল সাগর অভিমুখে।

এই বাঁকের মুখ গারোপাহাড়ের পাদদেশ থেকে ব্রহ্মপুত্রের উভয় কূল ও বাংলাদেশের রংপুর জেলা ইত্যাদি অঞ্চলকে নিয়ে—হিন্দু, মুসলমান বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত 'কোচরাজবংশী ভাষী' বা 'বাহেভাষী' লোকদের বসতির শুরু। কোচরাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে জনজাতি (Tribe) গণ ছাড়া, সমগ্র

উত্তরবাংলায় এই উপভাষা তাদের কথিত ভাষায় রূপান্তরিত হয়। তখন থেকেই এই ভাষার মাধ্যমে তাঁদের লোক-সংস্কৃতির সাহিত্যিক অংশকেও কালে কালে তাঁরা বিভিন্ন ধারায় পুষ্ট করে গিয়েছেন। অতীতের রংপুরের খণ্ডিত ও অসমের পশ্চিমপ্রান্তে যুক্ত সেই বাহেভাষী অঞ্চলকেই কেন্দ্র করে এই প্রবন্ধ।

এই অঞ্চলে এসে 'ব্রহ্মপুত্র' লৌকিক ভদ্র নাম নিল 'বরমপুত্তোর'। 'ঘরুয়া' (ঘরের) ভাষায় 'বাইরগাঙ্'। গাঙ্ অর্থেই বড় নদী, 'বাইর গাঙ্' অর্থে হয়ত আরো বৃহৎ। সেই 'বাইরগাঙ্' ও তার পার্বত্য উপনদী—অসম অঞ্চলের 'গদাধর' 'মানাস' এবং উৎরবাংলার তোরসা, ধরলা, তিস্তা ইত্যাদির বর্ষার রুদ্রমূর্তি। শরতে শান্ত হয়ে আসে। উদ্দাম উচ্ছ্বসিত কূল ছাপানো সেই দেহগুলি সংকুচিত হয়ে—নিজ-নিজ নির্ণীত পথে চলা শুরু করে। তখন কূলঘেঁসা বালুচরগুলি উঁকি দিতে থাকে। শীতের প্রারম্ভে তারা যৌবনের পরিপূর্ণতা নিয়ে জেগে ওঠে।

সেই সময় থেকে ভেসে আসতে থাকে এই গাঙগুলির অভিমুখে বিভিন্ন স্বরে 'ঢং-ঢং-ঢং-ঢং' শত শত 'ঘান্টি'র[১] গুরুগম্ভীর আওয়াজ। ঘান্টির সেই ধ্বনির সঙ্গে কখনও কানে আসে বাঁশির করুণ রেশ বা 'দোতরা'[২]র মন মাতানো ঝংকার। ক্রমেই সেই মিলিত গুঞ্জরন নিকটবর্ত্তী হতে থাকে। গাঙের উচ্চপাড়ের বনভূমিতে মর্মরধ্বনি উত্থিত হয়—বনভূমি চঞ্চল হয়ে জেগে ওঠে। তখন তার দেহ চিরে চিরে, একে একে, দুয়ে দুয়ে, শত শত কুচকুচে বিশালদেহী মোষের দল—তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে এসে গাঙের শীতল জলে গা ডুবিয়ে বসে।

সর্বশেষে দেখা দেয় সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে 'বাথানে'[৩]র 'দাফাদার[৪] অর্থাৎ অধিনায়ক তার পেছনে জিনিষপত্র বোঝাই গরুর বা মোষের গাড়ি। এই 'ভার-ভারাটি[৫]'র অংশ হিসাবে তাতে আসে বাঁশ ও ইকড়াকে বেতের বাঁধনে পরিপাটি করে বোনা—বাসগৃহের টুকরো টুকরো বিভিন্ন অংশ। তখনি দলের

১. 'ঘান্টি'—ঘণ্টা। এখানে মোষের বিশেষ ধরনের ঘণ্টা
২. 'দোহ্রা'—আঞ্চলিক মুগা তাঁতের যন্ত্র বিশেষ।
৩. 'বাতান'—বাথান, মোষদের আস্তানা।
৪. 'দাফাদার'—বাথানের অধিনায়ক।
৫. 'ভার-ভারাটি'—জিনিসপত্র।

'কামলা'রা (কর্মীরা) কেউ বেরিয়ে পড়ে বাথানের উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে, কেউ বা সান্ধ্যভোজনের জোগাড়ে।

সেই ধোয়া-মোছা ঝকঝকে বালুচর দেখতে-দেখতে নবাগত জীবগণের ও তাদের পালকদের বাসস্থানে পরিণত হয়। সন্ধ্যার মুখে বড় বড় 'জোড়-ধামসা'[৬] বনস্থল গাঙের পানি কাঁপিয়ে জানিয়ে দেয় দূর দূরান্তরের গ্রামবাসীদের তাদের আগমনবার্তা। অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাথানের চারদিকে আগুনের বড় বড় কুণ্ডগুলি জ্বলে ওঠে—মাংসলোলুপ ব্যাঘ্রকুলের ভীতির কারণ।

তখন দেখা যায়—জলের ধারটি পরিষ্কার করে দাফাদার নতুন কাপড় পরে, গায় একটি নতুন গামছা জড়িয়ে পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত। ভূত-প্রেত, অপদেবতা এবং কু-লোকের কুদৃষ্টি থেকে বাথানকে রক্ষা করার উদ্দেশে। 'ভোসা',[৭] বাতি, ধূপ, ধুনা জ্বালিয়ে, ফুল, ফল বিবিধ উপচারে এবং তুকতাকের মন্ত্র-তন্ত্রে তাদের সন্তুষ্ট করে, আগে বাথানবাসীদের বিপদমুক্ত করে নেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে দেখা যায়—সঙ্গে করে আনা সেই বেতবাঁশের বোনা ঘরের টুকরোগুলো, মজবুত গৃহরূপে দাঁড়িয়ে উঠেছে। ঘরের সামনে কিছুটা ব্যবধান রেখে একঝাঁক মোষের বাচ্চা ছোট্ট ছোট্ট খুঁটিতে বাঁধা—কেউ বসে, কেউ শুয়ে ঘুমোচ্ছে। কাল প্রত্যুষে তাদের মায়েরা দুধ দিলে তখন তাদেব ছুটি মিলবে। তার কিছু দূরে বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে মসৃণ বালুর উপর, কালোপাথরের স্তূপাবলীর (Rock) মতো তাদের মা, ভাই, বোনরা শুয়ে আরামে রোমন্থনে ব্যস্ত। বিশালদেহী 'বাবা', তার বিশাল শিং জোড়া বিস্তারিত করে দলটির পাশে তার হারেমের রক্ষকরূপে স্থান করে নিয়েছে। ঘরের ধারেই ছোট্ট একটি আগুনের 'ধুনি'—খোলা ধূ ধূ বালুচরের কনকনে ঠাণ্ডায় নিজেদের গরম রাখার ব্যবস্থারূপে।

পুজোপাট শেষ করে 'দাফাদার' ফিরে এলে আহারের পর্ব শেষ হয়। সারাদিনের কর্মশ্রান্ত কর্মীবৃন্দ বিছানার আশ্রয় নেয়। তখন অতল নির্জনতা ভঙ্গ করে থেকে থেকে কানে আসে কূলচর পাখিদের বিরহকাতর আকুল আহ্বান বা তাদের মিলনোৎসবের উচ্ছ্বাসগীতি। আবার কখনও

৬. 'জোড়-ধামসা'—জোড়া-দামামা বিশেষ।
৭. 'ভোসা'—কাঠিতে তুলো মোড়া বর্তিকা

শোনা যায়—নদীপাড়ের বনাঞ্চল থেকে হরিণের ভয়ার্ত ইঙ্গিতধ্বনি, কখনও তাদের অনুসরণকারী বাঘের গুরুগর্জনের রেশ।

এইসব মোষ ও তাদের বাথানগুলি সৃষ্টির একটি আদি ইতিহাস আছে। তার জন্য ফিরে যেতে হবে অন্তত উনবিংশ শতাব্দীতে। কারণ তার মূল সূত্রটি সেই সময়ের সঙ্গেই যুক্ত। অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে অতর্কিতভাবেই সেই কাহিনীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। আমার পিতামহের যুগের একটি বিরাট গুদামঘর ছিল। সেখানে পুরোন বাসন-কোসন, ভাঙাচোরা বিবিধ জিনিসপত্র, আর কত যে জানা-অজানা বিচিত্র বস্তুর ভিড় ছিল তার ইয়ত্তা নেই। সেই সবের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই কেন জানি আমার অদম্য কৌতূহল ছিল। একদিন সেখানে এককোণে ধূলিমলিন গিঁটবাধা পাকানো দড়িদড়ার একটি বোঝা দেখে কৌতূহলবশেই আমার ঠাকুরমাকে প্রশ্ন করি—এগুলো কি? তার উত্তরে তিনি বলেন—'অউলা বুথুয়া মইষ্ ধরা ফান্দ্' (ওগুলো বুনো মোষ ধরা ফাঁদ)। আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম 'ঐটুকু ফাঁদ দিয়ে বুনো মোষ ধরা হত? আর ধরাই বা হত কেন?' তখন তাঁর মুখে যে ইতিবৃত্তটি শুনেছি এখানে সেই কাহিনীটিকে তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। কারণ সেই সব ঘটনা অর্ধশতাব্দী পূর্বেই 'কাহিনী'তে রূপান্তরিত হয়েছিল। বর্তমানে সে কাহিনীও—সেই 'অরণ্য-মইষ' ও তার বাথানগুলির সঙ্গে কালের গতিতে অবলুপ্ত বলেই ধরে নেওয়া যায়।

কাহিনী মতে—এইসব অঞ্চলের বাথানগুলির অধিকাংশই নাকি গড়ে উঠেছিল 'অরনা' মোষের বাচ্চাদের নিয়ে। সেই কালে এসব অঞ্চলের নদীয় ও নিম্নভূমির জলা, ও বিলের ধারে-ধারে—নল, খাগড়া, ইকড়া, বাতা (Elephant grass) ইত্যাদি বিবিধ প্রকার ঘাসের ঠাসা-একটানা জঙ্গল—যোজন দিয়ে পরিমাপ হত! আর সেগুলি বড় বাঘ (Royal Tiger) শুয়োর, হরিণ এবং বিশেষ করে বুনো মোষদের বিরাট বিরাট দলের চারণভূমি ছিল। তা ছাড়াও বুনো হাতীর দল ও গণ্ডারদেরও আনাগোনা কম ছিল না। এই বন-অঞ্চলগুলিতে গমনাগমনের ও পরিবহনের উপায়রূপে একমাত্র হাতীই ছিল সম্বল। তাই সেকালের মানুষ হাতী ধরে যেমন নিজেদের কাজে লাগাত তেমনি মোষ ধরে তাদের দুগ্ধজাত আহার্য বস্তুর জন্য, তাদের পালনও করত।

এইসব জঙ্গলের ধারের বিল বা নদীর জমা গভীর জলাগুলোই মোষ ধরার

ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করা হত। সেই জলে অনেকগুলি নৌকো ভাসিয়ে—কিছু নৌকোয় 'ফাঁদী' আর বাকিগুলোতে মোষদের ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্ত বড় বড় বাঁশ, বর্শা ও গাদা বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে, বহু লোকজন উপস্থিত হত, তখন পাড়ের জঙ্গলে হাতীর উপর থেকে টিন বাজিয়ে পটকা ফাটিয়ে হাতী দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে মোষদের জলে নামান হত। জল গভীর থাকায় মোষেরা সাঁতার দিয়ে পালাবার মতো পায়ে জোর পেত না। সেই সুযোগে যে সব মায়ের দুধ ছাড়া বড় বড় বাচ্চা, যারা দলের পেছনে পড়ত। ফাঁদীরা তাদের ফাঁদ পরিয়ে, বিপরীত দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে পাড়ে তুলত। তবে সেটা সব সময় সহজসাধ্য বা মোটেই নিরাপদ ছিল না। অনেক সময় সেই দুর্ধর্ষ মোষের দল নৌকো আক্রমণের জন্ত দল বেঁধে এগিয়ে আসত। তখন দুইপক্ষকেই যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়াতে হত। মানুষ বুদ্ধি ও অস্ত্র বলে বলীয়ান বলে অধিকক্ষেত্রেই হয়ত জয়লাভ করত কিন্তু মোষদের দলবদ্ধ ঐক্য ও তাদের বিপুল শক্তির কাছে পরাস্ত হয়ে মানুষের মৃত্যুবরণের বহু বিভীষিকার কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত ছিল।

তবে সে-কাহিনী এই প্রবন্ধের বিষয় নয়। এখানে এইসব দুর্দান্ত 'অরনা' ও তাদের বংশধরদের 'চারণ ও সহচর' এই অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের যারা 'মইষাল' নামে খ্যাত—তাদের জীবনচিত্র এবং তাদের ঘিরে কিছু ছড়িয়ে থাকা লোকগীতিগুলিই এর বিষয়বস্তু। এই মইষালদের অসীম সাহস, শারীরিক শক্তি, বেপরোয়া চরিত্র—পুরুষের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করত, তাদের দেহ-সৌষ্ঠব, সাজসজ্জা এবং শিল্পীসুলভ রোম্যান্টিক চরিত্র—নারীকে ঘরছাড়া করত। তারা একদিকে তাদের প্রাণপ্রিয় 'অরনা'দের জন্য বাঘের সঙ্গে মোকাবিলা করতেও পিছপা হত না। আবার সেই অরনাদেরই বংশধররা মুহূর্তে যখন তাদের নিজেদের মধ্যে জোর মারামারি শুরু করে বাথানকে ভয়াবহ রণক্ষেত্রে পরিণত করত তখন তাদের মোকাবিলায় একমাত্র মইষালরাই এগিয়ে আসার সাহস রাখত। এই মইষালই আবার তাদের প্রিয়া-প্রিয়তমা নিজনারী পরনারীদের জীবনে বিপ্লব টেনে আনত। সেকালের শিল্পী-কবিরাই তাঁদের ভাষায়, তাঁদেরই সুরে তার সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন।

এই বেপরোয়া 'বাউদিয়া'[১] চরিত্রের নায়কদের দেখা যেত—রুদ্রের তাণ্ডবে তাদের আকর্ষণ, মৃত্যুর হাত ধরে চলাতে তাদের আনন্দ, স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের

১. 'বাউদিয়া'—বাউণ্ডুলে

বিতৃষ্ণা। তারা ঘর বাঁধত, ঘর তাদের বাঁধতে পারত না। তখন কবিদের ভাষাতেই তাদের ঘরের রমণীরা নায়কের যৌবনকে ধিক্কৃত করে বলত—

'ধিকো ধিকো ধিকো মৈষাল রে, মৈষাল ধিকো গাবুরালী।'

১. ধিকো ধিকো ধিকো মইষাল্ রে—
মইষাল্ ধিকো গাবুরালী[১]।
এ হেমা সুন্দর কন্যাক্ ক্যাম্‌নে যাইবেন্ ছারি মইষাল্ ও॥
তখনে না কইচোং[২] মইষাল্ রে, মইষাল্ না-যান্ চরুয়া-পাড়া,[৩]
চরুয়া-পাড়ার্ চেংড়ীগুলা[৪] জানে গুয়া-পড়া,[৫] মইষাল্ ও॥
ভার্ বান্দেন্ ভারাটি বান্দেন্ রে, মইষাল্ বান্দো মাতার্ ক্যাশ,
আজি কা না ছাখোং মইষাল্, ছাইর্‌বেন আমার ছাশ মইষাল্ ও॥
তোমরা যাইবেন মইষ্ বাতানে রে, মইষাল আমার পোড়ে হিয়া।
এই সোনার যৈবন কি রাখিম্ কাপড়ে বান্দিয়া, মইষাল ও॥

কিংবা আতঙ্কিত চিত্তের করুণ আবেদন—

২. বাতানে না যান মইষাল্ রে।
ও মইষাল্ বাঙো[৬]রে হাসিবে রে—
ও মইষাল্ কাচো[৭]রে হাসিবে রে—
বাতানে না যান্ মইষাল্ রে॥
ষোল শ মইষেরো-বাতান্, এ্যাকেলা মইষালো রে।
না-যানো না-যানো মইষাল্ মইষের বাতানে রে॥
তোরে কারণে মইষাল্, ভাত রান্দিয়া থুইচোং রে।
তোরে কারণে মইষাল্, বিছিনা পারিয়া থুইচোং রে॥
মইষাল্ আসিবে বুলিয়া দুয়োরে নাই ছাওং ঠ্যাঙা[৮] রে।
ঘুরিয়া আইসোং ঐ বুলিয়া, মইষাল গেইল্ মোর কুত্তি[৯] রে॥

---

১. 'গাবুরালী'—যৌবনে (কাব্যে)।
২. 'কইচোং'—বলেছি।
৩. 'চরুয়াপাড়া'—চরঅঞ্চলের পাড়া।
৪. 'চেংড়ীগুলা'—অল্পবয়সী মেয়েগুলো।
৫. 'গুয়া-পড়া'—গুয়া (সুপারী) মন্ত্রপূত (বশীকরণের উদ্দেশে)।
৬. 'বাঙোর' —বুনোমোষের বংশধর।
৭. 'কাচোর'—সংকর জাতীয় মোষ।
৮. 'ঠ্যাঙা'—আগল।
৯. 'কুত্তি'—কোথায়।

এ্যালায়[১] না দেখিনু মইষালক্ গিদ্দা[২] হ্যালানী দিয়া রে।
কাঁও বুজি মারিলেক মইষালক্ বিষের নাড়ু খোয়্যা[৩] রে ॥
ও মনষাল্ এ্যালাও[৪] ঘুরিয়া আয় রে—
ঐ বাতানে না যান্ মইষাল্ রে ॥

আবার পর-রমণীদের রুদ্ধ দরজাগুলো দমকা হাওয়ায় খুলে গিয়ে তাদের ঘর ছেড়ে উড়ে যাওয়া, বেরিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কার কথাও বলতে ভোলেন নি—

৩. ভাদ্দোরো আশিনে রে মইষাল্ নদীত্ পড়ে কুল্,—
মইষের পিটিত্ চড়িয়া রে মইশাল তোলেন কাশিয়ার ফুল।
মইষ চরান্ মইষালো বন্ধু ঘাটের উজান পারে,—
মইষের ঘান্টির বাইজে মন মোর উরাওং বাইরাওং[৫] করে।
মইষ ধরিয়া[৬] যান্ রে মইষাল, উরায় রে বাব্‌রী চুল,—
তোর পীরিতে পরিয়া মইষাল ভাঙিল রে জাতি কুল।
মইষো চরান্ দোতোরা বাজান্ কাচারে বসিয়া,
মুঞি নারী যাওং জলের ঘাটে কলসী ধরিয়া।
তুই তো পরেরো রে মইষাল, মুঞিও পরার নারী,
কোন দিন বা ছাড়িয়া যাইবেন হমো[৭] ছারাছাড়ি ॥
ছাড়িয়া না যান মোর মইষাল বন্ধুরে ॥

৪. বক্‌না-ভৈষের[৮] দুধ ধরি রে,
কি ও মইষাল যান রে আমার বাড়ী,—
তোর মইষালের চাপদাড়ি, মুঞিও চিটুল-রাড়ী[৯] মইষাল্ রে ॥

১. 'এ্যালায়'—এখুনি।
২. 'গিদ্দা'—তাকিয়া, মোটা বালিশ।
৩. 'খোয়্যা'—খাইয়ে।
৪. 'এ্যালাও'—এখনও।
৫. 'উরাওং-বাইরাওং'—উড়ে যাব-বেরিয়ে যাবো।
৬. 'ধরিয়া'—নিয়ে।
৭. 'হমো'—হব।
৮. 'বক্‌না-ভৈষের দুধ'—বাচ্চা বড় হলে যে দুধ গাঢ় হয়
৯. 'চিটুল-রাড়ী'—বাল্য বিধবা।

তোর মইষালের হাতে নাটি[১],
তুই মইষাল মোর গালার-কাটি।[২]
আমার বাড়ীত যান মইষাল্ রে,—
কি ও মইষাল বইসেতে দেমো ওরে মোড়া,—
খাইতে দেমো পান গুপারি বাজাইবেন দোতোরা মইষাল্ রে ॥
তোর মইষালের হাতে বাঁশী,
মোর নারীর মন হয়রে খুশী।
হাতের ভুকা[৩] চিকন চিরা রে—
কি ও মইষাল ঘরের তৈয়ারি খৈ,—
নয়্যা[৪] গাছের মাল ভোগ-কলা, তোমার মৈষের দই মইষাল্ রে ॥

জীবনচিত্র : বাড়িতে

দেখা যায় কেবল 'মইষাল'কে ঘিরে নারীমনের অনুভূতির অংশগুলিকেই লোককবিগণ চিত্রিত করে গিয়েছেন যা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে সমবেদনা জাগায়। কিন্তু মইষালের চরিত্র—তার উদ্দাম, বিশৃঙ্খল জীবন বস্তার মনোরাজ্যের খবর কোথাও পরিবেশিত হতে দেখা যায় নি। তার বৈপ্লবিক চরিত্রের ভিতর আছে অন্তরের সুকোমল প্রবৃত্তিগুলো কেবল সে পাষাণের স্তূপ নয়, সেখানেও ঝড় ওঠে। সেখানেও তুষার গলে স্নিগ্ধধারা প্রবাহিত হয়, সে পরিচয় কোথাও নেই। তাঁদের সুখদুঃখ জীবনযাত্রার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সুযোগে তারই ছিন্ন অংশগুলি নিয়েই এই জীবনচিত্র।

শীতকালে ব্রহ্মপুত্রে বাল্যকাল থেকে নৌকোয় ঘোরা এবং ওখানকার চরের ঘোষবাগানে যাওয়া ও থাকার এককালে সুযোগ ছিল। সে এক অপূর্ব আনন্দ-স্মৃতি। আর সেই বাথানের সঙ্গে সংযুক্ত একটি মইষাল পরিবার আমাদের প্রতিবেশীরূপে বাস করত। ঘনিষ্ঠতার সুযোগে তাদের জীবন-যাত্রার যে পরিচয় মেলে সেও তেমনি রোমাঞ্চকর কাহিনী ও কথার মালা।

১. 'নাটি'—লাঠি।
২. 'গালার-কাটি'—গলার পুঁতির মালা।
৩. 'হাতের-ভুকা'—হাতে কোটা (উদুখলে কোটা)।
৪. 'নয়্যা'—নতুন।

সেই প্রতিবেশী মইষালের পোষাকি নাম "নরনাথ রায়," পরিচিতজনের 'নরো-মইষাল' আর আমাদের 'নরো-দা'। তার বাড়িটা আমাদের খুব কাছেই, সামনের রাস্তায় দাঁড়ালেই নজরে আসে। আমার পূর্বস্মৃতিতে তার দৈহিক রূপটা দীর্ঘ, গাঢ়, বাদামি রং-এর 'তেল-ধোয়া' দেহের উপর কালো 'বাবরি-ছাঁটা' চুল।' তার মাঝে দু-একটি সাদা সাদা রেখা। ছেলেবেলায় তার কাছে গল্প শোনা আমাদের একটা খুব লোভনীয় ব্যাপার ছিল। নাবালিকা থেকে সাবালিকা হয়েও সেই লোভটাকে ছাড়তে পারিনি। নাবালিকা থাকাকালীন—বাথানের ভীতিপ্রদ ঘটনাগুলো কিংবা 'এক আছিলো রাজা' বা 'এক আছিলো জোলা' ইত্যাদির দিকেই আকর্ষণ অধিক ছিল। সাবালিকা হওয়ার পরে তাদের 'জীবন' সম্বন্ধে ঔৎসুক্য অগ্রাধিকার নিল—লোকসঙ্গীতে 'মইষাল' চরিত্রের বিশিষ্ট ভূমিকায় আকৃষ্ট হয়ে। এমনকি পরবর্তীকালেও বাতান থেকে ঘরে আসা চাকচিক্যহীন শীর্ণ অবিন্যস্ত চুলের মাথাটি রাস্তায় নজরে পড়লে, নরোদাকে ধরে এনে গল্প জুড়ে দিতাম। আর তার বৌ 'সন্তরা' কাজে কর্মে বা বেড়াতে আসলে ফাঁকে-ফাঁকে তার সুখ দুঃখের ছোটোখাটো কথা, যেগুলো আমার স্বল্পজ্ঞানের ভাণ্ডারে খোরাক জোগাত—সে-সময়ে তাদেরই 'ঘরোয়া ভাষায়' সেগুলো টোকা ছিল। সেগুলোরই বাংলা অনুবাদ এই জীবনচিত্রে সংযোজিত হয়েছে।

সেই নরোদা একদিন বিকেলে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে হন-হন করে এসে আমাদের বাড়িতে উপস্থিত। খুব গম্ভীর মুখ। কি হয়েছে প্রশ্ন করায় বললেন 'কাইল্ সাক্কালে উঠিয়াই বাতান যাইম্' (কাল সকালে উঠেই আমি বাথানে যাব)।

'মাও, মোক রাইতত্ একমুঠা খাবার দিস্। রাতিটা এইটিই কোনোটে পড়ি থাকিম্' (মাও, আমাকে রাতে একমুঠো খাবার দিস। রাতটা এখানেই কোথাও পড়ে থাকব)।

ঠাণ্ডা হলে উত্তেজনার কারণ জিজ্ঞাসা করি। তখন শান্তস্বরে বলেন 'মাও, তুই ক—মোর্ একটা দায় দায়িত্ব আছে না নাই! আজিই ভোর রাইতে স্বপনে দ্যাখোং। ভৈষগুলা অনাথ হয়্যা কান্দি কান্দি ঘুরির্ ধইর্‌চে। লোকজন কাঁও নেই। পাগ্‌লীটা (বৌ) কিছু বুজির্ চায় না। কয় কি, বয়স হইচে চাকরি ছাড়্। কও তো তাক্ ক্যামনে বুজাওয়া যায়?' (মাও, তুই বল, আমার একটা দায়িত্ব আছে কি নেই! আজই ভোর রাত্তিরে স্বপ্নে

দেখলাম, মোষগুলো অনাথ হয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকজন কেউ নেই। পাগলীটা কিছু বুঝতে চায় না। বলে, বয়স হচ্ছে চাকরি ছাড়। বলতো ওকে কেমন করে বোঝান যায়!)

বল ওকে কেমন করে বোঝাই! এটা যে আমার রক্তে আছে রে রক্তে। তিনপুরুষের মইষালের চাকরি। আমার 'বুড়া বাবা' (ঠাকুরদা) নিজ হাতে 'অরনা মোষ' ধরে তিন তিনটা বাথান 'সিরজন্' (সৃজন) করেছে, তাকে সাজিয়েছে। মরণকালে কর্তা বাবার হাত ধরে—তার ছেলে, আমার বাবার জন্য সেই তিনটা বাথানের 'দফাদারী'র কবুল নিয়ে তবে চোখ বুঁজছে। তার পরে—তারপরে আমার বাবা ওই যে তিনপুরুষের 'চক্‌চকা' লাঠিটা দেখা যাচ্ছে ওটা আমার হাতে তুলে দিয়ে মরার আগে বলেছিল—'দেখ, নন্দো, এই লাঠির মান কি তুই রাখতে পারবি?' বলে—আমার দিকে যে ভাবে তাকিয়ে ছিল, সেটা যে এখনও আমার বুকে গাঁথা। জানিস মাও, আমার বড়ভাই তখন চাংড়া, মৈষালী করে। মোষ চরাতে গিয়ে বাঘের হাতে জীবন দিয়েছে। আমার বাবা এই লাঠির চোটে বাঘের মুখ থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে এনেছিল। কর্তাবাবা খবর পেয়ে গিয়ে ওই বাঘ মারে। কিন্তু বাঘে ছুঁলেই 'কাল-বিষ' ধরে, সাপের বিষের মতো। ছেলেকে রাখতে পারেনি, মনটা ভেঙে গেছে, 'খুড়ার' হাতে দাফাদারী ছিল কিন্তু বাবা ঘুরে বাড়ি আসেনি। মোষের মায়া —মাও, মোষের মায়া। সেই লাঠি আমার বাবা আমার হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছে। 'এই সেই লাঠি।' একটি হাত চারেক লম্বা তেল খেয়ে পাকা কালো রংএর ওপর মাঝে মাঝে পেতলের পট্টি। আগাটাও পেতলে কারুকার্য করে বাঁধানো—কেবল গোড়াটাই মনে হল লোহা দিয়ে মোড়া। দেয়ালে দাঁড় করিয়ে রাখা সেই লাঠিটির দিকে তাকিয়ে মইষাল কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। একটু পরে আবার বলতে শুরু করে—'আর 'অরনা' ধরার কাহিনী—বাবা যখন বাথানে সন্ধ্যাবেলা আগুনের ধুনির পাশে বসে বলতে শুরু করত, সারা বাথানের লোক তো বটেই আশেপাশের গাঁয়ের লোক এসে ঘিরে বসে সেই কাহিনী শুনত।

তারপর আপনমনে বলে চলে—'পাগলীটা বোঝে না রে বোঝে না। সেই ছবিগুলো যে আমার চোখে ভেসে বেড়ায় সেটা ও বোঝে না।' মইষালের চিন্তা অতীতের চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়।

পরদিন সকালে উঠেই একমুঠো খেয়ে বেরিয়ে যায় মইষাল। তার কিছু পরেই রাতজাগা ক্লান্তি নিয়ে মইষাল-বৌ 'সন্তরা' বারান্দায় মাটিতে এসে বসে

পড়ে। মুখে কথা নেই। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই—'দিদি, আর আমি পারিনা' বলে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সান্ত্বনার কথা যোগায় না, হাত ধরে বলি—ওঠ, যা একটু চা খেয়ে আয়। একটি মেয়ে এসে ওকে টেনে নিয়ে যায় রান্না ঘরে। খানিকক্ষণ পরে কিছুটা শান্ত হয়ে ফিরে আসে। ঘরে ডেকে নিয়ে যাই। তখন যেন বাঁধ ভেঙে যায়—'দিদি আর কত সহ্য করব! কোন 'চ্যাংরা' বয়সে বিয়ে হয়েছে—ওর মাকেই মা বলে জানতাম। সোয়ামীর ঘর করা কাকে বলে জানলাম না। 'পরবাসী-অতিথের' মত আইসে। পুরো একটা মাসও 'থিতি' (স্থিতি) হয়ে কখনও থাকেনি।—ঝগড়া করেছি, ধিক্কার দিয়েছি—চিৎকার করে বলেছি তোর সরম নেই বিয়ে করেছিস কেন! মোষের দরদী! মানুষের জন্য দরদ নেই? থাকবে তোর বুড়ো মা বাড়ি আগলে আমার দু-চোখ যেদিকে যায় আমি সেইদিকে চলে যাব।—ডোমের ভাত খাব, ডোমের সঙ্গে 'নিকা'য় বসব। এই যুবান বয়সটা কি আকাশের তারা আর নদীর ঢেউ গনি (গুনে) কাটাবার জন্য!'

সেদিন আমার দিক থেকে তার কথার না ছিল জবাব, না ছিল কোনো সান্ত্বনার ভাষা। তাই মনে হল তার চাপা বুকের বোঝা পথ পেয়ে যেন কিছুটা হাল্কা হল। শান্তস্বরে বলল—'দিদি, গোসা হইস না। মোর মান্ষীর 'কায়া'টায় আছে—মানষীটা নাই। (আমার মানুষের 'কায়া টাই আছে—মানুষটা নেই)। আমি নিঃশব্দেই তার মাথায় হাত রাখি। সন্তরা তখন কাষ্ঠ হাসি হেসে বলে 'জানিস দিদি, শাশুড়ী আমাকে বোঝায়—বলে 'মাত্তরে—'ঝোরা'র জলই মাটির বুকটা ঠাণ্ডা রাখে, নরম রাখে। যদি ঝোরার 'গোর-ভাণ্ডা'র-এর (উৎস মুখের) জলের যোগান বন্ধ হয়—সেই নরম মাটির বুকও ধীরে ধীরে 'পষাণে'র (পাষাণের) রূপ ধরে। এই মইষালের ঘর করলে, মনটাকে পাষাণ করতে হয়। আর সেই পাষাণের ভার বুকে বয়ে বেড়ানটাই বিধাতার 'নেখন্'। মা আমিও তো মইষালের 'ঘর্নী'। আমি বুঝি তোর জ্বালা।' একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্তরা উঠে দাঁড়ায়। বলে—'হয় দিদি, বুড়িটার মুখ দেখলে বুকটা ফেটে যায়। বুড়িটা মরলেই বাঁচি—শান্তি তো পাবে।

বিদায় নিয়ে চলে যায় সন্তরা। ছড়িয়ে রেখে যায় মইষাল ঘরণীদের জীবন চিত্র।

জীবনচিত্র ঃ বাথানে

সেই পূর্ব পরিচিত মোষের বাথান। প্রত্যুষ কাল। শীতের কুয়াশার হাল্কা পর্দা ভেদ করে দেখা যায় সেই রাতের শৃঙ্খলাকে ভঙ্গ করে মোষের দল

এদিক ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কামলারা বাচ্চাদের পরিচর্যা, মোষ দোয়ান ইত্যাদি নানা কাজে ব্যস্ত। দফাদার বেরিয়ে এসে আগুনের ধুনিটির পাশে—একটি ছোট মোড়ায় বসল। একজন কামলা একটি হুঁকো সাজিয়ে তার হাতে তুলে দেয়। বৃদ্ধ দাফাদার তামাক খেতে খেতে তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় কাজের নির্দেশ দেন।

বাথান-পত্তন দিবসে অপরিচিত বাথানের প্রাণপুরুষ মইষালকে দেখা যায়—ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দফাদারের পায়ের ধুলো নিয়ে দাঁড়াতে। কুশলবার্তা বিনিময়ের পর মোষগুলোকে বিভিন্ন নামে সম্ভাষণ এবং কারও পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে এগিয়ে যায় মোষের দলটির মাঝখানে। দুর্দম দুধর্য 'অরণা'র বংশধররা মেষশাবকের মতো তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকে।

তাদের চরাবার সময় এগিয়ে আসে। এবারে মইষাল তার নয়হাত মোটা ধুতিটিকে কেবল হাঁটুর উপর পর্যন্ত নামায়—একটি রঙিন গামছার সাহায্যে তাকে কোমরের সঙ্গে অাঁট করে বেঁধে নেয়। তেল চুকচুকে বাবরি চুলটাকে সংযত রাখার জন্য একটি ফুলকারি বা সৌখিন গামছা পাট করে মাথায় বেঁধে একপাশে বাকি অংশটা ঝুলিয়ে দেয়। আবার কারোও পুঁতির মালা কিংবা সৌখিন তাবিজও ঝুলতে দেখা যায়। গায়ে থাকে একটা ফতুয়া বা গেঞ্জি। বেশি শীতে তার উপর একটা মোটা চাদর—পোষাকে ঐশ্বর্যের মহিমা না থাকলেও শিল্পীমনের সৌখিনতার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন আহার-পর্ব শেষ করে দ্বিপ্রহরের 'জলপানে'র মুড়ি-চিঁড়ের পুঁটলিটি বেঁধে নেয়। কোমরে গুঁজে বা বেঁধে নেয় একটা দা বা ভোজালি। বন-ভ্রমণের বিশেষ আবশ্যকীয় বস্তুটিকে। তারপর হাঁক দিয়ে মোষদের জঙ্গলে যাওয়ার সঙ্কেত দেয়। কর্মীরা ছড়ানো মোষগুলোকে জঙ্গলমুখে তাড়াতে থাকে। ইতিমধ্যে সেই তেল-পাকান চকচকে লাঠিটি আর হয়তো তার 'সাধের দোতরা' কিংবা বাঁশিটিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসে মইষাল। এবারে হাঁকাহাঁকি করে নিজেই মোষদের পিছু নেয়। মোষগুলো দলবদ্ধ হয়ে জঙ্গলে ঢোকে গোপন শত্রুকে সাবধান করে দিয়ে। কারণ একলা পেলে সুযোগ সন্ধানী শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা অবাস্তব নয়। যার বহু কাহিনী তাদের রক্ষক সেই মইষালদের দুঃসাহসিক কার্যকলাপ ও মৃত্যুকে নিয়ে জড়িয়ে আছে। কিন্তু দলবদ্ধ মোষদের দেখলে শক্তিমান বাঘেরাও নিজের শক্তির উপর আস্থা রাখতে সাহসী হয় না।

মৈষাল হাঁকডাক ও তদারকি পর্ব শেষে—তার পোষ্যদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলে—তাদের ছাড়পত্রের ইঙ্গিত দেয়। পোষ্যবর্গও নিশ্চিন্ত মনে ছড়িয়ে পড়ে তাদের সারাদিনের আহার্য সুস্বাদু তৃণ-গুল্মের সন্ধানে।

তখন মৈষাল তাদের কাছাকাছি একটা খোলা জায়গা বেছে নেয়, ঝোলাঝুলিগুলোকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে শীতের মিঠে রোদে কখনও দোত্‌রা কখনও বাঁশি নিয়ে বসে। দোত্‌রার সঙ্গে কখনও কণ্ঠস্বরও মিলিত হয়। নিকটের গ্রামের বালক যুবক দু-চারটি এসে জুটে যায়। আবার জঙ্গলের পার্শ্ববর্তী মাঠে—মেয়েরা কৃষিকর্মরত স্বামী, ভাইদের খাবার দিতে গিয়ে কিংবা নদীর জল ভরতে এসে, দু-চারদণ্ড দাঁড়িয়ে পড়ে। এইভাবে ধীরে ধীরে অপরিচিত জনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। পরিচয় কখনও বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আবার এই বন্ধুত্বই কখনও অন্তঃসলিলা শুষ্ক মরুতে প্লাবন এনে দুইকূলকে প্লাবিত করে যায়। গ্রামের কবি শিল্পীরা তারই চিত্রগুলি কথায় এঁকে গানের সুরে ছড়িয়ে রেখে গিয়েছেন।

সেই সুরের রেশ হয়তো কখনো মইষালের দোত্‌রার তারে ঝঙ্কার তোলে। আর তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে মইষালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

৫. 'ও মোক ছারিয়া না যাইস্‌রে—
কন্যা বুকে শ্যাল দিয়া।
হাটিয়া যাইতে কমোর ঢোলে আহারে কাঙ্কিনী গাছ রে গুয়ার।

কিংবা এই কাংকিনী গাছের মতো দেহখানিকে যে দোলায়িত করে চলে যায়—সেই কন্যা দৈনন্দিন বিবিধ কাজের মাঝে যে বিঘ্ন ঘটায়, তাকে উদ্দেশ্য করে গুণগুণ সুরে বলে—

'কোন বনে কান্দে মোর কুকিলা রে—
কুকিলা কান্দে বালুচরে।
৬. কোন বনে কান্দে মোর কুকিলা[১] রে—
কুকিলা কান্দে[২] বালুচরে।
প্রাণ কুকিলা রে—একবার আসিয়া, একবার দেখা দিয়া
তোর বাদে[৩] মনটা মোর, থাকেরে কান্দিয়া ॥

১. 'কুকিলা'—কোকিল (কাব্যে) ॥
২. 'কান্দে'—ডাকে ॥
৩. 'বাদে'—জন্য ॥

যখন কুকিলা মুঞি আগিনা সামটোং[৪]।
তখন কুকিলা তোর কান্দোন্ শোনং।
হাতের বারুণ[৫] মাটিত থুইয়া বসিয়ায় ভাবোং॥
যখন কুকিলা মুঞি ভাত রান্দোং,
তেরে কুকিলায় মুঞি কান্দোন্ শোনং,
চউকার আগুন নিবি[৬] থুইয়া বসিয়ায় শোনং॥
যখন কুকিলা মুঞি খড়ি কাটোং[৭],
তোর কুকিলার মুঞি কান্দোন শোনং।
হাতের কুড়াল ডালত্ থুইয়া বসিয়ায় কান্দোং॥
যখন যাওং আই মুঞি বাইয়া-গাঙে।
তখন কুকিলা মোর গান টানে[৮]।
কাণ্ডের কলোস ভূমিত্ থুইয়া বসিয়ায় থাকোং॥

ছোট্ট দিন দৌড়ে চলে, শীতের রবি দিনান্তে ধরণীর কোল ঘেঁসে দাঁড়ায়। —তখন বাথান থেকে সেই 'জোড়-ধাম্সা' বনাঞ্চলকে কাঁপিয়ে বাথান ফেরার সংকেত ধ্বনি তোলে। আবার তখন মইষালের হাঁকের সঙ্গে শুরু হয়— ঢং ঢং ঢং ঢং। জঙ্গল ভেদ করে 'ধাম্সা'র শব্দ লক্ষ্য করে বাথান মুখে নেমে আসে 'মইষে'র দল। বর্বশেষ মোষটিকে গুনে সর্বশেষে দেখা দেয় মইষাল, তার সারাদিনের কর্মধারার শেষ কর্তব্যটি শেষ করে। 'কামলা'রা তাদের বরণ করে নিতে এগিয়ে আসে। তারপর তাদের নিত্যকর্মের পুনরাবৃত্তি শেষে, আগুনের ধারে জমাট হয়ে বসে, গান গল্পের আসর জমায়।

বাথানবাসীদের এই দৈনন্দিন কর্মজীবনে বৈচিত্র্য দেখা যায় যখন সেই অঞ্চলে মোষদের ঘাসের অভাব ঘটে বা বাথান অপরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। তখন সেই বাঁধা সংসার ভেঙে নিয়ে আবার নতুন চরে নতুন সংসার পাতার কালে। আর লৌকিক পূজায় এবং বাথান-পূজার বিশেষ উৎসব-কালে। এই উৎসবটি বাদ্যভাণ্ড নাচ, গান ও বিবিধ আচার অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে জাঁকজমকে

৪. 'সামটোং'—ঝাট দেই
৫. 'বারুণ'—ঝাড়ু
৬. 'নিবি থুইয়া—নিবিয়ে রেখে
৭. 'খড়ি কাটোং'—জঙ্গলে কাঠকাটি
৮. 'গান টানে'—গান ধরে

পালিত হয়। সে সময় আশেপাশের গ্রামের বহু লোকজন এসে উৎসবে যোগদান করে—তাদের ভিন্ন রাজ্যে নিয়ে যায়।

বর্ষার পূর্ব পর্যন্ত চলে এই ব্যবস্থা। তারপর বর্ষার আগমনে 'ঢল' নামে। চরগুলোকে আবার 'গাঙের পানি' বুকে টেনে নিতে শুরু করে। বাথানবাসীরা সেই সঙ্কেতের অর্থ বোঝে। তখন বাড়ির কথা মনে পড়ে।

৭. বাতান্ বাতান্ করেন্ মইষাল্ ও—
কি ও মইষাল্ বাতান্ কইর্‌চেন্[১] বাড়ি,
যুবা নারী ঘরে থুইয়া
কে করে চাকিরী মইষাল্ রে ॥
উজানে কইর্‌লে ম্যাঘ-ম্যাঘালি রে
কি ও মইষাল্ দক্ষিণ্ খাইলেক্[২] বানে,
এ্যামোন্ ধনীর চাকুরি করেন্,
বিদায় না ছ্যায় ক্যানে মইষাল্ ও ॥
বাতান্ ছ্যাখোং আউলা ঝাউলা[৩] রে
কি ও মইষাল বাতাম্ ভরা গোবর
খান্ দান্ বাতানে থাকেন্
বাড়ির নাই তোর খবর্ মইষাল্ ও ॥
অকারি[৪] চাউলের ভাত রে—
কি ও মইষাল্ বক্‌না-ভৈষের[৫] দুধ।
তুই মইষাল্ বাতানে থাকিস্
আমার পোড়ে বুক মইষাল্ ও ॥
খরালির[৬] ছয়মাস রইলেন্ মইষাল্ রে—
কি ও মইষাল্ মইষের বাতানে
বাইশ্যার[৭] ছয়মাস্ থাকিয়া যাম্।
বাড়িতে আসিয়া মইষাল্ ও ॥

১. 'কইরচেন্'—করেছ
২. 'খাইলেক্ বানে'—বানে খেয়ে নিল
৩. 'আউলাঝাউলা'—এলোমেলো
৪. 'অকারী'—আঁকাড়া
৫. 'বক্‌না ভৈষের দুধ'—বাচ্চা একটু বড় হলে সেই গাঢ় দুধ
৬. 'খরালি'—খরা
৭. 'বাইশ্যা'—বর্ষা

ছোটকালে হইচে বিয়াও রে—
কি ও মইষাল্ বয়স ভাটি গ্যালো,
না হইলোং ছাওয়ার মাও
মনে দুখ্ মোর রইল মইষাল্ রে ॥
দুধো খাইলেন্ দইও খাইলেম্ রে
কি ও মইষাল্ আরো খাইলেন্ মাটা,
ছয়মাস থাকি যাও মইষাল্
কোলাত্ বাজুক[৮] ব্যাটা মইষাল্ ও ॥
বাতান্ ছারেক্ বাতান্ ছারেক্ রে—
কি ও মইষাল্ ঘুরিয়া আইসেক্ বাড়ি,
গলার হার ব্যাচেয়া দিম্ মুক্তি।
ঐ চাকিরির কড়ি মইষাল্ ও ॥

তারা তাদের গড়ে তোলা সংসারটিকে গুটিয়ে নেয়। আবার সেই 'ঢং-ঢং'—ফিরে চলে তারা বেনোজলের নাগালের উর্ধ্বে উচ্চভূমির অভিমুখে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে। নব-পরিচিত বন্ধুবান্ধবের অশ্রু সজল চোখ তাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানায়।

তাদের মধ্যে যে জন আবার বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে—তার জন্য বেদনাকাতর মনে পথ চলতে চলতে হয়তো মইষালের নিজগৃহের কোনো পাষাণ-প্রতিমার চিত্র বা প্রতীক্ষারত দুটি বিষন্ন জলভরা চোখও মনে পড়ে যায়। সেই সঙ্গে ঐ বিশেষ গানের পদগুলিও হয়ত তার 'কণ্ঠ' প্রস্তুতি না নিয়েই গেয়ে ওঠে—

'বাতান বাতান করেন মইষাল রে—
কি ও মইষাল বাতান্ কইরচেন বাড়ি,
যুবা নারী ঘরে থুইয়া—কে করে চাকিরি মইষাল ও ।

সংযোজন ঃ বাহে গানের বাঙলা অনুবাদ

১. ধিক ধিক—ধিক মইষাল,
তোমার যৌবনকে ধিক। এমন
সুন্দর কন্যাকে কেমনে তুমি
ছেড়ে চলে যাবে !!—তখনি না

---

৮. 'কোলাত্-বাজুক্ ব্যাটা'—কোলেতে সংলগ্ন হোক্ পুত্র।

আমি বলেছি :

মইষাল তুমি 'চক্মা-পাড়ায়' যেও না।

চক্মা-পাড়ার ছুঁড়িগুলো (মন্ত্রপুত বশকরা)

গুয়া-পড়া জানে ।।

তুমি 'ভারভারাটি' বাঁধছ,

তোমার মাথার কেশও বাঁধতে শুরু

করেছ,—আমি দেখছি মইষাল

আমার দেশ তুমি ছাড়বেই ।।

তুমি যাবে মোষ বাথানে,

মইষাল আমার 'হিয়া' পুড়ে যাচ্ছে—

(আমার) এই 'সোনার যৈবন'—

তাকে কি আমি কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখবো !!

২. মইষাল রে—বাথানে (তুমি) যেও না ।।

তোমাকে 'বাঙোরে' হাসবে,

তোমাকে 'কাচোরে' হাসবে।

বাথানে তুমি যেও না ।।

ষোল শ মোষের বাথান।

সেখানে তুমি একলা—যেও না যেও না

মইষাল রে ।।

তোমার জন্যে ভাত রেন্ধে রেখেছি, বিছানা করে রেখেছি,

তুমি আসবে বলে দুয়ারে আগল দেই নি ।।

ঘুরে আসব বলে

মইষাল কোথায় গেল।

এখুনি তাকে দেখলাম গিদ্দা হেলানি দিয়ে থাকতে।

কেও বা বুঝি (ঈর্ষায়)

মইষালকে বিষের নাড়ু খাইয়ে মেরে ফেলল !!

ও মইষাল তুই এখনও ঘুরে আয়—

বাথানে তুমি যেও না ।।

৩. ভাদ্র, আশ্বিনে মইষাল নদীর কুল জাগে।

মোষের পিঠে চড়ে

তুমি কাশফুল তোল ।।

মোষ চরাও মইষাল বন্ধু ঘাটের
উজান দিকে—তোমার মোষের
'ঘান্টি'র বাজনায় মনটা আমার যে
উড়ে যেতে—বেরিয়ে যেতে চায় ॥

মোষ নিয়ে তুমি যাও যখন।
তোমার বাব্‌রির চুল উড়তে থাকে।
তোমার পীরিতে পড়ে যে জাতকুল সব
ভেঙে গেল।
মোষ চরাও, দোত্‌রা বাজাও নদীর উঁচু পাড়ে
বসে—আমি তখন ঘাটে আসি
কলসীটিকে নিয়ে। তুমিও তো
পরের, মইষাল, আমিও পরের নারী,
কোনদিন যে ছেড়ে যাবে
হব ছাড়াছাড়ি।
ও মইষাল বন্ধু আমাকে ছেড়ে যেও না ॥

৪. 'বক্‌না মোষের' দুধ নিয়ে মইষাল
তুমি আমার বাড়ি যেও রে।
তোমার মুখে চাপদাড়ি (তুমি সুন্দর),
আমি অল্পবয়সের বিধবা নারী।
তোমার হাতে (সুন্দর) লাঠি,
তুই আমার গলার (প্রিয়) পুঁতির মালা।

আমার বাড়িতে যেও মইষাল,
তোমাকে বসতে মোড়া দেব, পান সুপারি
খেতে দেব। তুমি (বসে) দোত্‌রা বাজাবে ॥

তোর হাতে বাঁশি (দেখে)
আমার মন খুসি হয়ে ওঠে।
আমার হাতে কোটা চিকন চিঁড়ে,
আর ঘরের তৈরি দৈ,
নতুন গাছের 'মালভোগ কলা', তোমারি মোষের
দই (তোমারি জন্ম রাখা আছে) ॥

৫. আমাকে ছেড়ে যেও না কন্যা
বুকে শেল দিয়ে। হেঁটে
যেতে তোমার কোমরটি দুলছে—
আহা, যেন একটি—
কাংকিনী গুয়ার গাছ।
(দীর্ঘ সুপুরি গাছ-যা অল্প হাওয়াতে দুলতে থাকে)।

৬. কোন বনে আমার কোকিল ডাকছে,
কোকিল ডাকছে বালুচরে॥
প্রাণ কুকিলরে, একবার এসে,
একবার দেখা দিয়ে (যাও)
তোর জন্য আমার মনটা কান্দতে থাকে॥
যখন কুকিল আমি উঠোন
ঝাঁট দেই তোমার কুকিলের
আমি ডাক শুনতে পাই—হাতের 'বারুণ'
মাটিতে রেখে বসে ভাবতে থাকি॥
যখন ভাত রাঁধি তোমার ডাক শুনে
উনুনের আগুন নিবিয়ে রেখে,
বসে শুনতে থাকি॥ যখন আমি
কাঠ কাটি (জঙ্গলে) তোমার ডাক শুনতে পাই।
হাতের কুড়ুল ডালেই
রেখে বসে কান্দতে থাকি॥
যখন 'আই মুক্রি' (মা আমি) বাইর্গাঙে
যাই, তখন আমার কুকিলা গান ধরে।
কাঁখের কলস ভূমিতে রেখে
আমি বসেই থাকি॥

৭. মইষাল্, (কেবল) বাথান বাথানই কর—
বাথানকেই বাড়ি করে,
নিয়েছ। যুবা নারী ঘরে রেখে
মইষাল কোনজন চাকরি করে॥
উজানে মেঘ জমছে, (সেই জল নেমে)
দক্ষিণটাবানে (সব) খেয়ে নিল,

এমন ধনীর চাকরি কর
সে কেন বিদায় দেয় না ॥
তোমার বাথান তো দেখছি এলোমেলো,
মোষ রাখার জায়গাও
গোবরে ভরা। খাওদাও বাথানে থাক,
বাড়ির তোমার খবর
নেই। আঁকাড়া চালের ভাত,
আর 'বক্‌না ভৈষের দুধ'ই (তো
তোমার খাদ্য)। তুমি বাথানে পড়ে থাক,
আমার বুকটা পুড়তে থাকে ॥
খরার ছয়মাস মৈষাল বাথানেই তো রইলে।
বর্ষার ছ-মাস
এসে বাড়িতে থেকে যাও ॥
সেই ছোটকালে বিয়ে হয়েছে—
এখন বয়স 'ভাটি'তে গেল।
এখনও ছেলের মা হলাম না।
মনে আমার দুঃখই রয়ে গেলো ॥
দুধ, দই, মাটা ইত্যাদি (পুষ্টিকর
দ্রব্যের ইঙ্গিত) খাচ্ছ।
মইষাল ছ-মাস তুমি থেকে যাও, কোলে
আমার সন্তান আসুক।
বাথান ছাড় বাথান ছাড় মইষাল
বাড়িতে ফিরে এসো
আমার গলার হার বেচে—আমি তোমার
চাকরির (অগ্রিম নেওয়া) কড়ি দিয়ে দেব ॥

বার্ধক্যের আত্মজ্ঞান

(ইয়েটস-এর অনুসরণে)

বিষ্ণু দে

মানুষের মন তো ? পন্থা নির্বাচন করতেই হবে—
জীবনেই শুদ্ধিতে সাধনা কিংবা নিজ কর্মে।
এবং যদি সে বাছে দ্বিতীয়কে, ক্ষেপে গিয়ে তবে
আঁধারে লাফাতে হবে,—ঠাঁই কোথা ইন্দ্রাণীর হর্ম্যে ?

যখন সবটা গল্প অন্ত পাবে, সংবাদটা তখন কি হবে ?
সৌভাগ্য বা বিপর্যয়ে শ্রমই শুধু ছাপ রাখে মর্মে :
সেই চির অনিশ্চিতি, সেই ট্যাঁক-খালির বঞ্চনা
অথবা দিনের দম্ভ শূন্য কুম্ভে, রাত্রির শোচনা ॥

স্বরের আত্মছবি

বিমলচন্দ্র ঘোষ

অন্ধকারকে চমকে দেওয়া গলার স্বর
ধ্বনিত আলোক বিচ্ছুরণে
আছড়ে পড়েছিল
চলন্তকালের অদৃশ্য দেয়ালে।

সেই প্রতিহত বিক্ষিপ্ত স্বর
সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে
লাল হলুদ খয়েরী বেগুনী রঙে আঁকা
একটা ছবি হয়ে গেল
মনসিজ শিল্পের আঙ্গিকে।

অন্ধকারের বুক কাঁপানো
সেই স্বরের ছবি,
শহরের চিত্র-প্রদর্শনীগুলোর দেয়ালে
টাঙিয়ে রাখা যায় না।

গলার মধ্যে থেকে নিঃশব্দ ঝঙ্কারে
বেরিয়ে আসা
সেই ছন্দিত ধ্বন্যালোক
মানুষের ইতিহাসের
সমস্ত নিভে যাওয়া শিখাকে
আত্মস্থ ক'রে নিয়ে এঁকেছিল
অন্ধকারের ঘুমভাঙানো ছবি।

যে সব মায়েরা শত যন্ত্রণায় কথা বলেনি
ছবিটার দিকে তারা অপলকে তাকিয়েছিল
জলভরা মেঘের মতো চোখ মেলে।

অন্ধকারকে চমকে দিয়ে
হৈমন্তী সকালের ধানগুলো যখন
সমদর্শিতায় রৌদ্রশীর্ষ হল,
নর্দমার পোকাগুলো
চোখ পিট পিট করতে করতে
মুখ লুকুলো পাঁকে,
হাঁটুভাঙা মৃত্যুরা হামা দিতে দিতে যখন

অসূর্য নামক সেই তমসাগর্ভে
আত্মগোপন করল,

ঠিক তখনি
সেই ধ্বনির আলোকতরঙ্গ
ছবিটার সর্বাঙ্গে সৃষ্টি করল
তার সার্থকতম রূপব্যঞ্জনা।

বিকেল বেলায়

অরুণ মিত্র

বিকেলবেলায় মেয়েরা ডোবার পাড়ে এলে তাদের
ছেঁড়া শাড়িতে রংবাহার গায়ে ছলছল আলো উনুনে
কাঠকুটো গোঁজার আগে জ্বলুনির আগে এই সময়টা
রোদ কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে হ'য়ে আদরের মতো আর শ্যাওলার
ভেতর থেকে জল ইশারা করলে নামো পায়ের পাতা
উরু কোমর বুক গলা ক্রমে জড়িয়ে জড়িয়ে অন্ধকার
আহা যদি এমন অন্ধকার এখন থেকে সন্ধ্যের ওপর
দিয়ে চালচুলো জুড়ে রাতভোর ছড়িয়ে যেত মেয়েরা
পাড় বেয়ে নামতে থাকে।

বিকেলবেলায় ঝাঁপ ঠেলে বেরিয়ে বাচ্চাদের
এপার ওপার দৌড়োদৌড়ি মাঠটায় আবিরের ছোপ
ধরলে ঘাসের ওপর থেকে লাফ দিয়ে লাফ দিয়ে
আকাশে উঠে লাল নীল হলদে সবুজ বেলুনে
উড়তে উড়তে উড়তে হঠাৎ খির আর ওড়া যায় না
নিচে টানছে ভাঙা টিনের চালা ক্ষুদকুঁড়ো ব্যস
নামো নামো ক্ষিদে পেয়েছে মা'রা এতক্ষণে
ডোবা থেকে ফিরেছে নামো।

ন্যাংটো ছেলে গল্প জানে না

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘর ফুটপাথ
আহার বাতাস,
ন্যাংটো ছেলেটা
দেখছে আকাশ।

সেখানে এখন
টেক্কা সাহেব
বিবি ও গোলাম,
রাজ্যের তাস

সবাই ব্যস্ত ;
সবাই করছে
চাঁদ সূর্য ও
তারাদের চাষ।

সবাই চাইছে
রাজত্ব আর
সবাই লিখছে
দারুণ গল্প !

সেই শুধু
ফুটপাথের ন্যাংটো
ছেলে, তাই তার
বুদ্ধি অল্প—

দূর থেকে তাই
দেখছে দৃশ্য ;
দেখছে এবং
দিচ্ছে সাবাস্!

২৪ জুলাই, ১৯৭৮

ওরা

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

কারোরই হয় না লজ্জা খেতে শুতে, গাড়ি চেপে যেতে
আলো পাখা বন্ধ হলে, তা নিয়ে করতে হৈ চৈ,
কলে জল না আসলে, জলে রাস্তা হলে থৈ থৈ,
বোবা হলে টেলিফোন...সকলেরই মাথা ওঠে তেতে।
কেউ কি কখনো ভাবো, দিনান্তে দুমুঠো ভাত পেতে
কত দুঃখ সয় ওরা, বাস করে ক্লেদক্লিন্ন ঐ
বস্তীতে, যেখানে আলো কিংবা হাওয়া নেই কখনোই
পোকার মতন ওরা ঝাড়েবংশে মরে ব্যারামেতে!

অথচ এ সভ্যতার মেঘস্পর্শী স্ফীত ইমারত
ওরাই রেখেছে খাড়া, শহর সড়ক সেতু ডক,
নগর বন্দর জেটী কারখানা রেখেছে সচল
ওরাই শরীর দিয়ে। নিরুপায় নারীর ইজ্জত
ওদের, নির্মম হাতে ভাঙিয়ে তোমরা প্রতারক,
শোনাও ধর্মের বুলি। ভাব কেউ বোঝে না এ ছল?

তিন বাঘের খেলা

মণীন্দ্র রায়

কথা বানানো কঠিন নয়।
প্রেমিক, পুলিশ আর দেউলেরা
অনেক শব্দের জন্ম দেয়
নিজের নিজের ছাপাখানায়।
লোকেরা তার বাজারদর জানে

আসল খবর থাকে
টকটকে তাতানো লোহার ওপর
হাতুড়ির সংলাপে ;

কিছু খবর থাকে
উঠোনের ডালিমতলায়
মিলিয়ে যাওয়া সেই রক্তের দাগে ;

কিছুটা আবার জানতে হয়
পাথুরে মাটির গাঁটালো বাঁকা পলাশের মতো
পোড় খাওয়া সব মানুষের দিকে তাকিয়ে।

সে হল সময়ের তিন গলির মুখে
তিন ক্যামেরা বসানোর কাজ।
সে হল তিন বাঘের খেলা।

সন্ধ্যার বিষন্ন গন্ধে

রাম বসু

সন্ধ্যার বিষন্ন গন্ধে শেষ হয়ে এল দিনের পরিক্রমা
কার নামের জয়ধ্বনি দিতে দিতে বাতাস গেল অন্ত দিগন্তে
সমস্ত চেষ্টার মূক ধ্বংসের কিনারে এখন আমি একা
নিয়তির পায়ের দাগগুলো প্রতিহিংসার মতো জ্বলছে
সমুদ্র শঙ্খের ভাঁজে ভাঁজে গতদিনের নিষ্ফল কাহিনী
আর মুখে ফেনার তিক্ততা, ভস্মের খার, ফণি-মনসার কাঁটা।

গাছের দিকে অপলক তাকিয়ে কখনো হই নি আত্মবিস্মিত গাছ
পৃথিবীর বুকের ওপর বুক পেতে দিয়ে শুনলাম আমারই হৃদ্স্পন্দন
নদীর অবিরল গতিতে দেহ ভাসিয়ে পেলাম না জলের আঁধার।

আজ ওরা সবাই আমাকে ফেলে রেখে চ'লে গেছে যা যার স্বদেশে
আমি কোথাও যাই নি, যাব না ; আমার স্বদেশ কোথায় ?

কে আমার কণ্ঠনলী চেপে ধরেছ, কে ?
কে কেড়ে ফেলেছ আমার গর্বিত কণ্ঠস্বর ?
ঘৃণা আর ভালোবাসার আবিলতার ও পারে হে আদি
তুমি কি আমারই প্রতিফলন, আমারই সৃষ্টি ?

নিয়তির পায়ের দাগগুলো প্রতিহিংসার মতো জ্বলছে।
হৃদয়ের বাদা ভ'রে গেছে ঝিঁ ঝিঁ আর সরীসৃপের গানে
গাছের ফোকরে কবেকার এক চিলতে জলে দোলে শালিকের চোখ
দ্রোণফুলে সমাচ্ছন্ন মাঠে শিশিরের অপার সুষমা, শৃঙ্খলা
কেবল অন্ধপাতাল থেকে অদৃশ্য কালনাগ আমাকে শতপাকে বাঁধছে।

আজ যদি আমি চিৎকার করি হব আর্তনাদ
সমগ্রতা ফিরে পেয়ে হব সৌরমণ্ডলের গ্রহ ?

মূক ধ্বংসের কিনারে কে আমার কণ্ঠ চেপে ধরেছে, কে ?

শিশু

মহাশ্বেতা দেবী

জায়গাটির নাম লোহ্রি এবং জায়গাটি রাঁচি-সরগুজা ও পালামৌ তিন জেলার সীমারেখার মিটিং পয়েন্টে অবস্থিত। অফিসিয়ালি রাঁচিতেই। কিন্তু সমস্ত জায়গাটি দগ্ধ প্রান্তর বিশেষ। যেন ভূগর্ভে ভীষণ তাপ এখানে। তাই গাছগুলি বামন-বামন, নদীর বুক শ্মশান, গ্রামগুলি অবধি ধূলিধূসর। মাটির রং খুব অদ্ভুত। লাল মাটির দেশেও এমন গাঢ়, বাদামী-লাল চোখে পড়ে না। রক্ত শুকোবার আগে এ রকম নিষ্প্রাণ লাল হয় বটে।

রিলিফ-অফিসারকে ব্রিফ করা হয়েছিল এখানে আসার আগে। এই অফিসার অত্যন্ত সৎ ও দরদী। অনেক বাছাই করে তবে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়। বলে দেওয়া হয়, জায়গাটি বহুৎ খচ্ড়া। অধিবাসীদের কোনো অনেস্ট ওয়ে অফ লিভিং নেই।

—কেন ?

—চাষ করে না।

—কেন ? জমি আছে ?

রিলিফ-অফিসার ও বি. ডি. ও., বাংলোয় বসে কথা বলছিলেন। বাইরেটা এখনো জুড়োয় নি। রাতে বাংলোর হাতার মধ্যে নেয়ারের খাট পেতে দেবে চৌকিদার। এত গরমে এখানে কেউ ঘরে ঘুমোয় না। রিলিফ-অফিসার মাত্র তিন মাসের জন্য এই কাজে বহাল হয়েছেন। খাদ্যবিভাগ তাঁকে ধার দিয়েছে। জীবনে তিনি এ হেন রোদেপোড়া, অখাদ্য জায়গা

দেখেন নি। ত্রাণ যারা নিতে আসে, সেইসব উলঙ্গপ্রায়, শীর্ণ, ক্রিমি ও প্লীহা ফোলা পেট মানুষজন দেখে তাঁর খুব বিশ্রি লেগেছে। তাঁর ধারণা ছিল, আদিবাসী পুরুষরা বাঁশি বাজায় ও আদিবাসী রমণীরা ফুল পরে নাচে। গান গেয়ে তারা পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছোটে।

নিজে জীপ রেখে নিচু বুরুর ওপরের গ্রামে উঠতে গিয়ে বুঝেছেন, ছুটে পাহাড়ে ওঠা সম্ভব নয়। বুকে হাঁপ লাগে। আদিবাসী জীবনে গানের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেই তিনি জানতেন। এখন শুনতে পাচ্ছেন ওদের গান। একটানা, বুড়ী ডাইনীর নিঃসঙ্গতার কান্নার মতো। খুবই নৈরাশ্যজনক অভিজ্ঞতা। রিলিফ অফিসার, ফিলিম, বিশেষ হিন্দী ফিলিম দেখে আদিবাসী জীবন সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা করেছিলেন। এই যদি ওদের গান হয়, তাহলে মড়াকান্না কাঁদে কি করে? এ গানই তো কান্নার মতো। অস্বস্তি! অস্বস্তি!

—ওরা গান গাইছে কেন?

—জংলী লোক। যা হয়, সব কিছু মনে করে অপদেবতার খেলা। গান গেয়ে ভুত তাড়াচ্ছে।

'ভুত' শব্দটিতে অস্বস্তি। বি. ডি. ও. দেখলেন ও হাসলেন। বললেন, ভয় পেলেন?

—না না।

—এই খরা আর আকালও ওদের কাছে অপদেবতার অভিশাপ।

—ও।

—খুব খারাপ জায়গা। ভালো জায়গায় হিন্দু লোক থাকে, মহাবীরজীর ধ্বজা উড়ে, এখানে কিছু নেই। আমি কবে যে বদলী হব!

—আমি কাল কোথায় যাচ্ছি?

—লোহ্‌রি। খুব খচড়াই জায়গা। বেটাদের জমি দিলেও মহাজনকে বেচে দেয়। আঁখ মোটা করে বলে, জল কই? বিছন কই? হাল কই? ভঁইষা কই? চাষ করব কি করে? সব দিলে ভি মহাজনকে বেচে দিবে। বলবে, ফসল ওঠা তব্‌ কি খাব? ধার নিলাম। জমি বেচে শোধ দিলাম।

—সেখানে কি থাকতে হবে?

—হ্যাঁ। ক্যাম্প করবেন। থাকতেই হবে। ক্যাম্প চালু করে দিয়ে আসবেন। আমি লোক পাঠাব, ভাববেন না, ঔর ভয় খাবেন না।

—কিসের ভয় ?

—চোরের।

—চোরের ?

—হঁা। যতবার রিলিফ যায়, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে চুরি করবে এক-দো বস্তা চাল। চাল-মাইলো-গুড়, যা পাবে।

—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ?

—হঁা। তাদের কেউ ধরতেও পারে না। কেউ কেউ দেখেছে। আমি সেবার নিজে দেখলাম। সঙ্গে বন্দুক ভি ছিল।

—আপনি বন্দুক রাখেন ?

—লাইসেন্স। বন্দুক। লোহ্রি খুব খচড়াই জায়গা। দশ বছর আগে··· না, বারো সাল হল···খুব বলোয়া হয়···আগ জলে যায়।

—সে কি ?

বি. ডি. ও. বললেন, আমি তখন চাকরিতেই ঢুকি নি। লোহ্রি জায়গাটার কহানী জানেন ?

—না।

কিছুই জানেন না রিলিফ-অফিসার, জানতেও চান না। চাকরির খাতিরে রঁাচি শহরের আলো ও ঔজ্জ্বল্য ছেড়ে এখানে এসেছেন।

—এখানে, মানে ওখানে থাকত লোহার্ লোক। আগরিয়া। আগরিয়ারা, কহানীতে বলে অসুরের বংশ। ওদের কাজই ছিল মাটি থেকে লোহা উঠিয়ে কামারশালে লোহার জিনিস বানানো। ওরা আগুন খেত, আগুনের নদীতে স্নান করত, ওদের নগর ছিল লোহ্রি। রাজার নাম লোগুন্ডি। মাটির নিচে যে অসুররা থাকে, তারা শুধু আগরিয়াদের পাতালে নেমে লোহা উঠাতে দিত। শুধু আগরিয়াদের।

—তারপর ?

—ওদের রাজার নাম লোগুন্ডি। লোগুন্ডি রাজার বারো ভাই। বারো ভাইয়ের এক বউ।

—দ্রৌপদীর চেয়েও সরেস।

—লোগুন্ডি রাজার গরব উঠে গেল, সুরজ দেওতার চেয়ে তার তেজ বেশি। সুরজ দেওতা চলে এল লোহ্রি। সুরজের আগুনে লোগুন্ডি রাজা, তার এগারো ভাই, লোহ্রি নগর, সব জলে গেল। বউ ভিন্ গাঁয়ে ছিল, বেঁচে গেল। সুরজের তেজে জলতে জলতে বউ পালাল এক

গোঁড়ের ঘরে, ঔর মাট্‌ঠার হাঁড়িতে নেমে তার আগুন জুড়াল। সেখানে, ছিন্দি গাছের নিচে তার ছেলে হল। নাম জ্বালামুখী।

—বাপ্‌ রে!

জ্বালামুখী জোয়ান হয়ে সুরজের সঙ্গে লড়াই করতে গেল। ওই লোহ্‌রিতে দুজনের লড়াই হয় ঔর সেই তেজেই ওখানে মাটি জ্বলে গেল। লড়াই হথে, জ্বালামুখী সুরজকে সাঁপ দিল। চাঁদ যখন পুনম্‌-এ থাকবে, তখনি তোমাদের, মর্দ-আওরতের মিলন হবে। সুরজ দেওতা বলল, তোরা, আগরিয়ারা লোহার কাজ করে যথ দৌলত পাবি, সব ছাই হয়ে উড়ে যাবে। সেই থেকে আগরিয়ারা গরিব।

—জংলী কহানী।

—সে তো বটেই।

—আগরিয়া লোকেরা এখন ওই রকম হয়ে গেছে। জাত বেওসা, লোহার্‌ কাম ভি ওদের ছুটে গেছে। কিন্তু ওদের চাষ-খেতী কামে লাগালো কঠিন। ওরা বলে, ওরা অশুচ হয়ে আছে। লোহাসুর ওদের লোহা দেয় না কয়লাসুর দেয় না কয়লা। অগাইয়াসুর দেয় না আগুন। একদিন ওদের দিন আসবে।

—বলোয়া কা বাত বাতাইয়ে।

—বারো-চোদ্দ সাল আগে ভারত সরকার লোক পাঠায়। লোহ্‌রিতে আয়রনওরের তালাস করে। কুভা গ্রামের লোকরা ছিল খচড়াই আগরিয়া। তারা বলে, ওহি বুরুতে আমাদের তিন অসুর দেওতার বাস। ওখানে তালাস চালাবে না। দু পাঞ্জাবী অফ্‌সর, মাদ্রাজী জিওলজিস্ট, তারা কি মানবে জংলী অসুরদেওতার বুরু? তারা বুরু উড়িয়ে দেয় ব্লাস্ট্‌ করে।

—উস্‌কে বাদ?

—কুভা গাঁও থেকে আগরিয়ারা এসে সবাইকে কেটে ফেলে। উস্‌কে বাদ জঙ্গল মেঁ ঘুসে যায়।

—ঘুসে যায়?

—হাঁ। ওহি যে ঘুসে গেল, ইয়ে সমঝিয়ে মিস্টার সিং, ওহি যে ঘুসে গেল, বাস্‌! একদম খোয়ে গেল। ঔর কেউ ওদের দেখে নি। একশো-দেড়শো মানুষ!

—বলেন কি?

—ওহি তো তাজ্জব কে বাত।

—বাস্, বে-হদিশ?

—বে-হদিশ! বে-খবর!

—গরমেণ্ট পাত্তা চ'লাল না?

—বরাম্ভবনের বিধবা যেমন চাল থেকে কাঁড়া বাছে, তেমন করে জঙ্গল বাছল।

—তব্ ভি মিল্‌ল না?

—না।

—উস্‌কে বাদ?

—গরমেন্‌ট খুব তালাস চালাল। বিনা কুভা গ্রাম, কোনো গ্রামের মানুষ বেপাত্তা হয় নি। ইসি সে পরকাশ হুয়া কা ঔর কোই অপরাধী নেই থে। তালাস চলল এক মাস। উস্‌কে বাদ কুভা গ্রাম জ্বালিয়ে নাশ করে, গ্রামের মাটিতে লবণ ঢেলে পুলিস চলে এল। ঔর সব আগরিয়া গ্রামে পিটুনি খাজানা, বহোত্ জুলুম করল।

—তাদের পাত্তা মিলে নি?

—না।

—কোথায় গেল?

—জঙ্গল। জঙ্গল মেঁ কত বুরু, কত গোমফা, কোথা গেল কে বলবে?

—সব লোহ্‌রিতে?

—হঁা।

—আপনি কেন বন্দুক নিয়ে যান?

—ভয় করে। অত অত লোক! কোথা ছিপাকে আছে, যদি আসে?

—সেই জন্যে?

—না।

—তব্?

—রিলিফ যখনি যায়, চুরি হয়। আগে চার বস্তা, পাঁচ বস্তা চুরি হত। কয়েক বছর ধরে দু-তিন বস্তা চুরি হয়। জায়গাও বহোত্ খারাব। কে জানে মাটিতে কি আছে! কুছ্ হোতাই নেহি। আমার ভাতিজাও একবার খেতি করতে চেষ্টা করল। কিছু হল না। না ধান, না জোয়ার, না মাড়োয়া, না ভুট্টা। লাঙল চোটালে নিচে যেন লোহা। য়ো এক অভিশপ্ত্ ভুমি হ্যায়। দেখেই মালুম পড়ে।

—এখনো চুরি হয় ?

—হ্যাঁ। সবাই বলত, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে আঁধারে এসে চুরি করে। আমি ভেবে নিলাম, রিলিফ কা মাল তো রিলিফ-বাটনেওয়ালা লোক চুরি করেই থাকে। চুরি করে, কাউকে বেচে দেয়। গরমেন্ট কিছু জানে না। শীত-গ্রীষ্ম, রিলিফ পাঠালেই কম্বল ভেজবে, কাপড়ালত্তা। য়ো জংলী লোক কা করে গা ধারিওয়ালী কম্বল ঔর আচ্ছা কাপড়া ঔর চিনি দিয়ে ? সব তো তারাও বেচে দেবে, আর মহাজন বানিয়া টর্চবাতি, দেশলাই, কি আয়না দিয়ে সব কিনে নেবে। এ জানে বলেই রিলিফ-বাটনেওয়ালা লোক সব বেচে দেয়। এতে আমি কোন দোষ দেখি না।

—কিন্তু এ তো ঠিক নেহি হ্যায়।

—এইসান্ বে-ঠিক কাম তো হোতাই হ্যায়। দেখুন না, ও বাংলাদেশ যুদ্ধের টাইমে গরমেন্ কলকাতা হতে যত রিলিফ ভেজল, তামাম দুনিয়া হতে জামা-কাপড়-কম্বল-মশারি-বাসন-স্টোভ-জুতা—সব আমরা রাঁচি বাজারে কিনলাম না ?

—তাও বটে।

—সে যাক ! আমি ভাবলাম, নিজেরা রিলিফ চুরি করে আর গপ্ উড়ায় কা বাচ্চা লোক চুরি করতা। তা আমি সেবার নিজে গেলাম। সঙ্গে বিশ হাজার টাকার মাল, সিপাহী ভি মেঙে নিলাম। ক্যাম্প হবে লোহ্‌রিতে। সবাই আসবে, নেবে। কিন্তু রাত ভি খুব কালো ছিল, মাথার চুলের মতো, গরমও খুব। আমি বাহারে শুয়েছিলাম। হঠাৎ কেমন শব্দ ! উঠে দেখি কি বস্তা নিয়ে ছোট ছোট মানুষ, বাচ্চাই হবে, পালাচ্ছে।

—আপনি কি করলেন ?

—আকাশে বন্দুক ফুটালাম। কি করব ! বাচ্চাদের গায়ে মারব ? কিন্তু য়ো লোক ভেগে গেল। নাঙ্গা ছিল, বাচ্চা ! গুলি মারব ?

—তাও তো বটে।

—ঔর ভাবলাম, রিলিফের মাল তো কত চুরি হয়, কতজন নাফা করে, বাচ্চা লোক না হয় নিল।

—ঠিক বাত।

—লেকিন্ !

—কি ?

বি. ডি. ও. ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলেন। অন্ধকার অত্যচ্ছ ও গলন্ত। গলে গলে পড়ে বিশ্বচরাচরের সব ইন্দিছিন্দি যেন বুজিয়ে দিয়েছে এই অন্ধকার। মাটি থেকে উঠন্ত ধুলো ও ভাপে বাতাস অস্বচ্ছ। তাই আকাশের তারাও তেমন উজ্জ্বল নয়। চাঁদ উঠবে বেশি রাতে।

বি. ডি. ও বললেন, কারুকে বলি নি। কিন্তু আপনি ভালো লোক, রাজ্যমন্ত্রী আপনার মৌসা লাগেন, আপনাকে আজ যে কথা বলব তা কাউকে বলি নি। কিন্তু আপনাকে বলব, ঔর বিপদের আসানী ভি দিয়ে দেব।

—কি কথা ?

—জানেন মিস্টার সিং ? ও জায়গাটা তো বদনামী। অসুর-বোঙা-ভূত কি আছে বলে সবাই। আমি দেখেছিলাম, যে বাচ্চারা বস্তা নিয়ে ভাগছে, তারা মানুষের বাচ্চার মত নয়।

—কি বললেন ?

—হাত-পা-সব অন্য রকম।

—কি রকম ?

—তা বলতে পারব না। কি লম্বা চুল, আর কি রকম হেসে যে চলে গেল !

—আমার ভয় করছে।

—আপনার কোনো ভয় নেই। এই কথাটা বলব বলে আজ ফেরত গেলাম না টাহাড়। থেকে গেলাম। আপনার মেসোমশাই রাজ্যমন্ত্রী, আপনার জানের জিম্মাদারী মেরে পাস। আমি এই পরসাদ এনেছি মহাবীরজীর। পাকিট মেঁ রাখ্ দিজিয়ে। এ যার কাছে থাকবে, তার কোনো ভয় নেই।

—বন্দুক নেই যে ?

—তাতে কি ? সঙ্গে লোক থাকছে।

—বন্দুক-সেপাই বা পুলিস···

—এখন তো মাঙাবার কোনো উপায় নেই। ঠিক আছে। আপনি তো কাল যাচ্ছেন। এর পরে যারা যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে পুলিস পাঠাবার কৌশিস্ আমি করব।

—চলুন খেয়ে নিই।

—আগে স্নান করুন।

কুয়োর ঠাণ্ডা জলে স্নান। মেসোমশাই রাজ্যমন্ত্রী। ফলে খাওয়ার টেবিলে উৎকৃষ্ট চালের ভাত। ভাতে মটরশুঁটি। মাংস, গুলাবজামুন, আচার।

রাতে বাইরে খাট। মাটি জলে ভেজানো। ফলে সামান্য ঠাণ্ডা।

কিন্তু ঘুম আসে কোথায়? সূর্য আর একটি বালকের যুদ্ধ। একটি বৃক্ষ। অন্ধকার থেকে ঝল্‌কে ওঠা বলোয়া। কয়েকটি মৃতদেহ। বিধবা, ব্রাহ্মণের বিধবা যেমন করে চালের পোকা বাছে, তেমনি করে পুলিস জঙ্গল বাছছে। রিলিফ। অন্ধকারে অতিমানুষী শিশুরা চাল চুরি করছে। ছবির পর ছবির মিছিল। মুখে তাপ লাগতে তবে রিলিফ অফিসার বুঝলেন, খুব ঘুমিয়েছেন। টেনে। এখন মুখে সূর্যের তাপ লাগছে।

সকালে রিলিফ-অফিসার রওনা হলেন। বি. ডি. ও. টাহাড় ফিরে গেলেন। রিলিফের মাল চলল ট্রাকে। মায় তাঁবু।

পথ কিছু পরেই কাঁচা রাস্তা। গ্রীষ্ম বলে যাওয়া যাচ্ছে। বর্ষায় পথ অগম্য। পথে দেখা গেল, মিশনহাউসে মিশনরীরা রিলিফ-সেণ্টার খুলেছেন। দলে দলে মানুষ। কালো, শীর্ণ ও নীরব।

জীপের ড্রাইভার থুথ্‌ ফেলে বলল, জান্‌বর সব! আকাল হলে বালবাচ্চা মিশনের দরজায় ফেলে দিয়ে চলে যায়। বলে, ও লোক ফেলে দেবে না। কুছ না কুছ দিয়ে বাঁচাবে। আমাদের কাছে থাকলে মরে যাবে।

—মানুষ নয় এরা।

—মিশনের সায়েবরা এদের ক্রীশ্চান বানাচ্ছে। ধরম্‌ নাশ করে দিল। তবে এরাও খচড়াই। ক্রীশ্চান ভি হচ্ছে, নিজেদের দেও-দেওতা ভি পূজছে।

—মিশনরীরা জানে না?

—জানে। তব্‌ ভি ওদের দাওয়াই দিবে, দেখ্‌ভাল করবে। ওই গোরা গোরা মেমরা ওই জান্‌বরদের বাচ্চাদের কোলে বসাবে। মু মে মু লাগিয়ে পেয়ার করবে।

—রাম রাম!

—ও গানা শুনিয়ে না! কোই আচ্ছা লোক এ্যায়সান্‌ টাইমে এ্যায়সা গানা গায় গা?

গানের নামে দীর্ঘায়িত প্রেত-বিলাপটি এখন সকল বৃক্ষ ও জঙ্গল হতে এসে এসে ছুটন্ত জীপে ধাক্কা মারে।

—কেন গান গাইছে ?

—ওরা ওইরকম ! যারা চলতে পারবে, তারা রিলিফ নিতে আসবে। যারা চলতে পারবে না, বহোত্ বুড্ঢা যারা, তারা গোল হয়ে বসে ওই রকম গানা গাইবে। গাইবে, গাইবে, গাইতে গাইতে মরে যাবে। এক গ্রামে গানা হবে তো ঔর গ্রামে মরনেবালা বুড্ঢা ঔর বুড্ঢিরা জোয়ানদের ভেজে দেবে রিলিফ আনতে। ঔর নিজেরা গানা গাইবে।

রিলিফ-অফিসার অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন। রাঁচিতে আলো-ঔজ্জ্বল্য-ট্যাক্সি-মোটর, জীবন সেখানে চলছে। এ কোন দেশে যাচ্ছেন তিনি, যেখানে অতিপ্রাকৃত শিশুরা বন্দুকের শব্দের উত্তরে প্রেতহাসি হেসে রিলিফ নিয়ে পালায় ? যে দেশে যেতে হলে চোখে পড়ে শুধু ধূসর পাহাড় ও জঙ্গল। কিন্তু তার মধ্যে বসে জরতীরা মৃত্যু আসন্ন জেনে বাঁচার চেষ্টা করে না। প্রেত-বিলাপে গান গায় ?

—মরে যায় অনেক ?

—অনেক ! দেখুন না, কত শকুন-চিল উড়ছে ? জ্যান্ত থাকতেও শকুন খেয়ে নেয় কতজনকে। এ তাজ্জব দেশ !

—লোহ্রি কতদূর ?

—ঢুকছি এখন। দেখুন না, গাছ-মাটি-পাহাড় সব কি রকম ! যেন তামা দিয়ে তৈরি, কেমন লাল ? এহি হ্যায় লোহ্রি। এখানকার মাটিতে বিষ আছে।

দূরে কয়েকটি পাহাড় দেখা গেল। ড্রাইভার বলল, ওখানে আপনার ক্যাম্প পড়বে।

কিছুক্ষণ বাদে ড্রাইভার আবার বলল, এক বাত হুজুর। বুরা মত মানিয়ে গা। লোহ্রিতে যা আছে, কি আছে জানি না, কিন্তু মনে খুবই ডর এসে যায়। রাতে আমরা একটু দারু-উরু পিব। ক্যাম্পের কাছেই। নইলে ভয় ধরে যায়। যো বাহাদুর তো পাগল হয়ে গেল।

—বাহাদুর কে ?

—ডেরাইভর। কেন ? তার কথা অফ্সর সাব বলেন নি।

—না।

—ষে ঠিক নেই কিয়া।

—বাহাদুরের কি হয়েছিল ?

—তা এখনো কেউ জানে না। ওর সঙ্গে যারা ছিল, তারা বলে, সে রাতে সবাই ঘুমোচ্ছিল। বাহাদুর হঠাৎ, চোর! চোর! বলে কাকে তাড়া করে, ঔর অন্ধেরা মে' খো গয়ে। যারা ওকে খুঁজতে যায়, তারা আঁধারে কার হাঁস শুনে ডরসে চলে আসে। পরদিন সকালে দেখে বাহাদুর বেহোঁশ হয়ে পড়ে আছে। হোঁশ ফেরে, লেকিন চেতন নহীঁ।

—তারপর?

—বাউরা হয়ে গেল। আভিতক্। রাঁচি মে হায়। নিন্. লোহ্রি পঁহুছ গেলাম।

ক্যাম্প ফেলার জায়গা সাফ করা ছিল। একটি ছোট ঝোপড়ি থেকে তশীলদার বেরিয়ে এল। বলল, চায়ে-উয়ে পিয়ে নিন হুজুর। পানি মৌজুদ, নাহাতে ভি পারেন। পানি আনতে হয় আধা মিল দূর থেকে।

ড্রাইভার বলল, ওহি কুণ্ডী?

—ওহি।

রিলিফ-অফিসারের সপ্রশ্ন চাহনির উত্তরে তশীলদার বলে, কুভা গ্রামের বলোয়া কে বাদ বুরু ব্লাস্ট করা হয়। সেই ব্লাস্টে বুরু উড়ে যায়, এক গহ্রা গাঢ়া তৈরি হয়। তাতে জল জমে বর্ষায়, ঔর সালভর পানি রহ্তা। উসি কে পানি।

চা খাওয়া হলে তশীলদার তাঁবু খাটিয়ে ফেলে। রিলিফের মাল বস্তা গুনে সাজায়। বলে, কুছ্ মত্ শোচিয়ে। বছর-বছর আমি এহি কাম করি। গ্রাম-ওয়ারি নামের দফা ভি মৌজুদ। দশটা থেকে চারটে অবধি রিলিফ বাটবেন, তারপর খেল্ খতম।

—কত লোক আসবে?

—হাজার, দো-হাজার, ঠিক নেই কুছু।

—মেডিক্যাল ইউনিট আসছে।

—এখানে?

—হ্যাঁ। তাঁবু চাই। তাঁবু খাটান।

—বেশ হুজুর? মেডিক্যাল ইউনিট তো কখুনো আসে না?

এর আগে কখনো তো জন্তা সরকারও আসে নি। আর রিলিফ দিতে স্পেশাল অফিসার আসে নি।

তশীলদার মনে মনে বলে "শুয়ারের বাচ্চা" ও মুখে বলে, যো বোলে গা, ওহি করে গা।

—সরভোহা মিশন থেকে যারা এসেছেন, তাঁরাও কাজ করবেন।

—য়ো লোক ভি?

—হঁ্যা। ওঁদের নার্স আছেন। ডাক্তার।

—বহোত্ আচ্ছা।

—ক্যাম্প জল আনার জন্যে, ক্যাম্প সাফাই রাখার জন্যে, খিচরি যাতে বসবে সে হাণ্ডা সাফা করতে লোক চাই। দশটা গেঁয়ো ছেলে বেছে নিন। নাম লিখে নিন। তারা সব কাজ করবে, খানা পাবে, দিন এক টাকা করে মজুরিও পাবে।

—ওরা তো খানা পেলেই সব করে।

—আপনি কথা বলতে এসেছেন, না শুনতে? ক্যাম্প আমি চালাব। আপনি রোজ আসবেন।

—কতদিন ক্যাম্প খোলা থাকবে?

—এখন এক মাস। আমি এ ক্যাম্প দেখব। বিশ বিশ মাইল তফাতে ক্যাম্প পড়ছে। আর এক কথা! স্টোর যেখানে থাকবে, আমি সেই তাঁবুতে থাকব। আমার দায়িত্ব তো!

—য়ে খুব ঠিক কথা। আমাকে তো শও রুপেয়া দিলেও স্টোরের তাঁবুতে থাকব না।

—কেন?

—চুরি হয়। ঔর যারা চোরাই করে, তারা মানুষ নয়।

—ও সব কথা ছেড়ে দিন। কলেজের ছেলেরাও আসছে ভলান্টিয়ার হয়ে। বলে দিন, গ্রামে গ্রামে বুড়োবুড়ির গান উঠাবার দরকার নেই। গ্রামেও রিলিফ যাবে। ছেলেরা নিয়ে যাবে।

তশীলদার তাজ্জব বনে চলে যায়। সে প্রতি বছর রিলিফ থেকে চুরি করে ও কাজ গোছায়। সে অতি বদ, কিন্তু অত্যন্ত কাজের। দশটি গ্রামীণ আগরিয়া যুবককে সে ক্যাম্প দেখ্-ভাল্-সাফাইয়ের কাজে নিযুক্ত করে। চৌকিদার দুজনকে নিয়ে গাছের নিচে রিলিফের মাল সাজায়। আজ শুকনো মাল বিলি হয়। কাল থেকে খিচুড়ি ও শিশুদের জন্যে দুধ বিতরিত হবে।

রিলিফ-অফিসারকে বলে, স্টোরের তাঁবুতে এই ছেলেরা পাহারা থাকবে। আমাদের মধ্যে কেউ তো থাকবেই না, আপনি একা থাকবেন?

রিলিফ-অফিসার আশ্বস্ত হন। খুব তাড়াতাড়ি অতীব শৃঙ্খলায় ক্যাম্প চালু হয়ে যায়। পরদিন থেকে রান্না-করা খিচুড়ি দেওয়া হয়। মেডিক্যাল ইউনিট কলেরা ও টাইফয়েডের ইঞ্জেকশন দেয়। জায়গাটি সরগরম হয়।

দূর-দূরান্ত থেকে এখন মানুষ আসতে থাকে। রাতেও চোখে পড়ে দূর-দিগন্তে চলমান আলো। মশাল জ্বেলে মানুষ আসতে থাকে এবং দিনে যেহেতু প্রচণ্ড দাবদাহ, সেহেতু রাতে পথ চলাই সুবিধে। কয়েক দিনে তশীলদারও বলে, না হুজুর, রিলিফের কাজ করে আপনি যে জান্‌বরদের মনে বিশোয়াস্ এনে দিয়েছেন একটা। আগে বুড ঢারা জানত মরে যাবে, গাঁন উঠাত। এখন গানা ভি বন্ধ। এক কাম করলে হয় না?

—কি?

—গাঁও মে রিলিফ মত্‌ ভেজিয়ে। এবার তো ওরা রিলিফ পাচ্ছে ঠিকমত। ওরাই কেন বুড্‌ঢা-বুড্‌ঢিদের বয়ে আনুক না?

—না-না। য়ে লোক ভুখ্‌ মে মম্‌তাহীন হো জাতা। যাকে আনবে না সে তো মরে যাবে। বয়ে আনবে বা কি করে? আসতে আসতে পথে পড়ে মরে যাচ্ছে। তাগদ্ ভি নেই।

রিলিফ-অফিসার এই ঋণদান কার্যে অসম্ভব জড়িয়ে পড়েন। জায়গাটির পোড়ামাটির মতো চেহারা। খর্বাকৃতি ধূসর ও পত্রহীন গাছের ঘন বন, লালচে ও হিংস্র পাহাড়, ভয়াবহতা হারায়। নিরন্ন, বুভুক্ষু মানুষগুলি পায় টপ প্রায়োরিটি। ডাক্তার ছেলেগুলি টীকা দিয়ে চলে যায়। মিশনের ডাক্তার ও নার্সদের মনেও তিনি ভরসা জোগান এবং যদিচ কলেরা ও টাইফয়েডের ইঞ্জেকশন দেয়া নিয়ম, তিনি প্রোটোকলকে তুচ্ছ করে প্রচুর অ্যান্টিবায়োটিক, ঘায়ের ওষুধ, বেবিফুড, নিউট্রি নাগেট ইত্যাদি আনান রাঁচি থেকে।

গ্রামীণ আগরিয়া দশজন তাঁকে ঘিরে থাকে। ওরা তাঁকে বুরু ব্লাস্টেড কুণ্ডীতে নিয়ে যায় না। ওটি ওদের কাছে ট্যাবু। লোহ্‌রি নদীর বুকে যে লুক্কায়িত কুণ্ডী ওদের জলোৎস, যেখানে ওঁকে নিয়ে যায়। স্নান করতে করতে উনি ওদের কাছে সূর্য ও জ্বালামুখীর লড়াইয়ের কাহিনী শোনেন। জ্বালামুখী, এক আগরিয়া বালক ওদের হিরো। তার কারণেই আগরিয়ারা গরিব। আবার তার অভিশাপেই পূর্ণচন্দ্রিমার রাত ছাড়া সূর্য তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন না। লোহাসুর, আগইয়াসুর ও

কয়লাসুর, তিন অসুরের আশীর্বাদ পায়নি বলেই আগরিয়ারা আজ কষ্ট পাচ্ছে। স্নান করে যখন ফেরেন, তখন রাত হয়েছে।

রাতে স্টোরের তাঁবুর সামনে খাট পেতে শুয়ে পড়েন ও ভাবেন, রিলিফ চুরি করত দু হাতে, তাই বলেই প্রেতদের চুরি করার কথা রটিয়েছিল সবাই। এই লোহ্ রির আগরিয়াদের ভাগ্য বদলে দেওয়া যায় কিনা, একথাও ভাবেন। সৎ ও অনুকম্পায়ী অফিসার দরকার। তেমন লোক এদের কৃষিকর্মে কন্‌ভার্ট করতে পারবেন। রাঁচি গিয়েই নোট দিতে হবে। বছর বছর রিলিফ দিয়ে এত মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এসব কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েন। নিশ্চিন্ত ঘুম। আগরিয়া যুবকগুলি তাঁবু ঘিরে ঘুমোয়। ওরা ওকে "দেওতা" বলেছে। ভাবলে মনে হয় খুব জিত হয়েছে ওঁর। যারা নিজেদের ছাড়া কারুকে বিশ্বাস করো না, তাদের মুখে "দেওতা" শোনা একটা বিরাট জয় বই কি।

যুবক দশটি কিন্তু ঘুমোয় না। জেগে থাকে ও কান পেতে থাকে। এবার ক্যাম্প অনেক বড়। হইচই অনেক বেশি, সে জন্যেই কি?

একদিন তারা কোনো সম্মিলিত পদশব্দ শোনে। শ্বাপদ সতর্কতায় কয়েক জোড়া পা এগোচ্ছে। চাপা শিস্। প্রত্যুত্তরে শিস্। তাঁবুর দড়ি খুলে ফেলে কারা যেন। তারপর খুব দ্রুত ও নিঃশব্দ অ্যাকটিভিটি। যুবকগুলি উঠে যায় ও তাঁবুর পর্দা তুলে ধরে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ গভীর রাতে। চালের বস্তা নেমে যায়। মাইলোর বস্তা। কয়েকটি ছোট ছোট হাত।

রিলিফ-অফিসারের ঘুম নিমেষে ভাঙে। টর্চ নিয়ে উঠে বসেই তিনি দেখেন, আগরিয়া যুবকরা নেই। ক্ষিপ্র পায়ে তাঁবুর ওপারে চলে যান। যুবকরা দড়ি টেনে খোঁটায় বেঁধে দিচ্ছে। কেন? তাঁবুর পর্দা কেন খোলা হয়েছিল? বিমূঢ় ও আহত, বিশ্বাসভঙ্গে আহত অফিসার ওদের দিকে তাকান। অচেনা, অপরিচিত মুখ। ওরাই। কিন্তু ওদের সঙ্গে ওঁর মনের আর্ত প্রশ্নের কোন সংবাহন ঘটে না। হিংস্র এবং বিজয়ীর হাসি হেসে যুবকরা নিমেষে আঁধার বনে মিলায়। দৌড়ে অফিসার তাঁবু ঘিরে আসেন ও ভেতরে ঢোকেন। দুটি বস্তা নেই।

বেরিয়ে আসেন ও ছোটেন। ছোট ছোট পায়ের শব্দ। বনের ফাঁক দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে বস্তা চলে যাচ্ছে। প্রেত নয়, মানুষ। এত ছোট, শিশু বললে হয়। নিশ্চয় বালক-বালিকা। এদিকে রিলিফ নেয়, ওদিকে আট-দশ

বছরের ছেলেদের দিয়ে চুরি করায়। অথচ সরকারী রেকর্ড: লোহ্রির আগরিয়ারা চুরি-রাহাজানি-বাটপাড়ি জানে না। কখনো মিথ্যা বলে না। তিনি তো এদের ভাল করতে চেয়েছিলেন? যুবকগুলি ওঁকে "দেওতা" বলেছিল। সব ছিল প্রতারণা? মনে হচ্ছে কেউ ঠকবাজি করে ওঁকে নিঃস্ব করে ফেলে রেখে গেল! রিলিফ-অফিসারের মাথায় রক্ত চড়ে যায়। ভালো লোক তিনি, সৎ, ঘুষখোর নন। আদিবাসীদের বিষয়ে মমতা আছে। এতগুলো কারণে তাঁকে নির্বাচন করা। সে নির্বাচনের মর্যাদা তিনি রেখে-ছিলেন। প্রাণ দিয়ে রিলিফের কাজ করেছেন। এদের রিলিফ দিয়ে বছরে একবার না-বাঁচিয়ে সংবৎসর বাঁচিয়ে রাখার কথা ভেবেছেন। তার প্রতিদানে এই ব্যবহার? ছোটদের পাঠিয়ে রিলিফ চুরি করা? উনি ওদের ধরবেন, চুরির ফয়স্‌লা করে যাবেন।

দৌড়তে থাকেন উনি গোঁ ভরে। ওরাও ছোটে। বন পাতলা হয়। খেড়ো ঘাসের বন। প্রান্তর। এই সেই প্রান্তর, যেখানে সূর্য ও জ্বালামুখী যুদ্ধ করেছিল। এখানে পৌঁছে ছেলেগুলি মাইলো ও চালের বস্তা নামায়।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে নিশ্চয়। রিলিফ-অফিসার কাছে যান, বস্তাগুলির কাছে। বস্তা ঘিরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়াবার ভঙ্গিটা গুঁড়ি মারা জানোয়ারের মতো। ভঙ্গিতে হিংস্রতা। যেন লাফ দেবে। নিশ্চল, মৌন, নজর রাখছে ওঁর ওপর। কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নায় সব অস্পষ্ট।

হঠাৎ ওরা ওঁর কাছে এগিয়ে আসে। ছেলেরা নয়, মেয়েরাও আছে। হঠাৎ ভয় থাবা বসায় বুকে। ভয়, ভীষণ ভয়। এগোতে এগোতে ওঁকে ঘিরে ফেলে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল কেন?

ওরা ওঁকে দেখে, উনি ওদের দেখেন। ওরা আরেকটু এগোয়। আবার দাঁড়ায়। রিলিফ-অফিসার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন। বৃত্ত সম্পূর্ণ। পালাবার উপায় নেই। পালাতে যাবেন না। পালাতে যাবেন কেন? এরা তো মানুষ, মানুষের ছেলেপিলে। প্রেত নয়। প্রেত চাল ও মাইলো চুরি করে না। "য়োহ্ এক অভিশপ্ত্ ভূমি হ্যায়"—কে বলেছিল? "একটু দারু-উরু পিব"—কে বলেছিল? রিলিফ-অফিসার নিজের বাড়ি-খাওয়া, আছড়ে পড়া হৃৎপিণ্ডকে শাসন করেন। ওরা এগোয়।

ভয়, ভীষণ ভয়। ভীষণ, ভীষণ ভয়। ভীষণ ভয় করছে ওঁর। নীরবে এগোয় কেন? কেন কথা বলে না? ওদের শরীর স্পষ্ট হয়। এ কি দেখছেন উনি? নগ্ন কেন এরা? মাথার চুল এত বড় বড় কেন? বালক, বালক, লড়কা-

পণ যদি, তবে এর মাথার চুল সাদা কেন? মেয়েদের, বালিকাদের বুকে লম্বিত ও শুকনো স্তন কেন? ও এগোচ্ছে কেন? সাদা চুল যার? কাছে এস না। ওঁর আর্ত চীৎকারটি মৌন থাকে, শব্দরূপ পায়, 'ঔর মৎ আও!' যার চুল সাদা, সে কাছে এসে ওঁকে কি দেখাচ্ছে? বীভৎস, বীভৎস দৃশ্য, নিজের পুরুষাঙ্গ দেখাচ্ছে, শুকনো, ঝোলা, কোঁচকানো।

শিশু নয়, অ্যাডাল্ট! রিলিফ-অফিসারের মুখ থেকে শব্দ বেরোয় না। কিন্তু উপলব্ধির আঘাতে মস্তিষ্ক হিরোশিমা-নাগাসাকি হয়ে যায়।

বৃদ্ধটি বোঝে উনি বুঝেছেন। ও হাসতে থাকে। খিক-খিক-খিক—অমানুষী সে হাসি। হাসি ছড়িয়ে পড়ে। অফিসারকে ঘিরে সকলে হাসে। হাসতে হাসতে তারা শূন্যে লাফ মারে, কেউ কেউ গুঁড়ি মেরে বসে। অফিসার কি করবেন?

—মোরা ছেলা নই। মোরা কুভা গ্রামের আগরিয়া। কু—ভা! জানিস? "কুভা" নাম জানিস?

—নাঃ! নাঃ! নাঃ!—অফিসার চোখ ঢাকতে চান। হাত ওঠে না। প্রচণ্ড আঘাতে মস্তিষ্ক দীর্ণ। হাতকে মস্তিষ্ক, ওঠবার আদেশ দেয় না। "পাকিট মেঁ মহাবীর জীর পরসাদ"—কে বলেছিল?

—মোরা মোদের পূজার বুরুর মান রাখতে তুরাদের কেটে ফেলে সে হতে বনবাসী। কেউ মোরাদের ধরতে পারে নাই। কত পুলিস, সেপাই, কেউ পারে নাই!

বৃদ্ধটি হাসে। সবাই হাসে। খিক-খিক-খিক—প্রেতহাসি ছড়িয়ে পড়ে।

—নাঃ! নাঃ! নাঃ!

—আগরিয়ারা বাঁচায়ে রাখে। পলায়ে থাকতে থাকতে, না খেতে খেতে, সবাই মরে গিছে!

—নাঃ! নাঃ!

বৃত্ত ছোট হয়। ওরা আরো কাছে।

—কাছে এস না।

—কেন আসব নাই? অত অত চাল, অত অত মাইলো, দুটা বোরার লেগ্যে তু এলি কেন? এলি যখন, ভাল করে দেখ? হেই! তুরা দেখায়ে দে?

পুরুষরা পুরুষাঙ্গ দেখায়, মেয়েরা স্তন।

বৃদ্ধটি এখন খুব কাছে। অফিসারের গায়ে পুরুষাঙ্গ লাগছে। সামনে থেকে পেছন থেকে। শুকনো সাপের খোলস যেন। শুষ্ক ও অশুচি।

—মরতে মরতে মোরা এই চোদ্দজনা আছি। খেতে পাই না বলে দেহ শুকায়ে ছোট হয়া গিয়াছে। পুরুষরা শুধু মুতে যায়, রাতের কাম উঠাতে পারে না। মেয়েদের পেটে ছেলা আসে না। তাতেই মোরা রিলিফ চুরাই। খেয়ে খেয়ে আবার ত বড় হতে হবে কি না বল্?

—নাঃ! নাঃ! নাঃ!

—আগরিয়ারা মোরাদের মদত দেয়। কুভার বলোয়ার লেগ্যে মোরাদের এই হাল। কুভার বলোয়া!

—নাঃ! নাঃ! এ হতে পারে না।

কেননা এ যদি সত্য হয়, তাহলে সব মিথ্যে। কোপার্নিকাসের বিশ্ববিন্যাস, বিজ্ঞান, এই শতক, এই স্বাধীনতা, এই প্ল্যানের পর প্ল্যান। তাই রিলিফ-অফিসার বলে চলেন, নাঃ, নাঃ, নাঃ।

—"না" বললে "না" হবে? তবে এগুলা হল কি করে? ই গুলান্ দেখে বুঝিস না, মোরা ছেলাপিলা নই?

ওরা পিশাচ আনন্দে, প্রতিহিংসার উল্লাসে খিক-খিক করে হাসে। তারপর ওরা ওঁকে ঘিরে ছুটতে থাকে, হাসতে হাসতে। মাঝে মাঝে ওঁর গায়ে ঘষে দেখায় পুরুষাঙ্গ, বুঝিয়ে দেয়, ওরা পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় মানুষ।

আকাশে চাঁদ। কি নিরুপায় চাঁদের চেহারা। কি নির্বীর্য তার জ্যোৎস্না। সূর্য ও জ্বালামুখীর যুদ্ধের আগুনে দগ্ধ প্রান্তরে কয়েকটি বালক-বালিকা সদৃশ পূর্ণ বয়স্কের ভীষণ উল্লাস। প্রতিহিংসা চরিতার্থতার উল্লাস। শত্রুর মাথা বলোয়ার কোপে নামিয়ে দেবার উল্লাস। প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ।

কিসের বিরুদ্ধে?

ওদের নৃত্যপর শরীরের ওপর দিয়ে প্রলম্বিত ওঁর ছায়া। ছায়া বলে দেয় কিসের বিরুদ্ধে।

ওঁর পাঁচ ফুট ন ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের বিরুদ্ধে।

ওঁর শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধির বিরুদ্ধে।

রিলিফ-অফিসারের মস্তিষ্ক দিয়ে যুক্তির কথাগুলি মোটর রেস্ করে চলে যায়। বলতে চান, কেন এই প্রতিশোধ? আমি সাধারণ এক ভারতীয়। রুশী-কানাডিয়ন-আমেরিকানের মতো আমার শরীরের বৃদ্ধি নয়, দৈর্ঘ্য নয়। আমি জীবনেও সেই খাদ্য খাই নি, যা ক্যালোরিগুণে মানবদেহের বৃদ্ধির পক্ষে আবশ্যিক। ওআর্লড্ হেল্‌থ অর্গানাইজেশনের মতে যে খাদ্য না-খাওয়া অপরাধ।

কিছুই বলতে পারেন না। চাঁদের নিচে দাঁড়িয়ে ওদের দেখতে দেখতে, ওদের হাসি শুনতে শুনতে, ওদের পুরুষাঙ্গের ঘষটানি খেতে খেতে, ভারতের সাধারণ মানুষের অপুষ্ট দেহ ও হাস্যকর দৈর্ঘকে মনে হয় সভ্যতার জঘন্যতম অপরাধ, নিজেকে মনে হয় প্রাণদণ্ডের আসামী, এবং ওদের বামনাকৃতির কারণে রিলিফ-অফিসার নিজেকেই নিজে প্রাণদণ্ডটি দেন, এবং চাঁদের দিকে গলা তুলে হাঁ করেন। ওরা নাচছে, হাসছে, ওঁর গায়ে খসখসে পুরুষাঙ্গ ঘষছে, এখন ক্ষ্যাপা কুকুরের মত প্রান্তর ফাটানো আর্তনাদ করে পাগল হয়ে না যেতে পারলে তাঁর মুক্তি নেই। কিন্তু মস্তিষ্ক গলাকে আর্তনাদে ফেটে পড়ার আদেশ দিচ্ছে না কেন? ওঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

ইংরিজি

অসীম রায়

'এই রাস্তাতেই হবে। এটা তো পি-ব্লক'।

'কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না এ-অঞ্চলে।'

'তার মানে এটা মডার্ন এরিয়া। গ্রাম নয়। গ্রামে সকলে সকলকে চেনে।'

তারা গাড়ি থেকে নেমে কথা বলতে বলতে এগোয়। একটা বাগান-ওয়ালা একতলা বাড়ির সামনে এসে তারা থমকায়। ঠিক একতলা নয়, দেড়তলা। পাথরের কুচি-বসানো খাড়া দেওয়াল, তার নিচে রক গার্ডেন। বেঁটে দোতলায় খোলা টেরাস। নীল গ্রিল।

'নম্বরটা তো ঠিক মনে হচ্ছে। কুকুর নেই তো। দেখবেন।'

বেল দিতেই কাশির আওয়াজ পাওয়া যায়। তারপর পায়ের শব্দ। দরজা খুলতেই যে চেহারাটা বছর দশেক আগে কাগজে ছাপা হয়েছিল সেই প্রাইজ-পাওয়া চেহারাটার আরও বয়স্ক সংস্করণ। সামনের দিকে টাক বেড়ে গিয়েছে। ছবিতে মাথার পেছনে কোঁকড়া চুলের গুচ্ছি ছিল, সেগুলো ছাঁটা কাঁচাপাকা।

'আমরা কাগজ থেকে। কালকে সন্ধেবেলা ফোন⋯ ⋯

'আসুন, আসুন।'

এ সব ক্ষেত্রে যে-রকম হয়। বইয়ের আলমারি, দেয়ালে মাতিসের প্রিণ্ট, রেডিয়োগ্রাম, কয়েকটা ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের এল-পি। বাক্-এর কঞ্চার্তো, চাইকভস্কির নাটক্র্যাকার।

'আমরা একটা ওপিনিয়ন সার্ভে করছি আমাদের কাগজে। প্রাইমারি স্টেজ থেকে ইংরিজি তুলে দেবার কথা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এই স্টেজে শিক্ষা হবে কেবল মাতৃভাষা মারফত। যেমন জার্মানী ফ্রান্সে হয়, রাশিয়ায় হয়, প্রত্যেক স্বাধীন দেশে হয়।

পাশের তরুণটির পড়ুয়া চেহারা। সে তার পোর্টফোলিও থেকে একখানা সবুজ চটি বই বার করলে।

'আপনার মত অবশ্য আপনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন।' বইয়ের এক অংশে চিহ্ন দেওয়া ছিল। সেটা খুলেই সে আঙুল দিয়ে লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া জায়গাটা দেখায়। 'বইটা কবে বেরিয়েছে?'

তারপর নিজেই পাতা খুলে বার করে বললে, 'নাইনটিন ফর্টি এইট। মানে তিরিশ বছর আগে।'

পাজামার ওপর পাঞ্জাবিপরা দীর্ঘদেহী ভদ্রলোকটি হাত বাড়িয়ে নেন বইখানা। লাইনগুলো চোখের সামনে নাচতে থাকে: শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রাধান্য অনস্বীকার্য। দুশ বছরের ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য আমাদের প্রগতি শুধু সামাজিক রাজনৈতিকভাবেই খর্ব করে নি, আমাদের আত্মিক অবমাননারও কারণ ঘটিয়েছে। স্বাধীনদেশের নাগরিকরূপে শয়নে-স্বপনে ইংরিজি ভাষার এই প্রবল অত্যাচার থেকে কি ভারতবাসী কোনদিনই মুক্ত হবে না? মাইকেল মধুসূদনের আশার ছলনা স্বাধীনতার পরেও কতদিন তাড়না করবে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের?

ভদ্রলোক চেয়ারে নড়েচড়ে বসেন। ক্লান্ত গলায় ডাকেন, 'লতা, চা দিয়ে যাও।'

কী বলবেন? কী বলার আছে? ১৯৪৮ সালে ভূত-ভবিষ্যতের যে-চেহারাটা তাঁর চোখের সামনে জলজল করত আজ তা ম্যাড়মেড়ে। সিংহ-বিক্রমে তিনি ভারতীয় ভাষার পুনর্জীবনের কথা লিখেছেন, সভায় বক্তৃতা করেছেন, নিজের জীবনে তা পালন করেছেন। ইংরিজি বাংলা কিংবা যে-কোনো ভারতীয় ভাষার মাঝখানে এমন দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল ওঠে নি, যৌবনে অক্সফোর্ড সত্ত্বেও কখনও অ্যাংলোফিল হবার স্বপ্ন দেখেন নি। স্বপ্ন দেখার কোনো মানেই ছিল না। হেডমাস্টার রামকমল মুখার্জিকে কখনও ভোলা যায়?

উত্তর কলকাতার সেই সরু গলিতে তাঁদের বাল্যকাল। কতযুগ আগে কিন্তু সেদিনের স্মৃতি এখনও তলোয়ারের মতো মাথা তুলে আছে। উল্টোদিক থেকে হেডস্যার আসছেন, হাতে বাজারের থলি। 'শোনো শোনো, তুমি রোল নাম্বার থি না?' বুকের মধ্যে ছাঁত করে উঠেছিল।

শীর্ণ ফ্যাকফ্যাকে ফর্সা সেই ভদ্রলোক তাঁর ছাত্রের দিকে এগিয়ে আসেন। চারদিকে প্রচণ্ড কলেরা লেগেছে। একটু দূরেই তাদের পাড়ার বস্তির সামনে অ্যাম্বুলেন্স। কাগজের প্রথম পাতায় রোজ আর্তনাদ।

পাশের তরুণটির পড়ুয়া চেহারা। সে তার পোর্টফোলিও থেকে একখানা সবুজ চটি বই বার করলে।

'আপনার মত অবশ্য আপনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন।' বইয়ের এক অংশে চিহ্ন দেওয়া ছিল। সেটা খুলেই সে আঙুল দিয়ে লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া জায়গাটা দেখায়। 'বইটা কবে বেরিয়েছে?'

তারপর নিজেই পাতা খুলে বার করে বললে, 'নাইনটিন ফর্টি এইট। মানে তিরিশ বছর আগে।'

পাজামার ওপর পাঞ্জাবিপরা দীর্ঘদেহী ভদ্রলোকটি হাত বাড়িয়ে নেন বইখানা। লাইনগুলো চোখের সামনে নাচতে থাকে: শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রাধান্য অনস্বীকার্য। দুশ বছরের ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য আমাদের প্রগতি শুধু সামাজিক রাজনৈতিকভাবেই খর্ব করে নি, আমাদের আত্মিক অবমাননারও কারণ ঘটিয়েছে। স্বাধীনদেশের নাগরিকরূপে শয়নে-স্বপনে ইংরিজি ভাষার এই প্রবল অত্যাচার থেকে কি ভারতবাসী কোনদিনই মুক্ত হবে না? মাইকেল মধুসূদনের আশার ছলনা স্বাধীনতার পরেও কতদিন তাড়না করবে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের?

ভদ্রলোক চেয়ারে নড়েচড়ে বসেন। ক্লান্ত গলায় ডাকেন, 'লতা, চা দিয়ে যাও।'

কী বলবেন? কী বলার আছে? ১৯৪৮ সালে ভূত-ভবিষ্যতের যে-চেহারাটা তাঁর চোখের সামনে জ্বলজ্বল করত আজ তা ম্যাড়মেড়ে। সিংহ-বিক্রমে তিনি ভারতীয় ভাষার পুনর্জীবনের কথা লিখেছেন, সভায় বক্তৃতা করেছেন, নিজের জীবনে তা পালন করেছেন। ইংরিজি বাংলা কিংবা যে-কোনো ভারতীয় ভাষার মাঝখানে এমন দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল ওঠে নি, যৌবনে অক্সফোর্ড সত্ত্বেও কখনও অ্যাংলোফিল হবার স্বপ্ন দেখেন নি। স্বপ্ন দেখার কোনো মানেই ছিল না। হেডমাস্টার রামকমল মুখার্জিকে কখনও ভোলা যায়?

উত্তর কলকাতার সেই সরু গলিতে তাঁদের বাল্যকাল। কতযুগ আগে কিন্তু সেদিনের স্মৃতি এখনও তলোয়ারের মতো মাথা তুলে আছে। উল্টোদিক থেকে হেডস্যার আসছেন, হাতে বাজারের থলি। 'শোনো শোনো, তুমি রোল নাম্বার থি না?' বুকের মধ্যে ছাঁত করে উঠেছিল।

শীর্ণ ফ্যাকফ্যাকে ফর্সা সেই ভদ্রলোক তাঁর ছাত্রের দিকে এগিয়ে আসেন। চারদিকে প্রচণ্ড কলেরা লেগেছে। একটু দূরেই তাদের পাড়ার বস্তির সামনে অ্যাম্বুলেন্স। কাগজের প্রথম পাতায় রোজ আর্তনাদ।

'আচ্ছা শোনো, এই যে কলেরা লেগেছে কলকাতায় তুমি তা ইংরিজিতে কী বলবে?'

সেই তীক্ষ্ণ সীরিয়াস প্রবীণ মুখের সামনে তাঁর বালক দৃষ্টি তিনি এখনও যেন স্মরণ করেন। বুঁজে আসা গলা ঝেড়ে বললেন, 'কলেরা হ্যাজ ব্রোকন আউট ইন ক্যালকাটা স্তার।'

'ব্রেক-আউট কথাটা ঠিকই বলেছ। ব্রেক-আউট ব্যবহার হয় রোগের ক্ষেত্রে। কিন্তু এখন যেরকম ভয়ংকর ব্যাপার তাতে ব্রেক-আউট ভীষণ সফ্‌ট, একটা যাকে বলে আণ্ডার-স্টেটমেণ্ট। তার চেয়ে বল, কলেরা ইজ রেজ্‌িং ইন ক্যালকাটা। কী বললাম, বল তো?'

'কলেরা ইজ রেজিং ইন ক্যালকাটা', বলেই সামনের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন।'

'রেজিং বানানটা বল।'

বানান শুনে বললেন, 'বাঃ, তোমার কান তো বেশ তৈরি হয়েছে। যাই হোক, তোমার যে-ভাই ক্লাস এইটে পড়ছে তাকেও বলে দিও এই নতুন এক্সপ্রেশান। আর জল ফুটিয়ে খাচ্ছ তো? খুব সাবধান! জল ফুটিয়ে খাবে।'

রামকমলবাবু ইংরিজি এক-একটা শব্দের ওপর বলতেন, 'ম্যান: ম্যানলি, আনম্যানড, ম্যান ইজ মর্টাল তার মধ্যে উওম্যানও আছে, : দু মিনিটের একটা ঝর্ণা। প্রত্যেক দিন ক্লাস নেবার পর কুড়ি মিনিট এইরকম শব্দের নির্ঝর বয়ে যেত। এত আপনার লাগত ইংরিজি ভাষাটা। প্রত্যেক শব্দের ওজন একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠত। পরদিন কুড়ি নম্বরের পরীক্ষা নিতেন আলাদা করে। বেশির ভাগ ছেলেই ভালো করত। কারণ সবাই মজা পেত, আনন্দ পেত। এক চমৎকার অনুপ্রাণিত শাব্দিক খেলায় রামকমলবাবু নিজে মাততেন, অন্যকে মাতাতেন। তারপর শব্দের খেলা শেষ করে চোখ বন্ধ করে ব্রাহ্মসঙ্গীত গাইতেন। দু চোখের কোণ দিয়ে জল গড়াত।

অক্সফোর্ডে ডক্টর লিশম্যানের কাছে তিনি তাঁদের হেডমাস্টার রামকমল মুখার্জির কথা বলেছিলেন। বৃদ্ধ স্থিতধী লিশম্যান তাঁর লম্বা পাকা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, 'ইউ উইল নট ফাইণ্ড সাচ এ হেডমাস্টার ইন ইংল্যাণ্ড।'

তাই অহঙ্কার হবে না কেন? ভারতবর্ষ তখন স্বাধীন হচ্ছে। সেই সন্ত্রাসবাদীদের মরণজয়ী নিষ্ঠা, তিরিশ সালের আন্দোলন, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী

নৌ-বিদ্রোহের ফেটে পড়া আক্রোশ, তার পেছনে বাংলাদেশের উনবিংশ-শতাব্দীর চওড়া-চওড়া আত্মবিশ্বাসী মানুষগুলোর কর্ম কল্পনা এই সমস্ত মিলে-মিশে যদি নিজের জীবনটাকে এক দৃপ্ত এক্সপেরিমেণ্টে কেউ রূপান্তরিত না করে তাহলে তার মতো হতভাগ্য কে আছে?

'তাহলে আপনি আগে যা লিখেছেন বলেছেন সেই মতেই এখনও তো আপনি বিশ্বাসী। মাতৃভাষার ওপর জোর…আপনি তো সত্যেন বোসের সঙ্গে সেমিনারও করেছেন।' বয়স্ক রিপোর্টারের জিজ্ঞাসা।

ভদ্রলোক মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানান।

'তাহলে আমরা তাই লিখে দি', তরুণ রিপোর্টার বললে।

কাজের মেয়েটি চা দিয়ে গেল।

'আগে চা খান,' ভদ্রলোক বললেন।

আটচল্লিশ সাল আর আটাত্তর সাল...কি দুরন্ত জীবন বয়ে গেল সারা দেশ জুড়ে। রবি ঠাকুরের বাংলাদেশ একমাত্র তাঁর গানেই রয়ে গেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়াতেন তখন গোলাপ বাগান করেছিলেন। নিজেকে স্পষ্ট দেখতে পান, পাজামা গুটিয়ে বাগান নিড়চ্ছেন। এত কিছু যখন ওলোটপালট হয়ে গেল তখন অনেক ওপিনিয়নও তো ওলোটপালট। কি চমৎকার শব্দের খাঁচা! ওপিনিয়ন সার্ভে, যেন সার্ভেতে কিছু ধরা পড়ে, সার্ভেতে কিছু বোঝা যায়! আরও ব্যাপারটা জট পাকাবার জন্যেই তো এ সব চেষ্টা। সত্যের সেই জ্বলন্ত চেহারা, দেশকাল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আজ ধোঁয়াটে। আর সেই ধোঁয়ার মধ্যে পলিকে কাঁদতে দেখেন।

আমরা কি তোমার গিনিপিগ বাবা? আমাদেরই ওপর খালি এক্সপেরিমেণ্ট করে যাচ্ছ। দাদার তো কেরিয়ারটা নষ্ট করলে। আমাকেও একটা বাংলা স্কুলে দিলে। ইণ্টারভিউয়ে আমি কেন খারাপ করলাম? তোমার জন্যে। যে মেয়েটা চাকরি পেল সেই অরুন্ধতী একেবারে কাঁচা তার সাবজেক্টে। আমার কাছে আসত বুঝতে। ও পেয়ে গেল। ও ফড়ফড় করে ইংরিজি বলে গেল। আমি পারলাম না, আটকে গেল। আমাদের সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে দিলে তোমার ওই বাংলা-বাংলা করে।'

'এতেই জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল?'

'তা-ছাড়া কি! আমরা তো তোমার মতো ইণ্টেলেকচুয়াল হব না। আমরা সাধারণ লোক। আমরা সাধারণ ভ্যালুজ-এ বিশ্বেস করি। আমরা

একটা মোটাসোটা চাকরি-বাকরি করে সংসার করতে পারলেই যথেষ্ট মনে করি।'

অবশ্য পলি কিংবা তার দাদার জীবন ঠিক ব্যর্থ হয় নি। পলির দাদা এখন ক্যানাডায় ইঞ্জিনিয়ার, পলি পড়ায় কলেজে। কিন্তু বড্ড খেসারত দিতে হয়েছে। অনেক টাকা দিয়ে আলাদা ইংরিজি কোচিং-এর ব্যবস্থা করতে হয়েছে। প্রায় নাকে খত দেওয়ার মতো অবস্থা। স্বপ্নের ভারতবর্ষে ভারতীয় ভাষায় মানুষ গঠিত, উন্নত, চাকরি-বাকরি করে জীবনে প্রতিষ্ঠার সামান্য বাধা নেই। আর বাস্তবের ভারতবর্ষে দুটো শ্রেণী—ইংরিজি মিডিয়ম স্কুলে শিক্ষিতা অরুন্ধতী আর বাংলা মিডিয়ামের পলি। একজন ফড়ফড়ে আর একজন করুণ। তাছাড়া সাধারণ স্কুলে ভাষা শিক্ষা কি ইংরিজি কি বাংলা—উঠে গিয়েছে। রামকমল মুখার্জিরা বিদায় নিয়েছেন দেশ থেকে।

অবশ্য পলি ভুল করে নি। সে তার মেয়ে রুনুকে একটা নামজাদা মিশনারি স্কুলে ঢুকিয়েছে। রুনুর বিদ্যালয়-প্রবেশও এক স্মরণীয় ঘটনা।

'বাবা চল, তুমিও চল। তুমি একজন ইণ্টেলেকচুয়াল সাহিত্যিক, তোমার দেখা দরকার চারপাশে কি ঘটছে।' মেয়ের কথায় প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ।

পলির অনুরোধে তিনিও গিয়েছিলেন তার সঙ্গে নাতনিকে নিয়ে। ঘটনা বটে। স্কুলের লাগোয়া প্রকাণ্ড মাঠে প্রায় হাজারখানেক মা-বাপ ঘামছে লম্বা কিউ-এ। তিরিশটা সিট। তিনঘণ্টা সাড়ে-তিনঘণ্টা মেয়ে-জামাই ঠায় দাঁড়িয়ে। তিনি একটা গাছতলায় বসে 'ছিন্নপত্রাবলী'-র পাতা উল্টোচ্ছিলেন।

সে-বছর হয় নি। কিন্তু পলি নাছোড়বান্দা। পরের বছর ঠিক হয়ে গেল। স্কুল প্রবেশের ছ' মাস আগে মাসে দু শ' টাকা মাইনেতে স্কুলের একজন বিশেষ টিচার রাখা হল রুনুর জন্যে। এবারে অসুবিধে হয় নি। সব প্রশ্নই রুনুর জানা। ফটাফট বললে, লিখলে।

এ লোকগুলো কেন এল? ভদ্রলোকের প্রৌঢ় চোখে বিরক্তি। মেজাজটা ছত্রাকার হয়ে গেল। মেজাজ বসাতে ফের সময় লাগবে। আবার পুজো সংখ্যার জন্যে কয়েকটা বায়না আছে। তিনি বাজারের লেখক নন। কিন্তু পুজোর সংখ্যায় লিখলে একটু বেশি টাকা পাওয়া যায়। তাছাড়া পুজোর সংখ্যা আর বাংলা সাহিত্য চর্চা এখন অনেকটা অবিভাজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা ইংরিজি পেপার ব্যাক পড়তে

অভ্যস্ত তারাও এসময় একটা ছুটো পুজোর সংখ্যা ঘাঁটে। কাগজে পুজোর সংখ্যা নিয়ে ফিচারের আইটেম বাড়ে।

'আমাদের ওপিনিয়ন সার্ভেতে আমরা গ্রামাঞ্চলও ইনক্লুড করেছি। আপনি অবাক হবেন শুনে একেবারে অজ পাড়াগাঁয়েও কিণ্ডারগার্টেন। ইংরিজি শুধু বড়লোকের ভাষা নয়। গরিব লোকেরও ভাষা। গরিব লোকের জীবনযুদ্ধে বলা যায় ইংরিজি একটা হাতিয়ার।'

'হয়তো তাই, হয়তো তাই।' ভদ্রলোক যান্ত্রিকভাবে মাথা নাড়ান।

তরুণ রিপোর্টারটি বললে, 'আমরা কোলিয়ারিতে গিয়েছিলাম সার্ভের জন্যে।'

হাল্কা বাদামি চোখে ভদ্রলোকের কৌতূহল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন আগন্তুকদের দিকে।

'আমাদের গেস্ট হাউসের জমাদারনি। তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে তেরশ টাকা রোজগার করে মাসে। জীবনে আর কোনো দুঃখ নাই। খালি একটাই দুঃখ। তার নাতনিকে আসানসোলে লরেটো স্কুলে ভর্তি করাতে চায়। ভালো আংরেজি না-শিখলে ভালো সাদি হবে না। আমাদের বললে, আমরা যদি সাহেব-সুবোদের বলি।'

'হ্যাঁ শিবুও···ভদ্রলোক গলা ছেড়ে কয়েকবার কাশলেন। যেন কাশি দিয়ে কথাটা উড়িয়ে দিতে চান। কানখাড়া তরুণটি বললে, 'একটা কেস হিস্ট্রী, না? আমরা এরকম কেস হিস্ট্রি কালেক্ট করছি। বলুন না। একটু হিউম্যান টাচের দরকার। নইলে বড্ড গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের মতো লাগে। শিবু কি আপনার জানাশোনা?'

শিবু শান্তিনিকেতনের কাছে ভুবনডাঙ্গার কুমোর। তার বাড়িতে চাক আছে। ছেলেমেয়েরা যখন ছোট ছিল তখন আমার স্ত্রী তাদের নিয়ে যেতেন শিবুর চাক-ঘোরানো দেখাতে। সেই শিবু খুব ভালো কারিগর। হাতের কাজ খুব ভালো। এখন সেরামিকের কাজ করে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের এক সংস্থায়। শিবুর ছেলে গাবলু। ভদ্রলোক চুপ করে যান। যেন এই গল্পের মাঝপথে ছেদ পড়াই সংগত।

'শিবুর ছেলে গাবলু?'

'শিবু চায় না গাবলু তার মতো কুমোর হবে। সে তাকে ঢুকিয়েছে সেণ্ট জেভিয়ার্সে। কী ভাবে ভগবান জানে। কেউ বলে স্কুল ফাণ্ডে টাকা দিয়েছে। সে সব আমি জানি না। গাবলু বেচারির অবস্থা

সঙ্গীন। ইংরিজিতে ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান মুখস্থ করতে করতে হয়রান। কিন্তু শিবু ছাড়বে না। সে অনেক টাকা খরচা করছে। বাড়িতে টিউটার রেখেছে। ছেলে মানুষ করছে।'

'গ্র্যাণ্ড! ঠিক আমাদের কোলিয়ারির জমাদারনির মতো। এক কেস! তাহলেই দেখুন। আপনি যা ভাবতেন তিরিশ বছর আগে, তা অনেক পাল্টে গেছে।'

'হয়তো তাই', ভদ্রলোক ক্লান্ত গলায় বললেন।

'তাহলে?'

'তাহলে আবার কী?' এবার বার্ধক্য তাঁর গলায় নড়বড় করে ওঠে। 'ভাষা কি একটা আলাদা জিনিস? ইংল্যাণ্ডে শতকরা আটটা ছেলেমেয়ে হায়ার এডুকেশনে যায়। তারা যা-পড়েছে ইস্কুলে তাই যথেষ্ট চাকরি-বাকরিতে যাওয়ার পক্ষে। সে-রকম অবস্থা আগে তৈরি করুন। আর তা যদি না করেন তাহলে সারা দেশ যেমন চেঁচাচ্ছে, আপনারাও যেমন চেঁচাচ্ছেন, আমিও তেমনি চেঁচাব—ইংরিজি, ইংরিজি, ইংরিজি!'

বোধহয় গলা চড়াবার জন্যে হাঁপিয়ে গিয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'লতা, সামনের দরজাটা খুলে দে। এ ভদ্রলোকেরা যাবেন।'

তারা দুজন বাইরে এসে গাড়িতে উঠবার আগে থমকে দাঁড়ায়।

'আরে বাবা, হ্যাঁ-কি-না পরিষ্কার করে বল না।'

'এত নাম-ডাক, কিন্তু কি-রকম যেন ডিসটর্ট।'

'হ্যাঁ, সেই বাংলার একটা কথা আছে না—উদ্ উদ্……

'উদ্‌ভ্রান্ত।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, উদ্‌ভ্রান্ত।'

গাড়ি স্টার্ট দেয়।

গোবিনভ

আশীষ বর্মন

বন্ধু-বান্ধবেই গণপতিকে গোবিনভে রূপান্তরিত করে। সেটা পঞ্চাশ দশকের কথা। একেবারে গোড়ার দিকে। গণপতি তার দু-এক বছর আগে থেকেই গনগনে ছাত্রনেতা ছিল, যদিচ তার ছাত্রাবস্থার খোঁজ আমাদের অজানা চিরকাল। বক্তৃতায় তো বটেই, এমন-কি আলোচনায়ও সে অহরহ কমরেড স্টালিন কমরেড স্ট্যালিন উক্তিতে প্রতিপক্ষকে তছনছ করে দিত। উদ্ধৃতিগুলো তাৎক্ষণিক যুক্তি-বুদ্ধিপ্রসূত এবং প্রায়শই তার নিজস্ব কেরামতিতে গড়া হলেও, তখন আমরা স্বতই কাবু হয়ে যেতুম। নিজেদের জ্ঞানের দৌড় ছিল আদর্শের উচ্চাশার তুলনায় নগণ্য, তাই ওকে নেতা মানায় কেউ বিশেষ রা কাড়ত না। ও অন্তত বাস্তবিকই একনিষ্ঠ পার্টিকর্মী ছিল, উপরন্তু দুঃসাহসী। তবু কে বা কারা, সম্ভবত কোনো যুক্তিতর্কের ঘূর্ণিপাকে হেরে গিয়ে, কিছুটা ব্যঙ্গ-তিক্ততার মেজাজে, ওকে নেপথ্যে গোবিনভ উচ্চারণে ডেকেছিল। তাতে হাসি ছড়ায়। ক্রমে সেই ডাকই পাকা হয়ে ওর সঙ্গ নিল। আর কয়েক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই, ওকে ওই ডাক ভিন্ন, স্বল্প লোকে চিনত।

বছর ছ-সাত গোবিনভ উদ্দাম রাজনীতিতে ছিল আকণ্ঠনিমজ্জিত। মার খাওয়া, জেলে যাওয়া, বোমা মারা, যায় রাজবন্দীদের আমরণ অনশনে জড়িত। ইতিমধ্যে আমরা কেউ-কেউ, ভালো-মাঝারি ছাত্ররা, সেই মূল উদ্দাম স্রোত থেকে কোনো ক্রমে গা বাঁচিয়েছি। এবং আদর্শের টানে আই-এ-এস বা আই-পি-এস পরীক্ষা দেওয়া, আত্মীয়-স্বজনের হেনস্তা সত্ত্বেও এড়িয়েছি বটে ; কিন্তু ব্যাঙ্কে, সওদাগরি অফিসে, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে,

খবরের কাগজে, এমন-কি সিনেমা-থিয়েটারেও কম-বেশি শিকড় গেড়েছি। নাম-ধামও হয়েছে কয়েকজনের। মোটামুটি মধ্যবিত্ত সাচ্ছল্যের মুখ দেখেছি অনেকেই। কিন্তু গোবিনদা আমাদের সংস্পর্শ ছাড়ে নি। আমরা যারা দিল্লি-বোম্বাই-লণ্ডন বা হার্বার্ডের স্থানে কলকাতাতেই করে-কর্মে আছি, গোবিনের হাতে তাদের নিস্তার নেই। অনাহুত সে আসে, যখন-তখন, অফিসে এবং বাড়িতে। অফিসে যদি বা বিভিন্ন ছুতোনাতায় তাঁকে এড়ানো সম্ভব, অন্তত থেকে-থেকে কিংবা, মন নেহাৎ গররাজী থাকলে, গৃহে তার গমনাগমন রোধ করা অসম্ভব।

কিছুকাল আগেই আবার ব্যাপারটা ঘটেছিল। অফিসে যাওয়ার তাড়ায় জুতোর ফিতে বাঁধছি এমন সময় বেল বাজল। জানলার আলসে থেকে পা নামিয়ে দরজাটা খুলতেই গোবিনদা ঢুকে পড়ল। বলল 'কি-রে, বেরুচ্ছিস্ তুই ?'

'বাঃ, আমার অফিস নেই !'

'ডুব দে ডুব দে, আজ।'

'তা হয় না।'

'কেন ?'

'বড্ড কাজ রে, চাপ আছে।'

'আরে, রাখ-রাখ…মানুষের শরীর তো… ।'

'তাতে কি ?'

'কলিক্ পেন হতে পারে…জ্বর… ।'

'হয় নি তো…ওসব আমার নেই।'

'করা। বলবি পেটব্যথা, দাস্ত·· ইয়ে… ।'

'সরি ভাই।' পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টায় আমি ডাকি, 'ছাখো সীমা, কে হাজির হয়েছে।'

সীমা বোধ হয় কথাবার্তার সাড়ায় এদিকে এগিয়ে আসছিল, এবার স্মিত মুখে বলে 'আসুন, ভিতরে আসুন গোবিনদা।'

'তোমার কর্ত্তা যে পালাচ্ছে গো !'

তাতে কি, আমার তো আর অফিস নেই, আমি আছি।'

'আমার যে ভাই দুজনকেই চাই।' গোবিন আমার হাত আগেই ধরে ছিল, এবার ফিরে সরাসরি চোখের মধ্যে তাকিয়ে বলল 'তোর কি না গেলেই নয় ?'

'যাওয়া উচিত…মিছিমিছি… ।'

ও বাধা দিল মাঝখানে। বলল 'ডুব দিলে চাকরি যাবে ?'

'তা কেন, তবে… ।'

'খুব যা-তা হবে, অসুবিধে ?'

'অসুবিধে তো বটেই।'

'যা জীবনেরই অঙ্গ!' গোবিন হাসে, বলে 'গুলি মার আজ সব।' ওর ভঙ্গিতে, উচ্চারণে হঠাৎ সীমা হেসে ফেলে। আমিও ভিতরে-ভিতরে নড়বড়ে হয়ে যাই। অফিস আর যাওয়া হয় না। মনে মনে উত্যক্ত বোধ করি, আবার অধরা শৈথিল্যও। আর ততক্ষণে গোবিন সীমাকে নিয়ে পড়েছে, তাকে বলে 'আমি কিন্তু খেয়ে যাব, সুন্দরী।'

'বেশ তো।'

'চান করব।'

'নিশ্চয়ই।'

'ছেঁড়া পা-জামা-পাঞ্জাবিও চাই…বদলাব।'

'গোটাই পাবেন…এবার আসুন দিকি।'

ওরা ভিতর দিকে রওনা দেয়। আমি আবার আলসেতে পা তুলে জুতোর ফিতে খুলি। মনে মনে ভাবি, যৌবনের কৃতকর্মের দণ্ড দিচ্ছি, আরো অনেক কাল সম্ভবত দিতে হবে। কেননা গোবিনভ এ-হেন হাভাতেই থেকে গেল। আমাদের ছোটখাটো মাঙ্গলিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ওকে নাগালে আনা গেল না। বছর-দেড়েক আগেই আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে রাসবিহারীর মোড়ে ওকে একটা ছোট পত্র-পত্রিকার স্টল করে দিয়েছিলুম। নিজেরা তো বটেই, এমন-কি চেনাজানা বহুজনকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে পারলে পত্র-পত্রিকা ওখান থেকেই যেন খরিদ করে। কিন্তু অচিরে দুটি জিনিস চোখে পড়ল। প্রথমত সে স্টলে বেশিরভাগ চালু পত্র-পত্রিকাই পাওয়া দুষ্কর এবং, দ্বিতীয়ত, গোবিনের এক বছর-পনের বয়েসের সহকারী, যার নাম হাবু। হাবু নাকি শুধু বেকার নয়, একটা সংসারেরও ভরসা। অগত্যা গোবিনভ কি করে, তাকে চল্লিশ টাকা হাত-খরচা আর কমিশনের আধাআধি বখরায় নিয়োগ করে ফেললে। তাতেও স্টল চলত কি চলত না সে তত্ত্ব অর্থনীতির পণ্ডিতরাই জানেন, কিন্তু সে-সম্ভাবনাও সুদূর হল প্রথম কারণে। অর্থাৎ বহু-বিক্রীত পত্র-পত্রিকার অভাবে। স্টলে সেগুলো থাকছে না কেন খোঁজ নিয়ে জানা গেল সেগুলো সবই হয় অপসংস্কৃতির

হাতিয়ার অথবা চালু ভাবাদর্শের বিষ। সে-বিষের বদলে গোবিনভ দোকান ভরিয়ে ফেললে সাম্যবাদী দুনিয়ার বাঙলায় অনূদিত পত্র-পত্রিকায়। এবং অতঃপর, মাস তিন-চার পর, সে হঠাৎ উধাও হল। সে নিরুদ্দিষ্ট হলেও স্টলটি তার পুষ্যি-পুত্র হাবু, হৈ-হৈ করে চালাতে থাকল। অনূদিত পুস্তিকাদি পিছনে কোথায় রাখা রইল, আর সামনে শোভা পেল ঠাসা চালু পত্র-পত্রিকা এবং এমন কি কিছু চকিতে-কাটতি বইও।

মাস-কয়েক পর আমাদের বন্ধু বুচু হতভাগাকে পথে পাকড়াও করে। চকিতে ডেকে ওঠে 'আরে! গোবিন না?'

'বাই জোব!' গোবিন থমকে দাঁড়ায়, উৎফুল্ল গলায় বলে 'ভাগ্যিশ তোর সঙ্গে দেখা হল, বুচু!'

'বাঃ, বেশ! আমরাই তো তোকে খুঁজে মরছি।'

'ফাইন! আমারও ভীষণ দরকার রে।'

'কিসের?'

'দশটা টাকার...দিবি এখন তুই?'

'হঠাৎ?'

'বড্ড ফ্যাকড়া বাড়িতে...হাঁড়ি চড়ছে না ভাই।'

'তোর দোকানের কি হল?' বুচু ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করেছিল।

'দোকান?'

'রাসবিহারীর স্টল।'

'ওঃ!' গোবিন হাসে মৃদু, বলে 'দুর, চলল না ওটা।'

'চলল না মানে।' বুচু বিরক্ত হয়েই বলেছিল 'দিব্যি ঝলমল করছে এখনো দেখি।'

'ওটা এখন হাবু চালায়...বেচারার অনেক ঝুঁকি।'

'কিন্তু স্টলটা তোকেই করে দেওয়া হয়েছিল, ওকে নয়।'

'আরে আমি ওকে দিয়ে দিলুম।' গোবিন অনায়াসে বলে 'দুটো সংসার কি চলে ওতে...তোরাই বল্?'

বুচু এক-নিমেষ হতবাক হয়ে গেছিল। সোজা তাকিয়েও থাকতে পারে নি গোবিনের মুক্ত, সপ্রশ্ন চাউনির ভিতরে। তার আচমকা কেমন অগোছালো লেগেছিল নিজেকে। এবং এই অনভ্যস্ত বিভ্রস্ততার মধ্যেই সে পার্স খুলে পাঁচ টাকার নোট বের করেছিল। সেটা এগিয়ে দিতে দিতে বলেছিল—

'পার্সে আর দুটি টাকা আছে রে।'

'এতেই হবে এখন, থ্যাঙ্কস্' গোবিন টাকা নিতে নিতে বলেছিল—

'মাসের তো শেষ এদিকে।'

'পরশু মাইনে পাব·· অফিসে বরং আসিস তুই।'

'দেখা যাবে।' গোবিন ওর হাতে চাপড় দিয়ে বলে 'চল তোকে চা খাওয়াই।'

'না রে আমার তাড়া আছে আজ।'

'তোদের সারা জীবনই তাড়া... ।'

'আসলে আমি হাসপাতালে যাচ্ছি।'

'সে কী! কেন?'

'এক কলিগ আছেন...ভয়ের কিছু নয়।'

'আচ্ছা তাহলে... ।'

'So long...আসিস তুই।'

'হ্যাঁ যাব...so long.'

পরে, বুচুর কাছে পুরো কাহিনীটা শুনে আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলুম। শংকর পাইপের সামান্য ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে প্রথম কথা কয়, বলে 'আসলে গোবিনের কোনো দায়িত্ববোধ হল না।'

'তাই কি?' কল্যাণ জিগ্যেস করে, বলে 'আমার সব গুলিয়ে যায়।'

'আমি ব্রডার সেন্সে বলছি', পাইপটা মুখ থেকে বের করে শংকর বলে, 'Sense of responsibility in its social dimensions.'

'কি জানি।' কল্যাণ বলে 'আমার তো মনে হয় ওর সামাজিক দায়িত্ববোধটুকুই আছে, নিজস্ব চিন্তা নেই।'

'যা বলেছিস'। বুচু বলে 'আসলে বোধ হয় ওর অতীত ওকে তাড়া করে।'

'সবারই ভাই অতীত আছে।' শংকর বলে 'কম-বেশি আমাদেরও একই রকম।'

আমার মুখে এসে গেছিল, কথাটা ঠিক না। আমরা কেউ জলে নামি নি, ডাঙার কিনারায় দৌড়েছিলুম মাত্র, তাও অল্পকাল। পরে বুদ্ধি ও মননের চর্চা করেছি, পাশ থেকে। কিন্তু সে মুহূর্তে এ-সব কথা আমি উক্ত করি নি। বুচুই প্রসঙ্গত বলেছিল, 'কিন্তু সবাই ডিস্ওরিয়েন্টেড্ নয়।'

'আই সি।' শংকর বলেছিল 'তোর মতে গোবিন আধ পাগলা।'

'মনে তো হয়। আর কোনো ব্যাখ্যা পাই না।'

'ওকি এখনো রাজনীতি করে' কল্যাণ প্রশ্ন তোলে 'ডিরেক্টলি?'

'যোগাযোগ আছে বোধ হয়।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রেও গোবিন ব্যর্থ।'

'এরা নাটকের নগণ্য চরিত্র', শংকর বলে, 'জন্মাবধি ব্যর্থ।'

আমরা কেউ তৎক্ষণাৎ কিছু আর বলতে পারি নি। যদিও আমার কানে অভিব্যক্তিটুকু ক্রূর শুনিয়ে ছিল। সম্ভবত উক্তির সঙ্গে সঙ্গে শংকরের নিজেরও। কেননা কথাটা উচ্চারণের পরই সে পাইপের তামাক খোঁচাতে আরম্ভ করে নত নয়নে। আসলে আমরা গোবিনকে অভ্যস্ত ধারণা কিংবা বিচারের মানদণ্ডে মেপে ত্রাণ পাই না। সে অত্যন্ত কষ্টের সংসার তার মামাবাড়িতে আকৈশোর মানুষ, সে-গৃহে তার শয্যাশায়ী, পক্ষাঘাতে পঙ্গু বিধবা মা বর্তমান। তথাপি ব্যক্তিগত নিরাপত্তার চিন্তা ওর মনে আমরা আজও দেখিনি। এতে আমাদের শ্বাসরুদ্ধ অসহিষ্ণুতা কেমন বাড়ে থেকে-থেকে, তেমনি একান্ত নিভৃতিতে আমরা সবাই বোধহয় ওর সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ। অন্তত ওর সামনা-সামনি উপস্থিতি আমাদের বিনীত করে। অথচ সামাজিক সাফল্য-অসাফল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে যে গোবিন বিভিন্ন স্তরে ব্যর্থ এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমূল সমাজ-পরিবর্তনের প্রশ্ন আপাতত বাদ দিলেও, সে-প্রশ্নের বিচার ব্যক্তির কাল-সীমায় সম্ভব নয়, ঐতিহাসিক সময়ের পরিমাপ প্রয়োজন, এ-কথা মেনে নিলেও এটা অনস্বীকার্য যে ওর নিজস্ব স্বল্প পরিসরে কিছু হল না। ওকে জড়িয়ে আমাদের ছোটোখাটো কল্যাণকর প্রয়াসকেও গোবিন ব্যর্থ করেছে।

বছর আড়াই আগে একদা, পুজোর পূর্বে, আমরা ওকে শাড়ির ব্যবসার বুদ্ধি দিই। কেবল বুদ্ধিই নয়, খানিক আর্থিক-সাংগঠনিক সাহায্যও সেই সঙ্গে। গোটা তিরিশ-চল্লিশ চেনা-জানা ঘর, যারা পুজোর আগে সওদা করে, এবং হাজার ছয়েক টাকা। গোবিনও মহাউৎসাহে কাজে নামে। প্রথমে কাশ্মীরীদের মতো কাপড়ের গাঁঠরি নিজেই পিঠে বেঁধে ঘোরা আরম্ভ করে, কিন্তু আমরা তাতে হাঁ-হাঁ করে উঠি। ওর গ্যাসট্রিক আলসারে ও অর্ধভক্ষণে দড়ি-পাকানো, কোমর-ভাঙা শরীরে এহেন প্রয়াস আমরা শুরুতেই নাকচ করি। ওকে মোট বওয়ার লোক দেওয়া হয়। এবং প্রথম দু-মাসেই, আমাদের যৌথ হিসেবে, গোবিনের আট-শ টাকার উপর লাভ হয়। তাও সেটা তার খুচরো কিছু ধার-দেওয়া কাপড়ের হিসেব

না ধরে। কেননা তার বেনেটোলা লেন থেকে বেরনো, উচ্ছিষ্ট, ফ্যানা ও গয়ার ছড়ানো তিনফুটি গলির কিছু বৌ-ঝি নাকি শাড়ির টাকা তখনো শোধ দেয় নি। আমাদের ঈষৎ বিরক্তি দেখে ও তাড়াতাড়ি বলেছিল 'ওদের বড় অভাব রে।'

'আর তোর নিজের ?'

'আমি তো ক্যাপিটালিস্ট হয়ে যাচ্ছি...।'

'তোর দ্বারা কিছু হবে না,' বুচু বলেছিল, 'হোপ্‌লেস ফেলো !'

'কেন শুনি ?'

'ব্যবসার বারোটা বাজাবি···ব্যবসা দাতব্য-ডিস্‌পেন্‌সরি নয়।'

'রাখ্‌-রাখ্‌। ও সব টাকা তো আর মার যাবে না, পেতে দেরি হচ্ছে···।'

'তোর আড়তদার-মহাজন সে-কথা শুনবে ?'

'ওদের আমি তেশটি মারছি, দাঁড়া না।'

তখন গোবিনের চোখ মুখ জ্বল জ্বল করছে। এবং যদিও খোঁচাখোঁচা দাড়ি-গোঁফে তার শীর্ণ, ভাঙা মুখ ভর্তি, খড়ি-ওঠা পায়ে ধুলো ও ছেঁড়া চটি, শরীর ন্যুব্জ ও হাড্ডিসার, তবু সে হাসে রাজকীয় আত্মপ্রত্যয়ে। সে প্রত্যয়ে আমরাও নাড়া পাই। নিরুক্ত সে-বোধ, কিছুটা ছাত্রাবস্থায় ওর বক্তৃতা শোনার তুল্য। এ-মুহূর্তে অবশ্য আমরা উত্তেজিত হইনি, হয়েছিলুম অল্প-আশ্বস্ত। ভেবেছিলুম ওর এই আত্মবিশ্বাসের উৎসে আছে একাধারে আট-শ টাকা লাভের প্রেরণা ও এ-ব্যবসার অন্ধি-সন্ধি টের পাওয়ার নিশ্চিতি। কিন্তু গোবিনের পরের কথায় কেমন হঠাৎ দ্বিধা জাগে। সে গল্পচ্ছলে বলেছিল,

'মহাজন-আড়তদারগুলো, জানিস, এক-একটা স্কাউন্‌ড্রেল।'

'সে আর বল্‌তে।'

'শালাদের ব্যবস্থা করা দরকার।'

'সর্বনাশ !' শংকর তাড়াতাড়ি বলে, 'তুই কী ভাবছিস বল তো ?'

'না না ভয়ের কিছু নয়,' গোবিন তার শুদ্ধ, অনাবিল হাসিতে মুখ ভর্তি করে বলেছিল, 'আমি এবার সিধে তাঁতিদের কাছ থেকেই কাপড় কিন্‌ব।'

'ব্যবস্থা করেছিস্‌ ?'

'হচ্ছে ভাই হচ্ছে।'

'এটা ভালো প্ল্যান', কল্যাণ বলেছিল 'এতে তোর মার্জিন বেশি থাকবে।'

গোবিন মুখটিপে হেসেছিল শুধু, ছোট্টো করে বলেছিল 'তাঁতিদেরও।'

এই তাঁতিরাই সেবার ওর কাল হল। অথবা তাঁতিদের অবস্থা। মাস-চারেক গোবিন বেশ ভালো ব্যবসা করেছিল, স্বল্প সংগতিতে যতটা সম্ভব। ওর চেনাশুনো ঘরও বেড়েছিল বেশ, যেখানে শাড়ির সঙ্গে তাঁতের ধুতিও বিকোতে শুরু হয়। মাঝে মাঝে এমন-কি ওর নিজের পরনেও ধোয়া ধুতি-জামা উঠতে আরম্ভ করে। অবশ্য এর মধ্যে যখন ওর চোখের তলার কালি মনে হয়েছে অতিরিক্ত, মাজা বেশি ভাঙা, তখন কিছু প্রশ্ন করলেই সে বলত ও কিছু নয়। খামোখা আল্‌সারের ঝামেলাটা যন্ত্রণা দিচ্ছে থেকে-থেকে।

অথচ এ-মাসগুলি ভালোভাবে পেরতে না-পেরতেই গোবিন আবার বেপাত্তা হল। গোড়ায় আমরা টের পাইনি, কিন্তু চেনাজানা তার বিভিন্ন ক্রেতা মহল থেকে আমাদের কাছে তাড়া আসায়, শেষ পর্যন্ত সন্ধানে জানা গেল যে, সে তাঁতি সামলাতে ব্যস্ত, কলকাতার বাইরে। অর্থাৎ মহাজন আড়তদারদের ঋণ-দাদন এবং বিক্রি ব্যবস্থার হাত থেকে তাঁতিদের রক্ষা করার সংগঠন গড়ছে। কো-অপারেটিভ, ব্যাঙ্ক লোন, মার্কেটিং সোসাইটি ইত্যাদি কথা কানে এল। বুচু সব শুনে বলেছিল 'আমি আগেই জান্‌তুম···প্রিমোনিশান।'

'আই ওয়ার্নড হিম', শংকর বলে, 'সর্বনাশের কথা আমিই ওকে বলেছিলুম। বৃথা!'

মাস তিনেক পর আমরা সবাই হাসপাতালে দৌড়াই গোবিনের খবরে। তার তখন আল্‌সারের মারাত্মক অবস্থা। এমার্জেন্সি অপারেশন করে কোনোক্রমে বেঁচেছে। শরীরটা বিছানায় প্রায় বিলীন। আমাদের দেখে ও পাতলা, শ্রান্ত হেসেছিল। তক্ষুণি কিছু বলেনি, আমাদের নির্নিমেষ দেখছিল রুগ্ন-পাণ্ডুর চোখে। যে-দৃষ্টির দীপ্তি গত, কিন্তু তা চিন্তায় সজ্ঞান। ওর দিকে তাকিয়ে থেকে, এই স্তব্ধ মুহূর্তে, আমার ভিতরটা কেমন মুচড়ে ওঠে। অন্যেরাও নির্বাক। কল্যাণ টিনের দুধ, বিস্কুটের প্যাকেট, ফল ওর খাটের পাশের সিট-শেল্‌ফের উপর রাখে। গোবিন চুপচাপ দেখে সব, তারপর কল্যাণ ঘাড় সোজা করে মাথা তুললে সে ক্ষীণকণ্ঠে বলে

'পারলুম না শালাদের সঙ্গে, বুঝলি—।'

'আচ্ছা, পরে বলিস কথা।'

'আর পরে! তাঁতিরা দেনা-দাদন বিক্রি-পাটার প্যাঁচে ওদের স্লেভ হয়ে আছে।'

'প্লীজ!' শংকর ওর কপালে হাত দিয়ে বলে, 'তুই সেরে ওঠ আগে।'

'এবার সেরে যাব, ভয় কি!'

'গায়ে জোর হোক···কথা তখন হবে।'

'জোর থাকলে কি ব্যাটারা নিস্তার পেত?' গোবিন ম্লান হাসে, বলে 'এক বছর সময় পেলে দেখিয়ে দিতুম।'

আমরা আর কথা বাড়াই না। গোবিনের পক্ষেও আর চেয়ে থাকা সম্ভব হয় নি। সে মলিন হেসে, শংকরের হাতে হাত রেখে চোখ বোঁজে, অস্ফুট স্বরে বলে 'ঘুম পাচ্ছে।'

আমরা অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এসেছিলুম।

সে-দিন আমার অফিস যাওয়াটা ভণ্ডুল করে দিয়ে গোবিন গোড়ায় মহা মেজাজে ছিল। বলেছিল 'তোদের এবার ভাল আপেল খাওয়াব।'

সীমা হেসে ফেলেছিল, অতঃপর সামনে বলে 'হঠাৎ আপেল কেন?'

'হুঁ-হুঁ, আছে-আছে...সিক্রেট।'

'বলুন-ই না ছাই কী ব্যাপার?'

'কুলু যাচ্ছি, শিগ্‌গির।'

'কুলু?' আমি আর চুপ করে থাকতে পারিনি, বলি 'আবার কি ভূত চাগল?'

গোবিন মৃদু হেসেছিল। আমার কথা কানেই নেয় নি। ওর বিশীর্ণ চোখমুখ তখন কৌতুকে ভরা। আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল 'আমাকে তো তোরা ফেলিওর ভাবিস, আজীবন···এবার দেখবি!'

'হেঁয়ালি ছাড় দিকি,' আমি বলি 'আমরা তোর ভালোই চাই।'

'আই নো ছাট,' গোবিন বলে, 'সে-জন্যই তো খবর দিতে এলুম।'

'বল তাহলে ব্যাপার কি।'

'এবার ফলের লাইন নিচ্ছি, ম্যানুফ্যাক্‌চারিং।'

'ফল ম্যানুফ্যাক্‌চারিং!'

গোবিন নিজের রসিকতায় নিজেই প্রাণ খুলে হাসে, বলে 'দেখলে সীমা, তোমার স্মার্ট সাহেব বোকা বনে গেল!'

'শুধু সাহেব কেন গোবিনদা', সীমা হাসে, বলে, 'আমিও কিচ্ছু বুঝি নি।'

'তাহলে শোনো', গোবিনের আত্মপ্রসাদ তখন স্পষ্ট, সে আমার দিকে এবার তাকিয়ে বলে, 'শিবু গাঙ্গুলির নাম শুনেছিস?'

'না। তিনি কিনি?'

'বুড়ো মানুষ। টেররিস্ট আমলে অনুশীলন পার্টি করতেন...দেশের কোনো খবরই তো রাখিস না!'

'ঘাট মানছি ভাই।'

'তা শিবুবাবু অনেককাল হল ফলের ব্যবসা করেন। লিজ নেন ফলের বাগান, কুলুতে আপেলের, নাগপুরে কমলালেবুর ইত্যাদি।'

'বোঝা গেল। তারপর?'

'নিজে আর ভালো দেখতে পারেন না, অনেক দৌড়-ঝাঁপ দরকার...তাই আমায় পার্টনার করেছেন।'

'বাঃ!' সীমা হঠাৎ সোৎসাহে বলে ওঠে, 'কী ভালো হলো না!'

'Exactly.'

'আমরা কুলুতে বেড়াতে যেতে পারব তো?'

'নিশ্চয়ই। তোমরা আমার গেস্ট হবে...য্যাদ্দিন পর!'

'চিয়ার্স...কী খাবেন বলুন আজ?'

'দাঁড়াও, আগে চানটা সারি বাপু।' গোবিন হাসে, বলে, 'তাছাড়া আমার পেটের ব্যাপার তো জানোই তুমি।'

'ছোটো-ছোটো পারসে আছে, পাতলা ঝোল বানাই আপনার?'

'চমৎকার!'

'দই খাবেন তো...বাড়িতে পাতা?'

'হাপুস-হুপুস করে...সামলাতে পারবে?'

'খু-উ-উ-ব!'

সীমা তখুনি উঠে দাঁড়ায়, বলে 'আপনারা সারতে-সারতে সব রেডি থাকবে।'

ও রান্নার জোগাড়ে যায়। মূলত সেটা তদারকি বুঝিয়ে ব্যবস্থা দেওয়া। এবং সে উঠলে গোবিনও দাঁড়িয়ে পড়ে। শুকতো তোবড়ানো গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, 'দাঁড়িটা কামানো উচিত বোধহয়, না-রে?'

'আমার তো তাই মনে হয়', আমি বলি।

'এ জামা-কাপড়ও ছাড়ব ভাবছি।'

'বাথরুমে সব রেখে দিয়েছে।' আমি ওর নানা দিকে গিঁট দেওয়া পাঞ্জাবি ও নোংরা ছিন্ন পাজামার দিকে চেয়ে থেকে বলি—

'ওগুলো স্নানের ঘরেই ছেড়ে আসিস।'

'হ্যাঁ, সীমা বলেছে।' গোবিন যেতে যেতে বলে, 'কাচিয়ে রাখবে।'

ও-বস্ত্র কাচার পর রাখার কিছু থাকবে কিনা আমার সন্দেহ; কিন্তু সে-সংশয় আমি ব্যক্ত করি নি। কেননা তেমন প্রশ্ন ওর মনে ঢুকলে সম্ভবত এই জামাকাপড় পরনেই গোবিন স্নান সেরে বেরিয়ে আসবে। নিজের গায়ের সঙ্গে সাপ্‌টে থাকা কাঁথা-কানি সম্বন্ধে ওর গভীর মায়া, বহুকালের। ফেলে দিতে বললে বলে, "দুস্‌, কদ্দিন চলবে আরো!"

সে-দিন অবশ্য স্নান সেরে গোবিন আমার ফরসা পাজামা-পাঞ্জাবি পরনে বেরোয়। এগিয়ে আসে এক গাল হাসি নিয়ে, অনেকটা শিশুর মত সদ্য-ধৌত ও নিষ্পাপ, উৎফুল্ল হালকা গলায় বলে—

'দারুণ ফ্রেশ লাগছে-রে, অনেক কাল পর!'

আমি ঈষৎ হাঁ করে তাকিয়ে থাকি, বলি 'তা চুল আঁচড়াসনি কেন?'

'সীমার ভুলে।'

'ভুলে?'

'বাথরুমে তেল দিতে খেয়াল নেই।'

'ব্রিল ক্রীম আছে তো, পাসনি?'

'ক্রীম-ফ্রীমে হবে না, ও সরষের তেল রাখে।'

'সরষের তেল!'

'পেলে আমি তাই মাখি, চিরকাল।...তুই যা সেরে নে।'

গোবিন রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। নিশ্চয়ই তেলের তাগিদে সীমার খোঁজে। আমিও উঠে আবার স্নানে যাই। যা গরম, চৌবাচ্চায় ডুবে থাকতে পারলেই ভালো হয়।

স্নানের ঘরের মধ্যিখানেই দেখি ওর জঞ্জাল ডাঁই করে রাখা। নোংরা জামাকাপড়গুলো যে অন্তত একপাশে ঠেলে রাখবে সে-খেয়ালও গোবিনের নেই। আমার ত্যক্ত লাগে, পা দিয়ে ওর ছাড়া কাপড় কোণে সেঁধিয়ে দিই। বেসিনের দিকে চোখ গেলে নজরে পড়ে আমার শেভিং-এর সরঞ্জাম, ফেনা ও কামানো দাড়ির গ্যাঁজলা-সমেত, প্লাস্টিকের পাত্রে উপচে পড়ে আছে। তারই পাশে আধ-শুকনো, শেভিং ক্রিমের বুড়বুড়ি-ওঠা কিছু বৃহৎ দাড়ির শুঁয়ো জড়ানো বুরুশটাও দণ্ডায়মান। সেটা প্লাস্টিকের পাত্রে ঢুকিয়েও রাখেনি। এ-সব দেখেই আমার চাপা ক্ষোভ জাগে, কিছুটা অসন্তোষ মেশানো। গোবিনের এই অগোছালো নোংরামি আর গেল না। ব্যক্তিগত জীবনে ওর কোনো বিন্যাস নেই; নেই সাধারণ মনোযোগ অথবা যত্ন। নিজের ডেরাতে যেমন বিস্রস্ত, ছন্নছাড়া,

অন্যত্রও তার ব্যতিক্রম ঘটে না। বিরক্ত মনেই তাই বেসিনের কল জোরে খুলে দিয়ে গ্যাঁজলা-শুদ্ধু প্লাস্টিকের পাত্র ও বুরুশটা তার তলায় ফেলে রাখি। ওগুলো ধুয়ে এলে পরিষ্কার করা সহজ।

আমি যখন স্নান থেকে বেরোলুম তখন খাওয়ার টেবিলে মোটামুটি সাজানো শেষ। গোবিন সেখানে বসেই গল্প করছে। মাথা দেখে মালুম হল যে সরষের তেলও জুটেছে, সুতরাং চুলটি পরিপাটি করে আঁচড়ানো।

খাওয়ার সময় ওর সোচ্চার উৎসাহ দেখার মতো। সত্যিই সশব্দে খায় সে, খেতে খেতে বলে, 'মাছের ঝোলটা অমৃত করেছ, গো।'

'আরো আছে', 'সীমা বলে 'দেবো কিন্তু ফের।'

'দাও-দাও। মোর দ্য মেরিয়ার।'

'খান-না দেখি, কত দৌড়।'

'খাব-খাব…কিন্তু ওদিকে ওটা কী?'

সীমা চকিতে আমার দিকে তাকায়। আমি বলি 'মাংস।'

'আমায় দেবে না?' গোবিন সীমার দিকে তাকায়, বলে 'বড্ড দূরে রেখেছ যে!'

'ওটা খাবেন আপনি?' সীমা ঈষৎ বিব্রত হয়, বলে 'ইয়ে কিনা।'

'বাঃ, খাব না!'

'মাংসটা কিন্তু বড্ড রিচ' আমি বাধা দিয়ে বলি 'তোর কি খাওয়া উচিত?'

'আরে যা-যা, 'গোবিন বলে, 'আমি সব খাই, যা পাই।'

'তবু ভ্যাখ ভেবে।'

'ইয়েস, দেখা হ্যায় সব কুছ্…এ-ভোজ আমি ছাড়ছিনে।'

অর্থাৎ গোবিন বারণ শুনল না। সীমার মুখেও তখন ছড়ানো মায়া, অনুকম্পায়ী কোমল আভা। অগত্যা আমি চুপ করে যাই। ভাবি, বাইরে তো কতই ছাইভস্ম গিলছে প্রত্যহ, ওকে আর কে আটকাবে। খেয়ে নিক যা চায়, আবার কবে আসবে কি আসবে না। আমি যতক্ষণ এই সব ভাবি গোবিন ততক্ষণ মহানন্দে, সপ্রশংস ধ্বনি তুলে, খেতে থাকে। বলে 'ক'দ্দিন যে এমন খাইনি, সত্যি সীমা!'

আহারান্তে অনেকক্ষণ আমরা গল্প করেছিলুম। সিগারেট টানি এবং ফলের কারবার কত ভিন্ন ধরনের সে-বৃত্তান্ত শুনি। শেষে

গোবিন আমাদের বিশ্রাম দেওয়ার অজুহাতে পাশের ঘরে গিয়ে শুয়েছিল। আমরাও শোবার ঘরে গা এলাই। কিন্তু দিবা-নিদ্রা আসার আগেই মনে হয় ওর ঘর থেকে গোঙানির আওয়াজ আসছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখি গোবিন যন্ত্রণায় বিছানার চাদর আঁকড়ে ধরেছে, মাথার বালিশ চেপেছে পেটে। আর কোনো দৃকপাত বিনা আমি সোজা কল্যাণকে ফোন করি। দেখতে দেখতে কল্যাণ তার ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে হাজির হয়। দ্রুত ইনজেকশান দেয়। দিয়ে বলে 'অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বে। সন্ধ্যেবেলা আমি ফের আসছি…দরকারে জানাস তুই।'

'কী বুঝলি ?'

'বোঝার কিছু নেই। ওর পেটটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে…হঠাৎ মরবে।'

'এখন ?'

'দেখি। তেমন বুঝলে হাসপাতালে নিয়ে যাব।'

পাঁচটা নাগাদ কল্যাণ নিজে থেকেই ফোন করেছিল, খোঁজ নেয় 'রুগীর হাল কি-রকম ?'

'ঘুমুচ্ছেন।' সীমা বলে।

'গোঙাচ্ছে না তো ?'

'না, খুব শান্ত আছেন।'

'বেশ, ঘুমুতে দাও।' কল্যাণ বলে 'ফ্ল্যাস্কে দুধ গরম করে রেখো।'

'আচ্ছা।'

'অন্য কিছু খেতে দেবো না।'

'না-না।'

'অবশ্য অ্যাট্ অল কিছু নাও খেতে পারে…আমি সাতটা নাগাদ যাব।'

সাতটার মধ্যে ওরা সবাই এসে গেছিল। বুচু আর শংকর আসে আগেই। এসে সন্তর্পণে গোবিনকে গিয়ে দেখেও এল ওরা। ফিরে এসে শংকর বলেছিল 'অদ্ভুত পিসফুলি ঘুমোচ্ছে…মুখে কোনো স্ট্রেন নেই।'

'পেন-কিলার দিয়েছে বোধহয়।' বুচু বলে।

'উপায় কি। But he looks serene, even happy.'

'সত্যি, আশ্চর্য !'

আটটা নাগাদ, কল্যাণ পৌঁছানোর খানিক পরে, গোবিন উঠেছিল। আমরা কেউ টের পাইনি। সে নিজেই চোখে মুখে জল দিয়ে ঘর থেকে

বেরিয়ে এসেছিল। মুখে ছিল নিস্তেজ, আলগা হাসি। বলেছিল 'বড্ড তোদের জ্বালালুম, না-রে?'

'তোর এখন লাগছে কেমন তাই বল?' কল্যাণ বলে 'উইক?'

'ও কিছু নয়', গোবিন বলে, 'ভালো আছি।'

'তোকে আমি পৌঁছে দেব।'

'না-না, কেন মিছিমিছি হাঙ্গাম!'

'তাহলে আমার ড্রাইভার দেবে। You are not going alone.'

কল্যাণের ডাক্তারি সিদ্ধান্ত বলেই সম্ভবত গোবিন কথাটা মেনে নিয়েছিল। কিংবা হয় তো ওর শরীরেও আর নিচ্ছিল না। তবু ও উঠে সীমার সঙ্গে ভিতরের ঘরে গেছিল। ক্ষণকাল সেখানে ছিল দু-জনে, টুকরো-টাকরা শব্দ ভেসে আসছিল বাইরে। আমরা কেমন থমথমে হয়ে ছিলুম, প্রায়-বাক্যহীন, মানসিক অশান্তিতে গাঁথা। অতঃপর যখন ঘর থেকে গোবিন বেরুল তখন তার বগলে কাগজের একটা মাঝারি প্যাকেট চাপা। আমার দিকে তাকিয়ে সে হাসে শীর্ণ, বলে 'তোর কিছু লোকসান যাচ্ছে ভাই'

'যাক্। এবার তুই চল্লি নাকি?'

'হ্যাঁ, মার শরীরটা খারাপ।'

আমরা সবাই, সীমাসহ, ওকে কল্যাণের গাড়িতে চড়িয়ে দিলুম। ও আমরা সবাই, বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে কল্যাণ স্বগতোক্তি করে; চাপা, একটা বড় নিশ্বাসের সঙ্গে বলে 'হয়ে এসেছে।'

'কী বলছিস?'

'He is on his way out.'

'এত সিরিয়স?'

'মনে হয় মেরে কেটে বছর খানিক আয়ু···আগে যাওয়াই সম্ভব।'

'আর যেভাবে কাটায়!' শংকর বলে।

'প্রিসাইস্‌লি।'

অতঃপর আমরা এসে গুম মেরে বসে থাকি। কথাবার্তা চালু হয় না; সবার চিন্তা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে এক গুমোট সম্ভাবনায়। সে স্তব্ধতা ভিতরে-ভিতরে অশান্তিতে দীর্ণ হয়। আমি তাই হঠাৎ সীমাকে খামোখা জিগ্যেস করেছিলুম 'গোবিন কি নিল সঙ্গে?'

'টাকা। তোমার একটা প্যান্ট-শার্ট।...আমি ব্লু পুলওভারটাও দিয়ে দিলুম।'

'পুলওভার ! বুচু বলে 'এই গরমে পুলওভার কেন ?'

'ও কুলু যাচ্ছে', আমি বলি 'ইদানিং নাকি ফলের ব্যবসা করছে।'

'ও লর্ড !'

ফের আমাদের কথার খেই হারিয়ে ছিল। অবান্তর শোনাবে না এমন কোনো অভিব্যক্তিই কারো মুখে আসে নি। এবং সেই অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ্যে, শুরু বিরতিতে, সীমা হঠাৎ যেন ছটফটিয়ে বলেছিল 'তোমাদের হুইস্কি দেব ?'

'আনো, please !'

পুনর্বার বহুকাল গোবিনের দর্শন মেলেনি। কানাঘুষো শুনেছিলুম সে হিল্লি-দিল্লি করছে। দিল্লি আর কলকাতার বৃহত্তম ফলের বাজারেই শুধু ঘোরে না, কাছেপিঠেও কি কাজে নাকি ব্যস্ত। তার মধ্যেই একদা শংকরের ওখানে ঝড়ের মত এসে, ততোধিক দ্রুত বিদায় নিয়েছিল। বলেছিল রদ্দি নিয়ে খুব উত্যক্ত আছে।

'রদ্দি ?' শংকর জিগ্যেস করে।

'পুরনো কাগজ-রে...ফলের প্যাকিং-এ লাগে। হঠাৎ দাম বাড়িয়েছে।'

'তো তুই-কি করবি ?'

'এক সাপ্লায়ার পাকড়েছি...এই রাস্তাতেই।'

'কাজ হল ?'

'হ্যাঁ...আপাতত।'

'তাহলে বস একটু।' শংকর বলে 'চা আনছে।'

'না-রে, এক্ষুণি বিবিগঞ্জে দৌড়ুচ্ছি।'

'বিবিগঞ্জ ?'

'ওখানেও কাজ।' গোবিন শিশুর মত চোখ টেপে, বলে 'আমার যে দু-নৌকোয় পা !'

'সে কী !'

'ওখানে তাঁতিদের সমবায় করছি।'

'মাই গড ! গোবিন তুই মারা পড়বি রে...প্লীজ !'

'কী-যে ভাবিস তোরা !' ও যেতে যেতে হেসেছিল, ঘাড় ফিরিয়ে বলে যায় 'শিগ্‌গিরই আসব আবার।'

কিন্তু গোবিন আসে নি। শংকরের ওকে লেগেছিল ভীষণ কাহিল, পর্যুদস্ত। মনের দিক থেকে কিংবা কথায় বা ব্যবহারে নয়, শারীরিকভাবে।

অকস্মাৎ আমারই কাছে ওর মামার পোস্টকার্ড এল। মামাবাড়িতেই গোবিন আকৈশোর মানুষ। পঙ্গু, বিধবা মা-সহ আজ চল্লিশ বছর অন্তত সেখানে ওর বাস। কলেজে পড়াকালীন আমরা বার দুই আধো-অাঁধার, তিন-ফুটি সংকীর্ণতম গলির নোনা-ধরা সেই বাড়িতে গেছি। ঠিক বাড়িতে নয়, বাড়ির গলিঘেঁষা একটি ঘরে। সে ঘরে গোবিন, তার মা এবং মামার এক কিশোর ছেলে থাকত, পাশের ঘরে মামার পুরো, অগোছালো সংসার। তখন অবশ্য গোবিনের মা পক্ষাঘাতে পঙ্গু নন, কর্মঠ। সে অন্তত কুড়ি বছর আগের কথা, এখন শুধু ওঁর জ্বলজ্বলে চোখের কথা মনে আছে আমার, অন্য স্মৃতি ধূসর।

পোস্টকার্ডে গোবিনের মামা লিখেছিলেন: 'আপনাদের বন্ধু গণপতি অত্যন্ত অসুস্থ। আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে বড্ড ব্যাকুল হয়েছে। পারলে পত্রপাঠ সবাই আসবেন।'

আমরা আর বিলম্ব করি নি। বিকেলেই সকলে রওনা হয়ে গেছিলুম। শ-দুয়েক টাকাও সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। শংকর নিজেই তার গাড়ি চালায়, গম্ভীর। কেউই বাক্যালাপ করতে পারি নি। বেনেটোলার ভিতরে, গোবিনের গলির মুখে, গাড়ি লক করে, আমরা একজনের পিছনে আর একজন পর পর সারি বেঁধে, উচ্ছিষ্ট ফেনা ডিঙিয়ে, হাঁটি। বিপরীত দিক দিয়ে কেউ এগিয়ে এলে সবাইকে দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে, জায়গা দিতে হচ্ছিল। অবশ্য ওদের বাড়ি অদূরে, পৌঁছতে দেরি হয় না। তখন আরো-কিছু লোকজন জমা হয়েছেন, সম্ভবত দলের, এবং প্রতিবেশী। তারই মধ্যে এক ভদ্রলোক ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে কাকে বলেন কথাটা, আমাদেরও কানে যায়। উনি আস্তেই বলেছিলেন, 'সব শেষ, বেচারা!'

'বিবিগঞ্জে ওর কো-অপারেটিভটা চালু হয়েছে।'

'সে খোঁজও পায় নি...আমরা আমরা আসার আগেই...।'

আমরা ওঁদের কাটিয়ে, স্যাঁতস্যাঁতে আঁধার ও শ্যাওলা মাখা প্যাসেজটা পেরিয়ে ঘরে উঁকি দিলুম। প্রথমটা কিছুই চোখে পড়ল না। মনে হল ব্যাপ্ত কালির অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বলছে কোথাও। পরে দৃষ্টি অভ্যস্ত হয়ে এলে, দু-পা আরো এগিয়ে আমরা দেখতে পাই মলিন তক্তপোষে মৃত গোবিন। তার মুখটা দেখায় উদাসীন কিন্তু যন্ত্রণাবিদ্ধ নয়। হয় তো একেই প্রশান্ত বলে, জানিনে।

ওর মামা পাশ থেকে নিচু স্বরে বলেছিলেন, 'একটু দেরি হয়ে গেল ভাই···ভোরেই সব শেষ।'

আমরা পাথর হয়ে রইলুম নিমেষকয়। শেষ কল্যাণই বোধহয় চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যায় প্রথম। তার পিছনে বুচু, বুচুর পকেটেই টাকাটা ছিল। শংকর যাওয়ার আগে আমার জামায় একটা মৃদু টান দিয়েছিল। এবং আমি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে, পা-বাড়ানোর ঠিক আগের মুহূর্তে, সেই ডাকটা কানে এল, যাতে আমাদের সমস্ত চৈতন্য ও অনুভূতি ধক করে ওঠে। ওর মার গলা আসে, 'শোনো বাবা।'

আমরা চমকে দেখি ঘরের এক কোণে, প্রায় অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়ে, মেঝেতে ছিন্ন বিছানায় শায়িত স্থাণু, পঙ্গু মা। বৃদ্ধা অপলক চেয়ে আছেন আর তাঁর দৃষ্টি, এই স্বল্প আলোতেও জ্বলজ্বল করছে চেতনায়। আমি আর শংকর আচ্ছন্ন, অবশ টানে ওর কাছে যাই, হাঁটু ভেঙে বসি সামনে। তিনি স্পষ্ট দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত নির্বাক তাকিয়ে থাকেন, তার পর ভাঙা গলায়, ফিসফিসিয়ে বলেন, 'গণই আমার একমাত্র সন্তান ছিল··· তোমাদের বন্ধু··।'

পাশে শংকর হঠাৎ গলায় মুচড়ে ওঠা বাষ্পের চাপে গোঙায়। আমি মুখ ফিরিয়ে নিই, ওঁর সামনে চোখের জল ফেলতে দ্বিধা হয়। উনি আবার বলেন 'ও তোমাদের কথা প্রায়ই বলত...তোমরা ভালো থেকো।' আমাদের অন্তরাত্মায় সে-মুহূর্তে হাহাকার ঝাপটে আসে, আমি আচমকা উঠে পড়ি, অস্ফুট বলি, 'আবার আসব।'

'এসো বাবা·· আমি উঠতে পারি নে।'

খুবলাল এবং তার ক্রাউড

কবিতা সিংহ

আকাশের পেটের ভিতর, কোনো গোপন খাঁজ-খোঁজে হঠাৎ গুড়-গুড় গুড়-গুড় একটা শব্দ হল। খুবলাল কান পেতে শব্দটা শুনল। শুনেই ভিতর-ভিতর ঊর্ধ্বাহু হয়ে হৈ-হৈ করে নাচল। আবার একটা চোখ রাখল স্টুডিও-র গেটেও। কোথায় কী? গোবিন্দর চিহ্নই নেই। তার ক্রাউডেরও না।

এদিকে আকাশের পশ্চিম কোণের সেই কালো রুমালের মতো গণ্ডগুলে মেঘটা ফরফর করে বেড়ে উঠে সারা আকাশ ছড়িয়ে, ছেয়ে ফেলছে।

টপ করে একটা বড় ফোঁটা খুবলালের নাকের ওপর পড়তেই খুবলাল বলে উঠল—জয় হনুমান জী কি! হঠাৎ খচ্ করে বুকের পুরনো ব্যথাটায় একটু লাগল খুবলালের। কিন্তু সে আমল দিল না। একটা ছুঁচো বাজির মতো, মুখের বিড়িটা মাটিতে আছড়ে ফেলে দাঁতে দাঁত চেপে কেবল ঠোঁট নেড়ে অস্ফুট বিড়বিড় করল খুবলাল, 'শালা নতুন ডিরেকটর হয়েছে, শালা! ভেবেছে কী, হামাকে ছাড়া ফেরেশ্ ক্রাউড আনবে। ক্রাউড আনবে। এতো শোস্তা আছে। আমিই শালা তুমাদের ডিরেকটর থেকে ফের ক্রাউডে ঢুকিয়ে দিব। পথের ভিখারি বানিয়ে দিব তুমাদের।'

তিন নম্বর ফ্লোরের দরজার সামনে এসে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চারিদিক দেখছে ডিরেকটরবাবুর চামচা দুটো। আর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে।

আর কি তাকাবে? আকাশের এখন এমন রঙ যে স্টুডিও-র বাগ-বাগিচার সবুজও কেমন যেন পাঁশুটে বনে গেছে।

খুবলাল এখন ডিরেকটর মদন হালদারের মুখটাকে মড়ার মাথার মতো পাঁশুটে দেখতে চায়। শালা বড্ড কপচেছিল।

জয় হনুমান জী কি!

মদন হালদার নিজেই বেরিয়ে এলো এবার। খুবলাল বটগাছের গুঁড়ির ভাঁজে এমন ভাবে সেঁটে বসেছে যে তাকে ঠাহর হয় না। মদন হালদার-ও তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। মদন হালদারের সঙ্গে সঙ্গে ওলট-পালট হাওয়ার কোলে চড়ে এক ঝলক ঝড়ও এল।

মদন হালদার আর তার চামচারা মাথা জড়ো করে কি সব বলাবলি করছে।

করবেই ত। খুবলাল খবর নিয়েছে। ভিতরে শট্ দিচ্ছে টপ হিরো লালুবাবু আর চালিয়াত হিরোয়িন হুটুদি। দু-জনেরই গাড়ি স্টুডিও-র ভিতরে দাঁড় করানো আছে। আজকের শেষ শট ক্রাউড সিনের। এবং মদন হালদারকে একটা এ্যাসিসট্যাণ্ট ডিরেকটরের শালা গোবিন্দ ভজিয়েছে—সে ক্রাউড্ আনবে। খুবলালের ওই এক ক্রাউড। অর্ডার দিলেই হাজির করবে তাদের। বছরের পর বছর ওই একই ক্রাউড দেখে যাচ্ছে বাংলা সিনেমার দর্শক। মুখগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে তাদের। খুবলালের ক্রাউড দিয়ে এ-ছবির কাজ চলবে না। বিগ-বাজেটের রঙিন ছবি। এখানে খুবলালের ক্রাউড পাথরদুর্গের দেউড়ি মড়মড় করে ভেঙে ঢুকলে পাবলিক হেসে উঠবে। খুবলালের একটর সব রোগা সরু বাচ্চা। গাঁট্টা-গোঁট্টা, বোল্ড, বিপ্লবী-বিপ্লবী চেহারা কোথায়? মদন হালদারের নাকি তেমনই রিকোয়ারমেণ্ট।

খুবলাল বোঝাতে পারে না ক্রাউড মানেই ক্রাউড। ক্রাউডের কোনো আলাদা মুখ হয় না। কতকগুলো হাত-পা-বুক-কোমর-মুখের একটা চটকানো পিছলানো ব্যাপার। খুবলাল বোঝাতে পারে না ক্রাউড কখনো বাসি হয় না। কারণ সত্যিকারের ক্রাউডের মুখ আলাদা করে মনে থাকার কোনো ব্যাপারই ঘটে না। ক্রাউডে যে-সব মুখ একবার অন্তত আলাদা হয়ে ফুটে ওঠে তারা আর ক্রাউড থাকে না। বলতে গেলে লালুবাবু তো একদিন ওই ক্রাউড সিনেই এসেছিল্। কলেজ পালিয়ে শুটিঙ দেখতে এসে খুবলালের হাত ধরেই ঢুকে পড়েছিল পতাকা হাতে একটা মিছিলের মধ্যে।

ওই মিছিলের 'রাশ' দেখতে দেখতেই তো ডিরেকটরের চোখ আটকে গেল লালুবাবুর দিকে। খুবলালের ক্রাউড ছেড়ে ওপরে চলে গেল লালুবাবু। তা লালুবাবু তার কদর করে। ক-দিন আগে একটা ইনটারভিউ দিচ্ছিল কাগজওয়ালাদের কাছে। তাতে খুবলালের গলা জড়িয়ে খুব কানিক মেরে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছিল লালুবাবু। ছবিটা ছাপা হবার পর খুবলাল দু-কপি কিনেছে। তলায় বাংলায় লেখা আছে—এই খুবলালই বিলাসকুমারকে প্রথম রূপালি পর্দায় আনেন। তাই খুবলাল বিশ্বাসই করে না যে ক্রাউড কোনোদিন পুরনো হতে পারে, বাসি হতে পারে। ক্রাউডে অনেক সময় অন্য জিনিস মিশে যায়। যেমন লালুবাবু মিশে গেছিল। মিশে গেলে কি হবে, ক্রাউড এমন জিনিস—এমন একটা জখমের মতো যে পুঁজের কায়দায় বের করে দেয় সেই সব মালকে। যাওনা বাবা, হিরো হও, হিরোয়িনভি হও। সাইড্ রোলভি কর। কিন্তু আর ক্রাউডে ফিরে এসো না।

তবু আসে। কেউ-কেউ আবার অনেক চেয়ে চেয়ে খুবলালের কাছেই এসে দাঁড়ায়। তাদের সবাইকে ভাগিয়ে দিতে পারে না খুবলাল। রাখে। ভাঙা নৌকো, এ্যাকসিডেন্ট-হওয়া গাড়ির মতো খুবলাল পেছন দিকে আড়ালে রাখে তাদের। পাইল করে রাখে তার আসল নির্ভেজাল ক্রাউডের সঙ্গে। তাই গোবিন্দ যখন ভারিক্কি মুখ করে বলেছিল, খুবলালের ক্রাউড বাসি, খুবলাল গোবিন্দর বোকামিতে কেবল খানিকটা হেসেই ছিল। তাও মনে মনে। গোবিন্দ বলেছিল, অনেক কমে ক্রাউড এনে দেবে। কোথা থেকে আনবে গোবিন্দ? গোবিন্দ কি ক্রাউডের রেটের খেয়াল রাখে? তবে গোবিন্দর শেষ পর্যন্ত কি অবস্থা হবে তা খুবলাল জানে বলেই তার আর খুব হাসি পেল। চালাকি নাকি? মুখে বলা সোজা, চারটে লোক একসঙ্গে জড়ো কর দেখি বাছাধন। জিব বেরিয়ে যাবে। পলিটিকাল বাবুরা পোস্টার মেরে মেরেও ভিড় জোগাড় করতে পারে না, লোকের ভালো করবে বলে ডাকলেও নিজের ভালো শুনতে আসে না—আর গোবিন্দ এখন কোথায় ক্রাউড ধরতে গেছে! খুবলালের ক্রাউড তো আশে পাশে ছড়ানো। গোবিন্দ তাদের কাছে যাবে না। তাদের নেবেও না। তবে কি গোবিন্দ বিলেত গেছে?

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল ইতিমধ্যে। একেবারে ঝমাঝম। জয় পবন পুত্তর—জয় হনুমানজীকে। খুবলাল যেন চোখের সামনে দেখতো পেল টালিনালার

ওপর আলিপুর থেকে কালীঘাট পোলে উঠতে হনুমানজীর দেওয়ালে উড়ুক্কু সিঁদুর মাখানো মূর্তিটাকে। সে আরো দেখতে পেল—তিন নম্বর ফ্লোর থেকে ছাতা, খবরের কাগজ আর ওয়াটার প্রুফ—যার যা জুটেছে গায়ে মাথায় চাপিয়ে তিন-চারটে মানুষ এদিকে-ওদিকে বেরিয়ে পড়েছে।

খুবলাল বুঝতে পারল খোঁজটা এবার তাকেই। সে বটতলার নিশ্ছিদ্র ছায়ার ছাউনিতে সিমেন্টের বাঁধানো বেদির ওপর নিশ্চিন্তে উবু হয়ে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল।

চারিদিকে বৃষ্টির ঘন মোটা পর্দা। পর্দার আড়ালে থেকে খুবলাল তার ক্রাউডের একটা একটা মুখ মনে করতে চেষ্টা করল।

এটা একমাত্র খুবলালই পারে। পারে বলেই তো তার মাথায় একবার ডিরেকটরের 'রিকোয়ারমেন্ট' না কি বলে সেই মত ক্রাউড এনে হাজির করে। কেন, খুবলাল দুর্গভাঙার তাগড়া জোয়ান আনতে পারত না? তার বুড়ির ক্রাউডের প্রত্যেক বাড়িতেই এখন জোয়ান জোয়ান ছোকরা আড্ডা মারে না?

সেই কোন যৌবন কালের সময় থেকে বুড়িগুলোকে ক্রাউডে সামিল করেছিল খুবলাল। এখন ক্রমাগত বাচ্চা পেড়ে পেড়ে এখন ঐ বুড়িগুলোই 'ক্রাউডের বাচ্চা' 'ক্রাউডের বাসরবালিকা' এমনকি ক্রাউডের সেকেণ্ড রাউণ্ডের যুবক-যুবতী সাপ্লাই দিচ্ছে।

এক্ষুণি একবার পাঁচপাড়া আর টালিখোলা বস্তিতে গিয়ে হাঁক পাড়লেই হল।

জল ছিট্‌কে ছিট্‌কে ভারি ভারি কটা পা এদিকবাগেই আসছে। ক্রাউডের মুখ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে খুবলাল খুব ভবিষ্যুক্ত হয়ে বসে বৃষ্টির দিকে উদাস তাকিয়ে বিড়ি টানতে লাগল।

আরে খুবলাল—তুমি এখানে বসে আছ? এদিকে মদনবাবু—

খুবলাল ভুরুটা সিকেয় তুলে তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, তা হামাকে কেনো ডাকেন আবদুলমিয়া? মোদের বাবুর তো গোবিন্দ আছে।

—আর গোবিন্দ! খবরের কাগজের তলায় ভিজে মাথাটা নাড়ল আবদুল, গোবিন্দ বিষ্টির জলে ধুয়ে গেছে। এখন তুমি বাঁচাও ভাই খুবলাল। কিছু ক্রাউড এনে দাও এক্ষুণি!

—ক্রাউড? আখন এতো বারিশে ক্রাউড কুথায় মিলবে? ও আপনারা মেনেজ করে নিন বাবু। আমি পারব না।

—আরে না ভাই! খুবলাল এ ম্যানেজ হবার ব্যাপার নয়। না হয় তোমার রেটের চেয়ে একটাকা বেশি করে দিচ্ছি!

—এক টাকা? খুবলাল অদ্ভুত একটা বাঁকা হাসি খেলিয়ে মুখ মচকে বসল।

আবদুলের দাড়িঅলা মুখটা বৃষ্টির ছাইরঙা আঁধারে নিরুপায়তায় ভাঙছে-চুরছে। খুবলালের আড়চোখ সেদিকে একবার। সে পাত্তা দিল না। তার ক্রাউডের অনেকগুলো মানুষেরই মুখে হয়ত অন্ন পড়ে নি তিন-চার দিন। সবাই তো আর ক্রাউডের কাজটা পার্ট-টাইম হিশেবে করে না। পুঁটির কথা মনে পড়ল তার, হাতকাটা নিমাইয়ের কথা, বিপিন, খগেন, আমিনা, হায়দরের কথা, চারুশীলার কথা। কথা নয়, মুখগুলো। মাঝে মাঝে ক্রাউডদের কাছে ঘুরেঘারে আসে তো খুবলাল। যেমন খোঁয়াড়ের শুয়োর দেখতে যায় শুয়োরগাদার মালিক। নতুন নতুন ভালো-ভালো চেহারা বেছেও রেখে আসে। পুরোনো কুনকি দিয়ে নতুন হাতি টানার মতো। আবার কখনো-কখনো ক্রাউড হবার জন্যে তার পায়ে পড়ে যায় ভুখাসুখা লোক। আবদুল এবারে খুবলালের কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

—আরে ভাই, খুবলাল, আরো পঞ্চাশ পয়সা বাড়াচ্ছি ভাই। এবার আর না করো না।

খুবলাল তেরছা তাকাল।

—টিফিনের পাকিট্?

—হঁ্যা হঁ্যা টিফিন হবে!

—কোতো চাই?

—তা জনা তিরিশ তো লাগবেই।

—দুখানা ভেন্ দিয়ে দাও আখুনি, চট লিয়ে আসছি। কেমুন ক্রাউড?

—বেশ একটু রাগি রাগি, দুবার মেক-আপ নিতে হবে, একবার মুসলমান হয়ে হিন্দুদের দুর্গ ভাঙবে, একবার হিন্দু হয়ে মুসলমানদের শিবির আক্রমণ করবে।

—ও ঠিক আছে, অত হিন্দু মুসলমান করবার কি আছে মিয়াসাব। আমাকে শুধু বলো ফাইটিং ক্রাউড কি পোষমানা ক্রাউড। আমি তুমাকে কাঁচামাল এনে ফেলে দিব। তুমি হিন্দু-মুসলমান বানিয়ে নিবে।' তারপর একটু গলা নামিয়ে বলল—

—মেয়েছেলে লাগবে না?

আবদুল বলল—নাঃ। আজ না। চল, তোমায় ভ্যান জুটিয়ে দিই দুটো। এই বৃষ্টিতে কি কোনো ড্রাইভার বেরবে?

খুবলাল পাশে পড়ে থাকা তালিমারা হাতাটা খুলল। দীর্ঘকাল লো-বাজেটের ছবি হচ্ছে। তার ক্রাউডটাকে পুরো মাত্রায় বহুদিন কাজ দিতে পারছে না খুবলাল। সব শালা উপোসী ছারপোকা বনে আছে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাজ দেবার চেষ্টা করে খুবলাল। পারে না। তাই আজ সে ক্রাউডের কাছ থেকে কমিশনটা একটু বেশি করে মারবে। তাতে তো শালাদের কোনো ক্ষতিও হচ্ছে না। দেড় টাকাটা বাদ দিলেও তো ক্রাউড তার হিস্যা পুরো পাচ্ছে। তাছাড়া বর্ষার দিনে খুবলালের দৌলতে ঘরে হাঁড়ি চড়বে। ভ্যানে ড্রাইভারের পাশে ওঠার আগে তাই খুবলাল বলল, পাঁইটের দাম হোবে না আবদুল মিয়া। দেখো তুমাদের জন্যে বারিশে একদম ভিজে গেলাম—আবদুল বিশবাক্যব্যয়ে খুবলালকে পাঁইটের দামটা দিয়ে দিল!

ভ্যান যাচ্ছে। খুবলাল ইতিমধ্যে ড্রাইভারকে থামিয়ে দুটো পাঁইট কিনে ফেলেছে। একটা সাফ করে ফেলে আর একটার মুখ ভাঙছে। ভ্যানঅলা সেদিকে তৃষিত তাকিয়ে বলল, 'যাউ পঝ্ঝাস্ত বিষ্টি'।

টালিখোলা বাড়ি থেকে আটটা তুলেছে। আজ সব শালা এই বৃষ্টিতে বাইরে চলে গেছে রুজির ধান্দায়। কেবল গোটা-কতক মেয়েছেলে। সাধারণত খুবলালের নিয়ম, সে একদিন আগে খবর পাঠিয়ে দেয়। রতুর মা নড়বড়ে চালার তলায় ভিজে থান পরে দাঁড়িয়েছিল। আশায় আশায় বলল, কিগো খুবলাল? আজ আমাদের লেবেনি?

খুবলাল ধোঁয়াটে গলায় বলল, না। তুর রতু কুথায়?

বোতলের কারখানায়।

—উটা থাকলে লিয়ে লিতাম—

খুবলালের ভ্যান দুটো টালিখোলা বস্তি থেকে ঘুরপাক খেয়ে, পাঁচপাড়া বস্তির দিকে হুস সাঁতরাতে সাঁতরাতে চলল।

খুবলাল নেশার ঘোরে একটা মণি-অর্ডার ফর্ম দেখতে পেল। টাকা ভরছে। কতদিন ধরে খুবলাল টাকা ভরছে। দেহাতে তার জমিন হয়েছে, বয়েল হয়েছে, কুয়া হয়েছে, মেয়ের লগনভি হয়েছে। তার বাবা খাটিয়ায় বসে হুঁকো টানে, আর বেট এমনি গরমের দিনে লোটাভর সিদ্ধি বানায়। তার মা উঠোনে মাটিতে গর্ত করা উনানের

ধারে বসে শাল আটার লেচি নিয়ে হাতের তালুর জাদুতে মোটামোটা নরম রুটি বানায়। আর মেয়ে গা-ভরা রুপোর গয়না পরে সারা গায়ে উলকি এঁকে গেঁয়ো মেয়ে সাজা হেমামালিনীর মতো গেঁহুর ক্ষেতের মাঝ-খানে দাঁড়িয়ে দড়ির মুখে ঢিল বেঁধে বন বন করে ঘোরাতে থাকে। পাঁচ বছর খুবলাল দেহাতে যাবার সুযোগ পায় নি। পাঁচ বছর ধরে চারহাত বাই দু-হাত ঘরে, ভিজে ওঠা মাটিতে বিছানা পেতে খুবলাল পড়ে আছে। হোটেলে খায়। আর পাই-পয়সা পর্যন্ত জমায়। খুবলালের ক্রাউডে অনেক মেয়েছেলে আছে। তাই তার ওই খরচটা বাঁচে। তবে তাদের কাছ থেকে দু-দুটো রোগও পেয়ে গেছে খুবলাল। কাশির আর পারার রোগ। তাই গা-গতর টাটালে ও-ই একটু পাঁইট খায়।

পাঁচপাড়া বস্তিতে ঢোকার সময় খুবলাল একটু ঝিম মেরে গিয়েছিল। ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল তার। তাই তার আটজন ক্রাউডই নেমে গিয়ে বাকি বাইশজনকে ডেকে নিয়ে এল।

স্টুডিয়োয় পৌছেই খুবলাল একবার চোখ পিট্‌পিট্‌ করে দেখে নিল তার ক্রাউড ঠিকঠাক আছে কিনা। তারপর ফ্লোরের পাশে একটা টুল পেতে ঝিমিয়ে বসল। মেক-আপ করতে করতে, শট নিতে নিতে, এখন রাত দশটা তো বাজবে।

লালুবাবু খুব রাগ করছে শুনতে পেল খুবলাল। কিন্তু মদন হালদার হাতে-পায়ে ধরছে তার।

একটু কষ্ট করুন দাদা, কাল অন্য লোকের ডেট। আজই এই এতবড় সেট ভেঙে ফেলতে হবে দাদা। ওই শালার গোবিন্দই তো আমাকে ডোবালে দাদা। না হলে কী...খুবলাল আর যেন কিছু শুনতে পেল না। আর গা-গতর বড্ড ম্যাজ-ম্যাজ করছে। বড্ড বেশি রকম ঝিমুনি আসছে তার। মঙ্গলা বলে একটি মেয়ে সেদিন রথের মেলায় ক্রাউডে এসেছিল। তার মুখটা বারবার ভেসে উঠছে খুবলালের বন্ধ চোখের সামনে। দেহাতে থাকলে এই মঙ্গলাকেই সে তার মায়ের মত ভাবত। কিন্তু টালিগঞ্জের দূর কোণের একটা বাড়িতে, চারহাত-বাই-দু-হাত ঘরে থেকে মঙ্গলাকে কেমন যেন অন্যচোখে দেখতেই ছেদ করে। মঙ্গলাকে মুছে দিয়ে এলো হালিমা খাতুন। একটা ঝলঝলে ময়লা বোরখা পরে মসজিদের পাশে এখন তেলেভাজা বিক্রি করে। হালিমা খাতুন প্রথম এসে খুবলালের ঘরেই উঠেছিল। খুবলালই পরে তাকে ইঁট খোলা বস্তিতে ঘর দেখে দেয়। হালিমা

মুছে গিয়ে এলো রতুর মা। রতুর মায়ের মুখটা যেন জলের ভিতর। এত কাঁপছে-দুলছে আর অসমতল হয়ে যাচ্ছে। রতুর মাকে দেখেই খুবলালের খুব হাসি পেল। খুব কান্না এল। বলাও যায় না রতু আসলে খুবলালের ছেলে কি না?

খুবলালের সম্বন্ধে স্টুডিও পাড়ায় অনেক রকম গল্প আছে। খুবলাল নাকি অসাধ্য সাধন করতে পারে। মাঝরাতে নাইট স্যুটিঙে একটা বকনা দরকার ছিল—খুবলাল তো বিকেল থেকে বকনা হাজির করে বসেছিল। ডিরেকটর এসে বক্না দেখে কাত।

—এ কী করেছ খুবলাল? শাদা বক্না এনে হাজির করেছ! আমার যে কালো বকনা চাই!

—বকনার আবার সাদা কালো কি আছে বাবু?

—আছে আছে আগের রিলের ডায়ালগে আছে হিরো বলছে, কালো বকনা—কালো বকনা। খুবলাল সঙ্গে সঙ্গে বকনাটাকে কালো বার্নিশ করে এনে হাজির করেছিল।

খুবলাল ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে হাসল। আপন মনেই হাসল। এ গল্প সত্যি কি মিথ্যে আজ আর নিজেরই মনে নেই। কতদিন কতদিন হয়ে গেল, খুবলাল এই স্টুডিও পাড়ায় ক্রাউড আনছে। ক্রাউড আনছে বলেই দূরে, দেহাতে ছিপনি নদীর তীরে তার গাঁয়ে তার বুড়ো বয়সে শান্তিতে একলা আপন মনে কাটাবার জন্যে ঘর জমিন কুয়ো তৈরি হয়ে উঠছে।

লোকে বলে কত বয়স হল গো তোমার খুবলাল?

—ক-কুড়ি?

খুবলাল বলে পঁচাশ তো হবেই।

—না, না ষাট পঁয়ষট্টি

—পঁচাশ—চেয়ে এক বরষ ভি বেশি হোবে না—

সত্যিই তাই। পঁচাশ না-হোক বাহাত্তন, তিপাত্তন চেয়ে বেশি হবে না খুবলালের বয়স। কিন্তু তাকে খুব ঝুরঝুরে, ফাঁপা আর বুড়ো দেখায়। আসলে কলকাতা শহরটাই যেন কেমন, এখনো সহ্য হল না খুবলালের। তার ওপর বিচ্ছিরি রোগ দুটো কুরেকুরে খাচ্ছে খুবলালকে। না-হলে খুবলালদের অনেকখানি পরমায়ু। ওর বাবা আশি বছর বয়স পর্যন্ত হেসেখেলে বেঁচে আছে। ওর দাদু নাকি শ-ও বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিল। খুবলালও নিশ্চয়ই অনেকদিন পর্যন্ত বাঁচবে। খুবলাল এ বছরই

শীতে চলে যাবে দেহাতে। মেয়ে জওয়ান হয়েছে। এবার তো গেঁহু উঠলেই মেয়েকে শ্বশুর ঘরে পাঠাতে হবে। মেয়েটাকে একদিনের বাচ্চা দেখে এসেছিল খুবলাল। তার পর একেবারে ন-বছরে দেখে। তারপর পাঁচবছর আগে চোদ্দয় পড়েছে এখন মেয়েটা খুব সমীহ করে খুবলালকে।

একদিনের বাচ্চা! কথাটা মনে পড়তে আবার মিটমিট করে হাসল খুবলাল। একদিনের বাচ্চা চেয়েছিল একবার বুড়ো ডিরেকটর রাণাবাবু। খুবলাল একদিনের বাচ্চা পাবে কোথায়?

অনেক কষ্টে একটা মাসখানেকের বাচ্চার খোঁজ পেয়েছিল খুবলাল। কিন্তু রাণাবাবু তাকে রিজেক্ট করে দিল। তখন খুবলাল পাগলের মতো একদিনের বাচ্চা খুঁজছে। রাণাবাবু একশ টাকার নোট ফেলে দিয়েছিল খুবলালের সামনে।

খুবলাল অনেক মাথা খেলাচ্ছিল। কোথায় পায় কোথায় পায় একদিনের বাচ্চা। পরদিন সকাল আটটাতেই দরকার। নায়িকা বাচ্চা নিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাবে। মনে আছে খুবলালের, পাগলের মতো ঘুরছিল সে এক বস্তি থেকে আর-এক বস্তিতে। ঘুরতে ঘুরতে কোথাও কিছু না-পেয়ে শেষ পর্যন্ত খুবলাল নিজের ডেরায় ফিরে এসে দেখে, রতুর মা, রতুর মা তখনও রতুর মা হয় নি, খুবলালের ঘরের দরজার সামনে ধুঁকছে। বড় জিভ বেরিয়ে পড়েছে। বুকের শিরাগুলো দড়ির মত ফুলে ফুলে উঠছে। জালার মত পেটটা নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। চারপাশে ভিড়। স্ত্রী-লোকটা ছটফট ছটফট করছে। খুবলালের চোখ জ্বলে উঠল। সে নিজের ঘর খুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি দাই ডাকতে গেল। মনে মনে একশ টাকার নোটটা ডবল করে দিল খুবলাল। দাই-টাই-এর খরচ-খরচা দিয়ে হাতে আর কত থাকবে খুবলালের।

সেবার খুবলাল রতুর মায়ের একদিনের বাচ্চা বাবদ দেড়শ টাকা লাভ করেছিল। রতুর মা-কে একটা পয়সাও দেয়নি। সাতদিন নিজের ঘরে থাকতে দিয়েছিল, এই না কত। এইজন্যেই সারাজীবন কৃতজ্ঞ হয়েছিল রতুর মা। একদিনের রতু সিনেমায় নেমেছিল বলে খুব গর্ব করে বলে বেড়ায় এখনো।

—কিরে খুবলাল উঠবি না? যা তোর ক্রাউড এখন পেমেণ্ট নিতে গেছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে সোজা খাড়া হয়ে উঠল খুবলাল। তার সমস্ত ভিতরটা

থরথর করে কাঁপছে। বুকের ভিতরটা ঢুপ ঢুপ করছে। আর বুক ফুটো করে দেওয়া একটা যন্ত্রণা। খুবলাল টলতে টলতে এগলো। পেমেণ্ট দিচ্ছিল কালোবাবু। খুবলাল ঝাঁপিয়ে পড়ল একেবারে।

—আগে এদিকে হামার পেমিণ্ট ছাড়ো, মাথা পিছু এক রুপেয়া পঁচাস্ পয়সা।

কালোবাবু বলল—কেন? তোকে অত দেব কেন খুবলাল?

—সি তুমার অত পুছার কি আছে কালোবাবু! মদন হালদারকে পুছিয়ে লিও।

কালোবাবু বলল—কেন তোকে কি আলাদা দেবে বলেছে মদনবাবু?

—দিবে না? ই ভারি বারিষে এত্তগুলান তুলে এনেছি—

—তা তুই ওদের কাছ থেকে তোর কমিশন নিয়ে নে—আধা পেমিণ্ট তো হয়ে গেছে। খুবলাল টাল-মাটাল হয়ে ঘুরে তার ক্রাউডের দিকে ফিরল।

তিরিশটা আস্ত আস্ত লোক কেমন অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে খুবলালের দিকে। যারা পেমেণ্ট পেয়ে গেছে তারা ছোট ছেলের মতো না-ছোড় ধরে আছে টাকার নোটগুলো। যারা পায়নি তারাও অনিচ্ছুক চোয়াল তুলে তাকাচ্ছে খুবলালের দিকে।

—এ্যাই—এ্যাই—কমিশন দাও—হামাকে কমিশন দাও—

কাঁপতে কাঁপতে একজন পঞ্চাশটা পয়সা তুলেছিল খুবলালের হাতে। এটাই রেট।

খুবলাল ঝন্‌ঝন্ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল পয়সা।

—আরো এক রুপিয়া বের কর্—কি পেয়েছিস তোরা—

—না!

—না?

—না।

এবার যেন অনেকগুলো গলার আওয়াজ। লোকে আশপাশ থেকে ছুটে এল। খুবলালও অবাক হয়ে তাকাল। এমন কাণ্ড তো এর আগে কখনো ঘটে নি। তার ক্রাউড—যাদুকাঠি তুললে আসে, যাদুকাঠি থামালে উধাও হয়ে যায়। তার কথায় ওঠে—তার কথায় বসে সেই ক্রাউড শেষকালে তাকে তার ন্যায্য কমিশন না দিয়ে চলে যাচ্ছে।

খুবলাল চিৎকার করে লাফিয়ে পড়ল তার ক্রাউডের ওপর। ঘুষোঘুষি

খামচা-খামচির মাঝখানেও সে দেখতে পেল, একজনের পর একজন কালোবাবুর কাছ থেকে পেমেণ্ট নিয়ে যাচ্ছে।

অনেক কষ্টে যখন খুবলালকে তার ক্রাউডের কাছ থেকে আলাদা করা হল তখন তার খাকি শার্টটা ফালা ফালা হয়ে গেছে, সারা গায়ে খামচানির দাগ। বুকের ব্যথায় সে কুঁজো হয়ে কোঁকাচ্ছে।

মদন হালদার ছুটে এসে খুবলালকে ধরে ফেলে বলল, কেন বুড়ো বয়সে অসুস্থ শরীরে মারামারি করতে যাও খুবলাল ?

খুবলাল কি যেন একটা উত্তর দিতে গিয়েই ভয়ানক কেশে উঠল। আর চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখল তার সামনের ফ্লোরটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

আর তখনই ভেঙে এলো খুবলালের ক্রাউড। চারপাশে ঘিরে এলো তারা। মদন হালদারের গলা শুনল খুবলাল—এ্যামবুলেন্স—এ্যামবুলেন্স

পাগলের মতো কে যেন চিৎকার করে উঠল পাঁচ পাড়া টালিখোলায় খবর পাঠা, খবর পাঠা, সবাইকে আসতে বল—

দু-চোখ ঝাপ্সা হয়ে আসতে লাগল খুবলালের।

তিরিশজনের তিরিশ টাকা—আর পনের টাকা, পাঁচ কর পঁচাশ টাকা—

তার মেয়ে চুনরিয়া শশুরবাড়ি যাবে। নতুন শাড়ি চাই মেয়ের জন্যে, নতুন গহনার হাত বাকস চাই, গোলাপি রঙের সোনালি লতাপাতা-কাটা।

ঝাপসা হয়ে আসছে সব। ধূ ধূ আলো জ্বলছে, স্টুডিওর। চারপাশে তার উদ্বিগ্ন অনুতপ্ত ক্রাউড। ঝুঁকে পড়েছে। যেন সে গাছের নিচে শুয়ে আছে। গাছটার নাম কলকাতা। তার ডালপালা থেকে থোলো থোলো ঝুলছে মানুষের মুখ। মাঝে মাঝে ভিড় কেটে ছুটে আসছে আরও নতুন মুখ। একবার শুধু তারা তাদের খুবলালকে দেখতে চায়। বাইরে একটা গাড়ির শব্দ হল। খুবলাল আবছা শুনতে পেল, 'এসে গেছে, এসে গেছে।'

কারা যেন সাবধানে স্ট্রেচারে তুলে ফেলল খুবলালকে। খুবলাল গাড়ির অন্ধকার টানেলের ভিতর ঢুকতে ঢুকতে শুনল রতুর মায়ের ঈষৎ ধরাগলা।

—আ আমার পোড়া কপাল রে, খুবলাল রে, তুই কোথায় চললিরে, তোকে দেখতে পেলুম নি রে—

গাড়ি স্টার্ট নিল। খুবলালের অনন্তযাত্রা শুরু হল যেন। সে যেতে-

যেতে যেতে-যেতে তার ক্রাউডের মুখ একটার পর একটা, একটার পর একটা, দেখতেই লাগল, দেখতেই লাগল।

কে বলল ক্রাউডের মুখ চেনা যায় না। ক্রাউডের মুখ আলাদা নয়? খুবলাল এখন তাদের অরুল, তিল, রোম, রেখা, কাটা দাগ, এমনকি আর কিছু বিশেষ যা আলাদা না হলেও চোখের চাউনি, মনের চিন্তা, গালের গড়িয়ে আসা জলের ফোঁটা দেখতে পাচ্ছিল।

খুবলাল যা-দেখতে চাইছিল তার সেই নদী, গাঁও, জমিন, মা, বহু, বাবা আর মেয়ে—সব ছাপিয়ে উঠে আসছিল কেবল ক্রাউডের মুখ, সেই তিরিশ বছর আগের পুরনো মুখ থেকে আজকের দুপুরের আনকোরা নতুন মুখটা অবধি।

ওড়িষি নৃত্যকলার ইতিকথা

সত্যেন সেন

আজ থেকে ঠিক কুড়ি বছর আগেকার কথা। ১৯৫৮ সালে দিল্লীতে আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় যুব-উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেই যুব-উৎসবে এমন এক এক রমণীর উপাচার পরিবেশিত হয়েছিল, যার ফলে ভারতীয় নৃত্য-কলার ক্ষেত্রে এক স্থায়ী সুফল ফলেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। এরই মাঝখানে একসময় উৎকল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি নৃত্যশিল্পী প্রিয়ংবদা মহান্তী মঞ্চে প্রবেশ করে হাজার হাজার দর্শকদের সামনে এক অপূর্ব নৃত্যকলা উপহার দিলেন। দর্শকরা মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে নিঃশব্দে সেই নৃত্য উপভোগ করছিল। ভারতীয় নৃত্যের মধ্যে এই ধরনের ললিত নৃত্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না। প্রিয়ংবদা মহান্তীর এই নৃত্যানুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিঃশব্দ দর্শকরা সবাই একসঙ্গে বাঙ্ময় হয়ে উঠল, প্রশংসার করতালিতে সম্মেলন ভবন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতে লাগল।

প্রিয়ংবদা মহান্তী জাতশিল্পী। তিনি নৃত্যগুরু কেলুচরণের যোগ্যতম ছাত্রী। কিন্তু প্রিয়ংবদা সেদিন যত সুন্দর নাচই নেচে থাকুন না কেন, দর্শকদের মধ্যে কজনই বা সেকথা মনে করে রাখত? এবং সেই নৃত্য-কলার রসকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার শক্তি তাদের মধ্যে কজনেরই বা ছিল?

ওড়িষার এই লালিত্যময় নৃত্যভঙ্গির মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সেই সত্যটা হয়তো চাপা পড়ে থাকত। কিন্তু বহু ভাগ্যের কথা, ডঃ চার্লস ফেব্রির মতো বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ ও শিল্পকলা-রসিক সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

এতকাল ভারতীয় নৃত্যে ওড়িষির নৃত্যকলার কোনো স্থানই ছিল না। ডঃ চার্লস ফেব্রি স্টেটসম্যান পত্রিকার আর্ট-ক্রিটিক অর্থাৎ শিল্পকলা-সমালোচক ছিলেন। প্রিয়ংবদার এই নাচ দেখে মুগ্ধ ফেব্রি স্টেটসম্যানের পাতায় উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর সেই রচনা থেকেই এই উদ্ধৃতিটি দেওয়া যাচ্ছে :

"যখন আমি প্রথম 'ওড়িষী' নৃত্যকলা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলাম যে, এই নৃত্যকলা ভারতে প্রচলিত অন্যান্য বিশিষ্ট ক্লাসিকাল নৃত্যকলার মধ্যে অন্যতম, তখন অনেকেই আমার এই কথায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়েছিলেন। এই নৃত্য তখন ভারতীয় নৃত্যকলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত ছিল। একমাত্র ওড়িষাবাসীরা ছাড়া আর কেউ এর খবর রাখত না। এটা খুবই আশ্চর্য ঘটনা।

"আমি নানা কারণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত ভারতনাট্য এর তুলনায় পরবর্তীকালের সৃষ্টি। কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। কিন্তু ওড়িষি নৃত্য সম্পর্কে সেকথা বলা চলে না। এই নৃত্যকলার যে কোনো ভাবেই হোক আজ পর্যন্ত তার প্রাচীন ও বিশুদ্ধ রূপটিকে অক্ষুণ্ণভাবেই রক্ষা করে এসেছে।"

ওড়িষীর আবিষ্কার ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা। ডঃ চার্লস ফেব্রির আবিষ্কারের ফলেই এক মহামূল্য ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে। এই ওড়িষী নৃত্যকলা ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে প্রচলিত নৃত্যকলার শাখা বা উপশাখা নয়, ওড়িষার বুকেই এর জন্ম। ওড়িষার প্রাচীন নৃত্যশিল্পীদের কল্পনাই এই নৃত্যকলাকে রূপ দিয়েছিল।

ডঃ ফেব্রির এই রচনা পাঠ করার ফলেই তাঁর বান্ধবী বিখ্যাত নৃত্য-শিল্পী ইন্দ্রানী রহমান এই নৃত্যবিদ্যাকে আয়ত্ত করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। অবশেষে একজন নৃত্যগুরুর কাছে শিক্ষালাভ করে তিনি এই নৃত্যকলায় পারদর্শিতা লাভ করলেন। এই ওড়িষী নৃত্যকলাকে আয়ত্ত করার পর তিনি দেশে ও বিদেশে সেই নৃত্য প্রদর্শন করেছিলেন।

তার এই ওড়িষী নৃত্য ভারতে ও ভারতের বাইরে সর্বত্র বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

সুদূর অতীতকাল থেকে ওড়িষায় নৃত্যকলা বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে এবং সর্বসাধারণের চিত্ত বিনোদন করে এসেছে। কতকাল আগে থেকে এর সূচনা হয়েছিল, সেই ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে আজ থেকে দু-হাজার বছর আগে খোদিত সম্রাট খারবেলের শিলালিপিতে এই নৃত্যকলার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তিনি সর্বসাধারণের চিত্ত বিনোদনের জন্য নৃত্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন।

এতকাল আমাদের দেশের ক্লাসিকাল নৃত্যের মধ্যে ওড়িষি নৃত্যের কোনো স্থান ছিল না। অথচ প্রাচীনকালে ওড়িষি নৃত্যকলাকে অন্যতম জাতীয় নৃত্যকলা বলে গণ্য করা হত। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ভারতের যে চারটি জাতীয় নৃত্যকলার নাম উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে 'ওড্রমাগধী' অন্যতম। এই ওড্রমাগধী কথাটার অর্থ সম্ভবত এই যে, এই নৃত্যকলা ওড্র (ওড়িষা) ও মগধে প্রচলিত ছিল। আবার কেউ কেউ অন্যভাবেও এর ব্যাখ্যা করেন। মূলত ওড্র দেশে এই নৃত্যকলাটির সৃষ্টি হয়েছিল। পরে এই নৃত্যকলার মগধের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

গুপ্তযুগে উত্তরভারতে যখন হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটল ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সে এক মহোৎসবের কাল। ভারতের ইতিহাসে এ যুগ 'স্বর্ণযুগ' বলে পরিচিত। সে সময় সারা দেশ জুড়ে শিল্প ও সংস্কৃতির বহুমুখী ধারা যেন একসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। ভৌম রাজবংশের শাসনাধীন ওড়িষার বুকেও তখন সেই তরঙ্গ এসে পড়েছিল। মহাযান-পন্থী বৌদ্ধধর্মও তার প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। মহাযান মতবাদ সে সময় ওড়িষায় ব্যাপক প্রসার লাভ করে চলেছিল। সে সময়কার শিল্পীদের হাতে গড়া বুদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য দেবদেবীদের মূর্তির মধ্যেও আমরা ওড়িষী নৃত্যকলার প্রভাব দেখতে পাই।

ওড়িষায় প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ একজন পণ্ডিত বলেছেন : "এই মহাযান মতবাদের প্রবর্তনের ফলে বৌদ্ধধর্ম যেন আকাশের শূন্যমার্গ ছেড়ে মাটির পৃথিবীর বুকে নেমে এল।"

ওড়িষা এই মহাযান মতবাদের অন্যতম পীঠস্থান। সেই সময়কার সাহিত্য, শিল্পকলা, ও স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে এর পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম তখন নন্দনতত্ত্বের প্রভাবে প্রভাবিত। শুধুমাত্র স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে নয় নৃত্যকলা

ও সঙ্গীতের মতো ললিতকলাতেও আমরা তার বিচিত্র ও বিস্ময়কর অবদান দেখতে পাই।

এই সময় বৌদ্ধধর্ম ও শৈবধর্ম পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নৃত্যকলার ক্ষেত্রে এক রহস্যলোকের সৃষ্টি করে চলেছিল। শৈব সম্প্রদায়ের শিল্পীরা ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে নৃত্যকলাকেও রূপদান করছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত নৃত্যশিল্পীরা মূলগতভাবে থের গাঁথা ও থেরী গাঁথা থেকে তাদের নৃত্যকলার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। এ সমস্ত তথ্যগুলি থেকে ওড়িষী নৃত্যকলার প্রাচীনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময়কার নৃত্যশিল্পীদের হস্তপ্রচার, মুদ্রা ও ভঙ্গগুলির উপর শৈব ধর্মের চেয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনেক বেশি। এমনকি বৌদ্ধ নৃত্যশিল্পীদের বসন, ভূষণ-গুলির সঙ্গে ওড়িষী নৃত্যশিল্পীদের বসনভূষণের আশ্চর্য মিল লক্ষ করা যায়।

সপ্তম শতাব্দীতে ভৌমরাজ বংশের অবসান হয় এবং ওড়িষা কেশরী রাজবংশের শাসনাধীনে চলে যায়। এই আমলে হিন্দুধর্মের পুনরাবির্ভাব ঘটল। কেশরী রাজবংশের রাজাদের উদ্যোগের ফলেই ওড়িষী নৃত্যকলা তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছেছিল। এই রাজারা শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু নৃত্যকলার ক্ষেত্রে তাদের কোনো ধর্মীয় সংস্কারের বালাই ছিল না। ইতিপূর্বে বৌদ্ধদের বিহার-গুলিতে যে ধরনের সঙ্গীত ও নৃত্যচর্চা করা হোত, তারা সেই ধারাটিকে অনুসরণ করে চলেছিলেন।

কোনো কোনো শৈবধর্মগ্রন্থে শিবকে নৃত্যকলার আদিগুরু বলা হয়ে থাকে। তিনি কখনো একা কখনো তার দয়িতা পার্বতীর সঙ্গে নৃত্যে রত। অনেকের মতে এই শিবই নটরাজ। কেশরী বংশের রাজারা তাঁদের আরাধ্য দেবতা শিবকে অনুসরণ করে নিজেরাও প্রকাশ্যে নৃত্যচর্চায় অংশগ্রহণ করতেন। কেশরী বংশের জনৈক রাজা নৃত্য-কেশরী (নৃত্য-কেশরী) নাম গ্রহণ করেছিলেন।

রাজা ও রাজপরিবারের লোকেরা প্রকাশ্যে নৃত্যচর্চা করছেন, একমাত্র ওড়িষা ছাড়া আর কোথাও এমন দৃশ্য দেখা যেত না।

কেশরী রাজবংশের পর গঙ্গো রাজবংশেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ভুবনেশ্বরে অনন্ত-বাসুদেব মন্দির গাত্রে খোদিত লিপি থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই লিপিতে দেখা যায়, গঙ্গো বংশের রাজা অনঙ্গভীম দেবের ভগ্নী

চন্দ্রিকা নৃত্যকলায় পারদর্শী ছিলেন। তাছাড়া তিনি নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন।

এই বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী রাজকন্যা চন্দ্রিকা অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে নয়টি কুলুঙ্গিতে ওড়িষী নৃত্যে রত নয়জন নায়িকার মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। এই নয়জন নায়িকা ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে বর্ণিত কাব্যের নয়টি ভাবমূর্তির প্রতীক। সেই নয়টি মূর্তির মধ্যে এখন অল্প কয়েকটি অবশিষ্ট আছে।

কিন্তু এটা শুধু অতীতের কথা নয়, এ যুগেও ওড়িষা বিভিন্ন রাজপরিবারের লোকদের মধ্যে নৃত্যচর্চার প্রথা প্রচলিত আছে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত ভারতে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। নৃত্যচর্চার দিকে ওড়িষার লোকদের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। এক্ষেত্রে উচ্চস্তর ও নিম্নস্তরের লোকদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। এই কারণেই তারা তাদের নৃত্যকলাকে দীর্ঘকাল ধরে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল।

ভারতীয় নৃত্যকলা দুটি ভাগে বিভক্ত। পুরুষদের তাণ্ডব এবং মেয়েদের লাস্য। নৃত্যকলার সেই দুটি ধারা আমরা ওড়িষা নৃত্যের মধ্যে দেখতে পাই। ওড়িষায় ছৌ নৃত্যের মধ্য দিয়ে তাণ্ডব এবং ওড়িষী নৃত্যের মধ্য দিয়ে লাস্য রূপ পেয়ে এসেছে।

শেরাইকেল্লার করদ রাজ্যে দীর্ঘকাল থেকে মুখোশ-পরিহিত ছৌ-নৃত্য প্রচলিত হয়ে আসছে। অবশ্য শেরাইকেল্লাকে পরবর্তীকালে বিহারের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। শেরাইকেল্লার ছৌ নৃত্য এবং ওড়িষার প্রাক্তন করদরাজ্য ময়ূরভঞ্জ, নীলগিরি, কেওনঝর ও বোনাইতে প্রচলিত ছৌ নৃত্যের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। ছৌ নৃত্য পুরুষদের যৌথ নৃত্য। এই নৃত্যের মধ্য দিয়ে কোনো বীরত্বপূর্ণ গাঁথাকে সার্থকভাবে রূপ দেওয়া চলে।

ছৌ নৃত্যের মতো পুরুষদের পৈকা নৃত্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৈকা সামরিক নৃত্য। এই নৃত্যের সাহায্যে যুদ্ধের সময় সৈন্যদের মধ্যে বীরত্বের উন্মাদনা জাগিয়ে তোলা হত। অপরপক্ষে ওড়িষী নৃত্য মেয়েদের একক নৃত্য। অপূর্ব মনোমুগ্ধকর সেই নাচ।

ওড়িষার মন্দিরগুলির ভাস্কর্যশিল্প আজও তাদের নৃত্য ভঙ্গিগুলিকে জীবন্ত করে রেখেছে। ভৌম রাজবংশের আমলে এই মন্দির-ভাস্কর্যের সূচনা হয়েছিল। কেশরী বংশের রাজারা মন্দিরের ভাস্কর্যশিল্পের আরো বিকাশ সাধন করেছিলেন। তাঁদের আমলেই ভুবনেশ্বর ধর্মীয় নগরীতে পরিণত

হয়েছিল। এতকাল বাদেও ভুবনেশ্বরেও মন্দিরগুলির ভাস্কর্য আজও অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির প্রাচীরগাত্রে পুরুষ ও মেয়েদের বহু নৃত্যের দৃশ্য খোদিত আছে। এই নৃত্য দৃশ্যগুলির মধ্যেই ওড়িষী নৃত্য ও ছৌ নৃত্যের বিশিষ্ট নৃত্যভঙ্গিগুলি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ভুবনেশ্বরের প্রতিটি মন্দিরে নটরাজ শিবের মূর্তি খোদিত আছে। দক্ষিণ ভারতে নটরাজ শিবের মূর্তি থেকে এই মূর্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়ে ওড়িষার ভাস্করদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। রাজারাণী, মুক্তেশ্বর ও ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে যে অপূর্ব নৃত্যদৃশ্যগুলি খোদিত আছে, সেগুলি ওড়িষী নৃত্যেরই প্রতিচ্ছবি। এই নৃত্যরত মূর্তিগুলির মধ্যে দেবতার কাছে আত্মনিবেদনের ভঙ্গিটি সুপরিস্ফুট। দীর্ঘ একহাজার বছর ধরে এই মন্দির-ভাস্কর্য দর্শকদের মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে আসছে। ওড়িষার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলি, বিশেষ করে পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনার্কের মন্দিরগুলিতে শত শত নৃত্যদৃশ্যকে ভাস্কর্যের মাধ্যমে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। কোনার্কের মন্দিরের নৃত্য-দৃশ্যগুলি দর্শকদের অভিভূত করে তোলে।

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির গায়ে অনুরূপ বহু নৃত্যদৃশ্য খোদিত আছে। কিন্তু ওড়িষার মন্দিরের নৃত্যদৃশ্যগুলির সঙ্গে তাদের উল্লেখযোগ্য প্রভেদ আছে। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের নৃত্যদৃশ্যগুলির অধিকাংশ কল্পনাপ্রসূত। সমগ্র তামিলভাষী অঞ্চলে মন্দিরগুলির নৃত্যদৃশ্যের মধ্যে ভারতনাট্যের মূল নৃত্য ভঙ্গিগুলিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কথাকলি, কত্থক প্রভৃতি বিশিষ্ট ভারতীয় নৃত্যগুলির রূপ কোথাও ভাস্কর্যশিল্পের মধ্য দিয়ে সুরক্ষিত হয় নি। অপরপক্ষে ওড়িষার মন্দিরের নৃত্যদৃশ্যগুলি বাস্তব নৃত্যভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

এ সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ নেই যে এই সমস্ত মন্দির-ভাস্কর্য রচনার বহুকাল আগেই ওড়িষী নৃত্যকলা চরম উৎকর্ষ ও পরিপক্বতা লাভ করেছিল। ওড়িষার নৃত্যগুরুদের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গি সম্পর্কে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু ওড়িষার সকল মন্দিরে যে বিভিন্ন ধরনের নৃত্যভঙ্গি খোদিত আছে তারা অবিকল একই রকম। এ থেকে বোঝা যায় এগুলি তাদের অনন্য ও বিশুদ্ধ রূপ।

ওড়িষার প্রতিটি মন্দিরে একটি করে জগমোহন নামক বিরাট হলঘর আছে। এই জগমোহনে দাঁড়িয়ে বহু দর্শক সম্মিলিতভাবে নৃত্যদৃশ্য দেখতে

পারে। এই জগমোহনগুলিকে মন্দিরের নাচঘর বলা যেতে পারে। এই জগমোহন বা নাচঘর প্রাচীন আমলের মন্দিরগুলির সংশ্লিষ্ট অঙ্গ ছিল না, এগুলি দর্শকদের চাহিদা অনুসারে পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত হয়েছিল।

কোনার্কের বিশ্ববিখ্যাত সূর্যমন্দিরটি যে সময় নির্মিত হয়েছিল তখন নৃত্যকলা ওড়িষাবাসীদের চিত্তাকর্ষণের এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাধারণ দর্শকদের কৌতূহল ও আগ্রহ মেটাবার জন্য রাজা নরসিংহদেব এই সূর্যমন্দিরের সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র নাটমন্দির নির্মাণ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই নাটমন্দিরে বহুসংখ্যক দর্শক সম্মিলিতভাবে 'মহরি' নামে পরিচিত দেবদাসীদের নৃত্য উপভোগ করতে পারত। প্রায় এই সময়েই মহেশ্বর মহাপাত্র কর্তৃক ওড়িষী নৃত্যকলায় ক্লাসিকাল রীতি সম্পর্কে এক সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে ওড়িষার মন্দিরগুলিতে দেবদাসীদের নৃত্যানুষ্ঠানের প্রথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এই দেবদাসী-প্রথা একান্তভাবে ওড়িষার নিজস্ব ব্যাপার নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দির-গুলিতে বিভিন্ন সময়ে এই প্রথা প্রচলিত হয়েছিল।

পুরীতে মন্দিরের দেবদাসীদের জন্য বসবাসের একটি বিশেষ পল্লী গড়ে তোলা হয়েছিল। এই পল্লীর অধিবাসিনীদের নৈতিক চরিত্রের মানকে সুরক্ষিত করে রাখার জন্য প্রহরী হিসাবে একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হত। কিন্তু মন্দিরের যে সমস্ত প্রভুরা এবং স্বয়ং রাজা তাদের নৈতিক চরিত্রের মান রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষেই তারাই এই হতভাগিনীদের কলুষিত জীবনের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী।

কিছুকাল আগে এক প্রাক্তন দেবদাসীর কাছ থেকে এক কঠোর রাজকীয় নিষেধাজ্ঞার লিপি আবিষ্কার করা হয়েছে। এই লিপি থেকে দেবদাসীদের বাস্তবজীবন সম্পর্কে অনেক উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। গরীব ঘরের বাছা বাছা সুন্দরী মেয়েদের মন্দিরের দেবদাসীর কাজে নিযুক্ত করা হত। এই দেবদাসীদের জীবনে বিবাহ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কেননা একমাত্র দেবতার ভোগের জন্যই তারা নিবেদিত হত।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই দেবদাসী-প্রথা দুর্নীতির এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ রাজারা নিজেরাই ছিলেন এই দুর্নীতিমূলক প্রথার বিধান-দাতা। পুরীর এই দেবদাসীরা ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে রাজ অঙ্গীয় ও গহন মহরিকে—এই দুটি শ্রেণীর দেবদাসীদের

পুরোপুরিভাবে জগন্নাথের পবিত্র সেবাকার্যে উৎসর্গ করা হত না। এই দেবদাসীদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট পল্লীটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'অঙ্গ-অলস-পত্র'। এই কথাটির অর্থ, যে স্থানে গেলে দেহ আনন্দ ও আরাম ভোগ করতে পারে।

এই কথাটা হয়তো অনেকেই জানেন, দেবতার নাম করে এই দেবদাসীরা রাজা, রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত ও প্রভাবপত্তিশালী ব্যক্তিদের উপভোগ্যা ছিল। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক হতভাগিনীদের এই কলুষিত জীবনকে বরণ করে নিতে হত। এই জীবনের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে যাবার কোনো উপায় ছিল না। অবশ্য একমাত্র পুরীতেই নয়, সারা ভারতে প্রচলিত দেবদাসী প্রথার এইটাই ছিল যথার্থ চিত্র।

একদিকে স্বাভাবিক জীবনের বাইরে এই কঠিন অবরোধ, অপরদিকে পবিত্রতার ছদ্মবেশের আড়ালে এই গোপন ও কুৎসিৎ বৃত্তি অবলম্বন করে চলা —কি দুঃসহ এই জীবন! ফলে স্বভাবতই ওড়িষার সাধারণ লোকদের কাছে তারা অতি ঘৃণ্য শ্রেণীর মেয়ে বলে বিবেচিত হত। তাই তারা তাদের নাম দিয়েছিল মহরি। ওড়িয়া ভাষায় এই মহরি শব্দটির অর্থ মেয়ে ধাঙড়। অর্থাৎ সমাজের আবর্জনা কুড়িয়ে বেড়ানোই এদের জীবনযাত্রার পাথেয়।

কিন্তু এই সংসারে অভাবনীয় কত কিছুই না ঘটে থাকে। কলঙ্কিত জীবনের পঙ্ক থেকে কত পদ্মই না অপূর্ব শোভা নিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে ওড়িষার খ্যাতনামা কবি ডঃ মায়াধর মানসিংহ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন:

"সেটা অর্দ্ধশতাব্দীর চেয়েও আগেকার কথা। তখন ওড়িষার বুক থেকে দেবদাসী প্রথা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। তখন আমি স্কুলের ছেলে। তখন আমার বয়স কতই বা! তবু তাকে দেখে মনে হল, এ যেন আমাদের এই সমাজের কেউ নয়, এক মধ্যযুগের কবিতার নায়িকা যেন পথ ভুল করে এ যুগে চলে এসেছে। প্রায় আধঘণ্টা কাল ধরে তিনি নিঃশব্দে নেচে চলেছিলেন। তার পাশে বসে একজন প্রবীণ বয়সের লোক তাঁর নৃত্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাখোয়াজ বাজিয়ে চলেছিলেন। সম্ভবত তিনিই তাঁর নৃত্যের গুরু। তাঁর সেই নৃত্যরত মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে মনে হলো, তিনি যেন সেই নৃত্যের মধ্য দিয়ে দেবতার কাছে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে চলেছেন।

"সে দিনের স্মৃতি আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। অবশেষে নাচ শেষ

হয়ে গেল, তিনি একপাশে বসে পড়লেন। কিন্তু তারপর যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। তিনি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে নাচছিলেন, একদল তরুণ ও প্রবীণ ভক্ত ভক্তির আবেগে সেই মাটির উপর লুটোপুটি খাচ্ছিল। অথচ এই মেয়েটি তাদেরই একজন, যাদের তারা ঘৃণা করে, যাদের তারা ঘৃণা ভরে নাম দিয়েছে মহরি অর্থাৎ কলঙ্কিনী। এই অপরূপ নৃত্যের মধ্য দিয়ে তার সমস্ত কলঙ্ক যেন ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। সেই মুহূর্তের জন্ম সেই কলঙ্কিনী যেন এক দেবী মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেছে।

"কিন্তু তাই বলে যে কোনো দেবদাসীর কাছ থেকে এমনটি আশা করা যায় না। যে গ্লানি ও কলঙ্কের বোঝা তাদের বহন করে চলতে হয় তার মধ্যে কজনের পক্ষে এটা সম্ভব! ভক্তি আর কলানৈপুণ্যের মধ্যে যথাযোগ্য সংগতি ঘটলে তবেই এই ললিতকলা পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক হয়ে উঠতে পারে। সকলের কাছ থেকে তা আশা করা যায় না। এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি-চরিত্রের মধ্যে প্রভেদ থাকবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। এই দেবদাসীরা সমাজের নানাস্তরের নানা ধরনের পরিবার থেকে সংগৃহীত হত। তারা এক একজন এক একরকম ইতিহাস বহন করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই মেয়েটি এমন নাচ কি করে নাচল? এতো নৃত্য নয়, মনে হয় যেন এক সুন্দরীর প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নিঃশব্দ কবিতা ছন্দিত হয়ে উঠছে।"

আগেই বলা হয়েছে, ওড়িয়া সমাজের সাধারণ মানুষ এই মহরিদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত। কিন্তু বাধ্য হয়ে তাদের যে অস্বাভাবিক ও বিকারগ্রস্ত জীবন যাপন করতে হয়, সেজন্ম তাদের দায়িত্ব কতটুকু? তারা তো দুর্ভাগ্যের শিকার মাত্র। কিন্তু সকলের ঘৃণা ও অবজ্ঞা মাথায় নিয়েও তারাই এতকাল ধরে ওড়িষী নৃত্যকলাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা এই উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে।

নৃত্যচর্চাই ছিল তাদের জীবনের প্রথম পেশা। যে বয়সে বালিকা ও কিশোরীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোমলতা ও নমনীয়তা থাকে, সেই সময় থেকেই এদের নিয়মিত ভাবে কঠিন নিয়ম অনুসরণ করে নৃত্যকলাকে আয়ত্ত করতে হত। এই সাধনা কি সহজ সাধনা!

গত কয়েক শতাব্দী ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ওড়িশাকে বহু দুর্যোগ বহন করে চলতে হয়েছে। কিন্তু সেই ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও এই দেবদাসীরাই ওড়িষী নৃত্যকলার দীপশিখাটিকে

জ্বালিয়ে রেখেছে। আজ ওড়িষী নৃত্যকলার খ্যাতি দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া দেশের বাইরে, দেশ-বিদেশে তার সমাদর বড় কম নয়। নৃত্যের যারা প্রকৃত সমজদার, তারা শতমুখে এর প্রশংসা করছেন। ওড়িষাকে এজন্য মহরি নামে পরিচিত দেবদাসীদের কাছে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে।

প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ইন্দ্রানী রহমান এই দেবদাসীদের সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলেন, সেই কথাগুলি এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে :

"আমি প্রথমে মহরিদের নৃত্য-নৈপুণ্য স্বচক্ষে দেখার জন্য ওড়িষায় গিয়েছিলাম। আগে কথা ছিল 'মহরিদের' প্রতিনিধি-স্থানীয়েরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। কিন্তু আমি পরে সেই ব্যবস্থাটাকে বদলে দিয়ে নিজেই তাদের বাসস্থানে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করলাম। তাদের কাছে গিয়ে যা দেখলাম আর শুনলাম, তাতে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বিশেষ করে তারা গীত-গোবিন্দের অষ্টপদীগুলিকে যে ভাবে নৃত্যের মধ্য দিয়ে রূপ দিল, তা আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলল। সেদিন গীত-গোবিন্দের অষ্টপদীগুলিকে অবলম্বন করে যে অপূর্ব নৃত্য-রূপটি প্রদর্শিত হয়েছিল, ভারতের প্রচলিত ক্লাসিকাল নৃত্যের মধ্যে আমি তার তুলনা খুঁজে পাই না।

"আমি ভারতের সর্বত্র ওড়িষী নৃত্য প্রদর্শন করেছিলাম। শুধু ভারতেই নয়, সারা পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের যে সমস্ত বিশিষ্ট স্থানে আমার নৃত্যানুষ্ঠান করেছি, তাদের মধ্যে এই ওড়িষী নৃত্য বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।"

এই ওড়িষী নৃত্যকলা দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। এই নৃত্যকলা এক অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য বহন করে এসেছে। গঙ্গা বংশের রাজা অনঙ্গভীমদেবের বোন রাজকুমারী চন্দ্রিকা কটকের বরোবাটী দুর্গে এই নৃত্য প্রদর্শন করে অভিজাত সমাজের দর্শকদের মুগ্ধ করতেন। ইন্দ্রানী, প্রিয়ংবদা ও অন্যান্য নৃত্যশিল্পীরা সেই নৃত্যের সাহায্যেই এই বিংশ শতাব্দীর বিদগ্ধ নৃত্যরসিকদের মনকে বিস্ময়াভিভূত ও মুগ্ধ করে তুলতে পারবেন এমন অসম্ভব কল্পনা করতে পেরেছিল! কিন্তু ওড়িষার বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরের ভাস্কর্যের মধ্যে যে নৃত্যভঙ্গিগুলি মুদ্রিত হয়ে আছে, তারাই এই সত্যটিকে প্রমাণিত করেছে।

বর্তমানে ওড়িষায় নৃত্যকলা, সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের শিক্ষাদানের জন্য

বেসরকারী উদ্যোগে 'কলা বিকাশ কেন্দ্র' নামক একটি প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলেছে। প্রধানত বাবুলাল যোশীর উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল। কলা বিকাশ কেন্দ্র বিভিন্ন উপলক্ষে সরকারী সাহায্য লাভ করে আসছে। বর্তমানে ওড়িষী নৃত্যকলার শ্রেষ্ঠ শিল্পী সংযুক্তা পানিগ্রাহী (বর্তমানে পট্টনায়ক) এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর নানা দেশে ওড়িষী নৃত্যকলা প্রদর্শন করে অপূর্ব শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে চলেছেন।

উপন্যাস লেখা

অমিয়ভূষণ মজুমদার

এটা সুমিত বাগচির কোয়ার্টারের হল।

শহরের দুটো রাস্তা—একটা পুবপশ্চিমে অন্যটা উত্তরদক্ষিণে—যেতে যেতে এখানে কাটাকাটি করেছে। সংযোগের ঠিক মাঝখানে একটা গোল বেদি। ট্র্যাফিক পুলিশের দাঁড়ানোর জায়গা। কিন্তু কোনদিনই পুলিশ দাঁড়ায় নি। এ সংযোগটা শহরের কেন্দ্রে নয়।

পুবমুখো রাস্তাটার দক্ষিণপারে এই কোয়ার্টার। পথ আর কোয়ার্টারের মধ্যে সাত-আট ফুট কাঠের রেলিঙে ঘেরা জমি। বাগান হতে পারত। এখন জঙ্গল। কোমর সমান উঁচু ঘাস, কয়েকটা ঝোপড়া গাছ, অন্তত দুরকমের লতা লতিয়ে লতিয়ে গাছগুলোকে ঢেকে কোয়ার্টারের একটা দরজা ঢেকে কোয়ার্টারের ছাদ গিয়ে উঠেছে। লতাগুলোয় ভায়োলেট রঙ-এর থোকা থোকা ফুল। বুনো লতা বলে মনে হয়। কিন্তু খুব ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যায় ঝোপড়া গাছগুলোতে লতার আগাছা ভেদ করে দু-একটা ফুল উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ফুলগুলোকে চেনা-চেনা মনে হবে। তখন অনুমান হবে তা ক্যামেলিয়া। তখন সন্দেহ হবে লতাগুলোও হয়তো বুনো নয়। তখন বুঝতে বাকি থাকবে না কোয়ার্টারে যারা থাকছে তারা এদিকের প্রবেশ পথ আর বাগানকে উপেক্ষা করছে বেশ কিছুদিন থেকে, নতুবা বেশ কিছুদিন কোয়ার্টারে কেউ ছিল না। আর পি-ডাব্লু-ডি তো বছর তিনেকের আগে কোনো কোয়ার্টারেই হাত দেয়ার সুবিধা পায় না। শ্যামরক্

রঙের এই একতলা কিউবের গায়ে কিউব বসিয়ে তৈরি কোয়ার্টারে ঢুকবার অন্য দরজা উত্তর দক্ষিণমুখো রাস্তার পূর্বপারে। রাস্তা থেকে আট-দশ হাত এগিয়ে পনের ফুট বাই দশফুট একটা বাঁধানো চত্বর, যার উপরে আট-দশটা সিমেন্টের টব এখানে ওখানে বসাল, একটা তো কাত হয়ে আছে, আর কোনোটাতেই ফুল গাছ নেই, তার উপরে বৈঠকখানার দরজা।

কিন্তু আমরা কোয়ার্টারের হলের কথায় ছিলুম। হল নামটা সুজিতের দেয়া। এটা এই চওড়ার চাইতে দ্বিগুণ লম্বা ঘরখানা, যার দেয়াল সাদা আর মেঝে সবুজ রং-করা সিমেন্টে সাদা-কালো পাথরের কুচি বসিয়ে তৈরি, এটাকে ডাইনিং রুম বলা হত। পশ্চিম দিকে একটা ফ্রেঞ্চউইনডো, যাতে গ্রিল বসানো। পুবদিকে উত্তরদিকে ঘেঁষে একটা দরজা, যাতে দুনম্বর শোবার ঘরে যাওয়া যায়, দক্ষিণদিকের দেয়ালে একটা দরজা মাঝামাঝি জায়গায়, যাতে এক নম্বর শোবার ঘরে যাওয়া যায়। উত্তর দিকের দেয়ালে তিনটি দরজা। একটি বাথরুমের, একটি রান্নাঘরের, অন্যটি সেই জঙ্গলে ঢাকা অব্যবহৃত প্রবেশ পথ। হলের মাঝখানে কালো একটা চৌকোণ টেবিল। উত্তরদিকের পশ্চিম প্রান্তের দরজা আব মাঝের দরজার মাঝখানে বেসিন। বেসিনের তাকে বসানো দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম আর একটা আধময়লা তোয়ালে। উত্তরদিকে মাঝের দরজা আর পশ্চিম প্রান্তের দরজার মধ্যে একটা কালো কাঠের চওড়া আলমারি, হয়তো ওয়ারড্রোব ছিল। এখন তার মাথায় বসানো ছোট বড় প্ল্যাস্টিকের ঝুড়ির একটিতে কিছু আনাজ, অন্যটিতে কয়েকটি ডিম। দক্ষিণ দিকের মাঝামাঝি, শোবার ঘরের দরজার পশ্চিমে, দেয়ালে, একটা ঝুটো ফায়ার প্লেস। কেউ কখনও আগুন জ্বালবে না বলেই ফায়ার প্লেসের ভিতর দিকটা লাল রঙ করা, আগুনের অনুকরণে। ফায়ার প্লেসের উপরে ম্যান্টলপিসে দু-তিনটে লম্বা লম্বা বোতল। রঙিন লেবেল দেখে মনে হয় টম্যাটো কেচাপ, অরেঞ্জ স্কোয়াশ হতে পারে, কিন্তু এখন, বোঝা যাচ্ছে, তাতে খাওয়ার জল আছে। বোতল কয়েকটি থেকে কিছু বাঁয়ে একটা বেতের ঝুড়ি, তার ভিতরে কয়েকটি বোতল। কোনোটি সোজা কোনোটি কাত হয়ে আছে। কোনোটি অর্ধেকভর্তি, কোনোটি পুরো। পুরো একটা বোতল যে দলপতির মতো সোজা তা থেকে তার সঙ্গীদের বোঝা যায়—তার লেবেল থেকেই প্রমাণ সে হোয়াইট হর্স। পুব দেয়ালে যে-দরজা তার দক্ষিণে একটা আলনা, যার উপরে কয়েক জোড়া সুট। রং, যা স্ট্রাইপ, চেক ও প্লেন হলেও, সবসময়েই নীলের বিভিন্ন শেড। কয়েকটি যত্নে গুছিয়ে ঝোলানো সুটের একটা সুট অবিন্যস্তভাবে

তাড়াতাড়িতে রাখা। এই অবিন্যস্ত ভাবটা আরও বিশৃঙ্খল দেখাচ্ছে আলনার সামনে রাখা একজোড়া জুতো থেকে। যেন অসহিষ্ণু অসন্তোষে কেউ পা থেকে ছুঁড়ে ফেলেছে। আলনারও দক্ষিণে কয়েকটি বেড়ানোর লাঠি, এবং একের বেশি ছাতা। সবই বেশ সৌখীন, কিন্তু অগোছালো। একটা ছড়ি তো ছুঁড়ে ফেলা জুতোজোড়ার পাশে, মাটিতে। অনুমান হয়, কাল রাতে পোশাক ছাড়ার সময়ে সুস্মিত বাগচি অধীর, অস্থির, হয়তো বা ক্রুদ্ধ ছিল।

টেবলটার উপরে একটা বই, খোলা, পেপার ওয়েট দিয়ে পাতায় চাপা দেয়া। তার সামনে ছাই বোঝাই অ্যাশ্‌ট্রে। বইটা দেখে সুস্মিত বাগচির জীবিকা সম্বন্ধে এই ধারণা হয় যে জমিসংক্রান্ত কাজে সে নিযুক্ত আছে। বই-খানার নাম ল্যাণ্ড লেজিশলেশন, অর্থাৎ চাষের জমি এবং শহরের ঘরবাড়ি তোলার জমি সম্বন্ধে যত আইন হয়েছে তার সঞ্চয়ন। এ-সব আইনের উদ্দেশ্য যে পূর্বস্থিত একটা ব্যবস্থার পরিবর্তন, তা অবশ্যই সুস্মিত জানে। বইটার পাশে একটা ফাইল, তার কাছাকছি কালির বোতল এবং কয়েকটা কলম। অনুমান হয়, এই খাওয়ার টেবলে সুস্মিত কাজ করেও থাকে।

পুব দিকের দেয়ালের দরজার উত্তরদিকে দেয়াল ঘেষে একটা হারপসিকর্ড—যে জানে না তার মনে হতে পারে সেটা নতুন ধরনের অর্গ্যান অথবা ছোটজাতের পিয়ানো। বাজনার শব্দ শুনলে, যে জানে না, তার মনে হবে কতকটা যেন গিটারই, কখনও মনে হবে পিয়ানো, কিন্তু ঠিক পিয়ানোও যেন নয়। অভিধান খুললে জানা যাবে যন্ত্রটি অষ্টাদশ শতাব্দীর ঠিক মধ্যদশকে, বিশেষ করে পিয়ানোর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, ক্রমশ অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে সারা পৃথিবীতে বছরে হয়তো কয়েক শ করে তৈরি হত, মিউজিয়ামে রাখা সেকালের যন্ত্রগুলোর অনুকরণে। সুস্মিতের ঘরের যন্ত্রটি যে পুরনো তা সেটার সেকেলে মেহগিনি পালিশ থেকে বোঝা যায়, কারুকাজ থেকে বোঝা যায় কিছু ভাঙচুর হয়েছিল, যা নতুন কাঠ দিয়ে মেরামত করা হয়েছে। হয়তো দু আড়াই শ বছরের পুরনো নয়, হয়ত প্রথম মহাযুদ্ধের আগে আগে তৈরি। যারা ইতিহাস জানে তারা বুঝবে এ যন্ত্রটা বিংশ শতাব্দীতে তারাই সংগ্রহ করত যারা স্কারলেট্টি, হেনডল্‌-এর সেই সব হারপসিকর্ডের সঙ্গীতকে পিয়ানোতে বাজিয়ে সবটুকু তৃপ্তি পেত না। সুস্মিত বাগচি এটাকে অবশ্যই নিলামে কিনে থাকবে। আর সে মাঝে মাঝে এটার দুই সারি দাঁতের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গান বাজায়, যা সাধারণত এবং অন্যত্র গিটার এবং পিয়ানোতে বাজাতে শোনা যায়। একটু নতুন ধরনেরই শোনায় বটে সে বাজনা,

যতই না বিশ্বভারতীর মনোনীত স্বরলিপিকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করুক। এই নতুন ধরনটাই, পার্থক্যটুকুই, হারপসিকর্ডের বৈশিষ্ট্য। তাই বলে এমন মনে করার কারণ নেই স্কারলেটি বা হেন্ডলের কোনো সঙ্গীত সে বাজাতে পারে শোনার মতো করে। এবং এটাও তো সত্য যে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন হারপসিকর্ডে গান বসিয়েছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বহু প্রচলিত পিয়ানোর গানগুলো থেকে যে পার্থক্য টেনে বার করছে সুমিত, তা টিম্বার এবং টোনের, যা নতুন।

সুমিত বাগচির এই ঘরের অপরিচ্ছন্নতা দেখে অনুমান করা যায়, টেবিলের উপরে ফাইলের আড়ালে হলুদে সর পড়া আধখাওয়া চায়ের কাপটা, যা হয়তো দুদিন থেকে তেমনই আছে, একটা প্রমাণ, সে একা থাকে। অনুমানটা আংশিক সত্য। কোনো স্ত্রীলোক ধারে কাছে নেই। এক ছোকরা তার সব কাজ করে থাকে।

ছোকরা মৈথিলি ব্রাহ্মণ সন্তান। তিন-চার বছর থেকে সুজিতের সঙ্গে আছে। রান্না করে। চাকরের কাজ করে। সরকারি চাকরি দেয়ার আশ্বাস পেয়ে ছোকরার পিতা তাকে সুমিতের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়েছিল। সুমিত তাকে তার দারিদ্র্যর সুযোগ নিয়ে নষ্ট করেছে। সে এখন রোজ রান্না করে এবং খায়। কিন্তু সে একবার আধুনিক ধরনের চুল কেটে টিকি বিসর্জন দেয়াতে সুমিত মহা তম্বি করে বলেছিল, তার হাতে সে খাবে না। কখনো কখনো থালা-বাসন ধোয়া নিয়ে তকরার হয়। সুমিত বলে, বামুনের ছেলে আমার বাসন ধোবে কি? যার ফলে ওই কাপটা পড়ে আছে। কারণ ছোকরা বুঝতে পারছে না—ওটা তাকে পরীক্ষা করার জন্য সুমিত সে ভাবে রেখে দিয়েছে কিনা, এবং সে জন্য, ইতিমধ্যে অন্তত দুবার, সুমিতের বাসন ধুতে ভুল হওয়ার ফলে নিজে সে ধুয়ে রাখলেও, ওই কাপটাকে সে সরায় নি। শুধু কি মুরগি। হোয়াইট হর্সের তলানিও মাঝে-মাঝে চাই ব্রাহ্মণ সন্তানকে দিয়ে থাকে।

কাপটা থেকে যেমন কিছু প্রমাণিত হতে পারে—সুদৃশ্য ছড়িগুলো এবং সুদৃশ্য ছাতা দুটো থেকে বোঝা যায় সেগুলো সুমিতের প্রিয়। অনুমান করা যায় যে যখনই বাড়ির বাইরে যায় তার হাতে ছাতা কিংবা ছড়ি থাকে। ছাতা তবুও প্রয়োজনের জিনিস যদিও তার ব্যবহার আধুনিক কালে কমে যাচ্ছে। কিন্তু ছড়ি, তাও সুমিতের এই আটাশ বছর বয়সে? ছড়িগুলোর সৌন্দর্য এবং সংখ্যা প্রমাণ করছে

সুমিত সেগুলোকে স্যুটের মতো অপরিহার্য মনে করে থাকে। তার বয়সের মানুষেরা এই শহরে ছড়ি ব্যবহার না করলেও দেখা যাচ্ছে বাড়তি অর্থব্যয় করে তা সে করে। যে-ছড়িটা জুতোর পাশে মাটিতে পড়ে আছে সেটা যখন রাত এগারোটায় সুমিত বেড়ানো শেষ করে বাড়ি ফিরেছিল তখন সঙ্গে ছিল।

রাত এগারোটা পর্যন্ত বেড়ানো সুমিতের অভ্যাস। সাতটায় সে তার রাতের খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে পড়ে। যখন তার এই ভ্রমণ শুরু হয় তখন শহরের প্রধান পথগুলো থাকে আলোয় ঝলমল; রাস্তার আলো, দোকানের আলো, বাড়ির আলো, পথে লোক থাকে। কোথাও তারা ক্রেতা, কোথাও তারা ভ্রমণকারী, কোথাও-বা দোকানের সামনে বসে তারা আড্ডা দেয়। সেই সব পথে সুমিতের দামি নীলাভ স্যুটগুলো ঝকঝক করে, তার হাতের লাঠির পালিশ কখনো কখনো বিদ্যুতের মতো ঝলকায়। সুমিত জানে এই ছোট্ট মফঃস্বলি শহরে রাত আটটা থেকেই পথে-পথে ভাটা লেগে যায়। দোকানের ঝাঁপ-দরজা বন্ধ হতে থাকে, আলো নিবতে থাকে, আড্ডাবাজেরা দল বেঁধে সেদিনের গল্পটাকে চালাতে চালাতে বাড়িব দিকে ফেরে। ন-টা নাগাদ আলো-আঁধারি সৃষ্টি হয়। দূরে-দূরে পথের লাইট পোস্টগুলোতে আলো থাকে। বন্ধ দরজা জানলা দিয়ে স্তিমিত আলো কখনও কোথাও পথে পড়ে। সেই আলো আর ছায়ায় সুমিতের স্যুটে, ছড়িতে, মুখে কখনও স্পষ্ট আলো পড়ে কখনও ছায়া ছায়া। তারপরে রাত বাড়ে। হয়তো সোজা সোজা পথগুলোর কোনো একটিতে যত দূর চাও শুধু সুমিতকেই দেখতে পাবে, বাড়িগুলোর ছায়ায় নিজেই সিল্যুট ছবির মতো যেন কাঁচি দিয়ে কাটা, কালো আর ধূসর কাগজের কিউবগুলোর মধ্যে দিয়ে সুমিত, দ্রুত নয় কিন্তু লম্বা, পদক্ষেপের ফলে অল্প সময়ে পথ অতিক্রম করছে। মাথার ফেল্ট-হ্যাটের ছায়ায় তার মুখ তখন দেখা যায় কি যায় না।

এই যে পুরনো ব্রাহ্মমন্দিরের নিস্তব্ধ সিলুটের পাশ দিয়ে এগিয়ে কলেজের পথ ধরল। যে-পথে ক্যাসিয়া গাছগুলোর মাঝে-মাঝে লাইটপোস্টগুলো হওয়ায়, আলো, সব সময়েই জালিকাটা হয়ে পথে পড়ে, এবং কোনো সময়েই স্পষ্ট হয় না। কলেজের পথের ধারে কলেজের বাড়িগুলোর কোনো কোনটির মাথায় মৃদু আলো গাছের ডালপালার

ফাঁকে মিটমিট করে। আর তখন সুমিত পথটা যেখানে বাঁক নিয়ে রোড ট্রান্সপোর্টের ডিপোর পাশ দিয়ে গিয়েছে সে পথে ঢুকে পড়ে।

সুমিতের এই ভ্রমণ স্বাস্থ্যের কারণে নয়। তাকে রোগা দেখাতে পারে কারো-কারো চোখে, কিন্তু তা বোধ হয় সে তার ছ-ফিট ছোঁয় উচ্চতা সত্বেও আড়াই ইঞ্চি হিলের আধুনিক জুতো পরে বলে। তার চারিদিকে যারা দিনের অধিকাংশ সময়ে তাদের দিকে চাইতে গেলে সুমিতকে ঘাড় হেঁট করতে হয়। যার ফলে, যেন অভ্যাসে, সোজা মেরুদণ্ডের উপরে তার ঘাড় কিছুটা নিচের দিকে ঝুঁকে থাকে, যখন সে বেড়ায়, তখনও।

অথচ যখন সে বেড়িয়ে ফিরে আসে তখন কোনো কোনো দিন তার চোখের নিচে কালি পড়ে যায়, চোখের দৃষ্টিটা যেন ক্লান্ত, যেন সে কিছু খুঁজে-খুঁজে অবসন্ন। বস্তুত তার চলার ভঙ্গি দেখে এরকম মনে হয়ে যেতে পারে যে সে যেন কোনো অ্যাডভেঞ্চারের অনুসরণে সেই নির্জন পথে ঘুমন্ত বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে চলে, কখনও মনে হতে পারে যেন যে পথের উপরে কিছু পড়ে থাকতে দেখবে, যা সে খুঁজছে।

কিন্তু চোখের দৃষ্টি অবসন্ন বোধ হলেও যখন সে বাড়িতে ফিরে আসে তার মুখের পেশীতে ঠোঁট দুটোতে অনায়াসেই হাসি ফুটে ওঠে। যা থেকে এরকম ধারণা হতে থাকে আমাদের মুখের পেশী আর চোখের পেশীর স্থিতি-স্থাপকতা একজাতের নয়। মুখের পেশীতে অতি সহজে পরিবর্তন হয়, চোখের পেশী যেন ভেবে-ভেবে এগোয়। যেন, যা দেখে এসেছে তার ছাপ সহজে ছাড়তে চায় না। ফলত সুমিত চেয়ারে বসলে, সেই হলঘরে কালো টেবলেই, তার ছোকরা রসুইয়ে গরম দুধের গ্লাস নিয়ে এলে, কোনো কোনো দিন সুমিত নিজের জন্য পছন্দসই একটা বোতল থেকে কিছুটা ঢেলে নেয়, আর ছোকরাকে বাধ্য করে দুধটাকে খেয়ে ফেলতে। তখন তার গোলাপি রঙের ঠোঁটদুটো হাসতে থাকে, কিন্তু অন্তত কয়েক মুহূর্ত ধরে তার চোখ বরং প্রুশিয়ান ব্লুর মতো কালচে-নীল দেখায়, যেন তা সামনের শূন্য দেয়ালে কোন অস্থায়ী ছবি দেখছে। তারপরে তার চোখ আর মুখের পেশী একই ছন্দে হাসি-হাসি ঘুম-ঘুম ভাব নিতে থাকে।

সুমিতের ঠোঁটের রং যে গোলাপি বলা হল তা যথার্থ। আজকাল আধুনিকারা লালের বদলে ঠোঁটের জন্য যে অতি হালকা সাদার ধার

ঘেঁষা লিপস্টিক ব্যবহার করে, কতকটা তার মতো। তা বেমানানও হয় না। সুমিতের গায়ের রং এত গৌর, পার্শিদের কারো-কারো কম বয়সে যেমন থাকে। পার্শিদের সঙ্গে তুলনার আর-একটা কারণ তার নাক, যা সরু এবং খাড়া এবং মুখের তুলনায় বরং বেশ বড়।

রোজ রাত এগারোটায় সে বেড়িয়ে ফেরে, এবং রোজ ছোকরা রসুইয়ে দুধ খেতে বাধ্য হয় এমন নয়। কাল রাতে সে ন-টাতেই ফিরেছিল। কাল রাতের ছুঁড়েফেলা জুতো, মাটিতে পড়ে থাকা ছড়ি, যতই অসঙ্কুিতার প্রমাণ হোক, সে কোট খুলে বরং টেবলের কাছে চেয়ারে বসেছিল। ফাইলটাকে টেনে নিয়ে অফিসে কাজ করার মতো স্থির হয়ে বসে লিখতে শুরু করেছিল।

অফিসে তাকে স্থির হয়ে বসেই কাজ করতে হয়। কেননা তার বয়স আটাশ হলেও, সব-ডেপুটি হলেও সে ম্যাজিস্ট্রেট। তার কাছে যারা অফিসে আসে, এবং যারা অফিসে কাজ করে তারা অধিকাংশেই বেশ বয়স্ক। কাজগুলোও কঠিনের ধার ঘেঁষা। সে যে সুচারুরূপেই কাজগুলো করতে চায় তার প্রমাণ ল্যাণ্ড লেজিসলেশন নামে এই বইখানি, যার খোলা পাতার উপরে কাঁচের পেপার ওয়েট চাপা। এ তো বলাই বাহুল্য আমাদের এই বর্তমান কালে সব চাইতে মূল্যবান, সব চাইতে বিপজ্জনক, এবং হিংস্রও বলা যায়, হয়ে উঠেছে জমি সংক্রান্ত আইন এবং বেআইনের নানারকমের পারস্পরিক অবস্থা।

ছোকরা রসুইয়ে দুধ আনবে কি না জিজ্ঞাসা করাতে তাকে রাত দশটায় তা আনতে বলে তখন আবার হাসিমুখে লেখায় মন দিয়েছিল সুমিত। সে লিখলে: এবার এই শহরটার একটা নাম দিতে হচ্ছে। মনে করা যাক, এর নাম কুচাই। অবশ্যই এটা শহর, এবং পশ্চিমবঙ্গেরই শহর, ট্রেন থেকে স্টেশনে নামলেই বোঝা যার যে এটা আদৌ কাল্পনিক নয়, শুধু নামটা বদলে দিচ্ছি। রাস্তাঘাট, হাটবাজার, স্কুল-কলেজ, আদালত, মন্দির এমনকি ব্রাহ্ম সমাজের মন্দির, মিউনিসিপ্যাল অফিস, হাসপাতাল—সবই নিরেট অস্তিত্ব নিয়ে এই সহরের বাস্তবতা ঘোষণা করে।

কিন্তু তারপরে সুমিত আর লেখে নি। যেন এই সহরের নামকরণ করতে পারাটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে তার সঙ্গে তুলনা দিতে হলে কোনো ঔপন্যাসিকের একটি কঠিন পুরো পরিচ্ছেদ লেখার গুরুত্বের কথাই মনে করতে হবে। কিংবা তার সেই মানসিক একাগ্রতা এবং

উদ্ভাবন-শ্রমের কথা মনে আসবে যে আদিমানুষ প্রথম সমুদ্রকে সমুদ্র বলেছিল। কিংবা আত্মার বসতি কোথায় এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথম স্বর্গ শব্দটাকে উচ্চারণ করেছিল। অনেক সময়েই এমন হয় যে একটিমাত্র শব্দবীজের মতো একটা গোটা চিন্তার পৃথিবীকে ধারণ করতে পারে। এ সহরের নাম আবিষ্কার সেই বীজ আবিষ্কারের মতো, যার ফলে পরের দিনও চিন্তাটা হারিয়ে যাবে না—এই আশ্বাস পেয়ে যেন সুমিত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে গিয়েছিল। তার সেই ব্রাহ্মণ সন্তান রসুইয়ে যথাসময়ে তার নাইট-ক্যাপ দুধ গরম করে এনে, অনেকক্ষণ হলে অপেক্ষা করে করে যখন বুঝতে পারলে সুমিত সকলের আগে শোবার ঘর থেকে বেরোবে না, কি করবে এই চিন্তায় অনেকবার তার টিকির বোঝা সমেত মাথা দুলিয়েও কর্তব্য স্থির না করতে পেরে দুধটুকু নিজেই খেয়ে ঘুমাতে গিয়েছিল। কারণ দুধ বাসি হয়ে নষ্ট হলে সুজিত বেশি রাগ করতে পারে এই ভয় ছিল তার।

এই কুচাই সহরটা কলকাতা থেকে দূরে। ব্রডগেজের প্রকাণ্ড আর ভারি-ভারি ট্রেনগুলো উর্ধ্বশ্বাসে এবং কখনও কখনও নানা রকমের পতন ও স্খলনের ভয় দেখাতে দেখাতে সহরটার আট-দশ মাইল দূরে এক স্টেশনে থেমে দাঁড়ায় এমনভাবে যে সে যেন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কলকাতা থেকে এই এতদূর এসে ভালো করে নি। যেন ঘর্মাক্ত এবং ক্লান্ত, যেন সর্দিগর্মিতে মূর্ছা যাবে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে স্টিম ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর তখন তার কাজ থাকে না। কেন ট্রেনটা আর আট-দশ মাইল মাইল এগিয়ে সহরে যায় না এ সমস্যার সমাধান করতে হলে হয়তো সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির সাহায্যে কমিশন বসাতে হবে। হয়তো কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে কোর্টে এফ-আই-আরও দেয়া যেতে পারবে।

তাতে কিন্তু সহরে পৌছানো যাবে না, এই স্থির করে সুমিত কুচাইর ভাগ্যে নির্ধারিত ছোটমাপের দুর্বল চেহারার মিটারগেজের গাড়িতে চেপে বসেছিল।

এই হীনতার জন্য কাউকে এমন কি ভাগ্যকেও সুমিতের দোষ দেয়ার উপায় নেই। কারণ এই বদলির ব্যবস্থাটা সে নিজে নিজের উপরে টেনে এনেছে। যে সহরে বদলি করলে ডাক্তার চাকরি ছেড়ে দিতে চায়, পুলিশ অফিসার সখেদে বলে আমার মামা নেই কি করব, অধ্যাপকের পরিবারে

ডাইভোর্সের দুশ্চিন্তা ওঠে, সেখানে বদলির কথা কানে ওঠা মাত্র সেক্রেটারিয়েটের পূর্বপরিচিত এক মেজকর্তার কাছে আবেদন করেছিল কুচাই-এ আসার।

একটাই মাত্র ফাস্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে সেই ছোট গাড়িতে, সেজন্য অত্যন্ত ভিড়। এবং ভিড়ের সকলেই সুট পরিহিত। এবং কিছুটা পরস্পরের পরিচিত। এবং গাড়ি ছাড়ার আগে থেকেই ইন্দিরা গান্ধীর দুর্মতি, দুরভিপ্রায়, দুর্ভাগ্য, এবং ফার্নাণ্ডেজ প্রমুখের মানবতা, মহত্ব ইত্যাদি নিয়ে যেমন হওয়া উচিত এক সমাজ সচেতন মানবগোষ্ঠীতে ঠিক তেমন উষ্ণ এবং শব্দায়মান হয়ে উঠেছিল যাত্রীরা। সুমিত যেন সারারাত ভালো ঘুম হয় নি বলে উদাস এবং নিস্পৃহ হয়ে ভিড়ের প্রান্তে বসে ছিল। তখন তাকে আত্মকেন্দ্রিক, দর্পিত, জনসাধারণ থেকে সুদূরেস্থিত একজন মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল। একদিক থেকে তা যুক্তিপূর্ণও হত কেননা সে সময়ে সে ডিমোক্র্যাসি, এমারজেন্সি, সমাজতন্ত্র, হরিজন ইত্যাদি যে সব বিষয় নিয়ে আমরা সব সময়ে চিন্তাতুর তা সবকে এড়িয়ে কুচাই সহরটার কথাই ভাবছিল।

কিন্তু বেলা ন-টার কুয়াশাহীন কিন্তু ছায়াগ্রস্ত শীতের রোদে কুচাই স্টেশনে নেমে তার মনে হয়েছিল সে যেন এক সৌরভ পাচ্ছে। অতিসাধারণ একটা মিটারগেজ রেলের স্টেশনে সাধারণ দিনে যে ব্যস্তসমস্ত দু-মুখী জনতার স্রোত হয় তাতে সৌরভ যদি কেউ পায় তবে বুঝতে হবে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ বা জনসাধারণ কেউ দায়ী নয়।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা ঘোড়াগাড়ি দেখতে পেয়ে সুমিত মনে মনে বলেছিল, দেখো, কুচাই। এখন কি অন্য কোথাও স্টেশনে একটা গোলাকৃতি ঘোড়াগাড়ি পাওয়া যায়। সুমিত ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তার সেই রসুইকে বলেছিল, ধর, ধর ওই গোল ঘোড়াগাড়িটাকেই ধর। সেটাকেই ধরা গিয়েছিল। মালপত্র তার মাথায় চাপানো হলে স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে নামতে তীব্র সেই গন্ধটা নাকে লেগেছিল যা ঘোড়ার আড্ডায় থাকে। কিন্তু একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল সুমিত। একটা গোল বাগান থাকার কথা এখানে। এদিক-ওদিক চেয়ে জঙ্গল হয়ে যাওয়া বাগানের এক কোণ দেখতে পেলে সে। তা-ছাড়া সর্বত্র বাঁশ, টিন, কাঠের তৈরি ছোট-ছোট ঘর—তাকে তুমি ছাপরা, খুপরি, ঝুগ্‌গি যাই বলো না যেন—বাগানটাকে ঘিরে ফেলেছে, এমন করে যে বাগানের ভগ্নাবশেষকে কষ্ট করে আবিষ্কার করতে হয়। এখন, এই যে ঘরগুলো, যাকে আধুনিক সহরবাসীরা উটকো

বিপত্তি মনে করে, মনে করে একবার কোন ম্যাজিকে এগুলো সরিয়ে দেয়া যাবে, আর আধুনিক সহর মাটি ধুয়ে ফেলা সোনার মতো আবার হেসে উঠবে, সেগুলোই কিন্তু প্রকৃত এবং বাস্তব আধুনিকতার প্রমাণ।

স্বমিত সেই গাড়িতে সহরের দিকে যেতে ভেবেছিল: হবেই তো, স্বাভাবিকই তো, বারো বছরে পরিবর্তন যে-কোনো সহরের হবে এটা প্রথমেই বুঝে নেয়া ভালো। তা ছাড়া যে-সৌরভ সে পাচ্ছিল সেটা কোনো সৌরভের স্মৃতি নয়, অর্থাৎ বারো বছর আগে যখন তারা কুচাই স্টেশনে নেমেছিল তখন বাগানটার নানা রঙে মুগ্ধ হলেও ফুলগুলোর সৌরভ পাওয়া যায় নি। তা হলে সেই সৌরভটা সেই বারো বছর আগেকার স্মৃতির সুগন্ধ। কিংবা অতীত আর আধুনিকতার সন্ধিস্থলে দাঁড়ালে যে উবে যাওয়ার অনুভূতিটা হতে থাকে সেটাকে সুগন্ধ সৌরভ ইত্যাদি নাম দেয়া হয়ে থাকে। দেখো! পাণ্ডবরা বারো বছর পরে হস্তিনাপুরে ফিরে কি সেই সহরের এমন সৌরভ পেয়েছিল?

বারো বছর আগে পনের-ষোল বছরের স্বমিত তার মা মঞ্জুলাকে নিয়ে এক শীতের সকালেই এসেছিল। বিপদ মাথায় করে আসা বলতে পারা যায়। কিন্তু বিপদ যখন কেটে যায় তখন সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে একটা খুশির আমেজ আসে। স্বমিতের দিদির ছেলেপুলে হওয়ার কথা। ভগ্নীপতি পুলিশের লোক, সব সময়েই ব্যস্ত। সেই সমস্যা সমাধানের জন্যই মঞ্জুলা এসেছিলেন তাঁর ছেলেকে নিয়ে। কিন্তু সমস্যাটা জটিলতর হয়ে উঠল। ডাক্তাররা মত দিলে স্বাভাবিকভাবে হবে না, অপারেশন জাতীয় কিছু হতে হবে। মঞ্জুলার মুখ শুকলো, দিদি নিজে বরং মাকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করল যদিও সংবাদটা শোনার পর আরও ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। ঠিক তখনই, যখন দিনের আলোকে দমবন্ধ করা ধোঁয়া আর পথঘাট-বাড়ির উঠোনকে মঞ্জুলার অকূলপাথার মনে হচ্ছে, তখন একদিন বলেছিলেন এই সহরে সুশোভন খাঁ থাকেন না কি এখনও? সহরে একজন মানুষ থাকতে পারে এই সংবাদে একজনকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু পুলিশ আর পোস্ট অফিসের সাহায্যে সুশোভন খাঁর বাড়ি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। স্বমিত নিজে গিয়েছিল খবর নিয়ে। মঞ্জুলা বলে দিয়েছিলেন বলতে, বলো মা ডেকেছেন। সুশোভন খাঁ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কে তোমার মা? স্বমিত মায়ের নাম মঞ্জুলা বলার পর আর কোনো কথা হয় নি দিদির ঠিকানা বলা ছাড়া। কিন্তু সুশোভন খাঁ

এসেছিলেন। রং অবশ্যই অত্যন্ত ফর্সা, নাকটাও খাঁড়ার মতো; চিবুকের গোটি প্রায়-বাদামি অত্যন্ত বেশি চুরুটের ধোঁয়ায় যেমন হতে পারে, কিন্তু গোটিতে ধোঁয়া কি তেমন লাগে ঘুমের কয়েক ঘণ্টা ছাড়া চুরুট মুখ-ছাড়া না হলেও, সন্দেহটা দূর হয়, যখন দেখা যায় মাথার চুল কালোর চাইতে বরং বাদামি।

আর তখন থেকেই বিপদ কমতে লাগল। বিপদ অবশ্যই যতটা বাইরের ততটাই মনের। সুতরাং মনের বিপদ কমতে-কমতে প্রায় শূন্য হয়ে-হয়ে বিপদটাকে আর বিপদ বলেই মনে হল না। আর খুশির আবহাওয়াই দেখা দিল যখন সুস্থ সবল শিশুকে নিয়ে দিদি বাড়িতে এল। সেদিন একটা চায়ের বন্দোবস্ত হয়েছিল। আর সেই চায়ের টেবলের এপারে বসে মঞ্জুলা ওপারের সুশোভন খাঁকে বলেছিলেন: এই আমার সেই ছেলে। তারপরও তারা মাস দুয়েক ছিল সহরে, দিদিকে সুস্থ করে তুলতে, কিন্তু সুশোভন আর খোঁজ নেন নি তাদের, আর মঞ্জুলাও বেশ স্বার্থপরের মতো সুশোভন আর তাঁর উপকারকে একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন।

গোল সেই ঘোড়ার গাড়িতে যেতে-যেতে সুমিত স্মরণ করেছিল, কথাটা বলতে মঞ্জুলার মুখ প্রথমে ফ্যাকাসে পরে ক্রমশ লাল হয়ে উঠেছিল, বিশেষ করে তাঁর কানের পাশ। আর সুশোভন খাঁর চোখে প্রথমে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, তারপর ক্রমশ একটা স্নিগ্ধতায় গলে গলে বিস্ময়টা ঠোঁটের পাশগুলোতে একটা স্মিতহাসি হয়েছিল। অবশ্যই বলতে হবে বারো বছর আগেকার একটা কথা, একটা মুখের পরিবর্তন এত স্পষ্ট করে মনে থাকে না, বরং এ স্মৃতিটাতে কতটুকু মনে রাখার ব্যাপার, কতটুকু কল্পনা এখন আর সুমিতের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, একটা কাহিনী বারবার বলতে বলতে যেমন নিজের কাছেই তাকে সত্যি বলে মনে হতে পারে—এ ব্যাপারটা কি কতকটা সেই রকম?

তারপর আবার এই বারো বছর পরেই সহরে সুমিত বাগচি এসেছে, ইতিমধ্যে সে সাব-ডেপুটির চাকরি যোগাড় করে নিয়েছে, কারণ সে সহরে সুশোভন খাঁ থাকতে পারে। থাকবেই একথা বলা যায় না। বারো বছরে কত কী পরিবর্তিত হয়। তা হলেও, সুমিত ভেবেছিল, সেই স্কুল আছে যেখানে সুশোভন পড়েছিলেন, সেই ব্রাহ্মমন্দির আছে যেখানে সুশোভন সরকার ব্রাহ্মসঙ্গীত করতেন, সেই বাড়িটা আছে যেখানে তখন সুশোভন

খাঁ থাকতেন, যে বাড়ি থেকে সুমিত তাকে দিদির বাসায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। লোহা আর কাঁচের তৈরি বাড়ি। হাল্কা গড়নের আর ছোট। তখন, যখন সেই বাড়ি উঠে থাকবে, আর তা হয়তো সুশোভনের জন্যে, হয়তো অ্যালুমিনিয়াম আর ফাইবার গ্লাসে বাড়ি তৈরি করার কথা কেউ ভাবত না।

এটাকে অবশ্যই সুশোভনের পৈতৃক বাড়ি বলা চলে না, যদিও এটা সুশোভনের পিতাই তৈরি করিয়ে থাকবেন। পৈতৃক বাড়ি, যাকে সাত পুরুষের বাড়ি বলে সে তো শ্রীরামপুরের সহরতলিতে। বাড়ি না বলে তাকে দুর্গ জাতীয় কিছু বলা যায়। কিন্তু ঠিক তুলনা বোধহয় আজকালকার হাউসিং এস্টেটগুলো। শুধু শেষোক্তগুলো নিচের দিকে ছড়াতে না পেরে উপরের দিকে উঠতে থাকে, আর সেই গোটা একটা গ্রামের মতো বাড়িটা একটা চতুষ্কোণের চারিদিকে কোথাও তেতলা, অন্যত্র দোতলা পর্যন্ত উঁচু। হাউসিং এস্টেটগুলোয় যেমন পঞ্চাশটা পরিবার বাস করতে পারে, সুমিতের অনুমান, এ খাঁয়েদের বাড়িতেও তেমন ত্রিশ-চল্লিশটা পরিবার থাকা সম্ভব। হাউসিং এস্টেটের আগাগোড়া একই সঙ্গে তৈরি বলে একই চেহারা, এখানে কিন্তু পৃথক পৃথক সময়ে বৃদ্ধিহ্রাসের ফলে ভিন্ন ভিন্ন অংশ পৃথক পৃথক দেখায়। হ্রাস বলতে যেহেতু ধ্বংস পর্যন্ত যেতে পারে, এবং বৃদ্ধি বলতে মেরামতও বোঝায়, বাড়িটার কোনো কোনো অংশ অপেক্ষাকৃত দৃঢ়, কোনো অংশ বা ভেঙে পড়ছে। চারিদিক দিয়ে চারটি রাস্তা। প্রবেশ পথও এক একদিকে এখন দু-তিনটি করে। কোনো কোনো প্রবেশ পথে এমন-কি চটের পর্দাও দেখা যায়, যার ফলে সে-সব অংশ উদ্বাস্তুদের দখলে গিয়েছে বলে মনে হতে পারে। আসলে হয়তো তা নয়। বরং যেন অভিজাত একটা ভাব রাখতেই চেষ্টা, যেন এ-বাড়িতে যখন বাস করো তখন কতগুলো কাজ অন্তত প্রকাশ্যে সাধারণ লোকের মতো করতে পারা যায় না। যার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল সুমিতের সেই যেন এই মনোভাবের উদাহরণ হতে পারে। রোগা ফরসা এক বৃদ্ধ, যার গায়ে গিলে করা চুড়ি হাতা পাঞ্জাবি, গলায় সাদা ফুলের মোটা মালার মতো চুনট-করা চাদরের পাক, হাতে হাড়ের হাতল নক্সাদার ছড়ি। অথচ সে খাঁ-দের একজন নয়। হয়তো উপাধি চক্রবর্তী। হয়তো কোনো খাঁ-কর্তার মেয়ের বংশের, কিংবা মেয়ের মেয়ের বংশের। এ-রকম ধারণা হয়েছিল সুমিতের যে এদের কেউ-কেউ হয়তো ভুলেই গিয়েছে কি সম্বন্ধে-সুবাদে এই বাড়িটায় তারা এক সময়ে এসেছিল।

এখন আর কেউ এদের চলে যেতে বলে না। কে বলবে? শরিকে শরিকে এমন হয়েছে যে এ-বাড়িতে সকলের অংশ আছে বটে, কিন্তু কার কতটুকু অধিকার তা নির্ধারণ করা যায় না। সুতরাং এ বাড়ি মেরামত হতে পায় না, সুতরাং এ বাড়ির কোনো অংশ কেউ বিক্রি করতেও পারে না। বরং খাঁয়েরা, দেখা গিয়েছে, প্রতি প্রজন্মেই দু-একজন করে এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, অন্যত্র বাড়ি করেছে। কেউ কলকাতা, কেউ এলাহাবাদ, যেমন কেউ কুচাই।

এজন্য, অবশ্যই সুমিতের মনে কোনো বিষাদ কিংবা ক্ষেদ নেই। সে জানে জমিদারেরা রাষ্ট্রপরিচালন ব্যবস্থা থেকে এতদূরে ছিল যে তাদের ফিউদল বলাও যায় না। নিছক খাজনা আদায়ের এজেন্ট ছিল তারা ইংরেজ শাসকদের। বিলেতের হাউস অব লর্ডস-এর পীয়রদের রাজনৈতিক ক্ষমতাও ছিল না, কিংবা সেকেলে মনসবদারদের রাজ্য রক্ষা ক্ষমতা। আর এখন তো জমিদারি নামটাই অতীতের বিষয়। বরং যে পরিস্থিতিতে এই বাড়িটার শরিকরা বাড়িটাকে মেরামত, বিক্রি, এমন-কি ভাগ করে নিতেও পারছে না, তা জেনে কৌতুকবোধ করেছিল। তার বরং এ-কৌতূহলও হয়েছিল মাঝে মাঝে খাঁয়েদের কোনো কোনো পুরুষ কেন এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেত। যখন এ-বিষয়টা কথায় কথায় উঠে পড়েছিল সুমিত জোরে জোরে হেসে ওঠে নি, কিন্তু যে বলছিল তার মুখে হাসি জড়িয়ে ছিল, জোরে হাসা অভ্যাস থাকলে শোনা যেত।

সুমিতের মনে ছিল চার-পাঁচ বছর বয়সে এই খাঁয়েদের বাড়িতে সে এসেছে, থেকেছে। দু একজন সমবয়সী যাদের কারো নাম অস্পষ্টভাবে মনে আসে, কিন্তু তাদের আর কোথাও দেখেছে, বয়স হলে, এমন মনে পড়ে না, সুমিতের ধারণা তারা হয়তো এই বাড়ির কেউ হবে। তার আগেও এসেছে কি না, থেকেছে কিনা তার স্মৃতিতে নেই। আসাই সম্ভব, বিশেষ তার মা মঞ্জুলা সে রকম মুড হলে যে গল্প করেন তাতে মনে হবে তাঁর শৈশব, প্রথম যৌবন এবং বিয়ের পরও কখনো কখনো বাড়িটা তাঁর বাড়ির মতো ছিল।

কিন্তু খাঁয়েরা কেউ কি থাকেন? বাড়িটাকে প্রদক্ষিণ করে দক্ষিণের অংশে এসে পড়ে সুমিতের চোখে পড়েছিল গাড়ি বারান্দা, পুরনো লতা বেয়ে উঠেছে, গোল গোল পল তোলা থামের উপরের সেই বারান্দা, আর সেটাকে তার পূর্ব পরিচিত মনে হয়েছিল। গেটটা ভাঙা বলে

ততদূর এগনো যায়। কিন্তু তখন সুমিতের বয়স হয়েছে, সে সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ট্রেসপাশের অনধিকার প্রবেশের আইন সে ভালো ভাবে জানে, শিশুর সরলতা থাকা দূরের কথা। কাজেই দশ-পনেরো মিনিট তেমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে দেখে সে ফিরে যাচ্ছিল। তখন একজন, ঝিই বোধ হয়, তাকে ডেকে সেই গাড়িবারান্দার নিচে দিয়ে একটা পুরনো ওক রঙের দরজা আর পুরনো মার্বেলের সিঁড়ি পার হয়ে একটা ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।

যে ডেকে নিয়েছিল সে যে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল সুমিতকে সে ঘরে একজন নীল মহিলা ছিলেন, আর ঘরটা ছিল লেমন হলুদ। এই ইম্‌প্রেশনটাই সুমিতের মনে আছে। ঘরে ঢুকতে সেই নীল মহিলা হাতের ইশারায় সুমিতকে বসতে বলে জানালার ধারে অন্তত মিনিট পাঁচেক নিজের কাজেই ব্যস্ত রইলেন যেমন ছিলেন। এখন সুমিতের মনে আছে যে মহিলা ছবি আঁকছিলেন। খুব তাড়াতাড়ি হাত চলছিল তার আর মাঝে-মাঝেই তিনি চাইছিলেন সুমিতের দিকে। মিনিট পাঁচেক পরে মহিলা উঠে এসে সুমিতের কাছাকাছি একটা সোফায় বসেছিলেন। তখন যেন সুমিত বুঝতে পেরেছিল ঘরটাকে লেমন হলুদ আর মহিলাকে নীল মনে হওয়ার কারণটা। মহিলার পরণে নীল পাড় দেয়া লেমন হলুদ সিল্ক, হাতে নীল মীনা করা বালা, সোফা আর চেয়ারগুলোর গদি ছিল হলুদ, যার বর্ডার হিসাবে বাদামি রঙের দরজা জানলা, ছবি আঁকার স্ট্যাণ্ড বসানো ছোট টেবলটা; সেই মহিলার চোখ দুটি এবং মাথার চুলগুলোও কালচের চাইতে বরং বাদামি হয়ে বর্ডারের কাজ করে থাকবে। এটা অবশ্যই সুমিতের সেই ঘর এবং মহিলা সম্বন্ধে প্রত্যয়—যা গত এক বছরে ধীরে ধীরে তার মনে গড়ে উঠেছে। তখন দেয়াল, দরজা, আসবাবের মানুষের কথার রেখাগুলোকে উপেক্ষা করে তাদের প্রবহমান রং দিয়ে উপলব্ধি করার সাহস তার ছিল না। বরং তাকে তখন জিজ্ঞাসা করলে কায়ার রেখাকে মুছে দেয়াকে সৃষ্টজগৎকে ধ্বংস করার এক অজ্ঞাত অভূতপূর্ব পাপ বলে মনে করত। এখন এই প্রত্যয়টাই তার কাছে প্রিয় এবং হাসি মুখে সাহস করে ভাবতে পারে, তখন যদি সুমিত ছবি আঁকতে জানত, আর যথাযথ সেই নীল আর লেমন-হলুদকে চোখ থেকে ক্যানভাসে নিতে পারত তাহলে সে ছবিকে ইম্‌প্রেসনিস্ট পদ্ধতির বলা সম্ভব হত, আর তা হত সেজানকে অনুসরণ করে, এমন কারো অনুসরণ।

তখন অবশ্য এ রকম করে ভাবার সুবিধা ছিল না। কারণ সেজান সম্বন্ধে যে পড়াশুনো করেছে সে তো সেখান থেকে কলকাতায় ফেরার পরে, দ্বিতীয়ত সেজান-এর কথা উঠেছিল পারুলবালার সঙ্গে আলাপেই, আর তখন সেই নীল মহিলাই যে পারুলবালা তা পর্যন্ত সে জানত না। বরং একটু বিস্ময় বোধই করছিল সে, কেননা, মহিলা তার কাছাকাছি এসে বসতে না-বসতেই এবং 'আমি দুঃখিত, আপনার সঙ্গে এত দেরি করে কথা বলছি বলে' তিনি এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আগেকার সেই ঝি একটা ট্রেতে সাজিয়ে ওয়েফারের মতো পাতলা করে স্লাইস করা কেক আর চা নিয়ে এসেছিল। একটা ছোট টেব্‌ল টেনে এনে ট্রে-টাকে তার আর সেই মহিলার মধ্যে বসিয়ে দিয়ে চলেও গিয়েছিল।

এখন সুমিত জানে এই অত্যন্ত পরিমিত কিন্তু সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আপ্যায়নে বিস্ময়ের কিছু ছিল না, কারণ প্রথমত সেটা ছিল পারুলবালার নিজের চায়ের বেলা, তাঁর চায়ে সেই ওয়েফার-পাতলা কেক এবং সেই বিশেষ চা প্রাত্যহিক, আর, পরে যেমন পারুলবালা নিজেই বলেছিলেন, তাকে ঘরে ডেকে আনার উদ্দেশ্য ছিল: তাকে গাড়িবারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার মুখের যে স্কেচ তিনি শুরু করেছিলেন সে চলে যেতে শুরু করায় তাতে বাধা পড়েছিল, সেজন্য ঘরে ডেকে এনে কথা না-বলার পাঁচ-মিনিটে তা শেষ করে নেওয়া।

কিন্তু ততক্ষণে সুমিত বলে ফেলেছে: ট্রেনটা ফেল করাতে…

তিনি বললেন, ট্রেন ফেল করেছেন বুঝি। তা এখানেই থাকুন না, অসুবিধা কিছু নেই। তাঁর মুখে যে হাসিটা ছিল তা উপভোগের। তিনি অবশ্যই জানতেন দু-ঘণ্টা পর পরই শ্রীরামপুর থেকে কলকাতার ট্রেন।

সুমিত নিজেকে সংশোধন করে তাড়াতাড়ি বলেছিল: মফস্বলে কাজ ছিল, স্টেশনে যেতে না-যেতে ট্রেনটা চলে গেল। পরের ট্রেনটা ঘণ্টা দেড়েক দেরি। ভাবলুম এই বাড়িটা দেখে যাই। আমার ধারণা আছে এ বাড়িতে হয়তো একবার আমি মায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসে কিছুদিন ছিলুম।

তখন সেই নীল মহিলা কিছুক্ষণ সুমিতের মুখের দিকে চেয়ে থেকে থেকে কিছু যেন মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন। সুমিতকে তার

মায়ের নাম বলতে হল। আর তা শুনে তিনি বললেন, আপনি তা হলে মঞ্জুলার ছেলে।

সুমিত থেকে গিয়েছিল। আর সেখানে বসন্তশশীকে দেখেছিল সে। বসন্তশশী তখন খাঁয়েদের বাড়িতে থাকছিলেন। পরিবারের পরিচয়ের গণ্ডির মধ্যে এক-একটা নাম কি করে বিশেষ মনে রাখার মতো হয় তা তুমি বলতে পার না। কলকাতা থেকে শ্রীরামপুর এর মধ্যে কলকাতা এবং শ্রীরামপুরের কথা ছেড়ে দিলেও প্রায় প্রতি স্টেশনেই দু-একটি করে এমন পরিবার আছে যাদের সঙ্গে সুমিতের পরিবারের কোনো রকমের একটা করে আত্মীয়তা আছে। এবং সে-সব পরিবারে যে-সব নাম আলোচনায় উঠে পড়ে, তাদের মধ্যে কুমুদিনীমালা, তাঁর মেয়ে বসন্তশশী, এবং তাঁর মেয়ে পারুলবালার কথা সাধারণত থাকে।

কুমুদিনীমালাকে দেখার কথা নয় সুমিতের। এখন থেকে এক শতাব্দী আগে কুমুদিনীমালা জন্মেছিলেন কলকাতার এক আধুনিক বাড়িতে। মেট্রোপলিটানে অধ্যাপক ছিলেন পিতা। তখনকার দিনের হিসাবে বেশি বয়সে, প্রায় ষোল-সতরো বছরে তাঁর বিবাহ হয়েছিল কুচাইতে। আর কুচাই ছিল এক সামন্ততান্ত্রিকতার সঙ্গে আধুনিক মধ্যবিত্ত মনের সংযুক্তি। আধুনিক স্কুল-কলেজ, অনেক গাছপালার মধ্যে বসানো সোজা সোজা লাল সুরকির পথ, ব্রাহ্মদের উপাসনা মন্দির, মধ্য-ভিক্টোরিয়ান কায়দায় তৈরি বাড়িঘর, আর কিছু সংখ্যক সুন্দরী নারী যারা রাস্তা দিয়ে হাঁটত না বরং পাশের বাড়ি যেতেও গোল-গোল ঘোড়া গাড়িগুলোকে ব্যবহার করত, কিন্তু কোথাও-কোথাও মিলিত হতো নারীর দুর্ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করতে। দুর্ভাগ্যই, কথাটা, কারণ তাঁরা কেউই নারীর ভাগ্য নারী নিজের হাতে নেবে তা ভাবত না, দুর্ভাগ্যের উৎপীড়ন দূর হলেই যথেষ্ট হয়েছে মনে করত। সেইসব নারী-মণিগণকে ধরে রাখতে কুমুদিনীমালা স্বর্ণসূত্র ছিলেন। কুচাইতে যে-সব নারী বিদ্যালয়, নারীত্রাণ সমিতি ইত্যাদি আছে তার কারও ভিত্তি-প্রস্তরে কুমুদিনীমালার নাম নেই, কিংবা ব্রাহ্মমন্দিরে যে অর্গান তিনি বাজাতেন অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের গানের সঙ্গে, তার সুরধ্বনির সন্ধ্যাগুলোকে শ্লথচরণ করে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার মতোই তাঁর স্মৃতি কুচাইতে। দু-একটা গল্প আছে: যেমন কুমুদিনীমালার একমাত্র পুত্র সেই রাজ-সরকারে চাকরি করে নি, বরং উকিল হয়েছিল, কেননা যে রাণী তাঁর বন্ধুস্থানীয় তাঁরই রাজ্যে চাকরি দিলে বন্ধুত্ব আর থাকে না।

সুমিত ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে প্রায় তিন চার মাস ধরে কুমুদিনীমালার সমসাময়িককালের পত্রিকার পাতা উল্টে ট্রল্টে দেখেছে, কিন্তু পায় নি, কেননা আর একটা গল্প এই কুমুদিনীমালা লিখতেন।

আর কুমুদিনীমালার মেয়ে বসন্তশশী। নামটাই অভূতপুর্ব, শুনলে সহসা ভোলা যায় না, যদিও এরকম জানা আছে একাধিক শব্দের সমাস করে নাম রাখাটা এক সময়ে সম্মুখসারির আধুনিকতা ছিল। তা ছাড়া, শাস্ত্র অনুসারে এটা পুরুষের নাম হওয়াই সম্ভব হলেও, পারিবারিক অনেক আখ্যান ও উপাখ্যানের কেন্দ্রস্থিত এই নামটা নাকি মাত্র একজনকেই মানাতে পারে, একবারই মানিয়েছিল, পরে আর কখনও মানাবে না কাউকে। আর এ নামটা ছাড়াও অন্য নামে তাকে ভাবাও যায় না। আর তিনিই পারুলবালা আর সুশোভন খাঁর জননী।

তখন, সুমিত যখন খাঁয়েদের বাড়ি গিয়েছিল, তাঁর পঁচাত্তর হবে। এবং তিনি খাঁয়েদের বাড়ির সদর অংশে, অর্থাৎ খাঁয়েদের পুরুষানুক্রমিক মূলবংশের অধিকারে বাস করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আগে তিনি পঁচিশে, ত্রিশে, এমনকি চল্লিশেও তো ছিলেন। রূপের কথায় সুমিত ভাবে ওটাকে অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। টাকার জোরে ক্রমাগত সুন্দরী মেয়েদের আনা যায়। তাদের গর্ভে সুন্দর পুরুষরা জন্মাতে থাকে, যারা আবার টাকার জোরে সুন্দরতর মেয়ে সংগ্রহ করতে পারে, এই সুন্দর পুরুষ ও সুন্দরতর মহিলাদের সংযোগে রূপ যেন কেলাসিত হতে থাকে। আমাদের এই বঙ্গদেশে সুগৌরবর্ণ এবং নর্ডিক নাক কি করে বা রূপের মাপকাঠি হলো, যার ফলে একজন বসন্তশশী এই সার্থক নাম পেয়েছিল। ফলত সুশোভনের খাঁড়ার মতো ধারাল নাক, পারুলবালার লেমন-হলুদের চাইতেও উজ্জ্বল রং চল্লিশে, এবং দু'জনের চোখের তারা এবং চুলে কালোর চাইতে বরং বাদামীর ভাব বেশি।

আখ্যান-উপাখ্যানগুলিতে, যদিও পরিশ্রমের ফলে সুমিত পুরনো সংবাদপত্রে দু-একবারই মাত্র প্রমাণ পেয়েছে, বসন্তশশী এই মহিলা-বাজার বসাচ্ছেন, এই চিত্রশালার দ্বারোদ্ঘাটন করছেন, এই বা সঙ্গীতের আসরে যুক্ত হচ্ছেন, যার ফলে যেন আলো ছড়ানো এক স্ফটিক তিনি। খাঁদের মূলবংশের মূল পুরুষের স্ত্রী হিসাবে পঞ্চাশ বছর আগে তিনি কলকাতায় সঙ্গীত, চিত্র, সমাজসেবার আসরগুলোকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছিলেন, যতটুকু হলে সামাজিক ইতিহাসে নিন্দা-প্রশংসা নিয়ে স্থায়ী

নাম থেকে যায় ঠিক তার আগের ধাপে তিনি থেমে যেতেন যেন, অথচ তাঁর এমন সুযোগ ছিল যে পুস্তক লিখে স্মৃতিচারণ করলে তা মূল্যবান হতো। কিন্তু এটাই যেন তাঁর রুচি যে ঠিক আগের ধাপে তিনি থেমে যাবেন, এবং স্মৃতিচারণ করতে বই লিখবেন না, কেননা সেটাও তো বাজারে আসা।

স্ফটিকের সঙ্গে আলোর সাধর্ম্য থাকতে পারে যে জন্য হয়তো বসন্তশশী মাঝে মাঝে খাঁয়েদের বাড়ির ভারি পুরনো মার্বেল থেকে দূরে কুচাই চলে যেতেন। যদিও তখন নিশ্চয়ই খাঁয়েদের বাড়ি এখনকার মতো উদ্বাস্তু নিবাসের রূপ নেয় নি পিছনের দিকেও। সেখানে কুমুদিনী-মালার কাঁচ আর লোহার তৈরী হাল্কা বাংলো, যা তিনি পরে পেয়েছিলেন, এবং যেখানে এখন সুশোভন খাঁ থাকেন, সেখানে তিনি বাস করে আসতেন। যেন ঝরঝরে হাল্কা বাতাস পাওয়া, আলো পাওয়া।

এখন বসন্তশশী, এখনও তাঁকে সেই নামেই মনে করতে হবে, পারুলবালাকে নিয়ে। এই তবে পারুলবালা! নামটা শুনে সুমিত স্বগতোক্তি করেছিল। বছর চল্লিশ বছর বয়সের সেই নীল মহিলা যাঁর গায়ের রং লেমন হলুদের চাইতেও উজ্জ্বল। পারুলবালা ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন একজন আই. সি. এস.-কে। ঘৃণা করে চলে এসেছেন। এমন ঘৃণা যে এখন তার কিশোরবয়সী পুত্র এবং কন্যা হস্টেল থেকে দেখা করতে এলে দেখা করেন বটে, এগিয়ে গিয়ে খোঁজ নেন না। যেন কন্যার দুর্ভাগ্যকে আড়াল করে তাকে নিয়ে খাঁয়েদের এই বাড়িকে বসন্তশশী তাঁর অস্তাচল করেছেন।

পারুলবালা, এক ঘণ্টা পর পর যে ট্রেন আসে তা ফেল করে সুমিতের থাকাই স্থির হল যখন, তাকে নিয়ে বসন্তশশীর কাছে গিয়েছিলেন। মাথার কাঁধ পর্যন্ত নামা চুলগুলো গলানো রূপো, বয়সে ঈষৎ স্থূল শরীর আর ফুলো ফুলো মুখ যেন মোমের তৈরী, নাকটায় দু পাশের ঢাল যেখানে মিশেছে যাকে ব্রিজ বলে সেটা এখনও ছুরির ফলার চাইতে কম চওড়া, অনেক রেখার মধ্যে চোখ দুটি এখনও গভীর এবং যেন ইঞ্চি তিনেক টানা।

পারুলবালা বলেছিলেন, ইনি ট্রেন ফেল করেছেন, এঁকে আমি থাকতে বলেছি। ইনি আমাদের মঞ্জুলার সেই ছেলে, চেয়ে দেখো।

বসন্তশশী বলেছিলেন, তাই নাকি পারুল? এতো বড়ো আনন্দের কথা। কেমন আছ, বাছা, তুমি?

তখনই সুমিত জানতে পেরেছিল যিনি ছবি আঁকছিলেন তিনিই পারুলবালা যার নাম সে পারিবারিক গল্পে, হয়তো মায়ের মুখেই শুনে থাকবে।

তারপর সুমিত কৌতুকজনক ট্রেন ফেল করাকে পনরো দিনের আতিথ্যে পরিণত করেছিল। পারুলবালার বাহুল্য পরিত্যক্ত এবং ভুরিতাবর্জিত আতিথেয়তা ছিল ক্যানভাসে তুলির টানের মতো। আর সেই সুযোগে সুমিত তার প্রথম দুষ্কর্ম করে ফেলেছিল, মিথ্যা অসুখের টেলিগ্রাম করে ছুটি নিয়েছিল। আর এই সংবাদ পারুলবালাকে না বলা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিল না সে। পারুলবালাও শুনে ঝির ঝির করে হেসেছিলেন।

আর ক্যানভাসে তুলির টানই। পারুলবালা সকাল আটটা থেকে বেলা দুটো, চারটে থেকে সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত ছবি আঁকেন। যে ছবিটা শুরু করেছিলেন সেটাকে শেষ করাই তখন উদ্দেশ্য। ছবিটায় গাড়ি বারান্দাটা ধরা পড়েছে, তার সামনের খানিকটা লন, বারান্দার থাম বেয়ে ওঠা বাতাসে কাঁপছে মৃদু এমন লতা, বারান্দার ছাদে দাঁড়ানো একজন মহিলা যার চুল নামতে নামতে সেই বারান্দার আলসেতে আটকে গিয়েছে, একটা হাত নিচের দিকে প্রসারিত হতে হতে থমকে গিয়েছে, প্রসারিত হওয়ার আগ্রহ আলসের বাইরের একটা আঙুলে, মহিলার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, চুলগুলোর ঢেউএ, গাড়িবারান্দার থামের কাছে একটা ইট লালে সাদা ছোপ গরু একটা সোনালিতে লালের আঁশ কোঁকড়ানো চুলের কুকুর, একজন যুবক, সকলেই নিজের স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বারান্দার আলসের দিকে মুখ তুলে। ছবিটার নাম নাকি হবে সহানুভূতি।

এ থেকে আলাপ হয়েছিল ছবি সম্বন্ধে। পারুলবালার ছবি কখনও বাস্তবকে ছাড়িয়ে যায় না। তিনি বাস্তবকেই, বর্তমান দিনকেই রূপ দিতে চান তাঁর ক্যানভাসে। শুধু তার রংগুলো এক কৌতুক ঘটাতে থাকে, শুধু যে কায়ার রেখা মুছে মুছে যায় তাই নয়, সম্মুখে প্রসারিত দৃশ্যটাই যখন ক্যানভাসে রং প্লাবনে ঝলমল করে ওঠে তখন বোঝা যায় সেই রোজকার দৃশ্যটায় কত রং কোথায় লুকিয়েছিল। সুমিত জানতই না তার নীল স্যুটটায়, কারণ থামের পাশের যুবক যে সে নিজেই তা এখন ক্যানভাসে ধরা যায়, এত নীলের শেড আছে; সে জানতই না সে যখন গাড়ি বারান্দার দিকে চেয়ে চেয়ে খাঁয়েদের বাড়িকে ভাবছিল তখন তার ভঙ্গিতে, তার অর্ধেক তোলা

একটা হাতের আঙুলে যা যেন আলসেতে রাখা সেই মহিলার আঙুল স্পর্শে উদ্যোগী অথচ মধ্যে ব্যবধান, কতটা সহানুভূতি ফুটতে পারে। আর তখন সে মহিলাকেও দেখে নি, কারণ তিনি তখন ছিলেন গাড়িবারান্দার এক থাক উপরে তার স্টুডিওর ব্যালকনিতে তেমন ঝুঁকেই হয়তো যেমন ছবিতে। তা থেকেই ছবির আরও কথা, আর সেজানের উল্লেখ। বাস্তবকে দেখেন পারুলবালা কিন্তু তাঁর চোখে যেন এক অভূতপূর্ব চশমা, যার ফলে দিনের ম্যাটমেটে আলো তাঁর ক্যানভাসে লেমন হলুদ, গাছের সবুজ পাতা সোনালি আলোতে ঝলমল করে উঠতে পারে। পারুলবালা বলেছিলেন তত্ত্ব আলোচনা করে বাস্তবকে সকলে একই রঙে একই আকৃতিতে দেখবে কেন ? তোমার দেখা যদি আমার চেয়ে নতুনতর হয় ? সেই সময়েই একটা ক্যানভাস দেখেছিল সুমিত। শিল্পী তার স্টুডিওতে; যা ছিলো সত্যিই লেমন হলুদ, নীল আর বাদামীতে আঁকা যা দেখেই পারুলবালাকে তাঁর স্টুডিওতে প্রথম দেখার প্রত্যয়টা সুমিতের মনে লেমনহলুদের পটে নীল মহিলা হয়ে ওঠার সমর্থন পেয়েছে ক্রমশ।

ছবিটা চাইলে তখনই পেতে পারত সুমিত। হয়তো দিতেন পারুলবালা আমাদের মঞ্জুলার সেই ছেলেকে। কিন্তু আর কি লাভ হয়েছে সুমিতের খাঁয়েদের বাড়িতে গিয়ে ? যদি না তার দুই নম্বর দুষ্কর্মটাকে হিসাবে আনা হয়। এটা ভাবতে গেলে সুমিত হেসে ফেলে। খাঁয়েদের সেই বাড়ির এক মূল থেকে সরে যাওয়া পরিবারের যেখানে বাস সেখানকার এক পরিত্যক্ত হলের এক কোণে হার্পসিকর্ডটাকে দেখে ষাট টাকা দিয়ে কিনে ফেলেছিল সে। ষাট টাকা শুনে পারুলবালা হেসেছিলেন। যদি মেরামত হয় সম্ভব, তাতে তোমার শ-দুয়েক লাগবে। দুষ্কর্মই বটে, কারণ তখন সে জেনেছিল হার্পসিকর্ডটা বসন্তশশীরই বটে, যারা ষাট টাকায় বিক্রি করেছিল তারা কি জানত সেটা বসন্তশশীর ?

তারপরই সুমিত এসেছে কুচাইতে, কেননা সুশোভন খাঁ হয়তো এখানে থাকেন।

ভাগ্য বলা চলে, কিন্তু বাইবেল বলে সিক্ অ্যাণ্ড ইউ উইল ফাইণ্ড, খোঁজ তুমি পেয়ে যাবে। একমাসও তখন হয় নি তার কুচাইতে। তার অফিসের এক কেরাণী এসে তাকে বলেছিল সহরের ব্রাহ্মমন্দিরে মাঘোৎসব হবে। তখন তার সাথে আলাপে জেনেছিল যে সহর এক সময়ে কলকাতার থেকে দূরে এক রাণীকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসংস্কৃতির ছবিতে সাজানো কেন্দ্র হয়ে উঠবে সেখানে সেই যুবক কেরাণী আর তার পরিবার ছাড়া আর

কেউই যায় না ব্রাহ্মমন্দিরের উপাসনায়। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই কেরাণী এখন সেই ব্রাহ্মমন্দিরের আচার্য। ত্রিশ টাকা করে মাসোয়ারা পায় সে সপ্তাহে একদিন আচার্যের কাজ করে; আর বছরে পাঁচ ছ শ টাকা, মন্দিরকে মেরামত চুনকাম করতে আর এই মাঘোৎসব করতে। সুমিতের মনে হয়েছিল এক ধর্ম ও সংস্কৃতির নদী মরুপথে হারিয়ে গিয়েছে। সুমিত জিজ্ঞাসা করেছিল মাঘোৎসবের প্রার্থনায় কলকাতা বা শান্তিনিকেতন থেকে কেউ আসবেন কিনা। সেই কেরাণী আচার্য বলেছিল: লিখেছি। একজন আসবেন বলেছেন। না এলেও, সার, উৎসব হবে। সে ক্ষেত্রে সুশোভন খাঁকে বলেছি প্রার্থনা করতে।

অবাক হয়ে গিয়েছিল সুমিত। আরও চিন্তা করার নির্জনতা পেতে সেই কেরাণীকে বিদায় দিতে বলেছিল, আচ্ছা, কাজের চাপ না পড়লে যাবো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কেরাণী আবার যখন একটা ফাইল নিয়ে এসেছিল সুমিত তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সুশোভন খাঁর কথা বলছিলেন, তিনি কি ব্রাহ্ম? কেরাণী যা বলেছিল তার সার এই: কুমুদিনীমালার, সুশোভন খাঁ যাঁর দৌহিত্র, তার সময় থেকে এই হিন্দু পরিবার ব্রাহ্মমন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

মাঘোৎসবে গিয়েছিল সুমিত। মধ্যে দু একশ লোক হয়েছিল খিচুড়ি খেতে। সুশোভন খাঁকে প্রার্থনা করতে হয় নি। কলকাতা থেকে এক বৃদ্ধ আচার্য আসতে পেরেছিল। লম্বা পিঠওয়ালা সেই পুরনো বেঞ্চগুলোর একটিতে বসে সুমিত তার কয়েক সারি আগে সুশোভন খাঁকে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখেছিল। পায়ের চকচকে জুতো, হাতের উজ্জ্বল পালিশের কারুকাজ করা ছড়ি, চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি, এসব চোখে পড়ছিল সুমিতের। একটা পোর্ট্রেট যেন এমন সজীব অথচ স্থির। মুখটা বেদীর দিকে ফিরানো একটা উঁচুতে তোলা যার ফলে তাঁর গোটি চোখে পড়ছিল, কিন্তু সে দাড়ি এখন কালচে বাদামী নয়, রুপোর দাগ পড়েছে সেই দাড়িতে, আর তারই ফলে যেন বাদামী ভাবটা আরও ফুটেছে। তা হবে, তা হবে। সুমিতের যদি সাতাশ আটাশ হয় সুশোভনের পঞ্চাশ হলো।

কিন্তু যা খোঁজ তাই কি পাওয়া যায়? ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে কিছু পুরনো পত্রপত্রিকা দেখা হয়েছে, বসন্তশশীর হার্পসিকর্ডে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজিয়ে সেই সুরগুলোর এক নতুন টিম্বার, আর টোনও বলতে পারো, আদায় হয়েছে, জানা গিয়েছে কারো কারো চোখে এক্ রঙের চশমা থাকে যাতে বাস্তব এমন রঙে ঝলমল করে ওঠে যে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আমাদের যে পাণ্ডিত্য তাকে

সন্দেহ করার সুযোগ আসে, জানা গিয়েছে কোন স্কুলে লেখাপড়া করেছে; কিশোর সুশোভন কোন মাঠে ফুটবল বগলে বন্ধুদের নিয়ে নামতো আন্দাজ করা গিয়েছে। তার বেশি কিছু হয় না বোধহয়। দু তিন মাস আগে, সেটা নিশ্চয় ছুটির দিন ছিল, একজন অফিসর যেমন অন্য অফিসরের বাড়িতে যাস্ট ড্রপ্ ইন্ করতে পারে, অর্থাৎ পরিচয়ে কিছু উষ্ণতা আনতে অনিমন্ত্রিত যেরকম বেড়াতে যাওয়া হয় কারো বাংলোয় তেমন ঢঙে, তেমন সময় বেছে অর্থাৎ চায়ের বেলার কিছু পরে কিন্তু তা একেবারে পার না হতে সুমিত মিউনিসিপ্যাল মণ্ডী রোডে কুমুদিনীমালার সেই বাংলোয় যেখানে সুশোভন খাঁ বাস করেন সেখানে গিয়েছিল। লোহার লতাপাতার ফ্রেমে কাচ দিয়ে ঘেরা পোর্টিকো, যার লোহার ক্ষয়ের দরুণ অসমতলতা রঙে আংশিক ঢাকা, কাচের দেয়ালের পরে একসারি লাইট ওক রঙ করা দরজা জানলা। সেগুলো বোধ হয় দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রায় মগ্ন। কলিং বেলের সুইচটায় আঙুল দিয়েছিল সুমিত আর তখন সেই ব্যাপারটা ঘটলো। সুইচ ছুঁতে এগিয়ে যাওয়া তর্জনীসমেত তার হাত, বাহু যেন এক তীব্র চীৎকারে পরিণত হলো, যেন তার শিরা উপশিরা পেশী দৃশ্যমান শব্দের তরঙ্গে ভঙ্গিল। যেন সেই জানলাদরজার সারির লাইট ওক বয়সের কালি মেখে বিষন্ন খয়েরি রঙের এক পুরনো সরাইখানার দরজা হয়ে যাচ্ছে। যেন তার হাত একদল ক্লান্ত অসহিষ্ণু যাত্রীদের মুখপাত্র যে পিছনের মানুষগুলোর অধীর গুঞ্জন থামাতে চাইছে মনে মনে তাকে সমর্থন করলেও। আর তাদের সেই অধীর গুঞ্জনে যেন সুমিতের নিজেরই গলার স্বর চেনা যায়। অদ্ভুতভাবে তারা যেন সরাইখানাকে সমালোচনা করছে। সুমিত যেন শুনতে পেল তারা বলছে চাপা স্বরে: আমার পিতা বলে যিনি পরিচিত ছিলেন, আমার মা মঞ্জুলা তাঁকেও ভালোবাসতেন, আমি দেখেছি। ভাবো সেই মৃত্যুশয্যার কথা। আমার মা তাঁর সেই মৃত্যুশীতল শরীরটাকে বুকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। সেই মৃত্যুশীতল বাহু, কাঁধ, বুকে মা চোখের জলে ভেজা নিজের মুখটা ঘসছিলেন। বলো তা কি ভালোবাসা নয়। তা ছাড়া আমার দিদিকে আমার মা ভালোবাসেন এবং আমার অকালে হারিয়ে যাওয়া সেই ছোট ভাইকে, যারা আমার সেই পিতার সন্তানই নিঃসন্দেহে।

তারপরে দরজা খুলেছিল। সুশোভন খাঁই বেরিয়ে এসেছিলেন পোর্টিকোতে। পোর্টিকোর সেই কাচের প্রাচীর খুলে বলেছিলেন, ও আপনি, আসুন, আসুন।

সেই সুশোভন খাঁই যার সঙ্গে সুমিত বার বছর আগে যোগাযোগ

করেছিল। সুশোভন তাকে বৈঠকখানায় নিয়ে বসলেন। আর সুমিত নিজের পরিচয় দিতে বলেছিলেন, আমি এখানকার এক সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

আর তারপর একই নিশ্বাসে, আমি আপনার উপন্যাসের একজন ভক্ত পাঠক। সুশোভন বিনীত হয়ে বলেছিলেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সুমিত তখন লক্ষ্য করলে এখন গায়ের রং সোনালি মোমের মনে হয়, সেই গোটি এখন যেন আশিরিয়ান রাজাদের চতুর্ভুজাকার দাড়ির মতো, কিন্তু রুপোর আঁশ দেখা দিয়েছে তার খয়েরি রঙে।

থেকে থেকে সুশোভনের চারিদিকে শেলপ্‌গুলো নানা রঙের বইএর কিউবযুক্ত হওয়ায় ঝলসে ঝলসে উঠছিল। সুমিত ভাবলে সে বলবে, আমি কিন্তু আপনাদের মঞ্জুলার সেই ছেলে, আর এমন কৌতুকের জানেন আমার মা কিন্তু আমার দিদি আর ছোটভাইকে আমাকে যেমন তেমন স্নেহই করতেন। কিন্তু সে বলেছিল, আপনি কিন্তু, সার, লিখছেন না, খুব কমই লিখছেন। আমরা কি করে আপনার খ্যাতি বহন করে চলব, আপনার খ্যাতি ম্লান হতে চলেছে।

সুশোভন খাঁ হাসলেন। সুমিতের আবার ভুল হলো, বইগুলোর নানা রঙের কিউবসমূহ তাদের স্বাভাবিক যে রং তার চাইতে উজ্জল হয়ে ঝলসে ঝলসে উঠল তখন। বললেন, পাহাড়ের গায়ে মেঘ আর রোদ লেগে যে দৃশ্য তা যদি কারো ভালো লাগেই, পাহাড়ের কী গরজ নিজেকে বার বার তেমন করে দেখানো? উপন্যাস তো একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। সে ঘটনা কি কোনো তুষ্টির জন্য বারবার ঘটে?

সুমিত বলেছিল, আপনি, সার, আমাদের দিকটা দেখছেন না। প্রকৃতপক্ষে আপনি ঠিকই করছেন, হয়তো, কিন্তু ইচ্ছা হয় আপনার এ যুক্তি কি সন্দেহ করি।

কি লাভ হয়? সেই দারুণ দাম্ভিক একাকিত্ব সুমিতের আধুনিক মন জানে, খুব সম্ভবত খাঁ-দের মূল বংশের মূলধারার একজন হওয়ার ফল, যা যেন পারুলবালার স্বাশ্রয়ী স্বয়ংপূর্ণতার আত্মীয়ই বটে।

রাত্রির খাওয়ার পরে কাল অন্য অনেক রাতের মতো বেড়াতে বেরিয়েছিল সুমিত। মিউনিসিপ্যাল মণ্ডী রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে মণ্ডী শব্দটা এখানে এই কুচাই সহরে এল কেন? অনুপ্রাস? মণ্ডী রোডের বদলে মার্কেট ষ্ট্রীট হলেও অনুপ্রাস থাকতো। এ নিশ্চয়ই কোনো পাঞ্জাবি ম্যাজিস্ট্রেটের দেয়া নাম যা তার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে আছে। মানুষ যে কোথায় কি করে তার পদচিহ্ন রেখে

যায়, হাসিমুখে এই ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছিল সুমিত, পিঠ সোজা রেখে, ঘাড় থেকে মাথাটা একটু নুইয়ে, যেন শরীরের উচ্চতার ফলে পায়ের কাছে দেখতে অসুবিধা হয় বলে, অর্থাৎ সাধারণত যেমন ভাবে সে হাঁটে, হাতে গাঢ় মেহগ্নি রঙের নকশাদার ছিপছিপে ছড়ি, মাথায় নতুন কেনা ব্লু স্লাউচ হ্যাট।

হঠাৎ সে গানের শব্দে মুখ তুলেছিল। দেখতে পেয়েছিল লম্বা সেই কাচের পোর্টিকের একপ্রান্তে সামাদানে এক গুচ্ছ মোমের মতো উর্ধমুখী এক টেবলল্যাম্পের আলোয় সুশোভন খাঁ সেই গান শুনছেন। হয়তো সিগারের ধোঁয়া কিন্তু মনে হল যেন ধূপের চন্দনের উর্ধ্বমুখী ধোঁয়ার ছোট ছোট কুণ্ডলী, মাথাটা ঈষৎ বাঁ দিকে হেলে আছে, কোলের উপরে রাখা ঘুমন্ত দুখানা হাত। সেই গান, পুরনো রবীন্দ্রনাথের সেই গান: দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে......

সুমিত ল্যাম্পপোস্টটার কাছে, সেটাকে ধরেই যেন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তখন তার মনে হয়েছিল যেন সুশোভনের মাথায় গোল করে জড়ানো যুঁইএর মালা। সুমিতের স্লাউচ হ্যাটটার নরম নমনীয় কাঁধ বাঁ গালের উপরে টেনে নামানো। ভোল্টেজ কম বলে ল্যাম্পপোস্টের আলোটা ক্ষীণ, ফলে যেন হলুদ আর কালো রঙের বিন্দু ছিটিয়ে আঁকা এক ছবির মধ্যে সুমিত মিশে যাচ্ছে: যার ল্যাম্পপোস্টকে ল্যাম্পপোস্ট মনে করতে তাদের মনে হবে বেক্তিয়ার কেউ তাকে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে পড়েছে, যাদের চোখে ল্যাম্পপোস্টটা আলো-আঁধারিতে একটা গাছের মতো তাদের প্রত্যয় হবে যেন এক ভ্রমণক্লান্তপথিক সেই গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করে নিচ্ছে।

আর সুশোভনের চোখ দুটি কি করুণায় স্তিমিত? কিন্তু সুমিত চিনতে পেরেছিল। নিজের গলা কি চিনতে ভুল? এ তো বোঝাই যাচ্ছে, ভাবলে সে, কখনও এটাকে কেউ রেকর্ড করে নিয়েছে। ও, আচ্ছা, এই নিজেকে বলে আরও অবাক হয়ে সে ভাবলে যাকে সে স্বপ্ন মনে করেছিলো তা হলে তা স্বপ্ন নয়? সে এক স্বপ্ন দেখেছে বলে মনে করেছিল যাতে যেন সুশোভনের জন্মদিনে, সুমিত তার বৈঠকখানায় গিয়েছিল। সুশোভন খাঁ ছিলেন, কমলা, সিপিয়া, ইটলালে আঁকা সেই বৈঠকখানায়, সোনালি লেমন-হলুদ আর বাদামিতে আঁকা সুশোভনের হাসিমুখ যুবকযুবতী সন্তানেরা কি সুন্দর তারা! দরজার কাছে বসে পড়েছিল সুমিত একটা চেয়ারে। এক দারুণ পিপাসায় সে একাধিক বার জল খেতে হয়েছিল। যেন সুশোভন বলেছিল ইনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের সহরের, কে যেন বলেছিল উনি ভালো গাইতে পারেন

ব্রাহ্মমন্দিরের ওঁরা বলছিলেন। আর সেই স্বপ্নে এই গানটাই করে থাকবে স্থমিত। আর সে যখন দয়া দিয়ে জীবন ধুয়ে দেয়ার গানটা গাইছিল তখন কেউ তা রেকর্ড করে থাকবে।

কিন্তু তা হলে এ আর স্বপ্ন থাকছে না। ঘটনাই হচ্ছে যা সে ঘটিয়েছে। সুশোভন খাঁর জন্মদিন কারই বা অজানা তাদের পারিবারিক মহলে। ঘটনাটা স্বপ্নের প্রত্যয় নেয়ার কারণও তো বোঝা উচিত ছিল তার, ভাবলে স্থমিত। প্রচুর মদ খেয়ে তবেই সে গিয়েছিল সুশোভন খাঁর বৈঠকখানায়। সেজন্যই তেমন জল খেতে ইচ্ছা, অত বার, অত প্রচুর জল। আর সেজন্যেই তার নিজের গলায় আবেগ ঢুকে ভার।

একটা অধীরতা নিয়ে আবার সে হাঁটতে শুরু করেছিল কোয়ার্টার্সে ফিরে এসেছিল। ফিতে খুলে জুতো খোলার ধৈর্য ছিল না। অভিভূতের মতো মনে হচ্ছিল ফাইলে যা সে লিখছে তা সবই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যদি সে একটা আকার আর নাম দিতে পারে সেই সহরের ফাইলের বিষয়ভূত ব্যাপারগুলো যেখানে ঘটছে। সেই সহরের নাম কুচাই রাখার সিদ্ধান্তে পৌছে উপন্যাসের এক দুরূহ পরিচ্ছেদ শেষ করার তৃপ্তি নিয়ে শুতে যেতে পেরেছিল।

খুব বেশি মদই সেদিন সে খেয়ে থাকবে। মদ কখনও কখনও বেশিই খাওয়া হয়ে যায়। গানটা শুনলে মনে হয় না জন্মদিনের প্রণাম করার ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু বে এক্তিয়ার অবস্থায় পা ছুঁতে পারবে কিনা, নিচু হলে গড়িয়ে পড়ে যাবে কিনা—এমন সব সংশয় ক্রমশ আশঙ্কা হয়ে উঠছিল? তখন মনে প্রশ্নও ওঠে নানা জাতের। যেমন পরশুদিনের কথাই ধরো। সাপারের পরে বেড়াতে না বেরিয়ে হুইস্কি নিয়ে বসেছিল। সেই মৈথিলী ব্রাহ্মণ বালক যে তার তত্ত্বাবধান করে আর যাকে সে মানুষ করছে পরে চাপরাশির চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবে বলে তার সঙ্গে দু পেগ সাপার-পরবর্তী ব্রাণ্ডি খেয়ে, তার মুখ থমথমে লাল হয়ে তার চোখে জল দেখা মাত্র তাকে বিদায় দিয়ে স্থমিত তার হোয়াইট হর্স নিয়ে বসেছিল। প্রশ্নগুলো বেশ স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল।

আচ্ছা, দেখো, তা কি একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র যার কোনো কারণ দেখানো যায় না, যার আগে আর কিছু নেই যে জন্য সে মঞ্জুলার সেই ছেলে নামে উল্লিখিত হয়ে থাকে? অথবা তা কি রূপ। সুশোভন খাঁ নিশ্চয়ই রূপবান ছিলেন। আর মেয়েরা নাকি রূপের আগুনে পুড়তে অভ্যস্ত। আর তখন সুশোভন খাঁ আর মঞ্জুলা দুজনেরই বাইশ-তেইশ বছর বয়স হবে। কিংবা তা কি এই ছিল যে সুশোভন খাঁ খাঁয়েদের মূলবংশের মূলধারার প্রতিভূ, আর

মঞ্জুলা খাঁয়েদের সেই বাড়িতে, হয়তো কোনো শাখার, হয়তো দৌহিত্র বংশের বধূ মঞ্জুলা কি মূলবংশের মূলধারার গৌরবকে কামনা করেছিল। তা কি এক রকমের হীনমন্যতা? কিংবা তা কি প্রেম? তখন কি আনন্দবসন্তসমাগমে লাবণ্যে প্রাণ পূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছিল কারো। কিন্তু তার ফলে সুমিতই যে হবে তা কেউ কোনো বিজ্ঞানী স্বীকার করবে না। সুমিতের দিদির একটা সুন্দরী ছোট বোন হতে পারত, নিষ্ফলও হতে পারত।

সুমিত এই জায়গায় আর একবার হুইস্কি ঢেলে নিয়ে হেসেছিল। এক কথায়, সুমিত বলতে পারে, সে যে মঞ্জুলার ছেলে মাত্র নয়, সেই ছেলে, তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ভ্রু পেগে সেই মৈথিলী বালকের চোখ ছল ছল করে। হোয়াইটহর্সের বোতল অর্ধেক করে করে সুমিতের চোখও ছল ছল করে উঠল। না: সে বিড় বিড় করে বলেছিল, কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি যে সাবডেপুটি কেন তার কারণ প্রথম থেকে শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত যারা প্রথম হতো তাদের থেকে বিশ পঁচিশ নম্বর পিছিয়ে থাকার অভ্যাস ছিল যেহেতু সে অভ্যাস অতিরিক্ত পরিশ্রম এড়িয়ে যাওয়ার অন্য নাম, কিন্তু কেন তা বোঝা যায় না, বোঝা যায় না।

এখন সকাল হয়েছে। সুমিত তার কোয়ার্টার্সের সেই হল ঘরে এল। সাদা মসলিনের ঘুমের পোশাক তার গায়ে। হলটার বর্ণনা আগে যেমন করা হয়েছে তেমনই আছে। আজ সুমিতের মনে হলো সে ঘরের আলোটা যেন লেমন হলুদ। সে বেসিনের কাছে গিয়ে নিচু হয়ে মুখ ধুলো। তার হঠাৎ অনুভব হলো জিভটা যেন ভারি। অনুশোচনার জাতীয় কিছু মনের মধ্যে নড়াচড়া করছে নাকি? হাসিমুখে ভাবলে সুমিত।

সে বলে ফেললে, আমরা, সার, মাঝে মাঝে মদে বেএক্তিয়ার হলে ক্ষমা করা আপনার উচিত হবে।

ছোটগল্পে সমরেশ বসু

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

সমরেশ বসুর গল্প আমাদের মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের বিরুদ্ধেই প্রচণ্ড প্রতিবাদ—আর এ প্রতিবাদ এতই জীবনাভিজ্ঞতা-নির্ভর যে কখনই মনে হয় না, সমরেশ বসু পরোক্ষ কল্পনার আশ্রয়ে, কল্পসর্গের প্রতিবাদ আনছেন, তাই তাঁর গল্প কোনো ধর্মীয় স্বর্গরাজ্য বা প্রচলিত বিমূর্ত আশাবাদে শেষ হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতার স্বেদে তিনি প্রথমাবধিই জানেন, "ধ্যান নাই। উপাসনা নাই। তাই শ্রমণ নাই, ব্রাহ্মণ নাই, নির্গস্থ নাই, তীর্থংকর নাই। দেব নাই, দেবী নাই, মারভুবনও নাই। পরলোকও নাই। এ সকলই কল্পনা। ক্ষুধা তৃপ্তি তৃষ্ণা নিদ্রা দর্শন যারা চিরতরে দমন করে নাই, এবং জানে; দমন করে এই বস্তু জগতে বাঁচা সম্ভব নয়, শুধু কামদমনকেই তারা ইন্দ্রিয়-জয় নাম দিয়েছে। ইন্দ্রিয় জয় হয় না, দমন হয় না, নিয়ন্ত্রিত হয়। আছে এক ধর্ম, মনুষ্য ধর্ম। [অর্থাৎ] সাহস এবং সততা, প্রত্যক্ষ কর্ম, প্রেম, মৈত্রী ও ঐক্য।" বস্তুত পক্ষে এই মনুষ্য ধর্মর কথাই সমরেশ বসু ঘুরে ফিরে বলেন তাঁর গল্পে মূর্ত, মানুষের ইমেজে। আর সেজন্যই তাঁকে লেখক হিসাবে মধ্যবিত্তর কাঠামোর বাইরে দাঁড়াতে হয়, নিজ অভিজ্ঞান খুঁজতে হয় "ভদ্রলোক" গণ্ডীর বাইরে জীবনের জোয়ার ভাঁটায়, সংগ্রামের পাড়িতে, আদি-মানুষের কথকতায়। তাঁর প্রথম গল্প মুদ্রিত হয় উনিশশো ছেচল্লিশ-এ: বাঙালি মধ্যবিত্তর ভাঙন তখন প্রায় সম্পূর্ণ, শ্রেণী হিসাবে তার যাথার্থ্য

নিঃশেষিত। নিজ জীবনের সংগ্রামী ও নির্মম অভিজ্ঞতায় সমরেশ ধীরে ধীরে এই শ্রেণীর বাইরে চলে গেছেন—তাঁর মতো অভিজ্ঞতা-নির্ভর লেখকের পক্ষে এ ঘটনা তাৎপর্যময়। মধ্যবিত্ত সীমান্তবর্তী ও সীমান্তর বাইরের এই মানুষেরাই তাঁর লেখক হিসাবে জীবনদৃষ্টি গড়তে সাহায্য করে। তাঁর শিল্পের নান্দনিক অভিজ্ঞতায় সমগ্র বাস্তবতাই আসেঃ সেই সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ লেখকের মতোই সমগ্র বাস্তবের একটি দিক-এর ওপর তিনি গুরুত্ব দেন, এর ঘটনাবলী একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত, পয়েণ্ট-অব-ভিউ থেকে তিনি দেখান। মূর্ত ঐতিহাসিক পরিবেশে সর্বার্থসাধক মূর্ত মানুষের সূত্রেই, এই নান্দনিক দৃষ্টি তার গুরুত্ব, অর্থ ও মূল্য পায়। মানুষের শ্রমই যে তার বিশেষ গুণের বাস্তবায়ন বা বহিরূপায়ন, একথা সমরেশ কখনও ভোলেন নাঃ তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পের কুশীলবরা শ্রমের স্বেদাক্ত সংগ্রামেই ধরা দেয়। সমরেশ তাঁর মধ্যবিত্ত-বিমুখ জীবন-বীক্ষাটি নির্দিষ্ট করে নেন প্রচ্ছন্ন শ্রেণীচেতনার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। একটি সহজ-সরল গল্পে ('মান') সমরেশ বসু নির্ভুলভাবে দেখিয়ে দেন শ্রেণী-উত্তরণ প্রচেষ্টার ফাঁকিকে, আবার মধ্যবিত্ত হওয়ার মেরুদণ্ডহীনতার প্রতিপক্ষে সাহস ও সততাকে হাজির করেন অনায়াসে। সামগ্রিক ভাবেই আঘাত হানতে চান, মধ্যবিত্ত কাঠামোকে—চান বলেই, তাঁর গল্পের পুরুষ-রমণীরা আস্তঃ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, শোক-দুঃখ, কবিতা-যৌনতা সব নিয়ে তারা উঠে আসেঃ অথচ অভিজ্ঞতা-নির্ভর লেখকদের সে স্খলন প্রায়ই ঘটে, অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী, তা সমরেশ অধিকাংশ গল্পেই এড়িয়ে যান, তাঁর জীবনদৃষ্টির যাথার্থ্যে, গল্পের কাঠামোগত ভাবনার সতর্কতায়। সেজন্যই তাঁর গল্প কমক্ষেত্রেই প্রচলিত নিটোল গল্পঃ ঠিক গল্প বলতে যা সাধারণভাবে বোঝা যায়, তা তাঁর গল্পে থাকে না। কখনও একটি চরিত্রের বলিষ্ঠ সত্তায়, কখনও অনেক চরিত্রের সিমফনিতে দাঁড় করান গল্পঃ ছোটগল্পের অন্যতম প্রধান সমস্যা—সময়ের ব্যবহার করেন শৈল্পিক দৃঢ়তায়। গল্পের কেন্দ্রবিন্দু থেকে, তার ক্রমিক উন্মোচন থেকে সরে যান না কোনো সময়ই—অভিজ্ঞতার বোঝাকে হাল্কা করে দেন কবিতার হাওয়ায়। তাঁর গল্পে কবিতা আসে ঘুরে ফিরে—যে মানুষেরা তাঁর বিষয়, তাদের জীবনেও তো কবিতা থাকে, গান থাকেঃ তারা প্রকৃতির মতোই শতমারকে তুচ্ছ করে জেগে থাকে। আসলে তারাশঙ্করের পর আঁকাড়া জীবনকে শিল্পে রূপান্তরিত করার মতো এত

ক্ষমতা সমরেশ বসুর মতো কোনো গল্পকারেরই বোধহয় বাংলা ভাষায় নেই—আর জীবন কুৎসিৎ বীভৎসতার মধ্যেও কবিতাকে পায়, গানকে পায়, সমরেশের মৌল জীবনাবেগেই তারা আসে। আর এ কবিতা ছেঁদো ভাবালুতা নয়, শৈল্পিক গল্পের সামগ্রিক ছন্দের সঙ্গে যুক্ত। মাঝে মাঝে তো গদ্যর সীমারেখাই উধাও: "হাওয়া এল। শূন্য ঘর। ছড়ানো সংসার। ফুল নেই, শুকনো কাঠির মত শীর্ণ পাতাহীন কৃষ্ণকলির ঝাড়। কাল-কাসুন্দের বন। পোড়া পোড়া পাঁশুটে কচুরিপানা।" ('অকাল বসন্ত') এ গল্পেই "নির্বাক বিষণ্ণতা", "নিরাকার অস্থিরতা"র মতো চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়। অন্য আর একটি গল্পেও পাই: "ভাঙন ধরল না কোন রাত্রির বুকে। ফাল্গুন গিয়ে এল চৈত্র। পাগলা বাতাসে ঘূর্ণির লক্ষণ। চৈতালী ঘূর্ণি।" কিংবা ধরা যাক 'পশারিনী' গল্পটির সূচনা: "সেই সময় সে এসে দাঁড়াল। যখন চৈত্রের দুপুর ঝিমোচ্ছিল। যখন কলকাতা থেকে মাইল বারো দূরে উত্তরের এই স্টেশনটাও ঝিমোচ্ছিল এই দুপুরের মতোই। অবসন্ন হাত-পা এলিয়ে দেওয়া চোয়ালনাড়া, ল্যাজে মাছি না তাড়ানো অবসাদ-গ্রস্ত চোখ বোজা জানোয়ারের মতো। যখন দক্ষিণের হাওয়াটা উঠছিল এলোমেলো হয়ে, আড় মাতলার মতো টিন শেডের কলায় ঘা খেয়ে হঠাৎ দমকা নিশ্বাসের মতো শব্দ তুলে যাচ্ছিল হারিয়ে। এ সবই কবিতা—'পশারিনী'তে একটি নিম্নমধ্যবিত্তের হকার হওয়া ও হকারদের তাকে গ্রহণ করার প্রক্রিয়াটি গল্প করে তোলা হয়েছে—'মান' গল্পের উল্টো। গল্পটির আয়রনি এখানে—সে আসার এই যে দীর্ঘ বর্ণনা অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে, গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা করা, যাতে প্রথমে হকারদের তাকে যাত্রিনীই মনে হয়, সেটিই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তার হকার হওয়ায়—কারণ হকারদের, কোন ব্যক্তিসত্তা আর নেই—কেউ ভিকৃস, কেউ নিমের মাজন, কেউ দার্জিলিঙের নেবু। সমরেশ-এর প্রকৃতি ও বর্ণনা এই মানুষগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেই—নচেৎ 'পাড়ি' গল্পে এমন বাক্য আসতে পারে না: মেঘ জমেছে মেঘের পরে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রত্যক্ষ স্মৃতিবাহী এই লাইন কোনো রসভঙ্গ ঘটায় না সেখানে: এমনই প্রাকৃতিক আবেগ, মানুষের বোধ।

আর মানুষের বোধ এমন মৌলিক প্রকৃতি সংলগ্ন যে আমাদের মধ্যবিত্ত রুগ্ন, খানিকটা রক্তহীন মানবিক মূল্যবোধ আঘাত পায়। জন্তুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের তুলনা ('দুই বন্ধু') তাই এখানে কৃত্রিম নয়, অর্গ্যানিক—

সমরেশের স্বচ্ছন্দ রচনাশৈলীতে, বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গীতে এই অন্তর তুলনা, উপমা মাঝে মাঝে আসে, আসে বিশৃঙ্খল সম্পর্কের তীব্র টানাপোড়েন, প্রচলিত প্রথাসিদ্ধ প্রেমের প্রতিপক্ষে দুর্দমনীয় ভালোবাসা, নরনারীর শারীরিক আবেগ-অনুভূতি। পুরুষকে পুরুষ নারীকে নারী হিসাবে দেখেই, তাদের তিনি শোষণের শিকার রূপে, শ্রেণীর মানুষ রূপে চিত্রিত করেন: তাদের লড়াই, জয়-পরাজয়কে আঁকেন নিরাসক্ত আবেগে: মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবসন্নতায়, ভাঙনে তাঁর এই অভিজ্ঞানের অন্বেষণ আমাদের কাছে স্বাস্থ্যবান মনে হয়, তাঁর প্রতিভার প্রাণশক্তিই গল্পে মুখ্য বিবেচ্য,—অবশ্যই এই মৌলাবেগ সর্বত্র দানা বাঁধে না, সম্বন্ধ-স্থাপনের দ্বৈতাদ্বৈতে সার্থক ও প্রাণবন্ত হয় না, মানসের যে প্রগতিসন্ধান সমরেশের শিল্পীজীবনের পরিণতি হওয়া উচিত ছিল, তা হয়তো তির্যক হয়ে ওঠে কিন্তু যেখানে হয়, সেখানে তাঁর ঐ আবেগের, ঐ প্রাণশক্তির, ঐ অভিজ্ঞান খোঁজার দীপ্তি আশ্চর্য।

সমরেশ বসুর গল্পের শৈল্পিক গঠনের দরুনই 'জোয়ার ভাঁটা' বা 'পাড়ি'র মতো বিষয় গল্প হয়ে ওঠে। একটি বিশেষ পরিস্থিতির দর্পণে জীবনের অনেক আকাশ প্রতিফলিত হয়। জীবন-জীবিকা এক সূত্রে বাঁধা হয়ে যায়—এখানকার মানুষরা সমাজ-সীমান্তের অধিবাসী। 'জোয়ার ভাঁটায়' এদের সম্পর্কে পড়ি: "কিন্তু যেদিনটা ওরা কাজ পায় না। সেদিনটা ওদের অভিশপ্ত। এ ছন্নছাড়া আয়ের মতো জীবনও ছন্নছাড়া। কম হোক, বেশি হোক কোন বাঁধা আয় নেই, অথচ বাঁধা আছে পেট। তবে এ জীবনে পেটটাকেও গোঁজামিল দিতে শিখেছে ওরা। ঘরও নেই, বারও নেই, জীবনের রঙ্গ অঙ্গ সবটাকেই এখানে। এখানটায় ফাঁক গেলে সব আঁধার। আঁধারের সব কুরূপ না ওৎ পেতে আছে ওদের চারধারে। তাই হাতে যেদিন কাজ থাকে, সেদিন মূর্তিমান আনন্দ। বন্ধনহীন মন, তোলপাড় হৃদয়, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ নয়, যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ আশ।" সমরেশের জীবনবীক্ষা চমৎকার ধরা পড়ে এই অংশ-টুকুতে—জীবন ও কর্মের যে সাযুজ্য তিনি করেন, কর্মিষ্ঠ অস্তিত্বের যে বন্ধনহীন মনের কথা তিনি বলেন, সমরেশ শেষ পর্যন্ত সেটাই খোঁজেন: তাঁর প্রেম, সততা, সব কিছুই দাঁড়িয়ে থাকে এই শ্রম, কর্মের ওপর। পুরুষ ও নারীর বলিষ্ঠ উল্লাস আড়তবাবুর হরিনামের ফাঁকে অভিধা পায়: জানোয়ারের দল। অথচ কর্মের প্রত্যাশী জোয়ারভাঁটার গান সব তুচ্ছ করে দুর্জয় হয়ে ওঠে: "বৈশাখের খর হাওয়ায় সে গানের সুর ভেসে যায় মাঠ ভেঙে শহরে গাঁয়ে

গঙ্গার ছল্‌ছল্‌ তালে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে এপার ওপার। এ-গানেরই সুরে তালে দোলে আড়তের গ্যাড়া আর দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছ দোলে মাথা আকাশের।" কিন্তু এ গানে তাল কাটে, কারণ সূর্য মধ্যগগনে, দেখা দেয়নি এখনও সেই নৌকা, যার মাল খালাস করা এদের জীবিকা। এর আগেই লেখক জানিয়েছেন, "অমন ঘর চায় না কৈলাস যত ছ্যাঁচড়া জীবনের পাপ। ওটা ভেঙে ফেল।" গোবর কানাই ড্রাইভারকে বলে, "এখন যেন জীবনটা হয়েছে পোকা খেগো ছিঁটেবেড়া।" কানাই বলে, "বিগড়ে যাও।" "বিগড়ে যাব?" "হ্যাঁ। দেখনা, মেশিন বেগড়ালে তার পায়ের তলায় শুয়ে তেল মাখি। তেমনি বিগড়ে যাও।" কানাইও জবাব দেয় "ঠিক শালা বিগড়ে যাব।" লেখক জানেন, এই বিগড়ে যাওয়া কত দুরূহ, নৌকা না আসতে নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া বাধে, মারামারি বাধে। "কাজ নেই।...গরমজলের কেটলি ঢাকার মতো যেন ফুটতে থাকে কথাটা সবার মাথার মধ্যে। কাজ নেই।...তাদের জীবনের দিন-গুন্‌তিতে একটা বিরাট শূন্য ফাঁকা।" এই শূন্যতা, এই ফাঁকের মধ্যে আসে বিবাদ—কর্মই যে সবাইকে এক করে, আবার কর্মহীনতাই যে তাদের বিচ্ছিন্ন করে, সমরেশ বসু এই সত্যই উচ্চারিত করেন 'জোয়ার ভাঁটা'য়। কর্মিষ্ঠ জীবনের, শ্রমময় অস্তিত্বের আলোতেই প্রেম আসে, গান আসে—এ শুধু জোয়ার ভাঁটার সমাজ-সীমান্তর বলিষ্ঠ মানুষগুলোর ক্ষেত্রেই সত্য নয়, আমাদের অবসন্ন কর্মহীন সমগ্র সমাজের ক্ষেত্রেই সত্য। আবার নৌকা আসার সংবাদে মারামারি থামে, "গানে, কাজের উন্মাদনায় হাঁকে ডাকে মুখরিত গঙ্গার ধার।" লাল শাড়ি, কৈলাসকে একান্তে নিয়ে যায়, মুখের রক্ত ধুয়ে দেয়। কিন্তু এ রক্ত কেন? লাল শাড়ি ফুঁপিয়ে কাঁদে। গঙ্গার জোয়ার ভাঁটার মতো জীবনের এই জোয়ার ভাঁটায় সমরেশ উদ্ঘাটিত করেন সমাজসত্যকে: কেন এই মারামারি তারা নিজেরাই জানে না।

'পাড়ি' গল্পেও লেখক জানান শুরুতেই কাজ নেই তাই বসেছিল দুটিতে। বেকার বসে বসে দেখছিল। এই সময়ই "ধুলো উড়িয়ে বনজঙ্গল মাড়িয়ে, একরাশ কালো মেঘের মতো নেমে—এল জানোয়ারের পাল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।"* নেমে ও এল এই দুটিকে পৃথক করে দেওয়াতেই জানোয়ারগুলোর

* নেমে-র ড্যাশ চিহ্নটি 'ফুলবরিয়া' গল্পগ্রন্থ ও সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'শতবর্ষের শত গল্প' (দ্বিতীয়খণ্ড)-এ আছে। কিন্তু সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠগল্প ও গল্প সংগ্রহে নেই। প্রথম দুটিতেই ঠিক আছে বলে মনে হয়—ছাপার ব্যাপারে সতর্কতা খুবই দরকার--কারণ একটি ড্যাশ, কমা, স্পেশ, ইত্যাদিও রচনাশৈলীর আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গুরুত্ব বোঝা যায়। বস্তুত জানোয়ারগুলোর সূত্রেই পুরুষ ও নারীটি কাজ পায়। তারা "পরশুরাতে শেষবার খেয়েছে। কাজ করেছে আগের সপ্তাহ পর্যন্ত। তারপর 'মিসিপালটীর' দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কাজ নেই।" জানোয়ারগুলোকে গঙ্গা পার হবার যে "উনত্রিশ জানোয়ারের জন্য উনত্রিশ আসা"র কাজ যে তারা এবার পেল, তা এই পটভূমিতেই : কর্মহীন ক্ষুধার বাস্তবে ; শুয়োর যে কিনেছে সেই কানে সোনার মাকড়ি এই সুযোগটাই নেয়। পুরুষটির বর্ণনায় লেখক বলেন, "কালো কুচকুচে পুরুষ। গামছাটা পাতা শিয়রে। আঁটসাট করে কাপড় পরা। গোঁফজোড়া বড় হয়েছে। কিন্তু এখনো নরম খোঁয়াটে ভাব যায় নি। মুখটি এর মধ্যেই চোয়াড়ে খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে। শুয়ে পড়েছে। পা চালিয়ে দিয়েছে মেয়েটির উরুতের ওপর।" শেষ বাক্যটিতে ছমাসের বিয়ে হওয়া পুরুষটির চরিত্রটি ফুটে ওঠে। উনত্রিশটা শুয়োর নৌকা ছাড়া পার করবার ক্ষমতা সে রাখে : কিন্তু এতো শুধু শুয়োর পার করার গল্প নয়, এ যে দুর্যোগের দিনে মরণপণ পাড়ি দেওয়ার লড়াইয়ের গল্প। লেখক বলেন, "এ সব গল্পে তিনি দেখান, প্রকৃতই মানুষ জীবনকে সুদূর অনিশ্চয়তার মধ্যে শিকার করে ফিরছে।" আর "মানব-সমাজের উত্থানের শক্তি সেখান থেকেই।" দ্বিতীয় বাক্যটি সমরেশের গল্পাবলীতে বারবার বলা হয়েছে : নানাভাবে। এদের মধ্যেই তিনি উজ্জীবনকে দেখতে পান, কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রথমাবধিই তিনি বাদ দিয়েছেন, বিষয় হিসাবে নয়, উজ্জীবনের উপায় হিসাবে। কিন্তু প্রথম বাক্যটি মানা কঠিন : লেখক হয়তো এ কথাই বলতে চেয়েছেন, কিন্তু বিষয়-বিষয়ীর দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ায় গল্পটিতে এসেছে আরও গভীর, ব্যাপক মাত্রা। মেয়েটির হিসেবী মনকে চাপা দিয়েই পুরুষটি শুয়োর ও মেয়েটিকে নিয়ে ঝাঁপ দেয় গঙ্গায়। মেয়েটা বলে, "দরিয়ায় এখন জল বেশি। এরা এখন পার করছে কেন?" পুরুষটি বলল, "ওরা কারবারী। জানোয়ারের তখলিফ পরোয়া করে না।" শেষ বাক্যটিতে পুরুষটির সত্যদৃষ্টি ধরা পড়ে : তার প্রায় আদিম প্রকৃতি-মানুষের ঐক্যবোধে এই কঠিন পাড়িতে সে অর্জন করে, দেখায় দুর্লভ মানবিক আবেগ—লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। আর এ মানবিকতা এমনই মৌলিক, যে ক্ষুধা তাদের তাড়িত করে বেড়াচ্ছিল, সে "ক্ষুধার কথা ভুলে গেছে দুজনেই। অনেকক্ষণ ভুলে গেছে। পার হতে হবে শুয়োরগুলিকে নিয়ে, সেইটেই একমাত্র কথা, একমাত্র ভাবনা।" গাভিন শুয়োরীটা ঘূর্ণিতে পড়লে, "মেয়েটা চিৎকার করে উঠল, চলে এস। ওকে মরতে দাও। মরতে দেব।

মরবে শুয়োরীটা। এতগুলি বাচ্চা পেটে নিয়ে মরবে।' ঝাপটা দিয়ে পুরুষটি মাথা তুলল—বাঁচাল শুয়োরীটাকে। মেয়েটার পরনের কাপড় কোথায় চলে গেছে—নগ্ন সে। পুরুষটি গামছা পরে নিজের কাপড়টা ছুঁড়ে দেয় মেয়েটাকে, শেষ পর্যন্ত সবাই ডাঙ্গায় ওঠে। শুয়োরের খাঁচার পাশেই একটি চালাতে রাত কাটাচ্ছে পুরুষ ও মেয়েটা। পরশু রাতের পর আবার তারা খাবার পেল। "খাওয়ার পরে মেয়েটাকে বুকে নিয়ে সোহাগ করতে লাগল পুরুষটা। এখন সেই তরশুদিনের রাত্রের মতো ওদের দুজনের রক্তেই ভাঁটা ছেড়ে জোয়ার এল। জলন্ত কাঠটা খুঁচিয়ে দিল নিভিয়ে। তারপর দুজনে রক্তে রক্ত যোগ করে অনুভব করতে লাগল বাঁচাটা।" সমরেশ বসুর জীবনবীক্ষায় গঙ্গার ওই দুরন্ত লড়াই যেমন বাঁচা, তেমনি তার শেষে এই মিলনও বাঁচা—এই গোটা মানুষটা তাঁর অম্বিষ্ট. তারও অনেক পরে পুরুষটা গুণ গুণ করে গান করে, সব ছাপিয়ে ঐ গান মানুষদুটিকে প্রাগৈতিহাসিক আবহাওয়া থেকে ইতিহাসে নিয়ে আসে। কর্মিষ্ঠ লড়াই ও তারপরের এই প্রশান্তি—যে প্রশান্তিকে নিশ্চয়ই আগামীদিনের নিশ্চিতি নেই, মেয়েটার ছোটকাপড় বুক ঢাকতেও পারে না—তবু এই প্রশান্তি, আগামী লড়াইয়ের ইঙ্গিত। 'গল্পহীন' গল্পের, নতুনরীতি নবনিরীক্ষার পূর্বসূরী এই গল্প—সমরেশ বসু এদিক থেকেও আধুনিক।

এই আধুনিকতাই স্পষ্টভাবে ধরা আছে 'শানা বাউরীর কথকতা'-য়—বাঙলা ভাষারই একটি শ্রেষ্ঠ গল্প এটি। তিনজন মধ্যবিত্ত মানুষ ও শানা—এই চারজন। 'পাড়ি'র পুরুষটিই এখানে ঘুরে আসে শানা হয়ে: "কুচকুচে কালো গুলি-ভাঁটা চেহারা। মোটা ঠোঁট আর পাকানো চুল। কোকিলের মত লাল চোখ। এক চিলতে কাপড় আছে কোমরে, গায়ে জড়ানো পুরানো গামছা। মাল নিয়ে মোটর-বাসে তুলে দিতে যায় শানা: বোঝার ভারে ছায়াটাও অমানুষিক। যেন একটা পাহাড় মাথায় মানুষের দেহ। কালো সর্পিল স্ফীত শিরাগুলি কিলবিল করছে। থ্যাবড়া থ্যাবড়া খালি পা দুটি লাল কাদায় মাখা-মাখি হয়ে দেখাচ্ছে দগদগে ঘায়ের মতো।' এখানেও সেই নির্মম ক্ষুধার প্রসঙ্গে প্রথমে আসে, 'প্যাটের। পাপটো প্যাটের। জমিদারিটো খারিজ হয়্যা গেলছে, ব্যাগার নাই, কিন্তুক আমাকে ভাত দিবার কুনকালে কেউ নাই।' কিন্তু শানার মনে সুখ নেই—তার ঘরে মানুষ নাই। "বাতাসের ভরে কাঁপা হ্যারিকেনের আলোয় শুধু কিলবিলে শিরাগুলি আরও স্ফীত হচ্ছে। কালো রঙ

চকচক করছে উরুতের পেশীতে, পিঠের শিরদাঁড়ার দু-পাশে।" এই শারীরিক বর্ণনার প্রয়োজন আছে গল্পে, শানার প্রচণ্ড ক্রোধের আধার দুর্বল মানুষ হতে পারে না। শানার বউ বাপের বাড়ি চলে গেছে—শানার মা কুটনী। সে, "আপনকার ঘর থিকে দু ধামা ধান আনতে গিয়ে, উ আমার বউকে শুতে দেয়।" শানার কথকতা শুরু হয়। রায় বাঁড়ুজ্জে গাঙ্গুলিকে ঘিরে ধরে অস্বস্তি, অন্ধকারের মতো, পায়ের তলায় রক্তবর্ণ পাঁকের মতো। "আপনকাদের ব্যাটা নাতীরা বাউরিপাড়ার আঁস্তাকুড়েতে ঘুরর ঘুরর করে। শহরে বাজারে মেয়েমানুষের পাড়া আছে, ইখ্যানে বাউরী পাড়াটো আছে।" কালার বউ দু-বার পালিয়ে গেছে, দু-বার সে নিয়ে এসেছে—তার প্রাণ কাঁদে বউয়ের জন্য। কিন্তু, আর না—"আমি ভাতের ধান্দায় ফিরি, পুরুষমানুষ কতক্ষণ ধরে থাকবে।" তার বাড়ীতে "ভর দুকুরে আসে "মুকুজ্জে মশায়ের নাতী ক্যাদার বাবু"। এই আসার কারণ হিসাবে শানা যেটা বলে সেটিই ভূমিহীন কৃষক-মজুরের আর্তনাদ—শালো বাবুটার চারকুড়ি বিঘা ধানী জমি আছে। ভর দুকুরে উরার জলতিষ্টা পাবে কেনে নাই। ইয়ার ঘরে ধান আছে, (তা উ শানা বাউরীর ঘরে ঢুকে যায়। উয়ার ধান আছে, তো বউটোর শাউড়ী ই সময়ে বাড়ী আসে।" যে-তিনটি মধ্যবিত্ত শানার এই কাহিনী শোনে তারা দেখে হ্যারিকেনের আলোর বেষ্টনী ক্রমে ছোট হচ্ছে—শানা তাদের সামগ্রিক শ্রেণীগত রূপটাকেই খুলে ধরছে—"ভারী বোঝা টেনে, শানার শরীরের পেশীগুলো আরো শক্ত হয়ে উঠছে। শুধু ওর মুখটা দেখা যায় না।" শানা বলে, "উয়ার সুয়ামীর ধান নাই, তাই বউটোর বড় পাপ।" জমি নেই, ধান নেই—তার বউ চলে যায়। জমি আছে ধান আছে—"ভদ্রলোকেরা" বাউরীপাড়ায় আসে। আর এটা আছে বলেই ক্যাদার মুখুজ্জেদের "পুলিশ দারোগা আছে, দুমকা সদরটো আছে।" রায় গাঙ্গুলি বাঁড়ুজ্যের পাশে শানার ছায়াটা ভয়াবহ জানোয়ারের মতো—তারা, ক্যাদারকে সামলাতে চায়। শানাকে বারবার বলে 'তু বউটোকে লিয়ে আয়।' ভয়াবহ শানা মাথা নাড়ে, এক কথা বলে, "ক্যাদার মুখুজ্যের ধান আছে, উকে আপনকারা সামলাতে বলবেন।" পরশ্রমজীবী ভদ্রলোক শ্রেণীর কাছে ধান লক্ষ্মী নয়, ধান অর্থ-বিকার-দুর্নীতি। শানার এই স্পষ্টোক্তিতে, তার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে রায়-গাঙ্গুলি বাঁড়ুজ্জে অসহায় বোধ করে—"তিনজনেই বিস্মিত ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ। কিন্তু সাতপুরুষের গোলামটাকে

একলা পেয়েও তিনজনে কিছু বলতে পারছেন না। দেড়শো বছরের মধ্যে তিনটি বাউরীকে শুধু পিটিয়েই মারা হয়েছে কর্তাদের আত্মসম্মানের জন্যে। আর একটা শানা বাউরী, বোঝা মাথায় গোলামটাকে অসুরের মতো মনে হচ্ছে।" শানার প্রতিবাদ আরও তীক্ষ্ণ হয়—"ক্যাদার শালো, উয়াদের মতন মানুষের ঘরে কত বেজন্মা আছে আমি জানি। গগন বাঁড়ুজ্জে মশায়ের দশ-কুড়ি বিঘা ধানী জমি আছে, ওনার ছোট ব্যাটা ক্যাদারের আইবুড়ো বুনটার সঙ্গে শোয়। কেনে? না, চার কুড়ি দশ, কুড়িতে অনেক তফাত আছে হিসেবে। বিশ কুড়ি বিঘার মানুষ নাই আর গাঁয়ে, না হলে গগন বাঁড়ুজ্জ্যে মশায়ের টুকটুকে নাতীনটাকে মন্দিরে লিয়ে শুয়্যা থাকত আর একজনা।" শানা সম্পত্তি, জমির বেশি-কমের এই যে ব্যাখ্যা দেয়, এ তার জীবন থেকে পাওয়া। এরপর শানা চরম সাবধান বাণী শোনায়, "আপনাদের চেয়ে ক্যাদার শালোর জমি বেশী আছে।"...হঁ, আপনকারা শহরকে যান, বউসিগুলান গাঁয়ে থাকে। ক্যাদারের চোখে সবাই বাউরী।" রায়-বাঁড়ুজ্জ্যে-গাঙ্গুলী ভয়ে ছায়া হয়ে যায়। কিন্তু শানা? বউটো চলে গ্যালছে, আমার পানটো অক্ত দর্শন করতে চাইছিল, আমি পলায়ে ছিলম।" তার ধান নেই, কিন্তু সুন্দর রায় বাসে ওঠার আগে, মাল বইবার জন্য যখন তাকে চার আনা পয়সা দিতে যায় তখন শানা বলে, "ব্যাপারটা গ্যালছে ছোটকত্তা, গাঁয়ের পীরিতটা উঠে নাই, উতে আমার ধম্ম নষ্ট হবেক।" সমরেশ বসুর নিঃস্ব নায়কদের এই মর্যাদাবোধ, এই ভদ্রতা, সততা মধ্যবিত্ত কপটাচার দুর্নীতির পটে উজ্জ্বল। শানা প্রায় শপথ বাক্যের মতোই বলে, "কিন্তক ক্যাদারটো তবে সাবেক শানা বাউরীর হাতে", আর সেই সঙ্গেই সে চায় তার বউকে কারণ সে জেনে গেছে তার মতো ভূমিহীনেরা ক্যাদারদের না মারলে সুখী নামক বউকে ঘরে রাখতে পারবে না।

উপরের যে তিনটি গল্পের কথা বলা হল, এ ছাড়াও অন্তস্বাদের স্মরণীয় গল্প লিখেছেন সমরেশ বসু। অকালবসন্ত, অকাল বৃষ্টি বা মহাযুদ্ধের পরের মতো অসামান্য প্রেমের গল্প তিনি লেখেন—যাঁরাই এসব গল্প পড়েছেন তাঁরাই জানেন প্রেমের গল্প হিসাবে এরা কত স্বতন্ত্র, হয়তো নির্মম। আদাব, জলসা বা প্রতিরোধের মতো প্রথমদিকের তাঁর গল্পগুলিও নিশ্চয়ই মনে পড়বে—আবার সম্প্রতি লেখা "নিষিদ্ধ ছিদ্র"-দেখায় সমরেশ বসু তাঁর জীবনবীক্ষা কোনো সময়েই ছেড়ে আসেন নি। চূড়ান্ত অপমান, অসহায়ত্বর মধ্যেও মানুষের ক্রোধকে, মর্যাদাবোধকে, লড়াইয়ের মানসিকতাকে ধরে রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে

তাঁর "স্বীকারোক্তি" গল্পটি অনেকেই মনে করিয়ে দেবেন। এ গল্প কি প্রমাণ করে না সমরেশ সরে আসতে চাইছেন, তাঁর অর্জিত মৌল জীবনবীক্ষা থেকে, তাঁর অভিজ্ঞান অন্বেষণ থেকে?* আসলে সমরেশ বসু এখানেও মধ্যবিত্ত জীবনাচরণের ফাঁকিটাই দেখাতে চান—পাড়ির পুরুষ-মেয়ে, জোয়ারভাঁটার মানুষগুলি, শানা—ইত্যাদির জীবনের বলিষ্ঠ সত্য ও স্বাধীনতা, সম্পর্কের সততা মধ্যবিত্ত সত্তায় নেই এ কথাই বলতে চাইছেন তিনি। তবে এখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠছে নঞর্থক। স্বীকারোক্তির অনল ঘোষণা করে, লেখকের মতে, "সত্যের স্বীকারোক্তি দেওয়া কখনো সম্ভব হয় নি।" কিন্তু এখানে সংকট ঘনাচ্ছে অন্যদিক থেকে: সমরেশ বসু জীবন বীক্ষা মধ্যবিত্ত অভিজ্ঞানও অস্বীকার করছেন, কিন্তু ত্যাগ করতে পারেন না এখানে তাঁর সত্য ও স্বাধীনতার ধারণা আসছে বিমূর্তভাবে—আগে যেটা আসছিল মূর্ত মানুষের জীবন থেকে, এখন আসছে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির বিমূর্ত বোধ থেকে। ফলে শানা বা পাড়ির পুরুষ-মেয়ে বা জোয়ার ভাঁটার মানুষদের মতো স্বীকারোক্তির ব্যক্তিটি স্পষ্ট হয় না। সে সশস্ত্র গুপ্ত পার্টিতে থাকার সময় গোপনকথা বলে দেয় রায়বাহাদুর বিরাজমোহনের নাতনী অলকাকে—কেন? না তাকে সে চুমো খাবার চেষ্টা করত। সে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও নীরা বলে একটি মেয়ে ভালবাসে—কেন? উত্তর নেই। পার্টির সঙ্গে তার মতভেদ আছে—ধ্রুব বলে একজন দেশপ্রেমিক, বিশ্বাসী সৎপার্টিজান, চিন্তাশীল, বিবেকবানকে সে আশ্রয় দেয়, ছেলেটিকে ব্যক্তিগত বিরোধের ফলে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে পার্টি থেকে। অনল তাকে আশ্রয় দিয়ে বিবেকসম্মত কাজ করে—কিন্তু স্বীকার করে না। পুলিশের কাছেও সে স্বীকারোক্তি দেয় না—এখানে আবার না দিয়ে সে বিবেকের কাজ করে। বস্তুতঃ তার চরিত্রটি অস্পষ্ট—সে কেন বিবেকসম্মত কাজ করেও সৎ সাহসে হ্যাঁ বলতে পারে না? আবার রায়বাহাদুরের নাতনীর কাছেই

* সমরেশ বসু লিখেছেন, "গল্পের প্রকাশমাত্রই মুদ্রিত আকারে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলাম, সাম্রাজ্যবাদের অনুচর, সি আই এর দালাল।" বলাই বাহুল্য এ সব অবান্তর প্রসঙ্গ, গল্পটির আলোচনায় আসে না। এসব কথা যাঁরা শিল্প-সাহিত্য প্রসঙ্গে অনায়াসে বলেন, তাঁদের লক্ষ্য শিল্প-সাহিত্য নয়। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা—১৯৬৫-তে বিবরের প্রকাশ সমরেশ বসুর সাহিত্য জীবনে যে পর্বান্তর আনে, সে বিষয়েও মনে রাখতে হবে ঐ বছরই প্রকাশিত স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে-তে কালকূট অর্থাৎ সমরেশ বসুই পরমেশ বাবুর মেয়ে জামাইয়ের সংসার, কাকলীর বাবা-মার সংকট সমাধান ইত্যাদি সম্পর্কে যে সব কথা বলেন, তা বিবরের প্রতিবাদী। অবশ্যই এ উপন্যাস নিশ্চয়ই বিবরের তাৎপর্য থেকে অনেক দূরে—সাধারণ গল্পের বইমাত্র।

বা সে গুপ্তদলের কথা ফাঁস করে কেন? সেকি স্বেচ্ছাচারী—যখন যা মনে হয়, করে? 'মান' গল্পের বুনো বা শানা বা জোয়ার ভাঁটার মানুষদের মতো সে স্পষ্ট, সোজা নয়। লেখক কি এটাই বলতে চেয়েছেন—অনলের মধ্যবিত্ত অস্তিত্ব এরকমই অসহায়? কিন্তু এ ধরনের গল্প উপন্যাস সমরেশ বসু উত্তমপুরুষে লেখেন—চরিত্রটিকে অনেক সময়ই মনে রিল্যায়েবল ন্যারেটর—ফলে এ ব্যাখ্যাও টেঁকে না। তদুপরি এমন ভঙ্গিতে লেখেন, একটি বিশেষ পার্টির একটি বিশেষ ঘটনা সামগ্রিক ভাবে রাজনীতির বিরুদ্ধেই উদ্যত হয়ে ওঠে—ধ্রুবর ঘটনা পার্টিতে ঘটতেই পারে, বামপন্থী পার্টির বিউরোক্রেসি যে ভয়াবহ হয় তাও তো ইতিহাসে দেখা গেছে, ব্যক্তি হারিয়ে যায় পার্টিযন্ত্রের অমানবিকতায়, পার্টি হারাতে পারে তার শ্রেণী-ভিত্তি—কিন্তু এসবই রাজনীতির স্বধর্মচ্যুতি, রাজনীতি নয়: পাড়ি, শানা বাউরীর কথকতা, জোয়ার ভাঁটার মানুষদের মুক্তি তো আসতে পারে ঐ রাজনীতিরই সমুদ্র গর্জনে, মুক্তিতে। কেমন মনে হয়, অষ্ট্র্যালিনী-করণের উত্তর পর্বে সমরেশ বসু আত্মসমর্পণ করতে চান লিবারেল মূল্য-বোধের ঔপনিবেশিক পাঁকে, যার সঙ্কট খোদ ইয়োরোপেই শ্বাসরোধকারী।*
অথচ তাঁর জীবনবীক্ষা অভিজ্ঞান-অন্বেষণ এতে বাদ সাধে: নিষিদ্ধ ছিদ্র, উৎপাতের গল্প তাই বলে। এই সংকটের পর্ব কাটিয়ে সমরেশ নিশ্চয়ই সমুদ্র সঙ্গমে পৌঁছবেন, এযুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি যেখানে তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন।

---

* এ প্রসঙ্গে সোশ্যালিস্ট রেজিস্টার ১৯৭৩-এ ই পি টমসনের লেসজেক কোলাকোস্কিকে লেখা দীর্ঘ খোলা চিঠিটি পড়তে অনুরোধ করি।

জীবনের পাঠশালা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, তিনি ছিলেন স্কুল পলাতক। আর আমি রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় স্কুল থেকে বিতাড়িত। দুজনের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল যে, কারও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেই। কিন্তু কবি পেলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' উপাধি। আর আমি পেলাম বিশ্বভারতী থেকে সর্বোচ্চ সম্মান দেশিকোত্তম এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ডি. লিট। আর আজ পেলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পুরস্কার—জগত্তারিণী স্বর্ণপদক। যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এত বড় সম্মানলাভ করলাম সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই একদিন আমি বিতাড়িত হয়েছিলাম।

আজ আমার সাতাশি বছরের জন্মদিনে মনে পড়ছে আজ থেকে আটষট্টি বছর আগের এক জন্মদিনের কথা। সে জন্মদিনে কবিগুরু এক বুধবারের সন্ধ্যাকালীন উপাসনাতে বলেছিলেন "আমাদের এই আশ্রম-বাসী আমার একজন তরুণ বন্ধু এসে বললেন, 'আজ আমার জন্মদিন আজ আমি আঠারো পেরিয়ে উনিশ বছরে পড়েছি'। তাঁর সেই যৌবনকালের আরম্ভ আর আমার এই প্রৌঢ় বয়সের প্রান্ত—এই দুই সীমার মাঝখানটার কালটিকে কত দীর্ঘ বলেই মনে হয়। আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দেয়া হয়। সেই উপলক্ষে তিনি এই প্রতি-ভাষণ দেন।

এই উনিশ বছরকে দেখছি গণনা ও পরিমাপ করতে গেলে সে কত দূরে! তাঁর এবং আমার বয়সের মাঝখানে কত আবাদ, কত ফসল ফলা, কত ফসল কাটা, কত ফসল নষ্ট হওয়া, কত সুভিক্ষ এবং কত দুর্ভিক্ষ প্রতীক্ষা করে রয়েছে তার ঠিকানা নেই।...তাই আমার পরিণত বয়সের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও চিত্তবিস্তার সত্ত্বেও আমি আমার উনিশ বছরের বন্ধুটিকে তাঁর তারুণ্য নিয়ে অবজ্ঞা করতে পারি নে। বস্তুত তাঁর এই বয়সে কত অভাব ও অপরিণতি আছে, তারাই সবচেয়ে বড় হয়ে আমার চোখে পড়ছে না, এই বয়সের মধ্যে যে একটা সুসম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য আছে সেইটেই আমার কাছে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে।" তারপর বত্রিশ বৎসর তাঁকে দেখবার, জানবার, তাঁর কথা শুনবার, তাঁর অপার স্নেহ পাবার, তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্ক এমনকি সভা-সমিতিতে তাঁর বিরোধিতা করবার সৌভাগ্যলাভ করেছি। সেই সব ধৃষ্টতার কথা মনে হলে অবাক হয়ে ভাবি কী-ধৈর্যশীল মহাপুরুষের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু কি করে সে সুযোগ পেয়েছিলাম আর কি ভাবেই বা পবিত্রজীবনীকার হয়ে এত সম্মান পেলাম সে ইতিহাস একটু বলি।

১৯০৭ সালের কথা। সে যুগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বাংলাদেশ, উড়িষ্যা এমন কি ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত সুবিস্তৃত। এই সব অঞ্চলের স্কুল-কলেজগুলির পরীক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করত। আমি পড়তাম গিরিডি স্কুলে। তখন সেখানে সব বিভাগেই ছিলেন বাঙালি। ১৯০৭ সালের ৭ই অগাস্ট গিরিডিতে সভা। সভা হচ্ছে বৃটিশ পণ্যনীতি বর্জন নিয়ে। ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগ হলে বাঙালিরা এর প্রতিবাদে ব্রিটিশবস্ত্র বয়কট ঘোষণা করে। সেই ঘোষণার দিন ছিল ৭ই অগাস্ট। সেইদিন স্মরণে সভা হচ্ছে গিরিডির জৈন ধর্মশালার ময়দানে। বাবা ছিলেন সভাপতি, বক্তা ছিলেন ধরণীবাবু। আর, আমরা ছেলের দল সারাদিন ভল্যানটিয়ারি করি।

আমাদের হেডমাস্টার মশাই ছিলেন আশু আইচ। তিনি Risley Circular অনুসারে ছাত্রদের স্বদেশী সভায় যাওয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও গতকাল স্কুল কামাই করে যারা সভায় গিয়েছিল, তাদের বেঞ্চের উপর দাঁড়াতে বললেন। সব ছাত্রই প্রায় সভায় গিয়েছিল। সবাই বেঞ্চের উপর দাঁড়াল। আমি দাঁড়ালাম না। বললাম, 'ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। পিতার অনুমতি নিয়েই সভায় গিয়েছি, আমি বেঞ্চের উপর

দাঁড়াব না'। হেডমাস্টার মশাই ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'get out'। যেমন বলা, তেমনি কাজ। ভাবতেও পারি নি ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাব। সম্বন্ধ চুকল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, পরীক্ষা দেওয়া আর হল না। পরীক্ষা দিলাম কলকাতা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকে। ভালভাবে পাশও করলাম।

কলকাতায় মেসে থেকে পড়ি। কিন্তু শরীর টি'কল না। ১৯০৯ সালে পূজোর পর শান্তিনিকেতনে আশ্রয় পেলাম। রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন ছেলেটাকে গড়েপিটে মানুষ করা যাবে। ১৯১০ সালে জুন মাস থেকে ছোটদের পড়ানোর ভার পেলাম। এই বৎসরই গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুললে আমার জন্মদিন ১১ই শ্রাবণে 'পূর্ণ' অভিভাষণটি মন্দিরের উপাসনায় কবিগুরু বললেন।

শুরু হল আমার নতুন জীবনের ধারা। কেবল পড়ি আর পড়ি। রবীন্দ্রনাথের এই চারখণ্ডব্যাপী জীবনী লিখতে আমার দীর্ঘকাল কেটেছে। তরুণ বন্ধুরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, কবে এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করি। সঠিক তারিখ মনে করতে পারি না। তবে গ্রন্থ রচনার পূর্বে রবীন্দ্রসাহিত্য অধ্যয়ন এবং রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি। আমার বাড়িতে যে বিশ হাজার কার্ড আছে, সেগুলিই রবীন্দ্র জীবনী রচনার প্রধান উপকরণ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখব এই রকম দুরাকাঙ্ক্ষা কবে হল তার ইতিহাস আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু প্রয়াত শ্রীমান সুধীরচন্দ্র কর পুরনো কাগজপত্র থেকে উদ্ধার করে আমায় পেশ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে ১৯২৯ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর অমিয় চক্রবর্তী ও সুধীরচন্দ্র করের সম্পাদিত 'রবীন্দ্র পরিচয় সভা' স্থাপিত হয়। সভার পক্ষ থেকে এক আবেদন-পত্র প্রচার করা হয়। তাতে ঐ সভার জন্য কে কি কাজ করবেন সে সম্বন্ধে নিজ নিজ মত লিপিবদ্ধ করবার অনুরোধ নিয়ে সুধীরচন্দ্র হাজির হন। সেই পত্রে আশ্রমের তৎকালীন প্রায় সকলেরই নাম স্বাক্ষরিত দেখলাম। সেইখানে 'জীবনী-সংকলন' করবার ভার গ্রহণ করলাম।

তারপর কত বছর কেটে গেল। জীবনে অনেক সম্মান পেলাম। স্যার যদুনাথ সরকার যখন ভাইস-চ্যানসেলার ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, তখন 'বৃহত্তর ভারত' সম্বন্ধে তিনটে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। বহু বছর বাদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হল। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারবার বক্তৃতা দেওয়ার আহ্বান এল—লীলা বক্তৃতা

গিরিশ ঘোষ বক্তৃতা, বিদ্যাসাগর বক্তৃতা, যোগীন্দ্রমোহিনী বক্তৃতা। লীলা বক্তৃতার বিষয় ছিল 'রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ', গিরিশ ঘোষ বক্তৃতার বিষয় 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' আর যোগীন্দ্রমোহিনী বক্তৃতার বিষয় 'মধ্যযুগের ধর্ম ও ধর্মসাহিত্য'। এ-সবই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানের ফলে লেখা সম্ভব হয়েছে।

আজ যে জগত্তারিণী পদক পাচ্ছি, সেই পদকদাতা পুরুষসিংহ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মরণ করছি। তিনি তাঁর প্রধাতা মাতা জগত্তারিণী দেবীর নামে এই স্বর্ণপদক প্রদানের জন্য বেশ কিছু অর্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে যান। ১৯২১ সাল থেকে তা আরম্ভ হয়। প্রথম প্রাপক হন রবীন্দ্রনাথ। তখন তাঁর বয়স ষাট বছর। এর পর যাঁরা পেয়েছিলেন—শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ সবাই সাহিত্যিক। আমি সাহিত্যিক নই, আমি ঐতিহাসিক মাত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সাহিত্যিকের সম্মান দান করলেন, এই সাহিত্যিকদের পাশে আমাকে স্থান দিয়ে। জীবন সায়াহ্নে আমাকে এই সম্মানদানের জন্ম আমি ধন্য হলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এই পদক নিয়ে এসেছেন। সেজন্য আমি আনন্দ অনুভব করছি এবং তাঁকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাচ্ছি।

আর বিশ্বভারতীর উপাচার্যের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি এই উৎসবের আহ্বায়ক, এর সম্মানীয় অতিথিদের আতিথেয়তা দান করেছেন। তাছাড়া তিনি শান্তিনিকেতনের চিরাচরিত সৌজন্য প্রদর্শন করে আশ্রমের ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছেন।

আর সমাগত তরুণদের কাছে আমার একটি বক্তব্য আছে। আমি এই সাতাশি বছর বয়সেও কাজ করে চলেছি। তোমরা কঠোর পরিশ্রম করে কৃতকার্য হবে এই আশা রাখছি।

একটি প্রেমের গল্প

অমলেন্দু চক্রবর্তী

Girl kills herself to save honour

Krishnagar, Oct, 19. A 16-year old beauty Miss Bishnupriya Saha took her own life by setting her garments afire to avoid harassment by some Romeos at her residence at Nabadwip in Nadia district early this week according to delayed official reports received here to-day.

They used to run after the sweet sixteen for a long time but she managed to avoid them. But at last they allegedly forced her to accompany them. Requesting them to wait till she returned in her best, she went inside her residence. After a while smokes were seen coming out. They ran inside and saw that everything was finished. A number of people attended her funeral—(UNI).

AMRITA BAZAR PATRIKA
20 October 1973.

রঙিন মানচিত্র নয়, সবুজ সবুজ গোটা বাংলাদেশটাই তখন টেবিলের উপর ছড়িয়ে রাখা ভৌগোলিক নকশার চেয়ে আরও বেশি, অনেক বেশি জ্যান্ত। ছোট বড়ো অসংখ্য নদীর রং সাদা, রুপোলি ফিতেয় বাঁধা উপহার সামগ্রী যেমন। নিজেরই মুখের আদলে আরেক বিদেশী। বারো হাজার চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু থেকে নিচের দিকে চোখ রেখে সূর্যোদয়ের আকাশ দেখতে দেখতে যখন একঘেঁয়ে যান্ত্রিক ধ্বনিটা নিজের কানেই স্থিতাবস্থায় এসে গিয়েছিল, বিশাল একটা ডিমের খোলের মধ্যে সিটগুলিতে জোড়ায় জোড়ায় কতগুলি নিরিবিলি নারীপুরুষ, শান্ত চুপচাপ। দূরে রঙচঙে সুবেশ তরুণী নেহাত-ই

পেশাগত আলগা হাসিটুকু ঠোঁটে রেখে যাত্রীদের বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ট্রে-হাতে—যেখানে চকোলেট লজেন্সের সঙ্গে কানে-দেবার তুলোও তুলে নিতে পারে যে-কেউ। একরাশ বিরক্তিতে হাত বাড়িয়ে এয়ার-হোল্টা আরও একটু ঘুরিয়ে নিলো উৎপল, একেবারে ব্রহ্মতালু বরাবর সোজা বাতাসের পিচকিরি। শরীর জুড়োবে না, তবু হাতপা গুটিয়ে বসে থাকার একঘেঁয়েমিতে গায়ে-চামড়ায় কিছুটা খোঁচাখাচিও স্বস্তি। ডানপাশে বৃত্তাকার কাঁচের বাইরে মেঘের উপরতলা, অথবা মেঘ ভেদ করে ছুটে যেতে যেতে জানালার কাঁচ আচমকা ধবধবে সাদা আস্তরণে আচ্ছন্ন কিছুক্ষণ, তারপরই খোলামেলা মাঠ নদী গাছপালায় খেলাঘর সাজানো অদ্ভুত এক পৃথিবীর ছবি। সামনের ডেস্কটার উপর কাঁধের ঝোলাটা ছিল; কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাত থেকে কেনা শস্তা কাপড়ের ব্যাগ—গোটাকয়েক জামা পায়জামা টুথব্রাশ কাগজে-মোড়া চটি কিছু বই। এরকম সময়ে, অন্তত সময়টময় কাটাতে হলে, বইপত্তর কিছু থাকলে খুলে নিয়ে বসাই নাকি স্বাভাবিক নিয়ম, সবাই তাই করে, সেসবে কিছুমাত্র উৎসাহ নেই তার। বরং একটু নড়েচড়ে সে তার পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাইটা বের করতে চাইল। চোখটা ডানদিকে নিচের মর্ত্যভূমিতে—তার জন্মের আগেই যে-দেশটা বিদেশ হয়ে গেছে, যেখানে তার পিতৃপুরুষের পাপ অথবা পুণ্যি, যেদিকে তাকিয়ে সে এখনও ভাবতে পারছে না, ঘটনাটা এভাবে ঘটতে পারে! খবরের কাগজ সত্যি—রমা মরে গেছে। শুধু মৃত্যু নয়, এমন বিচ্ছিরিভাবে। ঠোঁটে সিগারেট তুলে দেশলাইটা জ্বালতেই, পার্শ্ববর্তী ষাট-পঁয়ষট্টির সজ্জন ভদ্রলোক, যিনি সেই তখন থেকে খবরের-কাগজটা নাকের ডগায় তুলে কী পড়ছিলেন, যেন কালই গোটাদিন ধরে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজকম্মো করেছেন মানবসভ্যতার জন্য এবং ভোরবেলাই দেখে নিতে চাইছেন, যথাযথভাবে সব কিছু দেশবাসীকে জানানো হলো কিনা, হঠাৎ ভুরু কুঁচকে একবার তাকালেন ডানদিকে। কাগজেই মুখ—'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

উৎপল শান্তভাবে ফিরে তাকায়—'আমাকে বলছেন?'

'নইলে আর কাকে?'

'আগরতলা।'

'কোথায় থাকা হয়?'

'কলকাতা।'

'ওখানে কেন?' বেড়াতে!'

'আগরতলাতেই বাড়ি। বাবা-মা থাকেন।'

'পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন' খশখশ শব্দে প্রথম পৃষ্ঠার লেজ ধরতে ভদ্রলোক ডানার মতো দু-হাত তুলে কাগজ ভাঁজ করছেন। তাকাচ্ছেন না এদিকে। বেয়ারা ছোঁড়া হাতের সিগারেটটা ফেলছে না এখনও—'কার পোলা।'

'জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী।'

'রাখালদার নাতি! অ্যাঁ...' ভদ্রলোক চমকে তাকালেন—'কও কী! তুমি, তুমি সেই পোলা! আরে তোমারে তো চিনতেই পারি নাই। অ ভোমলা, আমার পাশে কে দেখছসনি অরে, চিনস নি?'

বৃদ্ধের আকস্মিক চেঁচামেচিতে এতগুলি মানুষের স্তব্ধতা কেঁপে উঠতেই এমন একটা গ্রাম্য হট্টগোল, গা ঘিনঘিন বিরক্তিতে শরীরটা ঘুলিয়ে উঠলেও উৎপল শান্তভাবে পাশের জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। হাতের সিগারেট জ্বলছে। ঘাড় না ফিরিয়েই যদিও সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, কোণাকুণি সামনের সিট থেকে, চল্লিশের এপারে ওপারে বয়স ভোমলা নামে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে গলা উঁচিয়ে তাকে দেখলেন। বৃদ্ধ আরও একবার গলা ছাড়লেন—'জ্ঞানা উকিলের পোলা। রাখালদার সেই নাতি...'

ঠোঁটে আঙুল চেপে ঝুপ করে বসে পড়লেন ভোমলা নামের ভদ্রলোক। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ছোট শহর আগরতলার মানুষ। সিটের পিঠগুলি মাথা থেকে উঁচু, উঁকিঝুঁকির সুবিধে নেই, তবু একটা চাপা গুঞ্জন। বারো হাজার চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে হঠাৎ যদি একটা যান্ত্রিক গোলযোগের দুঃসংবাদ ঘোষিত হয় লাউডস্পীকারে, বোধ হয় তার চেয়েও মারাত্মক কিছু—বিপজ্জনক একটি বিস্ফোরকের অস্তিত্ব, একজন যুবক, যেন কোন দুর্ধর্ষ হাইজ্যাকারকে খুঁজে পাবার পর নজরে নজরে বন্দী করে রাখা, যে-কোনো মুহূর্তে যে-লোকটা লাফিয়ে উঠতে পারে, যা-খুশি করে বসতে পারে যখন তখন। মরতেও ভয় পায় না, এমন দস্যি।

এবং বাপঠাকুদ্দার ঘরবাড়ি জোতজমির উপর চোখ রেখে নির্বিকার উদাসীন যুবক, উৎপল বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেটটা ধরে ডানহাতে তার লালিত দাঁড়িটা ঘসছিল অন্যমনস্কতায়। এতকাল বাদে ঘরে ফেরার পর মোটামুটি ছোটখাটো একটা ভূকম্পন ঘটে যাবে ছোট শহরটায়, এরকম একটা ধারণা তার অনুমানের মধ্যে ছিল যদিও, কিন্তু ভাবতে পারেনি,

এক্ষুনি, এই মাঝপথেই হট্টগোলটা বেঁধে যাবে এভাবে। প্রায় বছর দেড়েক-দুয়েক সে ঘরে ফেরেনি। এর আগে যখন সে আসত, কারা যেন পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াত সবসময়, অন্ধকারে প্রেতের ছায়া। বাবা কী সব শুনে আসতেন বাইরে থেকে, মা কাঁদতেন। বাড়ির মধ্যেও একটা অশান্তি। রমা তখন তুলসীবতী থেকে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছে সবে। কলেজে যাচ্ছে। তবে দুদিনের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠে পালিয়ে আসতে হতো কলকাতায়।

ট্রে-হাতে ভদ্রমহিলা সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতের দুটো আঙুল নিঃশব্দে কপাল পর্যন্ত তুলে উৎপল যখন 'থ্যাঙ্ক ইউ' মাত্র দুটি শব্দে প্রয়োজনটুকু সেরে নিলো, অবাক হয়ে দেখল, ঠাকুর্দার ভাই বৃদ্ধ ভদ্রলোক থাবলা মেরে কিছু তুলে নিয়ে, কী নিলেন, কতোটুকু, হিসেব নেই, পকেটে পুরলেন। বোধহয়, নাতি-নাতনীদের জন্য।

'তোমার বাপ জানার সঙ্গে সেদিন কামান চৌমুনিতে দেখা, বুঝলা কিনা'··· যেন সিগারেটের ধোঁয়ায় খুবই অসুবিধা হচ্ছে তার। ভুরুকপাল কুচকোনো— 'খুবই দুঃখু করে বলছিল···হ, অ্যাই তোমারই কথা...'

'কেন বাজে কথা বলছেন!' খুবই ঠাণ্ডাভাবে উৎপল ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল— 'বাবা ওরকম দুঃখুফুখ্যু হাহুতাশ করেন না। খেয়েদেয়ে কোনো কাজ নেই। ওসব কথা উনি আপনাকে বলতে গেছেন?'

'কি, কি কও!' স্তম্ভিত বৃদ্ধ হঠাৎ দিশেহারা। ফর্সা চামড়ায় নাকমুখ-কান গাল লাল—'তুমিই বা কেমন ছেলে বাপু! চেনাজানা ঘরের ছেলে, তাই দুটো কথা বলতে গেলাম, আর যা-নয় তা শুনিয়ে দিলে! সেই তখন থেকে মুখের সামনে সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছো···।'

'আপনিই বা এত কথা বলছেন কেন? চুপ করুন না...' ঠোঁটের কোণে সিগারেট ভাসিয়ে মাথা গুঁজে ব্যাগের ভিতর কি খুঁজছিল উৎপল। লক্ষ করল, বেদম ঘাবড়ে গেছেন ভদ্রলোক। স্থির দৃষ্টিতে ওর ব্যাগে-হাতড়ানো দেখছেন। চোখের পাতা কাঁপছে না, মেদল ফুলো গাল দুটো কাঁপছে। হাতটা বের করে আনার পর, যখন নেহাৎ-ই একটা বই, ভদ্রলোক নড়েচড়ে সহজ হয়ে বসলেন। একটা সুখের নিঃশ্বাস। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচা। এবং ডানদিকে একটু বেঁকে, জানালার পরিচ্ছন্ন আলোয় বইটা খুলে বসল উৎপল।

সকালের কফি বা চা পরিবেশন শুরু হয়ে গেছে সামনের সারিতে। বাঁদিকের ফালতু উৎপাতটা বন্ধ হবার পর এবার কিছুটা উৎসাহ পেল সে।

এই ভোরবেলা গায়ের ম্যাজম্যাজানি ভেঙে চাঙা হবার একমাত্র দাওয়াই। কিন্তু পিঁপড়ের সারি কালো কালো অক্ষরগুলির প্রতি যখন আর কোনো কৌতূহল থাকছে না, বই-এর পাতার সঙ্গে জীবনটা মিলছে না ঠিকমতো, বই-পড়ার ভঙ্গিতেই উৎপল তার পার্শ্ববর্তী বৃদ্ধ সম্বন্ধে আগ্রহী হলো। অসম্ভব রকমের সাদা আর ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি, ধুতি, সোনার বোতাম, দামি ঘড়ি, সুবাসিত জর্দার গন্ধ মুখের পানে, বার্ধক্যেও গালের চামড়া সুন্দর মসৃণ। ধরেই নেওয়া যায়, বাংলাদেশের সীমান্তের চোলাই কারবার অথবা লরির ব্যবসা কিংবা বড় বাজারের আড়তদারি। এসব স্থানীয় মাননীয় ব্যক্তিরা, অন্তত উৎপলের নিজস্ব সিদ্ধান্ত, প্রায় সকলেই রমার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আততায়ী এবং প্রমাণ নজির ছাড়া টুটি চেপে ধরা যাচ্ছে না যেহেতু, কিছু ঘৃণা আর অবজ্ঞা ছাড়া আপাতত তার দেয় কিছু নেই।

স্যাণ্ডুইচের প্লেট কফির কাপ সামনে এসে পড়তেই সেই বৃদ্ধ, যিনি সোনার বোতাম বুকে ঝুলিয়ে নাতিনাতনীর ভাবনায় চকোলেট লজেন্স থাবলা মেরে পকেটে পুরতে পারেন, তুজোড়া পাউরুটি এক করে হালুম দিয়ে কামড়ে নিলেন প্রায় পুরোটাই। গাল ভরে চিবোতে লাগলেন উর্ধ্বে চোখ তুলে। সবল দাঁতের অহঙ্কার এবং পরমান্ন ভোজনের সুখ।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে ভালো লাগল তার এবং বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থেকে, যখন ফুলো-ফুলো গালদুটো কামারশালার হাপরের মতো অবিরাম উঠছে নামছে, ঢেঁকির পাড় পড়ছে দাঁতে, গলাধঃকরণে শিথিল চামড়ায় কণ্ঠনালীর ওঠাপড়া, দেখতে দেখতে এক সময় মনে হলো, ঠিক এখনই, এই মুহূর্তেই যদি লালবাতিটা জ্বলে ওঠে হঠাৎ, একটানা যান্ত্রিক ধ্বনিটা বদলে যায় অদ্ভুত-ভাবে, লাউডস্পিকারে ঘোষণা—বেল্টগুলো বেঁধে নিন কোমরে, ভয় পাবেন না, সবই ঠিকঠাক আছে, তবে···অকস্মাৎ সোজা সরলরেখায় তীব্রবেগে ছুটে আসা জ্বলন্ত এক অগ্নিশিখা পদ্মা মেঘনা শীতলক্ষার জলে অথবা সবুজ ধানের ক্ষেতে বায়ুমণ্ডলকে আরও একটু দূষিত করার পর পোড়া পেট্রলের গন্ধ ছড়িয়ে অগ্নিদগ্ধ কতগুলি মাংসপিণ্ড শুধু একাকার মিশে যাবে জলে বা কবরে, কেউ জানবে না কী বা পরিচয় তাদের! ক্ষতিপূরণের টাকা চাইবে আত্মীয় পরিজনেরা। ঘটতেই পারে। পৃথিবীর আকাশে এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটে আজকাল। পৃথিবী থেকে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে মেঘের উর্ধ্বে মৃত্যুকে আজ কতো সহজ মনে হয়! কল্লোল দীপু নয়ন চন্দ্রশেখর পিনাকী...বছরের পর বছর গড়ানোর শেষে আজ আর স্পষ্ট করে মুখগুলিও মনে পড়ে না তেমন,

শুধু নামের স্মৃতিতে কতোগুলি অস্পষ্ট আদল, লাস-কাটা-ঘরের আবছা আলোয় সেলফে-সেলফে টগবগে প্রাণগুলি পাথর বনে যাবার পরই হস্টেলে ফিরে এসে ল্যাবরেটরি সেসনালে ডুবে যেতে হয়েছে তাকে। পরীক্ষার পড়া। রমার কাছে প্রতিশ্রুতি—বাঁচতে হবে। শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্যই যদি এতসব, তবে মৃত্যু কেন? রমা! বিষের আগুন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দাউদাউ জ্বলে যাবার মুহূর্তেও কি একবার বেঁচে থাকার সাধ জাগেনি কোনো! ওকে বাঁচাতে পারল না কেউ? হত্যা বা নিধন নয়, আত্মহত্যা! বইপুঁথির ভাষায় যাকে সবচেয়ে ঘৃণা করে সে। রমা কী ঘৃণা!

কফিস্যাণ্ডুইচের শেষে সোনার বোতাম হীরের আংটির সেই বৃদ্ধ, রমার আততায়ী তার ব্যাগ থেকে পানের কৌটো খুলে এক জোড়া পান মুখে পুরে চিমটি কেটে জর্দা তুলছেন। আরও একটি সিগারেটের প্রয়োজন অনুভব করল উৎপল। কিন্তু সিগারেটটা হাতে নিয়েও ধরানো গেল না। 'নো-স্মোকিং' লাল বাতি জ্বলে উঠেছে সামনে। ডানদিকের জানালায় ত্রিপুরার পার্বত্য বনভূমি। নারীকণ্ঠে ঘোষণা—প্রাচীন ঐতিহ্যবহ, পাহাড়ে অরণ্যে ঘেরা পূর্ব ভারতের এক সবুজ দেশে পৌঁছে গেছি আমরা। আপনারা স্বাগত...

ডিমের খোলস ভেঙে যেভাবে বেরিয়ে আসে জীবন, ইস্পাতের বিশাল ডানা থেকে একটু একটু করে উন্মোচিত হলো পেল্লাই টায়ারটা। মাটিতে শক্তভাবে দাঁড়াবার মতো এক জোড়া পা চাই আমাদের এবং সেদিকে স্থির পলকে চোখ রেখে উৎপল তার গোটা শরীরের কেন্দ্রে একটা চাপা উত্তেজনার উত্তাপে দাঁতে দাঁত চেপে প্রতীক্ষায় রইল। আতস কাঁচের তলায় বই-এর ক্ষুদে-ক্ষুদে অক্ষরগুলির মতো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে ত্রিপুরার পার্বত্য বনভূমি। হাতের মুঠোয় নিজের অজান্তেই কখন, প্যাকেট থেকে নতুন বের-করা সিগারেটটা দলেমুচড়ে পিষে যেতে থাকে। আর আজন্ম পরিচিত শহর, মাঝখানে দশটা বছর প্রবাসে কলকাতায়। যৌবনের এক দশক। আজ মনে হয়, গৃহত্যাগের পর অনেক ঝড়ঝাপটা, অসংখ্য মৃত্যু, অভিজ্ঞতার শেষে শূন্য হাতে ঘরে ফেরা। একা।

দুই

বিমানবন্দর সিভারবিল থেকে বাসটা বড়ো দ্রুত তাকে শহরে পৌঁছে দিলো। মালপত্তর বুঝে নেবার স্লিপটিল্প ছিল না যেহেতু, ঝাড়া হাতে-পায়ে ঝোলা-ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে রাস্তায় নামতেই জন্মের সহর কামড়ে

ধরল তাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী তার। সহরের স্নায়ুকেন্দ্রে কামানচৌমুনিতে ভিড়ে, সাইকেল, সাইকেল-রিকশ ছুটো একটা লরি-মোটরের কোলাহলে নিঃশব্দে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে এগোতে দু-পাশের মানুষ, যারা তাকে চিনতে পারছে অথবা পারছে না, কুশল প্রশ্নে এগিয়ে আসছে না কাছে এবং যাদের প্রতি তারও কোনো কৌতূহল নেই, ডানে বাঁয়ে অস্বীকার করে, যেন কোনো অরণ্যচারী শিকারী, উৎপল ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল—আপাতত তার কোনো স্থির লক্ষ্য নেই। শহরটাই লক্ষ্য ছিল, তারপর ফাঁকা। গত দশ বছরে অনেক কিছু বদলালেও যে সহরের কোনো পরিবর্তনই চোখে পড়ল না কখনও, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে টুঁটি চেপে ধরার আক্রোশে সত্যি সত্যি কোনো বিস্ফোরণ ঘটানোর আগে সবকিছু বুঝেসুঝে নিতে হবে তাকে। রমা, শেষ পর্যন্ত যে তার বেঁচে থাকার অর্থ, একমাত্র অর্থ হয়ে উঠেছিল জীবনে।

হরিগঙ্গা বসাক রোডে সুজয়দের বাড়ি। বাঁশ-বেড়ায় ঘেরা ছোটো-খাটো ফুলের বাগান। মেঝেটা পাকা, টিনের চাল, বাঁশবেড়ার ঘর। উৎপল রেজায় এসে কড়া নাড়ল। দরজা খুলল মিনতি-বৌদি—'কে ?'

'সুজয় আছে ?'

'কে উৎপল না !'

উৎপল হাসতে চাইল।

'সে কি ! কবে এলে !'

'এই তো, এক্ষুণি...'

'ফার্স্ট-ক্লাইটে ! কি কান্ত এলো তো ! এসো এসো; কি করেছ শরীরটার ! আমি তো চিনতেই পারিনি···' দরজা ছেড়ে দাঁড়াতেই অভ্যর্থনার প্রথমে ধাক্কায় হাসিটা শুকিয়ে আসে। যেন সকালবেলার হঠাৎ-অতিথি আগন্তুক যুবক তার বুকের যন্ত্রণা—'সুজয় তো এই একটু আগে কোথায় বেরোল। আসবে এক্ষুণি, বোস তুমি...'

ঘরে ঢুকে হাঁটু উঁচু টেবিলে কাঁধের ব্যাগটা রেখে উৎপল একটা সোফায় বসল—'অজয়দা ?'

'আছেন। বোধহয় বাথরুমে···' স্থির পলকে তাকিয়ে থেকে কি রকম ঝিম্ মেরে গেছেন মিনতি বৌদি—'তুমি কি সুজয়ের চিঠি পেয়েই এসেছ ?'

'হ্যাঁ...'

'সব কিছু জেনেই...'

'জানি...'

তারপর অদ্ভুতভাবে দুজনেরই কথা থেমে যায় অথবা এমন এক নিস্তব্ধতা, যেখানে শব্দ নিয়ে এগোন যায় না বেশিদূর। উৎপল অস্বস্তিতে আরও একটা সিগারেটের জন্য প্যাকেটটা বের করে বৌদির দিকে তাকাল। ঘরের কোণে আলমারিতে ঠেঁস দিয়ে, মুখে আঁচল চেপে দাঁড়িয়ে আছেন, পলকহীন সজল চোখজোড়া নিবদ্ধ তারই দিকে। যেন এখনই, একটু টোকা দিলেই গোটা শরীরটা ভেঙে পড়বে মাটিতে। এই ক-বছরে এতটুকু পাল্টাননি ভদ্রমহিলা। ওদের ঘরটা বদলে গেছে। রঙিন সোফাসেট, দেয়াল ঘেঁসে বই-এর আলমারি, র‍্যাক, রেডিও, রেকর্ড-প্লেয়ার, দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ফটো, নাগা-উপজাতির মুখোশ।

'এভাবে ও তোমার এতো বড়ো সর্বনাশটা কেন করল উৎপল...'

উৎপল চমকে তাকাল। কান্নায় ভেজা ফ্যাসফেসে গলা। ভদ্রমহিলা সত্যি কাঁদছেন। 'তুমি সেবার ঘর ছেড়ে চলে গেলে, এখানে এতদূরে বসে খবরের-কাগজ পড়ত আর ছুটে ছুটে আসত মেয়েটা। কলকাতায় তখন খুনোখুনি, আর মেয়েটা এখানে দাবড়ে দাবড়ে মরেছে। তোমাকে যদি ওরা মেরে ফেলে! ওকে নিয়ে তখন আমাদের রোজ কি ঝামেলা। রাত হয়ে যেত, ঘরে ফিরতে চাইত না। বলত, ঘরে গিয়ে কি করব। পড়াশুনোও হয় না, রাত্তিরে ঘুমও হয় না। শুকোতে শুকোতে আদ্ধেক হয়ে গেল...' বুকের ভিতর যদিও এক অমানুষিক নির্মম যন্ত্রণা, শিরদাঁড়া উঁচিয়ে চোখ বুজে গোটা শরীরের রক্তসঞ্চালনকে নিজের মধ্যে আয়ত্তে আনতে চেয়ে আরও বেশি আক্রোশে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠে উৎপল। হাতের জ্বলন্ত এবং প্রায় পুরো সিগারেটটাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরে এ্যাসট্রেতে গুঁজতে থাকে।

'তোমার অজয়দা ওকে কত করে বোঝাতেন—একটা যুদ্ধে তো হাজার হাজার মানুষকে মরতে হয় কিন্তু যারা যুদ্ধ করে সবাই কি মরে যায়! অনেকে তো ফিরেও আসে। সেবারে এসে তুমি যখন থাকতে পারলে না, চলে গেলে, তোমাকে নিয়ে কত গপ্পো রটল এখানে। পুলিশের লোক নাকি নজর রাখছে এখানে ওখানে। ও আমাদের কাছে রোজই আসত বলে সুজয়কে নিয়ে ওর নামে কত আকথা কুকথা নিন্দে ছড়ালো। তোমার অজয়দা বলল—ওই নিন্দেটাই বেঁচে থাক। কলকাতায় উৎপল রক্ষে পাবে কিনা জানিনে,

এখানে মেয়েটা তো বাঁচুক। ওদের বাড়িতেও তোমাকে নিয়ে কম অশান্তি ছিল না ওর...'

সাজানো-গোছানো পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে ইনটারোগেশনের মতোই এ যেন আরেক যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণায় বুকের ছটফটানিতে শুধু আক্রোশ বা দাহ নয়, ঘনীভূত কান্নার বাষ্প। সোফার হাতলে কনুই, হাতের তেলোয় মাথা রেখে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করে উৎপল—এই ছেঁদো কান্নাকাটির বিরুদ্ধেই তার প্রকাশ্য যুদ্ধঘোষণা ছিল একদিন।

'শ্মশান থেকে ফিরে পুরো একটা রাত কথা বলেনি তোমার দাদা। সুজয় বাড়ি ফিরল রাত প্রায় বারোটার পর। সহরের মানুষ আজ পর্যন্ত জানে না সত্যি সত্যি কি ঘটেছিল। বদমাস শয়তানগুলো কি করেছিল ওর! কি বলব তোমাকে, উৎপল, ও এত ছেলেমানুষ, আমাকে এত বিশ্বাস করত, তোমার লেখা কত চিঠি এনে গোপনে গোপনে পড়াত আমাকে। মানে বুঝতে চাইত। তোমাকে নিয়ে বুকের মধ্যে সবসময় ওর একটা ভয়। সেই আমাকে, আমাকেও যাবার আগে সব কথা বলে গেল না মেয়েটা! আমি জানলে, জানতে পারলে...'

'এক কাপ চা খাওয়াবেন বৌদি...'

মুখে আঁচল চেপে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ার আগেই ভদ্রমহিলা একেবারে শুব্ধ হয়ে গেলেন—'ও হ্যাঁ, চা। চা দেব তোমাকে। অনেক দূর থেকে এসেছ...'

মিনতিবৌদি চলে যাবার পর ঘরটা যখন আবার ফাঁকা, টানটান শিরদাঁড়ায় নিজেরই গোপন অস্থিরতাকে যখন বেঁধে রাখা যাচ্ছে না কিছুতেই, উৎপল খাড়া পায়ে উঠে দাঁড়াল। হাতের তেলোয় নিশ্‌পিশ্‌ করছে আঙুলগুলি। একটা দুটো পেটোয় কি পিস্তলে পাইপগানে সমাজ বদলে দেওয়া যায় না দুনিয়ায়। কিন্তু একটা দুটো শয়তানের মাথা! যারা এই শহরে আছে এবং সমাজ বদলাতে চায় না বলে বেঁচে থাকবে বা বাঁচিয়ে রাখা হবে যাদের! ঠিক জেলখানার সেলের ভিতর যেমন, অস্থিরভাবে একটু নড়াচড়া করতেই আসবাব জিনিসপত্তরে ঠাসা ঘরটাকে অসম্ভব ছোট মনে হলো। এই সহরে রমা আর বেঁচে নেই—নিষ্ঠুর বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতেই, ঘরের কোণে ষ্টিল-আলমারির পাল্লায় পূর্ণাঙ্গ আরশিতে নিজেকে দেখতে পেয়ে থমকে গেল সে। অন্য এক অচেনা মানুষ। লাল লাল একজোড়া চোখ, আলুথালু চুল, গাল ভরে এলোমেলো দাঁড়ি। সুদূর কলকাতায় কটা দিন ধরে দিনে রাতে

ডানাঝাপটানির পর ধারকর্জের টাকায় চান্স বুকিং-এ হঠাৎ টিকিট পেয়ে আজ এখন, এই শহরে বড়ো বেশি বাস্তবের মোকাবিলায়…

খয়েরি রঙের লুঙি আর গেঞ্জি পরনে, তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে দ্রুত ঘরে ঢুকে পড়লেন অজয়দা, অজয় দত্ত, স্থানীয় কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। সরাসরি রমার মাস্টারমশাই।—'তুমি এসে গেছো, অ্যাণ্ড উই ওএয়ার এক্সপেক্‌টিং ইউ অন্ এনি ডে অ্যাট এনি মোমেন্ট। নাও বোস, কথা আছে…'

উৎপল ফিরে গিয়ে সেই একই সোফায় বসল। একই ভঙ্গিতে শান্ত চুপচাপ। টেবিলের ড্রয়ার খুলে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন অজয়দা—'অবিশ্যি এখন কি আর বলার আছে আমাদের! সব তো শেষ।'

নিঃশব্দে উৎপল তার নিজের সিগারেট ধরাল।

'অ্যাণ্ড নাউ ফিউ ফিউটাইল্ ওঅর্ডস মোর। এ নিয়ে আর কথা বলতে বড়ো বিচ্ছিরি লাগছে উৎপল। শুধু কতগুলি জরুরি কথা তোমার সঙ্গে…' উত্তেজনায় ঘর কাঁপিয়ে চিৎকার করছেন অজয়দা—'তোমাকে কি আর সান্ত্বনা দেব উৎপল। ইউ আর মাচ মোর র‍্যাশন্যাল টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড থিংগস্। ও তো তোমাকে ডেজার্ট করেনি। ও তো তোমার মধ্যে নিজেকে রেখে স্থিরভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। সি হ্যাড সাম্ ড্রিম্ অ্যারাউণ্ড ইউ। কিন্তু, কিন্তু কতগুলো গুণ্ডা বদমাশ, কোত্থেকে এসে যে ভিড় করছে এরা, পিলপিল করে গজিয়ে উঠছে সহরটায়, সে তুমি ভাবতে পারবে না। সে আগরতলা আর নেই…অ্যাণ্ড ফাইনালি দে ডেজার্টেট ইউ…'

সামনের সোফাটার কাছাকাছি এসে বারদুয়েক বসতে চেয়েও ফিরে গেলেন অজয়দা। বোঝা যায়, কি অস্থিরতায় ছটফট করছেন ভিতরে ভিতরে। উৎপল পূর্ববৎ স্থির। টেবিলে ছাইদানির উপর নিবদ্ধ নিষ্পলক চোখ। 'কিন্তু একটা জিনিস আমি এখনও, এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। ওর মতো এরকম একটা ইনটেলিজেন্ট শার্প মেয়ে এত ডিজাস্ট্রাস হেষ্টি ডিসিসান্‌টা নিল কি করে? আমরা কেউ কিছু টের পর্যন্ত পেলাম না। কতগুলো স্কাউণ্ড্রেল বড়ো বেশি বিরক্ত করছিল কদিন ধরে। বাড়িতে বেনামে উড়ো চিঠি যাচ্ছিল। সে তো অনেক মেয়েকে নিয়েই হচ্ছে আজকাল। ওর মা বাবা দাদারা তো শুনেছি, পড়াশুনোই বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। সেদিন কি যে হলো, কলেজে যাবে বলে বেরল সকালবেলা। সেখানে যায় নি।

গোটা দুপুর বিকেল পাত্তা নেই। তখনও বোঝেনি কেউ কিছু। ফিরল সেই অনেক রাতে, দশটা সাড়ে-দশটায়…'

'সি ওঅজ্ রেপ্ড বাই সেভেন মিস্ক্রিয়েণ্টস্, ওআন আফ্টার অ্যানাদার, উইদাউট রেস্ট্...'

'হাউ, হাউ ডু ইউ নো ইট...' প্রায় লাফ মেরে ছুটে এলেন অজয়দা—'পুলিশ রিপোর্ট ময়না-তদন্ত ওরকমই সন্দেহ করছে। আমরা বিশ্বাস করি নি…'

বারুদঠাসা শরীরটা কি রকম ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। অযথা যন্ত্রণা। অজয়দা মিনতিবৌদি সুজয়ফুজয় নয়, এসব প্যানপ্যানানি ছেড়ে যদি রমাকে খিস্তি দিয়ে কথা বলত কেউ, পাগলের মতো লাফিয়ে উঠে খাঁচার বাঘটাকে মুক্তি দিত সে। চোখে চোখে তাকাল অজয়দার দিকে—'সেদিন সকালে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলো হঠাৎ। ও তখন রাস্তায়। শকুন্তলা রোডের মুখে একটা বটগাছের তলায় রিকশ'র জন্য অপেক্ষা করছিল। তারপরই কি যে হল, একটা তেরপল ঢাকা জিপ্ এসে থামল সামনে। প্রকাশ্য দিবালোকে, হুটোপুটিতে কিছুই বুঝতে পারল না, যখন বুঝল, তখন আর কিছুই করার নেই। অনেক দূরে কোথায় যেন নিয়ে আসা হয়েছে ওকে। গ্রামট্রাম হবে বলেই ওর ধারণা। কতগুলো, আপনাদের সো-কল্ড ভদ্রঘরের ছেলে বলেই মনে হয়, সব মিলিয়ে সাতজন। ওরা হাসছে। আর হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় রমা তখন কম্‌প্লিট্‌লি নেকেড। সারাদিন ধরে অত্যাচারের পর ওরাই আবার রাত্তির-বেলা পৌঁছে দিয়ে গেল সেই শকুন্তলা রোডের মোড়ে। মাথা থেকে পা অবধি বোরখা চাপানো। ভেতরে মুখ সিল্ করা, পিছন থেকে হাতদুটো বাঁধা। সেই অবস্থাতেই বাড়ি ফিরল রাত্তিরে...'

পাবলিক-প্রসিকিউটারের ভাষণে সব সত্যি শোনার পর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সব মিথ্যে বলতে হবে জেনেই যেন অজয়দা অকারণ আসামী। কপালে ভাঁজ তুলে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে এসে বসলেন সামনের সোফাটায়। টেবিলে সিগারেট দেশলাই—'হ্যাঁ, বোরখা পরেই সে রাত্তিরে ঘরে ফিরেছিল। কথাটা ঠিক। ওই বোরখা তো একটা মিস্টেরি এখানে। একটা কমিউনাল কমপ্লিকেশন তৈরি করে ফেলে আর কি। অবিশ্যি বাঁচিয়েছে রমা নিজেই। সেদিন অনেক গালমন্দ বকুনি ঝকুনিতে কোনো কথা বলেনি। গুম্ হয়েছিল। শুধু বলেছিল ওর মাকে, গুণ্ডারা ধরেছিল, ও পালিয়ে এসেছে। ওদের কথাবার্তা ডাকাডাকি থেকে কতগুলি নাম

শুনেছিল সত্য হারু পঙ্কজ অভিজিৎ মৃণাল...কিন্তু কিন্তু তুমি এত কথা জানলে কী করে। ইট্‌স অ্যানাদার মিস্টেরি। এত ডিটেল এখানে কেউ জানে না। কাউকে কিছু বলে যায় নি। পুলিশের কাছে ওর মা-বাবার স্টেট্‌মেণ্টটাও ইন্‌কম্‌প্লিট। অথচ তুমি...

পকেট থেকে নিঃশব্দে একটা ইন্‌ল্যাণ্ড এগিয়ে ধরেছে উৎপল। অজয়দার প্রশ্ন—

'কী ওটা!'

'চিঠি।'

'কার চিঠি?'

'যেদিন সুজয়ের চিঠি পেলাম তার আগের দিন সন্ধেবেলা হস্টেলে গিয়েই এ চিঠিটা পেয়েছি···' উৎপলের ঠোঁটের কোণে একধরনের অদ্ভুত এক হাসি—'কলকাতায় অবিশ্যি বেশ কিছু পয়সা লুটে নিয়ে আসতে পারতাম এটা বেচে। উনিশ কুড়ি বছরের যুবতী মেয়ে নিজে লিখছে, ভেরি গুড নিউজ পর্নোগ্রাফি। রমাও খবরের কাগজে ব্যানার হেডলাইন পেয়ে বিখ্যাত হয়ে থাকত···'

'ইউ আর মেকিং ফান আউট অব ইট্‌···' দু-হাঁটুতে কনুই ঠেকিয়ে মাথার চুল চেপে ছিলেন অধ্যাপক। উত্তেজনায় আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন—'অ্যাট্‌ লাস্ট সি আন্‌ফোল্ডেড হারসেলফ্‌ অ্যাট লিস্ট টু ওঅন পার্সন অ্যাণ্ড দ্যাট্‌ ওঅজ ইউ, ওন্‌লি ইউ ইয়ংম্যান্‌···'

উৎপল সত্যি হাসল। চিঠিটা নাচছে হাতে—'এটা পড়ে দেখুন অজয়দা। প্লিজ গো থ্রু ইট্‌, রিয়েলি এ গুড পর্নোগ্রাফি ইফ্‌ ইউ আর আন্‌-অ্যাফেক্টেড...'

'তার মানে! কী বলতে চাও তুমি! ইউ মিন্‌ ইউ আর অ্যান্‌-অ্যাফেক্‌টেড্‌···'

দুজনই থেমে গেল। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে মিনতিবৌদি হাতের ট্রে-টা টেবিলে রাখছেন। চা-এর সঙ্গে অতিথির জন্য মোটাসোটা পুরু ডিমের ওমলেট। স্বামীর দিকে শুধুমাত্র চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতেই অধ্যাপক তখনও উত্তেজিত, স্ত্রীর দিকে সোজাসুজি তাকালেন—'গুণ্ডাগুলো রমাকে রেপ করেছিল, কথাটা সত্যি...' একটা শব্দের খোঁচায় থরথর কেঁপে উঠলেন ভদ্র-মহিলা। গলার স্বর বিষাদে করুণ—'এতটা জানুইন হলে কি করে?'

'রমা নিজেই চিঠি লিখেছে উৎপলকে।'

'রমার চিঠি?'

উৎপল আরও একবার চিঠিটা সামনে তুলে ধরল—'নিন না বৌদি, পড়ুন…'

'না না…' টানা টানা নিঃশ্বাসে ঢোঁক গেলেন মিনতি। মৃদু হাত নাড়া—'ওই হাতের লেখাটা আমি ভীষণভাবে চিনি উৎপল। সইতে পারব না…'

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অধ্যাপক আবার সোফায় এসে বসলেন—'কিন্তু আমি ভাবছি, চিঠিটা ও লিখল কখন? সময় পেল কোথায়?'

'তার উত্তরও তো এই চিঠিতে আছে অজয়দা। ও বিষ খেয়েছে পরদিন সকাল আটটায়। গোটা রাত ধরে পিঠে আর কোমরে অসহ্য যন্ত্রণা। তবু এরই মধ্যে শুধু চিঠিটা শেষ করার জন্যে আরও একটা সকাল পর্যন্ত জীবনটা বাড়িয়ে নিয়েছিল কিছুটা। তারপর ভোর হতেই নিজে গিয়ে পোস্টাপিসের বাক্সে ফেলে এসে ধীরেসুস্থে জিরিয়ে বিষটা গিলে ফেলেছে…'

ঘরের ভিতর তিনজন মানুষ। তিনজনই চুপচাপ। যেন মৃতের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে মিনিট দুয়েকের নীরব থাকার প্রথাপালন। মাথার উপরে পাখাটার একটা ক্ষীণ টিক্ টিক্ শব্দ আছে বোঝা যেতে লাগল। টেবিলে অধ্যাপকের চা জুড়োয়। উৎপলের দিকে চুমুকের শব্দ স্তব্ধতা ভাঙে। মিনতি হঠাৎ বললেন—'আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে দেবে?'

'কী?'

'সেই রাতে বিষটা ও কোথায় পেল?'

'করোনার্স রিপোর্ট বলছে ফলিডল··' ঘননিঃশ্বাসে নড়েচড়ে বসলেন অধ্যাপক। চায়ের কাপটা টেনে নিলেন কাছে—'সে তো এখন গ্রামদেশে ঘরে ঘরে পাওয়া যায়…'

'তাই বলে ওদের ঘরে তো আর ছিল না। ফিলজফি অনার্সের ছাত্রী। কলেজের ল্যাবরেটরির সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই। তাছাড়া শুনেছি, ফলিডল টলিডল কি সব কলেজে পাওয়াও যায় না নাকি। না-হয় তাও মানলাম, ও তো আর জানত না যে এরকম একটা ঘটনা ঘটবে, যার জন্যে আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকবে…'

'এ নিয়ে অত কি ভাববার আছে বৌদি?'

ওরা স্বামী-স্ত্রী চমকে তাকাল।

উৎপল দৃশ্যত স্বাভাবিক—'এছাড়া যখন আর বাঁচার পথ নেই, রাত্তিরবেলা ফিরিয়ে দিয়ে যাবার সময় জগাই-মাধাইরাই হয়তো হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেছে।

যা হবার সবই তো হলো, এখন ঝুটঝামেলা থেকে বাঁচতে চাও তো এই নাও, বেঁচে যাবে...'

'ওভাবে কথা বলো না উৎপল...' খুব নিচু খাদে মিনতিবৌদির গলা। রোগশয্যায় যে কাতরতা—'ওটা এখন খুব বড়ো প্রশ্ন। থাকো না তো এখানে, নইলে বুঝতে। সহরে নানান কথা রটছে। সেসব কথা যদি বিশ্বাস করতে হয়, রমাকে আমরা যেমন জানতাম, তার সবই কি রকম উল্টেপাল্টে যায়। এত বিচ্ছিরি লাগে শুনতে...'

শূন্য চায়ের-কাপটা টেবিলে ফিরিয়ে দেয় উৎপল। অন্যদিকে ঝুঁকে-পড়া বিষণ্ণ অধ্যাপক চায়ের-কাপে চোখ রেখে স্থির।

'সবাই বলাবলি করছে, চাঁদপানা মুখের অমন দেমাকি মেয়ে হলে কি হবে, তলে তলে ও মেয়ের অনেক ব্যাপার ছিল। কতোগুলি গুণ্ডা একদিন কি করল আর অমনি রাতারাতি মেয়ে বিষ জোগাড় করে ফেলল! সে কি হয়! একটা কেচ্ছা কেলেঙ্কারি হবে, ও সবই জানত। আগেভাগে তৈরি করে রেখেছিল সবই। কালই তো কর্নেলপাড়ায় তিমিরবাবুদের বাড়ি যেতে হয়েছিল। সেখানে একজন ভদ্রমহিলা বললেন, শুধুমুধু ছেলেগুলোকে দোষ দিলেই তো হবে না বাপু, অতো বড়ো একটা ঢাউস মেয়েকে দিনদুপুরে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গেল! অতোই শস্তা! এ কি মগের মুলুক নাকি। ও মেয়েও তেমন তুলসীপাতায় ধোয়া নয়। বিষ কি কেউ এমনি গেলে!'

'চিঠিটা তাহলে লিফ্লেট্ করে ছেপে শহরে দিই। কি বলেন...'

'ছিঃ উৎপল, তুমি...' মিনতিবৌদির কণ্ঠস্বর চিড়-খাওয়া গলায় হঠাৎ থমকে যায়।

প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরান নি অজয়দা। অন্যমনস্কতায় টেবিলে ঠুকছিলেন। ভুরু তুলে নিঃশব্দ তীক্ষ্ণতায় বিদ্ধ করতে চাইলেন, যখন চেয়ার ছেড়ে প্রায় উঠে দাঁড়িয়েছে উৎপল—'ওই ফলিডল যে ফিউডালদের সুসন্তানরাই ওর হাতে তুলে দিয়েছিল তার প্রমাণ তো আমার পকেটে বৌদি। রমা নিজেই লিখেছে। গলা টিপে চুপচাপ মেরে ফেলতেও পারত, কিন্তু মারে নি। ওদের অসীম দয়া। দে লেফ্ট্ হার অ্যালোন টু ডিসাইড হোয়েদার টু লিভ্ অর নট টু লিভ..'

'অ্যাণ্ড ইউ, ইউ টু হ্যাভ্ টু ডিসাইড ইয়ংম্যান, হাউ লং ইউ উড লিভ উইথ্ ইয়োর ওঅর্ডস, আদার টাইপ অব সেলফ-অ্যানিহিলেসান...' প্রায় আচম্বিতে তেড়েফুড়ে এমনভাবে গর্জে উঠলেন অধ্যাপক, উৎপল বা মিনতি

কেউ প্রস্তুত নন। সোজাসুজি আক্রমণ—'সিনিকের মতো কথা বলে যাচ্ছো তখন থেকে, কিন্তু লজ্জা করে না তোমার! মরবার আগে শেষ কথাগুলো একমাত্র তোমাকেই লিখে গেল, কিন্তু একবার ভেবে দেখেছ, ডেস্‌পাইট্ হার প্যাশনেট আর্জ ফর ইউ, ও তোমাকে বিশ্বাস করতে পারে নি। কতগুলো গুণ্ডা ছোঁড়া, দুর্বৃত্ত না-হয় ওকে বিষ উপহার দিয়েছিল, কিন্তু তুমি কতটুকু জীবন দিতে পেরেছ ওকে! লেখাপড়া-জানা মেয়ে, একবার ভাবতে পারল না, নেহাতই যখন একটা সারকাম্‌স্টেন্‌সিআল্ ভিক্‌টিম্, যাস্ট্ অ্যান্ অ্যাক্‌সিডেট আর মানুষটা যখন তুমি, ওকে না-মরলেও চলে অন্তত তুমি রামায়ণের রামচন্দ্র নও...'

অবস্থাটা যা দাঁড়াচ্ছে, যখন নেহাতই অসভ্যতা, দিশেহারা মিনতি স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। ঠিক পাশে নয়, দুজনের মাঝামাঝি, যেখানে আগুনে-চোখে স্থিরপলকে তাকিয়ে আছে উৎপল, যুৎসই একটা পাল্টা-আঘাতের জবাব খুঁজছে হয় তো। উত্তেজিত অধ্যাপক সুযোগ দিলেন না। পর পর আবার—'জানি, বলবে ওটা ওর স্টুপিডিটি। আত্মহত্যা মানি না, ইট্ ইজ্ অ্যান্টিলাইফ। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে ইঞ্জিনীয়ার হতে কলকাতা গেলে, বোমা-বন্দুক-পিস্তলে দুনিয়া বদলাতে চেয়েছিলে! নিজের ঘরে বোঝাতে পারো নি হোআট্ ইজ্ লাইফ। ওরা কিন্তু তোমাকে খুন করে নি উৎপল, খুন করে চোখ উপড়ে নেয় নি, হাড়গোড়ও ভাঙে নি। তোমাকে সুস্থ রেখে অদ্ভুত একটা বদলা নিয়েছে। নাউ গো, গো অ্যাণ্ড ফেস্ দ্য সিটি, সে টু দ্য পিপ্‌ল হোয়াট ইউ হ্যাভ টু সে। সত্য হারু পঙ্কজ অভিজিৎ মৃণাল রমার আততায়ীরা এখনও নিখোঁজ অ্যাণ্ড পারহাপ্‌স্ উইল এভার রিমেইন আন্‌আয়ডেন্টিফায়েড...'

তেড়েফুঁড়ে অনেকগুলি কথা। ঠিক ভর্ৎসনা নয়, ছোটোখাটো একটা বক্তৃতার মতো। হঠাৎ খেয়াল হতেই ক্লান্ত এবং কিছুটা সঙ্কুচিত অধ্যাপক অবসাদে আবার সোফায় ফিরে এলেন। এবং ঝোলা-ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়ে, পাশের ফিতেটা মুঠোয় চেপে আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল উৎপল। তার সঠিক উত্তর নেই।

রাস্তায় কিছুটা হাঁটার পর হঠাৎ একটা সাইকেল হুমড়ি খেয়ে পড়ল পাশে—'কি রে, কখন এলি?'

'ফার্স্ট ফ্লাইটে। তোর সাইকেলটা দে তো। বিকেলে নয় তো সন্ধেবেলা পাবি।'

নিঃশব্দেই সাইকেলের হাতবদল হলো। দ্রুত হাওয়ায় ভেসে গেল উৎপল এবং স্তম্ভিত সুজয় হতবাক। এত বড়ো একটা ঘটনার পর প্রথম দেখা। শুধু এইটুকু!

তিন

জীবন যখন একটাই, মৃত্যুর মতো ভালোবাসাও জীবনে একবারই... কথাগুলি বলা যায় নি মিনতিবৌদিকে, অজয়দাকে। কল্লোল দীপু নয়ন চন্দ্রশেখর পিনাকী···অনেক মৃত্যু, একই কলেজে হস্টেলে একই সঙ্গে ছিল যারা, স্পষ্ট করে মুখগুলিও মনে পড়ে না আর, এবং রমা...গোটা শহরটাই যেন এখন ভুল অঙ্ক মুছে-ফেলা কালো শ্লেটের মতোই অসম্ভব ফাঁকা আর অর্থহীন। হরিগঙ্গা বসাক রোড আখাউড়া রোডে এঁকেবেঁকে মোড় ঘুরে অথবা সোজা সরলরেখায় ভাসতে ভাসতে, যখন হাতের মুঠোয় সাইকেলের ব্যালেন্সটা স্বভাবের ক্রীতদাস, পায়ের পাতায় প্যাডেলের চেনটা ঘুরছে, নির্ভার দেহে এবং দাহে নিজের মধ্যে সঞ্চারিত গতিবেগেও যখন মুক্তি নেই, জনাকীর্ণ কামানচৌমুনি থেকে বাঁক ঘুরে বাস স্ট্যাণ্ড পেরিয়ে নির্জন আসাম রোডে পৌঁছে হঠাৎ মনে হলো কী কর্তব্য তার! পাগলের মতো ধারকর্জ করে ছুটে আসার মানে! এই সহরের কৃষ্ণনগর এলাকার ঠাকুরপল্লীতে তার ঘনিষ্ঠ আস্তানা আছে একটা—মা বাবা ভাইবোন, এখনও জীবিত ঠাকুর্দা ঠাকুরমা। দীর্ঘ অদর্শনের পর ছেলেকে আচমকা কাছে পেয়ে মা খুশিতে ভরে উঠতে পারেন, সে কথা জেনে, এখনও তার পৌঁছোনোর সংবাদটুকুও পাঠানো যায়নি সেখানে এবং একই পাড়ায় আরেক প্রান্তে সরকারি আপিশের প্রবীণ কেরানি জনার্দন চাটুজ্জের বাঁশবেড়ার পরিচ্ছন্ন সংসার, যার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রমার সঙ্গে অলিখিত বা অনুচ্চারিত এক চুক্তি ছিল তার—দুজনকেই বাঁচতে হবে, এক সঙ্গে এবং যৌথ উদ্যোগে।

উৎপল সাইকেল থেকে নামল। যেন একটু জিরোবারও প্রয়োজন ছিল। সামনেই বাঁশের দর্মার ঘর তুলে একটা চায়ের দোকান। বাইরে মুখোমুখি বেঞ্চিতে জুলপিদাড়িতে ভীষণ প্রকৃতির কয়েকজন যুবক। গাছের ছায়ায় পাশাপাশি অসংখ্য রিকশ। সুবেশ ভদ্র যুবক এবং রিকশওয়ালা যেখানে একাকার, যেখানে সাম্য, নৃত্যে হিন্দি-ফিল্মের উলঙ্গ নায়িকা—সূর্যঘরে নতুন ছবি, নিকষ বাঙালা ভাষায় হৈ-হুল্লোড়ে হঠাৎ কলকাতা—'কী দিচ্ছেন গ্‌গ্‌গ্‌···' ট্র্যান্‌জিস্টারে 'বিবিধ ভারতী'—'তেরে বিনা জিন্দেগী সে কোই

সিকওয়া নেহি···' কলকাতা অনেক দূর, কলকাতায় হরেক মজা, তবু কলকাতা চাই, কলকাতা আসে—বেল্ বট্‌স্-এ হাতির কান, রঙচঙে চেক্‌নাই জামা, ড্রেন পাইপে গুরু-পাঞ্জাবি, তীরবিদ্ধ হরতনে রঙিন গেঞ্জি, জুলপি বাবরিতে গব্বর-সিং, ম্যাচিং পেয়ার ম্যাক্‌সিপ্যারালাল লুঙি সেট, হেয়ার ডায়ার মদিরাক্ষি আই-লাইনার আই-স্যাডো, ব্রাও পেনসিল, মাস্‌কারা··· বাঁশবেড়ার চায়ের-দোকানে ভুরু নাচালেই গোপনে শস্তা চোলাই···নাচো গাও ফুর্তি লোটো,···লা...লা···লা···লো···লো···লো···ইয়া হুউউ···টুইস্ট নাচো পুজোপাব্বনভাসানে, টুইস্ট নাচো শ্মশানযাত্রায়, ছড়াও খৈ···

উৎপল ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে সেই দোকানের দিকে টেনে নিয়ে এলো সাইকেল। যুবকদের কাছাকাছি। '...রমার শবের শরীরে একজোড়া ঠাণ্ডা নীল চোখ দেখে আপনারা বড়ো বেশি বিচলিত অজয়দা। আমি দেখিনি। শান্ত জ্যান্ত চোখজোড়াই বেঁচে থাকবে আমার জন্য···এরপরও তো বেঁচে থাকে মানুষ! বাঁচতে হবে। জন্মের মাটি আগরতলা যদি মিথ্যে হয়ে গেল, থাকতে হবে পরবাসে কলকাতায়, একা, যেখানে কল্লোল দীপু নয়ন চন্দ্রশেখর পিনাকী···' খুব কাছাকাছি এসে পিছনের চাকাটা তুলে পা দিয়ে স্ট্যাণ্ডটা টেনে সাইকেলটা দাঁড় করাতেই হুল্লোড়পার্টির ছেলেগুলি হঠাৎ বম্ মেরে গেল। তাকিয়ে আছে তার দিকে। সাইকেল নিয়ে একা শহরে ঘুরে বেড়ায়, অথচ চেনামুখ নয়—ওদের বিস্ময়। উৎপলও দৃষ্টিটা দ্রুত ঘুরিয়ে নিল একবার। একপলকে যতগুলি মুখ দেখে নেওয়া সম্ভব—সত্য হারু পঙ্কজ অভিজিৎ মৃণাল···

'চা দিন তো এককাপ। দুধচিনি কম··'

'আসেন, বসেন ··' দোকানী লোকটা বিগলিত। পর পর অনেকগুলি গ্লাস সাজিয়ে দুধচিনি দিচ্ছিল চামচ মেপে। বলল—'মামলেট দিমু নাকি একখান?' তার খিদে নেই, তেষ্টাও না। উৎপল ভাবল। মিনতিবৌদির ডিমভাজা টেবিলেই পড়ে আছে। ডানে-বাঁয়ে ছেলেগুলির দিকে তাকিয়ে, বাইরে বসার জায়গা নেই বলে অন্ধকারে প্রবেশ করল। চালার ভিতর—'দিন···'

'ডবল না সিঙ্গ্যাল্?'

'সিঙ্গল্।'

'কে পল্টনদা না?'

উৎপল চমকে উঠল। ঘনিষ্ঠ ডাকনামে সম্বোধন। এখানে, এই সহরে যা খুবই স্বাভাবিক।

'তখন থেকেই দেখেছি আপনাকে...' বেঞ্চির ভিড় থেকে উঠে এসেছে একটি ছেলে—'এত বড়ো বড়ো দাড়ি রেখেছেন, রোগাও হয়ে গেছেন খুব। চিনতেই পারি নি...'

সটান তাকিয়ে থাকে উৎপল। মুখের আদলে মুখ খোঁজে। বছর দেড়েক মাত্র আসা হয় নি। এর আগে যখন এসেছে, দু চার পাঁচদিন থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। ইতিমধ্যে সাত থেকে সতেরোয়, বারো থেকে বাইশে বড় হয়েছে কারা।

'কই চিনতে পারলেন না তো!'

উৎপল অপ্রতিভ—'না না চিনব না কেন? তুমি...'

'হারাধন দেববর্মণ আমার বাবা···'

'আআচ্ছা, হারুদার ছেলে তুমি! কত বড় হয়ে গেছো!' হারুদা! ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া আধমরা শহরে হঠাৎ একটা নাম পেয়ে উৎপল খুশি। ভিতরে ধাতস্থ হয়ে তাকাল ছেলেটির দিকে—'কি যেন নাম তোমার?'

'পঙ্কজ···।'

বুকের পাঁজরায় সরাসরি ধাক্কা। কালো কালো তেল চিটচিটে একটা প্লেটে দোকানী ডিমভাজা রেখে গেল। ন'-চাইতেই সেঁকা পাউরুটি দু টুকরো সাদা হলুদ ডিমভাজায় কালো চুল। নিঃশব্দে বাঁ হাতে চুলটা সরিয়ে নিলো উৎপল। পঙ্কজ এবং তার বন্ধুরা ঝিম্ মেরে তাকিয়ে আছে।

'আপনি কি কলকাতার সব পাট চুকিয়ে এলেন পল্টনদা?' পঙ্কজ নামে ছেলেটি আবার গিয়ে তার বন্ধুদের সঙ্গে বসেছে—'আপনাদের কী? একবার এসে দাঁড়ালেই মোটা মাইনের বড় চাকরি···'

'তাই বুঝি?' অন্যমনস্কতায় ডিমের দূষিত ভাগ কেটে বাদ দেয় উৎপল।

'ইন্‌জিনিয়ারিং-এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন। সব শুনেছি···'

'নাহ্, এম. ই করছি। আরও বছর দুয়েক তো থাকতেই হবে। আচ্ছা পঙ্কজ···' উৎপল শিরদাঁড়া উঁচিয়ে সোজাসুজি তাকাল—'অভিজিৎ, মৃণাল, সত্য বলে কাউকে তোমরা চেনো?'

ছেলেগুলি নাড়া খেল—'ঠিক ঠিক কাকে খুঁজছেন বলুন তো! একসঙ্গে এতগুলো নাম। ওরই নাম তো অভিজিৎ, ওর নাম সত্য···'

বেঞ্চির সারিতে জিরাফের মতো গলা-উঁচোন দুই যুবক, সত্য এবং অভিজিৎ—অবধারিত যাদের নাম, গোল গোল চোখে ভড়কে গিয়ে এমন ভাবে তাকিয়ে রইল প্রগল্‌ভতায় উৎপল নিজেও ঘাবড়ে যায়। আসলে নাম কিছু নয়। এত সাধারণ কতোগুলি নাম!

'মৃণাল বলেও তো একজন বন্ধু আছে আমাদের।'

উৎপল ঝলকে উঠল—'কোথায় সে?'

'কলকাতায়।'

'কবে গেছে?'

'সে তো এক বছরেরও বেশি। এম্‌. কম্‌ পড়ে।'

নিজের মধ্যেই অকস্মাৎ নিভে যেতে হয়। বেকুবের মতো কী অর্থহীন ছেলেখেলা! নামগুলি ভাইরাস নয়, অথচ এই নামেরই কতগুলি মানুষ, এই সহরের রক্তে শিরায় যারা আছে, থানাতল্লাসিতে খুঁজে পায় না পুলিশ, লণ্ডভণ্ড অসংখ্য ঘটনায় যারা থাকে, টিকে থাকে মাসের পর মাস। বছর। অখাদ্য ডিমভাজা আর রুটিগুলি উৎপল দ্রুত গিলতে চায়। কেননা পঙ্কজ অভিজিৎ সত্য এবং তাদের দশ বারোজন বেকার বন্ধু ছেঁকে ধরছে তাকে। অনেকটা ঘেরাও-এর মতো—'আমাদের নামগুলো জিজ্ঞেস করলেন কেন আপনি?'

'না, কিছু না ··'

'কিছু না কি বলছেন? বেছে বেছে আমাদেরই নাম বললেন...'

'সব সহরে, প্রায় সব পাড়ায় ওরকম নামে বেশ কিছু ছেলে থাকে...'

'ফালতু বারফাট্টাই ছাড়ুন। ঝেড়ে কাশুন তো, কী মতলব আপনার?'

'মতলব কেন বলছেন! আমি পুলিশের লোক নই···'

বেঞ্চি থেকে উঠে এসে ছেলেগুলি ঘিরে ফেলেছে তাকে। পঙ্কজ নানা ভাবে বোঝাতে চাইছে বন্ধুদের। চায়ের-কাপ ফেলে উৎপলও উঠে দাঁড়াল এক ঝটকায়। বিষক্রিয়ার শুরু। পায়ের পাতা থেকে মগজ পর্যন্ত হলকা-আগুনে চাড়িয়ে যাচ্ছে একটা রাগ। যা সে চেয়েছিল—মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বী। এই ঠাণ্ডা নিস্তেজ সহরে আরও একটা ঘটনা ঘটানোর মতো প্ররোচনা এবং তার মুক্তি।

অথচ তাকে, নিজেকেই দমে যেতে হলো। চা-ডিমের দাম মেটাল সে। ছেলেগুলি দাঁড়িয়ে দেখল। ওদের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলো বাইরে, কথা বলল না কেউ। কলেজ-টিলার দিকে লক্ষ্য ছিল যদিও, ঠিক উল্টো

মুখো রামনগরের দিকে সাইকেল ঘুরিয়ে গড়িয়ে যেতে যেতে বাতাসের ঝাপটায় ভিতরের চনমনে দাহটা আরও তীব্রভাবে অনুভব করে, উৎপল, কী এক অসহ্য যন্ত্রণায় কিছু একটা বিস্ফোরণ চাইল। বিংশ শতাব্দীতে আজও রেলগাড়ি এলো না যে সহরে, কলকারখানার চিমনি নেই, ধোঁয়া নেই, শুধু ধুলো, ধানের জমি আর সীমান্ত জুড়ে চোরাই চালানের কাঁচা পয়সায় ধর্ষিতা রমা! রমা যদি কেউ না হতো তার! শুধুমাত্র একজন যুবতী! বুকপকেটে উত্তাপটা আরও বেশি কামড়ে ধরেছে। অজয়দা মিনতিবৌদির মতো এ সহর জানে না ঘটনার সব। যদি চিঠিটা সে খুলে দেয় শহরের কাছে! তার সর্বশেষ প্রেমপত্র! মুখে মুখে ছড়ানো কেচ্ছাগুলি সত্যি হয়ে উঠবে। রমা মরবে।

বিছানাপত্তর নেই, এমন-কি একটা মাদুর পর্যন্ত না। ন্যাড়া তক্তপোশে হাঁটু ভেঙে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন হারুদা। উৎপল ডাকাতের তেজে ঢুকল।

'কে ?'

'আমি উৎপল।'

কী ভীষণ বুড়ো হয়ে গেছেন হারুদা! টিংটিঙে শরীর। চশমাটা বাঁ হাতে ধরে গলা উঁচিয়ে চিনতে চাইছেন আগন্তুককে।

উৎপল আবার বলল—'আমি উৎপল। জ্ঞান উকিলের ছেলে···'

'ও-ও-ও···পল্টন, আমাদের পল্টন! তাই বলো, তা তুমি আবার উৎপল টুৎপল হলে কবে থেকে ? নাও বোসো, বোসো···' হারুদা সত্যি উদ্বেল। লুঙির গিঁট বাঁধতে বাঁধতে নড়েচড়ে বসেছেন—'কবে এলে ?'

'আজই। আপনার সঙ্গে কথা আছে একটা···'

'আরে, সে তো বটেই। নইলে ফার্স্ট-ফ্লাইটে পৌঁছেই রিভিসানিস্ট দাদার কাছে ছুটে আসবে, সে কি আর এমনি···'

'হ্যাঁ, বলতে এসেছি, একটা কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়েকে যারা এভাবে খুন করে, তাদের খুন করার রাজনীতিতে আমি এখনও বিশ্বাস করি···'

চশমাটা খুলে কুৎকুতে চোখে তাকালেন হারাধন দেববর্মণ। সারা জীবন নিঃশেষে পুড়তে পুড়তে মোমবাতির শেষটুকু—'কী হয়েছে পল্টন ? তুমি উত্তেজিত। নাও, বোসো বোসো, শুনি...'

উৎপল বসল না। রেস্তোরাঁ থেকে সঞ্চারিত ক্রোধে—'কেষ্টনগরের জনার্দন চাটুজ্জের মেয়ের ঘটনাটা আপনি জানেন ?'

'ও হতভাগীর কথা বলো না আমাকে। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল শহরে। সিম্প্‌লি হরিব্‌ল...'

'ব্যস ওই পর্যন্তই...'

শুদ্ধ হারাধন ভুরু কুঁচকে তাকালেন তীক্ষ্ণতায়—'কী বলতে চাও তুমি?'

'বলতে চাই, দিনের আলোয় রাস্তা থেকে লুফে নিয়ে একটা মেয়েকে রেপ্‌ করল সাতটা শয়তান। ঘটনাটা আপনাদের গণতন্ত্র রক্ষা, জুমচাষের আন্দোলনের চেয়ে কম ইম্‌পর্টেণ্ট নয়।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত।'

'কী করেছেন আপনারা?'

'কিছুই না।'

'তার মানে?'

'তুমি বড্ড ইমোশনাল হয়ে পড়েছ। ঘরে যাও পল্টন।'

জুমচাষের আগুন জ্বলে পাহাড়ে। উৎপলের শরীর ভরে সেই দাহ—'এভাবে পাশ কাটিয়েই বা আপনাদের কতদিন চলবে হারুদা?'

নিরুত্তাপ বিষণ্ণ কঙ্কাল-শরীরটা কোমর ঘেঁষড়ে নেমে এলেন তক্তপোষ থেকে। খুক্‌খুক্‌ কাশি গলায়—'ওকে পোড়াতে নিয়ে যাবার সময় ভেঙে পড়েছিল চারদিকের মানুষ। সে মিছিল তুমি দেখেছ পল্টন? কয়েক শ লোক গিয়ে হামলা করেছে থানায়—অপরাধীদের ধরতে হবে। এরাও কিন্তু এই শহরেরই লোক ..'

'কিন্তু ও আপনাদের কোন তরফেরই শহীদ হলো না ঠিকমতো। এই যা দুঃখু...'

'কে বলল তোমাকে...' কাশিটা বাড়ে। বুকে হাত চেপে কাশিটা সামলান হারাধন—'রমা আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় শহীদ। মার্টায়ার অব আওয়ার টাইম....'

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ভুরু কুঁচকে উৎপল তাকিয়ে আছে, সংশয়, যেন এই কথার সম্মোহে তার সর্বাধিক ঘৃণা—'এ রকম একটা বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেল, তারপর, তারপরও কি আপনাদের রাজনীতি, তত্ত্বকথা চিৎকার পোলিটিকাল কচকচি এক জায়গায় গিয়ে সব জোলো ফাঁকা অর্থহীন মনে হয় না হারুদা? ভিহিউম্যানাইজড্‌ ফিলিস্টাইন সোসাইটি, সেখানে কে আপনারা? আপনারা কোথায়?'

তক্তপোশে ফিরে গিয়ে রুমাল বা নোংরা কাপড়ের ন্যাকড়াটা তুলে নিলেন

হারাধন। একই নিঃশ্বাসে উৎপল তথাপি নির্মম—'আমি পুলিশ ফুলিশ আইন আদালত বিশ্বাস করি না। এখানে আসার পর থেকে কারও একজনের টুটি টিপে ধরার জন্তে লোক খুঁজছিলাম...'

কাশতে কাশতে হাঁপাতে হাঁপাতে রুমাল-চাপা মুখে চোখ তুললেন হারাধন—'আর সেজন্তেই এখানে এসেছ?'

'ঠিক তাই। এরপর যাব মিহিরদার কাছে, সাধনদার কাছে। জিজ্ঞেস করব—কে আপনারা? আপনারা কেন?'

'তাই যাও পল্টন, যাও...' পাঁজর-ভাঙা কাশি শুরু হলো। মর্মান্তিক কাশি। উৎপল ভয় পেল। এগিয়ে এলো কাছে। হারুদা বাঁ হাত বাড়িয়ে বাধা দিলেন। রুমাল তুললেন মুখ থেকে—'ডাক্তার বলছে, সাস্‌পেক্টেড্‌ টি-বি। ভয় নেই। এ রোগে কেউ মরে না আজকাল। আমিও মরব না। শুধু টাকার দরকার। ঘটিবাটি বেচে ঠিক বেঁচে যাব। না-হয় সেদিন কথা হবে। তাজা জোয়ান ছেলে, আমার কাশির সামনে থেকো না এখন। যাও...'

হতচকিত উৎপল সত্যি দিশেহারা। কাশির শব্দে চিৎকারে ভিতর থেকে ছুটে এসেছেন হারুদার স্ত্রী, আরও একজন—উৎপল চেনে না। আস্তে আস্তে সে খোলা দরজার দিকে এগোল। হারুদা ডাকলেন—'পল্টন...'

কথা বলতে কষ্ট। তবু—'আমার একটা ছেলে আছে। বি. এসসি. পাশ করে বছর তিনেক বসে আছে। আমার টাকা নেই। কলকাতা গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার এম. এস সি কিছুই হতে পারে নি। এখন আমাকে ভেংচি কাটে, আমার পার্টিকে খিস্তি করে। ওকে তুমি পাবে, নচ্ছার ছেলে-পুলেদের সঙ্গে চায়ের-দোকানে, তাসের আড্ডায়। দুদিন বাদে যাবে শুঁড়ি-খানায় জুয়ার-ঘরে। স্মাগলার হবে। শিক্ষিত স্মাগলার। ও ওর নিজের মতো বাঁচবে। কী বলবে তুমি? ওর বেঁচে থাকাটা রমার বেঁচে-থাকতে না-চাওয়ার চেয়ে ভালো? এও তো আমারই ব্যর্থতা পল্টন। আমারই অপরাধ। কি বলো, একদিন বিষ খাইয়ে মেরে দেব নাকি ছেলেটাকে—এনিমি অব দ্য পিপ্‌ল!'

স্তম্ভিত উৎপল নিঝ্‌ঝুম। বোধ হয়, উত্তর নেই তার।

ছিটকে বেরিয়ে আসে। বাইরে স্বাভাবিক সচল সহর। দুরন্ত বেগে গড়িয়ে নেমে আসে আরও নিবিড় ঘনিষ্ঠ কোলাহলে। ঘড়িতে বেলা বারোটা। মাথাটা ঘুরছে। এবার বাড়ি ফিরতে হবে। এতকাল পরে ছেলে ফিরেছে। ঠাকুরমার আদর, মা-র পায়েসের বাটি।

গোটা সহর জুড়ে রোদ ঝলকায়। আরও বেশি উজ্জ্বলতায় জ্বলছে ধবধবে সাদা বিশাল রাজবাড়ি, অধুনা বিধানভবন। সোজা যাবার পথে আচমকা বাঁদিকে সাইকেলটা ঘুরিয়ে নিল উৎপল। আবার কামানচৌমুনি। এয়ার-অফিস। আজই হোক অথবা কাল, যে-কোনো ফ্লাইটে চান্স বুকিং-এর চেষ্টা করতে হবে তাকে। দুটো নিঃশ্বাসে এতদিন, প্রায় আশৈশব রমণীয় ছিল যে সহর, সেখানে একা একা, স্বার্থপরের মতো বাতাস টানতে অসম্ভব মনে হয় বাঁচা। বরং কলকাতায়, হারুদার মতো ধুঁকে ধুঁকে দগ্ধে নয়, অসংখ্য চেনামুখ কল্লোল, দীপু, নয়ন, চন্দ্রশেখর, পিনাকীদের মতো ফুৎকারেও নয়, মরবে না, বেঁচে থাকবে, অচেনা ভাইরাস সত্য, হারু, পঙ্কজ, অভিজিৎ, মৃণালদের সঙ্গে মিলেমিশে, একই বাতাসের নিঃশ্বাসে স্বাধীনতায় গণতন্ত্রে কন্‌ডেম্‌ড সেলের বাসিন্দা। একা।

রিখিয়ায় নীরদ মজুমদার

অরুণ সেন

আগাইয়া থেকে জমি ঢাল হয়ে নেমে এসেছে রিখিয়ার রাস্তার দিকে। পেছনে ত্রিকূট পাহাড় চিত্রার্পিত। উঁচু নিচু আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে সাইকেল-ঠ্যালার ওপর জোড়াসন হয়ে বসে নীরদ মজুমদার দূর থেকে হাঁক দিলেন : "কি মশাই কোথায় চললেন? দেওঘর যাচ্ছি কেনাকাটা করতে। বিকেলে আসবেন। আড্ডা দেওয়া যাবে।"

আগাইয়া, মানে রিখিয়ার এক প্রান্তে গ্রাম। আর রিখিয়া সাঁওতাল পরগণার দেওঘর থেকে কিছু দূরে কয়েকটা ছোট ছোট গ্রাম নিয়ে জড়ানো প্রান্তর, শাল মহুয়া, চড়াই উৎরাই, লাল মাটি, টিলার তরঙ্গ, আমগাছ-বটগাছে ছাওয়া সপ্তাহান্তিক ব্যস্ত হাট। এই শতকের গোড়ায় বাবুদের কলোনি বানানের ব্যর্থ চেষ্টার প্রমাণ হিসেবে কয়েকটি পরিত্যক্ত বা জীর্ণ অট্টালিকা। চারপাশের পরাক্রান্ত লালে আর সবুজে মাঝে মাঝেই হারিয়ে যায়।

রাস্তার ধারে—এখন তবু তো পিচবাঁধানো রাস্তা—হাটের কিছু আগে পর্যন্ত সারে সারে কিছু বাড়ি শৌখীন কেয়ারি আমেজ আনে। তারই একটি নীরদ-বাবুর বাবা প্রফুল্ল মজুমদারের বাড়ি। সাদা মাটা একতলা বাড়ি, সামনের দিকে বারান্দার মতো টানা ঘর, দুপাশে অন্য ঘর চলে গেছে, চ্যাপ্টা আয়ত জানলা।

সামনে বাগান, পেছনের মাঠ ক্রমশই উঁচু। নীরদবাবুরা বোধহয় ভাইবোনে মিলে ছোটবেলা থেকেই আসতেন রিখিয়ায়। যুদ্ধের সময়, রিখিয়া তখন জমজমাট, ওঁদের নানা কীর্তিকাহিনীর কথা শুনি। হাতের লেখা পত্রিকা, মিনি ছাপাখানায় ছাপা একেক টুকরো সাহিত্যপত্র, রিখিয়াবার্তা, রিখিয়াকাফে এই সব মজাদার গল্প!

তারপর ১৯৪৫ সালে অকস্মাৎ বিষ্ণু দে এলেন সপরিবার ওঁর সঙ্গে। স্ত্রীর এবং নিজের শরীর সারাতে। তখন ক্যালকাটা গ্রুপের আমল। বাংলার ছবি আঁকার জগতে যাঁরা আধুনিকতার দিকসন্ধানী। "আর বিষ্ণুদা ছিলেন আমাদের ফ্রেণ্ড ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড" নীরদবাবু বলেন। ফলে বিষ্ণু দে-কে আর ক্যালকাটা গ্রুপেরই সহশিল্পী গোপাল ঘোষকে নিয়ে রিখিয়ায়। অদ্ভুত হুল্লোড়ে আর খুশিতে কেটে যায় পুজোর ছুটি।

গোপাল ঘোষ তখন খুব সাত্ত্বিক ও নিরামিষাশী—প্রায় বৈষ্ণব। আর নীরদ মজুমদার পোর্ট্রেট আঁকবেন বলে গরম সত্ত্বেও সাহেবী কুর্তা পরে আধ পোড়া চুরুট ছড়াচ্ছেন ঘরে।

প্রথমে নীরদবাবুর সঙ্গে স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে শুধু বিষ্ণু দে এসেছিলেন। এর আগে নীরদবাবু প্রাণকৃষ্ণ পাল, অর্থাৎ পানুবাবুকে নিয়েও বোধহয় কয়েকবার এসেছেন। হঠাৎ বললেন, "গোপালকে আসতে লিখি।" তা গোপাল ঘোষ এলেন। ঘরে ধূপ জ্বালেন। সারাদিন বুঁদ হয়ে বসে ছবি আঁকেন। অথবা বেরিয়ে পড়েন দুই শিল্পী, আউটডোর স্কেচ করতে। পথ এঁকেবেঁকে যায়—ওঠে, নামে। সামনে বা পাশে হঠাৎ মাটিতে ঢল। বিষ্ণু দে কবিতায় বলেন, যেন ধনীর সংসারে লুব্ধ বিপর্যয়। হৃদয়ের লাল অপচয়। তিনি তখন হয়তো চেয়ারে বসে আছেন বারান্দায়। ত্রিকূট এবং দিঘারিয়া দুটি পাহাড়ের রঙবদল দেখতে দেখতে সময় কেটে যায়। সকাল-বিকেল হেঁটে যান আরো দক্ষিণে, টিলার তরঙ্গে। মেদুর তন্বী টিলাগুলো দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে চোখে পড়ে শিমুল, পলাশ, শাল, পিয়াল কিংবা ঋজু রূপবান ইউক্যালিপটাস।

নীরদ মজুমদার ও গোপাল ঘোষের ছবি আঁকা হতে থাকে অজস্র। রঙের মুক্তি কেবা রোখে? এরকম রঙের ছবি কি গোপাল ঘোষ এর আগে এঁকেছেন? সত্যি সত্যি রঙ ফুরিয়ে যায় দুজনেরই। পার্শেল করে আনানো হয় কলকাতা থেকে। আর ক্যানভাস কম পড়ে গেলে নীরদবাবুর রঙের বাক্সের পেছনের কাঠেই আঁকেন গোপাল ঘোষ। রিখিয়ার ন্যাড়া মাঠ, টিলার

ছোট ছোট ঢেউ, দিগন্তে নেমে গেছে, বহুবর্ণ আকাশ ক্যানভাসের বেশিটা জুড়ে।

রিখিয়াবাসী বিষ্ণু দে গল্পগুলি বলেন আর একে একে দেখাতে থাকেন রিখিয়ার সে-সময়কার আঁকা নানা স্কেচ—গোপাল ঘোষের, নীরদ মজুমদারের, প্রাণকৃষ্ণ পালের। গোপাল ঘোষের চাইনিজ ইংকে আঁকা টানা-টানা লাইনে মাটি-পাহাড়। রিখিয়ার কোম্পানির স্মৃতিবাহী ব্রিজ। পানুবাবুর ছবি সফ্ট লাইনে আঁকা পেন্সিল স্কেচ—কোমলতায় ভরা—পানুবাবুর চরিত্রের মতোই। আরো অনেক কথাই ওঠে: ক্যালকাটা গ্রুপের প্রদর্শনী, ঘরোয়া আড্ডা, মৈত্রী ও মতান্তর!

নীরদবাবুও ক্যালকাটা গ্রুপের সময়কার অনেক গল্প করেন। তবে ওঁর মতে ক্যালকাটা গ্রুপের সঙ্গে দুর্ভিক্ষ প্রতিবাদ বিক্ষোভ ইত্যাদি বড় বড় শব্দকে জড়ানো হয় বটে, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ফর্মাল। "বিদেশী আধুনিক চিত্রকরদের প্রভাব, বিশেষত ফরাসীদের প্রভাব আমাদের কাছে ছিল খুব ভাইটাল—আর নতুন নতুন পরীক্ষা—নতুন নতুন কাজ করার তাগিদ—এই সব।"

নীরদ মজুমদার কথা বলেন যখন, তখন একটু অস্থির, কথায়-বলায় উঁচুগলা, জোর দিয়ে বলেন সব কিছু। অন্যকে ক্ষ্যাপাতে ভালোবাসেন। কথার তোড়ে বিপর্যস্ত করে দেন সবাইকে। তখন হয়তো জিভের লাগামও থাকে না। বিষ্ণু দে-র স্মিত স্বল্পবাক্ ব্যঞ্জনাময় ব্যক্তিত্বের পাশে ওঁর ঐ অস্থির দাপাদাপি ও প্রগল্‌ভতা কিরকম সিমফনি সৃষ্টি করত ৪৫-এ, ভাবতে বেশ মজা লাগে। অবশ্য বিষ্ণু দে তীব্র পরিহাসবোধে উপভোগই করতেন কনিষ্ঠের এই বাচন ও ব্যবহারের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল অতিরেক। নীরদবাবু বেশ সুখেই রোমন্থন করেন ওঁর স্নেহপ্রশ্রয়ের সেই পরিহাসমুখর দিনগুলি।

তাই কি রিখিয়ার প্রকৃতিতে রঙের এই আলোকঝর্ণা, ক্যালকাটা গ্রুপের বন্ধুদের "সজীব প্রতিরোধতীব্র টেকনিকের বিস্তার", ফরাসী ইম্প্রেশনিস্ট ও পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট যুগের চিত্রকরদের জগৎ একাকার হয়ে যায় কবি বিষ্ণু দে-র কাছে—সন্দীপের চর-এ লেখা হতে থাকে কবিতা 'নীরদ মজুমদারের জন্য', 'গোপাল ঘোষের জন্য'। রিখিয়ার একটি তল্লাট বাবুডি। সেই বাবুডিরই লাল আঁকাবাঁকা পথ দেখে নাজেহাল পিসারো। দেরাঁার সবুজ ও লাল চারদিকে। পাশের চিৎকাটে গ্রামে গ্রাম্য গলির মায়া স্মরণ করায় উট্রিল্লোকে। নীরদবাবু ত্রিকূটের ভোরের নীল স্বপ্ন ফোটান ছবিতে।

আর গোপাল ঘোষের খাতা ভরে ওঠে অক্ষয়যৌবনার তরঙ্গঘন বেগে। বাহির চিৎকাটের কুঁড়ে ঘর, নিচু শনের চাল, বাঙালিঘেঁষা পরিবেশ। বিষ্ণু দে-র কবিতায়, ওঁদের ছবিতে রিখিয়ার ভূগোল, ফরাসী ছবির উপমা। ধরা আছে কয়েকটি দিন, কয়েকটি প্রহর—তিরিশের কিছু খেলা! বিষ্ণু দে-র রিখিয়ার বাড়ির ভেতরের বারান্দায় দেওয়ালে টানানো কয়েকটি শুব্ধ স্মৃতি।

রিখিয়ার অন্য প্রান্তে আগাইয়ার বাড়ির বাগানে মোড়ায় বসে বারবার নীরদ মজুমদারের গলায় তাই এসে যায় বিষ্ণু দে-র কথা। রিখিয়া বলেও বটে, ক্যালকাটা গ্রুপের কথা বলেও বটে।

"—আমিই তো বিষ্ণুদাকে আনি। এখানে এসে ওঁর শরীর মন দুইই ভালো হয়ে গেল। এখানে না এলে বিষ্ণুদা এত দিন বাঁচতেন?"

—"ওঁকে ছাড়া ভাবাই যায় না আমাদের ঐ ক্যালকাটা গ্রুপের মুভমেণ্ট!"

—"মিসেস কেসি-র কল্যাণে আমাদের খাতির বেড়ে গিয়েছিল খুব। গভর্ণর হাউসেও ডাক পড়ত, সমাদর হত। ক্যালকাটা গ্রুপের স্বীকৃতির পেছনে অনেকটাই ছিলেন বিষ্ণুদা। তবে অনেকে খাপ্পাও ছিল আমাদের ওপর। বেঙ্গল গ্রুপের লোকজন আর অন্যান্য পুরোনো পণ্ডিত লোকেরা আমাদের রিবেল্ মনে করত—এড়িয়ে যেত। সেটাও প্রধানত বিষ্ণুদা ছিলেন বলে। ওঁকে যেমন অনেকে পছন্দ করত, চটাও ছিল অনেকে।"

—"তবে উনি যে যামিনী রায়কে জড়াতে চেয়েছিলেন ক্যালকাটা গ্রুপের সঙ্গে—মেশাতে চেয়েছিলেন দুটোকে—সেটাতে আপত্তি ছিল আমার। ও হয় না।"

আসলে যামিনী রায় বিষয়ে নীরদবাবু খুবই ক্রিটিক্যাল। উনি ভাবেন, শক্তিশালী একজন আর্টিস্ট ভুল পথে চলে গেলেন! "ক্যানভাসে কোনো ফাঁক নেই। ফরাসীরা তো বলেই আর্ট হচ্ছে ট্র্যাপিজের খেলা—ফাঁক রেখে সমস্যার মুখোমুখি—তারপর শুরু ঐ কি বলে ট্র্যাপিজের খেলা। তা যামিনী রায় তো ঐ সমস্যায় গেলেনই না।" ফলে বিষ্ণু দে সম্পর্কে প্রবল আস্থা সত্ত্বেও নীরদবাবু অখুশি তাঁর যামিনী রায়-মগ্নতায়।

ক্যালকাটা গ্রুপ প্রকাশিত ও বিষ্ণু দে-র ভূমিকা সংবলিত নীরদবাবুর একরঙা ছোট্ট ছবির বইটিতে যামিনী রায়ের আঁকাড়া প্রভাবের সাক্ষ্য আছে। কথাটা তুলতেই উনি একটু অন্যমনস্ক হলেন।

—"হ্যাঁ, যামিনী রায়ের প্রভাবের কথাও উঠেছিল। আমি শুনে অবশ্য বেজায় চটে গেলুম। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি যামিনী রায়ের প্রভাব। সঙ্গে সঙ্গে

অয়েল কালার কিনে আনলুম। শুরু করলুম অয়েলে আঁকতে। একেবারে অন্যরকম করে ফেললুম ছবি।"

এরপর চেষ্টা চরিত্রি করে নীরদ মজুমদার পাড়ি দিলেন ফ্রান্সের দিকে। এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে। কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, কিন্তু তখনও বিষ্ণু দে-র আশা, মাতিস-পিকাসোর দেশে নীরদবাবুর শিল্পজিজ্ঞাসা পৌঁছে দেবে ওঁদেরই পরিণতিতে—কারণ পিকাসোই তো বলেছেন, "লোকে যেমন নির্ঝরের মুখে গিয়ে পৌঁছয় আমিও তেমনি কম্যুনিজমে এসেছিলুম এবং আমার সমগ্র কাজই আমায় এই গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।" কিন্তু ততদিনে নীরদ মজুমদার বাঁক নিয়ে ফেলেছেন।

—"সেখানে অনেকেই সুখ্যাতি করল আমার ছবির। ছবির একজিবিশনও হবে ঠিক হল—সবচেয়ে নামী গ্যালারিতে। কিন্তু হঠাৎ মনে হল, ওদের নকল কী হবে, আমি যদি ভারতীয় কিছু না করি, তবে মূল্য কোথায়? আমি একজিবিশন বাতিল করে দিলুম।"

এইভাবেই নীরদবাবু পৌঁছুলেন তাঁর তত্ত্বে! তন্ত্রে। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলুম।" এমনভাবে বলেন যেন অন্ধকার ঘরের মেঝেতে ছুঁচ খুঁজে পেলেন।

—"আমার কাছে তন্ত্র শুধু তত্ত্ব বা কন্‌টেন্টের ব্যাপার তো নয়। একটা সম্পূর্ণ কাঠামো। চিত্রগত রূপগত সমস্যা মেটানোর উপায়। অনেক নতুন নতুন সূত্র পেতে থাকলুম—চিত্রসমস্যার সমাধান হল তন্ত্রের সামগ্রিক কাঠামোতে। তারপর তো অনেক দূর এগিয়েছি।"

রাতদিন পরিশ্রম করেন নীরদবাবু বিদেশে বসে। উনি বলছেন, তান্ত্রিক পড়াশুনোও। ড্রইংয়ের জোরালো হাত তো ছিলই, তার ওপর ঐ তথাকথিত তান্ত্রিক কাঠামোকে অবলম্বন করে গড়ে তোলেন চিত্রের ভেতরকার প্রকরণগত কাঠামো। ইত্যাদি। তারপরের ইতিহাস তো সকলেরই জানা।

অবশ্য তাঁর ভারতীয়ত্ব কতখানি বাস্তব ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাঁর হিন্দু আধ্যাত্মিকতা বা তথাকথিত গাণিতিক-জ্যামিতিক তন্ত্ররহস্য আমাদের জীবনে ও নন্দনে কতখানি প্রাসঙ্গিক এসব প্রশ্ন তো তোলা যায়ই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অবিশ্বাসী দর্শকের কাছেও, তাঁর ঐ গুহ্য ছবিতে রেখার লিরিক্যাল সবলতা, তেলরঙের উজ্জ্বল স্বচ্ছতা কিংবা কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়া রেখা ও রঙের বিন্যাস ও সাম্য অনেক আনন্দের উৎস। তত্ত্ব বাদ দিয়েও তাঁর ছবি সজীব, গতিশীল। এমনকি যাকে হয়তো তিনি তাঁর

ধারাবাহিক বা অনুক্রমিক পৌরাণিক চিত্রমালার অন্তর্ভুক্ত করেন আমরা তার ইন্দ্রিয়সংবেদ্য প্রত্যক্ষতাতেই আকর্ষণ বোধ করি। আর এখনও প্রকৃতিচিত্রতে যখন তিনি হাত দেন, আমাদের নান্দনিক তৃপ্তি তখন আরো অনায়াস! আর প্রকৃতিচিত্রণে, আবাল্যপরিচিত রিখিয়ার আদল তো আসবেই।

১৯৫৭-তে পারী থেকে ফিরে এসেও রিখিয়াকে তিনি ছাড়তে পারেন না। তাঁর ফরাসী স্ত্রী-রও ভালো লেগে যায় জায়গাটা। দুজনে মিলে গড়ে তোলেন পৈতৃক বাড়ি থেকে কিছু দূরে রিখিয়ার উপান্তে, আগাইয়াতে, নিজস্ব বাড়ি-বাগান। সময় পেলেই চলে আসেন এখানে।

পরের দিন সকালে বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে না যেতেই সেই পুরোনো হাঁক। নীরদ মজুমদারের ছবিতে যেমন, তেমনি তাঁর চলনে বলনে এখনও ভীষণ একটা জোর। এখন তো বেশ মোটাই হয়েছেন, কিন্তু ভাবে ভঙ্গিতে যেন স্বাস্থ্য ঝরছে।

গেট পার হয়ে বিরাট ছড়ানো বাগান। 'তান্ত্রিক' নীরদ মজুমদারের বাগান। ফলে জবা গাছের ভিড়। কত রকমেরই বা জবা! আরো নানা প্রকারের নানা রঙের ফুলের গাছ। ইতস্তত নানা স্থানে তান্ত্রিক অভিজ্ঞান। মেয়ের হাতের ভাস্কর্যকর্ম। চাঁপা গাছের তলায় মোড়া পাতা। আগের দিন এখানে বসেই আড্ডা হয়েছিল। ছেলে চিত্রভানু—আর্ট কলেজের ছাত্র—বাপের সঙ্গে উবু হয়ে বসে স্কেচখাতা খুলে দেখাচ্ছিল ছুটির কাজ। আজ ঘরে নিয়ে বসালেন। সমস্ত চৌকি জুড়ে ছড়ানো রয়েছে গৃহস্থালী জিনিষপত্র থেকে ছবি-আঁকার সাজসরঞ্জাম পর্যন্ত তাবৎ বস্তু। বোধ হয় গোছাচ্ছেন।

নীরদ মজুমদার আর বিষ্ণু দে উভয়েরই দ্বিতীয় আবাস এখন রিখিয়া। বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে বোধহয় আরো বেশি—তাঁর স্থায়ী আস্তানা রিখিয়া। 'কবিশিল্পীর কলোনী'। ফলে এখন, এখানে, নীরদবাবুর সঙ্গে কথায় বার্তায়, ওঁর কথা তো উঠবেই। গল্প থামতেই চায় না।

—"বিষ্ণুবাবুর কবিতার ওপর রিখিয়ার যেমন প্রভাব আছে, তেমনি আমার ছবির ওপরও আছে। রঙের দিক থেকে অন্তত। বিষ্ণুবাবুর আগের যুগের কবিতায় একটা যেন effort ছিল, রিখিয়ার পর, থেকে

effortless, স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে গেল। শরীর-মন দুয়ের পক্ষেই ভালো ওঁর রিখিয়া। তাই না?"

উত্তরে কী আর বলা যায়। চুপ করে থাকতেই হয়। এ তো আর কাব্য-আলোচনা নয় সত্যিই।

—"আমিও রিখিয়ায় ভালো থাকি। বাংলা দেশের কালো কালো মাটি অসহ্য। এখানে এলেই ভালো। এই বাতাস, আলো। সে দিক থেকে আগাইয়া আরো ভালো। ত্রিকূটকে এখান থেকে আরো স্পষ্ট দেখা যায়।"

রিখিয়াকে ভাবা যায় না ত্রিকূটকে বাদ দিয়ে। নীরদ মজুমদার আজ পর্যন্ত কত যে ছবি এঁকেছেন ত্রিকূটকে সামনে রেখে তার ইয়ত্তা নেই। সেই তরুণ বয়স থেকে। বিষ্ণু দে-র বাড়ির পেছনের বারান্দায় টানানো আছে বিভিন্ন বয়সের আঁকা নানান ত্রিকূট। কখনো পুঞ্জ বস্তুভার। কখনো ভোরের আগুন লাগে। পল সেজান যেমন আঁকতেন স্যাঁৎ ভিক্তোয়ার। জীবনের শেষ কুড়িটি বছর বার বার এঁকেছেন এই পাহাড়—নানা দিক থেকে, নানা ভাবে। আঁকতেন আর অসন্তোষে অস্থির হয়ে উঠতেন।

—"আমি মশাই সেজানের লা স্যাঁৎ ভিক্তোয়ার পাহাড় দেখেছি। তার চেয়ে অনেক সুন্দর অনেক imposing ত্রিকূট। ওটা সেজানের বানানো।"

অতুল বসু নাকি নভেম্বরে রিখিয়াতে এসে বলেছিলেন, "ত্রিকূট ব্যাপারটা আপনাদের বানানো। আমি তো কিছুই দেখছি না।" তখন দিনকতক কুয়াশায় অস্পষ্ট থাকত ত্রিকূট। আর অতুলবাবু চোখে কম দেখতেন।

ত্রিকূটও একেক দিক থেকে একেক রকম, একেক সময় একেক রকম। বিষ্ণু দে-র কবিতাতেও তাই। নীরদবাবুদের ছবিতেও। তাই বিষ্ণু দে জুড়ে দেন ত্রিকূটের শিল্পীর সঙ্গে সন্ত ভিক্তোয়ার-এর শিল্পীর অনুষঙ্গ—অল্প কদিন আগেই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কবিতায় 'বৃষ্টির পরে বর্ষার ত্রিকূট':

> আগাইয়া তাই ভাবে: পল্ কিবা দেখতেন?
> আর আঁকতেন কার রূপ শতবার?

নীরদবাবু ও তাঁর বিকাশের নানা স্তরে এঁকেছেন ত্রিকূট।

—"রিখিয়ার সঙ্গে, ত্রিকূটের সঙ্গে আমার কতদিনের যে পরিচয় তার হিসেব নেই। ত্রিকূটের মতো ক্যারেকটর, ওরকম লিরিক্যাল আর কিছু হয় না।"

—"এখনও, আমার ত্রিপুরেশ্বরী ছবি দেখে গিন্নি বললেন, এ তো ত্রিকূটেরই ছবি !"

'বৃষ্টির পরে বর্ষায় ত্রিকূট' বিষ্ণু দে নীরদ মজুমদারকে উপহার দিয়েছেন। ৩১ বছর পরে আবার "নীরদ মজুমদারের জন্য"। বিষ্ণু দে-র রিখিয়া-আবাসের বাইরের ঘরে নীরদ মজুমদারের উপহৃত ক্যানভাসে তেলরঙ ত্রিকূটের কঠিন রঙিন কৌণিক অস্তিত্ব। মনে পড়ে স্যাঁৎ ভিক্তোয়ার ?

যেন বা শৈব কেলাসিত প্রিয় পাহাড়—
কৌণিকে নীলে নানান্ রূপের পাহাড়কে বারবার—

—"খুব ইচ্ছে হয় ফরাসী কায়দায় একটা বই করি। রিখিয়া নিয়ে, ত্রিকূট নিয়ে বিষ্ণু দা-র কবিতা আর আমার ছবি এক সঙ্গে।"

অনুরোধ করতেই একটা স্কেচ্ এঁকে দিলেন। বললেন, "দেখুন, কৌণিক হয়েছে কিনা ? কবিতাটি আমার ভারি পছন্দ। ত্রিকূটের চরিত্র ফুটে উঠেছে। ত্রিকূট আমার মুখস্থ। এ ছবি আঁকতে সময় লাগবে, আমার ?"

আলবার্ট আইনস্টাইন ঃ জীবনে ও চিন্তায়

অমল দাশগুপ্ত

একবার একজন সাংবাদিক আইনস্টাইনকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আর কেউ আবিষ্কার না করে আইনস্টাইনই যে করলেন তার কারণ কী? জবাবে আইনস্টাইন বলেছিলেন, তাঁর মানসিক অগ্রগতি ধীর লয়ে হয়েছিল, কুড়ি-পঁচিশ বছর বয়সেও তাঁর মনের অনুভূতিগুলো ছিল শিশুর মতো। তাই পদার্থবিদ্যার তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে যখন চিন্তা করছিলেন তখন শিশুর মতোই বিস্মিত হন। কিন্তু পরিস্থিতির বিচার করেন কুড়ি-পঁচিশ বছর বয়সের ধী নিয়ে। এমনিভাবে যে ফলাফলে পৌঁছন তারই পরিণতি বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব।

যখন প্রকৃতই শিশু ছিলেন তখন তো বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। বিশেষ করে দুটি ঘটনার বৈজ্ঞানিক ছাপ এতই গভীর ছিল যে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে সে-কথা বলে গিয়েছেন। আটষট্টি বছর বয়সে (ছিয়াত্তর বছর তিনি বেঁচেছিলেন) আত্মজীবনীমূলক যে লেখাটি লেখেন, যাকে নিজেই বলছেন তাঁর 'অবিচুয়ারি', সেখানে বলছেন, "আমি তখন চার কি পাঁচ বছরের শিশু, বাবার কাছে একটি কম্পাসযন্ত্র দেখে এমনি ধরনের বিস্ময় অনুভব করেছিলাম। কম্পাসের কাঁটার আচরণ যে এমন সুনিশ্চিত হতে পারে, এ-ব্যাপারটাকে অন্য সব ঘটনার প্রকৃতির সঙ্গে কিছুতেই মেলানো যাচ্ছিল

না।...এই অভিজ্ঞতা আমার ওপরে গভীর ও স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। শৈশব থেকে মানুষ তার চোখের সামনে যা-কিছু দেখে তাতে তার এ-ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় না। বস্তুর পতন সম্পর্কে, বাতাস ও বৃষ্টি সম্পর্কে, চন্দ্র সম্পর্কে, চন্দ্র যে অধঃপতিত হচ্ছে না এই ঘটনা সম্পর্কে, জীবন্ত ও অ-জীবন্ত বস্তুর পার্থক্য সম্পর্কে মানুষ তো বিস্ময় বোধ করে না।"

দ্বিতীয় ঘটনা সম্পর্কে আইনস্টাইন তাঁর 'অবিচুয়ারিতে' লিখছেন, "বারো বছর বয়সে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দ্বিতীয় এক বিস্ময়ের অভিজ্ঞতা আমার হল। এই বিস্ময় ছিল সরল ইউক্লিডীয় জ্যামিতি বিষয়ক ছোট একটি বইয়ের মধ্যে।" বইটি তাঁর হাতে এসেছিল স্কুলের নতুন বছর শুরু হবার সময়ে। পড়ে দেখলেন, কী নিশ্চয়তার সঙ্গে এক-একটি উক্তি উপস্থাপিত। যেমন এই উক্তিটি: ত্রিভুজের তিন লম্ব-রেখা এক বিন্দুতে মিলিত হয়। ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ নয় কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণসাধ্য। অন্যদিকে জ্যামিতিতে কতকগুলো ব্যাপার স্বতঃসিদ্ধ—প্রমাণ ছাড়াই মেনে নিতে হয়। এতে তিনি বিচলিত হননি। কিন্তু এমন প্রতিজ্ঞাও আছে যা গ্রহণীয় বটে, তবুও প্রমাণবিদ্ধ করা গেল। তাঁর কাছে সেটাই যথেষ্ট। জ্যামিতির বইটি হাতে আসার আগে কাকার কাছে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের কথা শুনেছিলেন। তখন অনেকখানি চেষ্টার পরে ত্রিভুজের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে উপপাদ্যটি প্রমাণ করেন। তা করতে গিয়ে স্বতঃ-প্রতীয়মান ধারণা লাভ করেছিলেন যে সমকোণী ত্রিভুজের বাহুর সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে তার একটি সূক্ষ্মকোণের দ্বারা নির্ধারিত। আরও মনে হয়েছিল, যে-সব জিনিস নিয়ে জ্যামিতির আলোচনা তা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত জিনিস থেকে অভিন্ন—"যা দেখা যায় ও স্পর্শ করা চলে।" ধারণাটি আদিম, কাণ্টের দর্শনে হেতুপ্রভব বিচার নিয়ে যে সমস্যার কথা তোলা হয়েছে তার মূলেও সম্ভবত এই ধারণা, স্পষ্টতই তার প্রতিষ্ঠা এই ঘটনার ওপরে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জিনিসের সঙ্গে (কঠিন দণ্ড, নির্দিষ্ট সময়কাল, ইত্যাদি) জ্যামিতিক ধারণার সম্পর্ক দুর্জ্ঞেয়ভাবে হলেও উপস্থিত।

আইনস্টাইনের প্রাথমিক শিক্ষা ম্যুনিখের ক্যাথলিক স্কুলে, মাধ্যমিক শিক্ষা ম্যুনিখের লুইটপোল্ড জিম্‌ন্যাসিয়ামে। দুই স্কুলেই ধর্মীয় শিক্ষালাভ করেছিলেন। ক্যাথলিক স্কুলে তিনি ছিলেন একমাত্র ইহুদী ছাত্র, কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষা পেয়েছিলেন ক্যাথলিকবাদে। ইহুদীবাদ-বিরোধী কোনো মনোভাব তাঁর ছিল না, অন্যদিকে ইহুদী আচারপ্রথা সম্পর্কেও অনাগ্রহী

ছিলেন। ধর্মের গোঁড়ামি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তাঁর পরিবারে কিন্তু একটি ইহুদী প্রথা মেনে চলা হত। তা হচ্ছে কোনো একজন গরীব ইহুদীকে সপ্তাহে একদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো। এই ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুরে আইনস্টাইন পরিবারে খেতে আসতেন রাশিয়া-প্রত্যাগত গরীব ইহুদী ছাত্র, আইনস্টাইনের চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো, মাক্স টাল্‌মাই। আইনস্টাইনকে তিনি পপুলার সায়েন্সের কয়েকটি বই পড়তে দিয়েছিলেন। একই সময়ে জিমন্যাসিয়ামের ছাত্র হিসেবে আইন-স্টাইনকে ওল্ড টেস্টামেণ্ট পড়তে হচ্ছিল। কিছুকাল আইনস্টাইন গোঁড়া বাইবেল-অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই বিজ্ঞানের বই পড়ার শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্ঘর্ষ বেধে গেল। 'অবিচুয়ারিতে' তিনি লিখছেন, "পপুলার সায়েন্সের বই পড়ে অল্প সময়ের মধ্যেই আমার ধারণা হল বাইবেলের গল্পগুলোতে অনেক কিছুই সত্য নয়।" তার ফল হল স্বাধীন চিন্তা এবং তৎসহ এই বদ্ধমূল ধারণা যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রাষ্ট্র ইচ্ছাকৃতভাবে তরুণদের প্রতারিত করছে। ধারণাটি অতি মারাত্মক। এই অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিল সকল প্রকার কর্তৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহ, কোনো সবিশেষ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে লালিত বিশ্বাস সম্পর্কে সংশয়ী মনোভাব। এই মনোভাব সারা জীবন তাঁর মধ্যে ছিল।

এই মাসক্স টাল্‌মাইর পরামর্শে সেই অল্প বয়সেই আলবার্ট আইনস্টাইন মহান জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্টের রচনাবলী পাঠ করেন। পরে টালমাই লিখেছেন, "তখনো সে (আলবার্ট আইনস্টাইন) শিশু, মাত্র তেরো বছর তার বয়স, তবুও মনে হল কাণ্টের যে রচনাবলী সাধারণ নশ্বর মানুষদের কাছে দুর্বোধ্য তা তার কাছে স্পষ্ট।"

কিন্তু স্কুলে আলবার্টের শিক্ষকদের ধারণা কিন্তু অন্যরকম ছিল। তাঁরা মনে করতেন এই ছাত্রটি বেয়াড়া আর অপদার্থ। স্কুলে আলবার্ট নিজেও খুবই অসুখী ছিলেন। প্রচণ্ডভাবে বিদ্রোহ করতেন স্কুলের কড়াকড়ি শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে, আতঙ্কিত হতেন শিক্ষার পদ্ধতিতে ভয়ের ভূমিকা দেখে, শিক্ষকদের মনে করতেন আর্মি-সার্জেণ্ট।

আলবার্টের যখন পনেরো বছর বয়স (১৮৯৪) তখন মুানিখে তাঁর বাবা হেরমানের ব্যবসা (বৈদ্যুতিক সামগ্রী তৈরি করার কারখানা) ফেল পড়ল। মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য আলবার্টকে মুানিখে রেখে মেয়ে মায়াকে সঙ্গে নিয়ে হেরমান চলে গেলেন ইতালির মিলানে। ছ-মাসও পার হল না।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ না করেই আলবার্টও রওনা দিলেন মিলানের উদ্দেশে। তার আগে এই মর্মে ডাক্তারের সার্টিফিকেট যোগাড় করেছিলেন যে স্নায়ু-বৈকল্য ঘটার দরুন তাঁর উচিত স্কুল ছেড়ে দিয়ে ইতালিতে বাপ-মার কাছে চলে যাওয়া। কিন্তু দেখা গেল এই সার্টিফিকেটের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাঁকে স্কুল থেকে ছেড়ে দিয়ে স্কুলের শিক্ষকরাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তবে গণিতের শিক্ষকের কাছ থেকে এই মর্মে সার্টিফিকেট পেলেন যে গণিতে আলবার্ট যথেষ্ট অগ্রসর, জিমন্যাসিয়ামের ডিপ্লোমা ছাড়াই আলবার্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়াশুনোর জন্য যেতে পারে।

জিমন্যাসিয়াম থেকে মুক্তি পেয়ে আলবার্ট সোজা চলে গেলেন বাবা-মার কাছে মিলানে। তারপরে পনেরো বছরের বালকের পক্ষে এক অস্বাভাবিক কাজ করে বসলেন—জার্মান নাগরিকত্ব ত্যাগ। একুশ বছর বয়স পর্যন্ত নাগরিকত্বহীন ছিলেন। তারপরে সুইস নাগরিক হন।

আইনস্টাইনের জীবনে সে ছিল অত্যন্ত সুখের দিন। মনের আনন্দে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ান আর বাড়িতে নিজে নিজেই গণিত পড়েন। কিন্তু আবার অঘটন ঘটল। তাঁর বাবার ব্যবসায়ে আবার সংকট দেখা দেয় আর আইনস্টাইন বুঝতে পারেন তাঁর কিছু করা উচিত। বাবার ইচ্ছে, ছেলে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হোক। অতএব আইনস্টাইন গেলেন জুরিখে। সেখানে ছিল জার্মানির বাইরে মধ্য ইউরোপে বিজ্ঞান পড়ার সবচেয়ে নামডাকওলা কেন্দ্র—সুইস ফেডারেল পলিটেকনিকাল স্কুল। প্রথম বারের পরীক্ষায় আইনস্টাইন অনুত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু গণিতের বিষয়গুলোতে তাঁর নম্বর এত ভালো ছিল যে স্কুলের অধ্যক্ষ পরামর্শ দিলেন কোনো একটি হাইস্কুল থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে আইনস্টাইন যেন পরের বছর আবার ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেন। আইনস্টাইন তখন গেলেন আরাউ-এর স্কুলে। এই স্কুলের প্রগতিশীল শিক্ষার ধরন আইনস্টাইনের খুবই ভালো লেগেছিল। সেখানে ছাত্ররা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারত। সেখানে ছিল ভালো ল্যাবরেটরি, ছাত্ররা ল্যাবরেটরির যন্ত্র ব্যবহার করে বিজ্ঞান শিক্ষা করত! পরের বছর ডিপ্লোমা নিয়ে আইনস্টাইন আবার পলিটেকনিকে ভর্তি হবার জন্য আবেদন করলেন এবং বিনা পরীক্ষাতেই ভর্তি হয়ে গেলেন।

জুরিখে পড়বার সময়েই, যখন তাঁর বয়স ষোল, আইনস্টাইন সিদ্ধান্ত করলেন বিশুদ্ধ গণিত ছেড়ে দিয়ে পদার্থবিদ্যা পড়বেন। 'অবিচুয়ারিতে' আইনস্টাইন লিখছেন, "আমি দেখলাম অজস্র বিশেষ বিশেষ বিষয়ে গণিত বিভক্ত, তার কে

কোনো একটি নিয়ে পড়তে গেলেই স্বল্প যে জীবনকাল আমরা পেয়েছি তা সহজেই ফুরিয়ে যেতে পারে। ফলে আমার অবস্থা হল সেই বুরিদানের গাধার মতো, যে গাধা দুই আঁটি ঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্থির করতে পারেনি কোন্ আঁটি থেকে ঘাস খাবে। সেটা স্পষ্টতই এই কারণে যে গণিতের ক্ষেত্রে আমার অনুভূতি এমন জোরালো ছিল না যে মোটামুটি স্থগিত রাখা চলে এমন সব বিদ্যা থেকে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণকে ও প্রকৃতই ভিত্তিস্থানীয়কে পরিষ্কার পৃথক করে নিতে পারি।" প্রকৃতির জ্ঞানে তাঁর আগ্রহ অবশ্যই আরো জোরালো। কিন্তু তখনো পর্যন্ত ছাত্র হিসেবে তাঁর কাছে একথা স্পষ্ট ছিল না যে পদার্থবিজ্ঞানের মৌল নীতি সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞানলাভ করতে হলে জটিলতম গাণিতিক পদ্ধতিও অবশ্যই আয়ত্ত করা চাই। পদার্থবিদ্যাও নানা ক্ষেত্রে বিভক্ত, যে কোনো একটি ক্ষেত্রে স্বল্প জীবনকাল ব্যয় হয়ে যেতে পারে। এখানেও পরীক্ষালব্ধ তথ্যের শিথিল সংগ্রহ বিপুল। তবে তারই মধ্যে তিনি শিখে নিলেন যে-পথ মৌলিকের দিকে সেই পথের হদিস বার করতে। সঠিক সন্ধানটি পাবার পরে অন্য সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

'অবিচুয়ারিতে' আইনস্টাইন লিখেছেন, আর এই সময়েই তিনি উপলব্ধি করতে শুরু করেন যে মৌলিক পাঠ্যপুস্তক স্বতন্ত্রভাবে অধ্যয়ন করে যে পদার্থবিদ্যার শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার ভিত্তি মূলগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ। তারপরে সময় লেগেছিল আর দশবছর—অর্থাৎ ১৯০৫ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যেই ব্যাপারগুলোকে মনের মধ্যে যথেষ্ট গুছিয়ে নিতে পেরেছিলেন এবং আপেক্ষিকতার তত্ত্বের ওপরে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

পলিটেকনিকে আইনস্টাইন প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু সেটা ক্লাসের লেকচারে নয় বা নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসরণে নয়। সেটা তাঁর পক্ষে খুবই ক্লান্তিকর ছিল, কিছুটা সাবেকীও। তিনি নিজে যেটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন তাই নিয়ে কাজ করতেন। অধিকাংশ সময় ব্যয় করতেন জেম্স ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল প্রবর্তিত বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্বের তত্ত্ব অধ্যয়ন করার জন্য। পরবর্তীকালে আইনস্টাইন মন্তব্য করেছিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যে মান দেখা যাচ্ছে তাতে বিদ্যার মৃত্যু যে বহু আগে ঘটেনি সেটাই বিস্ময়কর।"

তবুও, পলিটেকনিকে চতুর্থ বছরের পরে (১৮৯৬-১৯০০) স্নাতক পরীক্ষায় যখন বসলেন তখন কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। এ কৃতিত্ব লাভ করতে পেরেছিলেন তাঁর বন্ধু মারসেল গ্রস্‌মানের সাহায্য নিয়ে। গ্রস্‌মান

মনোযোগী ছাত্রের মতো ক্লাসের যে-সব নোট নিয়েছিলেন সেগুলো চেয়ে নিয়ে পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়েছিলেন।

তারপরের দু-বছর আইনস্টাইন বেকার। মাঝেমধ্যে বাধ্য হয়ে নানা অস্থায়ী শিক্ষকতার ও গবেষণার কাজ নিতেন। তাই বলে অলস সময় কাটান নি। মৌলিক বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে। পরে এই প্রবন্ধের ভিত্তিতেই রচনা করেন ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের জন্য গবেষণামূলক নিবন্ধ। কিন্তু চাকরি একটা চাই, তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। জগতের কাছে আইনস্টাইন ব্যর্থতার দৃষ্টান্তরূপে প্রতীয়মান ছিলেন।

বন্ধু গ্রস্‌মান পুনরায় তাঁকে উদ্ধার করেন। গ্রস্‌মানের চেষ্টায় বার্ন্‌-এর পেটেণ্ট আপিসে একটা চাকরি পেয়ে যান (১৯০২)। এমনিভাবে তেইশ-বছর বয়সে আলবার্ট আইনস্টাইন হয়ে ওঠেন সুইস অসামরিক সরকারী কর্মচারী (তৃতীয় শ্রেণী)।

পরের বছর বিয়ে করেন জুরিখ পলিটেকনিকে তাঁর সহপাঠিনী মিলেভা মারিককে (পদার্থবিদ্যার ক্লাসে একমাত্র মিলেভা মারিক-ই ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি)। আইনস্টাইন সম্ভবত এই ভেবে বিয়ে করেছিলেন যে ঘরের কাজ করার জন্য যদি কেউ থাকে তাহলে তিনি নিজে অনেক বেশি সময় পাবেন। কিন্তু মিলেভা সেই স্থান নিতে পারেন নি। দুটি ছেলে হয়েছিল তাঁদের—১৯০৪ সালে হান্‌স আলবার্ট, ১৯১০ সালে এডুয়ার্ড। বার্ন্‌-এ আইনস্টাইন দম্পতির পারিবারিক জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় তা মোটেই সুখের নয়। বিয়ের বছর কয়েক পরে একজন সহকর্মী গিয়েছিলেন আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি লিখছেন, "একটু আগে জল দিয়ে মেঝে ধোয়া হয়েছে, কাচা জামাকাপড় দেওয়ালে ঝোলানো—এগুলো যাতে শুকিয়ে যায় সেজন্য অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খোলা। আমি আইনস্টাইনের ঘরে ঢুকলাম। এক হাতে তিনি শান্তভাবে একটি দোলনা দোলাচ্ছেন। তাঁর মুখে খুবই খেলো চুরুট, অপর হাতে একটি খোলা বই। উনুন থেকে ভয়ংকর ধোঁয়া উঠছে। ভেবে পাচ্ছি না এই অবস্থা উনি সহ্য করছেন কি করে?'

আইনস্টাইন চিরকাল সহ্য করতে পেরেছেন। তাঁর কখনো চিত্তবিক্ষেপ হত না। ফলে যে কোনো জায়গায় তিনি কাজ করতে পারতেন। তবে ১৯৩৩ সালে লণ্ডনের আলবার্ট হলে শরণার্থী জার্মান বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে ভা ণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, লাইটহাউসের কীপারের কাজটি বিজ্ঞানীর পক্ষে

বেশ উপযুক্ত। কেননা, কাজটি সহজ এবং তার ফলে চিন্তা করার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার প্রচুর সুযোগ পাওয়া যায়।

আইনস্টাইন অবশ্য কোনোদিন লাইটহাউসের কীপারের কাজ করেন নি। কিন্তু বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ ও একাকী। এদিক থেকে অন্য বিজ্ঞানীদের থেকে তিনি আলাদা। ১৯০৫ সালে যখন তিনি বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রকাশ করেন তখন বিজ্ঞানের জগতে তিনি অপরিচিত। কোনো বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করেন নি, কোনো মহা-বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত নন—পেটেন্ট আপিসের কেরানি মাত্র। আইনস্টাইন নিজেই বলতেন, "তিরিশ বছর বয়স হবার আগে সত্যিকারের কোনো তত্ত্বগত পদার্থবিজ্ঞানীকে আমি চোখে দেখি নি।" দৃষ্টান্ত হিসেবে আইনস্টাইন অসাধারণ। তাঁর এই বিচ্ছিন্নতা তাঁর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল। ধরাবাঁধা পথে তাঁর চিন্তা ধাবিত হয় নি। এই একাকীত্ব, নিজের তৈরি করা সমস্যা নিয়ে এই স্বাধীন চিন্তা, এই ভিড়ের সঙ্গে না চলা—এই ছিল তাঁর সৃষ্টির সবচেয়ে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বিপুল খ্যাতির সময়েও তাঁকে ঘিরে কোলাহল হত, কিন্তু তিনি ছিলেন এতই নির্লিপ্ত ও তন্মনস্ক যে তার মনের একাগ্রতা ক্ষুণ্ণ হত না।

১৯১৪ সালে আইনস্টাইন যখন অধ্যাপনার কাজ নিয়ে জুরিখ থেকে বার্লিনে চলে আসেন তখন মিলেভা দুই ছেলে নিয়ে জুরিখেই থেকে যান। ১৯১৭ সালে বার্লিনে আইনস্টাইন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর সেবা করেছিলেন মাসতুতো বোন এল্‌সা। ১৯১৯ সালে মিলেভার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হবার পরে এল্‌সাকে আইনস্টাইন বিয়ে করেন। (এল্‌সা সম্পর্কে আইনস্টাইন বলেছিলেন, "আমি খুশি যে আমার স্ত্রী বিজ্ঞান জানেন না, আমার প্রথম স্ত্রী জানতেন।") বিবাহবিচ্ছেদের সময়েই কথা হয়ে থাকল যে আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কারের সমস্ত টাকা মিলেভা ও তাঁর দুই ছেলের ভরণপোষণের জন্য দিয়ে দেবেন। তখন থেকেই জানা ছিল আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পাবেনই। নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯২১ সালে, তখন তিনি প্রাচ্যদেশ সফর করছিলেন এবং ছিলেন সাংহাইয়ে। একটি তারবার্তায় খবর পাওয়া গেল—পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার "আপনার ফটো-ইলেকট্রিক সূত্রের জন্য এবং তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে আপনার কাজের জন্য"। আপেক্ষিকতা তখনো পর্যন্ত বিতর্কিত বিষয়, ঘোষণায় তার কোনো উল্লেখ ছিল না। আইনস্টাইন তাঁর 'অবিচুয়ারিতেও' নোবেল পুরস্কারের উল্লেখ করেন নি।

কারণ, আইনস্টাইনের সেই একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতা। নোবেল পুরস্কার পাওয়া নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র মানসিক আলোড়ন ছিল না। সেদিন রাতে যদি তিনি ঘুমোতে না পেরে থাকেন সেটা নিশ্চয়ই এই কারণে যে তিনি কোনো বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে ভাবছিলেন। সম্ভবত নোবেল পুরস্কারের পদকটিও তিনি ভালো করে দেখেন নি। সেই পদক এবং আরো অজস্র পদক ও সম্মানপত্র একরাশ কাগজপত্রের সঙ্গে তাঁর সেক্রেটারির ঘরে থাকত।

বিপুল ও অভূতপূর্ব খ্যাতি পেয়েছিলেন আইনস্টাইন। কিন্তু আইনস্টাইনকে যেন তা স্পর্শ করত না। কল্পনাতীত খ্যাতির মধ্যের থেকেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনবহিত। তবুও মাঝে মাঝে শান্তি বিঘ্নিত হত, তিনি বলতেন, "সবচেয়ে সাধারণ একজন শ্রমিককে আমার হিংসে হয়, সেও আড়াল রাখতে পারে।"

১৯০৫ সালে পদার্থবিদ্যার সম্ভ্রান্ত জার্মান মাসিক 'আনালেন ডেয়ার ফিজিক' (পদার্থবিদ্যার বর্ষপঞ্জী) পত্রিকায় আইনস্টাইনের গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হল—'আণবিক পরিমাপের এক নতুন নির্ধারণ'। এই প্রবন্ধটির জন্য তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ ডি পেলেন। একই বছর একই পত্রিকায় প্রকাশিত হল আরো চারটি যুগান্তকারী প্রবন্ধ, এবং বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি চিরকালের জন্য বদলে গেল।

প্রথম প্রবন্ধটি ব্রাউনীয় বিচলন সম্পর্কে। ১৮২৮ সালে স্কটদেশীয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ করেছিলেন স্থির তরল পদার্থে নিমজ্জমান পরাগরেণু দুরন্ত নড়াচড়া করে থাকে। এই ব্যাপারটাকে বলা হল ব্রাউনীয় বিচলন। আইনস্টাইন বললেন, এই বিচলন ঘটছে তরল পদার্থের পরমাণুর ধাক্কায়। কতখানি বিচলন তারও হিসেব দিলেন। দেখা গেল বাস্তবের সঙ্গে এই হিসেব মিলে যাচ্ছে। পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্ব মেনে নিতে হল। পরমাণুর কথা যদিও অনেক আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল কিন্তু সেটা অনেকটা কতকগুলো ক্রিয়াকাণ্ড ব্যাখ্যা করার সুবিধের জন্য। এই প্রথম পরমাণু নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা পেল।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ ফটো-ইলেকট্রিক ক্রিয়া সম্পর্কে। কোনো বস্তু যখন উত্তপ্ত হয়ে জলতে শুরু করে তা থেকে আভা নির্গত হয়—প্রথমে লাল, তারপরে উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যথাক্রমে কমলা, হলদে ও সাদা। বিজ্ঞানীরা অনেক দিন চেষ্টা করেছিলেন তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও উত্তাপের ভিন্নতা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বিকিরিত শক্তির পরিমাণে কি-ভাবে ভিন্নতা ঘটে তার একটা সূত্র সন্ধান

করতে। সন্ধান দিলেন মাক্স প্লাঙ্ক ১৯০০ সালে। তিনি এমন একটি সমীকরণ উপস্থিত করলেন যা পরীক্ষাকার্যের সমস্ত ফলাফল পূরণ করে। এই সমীকরণের ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হলেন যে বিকিরিত শক্তি নিঃসৃত হয় অবিচ্ছিন্ন ধারায় নয়, বিচ্ছিন্ন টুকরোয় বা অংশে। এই টুকরো বা অংশগুলোর নাম তিনি দিলেন কোয়ান্টা। তারপরে কোয়ান্টাম তত্ত্বের তাৎপর্য নিয়ে অন্য কোনো পদার্থবিজ্ঞানী মাথা ঘামান নি, আইনস্টাইনই প্রথম তার তাৎপর্য তুলে ধরলেন। কোয়ান্টাম তত্ত্বকে তিনি নিয়ে গেলেন নতুন এলাকায়। বললেন—আলো হোক, উত্তাপ হোক, এক্স-রে হোক, সকল প্রকারের বিকিরিত শক্তি পরিক্রমা করে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কোয়ান্টায়। এই ধারণাটি তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন ফটো-ইলেকট্রিক ক্রিয়া নামে পরিচিত একটি বিভ্রান্তিকর ব্যাপারের পরিষ্কার সংজ্ঞা উপস্থিত করে। একটি ধাতুর পাতের ওপরে যখন আলো পড়ে তখন ধাতুর পাত থেকে এক ঝাঁক ইলেকট্রন নির্গত হয়। আলোকে যদি তরঙ্গ বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে এই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আইনস্টাইন বললেন, আলো শক্তির অবিচ্ছিন্ন ধারা নয়, শক্তি-গুচ্ছের পৃথক পৃথক কণিকা। এই কণিকার নাম তিনি দিলেন ফোটোন। ফোটোন যখন ইলেকট্রনকে ঘা দেয় তখন ব্যাপারটি ঘটে দুটি বিলিয়ার্ড-বলের ধাক্কা খাওয়ার মতো। ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে আসে। এমনিভাবে আইনস্টাইন আলোকতত্ত্বে বিপ্লব ঘটালেন এবং ফটো-ইলেকট্রিক ক্রিয়া ব্যাখ্যা করলেন।

তৃতীয় প্রবন্ধে উপস্থিত করলেন বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। এক লাইনে বলতে হলে তত্ত্বটি এই: আলোর বেগ ধ্রুব ও নিত্য (অপরিবর্তনীয়), সাপেক্ষে সমবেগে গতিশীল সকল ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সকল নিয়ম অভিন্ন, তাহলে বিচার ও তুলনার (রেফারেন্স) সকল কাঠামোতেই দেখা যায় সময় ও গতি দর্শকের আপেক্ষিক।

কোনো বস্তু গতিশীল কিনা তা বুঝতে হলে দ্বিতীয় কোনো বস্তুর সঙ্গে বিচার করতে হয়। যেমন, গাড়ির গতি বোঝা যায় ভূপৃষ্ঠের বিচারে। গ্রহের গতি নক্ষত্রের বিচারে। যার সঙ্গে বিচার করা হচ্ছে তাকে বলা হয় স্থানাঙ্ক নির্দেশক। গ্যালিলিও ও নিউটনের গতিবিদ্যার নির্ভর এই স্থানাঙ্ক নির্দেশক।

বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে প্রথম কথা, পরস্পরের বিচারে সমবেগে গতিশীল সকল নির্দেশকে প্রকৃতির সকল নিয়ম অভিন্ন।

দ্বিতীয় কথা, শূন্যদেশে আলোর গতি সকল অবস্থাতেই ধ্রুব বা একই মাপের—অর্থাৎ, সেকেণ্ডে তিনলক্ষ কিলোমিটার। যে উৎস থেকে আলো নির্গত হচ্ছে সেই উৎসটি যদি ধাবমান হয়, কি সামনে কি পিছনে, তাহলেও আলোর গতি একই মাপের থাকে। অন্যদিকে দর্শক যতোই ছুটোছুটি করুক তার কাছেও আলোর গতির কোনো হেরফের নেই।

উল্লিখিত কথাদুটি আলাদাভাবে মেনে নিতে অসুবিধে নেই, একসঙ্গে মেলানো শক্ত। বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে এই মেলানোর ব্যাপারটি যুক্তি-সহভাবে ঘটানো হয়েছে—স্পেস ও সময় সম্পর্কিত নিয়মের তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে।

দুটি ঘটনা একই সময়ে ঘটছে একথা নির্বিশেষভাবে বলা অর্থহীন। বলা দরকার, একটি বিশেষ স্থানাঙ্ক নির্দেশকের বিচারে। মনে করা যাক দুটি ছুটন্ত ট্রেনের দুই প্রান্তে দুটি বাজ পড়েছে। লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন লোক একই সঙ্গে দুটি ঝলক দেখল—অর্থাৎ তার কাছে দুটি ঘটনা যুগপৎ। কিন্তু ছুটন্ত ট্রেনের ঠিক মধ্যিখানে থাকা একজন দর্শক আগে দেখবে ট্রেন যেদিকে ছুটছে সেদিকের প্রান্তের ঝলক, অন্যদিকের ঝলক পরে। তার কাছে দুটি ঘটনা যুগপৎ নয়। অতএব, স্থানাঙ্ক নির্দেশক যদি লাইনের ধারে দাঁড়ানো মানুষটি হয় তবে ঘটনাদুটি যুগপৎ। স্থানাঙ্ক নির্দেশক যদি ছুটন্ত ট্রেনের মধ্যিখানে থাকা মানুষটি হয় ঘটনাদুটি যুগপৎ নয়।

তার মানে, মাপ নেবার ব্যবস্থার আকার ও ঘড়ি চলার বেগ নির্ভর করে স্থানাঙ্ক নির্দেশকের বিচারে তার গতির অবস্থার ওপরে। একটি গতিশীল ব্যবস্থায় স্থাপিত ঘড়ি স্থিতিশীল ঘড়ির চেয়ে আস্তে চলবে। একটি গতিশীল ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মাপনদণ্ড গতি বাড়ার সঙ্গে লম্বায় ছোট হতে থাকবে। আলোর বেগে গতিশীল একটি ঘড়ি সম্পূর্ণ থেমে যাবে। আলোর বেগে গতি-শীল একটি মাপনদণ্ড কুঁচকে শূন্য হয়ে যাবে। আলোর গতি হচ্ছে এই বিশ্বে সর্বাধিক গতি—তার অধিক গতি নেই।

একটি ছুটন্ত ট্রেনের মধ্যে একজন যাত্রী ট্রেনের গতির দিকে ছুটছে। তাহলে লাইনের ধারে দাঁড়ানো একটি লোকের কাছে যাত্রীর গতি হবে ট্রেনের গতির সঙ্গে যাত্রীর গতি যোগ করিলে যা হয় তাই। ট্রেনটি যদি (কল্পনা করা যাক) আলোর বেগে ছুটত তাহলেও কি দুটি গতি যোগ করা যেত? যেত না, কেননা আলোর বেগই হচ্ছে সর্বোচ্চ বেগ, একই দিকে ছুটে যাওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে অন্য কোনো বেগ যুক্ত হতে পারে না।

নিউটনীয় ধারণায় যা ছিল পরম স্পেস ও পরম সময় তা আইনস্টাইনীয় ধারণায় বাতিল হয়ে গেল। দেখা গেল স্পেস হচ্ছে বিদ্যমান নানা জিনিসের বিন্যাস বা সম্পর্ক। আর সময় হচ্ছে ঘটনার সম্ভাব্য পারম্পর্য। যে জগতে আমরা বাস করি তা হচ্ছে চার-মাপ বিশিষ্ট স্পেস-সময় ধারাবাহিকতা। স্পেসের ধারণা তিন মাপের—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা। অতএব সময় হচ্ছে চতুর্থ মাপ।

'আনালেন ডেয়ার ফিজিক' পত্রিকায় প্রকাশিত চতুর্থ প্রবন্ধে আইনস্টাইন উপস্থিত করলেন বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের এক গাণিতিক সংযোজন। তাতে প্রতিষ্ঠা করলেন ভর ও শক্তির তুল্যতা। জানা গেল বস্তু শক্তিতে পরিবর্তনীয়। তার পরিমাণ ভরের সঙ্গে আলোর গতির বর্গের গুণফলের সমান ($E=mc^2$)। এই সমীকরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে অতি সামান্য পরিমাণ বস্তু থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হতে পারে। তাঁর এই সূত্রের ওপরে নির্ভর করেই পরমাণু-বোমা ও হাইড্রোজেন-বোমা তৈরি হয়েছিল।

আইনস্টাইনের বয়স যখন সাতাশ তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব শুধু বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্রাউনীয় বিচলন ও ফোটোন তত্ত্বে তাঁর মৌলিক অবদানের জন্যও বিজ্ঞানীমহলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বিজ্ঞানীদেরও দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ও কোয়ানটাম তত্ত্বের ওপরে। মহাকর্ষ নিয়ে কাজ করার পক্ষে কোনো আকর্ষণ ছিল না। নিঃসঙ্গ ও একক আইনস্টাইন শুধু নিজের তাগিদেই এই সময় থেকে পুরো দশবছর মহাকর্ষের তত্ত্বের ওপরে গবেষণা চালিয়ে গেছেন। সমকালীন পদার্থবিদ্যার রেওয়াজের বাইরে গিয়ে এই গবেষণা একমাত্র আইনস্টাইনের পক্ষেই স্বাভাবিক ছিল।

'আনালেন ডেয়ার ফিজিক' পত্রিকায় ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ—'সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের ভিত্তি'। এই তত্ত্বের মূলকথা এই: নিউটন অনুসারে মহাকর্ষ হচ্ছে একটা শক্তি যা দূর থেকে পলকের মধ্যে ক্রিয়াশীল হতে পারে। আইনস্টাইন বললেন মহাকর্ষ শক্তি নয়, স্পেস-সময় ধারাবাহিকতায় একটা বক্র ক্ষেত্র। বস্তু আছে বলেই এই ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যাপারটির প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে যদি সূর্যের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে তারার আলোর সরে যাওয়ার মাপ নেওয়া হয়। একমাত্র সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময়ে তারার আলো

দৃশ্যমান হয়ে থাকে, অতএব ব্যাপারটা বাস্তবেও ঠিক তাই কিনা দেখার জন্য পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল।

আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার সূত্র থেকে আরো একটি ব্যাপারের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। বুধগ্রহের অনুসূর (কক্ষপথের সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছের বিন্দু) একটু একটু করে এগিয়ে যায়, বিজ্ঞানীদের কাছে ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর ছিল। আইনস্টাইনের সূত্র থেকে এই প্রথম বোঝা গেল সেটা কেন হচ্ছে।

১৯১৯ সালে একটি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সুযোগ পাওয়া গেল। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটনের উদ্যোগে অভিযান হল ব্রাজিল ও আফ্রিকায়। প্রমাণ পাওয়া গেল আইনস্টাইনের উক্তিই ঠিক। সূর্যের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময়ে তারার আলো বেঁকে যাচ্ছে। ৭ নভেম্বর ১৯১৯ তারিখে লণ্ডন টাইমস পত্রিকায় বড়ো বড়ো হরফে ব্যানার হেড-লাইন দিয়ে খবর প্রকাশিত হল: বিজ্ঞানে বিপ্লব—নিউটনীয় ধ্যান-ধারণা উৎসাদিত।

রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন আলবার্ট আইনস্টাইন।

১৯২১ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত আইনস্টাইন প্রায় সবসময়েই পরিক্রমারত ছিলেন। সফর করেছিলেন বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের রাজধানীতে শুধু নয়, প্রাচ্যদেশে, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাতেও। সিংহলের হিন্দুদের মধ্যে দেখেছিলেন আভিজাত্য, জাপানীদের মধ্যে আত্মার বিশুদ্ধতা, প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের মধ্যে উন্নত প্রজ্ঞা ও নৈতিকতা।

আবার এই বিশের দশকেই যখন তিনি খ্যাতির তুঙ্গে, তাঁকে নিয়ে দুনিয়াব্যাপী প্রচণ্ড সোরগোল, তখনো কিন্তু তিনি তাঁর নতুন গবেষণা থেকে বিচলিত হননি। তিনি সন্ধান করছিলেন বিদ্যুৎচুম্বকত্ব ও মহাকর্ষের মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক। তিনি অনুভব করছিলেন, এই হবে ইলেকট্রন থেকে গ্রহ পর্যন্ত বিশ্বের সবকিছুর আচরণ নির্দেশ করার সাধারণ সূত্র আবিষ্কারের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। তিনি চাইছিলেন বস্তু ও শক্তির নিখিল ধর্মকে একটিমাত্র সমীকরণে বা সূত্রে সম্পর্কিত করতে—যার নাম দেওয়া হল একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব। আইনস্টাইনের বাকি জীবন এই একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বের নিষ্ফল সন্ধানেই কেটেছিল। আইনস্টাইনের সহকর্মীরা কিন্তু অনেক আগে থেকেই ধারণা করে নিয়েছিলেন যে তাঁর এই সন্ধান ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা ততদিনে কোয়ানটাম তত্ত্ব আরো অনেক দূর

অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে যে ইলেকট্রনের গতিবিধির মাপজোখ নিতে হলে অনিবার্যভাবেই একটা সম্ভাব্যতা এসে যায়। কোনো একটি মুহূর্তে একটি একক ইলেকট্রনের গতিবিধি জানা সম্ভব নয়। এই কারণে যে সেই মুহূর্তে সেই বিশেষ ইলেকট্রনের অবস্থান ও বেগ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তার মানে, পরমাণুর ভিতরকার ব্যাপার নিয়ে কোনো সূত্র বা ব্যবস্থা দাঁড় করাবার চেষ্টায় অনিশ্চয়তা আসতে বাধ্য। আইনস্টাইন যদিও কোয়ানটাম বলবিদ্যার উৎকর্ষ স্বীকার করে নিয়েছিলেন—যে উৎকর্ষ অর্জনে তাঁর নিজের অবদানও অনেকখানি—কিন্তু এই অনিশ্চয়তাকে মেনে নিতে পারেননি। বলতেন, "ঈশ্বর এই জগৎকে নিয়ে পাশা খেলেন না।" তিনি বিশ্বাস করতেন এই বিশ্ব সঠিক নিয়মে চালিত—"ঈশ্বর অণীয়ান কিন্তু বিদ্বেষপরায়ণ নন।" ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি স্পিনোজার ঈশ্বরে, যে ঈশ্বর বিশ্বের গাণিতিক বিশ্বাসের সঙ্গে সমার্থক। আমি সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না যে ঈশ্বরের ভাবনাচিন্তা মানুষের মঙ্গল নিয়ে, মানুষের নৈতিক কার্যকলাপ নিয়ে।" অর্থাৎ তিনি ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। বিশ্বের প্রজ্ঞাসিদ্ধ বিন্যাস যে ঈশ্বর সেই ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস। আইনস্টাইন তাই ভাবতে পারলেন সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকেই ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের সন্তোষজনক ভিত্তি পাওয়া যাবে। এইখানেই তত্ত্বগত পদার্থবিজ্ঞানীদের থেকে তিনি আলাদা হয়ে গেলেন। বিশিষ্ট জার্মান কোয়ান্টাম বিজ্ঞানী মাক্স বর্ন ছিলেন আইনস্টাইনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সারা জীবন দুজনের পত্রালাপ চলেছিল, তিনি সে-সময়ে বলেছিলেন, "আমরা অনেকেই এ-ব্যাপারটাকে ট্র্যাজেডি মনে করি। ট্র্যাজেডি তাঁর পক্ষে, তিনি একা পথ হাতড়াচ্ছেন। ট্র্যাজেডি আমাদের পক্ষে, আমরা আমাদের নেতা ও পতাকাবাহককে হারাচ্ছি।" এই সময়েই (৮ সেপ্টেম্বর ১৯২০) মাক্স বর্নের স্ত্রী হেডি একটি চিঠিতে আইনস্টাইনকে লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দ্য হোম অ্যাণ্ড দ্য ওয়র্ল্ড' আপনি অবশ্যই পড়বেন। এমন চমৎকার উপন্যাস আমি বহুকাল পড়িনি।" 'ঘরে বাইরে' আইনস্টাইন পড়েছিলেন কিনা জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন সত্যের প্রকৃতি নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সত্যের প্রকাশ মানুষের মধ্যে দিয়ে। আইনস্টাইন বলেছিলেন, সত্যকে গ্রহণ করতে হবে মানুষ নির্বিশেষে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে। "আমার কথাই ঠিক তা আমি প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু এই আমার ধর্ম।" নিরীশ্বরবাদকে অস্বীকার করে তারপরে

বলেছিলেন, "স্পিনোজার ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি, যে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন অস্তিত্বশীলের সামঞ্জস্যের মধ্যে।" সারা জীবনে বহুবার যে উপন্যাসটি তিনি বারে বারে পড়েছেন তার নাম 'ডন কুইক্সোট'—বিশ্ব-সাহিত্যের শুদ্ধতম আত্মা। আর পড়তেন গান্ধীজীর আত্মজীবনী—সত্যকে নিয়ে পরীক্ষাকার্য। কাজেই আইনস্টাইন যে জীবনের শেষ পঁয়ত্রিশটি বছর একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্বেই নিমগ্ন থাকবেন সেটাই প্রত্যাশিত। এই জীবন ব্যর্থ কিনা তা জানার জন্য উত্তরসূরীদের বিচারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

১৯১৯ সাল থেকেই জার্মানিতে আইনস্টাইন-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছিল। তার একটা প্রধান কারণ ছিল এই যে আপেক্ষিকতার তত্ত্বের আবিষ্কারক ইহুদী। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী সময়ে জার্মানির ইহুদী বিরোধী আবহাওয়ায় এই আন্দোলনের পিছনে কিছু মানুষকেও জড়ো করা গিয়েছিল। আন্দোলনের নেতা ছিলেন নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী ফিলিপ লেনার্ড। আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে আইনস্টাইনকে হত্যা করার প্ররোচনাও ছিল। ১৯২৩ সালের নভেম্বরে যখন হিটলারের নেতৃত্বে ম্যুনিখে সশস্ত্র অভ্যুত্থান হয়ে গেল, আইনস্টাইন কিছুকালের জন্য দেশের বাইরে গিয়েছিলেন।

১৯২৯ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে ৫০তম জন্মদিনে আইনস্টাইন সারা বিশ্ব থেকে অভিনন্দন লাভ করলেন। জার্মানির চ্যান্সেলর হেরমান ম্যুলারের পক্ষ থেকেও তাঁকে সম্মান জানানো হল। এক আউন্স তামাক উপহার পেলেন একজন জার্মান শ্রমিকের কাছ থেকে। অন্যদিকে আপেক্ষিকতা-বিরোধী কোম্পানী থেকে একটি পুস্তক প্রকাশিত হল—'আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে শত গ্রন্থকার'। আইনস্টাইন মন্তব্য করলেন, "আমি যদি ভ্রান্ত হই তাহলে একজনই তো যথেষ্ট।"

এই ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকেই প্রুশিয়ান আকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রথম ভাষ্য। কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলেও শেষ পর্যন্ত বিশেষ সাড়া জাগল না। আইনস্টাইন তাতে দমেন নি। কিন্তু বিচলিত হচ্ছিলেন বিশ্বের ঘটনাবলীতে কিছু বিপর্যয়ের সংকেত লক্ষ করে। প্যালেস্টাইনের ইহুদী বসতিস্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে আরবরা হিংস্র আক্রমণ শুরু করেছিল। জার্মানিতে নাৎসীরা ক্ষমতা দখল করছিল। লীগ অব নেশন্স-এর অথর্বতা প্রকাশ পাচ্ছিল (প্রতিবাদে আইনস্টাইন বুদ্ধিজীবী সহযোগিতা কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন)। নিউইয়র্কের শেয়ার-বাজারে ধ্বস নেমে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল।

১৯৩১ সালে আইনস্টাইন গিয়েছিলেন অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে। সেখানে বিজ্ঞান নিয়ে যেমন আলোচনা করলেন তেমনি শান্তিবাদের পক্ষে প্রচার চালালেন। এমনকি 'যুদ্ধ-প্রতিরোধীদের আইনস্টাইন আন্তর্জাতিক তহবিল' স্থাপনেও অনুমতি দিলেন। এমনিভাবে বিপুল এক জনমতের চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারিতে জেনিভায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ওপরে। পরে এই সম্মেলন অসার্থক হতে আইনস্টাইন তিক্ত হতাশাগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং জেনিভাতে এসে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ভণ্ডামির স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারিতে হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করে এবং নাৎসী সন্ত্রাস শুরু করে দেয়। আইনস্টাইন তখন ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে। তিনি আর জার্মানিতে ফিরে যাননি। নাৎসীরা জার্মানিতে তাঁর বাড়ি তছনছ করে দেয়, তাঁর ব্যাঙ্কের অর্থ বাজেয়াপ্ত করে, তাঁর বই পোড়ায়, এবং তাঁর মাথার ওপরে হাজার-পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করে।

আইনস্টাইন স্থির জানতেন যে নাৎসী জার্মানি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাই তিনি রোমাঁ রলাঁ ও অন্যান্য শান্তিবাদী বন্ধুদের হতচকিত করে এবং নিজের শান্তিবাদী আদর্শ বিসর্জন দিয়ে মুক্ত ইউরোপের উদ্দেশে ডাক দিলেন অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হতে এবং প্রতিরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে।

এবং এই মনোভাব থেকেই রুজভেল্টকে তাঁর সেই বিখ্যাত চিঠি লিখে পরমাণু-বোমা তৈরির কথা বলেছিলেন। ১৯৪৫ সালে তিনিই আবার চিঠি লিখে রুজভেল্টকে অনুরোধ করেছিলেন সামরিক উদ্দেশে এই বোমা ব্যবহার না করতে।

তাঁর জীবনের শেষ কীর্তি নিউক্লিয়র যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি এবং রাসেল-আইনস্টাইন ইস্তাহারে স্বাক্ষরদান। ইস্তাহারটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর (১৮ এপ্রিল, ১৯৫৫) পরে। এই ঐতিহাসিক ইস্তাহার থেকেই বিজ্ঞানীদের পাগওয়াশ সম্মেলনের উদ্ভব।

'মাইন ভেল্ট্‌বিল্ট' (আমার বিশ্বের চিত্র) নামে প্রকাশিত (১৯৩৪) রচনা-সংকলনের নাম-প্রবন্ধে আইনস্টাইন বলছেন, "দার্শনিক অর্থে মানব স্বাধীনতায় আমার আদৌ বিশ্বাস নেই। প্রত্যেক মানুষ কাজ করে শুধু বাইরের বাধ্যবাধকতায় নয়, আভ্যন্তরিক প্রয়োজন অনুসারেও।

শোপেনহাওয়ারের এই উক্তি—'মানুষ যা চায় তা সে করতে পারে, কিন্তু মানুষ যা চায় তা সে চাইতে পারে না'—যৌবনকাল থেকেই আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব অনুপ্রেরণা হয়ে থেকেছে।"

আইনস্টাইন জীবনভোর প্রমাণ রেখে গিয়েছেন তাঁর স্থান আরও উঁচুতে। তিনি যা চেয়েছেন তা করতে পেয়েছেন, উপরন্তু যা চেয়েছেন তা চাইতেও পেরেছেন।

পরশুরাম : ব্যক্তিগত বিবেচনা

পবিত্র সরকার

১

যে জীবনীলেখক ইদানিংকালকার অস্ত্রেশস্ত্রে—অর্থাৎ মনোবিকলন, প্রতিমাবর্ষণ, পূজা ও শরণাগতিতে স্বাস্থ্যকর অবিশ্বাস ইত্যাদি—নিয়ে পরশুরামকে শিকার করতে উদ্যত হবেন, তাঁকে খুবই হতাশ হতে হবে। পরশুরাম মানুষটির জীবনে কোনো প্রকাশ্য নাটকীয়তা নেই। সম্প্রতি তাঁর যে গ্রন্থাবলি বেরিয়েছে তাতে তাঁর লেখক-ব্যক্তিত্বকে পরশুরাম ও রাজশেখর বসু—এই দুভাগে ভাগ করা সম্ভব হয়েছে। এ ব্যবস্থা পরশুরামের অনুমোদিত সন্দেহ নেই—তিনি নিজেই ঐ দুটি নাম দুই পৃথক উপলক্ষে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই জিনিসটা নিয়ে যে কোনো বাঙালি এরিক এরিকসন তাঁর মধ্যে লোভনীয় ব্যক্তিত্ব-বিভাজন বা স্কিৎসোফ্রেনিক ধুন্ধুমার আবিষ্কার করবেন, তারও সুযোগ যৎসামান্য। বেঙ্গল কেমিক্যালের উঁচু কর্মকর্তা বলে গল্প লিখতে গিয়ে নিজের নাম দিতে চান নি, ছদ্মনাম নেবার কথা ভাবছিলেন। কী ছদ্মনাম নেবেন তাও দীর্ঘদিন ধরে ভাবনাচিন্তা করেন নি, বাড়িতে অলঙ্কারনির্মাতা পরশুরাম এসে পড়ায় একদিন ওই নামটি নেওয়াই ঠিক ক'রে ফেললেন। ঠিক এই নামটি হঠাৎ পছন্দ করার মধ্যে কতখানি প্রস্তুত ভাবনা আছে, কতখানিই বা আকস্মিক—এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু তা থেকে পরশুরাম ও রাজশেখর বসুর চরিত্রের মধ্যে দ্বিধা, দূরত্ব বা লড়াই কল্পনা করা সহজ নয়। তা ছাড়া, তাঁর জীবনে কাজ বা অভিজ্ঞতার দুর্ধর্ষ বৈচিত্র্যও এমন কিছু নেই যে, তা নিয়ে

চটকদার কিংবদন্তি তৈরি করা যাবে। পি. জি. উডহাউস নামক যে মার্কিন প্রবাসী ইংরেজ লেখকের গল্প পরশুরাম একবার বাংলা চেহারায় ঢেলেছেন ('রাজমহিষী', 'আনন্দীবাঈ' ইত্যাদি গল্প), সে ভদ্রলোক ফ্রান্সে জার্মানদের হাতে বন্দী হয়েছেন, বন্দীশিবিরে থাকার সময় টস্ট সহর থেকে জার্মানদের সামরিক রেডিয়োতে এমন বক্তৃতা করেছেন যাকে বন্দীশিবিরের সুখ ও সুব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রচার বলেও অনেকে ব্যাখ্যা করেন, তারপর তাঁর নাটকের অভিনয়দলের সঙ্গে মার্কিনদেশের 'রোড'-এ, অর্থাৎ সহরে সহরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, ফলে দুজনেই হাসিলেখক হওয়া সত্ত্বেও দুজনের জীবনের তুলনা কি করে সম্ভব ? দুই সংস্কৃতির, বিশেষত অত্যুন্নত ও উন্নতিশীল অর্থনীতির দুই সংস্কৃতির মানুষের তুলনা কেবল তাদের বাইরের সাদৃশ্য দেখে করা উচিত নয়। এক সংস্কৃতিতে জীবনের যে বৈচিত্র্য প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক, অন্য সংস্কৃতিতে তাই হয়তো উৎকেন্দ্রিক এবং ডিভিয়াণ্ট।

কাজেই পরশুরাম আমাদের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির দেশে আধা খ্যাঁচড়া ধনতন্ত্রের উদ্ভবের কালে, সামন্ততন্ত্রের সামাজিক-পারিবারিক সংগঠনের মধ্যে বাঁধাধরা পথেই বেড়ে উঠেছেন। বাঙালির গ্রামীণ সমাজ শাসনের রীতি মেনে মামাবাড়িতেই জন্মেছেন (১৬ মার্চ, ১৮৮০) বর্ধমানের বামুনপাড়া গ্রামে, শৈশবে 'ফটিক'—এই অতিশয় বাঙালি ডাকনামও উপার্জন করেছেন। যথানিয়মে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উৎরেছেন দ্বারভাঙ্গা রাজ স্কুল (১৮৯৫), এফ. এ. সেরেছেন পাটনা কলেজে (দ্বিতীয় বিভাগ, ১৮৯৭), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি. এ (দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছ-নম্বর, ১৮৯৯), কেমিস্ট্রিতে করেছেন এম. এ. (দ্বিতীয় শ্রেণী, প্রথম স্থান, ১৯০০), তারপর উচ্চ-মধ্যবিত্ত তখনকার ভারতীয়ের জাতীয় কর্তব্য অনুসারে আইনের ডিগ্রিও নিয়েছেন একটি (১৯০২)। অতঃপর বেঙ্গল কেমিক্যালে রাসায়নিক হিসেবে প্রবেশ (১৯০৩) এবং ডিরেক্টরের সর্বোচ্চ চেয়ারটি অধিকার করে, সে চেয়ারটির সম্মান ও অলঙ্কার অনেকখানি বাড়িয়ে, ১৯৩৩-এ অবসর গ্রহণ। এ জীবন সরলরৈখিক, ক্রমোন্নতিশীল এবং অব্যাহত। আঘাতসংঘাত নিশ্চয়ই ছিল, বিশেষত তাঁর কন্যা ও জামাতার প্রায় একই সঙ্গে মৃত্যু নিঃসন্দেহে খুব বড় আঘাত—কিন্তু তা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঐ একরৈখিক গতিকে বিপর্যস্ত করতে পারে নি। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, তিনি খানিকটা অসাড় স্বভাবের লোক। চারুচন্দ্র তার ব্যাখ্যা করেছিলেন গীতার 'মুনি'-তত্ত্ব এনে—দুঃখে তিনি অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে বিগতস্পৃহ, অনুরাগ,

ভয় এবং ক্রোধ তিনি পরিত্যাগ করেছেন। এই উপলক্ষেই পরিমল গোস্বামী ফরাসি Sangfroid (স'ক্রোয়া) কথাটি ব্যবহার করেছেন রাজশেখর সম্বন্ধে। তিনি আরো পরিষ্কার করে বলেছেন, "রাজশেখর কোনো বিষয়ে হঠাৎ উত্তেজিত হতে পারতেন না। এটি তাঁর স্বভাবের বিরোধী ছিল।" ('আমি যাঁদের দেখেছি', ১৯৬৯, ৭৫ পৃষ্ঠা)। পরে আমরা দেখব, এই স্বভাব তাঁর গল্প প্রবন্ধেরও বিশেষ একটি ধর্ম তৈরি করেছে। যাঁর ধাত এই রকম, জীবনীর উপাদান হিসাবে তাঁর আকর্ষণ বেশি নয়, কোনো নাটকীয় গল্পকথাও তৈরি করা যাবে না তাঁকে নিয়ে। নিজের সম্বন্ধে এমন নির্বাক লেখকই বা আর কোথায় ? নিজেরই সংবর্ধনা সভায় যে-ব্যক্তি সারাক্ষণ মুখ বুজে থাকার শর্তে উপস্থিত থাকেন এবং কদাচ সে-শর্ত ভাঙেন না—উত্তেজনালোভী জীবনীকারকে সহায়তা করার লোক তিনি নন।

২

তবে কি তিনি মানুষ হিসেবে নিরুত্তাপ ছিলেন, অনুভব যথেষ্ট সতর্ক, ত্বরিত ও উষ্ণ ছিল না তাঁর ? কেবল সমাজের প্রচলিত প্যাটার্ন অনুযায়ী নিজের জীবনকে তিনি একটি উন্নতির সদর রাস্তায় স্থাপন করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন, আর কোনো বৃহত্তর লক্ষ্য ছিল না তাঁর ? আমরা খুব ভালো করেই জানি যে, তাঁর সম্বন্ধে এই সব নেতিবাচক সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। রাজশেখর বসু সম্বন্ধে তো নয়ই—পরশুরাম সম্বন্ধেও নয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে কুঠারধারী করেছেন পরশুরাম এই ছদ্মনামের সূত্রে ('বাংলা গল্প বিচিত্রা', ১৩৭৮, ৩০-৪২ ; এই একই আলোচনায় পরশুরামের গল্পগুলি প্রসঙ্গে তাঁর আরেকটি মেটাফর হল "শরতের মেঘে বজ্র")—অর্থাৎ তিনি তাঁর স্যাটায়ারিস্ট চেহারাটিকেই লক্ষ্য করেছেন বেশি ; অন্যদিকে পরিমল গোস্বামী এমন অনুমানের প্রতিবাদ করছেন, বলছেন "তাঁর হাতে স্যাটায়ারিস্টের চাবুক ছিল না, ছিল ইক্ষুদণ্ড, তা দিয়ে আঘাতের ভঙ্গিতে তার রসটাই তাঁর পরিবেশনের লক্ষ্য ছিল।" পরিমল গোস্বামীর মতে কদাচিৎ বিশুদ্ধ স্যাটায়ার লিখেছেন রাজশেখর। কি ছিলেন তিনি, যথার্থত ?

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পরশুরামের গল্পের যে ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন, তাতে খানিকটা পরিমল গোস্বামীর কথাই প্রমাণিত হয়, তাঁর নিজের মেটাফর অসম্পূর্ণ প্রতিভাত হয়। প্রথম বই 'গড্ডালিকা'য় (১৩৩২) ব্যঙ্গ সামান্যই, রঙ্গ বা মজাটাই আসল। বিদ্রূপ নিশ্চয়ই আছে, 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী

লিমিটেড' বা 'মহাবিদ্যা'তে যেমন, কিন্তু তা সুইফ্‌টের তীব্র তির্যক চাবুক নয়। তা জ্বালা ধরায় না, পাঠকের মনে পাত্রদের সম্বন্ধে ক্ষোভ বিদ্বেষ বা অভিযোগ জাগিয়ে তোলে না, বরং 'It takes all sorts to make this world' গোছের একটা সহিষ্ণুতার জন্ম দেয়। 'কজ্জলী'র (১৩৩৫) গল্পগুলি সম্বন্ধে এই একই পাঁতি দেওয়া চলে। 'বিরিঞ্চিবাবা', 'জাবালি', 'দক্ষিণরায়', 'কচি-সংসদ', 'উলট-পুরাণ'—সর্বত্রই অল্পস্বল্প ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু সেখানেও ব্যঙ্গকে আচ্ছন্ন করে বেদম মজার, সহাস্য উপভোগের ব্যাপারটাই প্রধান হয়ে ওঠে। একটি উদাহরণ নিই। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে ঐ গুরুটি যদি আসল আক্রমণের লক্ষ্য হতেন তাহলে গল্পের ছাঁদটা এরকম হত কি না সন্দেহ। তেত্রিশ পৃষ্ঠার এই আখ্যানে বিরিঞ্চিবাবার প্রথম উল্লেখ এসেছে সপ্তম পৃষ্ঠায়। তার আগে খানিকটা পটভূমিকা তৈরি করা হয়েছে বটে, কিন্তু সেও খুব ঢিমে তেতালাভাবে, তড়িঘড়ি না করে এবং নানা ছেলেমানুষি ঘটিয়ে। চরিত্রগুলিকে চিনিয়ে দেবার পর এল বরদা-খুড়োর ইচ্ছাঘুমের গল্প—যার সঙ্গে 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের কোনো সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। আফিসে ছোটোসাহেবের কড়া নজরের ফলে চেয়ারে বসে ঘুমোবার সুযোগ না পেয়ে নিতাইয়ের 'চিত্তে সুখ নেই'—এই সূত্রেই আফিসের সেকাল ও একালের তুলনা এসেছে। নিতাইয়ের সাধু-সন্ন্যাসী এবং গুরু খোঁজার প্রাথমিক উপলক্ষ এই—আর তার সঙ্গে অবশ্যই যোগ করতে হবে "ঝি-বেটী পালিয়েছে, খুকীটার জ্বর, গিন্নী খিটখিট করছেন"। তারপরে একে-একে এই প্রসঙ্গগুলি পরপর আসছে :

১. মিরচাইবাবা—যিনি কেবল লঙ্কা খেয়ে থাকেন এবং তাঁর গুরু 'করাতের গুঁড়ো বাবা' ;
২. কাগমার্গ ;
৩. সত্য, তার পিসীমা ও চীনের আসন্ন যুদ্ধে তিন টন আরসোলা রপ্তানির প্রসঙ্গ ;
৪. পিসেমশায়ের প্রার্থনার জোরে পিসিমার তিন দিনের দিন দাঁত পড়ে যাওয়ার খবর ;
৫. রেডিও বাবা বা রাজশাহির তড়িতানন্দ ঠাকুর।

পিছনে তাকিয়ে বোঝা যায় যে লেখক আস্তে আস্তে বিরিঞ্চিবাবার দিকেই এগোচ্ছিলেন এতক্ষণ, কিন্তু পুরোটাই ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে করতে, তারিয়ে-তারিয়ে, খানিকটা মশকরার মেজাজে। তাই আমাদের সম্ভাব্যতার বোধ ও

প্রত্যাশাকে খানিকটা ঝুলিয়ে দিয়ে মহা খোশমেজাজে তিনি বিরিঞ্চিবাবার কাণ্ডে পৌছে যান। সে কাণ্ডও কম মজার নয়। বিরিঞ্চিবাবা হ য ব র ল-র উদো-বুধোর চেয়ে প্রচুর বেশি ক্ষমতা ধরেন, তাঁর হাতে একটি অলক্ষ্য টাইম মেশিন আছে (ওয়েলস্ সাহেবকে টাইম মেশিনের আইডিয়াটা হয়তো বাবাই দিয়ে থাকবেন—পরশুরাম সেটা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন)—যার ফলে ইতিহাসের পারম্পর্য তিনি তছনছ করে দিতে পারেন। এ সব খবর আমরা পাচ্ছি রিপোর্টিংয়ের মধ্য দিয়ে। বিরিঞ্চিবাবার চাক্ষুষ দেখা পাওয়া গেল সেই কুড়ি পৃষ্ঠায়। মাঝখানে আরো কিছু কিম্ভূত উল্লেখ ও বিবরণ ঢুকে পড়েছে—মেকিরাম আগরওয়ালার বরাত ফিরে যাওয়ার খবর এবং প্রফেসার ননির উদ্ভট এক্সপেরিমেন্টের বর্ণনা, মৌলবী বছিরুদ্দি ও দরোয়ান ফেকু পাঁড়ের চমৎকার দুটি টাইপ, এবং গনেশমামার 'হেঁ হেঁ' ও জামাইয়ের চাকরি লাভ বিষয়ে আগ্রহ। বিরিঞ্চিবাবার আবির্ভাবের পর তার সম্বন্ধে আগেকার খবরগুলিই নানা অনুপুঙ্খ ও শ্রোতাদের (বিশেষত মিস্টার সেনের) প্রতিক্রিয়ার যোগফলে পেটের মধ্যে হাসির দামামা আরম্ভ করে দেয়, সেখান থেকে দেবাদিদেব মহাদেবের "আঃ, ছাড়—ছাড়—লাগে, মাইরি এখন ইয়ারকি ভাল লাগে না—চাদ্দিকে আগুন ছেড়ে দাও বলছি" পর্যন্ত সেই হুল্লোড় অব্যাহত থাকে। এর মধ্যে ব্যঙ্গের কাঠিন্য যদি কিছু থাকে তার উপর দিয়ে হাসির অমল স্রোতধারা কলশব্দ করে বয়ে যায়। গল্পের শেষও প্রসন্ন মধুরতায়। কাজেই এ ধরনের গল্পে স্যাটায়ার খুব অস্পষ্ট ও দূরবর্তী থাকে, লেখক সে সম্বন্ধে খুব সহজেই আমাদের অন্যমনস্ক করে রাখেন। ব্যঙ্গ তাঁর উপজীব্য হলে বিরিঞ্চিবাবা এমন উপলক্ষ হয়ে থাকতেন না এ গল্পে। এ গল্প আসলে বিরিঞ্চিবাবার নয়, তার হবু, উপস্থিত না-হওয়া এবং ফসকে-যাওয়া শিষ্যদের—তাদের কিম্ভূত ইচ্ছা ও উদ্যমের, মানবিক লোভ, দুর্বলতা, বিশ্বাসপ্রবণতার ও বিস্ময়বোধের, তাদের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার। তারাই বিরিঞ্চি-বাবা শ্রেণীর জীবের জন্ম দেয়, লালন করে এবং শেষে ভক্ত ও ভৃত্য হয়। ব্যঙ্গ করতে হলে তাদেরই করতে হয়, কিন্তু তারা আমরাই—লেখকের স্বসম্প্রদায়। পরশুরাম কোন নিষ্ঠুরতায় তাদের আক্রমণ করবেন? সুতরাং সকলকেই ক্ষমা, গুরুকে এবং বিশ্বাসী নির্বোধদের। ক্ষমা ব্যঙ্গের চরিত্রই বদলে দেয়। বিরিঞ্চিবাবাকে, অর্থাৎ তার জোচ্চুরি ও ভণ্ডামির ব্যাবসাকে যদি ব্যঙ্গ করাই উদ্দেশ্য হত পরশুরামের, তাহলে এমন ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে বলতেন না তার গল্প, তার প্রকট কীর্তিকাহিনীকে ফেলতেন না এমন

একপাশে এনে, শেষ করতেন না মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণীর সরল ও ইচ্ছাপূরক রাগ-অনুরাগের আভাসে। অন্তত এ পর্বে তিনি কুঠার হানছেন না। এখনও তিনি উদার, সহিষ্ণু, প্রসন্ন।

অসহিষ্ণুতা বা অপ্রসন্নতা দেখা দেয়—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যেমন লক্ষ করেছেন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে এসে। এর আগে গল্প লেখার পাশাপাশি তিনি তাঁরই কথামত "আধা মিস্ত্রি, আধা কেরাণী"র কাজ করে গেছেন, —অর্থাৎ "বানান ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া মিস্ত্রির কাজ, রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ কেরাণীর কাজ।" (সাহিত্যিকদের সংবর্ধনার উত্তরে, ১০ জানুয়ারি, ১৯৬০)। প্রবন্ধও একটি দুটি লিখতে শুরু করেছেন ১৩৩০ থেকে—তখন গড়ে বছরে প্রায় আধখানা করে। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে লেখা 'লঘুগুরু'-র (১৩৬৯-র তৃতীয় সংস্করণে এ শ্রেণীতে দশটি প্রবন্ধ পড়বে) প্রবন্ধগুলি যদি দেখি, তাহলে লক্ষ করি যে, এগুলিতে রসিকতা যত, আক্রমণ তত নেই। 'নামতত্ত্ব' (১৩৩০)-এর শুরু "হরিনাম নয়, সাধারণ বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের নামের কথা বলিতেছি।" 'ডাক্তারি ও কবিরাজি' প্রবন্ধটিতে কাজের কথা যথেষ্ট আছে—কিন্তু তর্কের চেহারাটা অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' নামক রঙ্গরচনাটির মতো, খানিকটা কৌতুকাবহ। 'ভদ্র জীবিকা' (১৩৩২)-র শেষে একটু বিদ্রূপ আছে—"নিজের দাঁড়িপাল্লা নিজের হাতে ধরিলেই বাঙালীর ভাবের উৎস শুকাইবে না"—কিন্তু তা যৎসামান্য খোঁচা মাত্র। এ শ্রেণীর প্রবন্ধগুলিতে তিনি আমাদের অজ্ঞতার খোলসগুলি ভাঙবার চেষ্টা করেছেন, বিমূঢ়তাকে নাড়া দিয়েছেন, কুসংস্কারকে উপহাস করেছেন, কিন্তু তীব্র উক্তি কোথাও নেই—যেমন আছে যুদ্ধের আবহে লেখা 'খ্রীষ্টীয় আদর্শ' (১৩৪৯) প্রবন্ধে—…"রাজনীতিক মৈত্রী আর বারবনিতার প্রেম একজাতীয়।" অর্থাৎ যুদ্ধের সময় থেকেই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে থাকে, উদারতায় টান পড়ে। 'তিথি' (১৩৪৯) প্রবন্ধটিতেও তাই ঘটতে দেখি।

বেশ ছিলেন, গল্প লিখছিলেন খানিকটা 'ঠাট্টা তামাশা' করে—নিজে না রেগে, অন্যদের না রাগিয়ে। তিন ধরনের গল্প পাই তাঁর কাছ থেকে—বৈঠকী ধাঁচের গল্প—যাতে ভূত-প্রেত, মানুষের বাঘ হওয়া, মুণ্ডু ট্র্যানসপ্ল্যাণ্ট ইত্যাদি কিম্ভূত কাণ্ডকারখানা একটু বেশি আসে। লেখকের নিজের জবানিতে সোজাসুজি বলা হলেও, অর্থাৎ direct narration থাকলেও

মেজাজের দিক থেকে এ ধরনেরও অনেক গল্প বৈঠকী—যেমন 'চমৎকুমারী' ইত্যাদি গল্প (১৮৮১ শকাব্দ)-এর 'উৎকোচ তত্ত্ব', 'নীলতারা ইত্যাদি গল্প'-র (১৩৬৩) 'জয়হরির জেব্রা' ইত্যাদি। তারপর আছে কাব্যপুরাণের সম্প্রসারণ জাতীয় গল্প। অর্থাৎ ব্যাস-বাল্মীকি-ভাস যা ভ্রমক্রমে লিখে যেতে পারেন নি, তা আমি লিখছি, কিছু উহ্য আখ্যান জুড়ে দিচ্ছি। সে সবই অবশ্য নতুন পুরান. আধুনিক কালের মানুষের সম্ভতন ভাষায় লেখা,—সেখানে মুনি-ঋষিরাও একালের অনুষঙ্গে কথা বলে। এগুলি মূল পুরাণের দেহে লগ্ন হতে পারবে না, প্রাগ্-আধুনিক কালে মৌখিক সাহিত্যের সে নিয়ম এখানে খাটবে না। 'তৃতীয় দ্যূতসভা', 'পুনর্মিলন', 'যযাতির জরা', 'নির্মোক নৃত্য', 'ভীমগীতা' এমন-কি মধ্যপ্রাচ্যের অথবা আরব্য-উপন্যাসের স্বকপোলকল্পিত উপসংহার 'গুলবুলিস্তান'-ও এই পর্যায়ে পড়ে। এরই একটা বিস্তার হিসেবে প্রাচীন চরিত্রগুলিকে একালের পৃথিবীতে ছিটকে এনে ফেলে কিছু মজার কাণ্ড বাধিয়েছেন লেখক—যেমন 'চিরঞ্জীব', 'ভরতের ঝুমঝুমি', 'গন্ধমাদন বৈঠক' (এ গল্পে বিভীষণের মুখে "ঘোড়দৌড়ের হ্যাণ্ডিক্যাপ" পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে)। তৃতীয় এক ধরনের গল্প খানিকটা অতিরঞ্জিত ডকুমেন্টেশনের মতো—'বিরিঞ্চিবাবা' যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চারপাশে যা ঘটছে বা চোখে পড়ছে তাকে একটুখানি বাড়িয়ে, একটু উদ্ভটত্বের প্রলেপ মাখিয়ে আরো চিত্তাকর্ষক চেহারা দেওয়া। এ সব গল্পের চরিত্রগুলিকে প্রমথনাথ বিশি 'আবিষ্কার'ধর্মী বলেছেন,—অর্থাৎ তারা ছিলই—লেখক শুধু আমাদের দৃষ্টির বৃত্তাকার সীমার ঠিক মাঝখানটিতে এনে তাদের বসিয়ে দিলেন। 'আবিষ্কার' কথাটাকে ঠিক আক্ষরিক অর্থে নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ ঐ অতিরঞ্জনটুকু আছে এখানে—ফলে তারা লেখকের সৃষ্টিও বটে। আবার ধারণার ভিত্তি হিসেবে কথাটিকে গ্রহণ করতেই হয়—কারণ এ সব চরিত্রের 'টাইপ' বা আদল নিশ্চয়ই সশরীরে ছিল লেখকের অভিজ্ঞতায়। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'চিকিৎসা-সংকট' 'বদন চৌধুরীর শোকসভা' ইত্যাদি গল্প এখানে আসছে। এতে 'আবিষ্কার' ও 'সৃষ্টি' দুইই ঘটছে বললে অন্যায় হয় না।

ফর্মের দিক থেকে কোনো গল্প চরিত্র-নির্ভর—অর্থাৎ মানুষগুলির নির্দিষ্ট প্রবণতা ও ক্রিয়াকর্ম থেকে গল্পটি জমছে এগোচ্ছে ও শেষ হচ্ছে—যেমন 'জাবালি', 'বিরিঞ্চিবাবা', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'উৎকোচ-তত্ত্ব' ইত্যাদি; কিছু গল্প গল্প সিচুয়েশন-নির্ভর, সেখানে ঘটনার নাগরদোলায় চড়ে বসেছে চরিত্র, গল্পের মজাটাও ঘটনার আকস্মিকতা, অভাবনীয়তা ইত্যাদির জন্যই

তৈরি হচ্ছে। 'ভুশণ্ডীর মাঠ', 'পরশ পাথর', 'চিঠি বাজি', 'প্রেমচক্র' ইত্যাদি পড়লেই পাঠক জিনিসটা ধরে ফেলবেন। এই পর্যায়ে তিনটি অন্ত্য-চমৎকারী গল্প লিখেছেন পরশুরাম 'হনুমানের স্বপ্ন' বইয়ে—'পুনর্মিলন', 'উপেক্ষিত' ও 'উপেক্ষিতা'। আর কোথাও তাঁকে পাঠককে এভাবে চমকে দিতে দেখি না। তাঁর আর সব গল্পেই উপসংহারটি খানিকটা প্রত্যাশিত, শেষ অনুচ্ছেদ আসার কিছু আগে থেকেই পাঠক তা আঁচ করতে শুরু করে দেয়, এবং শেষের তৃপ্তিটুকুর জন্য একটু প্রস্তুত থাকে। কিন্তু এই তিনটি গল্পে তিনি শেষ পর্যন্ত পাঠককে উৎকণ্ঠিত রাখেন, এবং হঠাৎ আরেক বাঙালি লেখক বনফুলের ধরনে—হুড়মুড় করে তার উপর প্রজ্ঞার বোমাটি নিক্ষেপ করেন। এ ফর্ম পরশুরামের ধর্মানুমোদিত নয়, ফলে, সৌভাগ্যবশত, এই তিনটি সংক্ষিপ্ত এবং দুর্বল গল্প লিখেই তিনি এ ফর্মটিকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর গল্প পড়া মানে দুপাশের রস চাখতে চাখতে এগনো। শেষে পৌঁছবার আগেই পাঠক যথেষ্ট পুরস্কৃত হয়ে যায়। উৎকণ্ঠায় নয়, আস্বাদনে তাঁর গল্পের মূল্য।

গল্পের এই অসম্পূর্ণ জরিপ শেষ করার আগে যে গল্পগুলির কথা বলা আমাদের খুব দরকার আমরা সব কিছুর মধ্যে আসলে মানুষটিকে খুঁজছি বলে—সেগুলি পরশুরামের ব্যক্তিগত মন্তব্যের বাহন, সেগুলির মধ্য দিয়ে তিনি নিজের কোনো বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত বা দর্শন আমাদের কাছে উপস্থিত করতে চান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকেই এই পর্ব শুরু হল, প্রাবন্ধিক রাজশেখর বসু স্বসম্প্রদায় ও মানবজাতির বৃহত্তর শুভাশুভ নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন এবং মাঝেমাঝেই পরশুরামের এলাকায় হানা দিতে লাগলেন। 'গামানুষ জাতির কথা' দিয়ে এই প্রবণতার আরম্ভ, কিন্তু 'জাবালি'তে এর পূর্বসূত্র নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ব্রহ্মা ঐ গল্পে জাবালির কাছে কাঙাল হয়ে বর দেওয়ার অনুমোদন প্রার্থনা করে বললেন, "হে মহাত্মন, তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া যুগে যুগে লোকে লোকে মানবমনকে সংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে থাক" ('কজ্জলী', ৫৮ পৃষ্ঠা)। আসলে এই বর শেষ পর্যন্ত পরশুরাম নামক লেখকেই বর্তেছে। কৌতুকরঙ্গের গল্প লেখার পাশাপাশি প্রবন্ধও লিখে গেছেন তিনি, কিন্তু তাতে প্রত্যাশামতো কাজ হয় নি। এই হতাশা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এসে প্রচ্ছন্ন তিক্ততার চেহারা নিল পরশুরামের মধ্যে। 'গল্পকল্প' (১৩৫৭)-এর গল্পগুলিতেই মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায় তর্ক বাড়ছে, আখ্যান সংক্ষেপিত হচ্ছে। 'গামানুষ জাতির কথা'

অধিকাংশত তর্ক, 'অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা'-ও 'তর্ক'—তার এখানে তা নিজের সঙ্গেই, তার আর কোনো সাক্ষাৎ প্রতিপক্ষ নেই সোক্রাটিসের ডায়ালগের ধরনে। তর্ক আছে 'রামরাজ্য'-এ, 'শোনা কথা'-য়, 'তিন বিধাতা'-য় 'ভীমগীতা'য়। 'রামধনের বৈরাগ্য'-তে ('ধুস্তরী মায়া', ১৩৫৯) আছে ঐ স্বগত-তর্ক। 'অক্রূর-সংবাদ', 'গন্ধমাদন বৈঠক', 'মাৎস্য-ন্যায়' ইত্যাদি গল্পেও তর্কের অন্ত নেই। ফলে একটি অভাবনীয় জিনিস ঘটছে পরে,—এই ডায়ালগের ছকে একটি প্রবন্ধও লিখে ফেললেন রাজশেখর বসু—'চলচ্চিন্তা'য় 'আমিষ নিরামিষ'। শুধু ফর্মের ক্ষণিক বিনিময় নয়, ১৩৫০-এর পর থেকে তাঁর গল্প ও প্রবন্ধে চিন্তার বিনিময়ও অহরহই ঘটে। কিন্তু এ সময়কার গল্পে চিন্তা অনেক বেশি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য, গল্প বলতে গিয়ে নিজের মনের একটি টুকরো তিনি পাঠকদের দেখিয়ে দিতে উৎসাহ বোধ করছেন। আগে সেটা এমন ভাবে কখনোই করেন নি। এবং 'জাবালি'র ধরনে গল্পের কিছু কিছু চরিত্রের সঙ্গে নিজের আংশিক একীকরণ বা আইডেন্টিফিকেশনের চেষ্টাও লক্ষ্য করি তাঁর মধ্যে—যেমন 'ভীম গীতা'র ভীমের সঙ্গে—কর্মে না হোক, অন্তত চিন্তায়; 'সিদ্ধিনাথের প্রলাপ'-এ সিদ্ধিনাথের সঙ্গে—সিদ্ধিনাথ একেবারে প্রাবন্ধিক রাজশেখরের শৈলীতেই কথা বলে। 'শোনা কথা'র মাস্টারও তাই।

৪

'ভীম গীতা'য় ভীম বলছে, "আমি কাপুরুষ অমানুষ নই, ধর্মভীরু পুরুষশ্রেষ্ঠও নই, আমি মধ্যম পাণ্ডব, সকল বিষয়েই মধ্যম।" এই 'মধ্যম' কথাটির দুবার ব্যবহারের মধ্যে রাজশেখর-পরশুরামের ব্যক্তিত্বের ভিতরকার ভিতটা ধরা পড়ে। কোনো উৎকেন্দ্রতা বা ঐকান্তিকতা (extremism) তাঁর স্বভাবে নেই, অথচ কখনো মৃদুভাবে, কখনো আরেকটু তীব্রভাবে, বাঙালি, ভারতবাসী বা মানবগোষ্ঠীর জন্য তাঁর দুর্ভাবনা জাগে, পরিবর্তনের ইচ্ছা তাঁকে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত করে—এবং এই উত্তেজনা নিজে বহন বা প্রকাশ করতে চান না তিনি, তা হস্তান্তর করতে চান। 'সাহিত্যিকের ব্রত' (১৩৫৮) প্রবন্ধে রাজশেখর বলছেন,

"আমাদের প্রয়োজন হ্যারিয়েট বীচার স্টো এবং দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় শক্তিশালী বহু লেখক—যাঁরা সামাজিক পাপের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করতে পারবেন।"

'বিচিন্তা' (পরশুরাম গ্রন্থাবলী, ৩য় খণ্ড, ৪৫৯ পৃষ্ঠা)

তবে কি নিজে যথেষ্ট জড়িত হতে চান না তিনি, সার্ত্র যাকে বলেন engagé, সেইরকম? এইখানেই ভীমের সঙ্গে তাঁর তফাৎ, উঁচুগ্রামের উচ্চারণে এবং সক্রিয়তায় তাঁর একটি চারিত্রিক সঙ্কোচ আছে। শ্রীমতী প্লেটো বা দীনবন্ধু মিত্রকে বরাত দেবেন তিনি, নিজে সত্যি সত্যি কুঠার ধরবেন না ধ্বংসের প্রবল উদ্দেশ্যে। একটু বিদ্রূপ, একটু তির্যক, ক্বচিৎ তিক্ত ইঙ্গিত—তার বেশি কিছু নয়। বেশিরভাগই হাস্যরোলের মধ্য দিয়ে একটা কিছু বলার চেষ্টা, তাতে বলার কথাটা চাপা পড়লেও ক্ষতি নেই। অথচ পরিষ্কার বোঝা যায় বাংলা সাহিত্যে এই একটি অসাধারণ মানুষ এসে পড়েছে যিনি মুক্তবুদ্ধি, অসাম্প্রদায়িক, উদার, কুসংস্কারদ্বেষী। বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে যত অপবিশ্বাস, দুর্বুদ্ধি (bigotry) আর ভণ্ডামি আছে—সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে তাঁর বিক্ষোভ মিথ্যাচার, জ্যোতিষ বিচার, গুরুর ব্যাবসা, ভূত-প্রেত ও অন্যান্য অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, প্রগল্‌ভতা—এ সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে তাঁর নিজের ধরনে আক্রমণ চালিয়েছেন তিনি। এবং সেক্ষেত্রেও তাঁর অগ্রাধিকার সুনির্দিষ্ট ছিল, তিনি বলেছেন,

"রাজনীতির চেয়ে মনুষ্য আর সমাজধর্ম বড়। দেশের সাহিত্যিকেরা সামাজিক কর্তব্যবুদ্ধি জাগরিত করার চেষ্টা করুন।" (পূর্বোল্লেখ)।

অথচ ঐ একই প্রবন্ধে উদারভাবে জানান, "কোনও কাব্য নাটক বা গল্পে যদি মতবিশেষের সমর্থন থাকে তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই।" (পূর্বোল্লেখ, ৪৫৫ পৃষ্ঠা)। এই মানুষটি জন্মশাসন ও জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে ('ষষ্ঠীর কৃপা' গল্প—'ধুস্তরী মায়া ইত্যাদি গল্প' এবং 'বিচিন্তা'র 'জন্মশাসন ও প্রজাপালন' প্রবন্ধ), বাঙালি পুরুষেরা কাজেকর্মে পাজামা-পাঞ্জাবি এবং বাঙালি মেয়েরা স্কার্ট বা স্ল্যাক্‌স পরলে সুখী ('আমাদের পরিচ্ছদ'—'চলচ্চিন্তা'), বাংলা সাহিত্যের অসাম্প্রদায়িক বিকাশ এঁর কাম্য ('কবির জন্মদিনে', 'বিচিন্তা'), এবং সবচেয়ে যেটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা—শ্রেণীহীন সমাজের জন্য এঁর মধ্যে একটি ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে।

"এই আশা করা যেতে পারে—মানুষের ন্যায়বুদ্ধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে, তার ফলে শ্রেণীগত বৈষম্য কমবে।"

'অশ্রেণিক সমাজ', 'বিচিন্তা'

('পরশুরাম রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, ৫২৬ পৃষ্ঠা)।

ফলে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অনুকরণ না করেও সেখান থেকে 'অনেক কিছু' শেখার আগ্রহ তাঁর কমছে না, আর তাঁকে বলতে হচ্ছে—

"চীনের শাসনতন্ত্রে যতই স্বেচ্ছাচার নির্দয়তা আর কুটিলতা থাকুক, প্রজার স্বাধীন চিন্তা যতই দমিত হক, সে দেশের জনসাধারণের যে নৈতিক উন্নতি হয়েছে তা অগ্রাহ্য করা যায় না।"

'ধর্মশিক্ষা', 'চলচ্চিন্তা', (রচনাবলী, ৩য়, ৫৫০ পৃষ্ঠা)।

আর পরিবর্তনের জন্য দশ-বিশ হাজার বছর অপেক্ষা করবেন কি তিনি? তাও নয়। 'গন্ধমাদন বৈঠক'-এ নিজের অর্থাৎ পরশুরামের জবানিতেই বলেছেন,

> "ও সব চলবে না বাপু, আমি এখন বিষ্ণুর কাছে যাচ্ছি। তাঁকে বলব, আর বিলম্ব কেন, কল্কিরূপে অবতীর্ণ হও, ভূভার হরণ কর, পাপীদের নির্মূল করে দাও, অলস অকর্মণ্য দুর্বলদের ধ্বংস করে ফেল, তবেই বসুন্ধরা শান্ত হবেন। আর, তোমার যদি অবসর না থাকে তো আমাকে বল, আমিই না হয় আর একবার অবতীর্ণ হই।"

এই উষ্মা ও তীব্রতা তাঁর ক্ষেত্রে স্থায়ী হয় নি, কিন্তু কোথাও একটা বোধ হিসেবে সক্রিয় ছিল হয়তো। তাই তাঁর গল্পে তারাই সৎ বা মহৎ মানুষ হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে যারা অতি সামান্য লোক, গরিব ও তথাকথিত শিক্ষাহীন—মোটর ওয়ার্কসের মিস্ত্রি ভূষণ পাল ('ভূষণ পাল'—'চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প') বা বাণপ্রস্থে এককড়িতে রূপান্তরিত দশকরণ। পরশুরাম তাদের কথা খুব বেশি লেখেন নি, এই যা দুঃখ।

কিন্তু ওয়ার্ডস্বার্থীয় সরল বিশ্বাসের বাইরেও কোনো একটা বড় সত্যের ভাবনা তাঁর ছিল।

আরতির শিখা

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

'শ্রীমতী! তুমি!' আশ্চর্য হলেন অজাতশত্রু।

'আমি, মহারাজ। আপনার দাসী।'

'দাসী! তোমার ব্যবহার তোমার উক্তিকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে।'

'এ রাজ্যে সবাই আপনার দাস মহারাজ। রাজ-উদ্যানে আমরা যারা আপনার রক্ষিত নটী, তারা তো বটেই।'

'আমার দাস হয়ে তুমি অশোকচৈত্যে পূজা দিয়েছ—দীপাবলী সাজিয়েছ!' ক্ষুব্ধ অজাতশত্রু: 'কালও তুমি একটি প্রদীপ জেলেছিলে? এই যে সেই প্রদীপটা।'

'কাল প্রদীপটা জ্বালতেই দমকা হাওয়ায় আলোটা নিবে গেল। আজ তাই অনেকগুলি দীপ এনেছিলাম। কিছু নিবলেও কিছু থাকবে।'

'আমি ঘোষণা করেছি, অশোকচৈত্যে যে পূজা দেবে বা দীপ জ্বালবে, তার প্রাণদণ্ড হবে। এ রাজাজ্ঞা তুমি শুনেছ?'

'শুনেছি, মহারাজ।'

'শুনেছ! তারপরেও তোমার এই দুঃসাহস!'

'মহারাজ, মানুষের একটা অংশ দাস—অন্নের জন্যে, আরো অনেক কিছুর জন্যে। আর একটা অংশ, সে তো কারুর দাস নয়।'

'কারুর দাস নয়!' স্তম্ভিত অজাতশত্রু।

'কথাটা আপনার কাছে নতুন। তাই অন্যভাবে বলি। আমার ভেতরে একটা অংশ আছে, যে বুদ্ধের দাসী।'

'বুদ্ধ! সেই সনাতনধর্ম-বিরোধী পাষণ্ড!'

'সেই বুদ্ধ যিনি আমার ভেতরে আলো জ্বেলে দিয়েছেন, যিনি আমাকে দেবপূজার অধিকার দিয়েছেন।'

'সেই পাষণ্ডের সঙ্গে তোমার কবে দেখা হলো?'

'তাঁর সঙ্গে দেখা—! না। একদিন তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম। ঐ অশোকতলে। তখন মগধের রাজা ছিলেন আপনার পিতা বিম্বিসার।

'হ্যাঁ, পিতা বুদ্ধ-ভক্ত ছিলেন। ঐ অশোকতলে পাষণ্ড গৌতমকে অভ্যর্থনা করেছিলেন।'

'আমি তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বললেন—তুমি ছোট নও, তুমি সবার সমান; তুমি অশুচি নও, মানুষ অশুচি হয় না, তুমি মানুষ, তুমি শুচি।'

এই অশোকতলেই বিম্বিসার চৈত্য নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেখানে নারীরা যেত সন্ধ্যায়—দীপ জ্বালাতে পূজা দিতে। শ্রীমতীও যেত। কিন্তু এই বেশে! মৃত্যুদণ্ড কী করে হানবেন শ্রীমতীর ওপরে এই চিন্তায় তার বেশবাসের দিকে এতক্ষণ বুঝি লক্ষ্য পড়ে নি অজাতশত্রুর।

'এ কী পরেছ—এই পীতবস্ত্র।'

'আমার পূজার বেশ।'

'পূজার বেশ! সর্বাঙ্গে পীতবর্ণ দেখলে আমার মনে হয়, পিত্তের ব্যাধি হয়েছে। যাও, পোষাকটা পালটে ফ্যালো।'

'আজ আর আমি পালটাবো না। অনেকদিন পোশাক বদলে বদলে কেটেছে আমার। মহারাজা বিম্বিসার অশোকচৈত্য স্থাপন করলেন। আমি সেখানে পূজা দিতে যেতাম, দীপ জ্বালাতে যেতাম। পরনে থাকতো খুব সামান্য এক বেশ। মনে মনে ভাবতাম, এই আমার পীতবস্ত্র। তারপরে ফিরতাম আপনার প্রমোদ-উদ্যানে, আমার নটীর আলয়ে। রাত্রে আপনি আসতেন, তাই সে-বেশ ছেড়ে পরতাম আমার নটীর বেশ। বর্ণে বিচিত্র, মূল্যে মহার্ঘ, হীরা-মুক্তার চমক।'

'সে-পোষাক এর চেয়ে কত সুন্দর ছিল।'

'সুন্দর! জানি না। সে-পোষাক পরলে জানি, শুধু পোষাকটাকেই

দেখা যায়। আর এই পোষাক বড় বিনীত, মানুষটাকে ফুটে উঠতে দেয়।'

'পীতবস্ত্রের পতাকা রাজশক্তির নাকের সামনে বড় উদ্ধত ভঙ্গিতে নাচে। সেই ঔদ্ধত্যের শাস্তি হিসেবে বহু বৌদ্ধ শ্রমণকে আমি হত্যা করেছি।'

শ্রীমতী করুণভাবে বলে, 'জানি। নিহতদের মধ্যে একজন আমার ভাই।'

'তোমার ভাই!'

'সে শ্রমণ হয়েছিল।'

'তুমি তোমার ভাইয়ের খবর রাখো নাকি?'

'রাজার চর আমাকে সুন্দরী বিবেচনা করে গৃহভূমি থেকে ছিন্ন করে নিয়ে এসেছিল। রাজভোগে অর্পণ করেছিল আমাকে। নৃত্যগীত শিখিয়ে আপনাকে তুষ্ট করবার জ্ঞান দিয়েছিল। সেই সঙ্গে রাজপ্রাসাদ ও দীনের কুটীরের মধ্যে প্রাচীর উঠে গিয়েছিল। কিন্তু তাও নানা ভাবে আমি তাদের খবর রাখতাম। ভাই শ্রমণ হয়েছিল, আর নিশ্চিতভাবে জেনেছি—' শ্রীমতী কান্না চাপবার চেষ্টা করে।

'ও কথা থাক, শ্রীমতী।' অজাতশত্রু শ্রীমতীর মাথায় আস্তে হাত বুলিয়ে দেন। 'শ্রীমতী, তুমি কি চাও যে আমার মৃত্যু হোক?'

'না, না।' শিউরে ওঠে শ্রীমতী।

'আমি যদি আজ পীতবস্ত্রের হত্যা না করি, তাহলে ওরা আমাকে কাল হত্যা করবে।'

'ওরা তো অহিংস।'

'কাজে সর্বদা নয়। ওদের বস্ত্রের আড়ালে ছুরি থাকে। এইটুকুই ওদের সঙ্গে আমার প্রভেদ।' রাজা শ্রীমতীকে একটু-একটু আদর করেই যাচ্ছিলেন।

'আমার শীতবস্ত্রের আড়ালে ছুরি আছে?'

'না। আরো সাংঘাতিক অস্ত্র আছে।' আদর করতেই থাকেন রাজা। নিজেকে ছাড়িয়ে শ্রীমতী একটু দূরে সরে যায়।

'তোমার শীতবস্ত্র তো অদ্ভুত রকমের।' বলেন রাজা।

'কী রকমের?'

'বড়দের কাজের নকল করতে ভালোবাসে শিশুরা—'

'দুর্ভাগ্য! এত নিকটে থেকেও আপনি জানেন না যে কত অল্প দিনের মধ্যে আমি কত বড় হয়ে গেছি। কাছে থেকেও আপনি অনেক দূর।'

'আজ একটু অন্য রকম লাগছে। তিক্ত কেন? তোমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আমি কোনো অভাব রাখি নি। আমি তোমায় ভালবাসি। কী, তুমি বিশ্বাস করছ না মনে হচ্ছে! এর তো খুব বড় প্রমাণ এটাই যে আমি এতক্ষণ তোমার স্পর্ধা সহ্য করছি, তোমার যুক্তি শুনছি, তর্ক করছি। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে তার শিরশ্ছেদ হতো।'

'আপনার অশেষ অনুগ্রহ, মহারাজ।'

'অনুগ্রহের কথা নয়, ভালোবাসা। তুমি বিশ্বাস কর আমি ভালোবাসি তোমাকে?'

'কখনো কখনো মনে হয়।'

'কখন্ কখন্ মনে হয়।'

'যখন এক এক দিন রাত্রে আমার কোলে মাথা গুঁজে আপনি গোঙাতে থাকেন, বা প্রচণ্ড অস্থিরভাবে আমাকে ভেঙ্গে-চুরে কি একটা শান্তি খুঁজতে থাকেন, তখন—'

'যথেষ্ট, যথেষ্ট। এর থেকে বেশি ভালোবাসা পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়—রাজার পক্ষে তো নয়ই। আচ্ছা, এবার বল, তুমি আমায় ভালোবাসো?

'আমার ভালোবাসা তো আপনি কিনে রেখে দিয়েছেন। আমার ভালোবাসার গলায় দড়ি দিয়ে আপনি টেনে নিয়ে চলেছেন।'

'ও সব বাদ দিয়ে ভেতরকার কথাটা বল।'

'মন বেঁকে যায়, ঘৃণা হয়, তবু আপনি তো আমার জীবনের একমাত্র পুরুষ। সেই কৈশোর থেকে আজ পর্যন্ত আর কোনো পুরুষকে আমি দেখি নি, ভাবিও নি! নটী শ্রীমতীর মতো একনিষ্ঠ প্রেম আর কার আছে, মহারাজ!'

'ঘৃণা কোথা থেকে আসছে?' অজাতশত্রুর গম্ভীর গলা আরো গম্ভীর হয়।

'আমাকে ছিড়ে নিয়ে আসা হয়েছে। পাতা, ফুল, ফল যা-ই ছিঁড়ুন, ছেঁড়া জায়গাটা দিয়ে চোখের জলের মতো কষ বেরোয়, সে-কষের স্বাদ বড় কষা। আমি যদি স্বাধীনভাবে আসতাম—থাক্, আমায় আপনি স্বাধীনভাবে আসতে দেন নি, স্বাধীনভাবে যেতেও দিচ্ছেন না। তাছাড়া যে-হাতে আপনি আমায় আদর করেন, সে-হাতে রক্তের দাগ—আপনার পিতার রক্ত, শ্রমণের রক্ত। আমার ভাইয়ের রক্ত।'

'তোমায় স্বাধীনভাবে যেতে দিলে এতক্ষণে তুমি থাকতে না, বা কারাগারে থাকতে।'

'কারাগারে! যেমনভাবে আপনি আপনার পিতাকে রেখেছিলেন? খাদ্যের পরিমাণ একটু একটু করে কমিয়ে শেষে সম্পূর্ণ অনশনে রাখা! তিলে তিলে হত্যা! না, না, মহারাজ! এইটুকু দয়া আমায় করুন। আমাকে এক বারে কৃপাণের নিচে নিক্ষেপ করুন।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো—মিথ্যে কথা! ভালোবাসলে আমাকে লঙ্ঘন করতে যেতে না।'

'আপনি যে প্রতি মুহূর্তে অগণ্য মানুষকে লঙ্ঘন করছেন!'

'আমি রাজা।' অজাতশত্রু ঘোষণা করেন।

'নিজের ধর্ম পালন বা বিশেষ মত পোষণের অধিকার সব প্রজার আছে। তার পূজার অধিকার থেকে রাজাও তাকে বঞ্চিত করতে পারে না। রাজাও একজন নাগরিক। বিশেষ কাজের জন্য তাকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয় মাত্র।'

'নাঃ, তোমাকে আর কিছুতেই বাঁচানো গেল না। তোমার মতো একজন সুন্দরী তরুণীর রক্তাক্ত ছিন্ন মুণ্ড অশোকচৈত্যে গড়াগড়ি যেতে দেখলে প্রজাদের একাংশ হঠাৎ বড়ই বেদনা বোধ করে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। তুমি আমার শত্রু, মৃত্যুতেও তুমি আমার ক্ষতি করে যাবে।'

'আমি আপনার পরম মিত্র, মহারাজ। আপনার ভেতরটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমি সেটা রক্ষা করতে প্রাণপণ করেছি, মহারাজ।'

'চরম বিরোধী ঘটনা থেকেও উপকার আদায় করা—এই তো রাজনীতির শিক্ষা। তোমার মৃত্যু থেকেও হয়তো উপকার আদায় করা সম্ভব। তোমার হত্যা দেখে লোকে থমকে যাবে, ভয় পাবে। তারা বুঝবে, রাজার প্রিয় নটীও রাজাদেশ মানতে বাধ্য। সে-ও রাজ-শাস্তির উর্ধ্বে নয়। তোমার মৃত্যু এই উপকার আমায় দিতে পারে।'

'তবে তাই হোক, মহারাজ। আমার মৃত্যু কিছু উপকার দিক।'

'কিন্তু শ্রীমতী, তুমি না থাকলে আমার বড় শূন্য লাগবে, আমার জীবনের একটা দিকই একটু সরস ছিল, সেটাও শুকিয়ে যাবে। সেই শুষ্ক জীবন নিয়ে কী করব শ্রীমতী?'

'তাহলে আদেশ তুলে নিন।'

'না, তা হয় না। লোকে বলবে, রাজা দুর্বল, প্রিয় নটীর প্রাণ বাঁচাতে

রাজা আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তাতে অন্য সব রাজাদেশের শক্তি কমে যাবে, রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হবে।'

'তাহলে?' শ্রীমতীর প্রশ্ন।

'তাহলে তোমাকে হত্যা করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। কেন আমাকে এই কঠিন জায়গায় আনলে শ্রীমতী?'

'আপনাকে বাঁচাবার জন্যে।'

'স্পর্ধা! মৃত্যুপথযাত্রী তুমি বাঁচাবে আমাকে! রাজাকে!'

'আমি তাহলে এগোই অশোকচৈত্যের দিকে।'

'দাঁড়াও। আর একবার ভেবে ত্যাখো।'

'আমার ভাবনা শেষ করেছি আমি।'

'প্রহরীকে ডেকে তোমাকে তোমার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' হঠাৎ এই রায় ঘোষণা করেন রাজা।

'তাতে কী লাভ হবে? আমি তো কাল আবার আসব—পুজো দিতে, আরতি করতে।'

'আচ্ছা, কারাগারে রাখা হবে তোমাকে। কোনো খাদ্য দেওয়া হবে না সেখানে। তিলে তিলে তোমার মৃত্যু হবে—লোকচক্ষুর অন্তরালে।'

'কিন্তু আপনার আদেশ ছিল, ঐ অশোকচৈত্যে পূজারত অবস্থায় তাকে হত্যা করা হবে। আপনি ভয় পাচ্ছেন, মহারাজ।'

'ভয়? কাকে? তোমাকে? হা হা ঐ পাষণ্ডগুলোকে? হাঃ!'

'কারাগারের ঐ মৃত্যুই হোক তবে আমার। সে আমার পক্ষে বড় কষ্টের হবে, কিন্তু আপনার পক্ষেই কি তা খুব সুখের হবে? আমাকে আপনি ভালোবাসেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার এই শরীরে আপনার আসক্তি আছে জানি। সেই শরীর শুকিয়ে কুৎসিত হয়ে রুগ্নতায় ধুঁকতে থাকবে, তা দেখতে আপনার ভালো লাগবে?'

'শ্রীমতী, তোমার বাঁচতে ইচ্ছে করে না?'

'আমার মতো কার এত বাঁচবার তৃষ্ণা!' করুণ একটা হাসি ফুটে ওঠে শ্রীমতীর মুখে। 'আমি তো কোনোদিন বাঁচিই নি। বেঁচে-থাকা জগৎটা আমার বাতায়নের বাইরে দিয়ে বয়ে গিয়েছে। তার দু-একটা দৃশ্য আমার চোখে পড়েছে, এক-আধটা ধ্বনি কানে বেজেছে, আমার অন্তরাত্মা ছটফট করেছে, কিন্তু কারাগারের ভারি লৌহদ্বার আমার বুকের ওপর চেপে বসেছিল। বাঁচাটাকে সবে বুকের কাছে ধরে, ভয় কৌতূহল আর প্রচুর

ভালোবাসা দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছি, তখন আমাকে আপনারা ছিঁড়ে নিয়েছিলেন। সেই ছেঁড়া মানুষ আমি যতটা জোড়া লাগতে চাই, ততটা আর কে! অবাধ মুক্ত স্বাধীনভাবে বাঁচা—এ তো আমার সারা জীবনের তৃষ্ণা। পাথর-চাপা গাছ আলোর তৃষ্ণায় যতটা মরিয়া, আমিও তাই।'

'আমার বিরুদ্ধে ঠিক অভিযোগটা কী তোমার? হ্যাঁ, আমি আমার পিতা মহারাজা বিম্বিসারকে হত্যা করেছি, অনেক পাষণ্ড শ্রমণকে হত্যা করেছি। কিন্তু তার দ্বারা দেশকে রক্ষা করেছি।'

'দেশের লোককে হত্যা করে, দেশের রাজাকে নিজের পিতাকে হত্যা করে দেশকে বাঁচানো—খুবই অভিনব পন্থা!'

'নতুন কয়েকটা কথার চমকে দেশে তখন গৌতম-ভক্তির জোয়ার এসেছে। দেশে রাজত্ব রক্ষা করতে গেলে পিতার তখন বৌদ্ধ সমর্থন গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। পিতা পাষণ্ডদের সমর্থন নিলেন, হলেন বুদ্ধের অনুগত। হাওয়া ঘুরলো। বৌদ্ধ-বিরোধী প্লাবন এলো—দেবদত্তের নেতৃত্বে। পিতার সিংহাসন কেঁপে উঠলো। পিতা সিংহাসন রক্ষা করতে চান, কিন্তু পাষণ্ডদের জাল তখন তাঁকে জড়িয়ে ফেলেছে। তাই যুবরাজ আমি এগিয়ে এলাম, দেবদত্তের সঙ্গে যুক্ত হলাম।'

'পিতার প্রাণ নিলেন।'

'অনেক শ্রমণের প্রাণ নিলাম, এবং দেশকে রক্ষা করলাম।'

'এই সব হত্যার সঙ্গে দেশরক্ষার কী সম্পর্ক?'

'আমি তখন ঐ উদ্যোগ না নিলে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধবিরোধীদের গৃহযুদ্ধ শুরু হতো এবং দেশ ছারখারে যেতো।'

'অন্য রকমও তো হতে পারতো। আপনার পিতার নেতৃত্বে ভগবান বুদ্ধ প্রদর্শিত পথে দেশ হয়তো উন্নত মানবিকতার দিকে অগ্রসর হতো।'

'সেই উন্নত মানবিকতা দেশ থেকে অস্ত্রকে নির্বাসিত করছিল। রাষ্ট্র হচ্ছিল অহিংস, অস্ত্রহীন, সৈন্যহীন। প্রতিবেশী রাজ্য বরাবরই আমাদের এই সমৃদ্ধ মগধ সম্পর্কে লোভাতুর, কিন্তু বরাবরই তাদের আক্রমণ আমাদের শক্তিতে প্রতিহত। পিতা যদি পাষণ্ড-রীতিতে রাজা থেকেই যেতেন, তাহলে প্রতিবেশী-আক্রমণ আর প্রতিহত করা সম্ভব হতো না এবং এতদিনে মগধ হতো অন্য রাজ্যের অধীন, পদানত। আমি তোমাদের স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র সংকুচিত করলে তোমরা চিৎকার কর, আর তখন গোটা দেশ বিদেশীদের পায়ের তলায় থাকতো, সমগ্র জাতি একটা দাস জাতিতে পরিণত হতো।

আমি সেটা হতে দিই নি। আমি বেঁচে থাকতে সেটা হতে দেবও না।'

শ্রীমতীকে স্তব্ধ দেখে রাজা জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি মগধকে বিদেশীদের পায়ের তলায় পিষে ফেলতে চাও?'

'না না। কিন্তু একটা ভালো কাজ করার জন্যে এতগুলো খারাপ কাজ করতে হবে?'

'সেই ভালো কাজটা যে মস্ত বড় ভালো কাজ। খুব মৌলিক। সেটাই লক্ষ্য। সেটাই আসল।'

'লক্ষ্যে পৌছতে পথে যদি এত রক্তপাত, তাহলে সে-রক্তের ছোপ তো শেষে ঐ লক্ষ্যেও পৌছবে।'

'পুজোর কথা বলতে বলতে তুমি তো রাজনীতির কথায় এসে গেলে।'

'এটা রাজনীতি! কী জানি! আমি বলতে চাইছি মানবনীতির কথা।'

'মানবনীতি! তার মানে কী?'

'দয়া, মায়া, ভালোবাসা, নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করা, অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করা।'

'টেনে টুনে ধরলে জীবনের সবই রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তোমার ঐ-সব রাজনীতির মূল কথা নয়।'

'আমার ধারণা, মানবনীতিই রাজনীতির মূল ভিত্তি হওয়া উচিত।'

'ভিত্তি! হুঁ!' রাজার গলায় তাচ্ছিল্য। 'রাজনীতির মূল কথা আত্মরক্ষা, আত্মপ্রসার। ছল-বল-কৌশলের সেই সংগ্রামে আত্ম ভিত্তি দৃঢ় হলে, তার সৌধচূড়ায় মানবনীতির কারুকার্য করা হয়। সখের সে এক সৌন্দর্যবিলাস।'

শ্রীমতী আহত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, 'ভগবান বুদ্ধের বাণী ও কর্ম শুধু স্বার্থপরতার উপর এক শোভন কারুকর্ম?'

'সে-উত্তর তুমি দেবে। আমি শুধু দু-একটি তথ্য তোমাকে বলতে চাই।'

'না। এখন আপনি বুদ্ধের নামে কিছু কুৎসা-কথা বলবেন।'

'আমার কথার সত্যতা তুমি যে কোনো ভাবে যাচাই করে নিতে পারো।' ধীর ও দৃঢ় কণ্ঠস্বর অজাতশত্রুর।

'না। যাচাই করতে চাই না আমি। শুনতেও চাই না।'

'এ কী মেয়েলি কথা! এ কথা তো একমাত্র অন্তঃপুরেই শোভা পায়। এখন তুমি তো বাইরের জগতে পা দিচ্ছ। সত্য নানা পথে তোমার

সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে, তাকে এড়াবার উপায় নেই।' একটু থেমে রাজা বলেন, 'তা ছাড়া যার জন্যে প্রাণ দেবে, তাকে তো সম্পূর্ণ করে জানতেই হবে। তোমার বুদ্ধ কী রকম ভগবান তা কি তুমি জান?'

'ঠিক আছে। বলুন, আমি শুনবো।'

'গৌতম মানুষকে ভালোবাসার কথা বলে। কিন্তু সে তার যুবতী স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। ভগবানের এ কী রকম দায়িত্ব বোধ, এ কী রকম ভালোবাসা। যে তার স্ত্রীপুত্রকে ভালোবাসে না, সে ভালোবাসবে সারা পৃথিবীর লোককে! আর আমাদের দিকে ছাখো, নটীর কাছে যাই, রক্ষিতার ঘরে রাত কাটাই, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যে একচুল গাফিলতি পাবে না।'

'আর আমি শুনবো না। না।'

'দাঁড়াও। ভগবানের মুখোমুখি দাঁড়াও। ভালোবাসবে গৌতম কোনো মূল্য দেয় না তার আরো প্রমাণ আছে। নন্দকে প্রব্রজ্যা দিয়েছিল গৌতম কবে, জানো? নন্দের বিবাহের দিনে। প্রব্রজ্যা সত্বেও নন্দ তার স্ত্রীকে ভালবাসতো, এ দেখে গৌতম কী করেছিল জানো? যোগবলে অতি-সুন্দরী দেবকন্যাদের দেখিয়ে নন্দকে বলেছিল, 'স্ত্রীকে ত্যাগ করে এলে পরে এই রকম সুন্দরী নারী পাবে।' নারীর প্রলোভন সামনে রেখে স্ত্রী-ত্যাগে প্ররোচিত করে এ কোন ধরনের ভগবান! আর পরে সুন্দরী নারী পাওয়া যাবে এই লোভ দেখিয়ে মানুষকে প্রব্রজ্যায় টানা—এ কোন্ ধরনের প্রব্রজ্যা, কোন্ ধরনের নীতি?'

'আমি আর শুনতে চাই না, চাই না।'

'জ্ঞান চাও না? সত্য চাও না? আরো শোনো। গৌতম তো অহিংসার পূজারী। কিন্তু সে ভিক্ষালব্ধ মাংস ভক্ষণ করে। কারণ সে বলে, এ ক্ষেত্রে প্রাণীহত্যার পাপ দাতার, ভোক্তার নয়। অর্থাৎ হিংসার পাপ নেবে অন্যে, সুফল নেবে গৌতম। একে স্বার্থপর ছদ্মবেশী হিংসা ছাড়া আর কী বলবে তুমি?'

'আপনি থামুন, আপনি থামুন।'

'সত্য তো তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী থামে না। শোনো। দেবদত্ত ভিক্ষায় বেরোলে গৌতমের অনুচরেরা কী করে জানো? তার ভিক্ষাপাত্র ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। ভিক্ষাপাত্র ভেঙে দেওয়ার মতো জঘন্য অপরাধ আর কী আছে?

'এ তো মুখের অন্নগ্রাস কেড়ে নেওয়া।'

'আমি আর শুনতে পারছি না। শুনতে পারছি না।'

'আর হত্যা! দেবদত্তের দল যতগুলি হত্যা করেছে, গৌতমের অনুচরেরা তার থেকে কম করে নি, বরং বেশিই করেছে।'

'আর বলবেন না। আমাকে দয়া করুন। দয়া—

'এ সব সত্ত্বেও দেশের ভ্রাতৃবিরোধ এড়াবার জন্য দেবদত্ত গৌতমের অনুগত হয়ে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ভুক্ত হতে চেয়েছে। পরিবর্তে পেয়েছে অপমান। গৌতম প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সম্প্রদায়ে দেবদত্তের স্থান হবে শারীপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের নীচে, গৌতম এত নীচ! এই গৌতমের উন্নত মানবিকতা, ভগবত্তা!'

'এ সব বলবেন না। আর বলবেন না। বরং আপনি আমাকে হত্যা করুন।' শ্রীমতী ছটফট করতে থাকে যন্ত্রণায়।

'সত্যের দাহ তো বেশিই হয়, শ্রীমতী।' রাজা কাছে এসে শ্রীমতীর হাত ধরেন। তাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। শ্রীমতীর ছটফটানি কমে না।' 'শান্ত হও, শ্রীমতী।'

হঠাৎ উঠে পড়ে শ্রীমতী: 'আমি চলে যাই।'

'তাই যাও শ্রীমতী। ঘরে যাও।'

'ঘরে! আমার ঘর তো জ্বলে গেছে। এখন আমার বাইরেটাও জ্বলে গেল! এ আপনি আমার কী করলেন!'

'সব মানুষেরই এই দশা, শ্রীমতী।'

'আপনারও?'

'হ্যাঁ, শ্রীমতী। নির্দোষ বহু শ্রমণদের হত্যা করে, তোমার ভাইকে হত্যা করে, নিজের পিতাকে হত্যা করে আমিও সুখে নেই।'

'আপনি তো ইচ্ছে করেই—'

'হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই। আবার সবটুকু ইচ্ছে করেও নয়। ক্ষমতা রক্ষার জন্যে অনেক কিছু করতে হয়।'

'এত ক্ষমতা দিয়ে কী হবে?'

'তোমার ঐ যে মানবনীতি, তা প্রতিষ্ঠা করার জন্যেও তো ক্ষমতা দরকার। আবার ঐ ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা রক্ষার জন্যে ঐ মানবনীতিকেই হত্যা করতে হয়। ক্ষমতা বাড়ে, কিন্তু ভয় যায় না। পাষণ্ডরা এই বুঝি পায়ের তলা থেকে মাটি কেটে নিয়ে গেল। তাই আরো শক্ত করে মানবনীতির টুঁটি টিপে ধরতে

হয়। এই রকমই চলছে শ্রীমতী, এই রকমই চলবে। এরই মধ্যে কাজ করে যেতে হয় আমাকে।'

'আমাকেও কাজ করতে হবে।'

'কোথায় যাচ্ছ, শ্রীমতী?'

'অশোকচৈত্যে।'

'গৌতম সম্পর্কে এত কথা শোনার পরেও?'

'বুদ্ধদেব হয়তো ভগবান নন, মানুষ। অনেক দোষ তাঁর। তবু এই মুহূর্তে তিনি দেবদত্তের তুলনায় অগ্রসর। তিনি তো বলেছেন, সব মানুষ সমান, সব মানুষ শুচি, তিনি তো আমায় পূজার অধিকার দিয়েছেন। তাঁকে উপলক্ষ্য করে আমি সত্যের উদ্দেশে স্বাধীনতার উদ্দেশে আমার প্রদীপ জ্বালাবো।'

'থামো, থামো, শ্রীমতী। অশোকচৈত্যে শাণিত অস্ত্র উদ্যত হয়ে আছে। এবার প্রহরী আমার কাছে আনবে না। ঐখানেই—'

'যার ঘর-বাহির জ্বলে গেছে, তাকে তো আগুনের ওপর দিয়েই যেতে হবে।'

উদ্যানের পথে দ্রুত শ্রীমতীর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়।

'শ্রীমতী, শ্রীমতী।'

কোনো সাড়া আসে না। অজাতশত্রু দেওয়ালটা চেপে ধরেন। এখনি একটা আর্তনাদ বসন্তপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকে বিদীর্ণ করে ফিনকি দিয়ে ছুটে বেরোবে। এখনি—আর একটু পরেই। কিন্তু একটা চাপা গর্জন কেন! ধ্বস্তাধ্বস্তি বহু লোকের। সৈন্যরা কাদের সঙ্গে লড়ছে? তীক্ষ্ণ আর্তনাদটা কি বহু কণ্ঠের চিৎকারে ডুবে গেল?

দূত হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দেয়। শ্রীমতীর হত্যাকে কেন্দ্র করে বহু লোক বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রহরীদের আক্রমণ করেছে। টুকরো টুকরো খণ্ডযুদ্ধ চলছে উদ্যানের চারিদিকে।

রাজা গর্জন করে আদেশ দিলেন—রক্তস্রোতের প্লাবনে বিদ্রোহী পাষণ্ডদের ভাসিয়ে দাও, হটিয়ে দাও।

দূতের সঙ্গে সঙ্গে রাজাও বেরিয়ে আসেন। রাজাকে দেখতে পেয়ে প্রহরীরা দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চিৎকার ও আর্তনাদে বসন্ত-পূর্ণিমা রক্তিম হয়ে ওঠে।

রাজা এসে দাঁড়ান অশোকচৈত্যে। শ্রীমতীর ছিন্ন শরীর হতশ্রী হয়ে পড়ে

আছে। প্রদীপগুলি ছিটকে গেছে চার দিকে। কিন্তু ঐ ওখানে হঠাৎ একটা লালচে আভা চমকে উঠল যেন। ওখানে যেন একটা প্রদীপের আলো মেজের ওপর গড়িয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি এগোন রাজা। প্রদীপের আলো নয়। শ্রীমতীর রক্ত গড়িয়ে গেছে মেঝেতে। তার ওপর পড়েছে বসন্তপূর্ণিমার আলো। শ্রীমতীর রক্ত আগুনের আভা নিয়ে জলছে।

'শ্রীমতী, শ্রীমতী।'

রক্তটা গড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বসন্তপূর্ণিমা প্রতি রক্তবিন্দুতে প্রদীপ জেলে দিচ্ছে। অশোকচৈত্যে দীপাবলী।

'প্রহরী, প্রহরী।'

রক্তটা গড়িয়ে যাচ্ছে। দীপের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে।

বায়োস্কোপ

কার্তিক লাহিড়ী

বসা-শোয়ার পাঁচ-মিশালি ঘর বাঙালী মধ্যবিত্তর, বাংলা সিনেমায় যেমন যথাযথ করার চেষ্টা হয় তেমন

রমেশ, রমেশ আছ ?

কে ?

আমি অক্ষয়

আরে এসো এসো

এবার দু-জন প্রায় সম-বয়সী প্রৌঢ়কে দেখা যায় রমেশ বাড়ির-ভিতর থেকে অক্ষয় বাড়ির-বাইর থেকে ঢোকে, বাড়ির কর্তা রমেশ আসন গ্রহণ করে, অক্ষয় লাঠি টেবিলে রাখে

আরে বসো বসো, কি সৌভাগ্য, তারপর খবর কি

অক্ষয় (আসন গ্রহণ করে) যথা পূর্বং তথা পরং, সকলে ভালো আছে তো ?

তা এক রকম, চলছে, চলবে

উভয়ের হাসি উচ্ছ্রিত হয় শিশুর মতো, লাঠি পড়ে যায় মেঝেয়।

রমেশ (থেমে) তোমাকে একটু কৃশ দেখাচ্ছে

হা-হা, যা বলেছ, কৃশ

হাসলে যে

কৃশ কথাটা মোক্ষম লাগালে দেখছি, আজও ভুলতে পারলে না কথাটা !

ভোলা কি যায় ভাই (রমেশের দীর্ঘশ্বাস মোচন)

সত্যি ভোলা যায় না (অক্ষয়ের দীর্ঘশ্বাস তখন), সেদিন আর আসবে না, কেমন সব বদলে যাচ্ছে, তাই না ?

বদল বলে বদল, কিছু কি ছাই বুঝছি, ছেলে-ছোকরাদের রং-ঢং সব কেমন হয়ে যাচ্ছে, আরে আমরাও তো যুবক ছিলাম

উহুঁ, ঠিক হল না ভাই

কি ঠিক হল না অক্ষয় ?

এই যে ছেলে-ছোকরাদের সম্বন্ধে যা বললে

কেন ?

আমাদের সময়েও বুড়োরা ঐ কথা বলত আমাদের সম্বন্ধে, বুঝলে—আমি কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি রকম-সকম, বুঝলে রমেশ

তুমি তাহলে সুখে আছ

সুখ (দীর্ঘশ্বাস মোচন অক্ষয়ের), তা বলতে পারো, নাতনিটা চোখের সামনে হেঁটে চলে বেড়ায়, দেখি আর ভাবি—আমিও একদিন এমন ছিলাম, দেখতে দেখতে শৈশবে চলে যাই, হারিয়ে গেলেও যা কিছুতে হারায় না তবু (চোখে স্বপ্ন ভাসে ও তৎক্ষণাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলে যেমন) কি ছাই বলছিলাম, তুমি কেমন আছ ?

ঐ এক রকম

মানে

আমার আবার ভালো মন্দ

কেন তুমি তো ঝাড়া হাত-পা

মনে নেই (রমেশ মনে করানোর চেষ্টায়) সেই ভাবসম্প্রসারণের কথা, (অক্ষয়ের চোখ জিজ্ঞাসু হয়ে উঠলে) সেই যে নদীর এ-পার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ওপারে তে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস

অক্ষয় (হেসে) মনে থাকবে না, কি যে বলো ? বাই দি ওয়ে ভাব-সম্প্রসারণের কথায় মনে পড়ল, আচ্ছা আকাশ-কুসুম মানে কি হে ?

আকাশ কুসুম, আকাশ কুসুম (রমেশ টেবিলের দিকে এগোয়)

ডিকশেনারি খুঁজছ ? আমি দেখেছি

শব্দটা নেই ?

আছে (অক্ষয় হাসে) তবে সেটা মানেই নয় কোনো

তাহলে (রমেশের চোখ বিস্ফারিত ঈষৎ বিস্ময়ে)

কি মানে করেছে জানো (পকেট থেকে কাগজ বের করতে অসুবিধে হওয়ায়) রসো, হাঁ লিখেছে আকাশ-কুসুম মানে অবস্তু অসম্ভব কল্পনা খ-পুষ্প (রমেশকে নিরুত্তর দেখে) বুঝলে কিছু ?

'—'

আরে ডিকশেনারির মানে বুঝতে পারলে কি তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম !

পরীক্ষা করার জন্যেও তো করতে পারো

উভয়ের ঠা-ঠা হাসি অতএব তখন

অক্ষয় (হাসি থামিয়ে) কত ঠকানো হত কত ভাবে, তাই না !

তা বলতে (রমেশ একটু চুপ থেকে) তা তুমি আকাশ-কুসুম নিয়ে পড়লে কেন হঠাৎ ?

অক্ষয় (প্যাকেট থেকে সিগ্রেট বের করে এবং ধরিয়ে) সাধ করে কি ভাই ! সেদিন বসে বসে চিঠি লিখছি নিতাইয়ের কাছে, হঠাৎ কোথা থেকে নন্দু এসে বললে—দাদু, আকাশ-কুসুম মানে কি, লেখা থামিয়ে বললাম—তাই, সে বললে ঘেঁচু, পারলে না তো বলতে, তাতে আমি বললাম আচ্ছা সেনটেনস বলো, এখুনি বলে দিচ্ছি, নাতনি বললে কি জানো—সেনটেনস বলে দিলেও নাকি আমি পারব না, আর আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বললে—আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন হতাশে, যেই না বলা আমি হেসে বললাম ধাঁধার কি উত্তর দেবো দিদা, ব্যাস যায় কোথায়, হেসে গড়াগড়ি, তা দেখে আমারও হাসি থামে না, ঐ যা আবার হাসি পাচ্ছে আমার—

রমেশ (বেশ গম্ভীর হয়ে) একদম ছেলে মানুষই আছ দেখছি, সত্যি তো ধাঁধার কি উত্তর দেবে ! মনে নেই কালীপদ স্যর বলতেন ধাঁধার উত্তর কেবল প্রশ্নকর্তাই জানে, তাই ধাঁধার উত্তর দিতে বারণ করতেন (অক্ষয়ের হাসির পর) হাসছ যে

কিচ্ছু ধরতে পারো নি, সেই পুরনো ট্যাকটিকস

মানে

মানে ওটা ধাঁধা নয়, রবি ঠাকুরের গান

তাই বলো (রমেশ হো-হো হেসে) সেই ট্রাডিশন সমানে চলিয়াছে

ব্যাখ্যা লিখ প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া

উভয়ের দারুণ হাসি তখন

অক্ষয় (হাস্যবেগ সংবরণ করে) তাহলে আর বলছি কেন ? তুমি তো

বলছিলে সবকিছু পালটে গেছে, এখন বোঝো—সেই এক ধারা, শুধু রকমফের মাত্র (থেমে খুব গভীর স্বরে) বাজারে বেরিয়েছি হঠাৎ দেখি একটা ছেলে কয়লা দিয়ে শ্লেট মাজছে, দাঁড়িয়ে পড়লাম, আমরাও তো কয়লা দিয়ে শ্লেট মেজে জল দিয়ে ধুয়ে তারপর সূর্যের দিকে নাড়াতে নাড়াতে বলতাম—জলকে পানি জলকে যা আমার শেলেট্ শুকিয়ে যা, বাজার-টাজার সব চুলোয় গেল, চলে গেলাম একদম ছেলেবেলায় (হেসে) ক-মুহূর্ত তারপর মোটরের হর্ন রিকশার টুং-টাং, নাও ঠেলা, স্বস্তি কোথায় (হঠাৎ থেমে) আচ্ছা রমেশ, শৈশব কি ফিরে পাওয়া যায়, মানে হারানো শৈশব ?

'—'

যে শৈশব ফেলে এসেছ রমেশ, সেই শৈশব, অর্থাৎ

অর্থাৎ জানি না, অত তত্ত্ব-ফত্ত্ব মাথায় ঢোকে না, চিরকাল করলাম উইথ রেফারেন্স টু ইওর লেটার নম্বর, আর এখন তুমি জিজ্ঞেস করছ একেবারে লাস্ট প্রশ্ন

লাস্ট প্রশ্ন ?

তা নয়তো কি! আমি ভাবছি কি জানো (রমেশ টেবিলের ড্রয়ার চাবি দিয়ে খুলে একটা নোট-বই বের করে পাতা উল্টাতে উল্টাতে) হাঁ, হিয়ার ইট ইজ, ভাখো

একটু মন দিয়ে ভাখো

এতো দেখছি (অক্ষয় পাতাটি ভালোভাবে পরীক্ষায় রত) অনেকটা 'এ' স্কোঅ্যার মাইনাস 'বি' স্কোঅ্যার-এর অঙ্ক

ঠিক ধরেছ তবে এটা a^2-b^2 এর অঙ্ক নয়, হচ্ছে পারমুটেশন-কম্বিনেশন, পরীক্ষা করে দেখছি আউট অব এন্ নাম্বার কতবার ট্রাই করলে প্রাইজটা পাবো

প্রাইজ !

সিওর, একবার লাগাতে পারলে দেখতে হবে না, কেল্লামাৎ, সব পালটে যাবে, এই ভাখো (পাতা উলটিয়ে আর একটা পাতা রমেশ খুলে ধরে) এটা হচ্ছে প্রোপজড বাড়ির প্ল্যান, জব্বর প্ল্যান—হঁ্যা এটা পুকুর পাশে বাগান, দেন্ উত্তর দিকে

শুরু করেছ আবার

রমেশের স্ত্রী মন্দাকিনী মাঝবয়েসী ট্রে-তে দু-কাপ চা সহ ঐ কথা বলে প্রবেশ করলে রমেশ হেঁ-হেঁ নার্ভাস হেসে ডাইরি বন্ধ করে

মন্দা। (চা-র কাপ নামিয়ে দিল) অক্ষয়বাবু কতদিন পরে এলেন আর তুমি বসলে কিনা প্ল্যান বোঝাতে, তোমার কি কোনোদিন আক্কেল হবে না

না না বৌঠান, ওর প্ল্যান দেখতে সর্বদা ভালো লাগে, ও-ই তো ছিল আমাদের প্ল্যানার। মনে আছে রমেশ মক্-ফাইটের সময় সর্বদা স্ট্রাটেজি তুমি-ই তৈরি করতে, আমি থাকতাম অ্যাসিস্টেন্ট, বুঝলেন বৌঠান—একবার ক্লাস টেনের সঙ্গে আমাদের ফাইটিং, রমেশ অ্যাবসেন্ট, সব ভার এই অধমের উপর, ক্লাস টেন দারুণ অফেনসিভে, আমরা কি পারি, কেবল পিছু হট্‌ছি, আর পিছু হটলেই একদম হার, এমন সময় পরিত্রাতা মধুসূদনের গর্জন—সাঁড়াশি, চার্জ। ব্যাস সেই সাঁড়াশি আক্রমণ চালালাম সবাই প্রাণ ঢেলে, জিত হল, জানেন তো সেই শর্মা হচ্ছেন ইনি

ওরে ব্যাস্, আর বলবেন না আপনার বন্ধুটি অহঙ্কারে গর্বে ফেটে পড়বেন তাহলে,

সত্যি গর্বের ব্যাপার (অক্ষয়ের চোখে মুখে সপ্রশংস ভঙ্গি) রমেশ আমাদের অনেক বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে, একেবারে বাঘের বাচ্চা যাকে বলে,

কিন্তু এখন তো হয়েছেন কাদার ঢেলা

তা ঠিক মন্দা (রমেশের মুখ চোখের আলো নেভে) একটা কাদার ঢেলা ছাড়া আর কি আমি এখন (দীর্ঘশ্বাস)

কিন্তু তুমি তো এমন ছিলে না

বাট দ্যাট ইজ পাস্ট, আর স্মৃতি সততই সুখের

তাই তো বলি রমেশ (অক্ষয়ের সারা শরীরে উত্তেজনা) সেই সব দিন কি ফিরে আসবে না—সেই ইছামতী, লোহার পুল, পদ্মার ধার, কামিনী গার্ডেনস, বেরিয়াল গ্রাউণ্ড, এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট, জামতলা—মনে আছে রমেশ ?

　　সকলে নীরব কিছুক্ষণ অতঃপর অক্ষয়ের কথার রেশ ঝোলে ঘরের আনাচে কানাচে

আচ্ছা বৌঠান, শৈশবে কি ফিরে যাওয়া যায় ? মানে যে দিনগুলো ফেলে এসেছি পেছনে,

বাব্বা, বড্ড ভয়ঙ্কর কথা জিজ্ঞেস করলেন যাহোক, কি উত্তর দেবো বলুন, সারাদিন রাঁধি বাড়ি খাওয়াই-দাওয়াই কি করে কাটে সময় ভগবান জানেন, নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসৎ পাই না (একটু থেমে মন্দা) ওঃ যা, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল আপনার

আমি ঠাণ্ডা চা-ই প্রেফার করি (চায়ে চুমুক দিয়ে) কিন্তু আমার কথার উত্তর পেলাম না,

যা দিন কাল পড়েছে, আমাদের তো (মন্দার ম্লান হাসি)

ঠিক বলেছেন (সম্বিৎ ফেরার ভঙ্গি অক্ষয়ের), যে হারে দাম বাড়ছে, তার উপর মেরিটের দাম নেই, দয়া-দাক্ষিণ্য নেই, যত রাজ্য হয়েছে চোর-বদমাসদের, তারাই এখন সমাজের মাথা, বিচার পাবেন কোথায় (থেমে কিছু মনে পড়ার স্বরে) আপনাদের আর কি চিন্তা, ছেলে বড় হয়েছে

ছেলে বড় হয়েছে! (রমেশের মুখ ও স্বর স্বাভাবিক নয়) একটা স্কাউনড্রেল, বাপ-মার দুঃখ বোঝে না, কি বলব তোমায়, তুমি তো আর পর নও, ঘটে বুদ্ধি থাকলে কি কপালে দুঃখ হয়, না—তিনি তানসেন হবেন, গান গেয়ে জগৎ মাতাবেন, চাকরি-বাকরি জলাঞ্জলি দিয়ে নেমে গেছেন সাধনায়

বটে?

আর বলি কাকে দুঃখের কথা, তবু যদি গলা থাকত! সে যে কার ফেরে পড়েছে আর কার পেছনে ছুটছে

তা যদি জানত তবে কথাই ছিল না, তুমি যেমন দিন-রাত অঙ্ক কষছ, লটারি কিনে টাকা নষ্ট করছ, কেন করছ তা যদি জানতে—

কার সঙ্গে কিসের তুলনা করছ মন্দা! আমারটা হচ্ছে পিয়োর অঙ্ক, তা কারুর উপর নির্ভর করে না, কিন্তু গান গলার উপর নির্ভর করে, টাকা নষ্ট করছি বোলো না, বলো টাকা পাওয়ার জন্য টিকিট কিনছি, কি বলো অক্ষয়, বাড়ির যাতে স্বাচ্ছন্দ্য আসে তার চেষ্টা,

কিন্তু কি জানো রমেশ

নেপথ্যে তখন কাঁচের জিনিস ভাঙার শব্দ তীক্ষ্ণ চীৎকার

মা দেখে যাও, পল্টু কি করছে

কি হল মাধু, কি হল

তোমার গুণধর পুত্র স্পিন্ বোলিং করে সব শেষ করে দিয়েছে

পল্টু পল্টু

সে কি আর এখানে আছে

আসুক সে, তার একদিন না আমার একদিন

এসব কথা থিয়েটারের যেমন নেপথ্যে হয় এখানে তেমন

দেখলে রমেশ, সেই এক কাণ্ড, আমরা করতাম কিক্ আর এরা করছে বোলিং, বেশ সুখে আছে, নেই চিন্তা নেই ভাবনা

তোমার বড় ছেলেটি করছে কি অক্ষয় ?

ঐ তোমার বড়টির মতো, শিল্পী হতে চায় (হেসে তাকায়) ছবি আঁকিয়ে, কি আঁকে ভগবান জানেন, মডার্ন আর্ট নাকি, আমরা বুঝব না, ছেলেরা মানে ছোট ছেলেরা যেমন আঁকে তেমনি, বলে চাইল্ড আর্ট নাকি হচ্ছে সত্যিকারের আর্ট, বুঝলে রমেশ—মানুষ আবার তার শৈশব ফিরে পেতে চাচ্ছে, ইটারন্যাল চাইল্ডহুড, ও কি তুমি গম্ভীর হয়ে উঠলে যে !

হুঁ (দীর্ঘশ্বাস রমেশের) নোটবই দেখছিলাম, দেখছি সেই ভাইট্যাল পাতাটা হারিয়ে বসেছি কখন, আমি সব সময় ঐ রকমই করি

মানে ?

হাঁ অক্ষয়, ভাইট্যাল (আবার দীর্ঘশ্বাস) যাক ও নিয়ে খেদ করে লাভ নেই—বরং

> কথা শেষ না হতে একটা টেনিস বল লাগে রমেশের কপালে, রমেশের কাতরানি ওঠার আগে চোঙা প্যাণ্ট টি-শার্ট পরিহিত পল্টুর প্রবেশ

বাবা কি রকম দেখলে (বল কুড়িয়ে পল্টু আবার বল দেওয়ার ভঙ্গি নেয়) আগের চেয়ে ইমপ্রুভ করেছে ? (অক্ষয়ের দিকে) আপনি কি বলেন ?

আমি, আমি তো বাবা আগে তোমার বোলিং দেখিনি

আগে না দেখলে কি হবে, এখন দেখলেন তো ? আন্দাজ করে বলুন

আঃ পল্টু, উনি আমার বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র বিশ্বাস, তোমার কাকাবাবু, ছোটবেলায় উনি তোমাকে নিউটন বলে ডাকতেন—তোমাকে খুব স্নেহ করতেন

ওঃ হ্যাট ওল্ড গ্র্যাণ্ড কাকু (পল্টু প্রণামের জন্য নত)

থাক থাক

এই তো বুড়োদের দোষ, প্রণাম না করলে রাগ করবে, করলে বলবে থাক থাক, যত সব, যাক সে কথা, আমার ইমপ্রুভমেণ্ট কেমন হয়েছে তাই বলুন

উনি তোমার ইমপ্রুভমেণ্ট হয়েছে কিনা বলবেন কি করে ? অক্ষয় তো তোমার আগের বোলিং দেখেনি, আর দেখলেও কি মনে রাখতে পারবে নাকি ?

তা দেখেন নি তো হয়েছে কি? তুমি তো বোম্বাই যাও নি, সেখানে কাপড়ের মিল আছে জানলে কি করে, কেদারবদ্রীতে শীতকালে বরফ পড়ে তা জানলে কি করে সেখানে না গিয়ে!

তা এর সঙ্গে অক্ষয়ের বোলিং না দেখার কার্যকারণসূত্রটা কোথায়?

দেখা আর না দেখার ব্যাপারে (একটু থেকে ক্রিকেটের একটি পরিচিত বোলিং-এর ভঙ্গি করে) এখন ফ্রন্ট-ফুটের নিয়ম চালু হয়েছে, আমি সেটা প্র্যাকটিস করছি। ধরুন এটা বোলিং-ক্রিজ আর এটা হচ্ছে—

> পল্টু ড্রয়ার টেনে খড়ি বের করে মেঝেয় দাগ টানতে নত হলে রমেশ ইঙ্গিতে অক্ষয়কে পল্টুর একটু মাথার দোষ আছে বোঝাতে অক্ষয় নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালে রমেশ ও অক্ষয় একবারে পালিয়ে চলে আসে, তখন পল্টু লাইন টানা শেষ করে বল কুড়িয়ে দাঁড়াতে যায়

যা বাব্বা, গেল কোথায় বুড়ো দুটো, জ্বালালে দেখছি—বাবা, কাকু, নাঃ—এরা কিছুতেই অ্যাপরিসিয়েট করতে পারে না, দিদি—দিদি

কি? কাজ করছি আমি

শোন না লক্ষীটি

এখন যেতে পারব না, কাজ করছি

আচ্ছা, বেশ থাকো তুমি, পাবে না তাহলে, (উত্তর নেপথ্য থেকে না এলে পল্টু) এবার ঠিক ওষুধ ধরেছে, ধরবে না মানে

কি, কি অমন গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিলি (সতেরো-আঠারো বয়সের মাধবীর প্রবেশ) কি বলছিলি রে, এত কিসের ছটফটানি

থাক বলব না

বলবি না তো ডাকছিলি কেন, কাজ ফেলে দৌড়ে এলাম

থাক তোমার যদি এত তাড়া থাকে তো আমার ভারি বয়ে গেছে, মলয়দা বলছিলেন—

কি কি বলছিলেন (আগ্রহভরে মাধবী এগিয়ে আসে) তোকে

কিছু বলেনি তবে—

তবে কি!

এই দিয়েছে আর কি

দিয়েছে! কোথায়, কোথায়, দে-দে (পকেট থেকে বস্তু ছিনিয়ে নিতে চায় মাধবী)

উহু (পকেট খুব কষে ধরে পল্টু) আগে ঝাড়ো কিছু মাল তারপর আগে দে, তবে না—

নট্ নট্, ফেলো কড়ি মাখো তেল, ক্যাশ ডাউন দিলে এটাও ডাউন করব

আরে বাবা দিচ্ছি দিচ্ছি, তোকে কোনোদিন ঠকিয়েছি রে

ঠকাওনি ঠিকই, তবে ঠকাতে কতক্ষণ

তোর জ্বালায় যদি শান্তি থাকে, দাঁড়া (মাধবী দ্রুত চলে গেল)

ঠিক ওষুধ ধরেছে, কিন্তু ওয়াট টু ডু নাউ

এই নাও (অন্য হাত বাড়িয়ে মাধবী) এখন দাও

আমাকে অবিশ্বাস! চাই না তোমার টাকা (পল্টু যাওয়ার উপক্রম)

আ-হা, রাগ করিস কেন—এই নে

পল্টু (নোট নিয়ে) মাত্র দুই, যাক এখনকার মতো চলবে

যাচ্ছিস যে! দিলি না?

এখনও দেয় নি, তবে দেবে বলেছে, দিলেই তোকে দেবো (পল্টু চলে যায়)

মিথ্যুক পাজি নচ্ছার, আসিস আবার আমার কাছে, দিদি করে ডাকিস আবার দেবো তখন (মুখ বিকৃত করে এসব বলার সময়)

কাকে এত গাল দিচ্ছিস ভর সন্ধ্যেবেলায়

কাকে আবার (মন্দা তখন ঘরে) তোমার সুপুত্তুর। পাজি নচ্ছার গুণ্ডা

আঃ মাধু, এসব কি কথা, বয়েস বাড়ছে না কমছে

মা, আর কোলে ঝোল টেনো না, ওর যা বিদ্যে হয়েছে, মুখ দেখলে ঘেন্না করে

থামলি তুই, সারাদিন ধিঙিপনা, ভেবেছ আমি কিছু টের পাই না

কি, কি টের পাও তুমি। আমি চুরি করি না ডাকাতি করি যে তুমি সর্বদা আমাকে খোঁটা দেবে (কান্না)

আমি কি তাই বললাম, তুই তো বড় ভাই—

তুমি সর্বদা আমাকে খোঁটা দাও, দোষ ধরো। আমার মাথায় যদি কিছু না ঢোকে সে কি আমার দোষ?

সে কথা বললে কে? (থেমে মন্দা) জানিস তো পল্টু অষ্টম গর্ভের সন্তান, তোর ছোট ভাই। যদি অন্যায়ও করে (পল্টুকে ইতস্তত করে ঢুকতে দেখে) পল্টু এদিকে আয়, মাধুকে কি বলেছিস

দিদিকে ! আমি ! কিছু বলি নি তো

এই মিথ্যুক

হাঁ ওর কাছে টাকা চেয়েছিলাম

আর টাকা নিয়ে সরে পড়লেন বাবু সায়েব, পাজি গুণ্ডা

ল্যাও ঠেলা, পল্টু বোস প্রমিস কথনো ব্রেক করে না। বুঝলে ? এই নাও

মাধবী (কাগজটি হাতে নিয়ে) উঁ—হু—হু গেলাম গেলাম

কি হল, কি হল (মাধুর গোঙানি ও মন্দার ব্যস্ততা)

জল জল, পাখা পাখা, জল পাখা

মাধবী (গোঙাতে গোঙাতে) জল জল

হাঁ করে দেখছিস কি, মাধু যে এদিকে যায়

তুমি সরো তো, যাও তো, আমি দিদিকে পাখা দিয়ে বাতাস করছি, তুমি বরং একটু দুধ গরম করো গে দিদির জন্য

পল্টু (মন্দা ভিতরে চলে গেলে হেসে) খুব অ্যাকটিং করলি যাহোক,

মাধবী (হেসে) তুই মা-র সামনে দিলি যে বড় !

শুয়ে পড় শুয়ে পড়। মা আসছে (পল্টু খুব মনোযোগ দিয়ে হাওয়া করে)

কেমন লাগছে, মাধু

ভালো

দুধটা খেয়ে নাও

মাধবী (মাথা নাড়িয়ে) না চা

পল্টু (লাফ দিয়ে) ইয়েস চা, নো দুধ, তুমি জল চাপাও। আমি চট করে এক চক্কোর দিয়ে আসি, দেখি কোন ব্যাটা কত জিতল, (যাওয়ার মুখে) তোমার জন্য সন্দেশ তো ? (মাকে বলেই পল্টুর প্রস্থান)

দেখলি তো (মন্দার মুখে অহংকার)মা-র জন্য কত চিন্তা, কবে বলেছিলাম সন্দেশ খেতে ইচ্ছে করে, ব্যাস

সত্যি পল্টুটা ডানপিঠে হলে হবে কি ওর কর্তব্যবোধ সাঙ্ঘাতিক

মন্দা (যেন স্বপ্নের রাজ্যে গিয়ে) ও যে আমার অষ্টমগর্ভের সন্তান, ওকে দেখলে আমি সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যাই, দেখতে পাই—পল্টু বড় হয়েছে, মানী জ্ঞানী বিদ্বান, চারধারে কি নাম ডাক, লোক আসছে, ওর কাছে আশীর্বাদ চাইতে, পায়ের ধুলো নিচ্ছে, বিদেশ থেকে ডাক আসছে হরদম, তুই দেখিস মাধু—বড় হলে ও একটা মানুষের মতো মানুষ হবে, কি বুদ্ধি ওর, একবার

দেখলে আর ভোলে না, অঙ্কে যেমন মাথা ইংরেজীতে তেমন। মাধু ওকে তোরা কিছু বলিস নে, অরুণের কিছু হল না, বরুণেরও কিছু হবে না, কিন্তু পল্টু, দেখিস ওই তোদের বংশের বাতি উজ্জ্বল করবে।

ঠিক বলেছ মা,

আমি কি বেঠিক বলতে পারি, আমি যে তোদের গর্ভে ধারণ করেছি, তোদের নাড়ি নক্ষত্র আমার চেনা, ও যে বড় হবে তা আমি আগে বুঝে নিয়েছি (স্বপ্নের ভিতরে যাওয়ার মতো)

মাধবী (মাকে কিঞ্চিৎ ঠেলে) মা, এই মা

মন্দা (ঈষৎ চমক ভাঙার পর) কি রে

বাঃ, পল্টু যে চা-র জল চাপাতে বলল,

এই গ্যাখ, ভুলে গেছি, বুড়ো হচ্ছি কিনা

আ-হা ঢঙ কোরো না। কি বয়েস হয়েছে যে নিজেকে বুড়ো বলছ

মন্দা (যেতে যেতে) বুড়ো নয় তো কি, (থামলে পর) পল্টুকে ঠেকিয়ে রাখিস একটু, উনুন নিভে গেছে, জ্বালাতে হবে,

আচ্ছা আচ্ছা, ওকে আমি ঠেকাব, তুমি নিশ্চিন্তে থাকে। (মা চলে গেলে) বাঁচা গেল,

এবার একটু (কাগজটাকে চুমু খেয়ে ধীরে ধীরে খোলে ও পড়ে)

অভিনয়ে স্বগত যেমন এখানে তেমন যদিও বাস্তবে কেউ এমন জোরে চিঠি পড়বে না তবু, পড়ে এবং নিজে মন্তব্য রাখে ফাঁকে ফাঁকে

আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারছি না, তা পারবে কেন ইচ্ছা থাকলে তো, এর মধ্যে যদি চাকরি না পাই, তাতে হয়েছে কি, তবে আত্মহত্যা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই, ইস আত্মহত্যা করতে দিচ্ছি আমি, আমার সমস্ত কল্পনা আশা-আকাজ্ক্ষা শেষ-মেষ আকাশ-কুসুম কল্পনা মাত্র, ইস তা বললে কে, তবু ধৈর্য ধরে থাকো, তা ধরব না কেন, সুদিন আসবে, তাতো আসবেই না হলে আমি কেন তোমার পথ চেয়ে বসে আছি, আমি জানি তুমি আসবে

এই যে এসেছি (মাধবীর কথার মধ্যে পল্টুর নিঃশব্দ প্রবেশ)

মাধবী চিঠিটা গালে ঠেকিয়ে চোখ বুজে থাকার অবসরে পল্টুর হঠাৎ কথা শুনে

কে! কে! (পল্টুকে দেখে চিঠি লুকোতে থাকে)

ভাবছিলাম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিস বোধহয় তাই

যাঃ, ঘুমুতে যাব কেন?

না, যেমন চোখ বুজেছিলি আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানছিলি, এসব চিঠিতে কি এসেন্স মাখানো থাকে নাকি ?

যাঃ ফাজিল !

সত্যি ! যারা পড়ে তাদের ঘুম পেয়ে যায়, যেমন তোর

গেলি তুই, মা-র জন্য সন্দেশ এনেছিস ?

অফ্ কোরস !

মা তোর খুব প্রশংসা করছিলেন, তুই অষ্টম গর্ভের সন্তান

ব্যাস তাহলেই জজ ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যাব তাই না

তাই

অথচ আমি, দ্যুৎ, ওসব হতে যাব কেন ! দেখছিস না মলয়দাকে, এত লেখাপড়া করল, এখন চাকরির জন্য ফ্যা-ফ্যা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো মানে হয় এসবের। আমি কি হব জানিস—গ্যারি সোবার্স

পল্টু একজন পাকা খেলোয়াড়ের ভঙ্গি নেয়

সোবার্স ?

ইয়েস সোবার্স, একাই তিনজন—মানে যেমন ব্যাটিং তেমন ফিল্ডিং তেমনি বোলিং, সুপার্ব, স্পিন এবং পেস, পৃথিবীর দি বেস্ট

কিন্তু মা-র ধারণা—

রাখ রাখ, মা-র ধারণা, আমি মরছি নিজের জ্বালায়, মা বলল আর ওমনি আমি হয়ে গেলাম, না ?

পল্টু চা হয়েছে

যাই মা (পল্টু হেসে) মাকে সন্দেশ দেবো, তারপর আরও কিছু ঝাড়তে হবে···বুঝলি !

মাধবী (পল্টু চলে গেলে চিঠি খুলে পড়ে, আবার ভাঁজ করতে গিয়ে পড়ে ব্লাউজে ঢুকিয়ে দেয়) মলয়ের জন্য কষ্ট হয়, এত লেখাপড়া করে কি হল, ভালোই করেছি আমি ঐ পাট চুকিয়ে দিয়ে, মলয় তো আর যা তা চাকরি করতে পারে না

মাধু, এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস (উদভ্রান্তর মতো বরুণের প্রবেশ ও কথা)

এতক্ষণ কোথায় ছিলি ছোড়দা, সারাদিন কেবল টো টো, কিছু খেয়েছিস ?

নো কৈফিয়ৎ, চা দিতে পারবি ? চা খেয়েই আবার—

মা, ছোড়দার জন্য এক কাপ

মা চা করছে নাকি, তা হলেই হয়েছে, গেলেই ভ্যাদর ভ্যাদর করবে, বরং তুই যা না—চা-টা নিয়ে আয়

ছোড়দা

কি ?

আজ সারাদিন খুব ধকল গেল, তাই না ?

খুব, বুঝলি মাধু একবার যদি নমিনেশনটা বাগাতে পারি, তবে কেল্লাফতে !

সত্যি ?

তবে। এবার নমিনেশন পেলে একটা পোর্টফোলিও সিওর, (বরুণ চোখ বুজে তর্জনী ও মধ্যমা মাধবীর সামনে তুলে ধরে) ধর দিকি উইথ-আউট ভাবনাচিন্তা (মাধবী চোখ বন্ধ করে মধ্যমা ধরতে বরুণ) হুররে মাধু

কিরে কি হল

ভাটস লাইক মাই সিস্টার, যা ভেবেছি তাই, এবার মিনিস্টার, বুঝলি ?

সত্যি ছোড়দা !

তবে !

মানে মন্ত্রী ?

হঁ্যা-হঁ্যা মিনিস্টারের বাংলা মানে তাই, ফুল কেবিনেট না পেলেও স্টেট, না হলে ডেপুটি তো বটে-ই

ডেপুটি !

সিওর, হলেই তোকে একটা জিনিস দেবো

সত্যি ?

নিশ্চয়, মন্ত্রী হলে দেখবি সব বদলে যাবে, বাবা-মার দুঃখ, বড়দা যে গান-গান করে পাগল, পল্টুর লেখাপড়া আর তোর সুন্দর একটা বিয়ে, আহ্ মাধু—আমি সব দেখতে পাচ্ছি, জলের মতো একদম

মিনিস্টার হলে গাড়ি পাবি ?

নির্ঘাৎ, একটা নাকি ! যখন দরকার, মুখের 'রা' সরতে না সরতেই হাজির হবে

আমি কিন্তু যখন তখন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব 'ছোড়দা', তখন তুমি রাগ করতে পারবে না—না

আরে পাগল তা নয় তা নয়, নমিনেশনটা পেলেই—ব্যাস

যে কেউ বুঝি নমিনেশন পায় ?

ছ্যাৎ! দেশের কাজ না করলে দেশের কথা না ভাবলে—দেখিস না আমাকে সারাদিন টো-টো করছি, বাড়ির খবরই রাখা হয় না। আজ ক্লাব তো কাল ফাংশন পরশু মন্ত্রীর ওখানে, কার খেলার টিকিট কার পারমিট ছাত্রদের জন্য···বুঝলি সে অনেক কাজ, অত সস্তা নয় বুঝলি, এই শর্মা যদু মধু নয়

এই কথা শেষ না হতে অক্ষয় ও রমেশ প্রবেশ করে এবং দুজনে ইতি উতি কি যেন খুঁজতে থাকে

অক্ষয় (খুঁজতে খুঁজতে) সামান্য ভুলের জন্য, কিন্তু নেই তো এখানে। তবে কোথায় ফেললাম, লাঠি আমার নিত্যসঙ্গী সব সময়ের, বুঝলে না (দুজনে খুঁজতে থাকে)

কুকুর-টুকুর মারা যায় আবার

কি খুঁজছ বাবা

লাঠি মা, তোমার কাকাবাবুর লাঠি

এই তো (মাধবী আলনার পিছন থেকে কুড়িয়ে) এইটে তো

অক্ষয় (লাঠি দেখে ও পাওয়ার আনন্দে) বাঁচলাম! তুমিই না মাধু? (মাধবী প্রণাম করতে গেলে) থাক থাক, সুখে-শান্তিতে থাকো এই আশীর্বাদ করি, ত্থাখো রমেশ, বয়েস বাড়ছে নাহলে এত ভুল হয় (তারপর বরুণকে দেখে) তুমি অরুণ নয় ?

না আমি বরুণ, অরুণের ছোট

ওহো, তুমি সেই বিখ্যাত বরুণ, কর্মী মহলে তোমার শুনেছি বেশ নাম-ডাক হয়েছে

তা-তা

আচ্ছা এবার ইলেকশনের প্রসপেক্ট কেমন

ইলেকশনের প্রসপেক্ট বেশ ব্রাইট (বরুণ তখন কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে) আমি বোধ হয় নমিনেশন পাচ্ছি কাকাবাবু

আর ইউ সিওর ? পলিটিকস তো ফেরেববাজদের আড্ডা হয়ে উঠেছে, তুমি কি ওদের সঙ্গে কমপিট করতে পারবে ?

(বরুণ বিনয়ে একদম গলে যায়) আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে

(রমেশ বরুণের দিকে তীক্ষ্ণ ও তির্যক ভাবে তাকিয়ে) তুমি পাবে নমিনেশন ?

কেন? দোষটা কি?

এ তোমার মাথায় ঢোকালো কে! দুদিনের ছেলে, কিছু করলে না। আর পাবে তুমি নমিনেশন, কি বাজে কথা বকছ

যা জানো না বাবা, তা নিয়ে কথা বোলো না। তুমি কিছু জানো না আমার সম্বন্ধে, কাকাবাবু দেখলে না এক ডাকে আমাকে চিনলেন, আমি পপুলার এ্যামঙ্গ

ঐ গুটিকয় ফক্কড় ছোকরার মধ্যে, বাড়িতে বুড়ো মা-বাবা কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে তার খোঁজ নেই। ইনি করবেন দেশোদ্ধার!

দেশটা শুধু তোমাদের নিয়ে নয়, দেশকে এত ছোট করে দেখো না, এত ঘর-বাড়ি করলে দেশকে দেখবে কে? আমি এই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাই না, তাই—

তাই দেশ উদ্ধারে নেমেছ, তোমার মাথায় যে ওঁরা কাঁটাল ভাঙছে তার খবর রাখো কি?

বাবা তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, লিডার সম্বন্ধে এসব কথা খবরদার যেন না শুনি। জনপ্রিয় নেতারা দেশের হৃদয় জয় করেছেন

দেশের হৃদয় জয়! তোর কিছু হলে তারা দাঁড়াবে তোর পাশে?

আহ্ রমেশ, উত্তেজিত হয়ো না, ও ছেলেমানুষ—লিডারদের সম্পর্কে—

ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ বলবেন না, একবার নমিনেশন পেলে দেখবেন এই শর্মার কদর কত (শান্ত হয়ে বরুণ) বাবাকে বলেছি সবুর করতে, সবুরে মেওয়া ফলে, একবার নমিনেশন পেলে নির্ঘাৎ মিনিস্টার

আবার বাপ-বেটা শুরু করলে, তোদের জ্বালায় বাড়িতে টেকা দায়

বুঝলে মা (ততক্ষণে মন্দা ঘরে) বাবা কিছুতেই বুঝবেন না যে আমার প্রসপেকট আছে, এই তো মাধু বল না, আজ আঙুল ধরে কি ভবিষ্যৎ বলেছিস (চা গ্রহণ) ছোড়দা মিনিস্টার হবে,

থাক থাক (রমেশের সমস্ত মুখের রেখা তখন উত্তেজনায় বিকৃত) উনি হবেন মিনিস্টার, তখন মন্ত্রী হয়ে করবেন আমাদের উদ্ধার, বুঝলে অক্ষয় কে যে ওর মাথায় ঢুকিয়েছে এসব, তুমিই বলো—এটা কি সম্ভব, একদম অ্যাবসার্ড

তোমার কাছে অ্যাবসার্ড, আমার কাছে রিআল (চায়ে চুমুক দিয়ে বরুণ) যাক তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, 'রাজনীতি কঠিন ঠাঁই, বোঝা আরও কঠিন, তোমাকে বোঝাতে যাওয়া কেবল আয়ুক্ষয়

দেখলে, দেখলে তো অক্ষয়, কথার ছিরি, শীলতা শেখে নি। বাবার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তা-ও

বরুণ (দীর্ঘ চুমুকে চা শেষ করে) দরকার নেই শিখে, সময় হয়ে গেছে, বিদ্যুৎদা হয়ত লোকজন নিয়ে এতক্ষণ এসে গেছেন, উঃ লেট হয়ে গেল

রমেশ (বরুণ প্রস্থান করলে) কি আমার নেতারে, (মন্দার দিকে চেয়ে) আমি বলে দিচ্ছি ওকে একদিন পস্তাতে হবে

তুমি তো চিরটা কাল ছেলেদের শাপ-শাপান্ত করেই গেলে, এত পেছনে লাগো কেন ছেলেদের তুমি

সাধেই লাগি! অসম্ভবের পিছনে ছুটছে, বলতে হবে না আমাকে তা, যা পাবে না হবে না তার পিছন পিছন ছুটছে

তুমিও তো তার পিছনে ছুটছ

আমি!

হাঁ তুমি, তোমার জন্যই সংসার রসাতলে যাচ্ছে

কি বলছ মন্দা

ঠিকই বলেছি, বিয়ের পর থেকে একদিন তাকিয়ে দেখেছ কি কিভাবে সংসার চলছে,

কেবল বসে বসে আঁক কষা লটারির পিছনে টাকা ধ্বংস করা

অরুণ, অরুণ

কে?

আমি বিমল, অরুণ নেই মাসিমা?

অরুণ বাড়ি থাকবে এসময় (মন্দার হাসি) তাহলেই হয়েছে

(রমেশ বিমলের দিকে এগিয়ে এসে হঠাৎ) বিমল, তোমার বন্ধুটিকে শায়েস্তা করতে পারো না ঠিকমতো? (বিমল হতচকিত) রাতদিন যে পাগলামি করে বেড়াচ্ছে গান গান করে। আমাদের মাথাও খারাপ করে দেবে, তোমরা তার বন্ধু, একটা কিছু করতে পারো না?

আমরা কি করতে পারি

বোঝাতেও তো পারো। একটা চাকরি-বাকরি

বোঝালেও সে বোঝে না, বুঝবেও না কোনোদিন। বহুদিন বুঝিয়েছি, ঐ এক গোঁ

গোঁ-টা ভাঙো তোমরা

কেন মেশোমশাই, ও তো তবু একটা কিছু নিয়ে আছে, কিন্তু আমি

তুমি বেশ ভালো আছ

না মেসোমশাই। জীবনে একটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকা দরকার না হলে—

লক্ষ্য থাকা উচিত তা বলে এই অসম্ভব অবাস্তব উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য তো তাই যা অন্যের কাছে অসম্ভব অবাস্তব মনে হয়, এভারেস্টে উঠতে প্রাণ দিচ্ছে একজন আমরা হাসছি পাগলের কাণ্ড ব'লে, কেউ সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে, না-না মেসোমশাই একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই, এই যে আমি, আমি যে কিছুই অসম্ভব ভাবতে পারি না, হাজার চেষ্টা করলেও

ইজ ইট (অক্ষয় বিস্ময়ে তাকায়) তোমার স্মৃতি নেই

'———'

ছেলেবেলার কথা ভাবতে পারো না ? (বিমলকে নিরুত্তর দেখে) ছেলেবেলার দিনগুলো ফিরে পেতে ইচ্ছে করে না ?

নন্-না (চিন্তা করে বিমল) কিচ্ছু ইচ্ছে করে না। তাছাড়া সময় কোথায় চিন্তা করার, সকাল থেকে ঘানি টানা শুরু হয় শেষ হতে প্রায় মাঝ-রাত, না না, এর মধ্যে বাড়তি ভাবনার সময় কোথায় ? মেসোমশাই যাকে অসম্ভব কল্পনা বলছেন—আহ্ তেমন যদি কিছু চিন্তা করতে পারতাম তাহলে—

খুব বেঁচে গেছ বিমল, নইলে আমার পুত্রদের মতো তোমার অবস্থা হত

ও-কথা বলবেন না মেসোমশাই, এই যদি বাঁচা হয় তবে বেঁচে লাভ কি ? আমি অরুণকে ঈর্ষা করি

ঈর্ষা করো ! (রমেনের সঙ্গে সঙ্গে মন্দাও আঁতকে ওঠে)

হাঁ ঈর্ষা করি, অরুণের মতো সবাইকে

হ্যালো বিমলদা (পল্টু ঢুকতে ঢুকতে)

তোর টিকিটের ব্যবস্থা হয়েছে

হুররে, থ্রি চিআর্স ফর বিমলদা ! বিমলদা মাইরি, তুমি আমাকে বাঁচালে, সোবার্সের এখন টপ্ যাচ্ছে, আহ্

দেখেছেন (সকলকে দেখিয়ে বিমল) কি স্ফূর্তি পল্টুর, কি পবিত্র ওর মন, সামান্য একটা কিছু পেয়েছে ব্যাস, কিন্তু আমার, পল্টুর একটা মানে একটা—

ডিটারমিনেশন লক্ষ্য আছে (পল্টু হাসে)

ঠিক ঠিক, একটা ডিটারমিনেশন একটা লক্ষ্য

ছাই, ছাই (রমেশ মুখ বিকৃত করে) আমার একটা ছেলে যদি মানুষ হয়ে থাকে !

ফের ছেলে তুলে কথা বলছ ! তুমি নিজে কি ? রাতদিন অাঁক কষে

কষে আমাদের মাথা কিনছেন। যেন সব টাকা হেঁটে হেঁটে তোমার কাছে এসে পড়বে এক্ষুণি

আঃ মা, তুমি থামবে, বাবা কথা বললেই তুমি ঝনঝনিয়ে ওঠো,

আ-হা-রে বাপ সোহাগী মেয়ে আমার, বাপ তোদের কি দেখে না ছুঁড়ি, আপনি তো খুব বন্ধুর প্রশংসা করছিলেন। ও নিজে এখন কি করে জানেন আপনি, সারাদিন শুধু বসে থাকা আর ভেরাণ্ডা ভাজা

থাক বৌঠান, ও সব বলে লাভ কি, শুধু তিক্ততা বাড়ে (একটু থেমে অক্ষয়) মাধু মা ক-টা বাজে দ্যাখো তো !

তুমি যাচ্ছ তো বিমলদা খেলা দেখতে, সোবার্স দারুণ, সোবার্সের মতো যদি খেলতে পারতাম—

তা পারবে না কেন, তুমি দেখে এসো, তারপর তোমার কাছে শুনব

ঐ তোমার স্বভাব বিমলদা, নিজেকে এত গুটিয়ে রাখো

কি করব, পারি না

আলবৎ পারবে। এত লেখা পড়া শিখলে আর এটা পারবে না

থাক থাক তোকে আর বিমলকে উপদেশ দিতে হবে না, নিজের চরখায় তেল দে গে যা,

ন-টা বাজতে দশ

ন-টা বাজতে দশ (অক্ষয় চঞ্চল হয়ে) অনেক রাত হল দেখছি, আচ্ছা বৌঠান চলি আজকের মতো, রমেশ একদিন এসো না কেন তুমি আমাদের ওখানে

শোনো অক্ষয়

পিছু ডাকলে আবার, তাহলে একটু বসে যাই

যত সব বাজে সংস্কার (পল্টু বোলিং-এর ভঙ্গি নেয়)

বয়েস বাড়ুক, তখন বুঝবে এগুলো বাজে নয়, আমরাও তাই ভাবতাম

মা, মা আলো নিবে নাচ্ছে

আলো

হাঁ

তাই তো আলো নিবছে তাই তো (অক্ষয় ও রমেশ একসঙ্গে বলে তাই তো এবং ম্লান বালবের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে) এই এই গেল গেল

মাধু এখানে চলে আয়, এখন দেখুন কতক্ষণের জন্ত গেল

আজকের রাতের মতো বোধহয়,

নিশ্চয় বাইরেটা, হ্যাঁ ঘুটঘুটে অন্ধকার, এখন বাড়ি ফিরব কি করে

মাধু, একটা মোম নিয়ে আসিস আর দেশলাই

কোথায় আছে

মিটসেফের উপরে ডানদিকে

আশ্চর্য

কেন

এমনভাবে তো কোনোদিন আলো নেভেনি, মানে যেন আস্তে আস্তে ম্যাজিকে

মাধু, মোম পেলি

দেখছি দাঁড়াও

ওখানে না পেলে ঠাকুরের আসনে আছে ডানদিকে

দেশলাই আমার কাছে আছে বৌঠান, ওকে কেবল মোম আনতে বলুন

মাধু, খালি মোমটা নিয়ে আয়, দেশলাই আনতে হবে না। এখানে আছে

তাজ্জব কাণ্ড, ইলেকট্রিক সাপ্লাইকেও বলিহারি, বুঝলে অক্ষয় প্রতিদিন ঠিক এই সময়—

কিন্তু যাই বলো রমেশ, আজকের নিভে যাওয়াটা যেন কেমন

বুড়োদের এই দোষ (পল্টুর গলা), একটা বিষয় হল তো আর কথা নেই, আরে বাবা, মেসিন কি প্রত্যেকদিন একরকম কাজ করবে ?

মা দেশলাইটা জ্বালো দিকি

এই যে মা (অক্ষয়বাবু দেশলাই জ্বালিয়ে মোমটি ধরান)

যা অন্ধকার (মাধবী জ্বলন্ত মোম টেবিলের এক কোণে বসিয়ে) আজকের অন্ধকারটা যেন কেমন মা !

—চা—ই

এত রাত্রে কি ফিরি করছে রে বাবা, আজব কাণ্ড

করতে দিন না, আপনার কি কাকাবাবু, আপনাদের জ্বালায় কেউ ফিরিও করতে পারবে না ?

না মানে এত রাতে, ফিরি করছে তাই

—চা-ই

তাইতো অক্ষয়, গ্যাখ তো পল্টু কি ফিরি করছে—এত রাতে

যাই হোক না কেন তোমার তাতে কি ? করতে দাও না বিক্রি

চোর বাটপাড়ও তো হতে পারে,

আচ্ছা যাহোক, লোকটা ঘুরছে পেটের ধান্ধায় আর

না তা নয়, হয়ত ঐ ফিরি করাটা একটা ছুতো, ঐ সুযোগে

—চা—ই

গ্যাখ তো পল্টু ব্যাপারটা কি

তোমাদের জ্বালায় (পল্টু বাইরের দিকে গলা বাড়িয়ে) এই—এই চা—ই

ক্যা—যা

ইধার আও, হমলোগ ডাকতা হ্যায়

হ বাবু হামি আসিয়াছে

ক্যাহা হ্যায় তোমার ঝুড়ির মধ্যে

আপলোগ নেবেন কুছু

আরে দেখাও না এঁদের কি আছে ঝুড়িতে

বাবু এ-চিজ বহুৎ নাজুক কটো লাগবে আপলোগকো বলুন

কি জিনিস রমেশ যে বলছে বহুৎ নাজুক হ্যায়

আরে ক্যায়া হ্যায় ফেরিওয়ালা

লাল নীল চশমে (ফেরিওয়ালা ঝুড়ি থেকে বার করতে থাকে) সবকো

লাগে গা কি বাবু—দাম মে সস্তা কাম মে খাস্তা

চশমা কিনে কি হবে মা, বাচ্চাদের চশমার মতো মনে হচ্ছে

আরে পরিয়ে গ্যাখেন, ভারি বেহ্‌তরিন চশমে, মনকে সব কুছ মিল যায়গা এক মিনট মে, যা ভাবিয়া আছেন সব কুছু, একদম

বটে

দাও সবাইকে একটা ক'রে

আমাকে দাও আমাকে একটা (ইত্যাদি কথা সকলের এক সঙ্গে)

না, আমাকে নয় পল্টু, আমি, আমি চাই না তোমাদের চশমা

আচ্ছা বিমলদাকে দিও না, সবকো দাও, কেবল একঠো বাদ দিও,

এবার সব আপনারা চশমা পিনিহে নিন, জলদি দেখিয়ে নিন আপলোগ

এই তো এই তো পদ্মার চর এমব্যাঙ্কমেণ্ট এই যে রমেন গ্যাখো গ্যাখো

পুকুরটা কেমন হয়েছে গ্যাখো মন্দা, ডাইনিং স্পেসটা পছন্দ হল ?

আহ্ রমেশ—চার্জ করছে—এবার জিতবই আমরা

মলয়দা চাকরি পেয়েছে, আচ্ছা মলয়দা এটা আবার কিনলে কেন এ যে মুক্তো

আরে ফেরিওয়ালা আপনি একি করছেন

ফেরিওয়ালা একটা লাঠি পুঁততে থাকে যেন

কুছু না বাবু, ঘর যাইব হামি তাই

আহ্ স্প্লেনডিড্, কভার ড্রাইভটা দেখুন বিমলদা, আহ্ ঠিক সোবার্সের মতো ফিল্ডিং করছি আমি, ক্যাচটা দেখুন

পল্টু যাচ্ছে বিলেতে লেকচার দিতে। কত মেডেল। কত প্রাইজ, হাততালি

কোথায় গেলেন ফেরিওয়ালা, কি করছেন আপনি, কোথায়

হিঁয়া, হম ঘর যাইতাছি, হমার টাইম বিৎ গয়া

আর আমি, আমি তো একলা, এখানে সবাই চশমায়, আর আমি

হ-হ কুছু ডর নাই, হামি যাইতাছি

আহ্ কি ফাইন স্কোয়ার কাট্। দারুণ। সেনচুরি,

ছাটস ইট, গাড়িটার দাম কত হল জানো মন্দা, যেমন কালার কম্বিনেশন দেখছ, কিছুতেই দিতে চাইছিল না,

পল্টু গভর্নর, ফুলের মালা গলায়, পল্টু বক্তৃতা দিচ্ছে

আপনি কো—থা—য়

হম যা-ই তা—ছি আপনি একটা চশমা পরিয়া নিন

আমি!

হুঁ—ঝটপট পরিয়া নিন

মলয়দা

কামিনী গার্ডেনস

গভর্নর

স্কোয়ার কাট

এদিকে লাউঞ্জ

হাঁ হাঁ আমি-ও চাই, আমিও চাই

বিমল ঝাঁপিয়ে প'ড়ে একজনের হাত থেকে চশমা ছিনিয়ে নিতে গেলে ও ছিনিয়ে নিলে আরও আর্তনাদ হট্টগোল ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আলো জলে ওঠে

ধাঃ বাবা, এ কি হল, আমার কপালটাই এই, নিভেই আলো জ্বলল !

তাজ্জব ব্যাপার রমেশ

অসম্ভব কাণ্ড অক্ষয়

কি যে হল মা

সব ভূতুড়ে কাণ্ড বাবা, এমন দেখি নি কোনও দিন, তুই ভয় পাস নি তো মাধু

সত্যি আশ্চর্য

তা হলে হল কি !

বিমল (লাফ দিয়ে) শূন্য

ফক্কা সকলে চিৎকার করে ওঠে

থ্রি. চিআর্স ফর ফক্কা

হিপ্ হিপ্ হুররে ।

চাষ-করা ঘাস

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

লবণাক্ত জল ছেড়ে ইলিশের ঝাঁক, বছর বছর উঠে আসে
দুঃসাহসী অভিযানে। নিয়ে আসে সমুদ্রের স্বাদ,
নিয়ে যায় মিঠে জল-টান…অনেকেই মারা পড়ে
তবু তো মহার্ঘ তৃপ্তি কিছু রেখে যায়, অপরের মুখে।

অদূরে পাথর-ভাঙা ঝরণার জল জ'মে আছে এক পাশে
ছোট্ট পল্বলে। আর অজস্র ব্যাঙাচি ক্ষুদে ক্ষুদে লেজ নেড়ে
প্রাণপণে আঁকড়ে থাকে পাথরের গায়
বিবর্ণ সবুজ শ্যাওলায়, আশ্রয় ছাড়ে না—
নিকটেই তাজা জল খরস্রোত ফেনা।
মরা পাথরের রং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নির্মল আশ্বাসে
সামুদ্রিক গহনের গাঢ় ঝিকিমিকি :
একটুখানি আয়নায় ফোঁটা ফেলে সুদূরের চিল
গায়ে মেখে আকাশের নীল।
চোখ বুজে ওরা ভাবে—এই তো মহৎ সত্য, শান্তিভরা আবেশ আরাম।

এদিকে ভাঙন নদী, নিমন্ত্রণ-কূলে শুয়ে আছে
পলিমাটি দিগ্‌বসনা, বন্ধ্যা ঋতুমতী।
নির্ভুল আহ্বান ফেলে বিপরীত ফসল ফলাই
নিসর্গের মায়া ঢেলে নিজস্ব শিল্পের ফল
গ'ড়ে তুলি নিঃস্ব এক ভাবুক বৈরাগী।

নয় তো তিন বিঘে জমির
ভরপুর জোতদারি করি ঢিলে পায়জামা আর মোকাসিন পরে
আগাছার ঝাড় ছেঁটে সরু আল দিয়ে
নিরাপদ কাঁটা-তার বেড়া বেঁধে স্বপ্ন দেখি যত
শিশির পান্নায় ভেজা নরম ঘাসের।
আদিমের টান ছিঁড়ে, বাস্তব চাহিদা ভুলে, সৌখিন মনের
অগ্নিমন্দা দিয়ে ভাবি—মিটবেই জগতের ক্ষুধা।

আর তুলোট কাগজে লিখি রং-ঢং লেপা
আমাদের বাগানের চাষ-করা ঘাস—
আহা! শ্যামল মখমল কত রোদে ঝলমল—
খেয়ে শুঁকে সবাই বাঁচুক না!

হে অনাবিষ্কৃত, হে আকাশ

রণজিৎকুমার সেন

কি লিখি কি লিখি ভেবে যখন সময়টা একান্ত আলস্যে কাটে,
যখন নারীর প্রসব-যন্ত্রণার মতো আমার লেখনী
কোনো একটা চিত্রকল্পকে প্রকাশের অক্ষমতায় ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে,
আর আমার বোবা চিন্তাগুলি জট পাকাতে পাকাতে আর জট বাঁধে না,

তখন অকস্মাৎ, হে আকাশ, তোমার দিকে দৃষ্টি যেতেই
　নানা দৃশ্যের সংরাগে মন আমার বিলাসখানি টোরী গেয়ে ওঠে।

কখনো তুমি সৌরসভায় সূর্যদীপ্ত মহারুদ্র,
কখনো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ কুটিল মেঘভারে সারা দিগন্ত থান্ থান্ ক'রে
　　বিদ্যুৎ-চমকে তুমি বজ্র হানো,
রামধনুর সাত রঙে ললাট হয়ে ওঠে রঞ্জিত ;
কখনো বা শীতের তুষারতীর্থে কুজ্ঝটিকায় তুমি মুখ ঢাকো,
　　কুয়াশায় আচ্ছন্ন দেখি তোমার সারা দেহ,
কখনো বা গিনি-পদ্মের মতো কোটি কোটি স্বর্ণতারকা বুকে নিয়ে
　　ষোড়শী বধূর মতো হাসো ;
তোমার পূর্ণিমার রূপে কিন্নরীর নূপুর-নিক্কন বেজে ওঠে বিশ্বপ্রকৃতি জুড়ে,
আবার অমাবস্যায় তোমার নিমীলিত চোখের গাঢ় নিদ্রায়
　　তমাসায় ছেড়ে থাকে দিগন্ত।

নীলে নীলে কখনো তুমি নীলাদ্রি,
কখনো ধূসরে গৈরিকে তুমি উন্মন উদাসীন,
তোমার বিচিত্র রূপের জালে জড়িয়ে রেখেছ এই পৃথিবী।
নীহারিকাপুঞ্জে কখনো তুমি সমাকীর্ণ,
কখনো বা উল্কা আর ধূমকেতুর পুচ্ছলেহনে
　　তোমার অস্তিত্ব হয় লাঞ্ছিত ;
অথচ গ্রহে-গ্রহান্তরে তোমার নিত্য রসের মিতালি,
হে অনাবিষ্কৃত, মহাশূন্য, হে আকাশ,
সৃষ্টির আদি ইতিহাসের জন্ম-ঠিকুজি নিয়ে
　পৃথিবীর কাছে আজও তুমি স্বপ্ন হয়ে আছ।

তোমার দিকে দৃষ্টি যেতেই অকস্মাৎ আমার আলস্যের মুহূর্তগুলি
　কখন নানা ভাববিভঙ্গে মূর্ত হয়ে ওঠে,
একটা মনোহর চিত্রকল্পকে রূপ দিতে গিয়ে
　সহসা সন্তানবতী নারীর মতো রূপবতী হয়ে ওঠে আমার লেখনী,
আর বোবা চিন্তাগুলি বিলাসখানি টোরীর সুরের ঝঙ্কারে নিমগ্ন হয়ে যায়।
আমি যেন সেই মুহূর্তে এক অনন্ত উল্লাসে নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে উঠি।

এখনই সময়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

একসঙ্গে যাওয়ার এখনই সময়।
স্তম্ভে ফাটল, ভিৎ নড়বড়ে,
দূর্বাগজানো গর্তগুলোতে ইঁদুরের যাওয়া-আসা।
এতোদিন জোড়াতালি দিয়ে চলছিল
ভাঙা রেলগাড়ি;
এখন লাইনচ্যুত।
বদলে যাচ্ছে পুরনো আমলের নকশা,
হেলে পড়ছে একটার পর একটা
পুরনো ঘর, প্রাচীন খিলান।

একসঙ্গে যাবার এখনই সময়।

দীর্ঘকাল সময়ের জটগুলো খুলে-খুলে
চলতে চলতে
এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে
মাঠ একেবারে শূন্য নয়, দু-একটা সজীব অঙ্কুর
হাসিমুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।
নদীর দিকে গেলে
জল সবই ঘোলা নয় নতুন স্রোতের ছোঁয়ায়
এক-এক জায়গায়
কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে রক্তের দাগগুলো
এখানে-ওখানে চোখে পড়ে;
অথচ সূর্যের আলোয় রাতের জ্যোৎস্নায়
মাঠের গাছপালায়
পাঁচ পাহাড়ের চূড়ায়
কেমন যেন দিন-বদলের হাওয়ার সঙ্কেত!

একসঙ্গে যাওয়ার এখনই সময়॥

পাথর ঘুমায়

চিত্ত ঘোষ

কার হাত টেনে টেনে উপড়ে ফে'লে অনুভূতিগুলো
কার হাত মূল ধ'রে টানে।
ভীষণ নিহিতভাবে এই এক গতিধারা
ভাসায়, ভাসিয়ে নিয়ে যায়।
জলের দুদিক বড় দূরে।
ছিঁড়ে যায়, আলগা হয়ে যায়, শিকড়ের সব মুখ।
কেউ কেউ স্নায়ুর ঝুলন্ত সেতু পার হয়ে
বৃক্ষময় সুস্থির পাহাড়ে যেতে চায়।
সেখানে প্রবল নদী ভিন্ন খাতে প্রবাহিত
সে-নদীতে সন্ধ্যাবেলা অনেকেই নিরুদ্দেশ প্রদীপ ভাসায়।
শূন্যহাতে স্পর্শ করে জল
সে জলের নীচে শুধু পাথর ঘুমায়।

পানকৌড়ি

সিদ্ধেশ্বর সেন

পানকৌড়ি, পানকৌড়ি
ডাঙায় ওঠ'সে

তোমার জন্যে ভাঙা মাচার ভেলা
ভেসেছে

পানকৌড়ি চুপ্
জলের মধ্যে ডুব্

পানকৌড়ি, পানকৌড়ি
ডাঙায় ওঠ'সে

ঘরের মধ্যে ঘরামী
পারের কড়ি পারাণীর

তোমার জন্তে
ঘরের হাতায় নদী ডেকেছে

ডাঙায় বইছে
সোঁতা

গাঙ্
ঢুকলো পিছু

গাঙের টান ভাসিয়ে নিলে
যা কিছু সব কিছু

ভাসলো হেঁসেল ভিটেমাটি
ভেসে গেল শেষ কান্নাকাটি
দুখের কচির কাঁথা

পানকৌড়ি আয় দেখে যা
খাস্ আমার মাথা

পানকৌড়ি চুপ ।।

মানুষের মিলন-উৎসবের দিন

লোকনাথ ভট্টাচার্য

হাত বাড়ালেই বল্লম, বল্লম তুলেই ছোঁড়া, এবং তা নির্ঘাৎ বিঁধবে। সেটা যেমন জানে হাত, তেমনি দেয়াল, ঘরের কোণে-কোণে উত্তাল আর্তি, রক্তের পিপাসায় হাঁ-করা মুখ ছবির, ধূলার, ভ্যাপসা গন্ধের নীরবতার। এমন-কি সেই আশ্চর্য সূর্যাস্তের আকাশ বা দুঃখের শতদল পদ্ম, যারা এখনো মায়ের জঠরে জ্রূণ, তা চোখের ভিতরের চোখে ইতিমধ্যেই রঞ্জিত-প্রস্ফুটিত, হয়তো আরো সত্য বাহ্যের দৃশ্য বস্তু হতে। তাই দেখছি যেখানে কিছুই দেখা যায় না, শূন্যে জাগছে গাছ, যে-গাছের ডালে ময়ূর নাচছে।

বর্তমান ও আসন্ন ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ এই ঘর এক আজগুবি রূপকথা, নানান রঙের প্রতিফলনে স্বচ্ছ স্ফটিক—মনে হয় যেটা দেখছি তা নেই বা যা দেখছি না তা-ই রয়েছে, অথবা যা আছে ও নেই বা যা হয়েছে ও হবে কিম্বা একেবারেই হবে না, তারা দুজনেই রয়েছে একের পিঠে অন্যে চেপে, গাছের খানিকটা দেয়াল, কান্নার সরল রেখাটাকে স্তব্ধতা যেখানে যেমন-খুশি খান-খান কাটে। যে-যুদ্ধ চলছে ও আপাতদৃষ্টিতে যার জয়-পরাজয়ের ফলাফল ভয়ার্ত কল্পনারই খোরাক, তার ইতিহাস এখনই লিখিত হয়ে আছে অতি স্পষ্ট হাতের গোটা-গোটা হরফে, লালায়িত সে কুতূহলী নাবালকদের পাঠ্য হতে—রণাঙ্গনে ঐ-তো দেখি সমাপ্তির সন্ধ্যা, যখন যত শকুন আগে পালিয়েছিল ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে, তারা শ্মশানের প্রহরী ফিরছে একের পর এক, চোখ যেন হিংস্র তলোয়ার, নিরীক্ষণ করছে সারে-সার পড়ে-থাকা মুণ্ড, তাদের লালার ক্ষরণে বাতাস বিষাক্ত সিক্ত। আরো পরে যে-রাত্রি নামবে ও সে-রাত্রি পেরিয়েও যে-সূর্যোদয়, তার ভেরীও সমানই নিস্বনিত, যেহেতু ইতিমধ্যেই ধ্বংসের প্রান্তর রূপান্তরিত বসতির পত্তনে, রাস্তার দুধারে পোঁতা দেবদারুর চারায়, কোথাও ছোট-বড় বাড়ির সারিতে, আরো দূরে তোরণে, তোরণ ছাড়িয়ে পুরীতে, পুরীর ভিতরে মহলে, পরে গালিচা-পাতা দালানে নিঃশব্দ পা ফেলে-ফেলে অবশেষে ঐ-তো ঝাড়-লণ্ঠনের নিচে, যেখানে সিংহাসন ও যে-সিংহাসনে আসীন রাজ্যের অধীশ্বর, ঝকমকে মুকুট কিংখাব ইত্যাদি, পাশে সান্ত্রীর চামর, চিত্রবৎ পারিষদবর্গ, অদূরের অবগুণ্ঠনের ওপারে চাঁপার কলির মতো আঙুল ছোঁয়-ছোঁয় বলে শায়িত বীণা।

এ-মুহূর্তে যদিও ধেই-ধেই করে নাচে আলো-ছায়া, মেঘের ডম্বরুতে থেকে-থেকেই বুকে কম্পন, উল্টো-পাল্টা কথা, সংগীতে কোলাহল, তবু দেখছি আরো দুর-দুরান্তে বিস্তৃত জনপদ, যেখানে কুয়াশা কেটে গেছে বা ঝড়ের পরে উত্থিত ধূলিকণাগুলি একে-একে নেমে এসেছে আবার মুক্ত করতে মহুয়ার দূরাগত গন্ধের বহুক্ষণ অবরুদ্ধ পথটি, ঐক্য ও প্রাঞ্জলতা ফিরেছে ঘরে, যখন নিখুঁত শিল্প হয়ে বিরাজমান দেয়ালে-দেয়ালে রক্ত, কোণে-কোণের চোখের জলে মুক্তা, দুঃখ পরিণত চারিদিক নীল পাহাড়ে ঘেরা কাকচক্ষু-সরোবরে, এমন-কি বেশ দেখছি কারা-কারা আসছে তখন ঘরে, উৎসুক সেই পর্যটকের দল, তাকিয়ে একবার এটায় একবার ওটায় কী বলছে না-বলছে, কারুর কুঞ্চিত ভ্রূ, কেউ ধিক্কারে মুখ বেঁকায়, ও সেটা এমন জলজ্যান্ত দেখছি বলেই হাত আমার কেঁপে যায় এই যখন বল্লমও ছুঁড়িনি এখনো, যদিও তা এক লহমারই জন্যে, সঙ্গে-সঙ্গে আবার আমি দৃঢ় যেহেতু বিঁধতে হবেই, যেহেতু জানি বিঁধতে পারবই, তাছাড়া হয় হোক কুঞ্চিত ভ্রূ একের, সঙ্গী অন্যের ঠোঁটে হয়তো আত্মীয়তার আবেশ ঘনাবে—হয়তো কেন, ঐ-তো ঘনাচ্ছে

অতএব তারাও রয়েছে এই ঘরে, কাছে-দূরে পায়ের শব্দ পাচ্ছি আরো কত জনার, যারাও ঢুকতে চায়, হয়তো ঐ চটিটা খুলছে চৌকাঠের ওপারে, তাদের অপেক্ষা দুয়েকজনের বেরিয়ে যাওয়ার যেহেতু ঘরে স্থান নেই তিলধারণের, এবং এত ভিড়ে আমি নিজেও হারিয়ে রয়েছি কোথাও, সকলের মতো দর্শকই বনে গেছি, তারিফ করছি ভ্রূ কুঁচকাচ্ছি বা কিছু উৎকট মনে হল তো বিস্ময়ে হতবাক। ধ্বংস বা সৃষ্টির সবই যখন এভাবে তৈরি হয়ে রয়েছে, মানুষের সেই মিলন-উৎসবের দিনটিও এখুনি আলপনায় আঁকা, তখন কথাটা মনে জাগল বলে বলি,

যে-পথে পা ফেলা হচ্ছে, এই ফেলছি বা এখনো তবু ফেললাম বলে, এবং যে-একই পথ বেশ দেখছি এই মুহূর্তেই অতিক্রান্ত হয়ে রয়েছে তার মৃত্যুতে বা গন্তব্যের গম্বুজে ও কৃষ্ণকলির ঝাড়ে, তার চেতনা আমাকে, আমাদের সকলকে, চটিজুতোকে-বল্লমকে বিরাট পুরুষ করে রেখেছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে কাঁপিয়ে, টাঙিয়ে আকাশ থেকে আকাশে, অতীতে-ভবিষ্যতে।

খেলার প্রতিভা

সুনীলকুমার নন্দী

এত বেশি কাছে এলে—
　　　　এতটা না-এলে, হয়তো
ভালো ছিল
রক্তের গহ্বর থেকে উঠে আসে খরটান
ছিঁড়ে যেন পাথুরে শিকড়।

ভূমিতল ক্ষয়ে চলে, বনেদী গম্বুজ ভাঙছে
　　　　খুলে যাচ্ছে শরীরের ভিতর অবধি—
তুমি
এত বেশি কাছে এলে
আয়ত্ত চোখের কোণে খেলাকরা বেদেনীর তীক্ষ্ণ তরবারি
খ'সে পড়ে, ভেসে যায়
কালকালিন্দীর স্রোতে খেলার প্রতিভা।

মোহিনী ছলনা

কৃষ্ণ ধর

তোমার মাথায় ওরা পরিয়ে দিয়েছিল
জলপাইপাতার মুকুট
তুমি তা ফেলে দিয়ে তুলে নিলে ইস্পাতের হেলমেট।
তোমার হাতে কত যত্ন ক'রে এঁকে দিয়েছিল মেহেদির ফুলকারি
তুমি তা ধুয়ে মুছে পরলে লোহার দস্তানা।

তোমার রথের রশিতে টান দেবে ব'লে
পথে নেমেছিল সারা শহরের মানুষ

তুমি ঘুরপথে বুলেট-প্রুফ গাড়িতে
ততক্ষণে হাওয়া।

তোমার সঙ্গে মেলা দেখতে যাবে ব'লে
সাত সকালে দোরগোড়ায় এসে বসেছিল
গাঁয়ের ছেলেবুড়ো মেয়েমানুষ
তুমি তখন মনসবদারদের সঙ্গে
বাঘবন্দী খেলায় মত্ত।

ওদের দেওয়া সাধের মুকুট, গলার মালা, আর রঙিন আঙরাখা
ধুলোয় মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে।

তোমার গলায় মিথ্যে মিথ্যে কেবল
'ভালোবাসা, ভালোবাসা'র রেকর্ড বেজে চলে
ওরা কি জানে তোমার রেশমী ওড়নার তলায়
লুকনো আছে চকচকে বাঘনখ!

নদীতে কিছু পাথর

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পাথর কিছু পাথর থাকা ভালো
নদীতে কিছু পাথর থাকা ভালো।
তাহলে, যদি ফেনার ফুল ফোটে
গানের মতো শ্বাপদ ভেসে ওঠে—
পাথর কিছু পাথর থাকা ভালো
নদীতে কিছু পাথর থাকা ভালো।

পুকুর ভারি প্রয়োজনীয় স্নানে,
শীতল থাকে ছায়ার অবদানে—
শ্যাওলা-দাম মজায় তার কোণা
তলায় শোয় পাঁকের কালোসোনা ;
বাতাস তাকে পরায় ডুরে শাড়ি—
এমন রূপ ! ভালো না বেসে পারি ?

এরা তো এই দুজন, বলো কাকে—
জড়াব ক্ষুৎকাতর সাতপাকে ?

পূর্বার্ধ

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

খুব জোরে কথা ব'লো না ;
ঢেউ দিয়ো না, শরীর।
হাততালি না,
গন্ধ, পাথর, ফলসা বা নিয়ন—
কিংবা হাতের ভিতরকার বাজনাও না ;
সব, সর্বস্ব থেকে
তুলে আনো চিরস্থির পূর্বার্ধ।

পশ্চিমে
ক্রমাগত রাঙিয়ে ওঠে কোলাহল ;
কথা নয়, ব্যসন।
পুড়ছে কাগজের স্তূপে প্রেতাত্মা !

শান্ত ও পলকহীন সে-কালো—
আমার।

যেখানে নদীতীর ছেয়ে আছে এক-একটি গণ্ডুষে,
আমি যাব সেই ঠাণ্ডা কিনারায়।

ঝুঁকে দেখব
যা-দেখার নয়, যাকে চোখ
জলেরই মতো স্থাখে ঝরতে
তেমনি প্রদোষ,
যা আস্তে দু-একটি কথা ব'লে, চুপ।

ঢেউ রেখো না আর, শরীর।

গরিবি

শিবশম্ভু পাল

আমি তেমন ধনী ছিলাম না
তেমন ধনী আজও আমি নই।
শত্রুপক্ষ আমার সামনা-
সামনি হলেই আঁকড়ে ধরি বই।
বই? নাকি সে কিংবদন্তি
সূত্রধারক প্রধানমন্ত্রী
চন্দ্রালোকে শোনায় রামনাম?

আমার নেই তাঁবুর সমাদর
তাঁবুর মানে চিরহরিৎ ঘন
ছায়ায় আঁকা স্বদেশ, দেশান্তর।
ছায়া? নাকি সে স্পষ্টতই কোনো
সুসমাচার, মহাত্রাণের বিধি
আয়নবায়ুর ভদ্র প্রতিনিধি
কাঁটাতারে ঘিরল তেপান্তর।

তেপান্তরের মধ্যে থতমত
আমার গরিব পক্ষিরাজ ঘোড়া
বিপ্রতীপ সমীরে বিক্ষত
গোলাপফুলের আরণ্যক তোড়া
খুঁজে পায় না, ভাঙা আয়না শুধু
দেখায় আমায় ভাঙাচোরা সুদূর ;
সুযোগবাদী শক্র উদ্যত !

তলস্তয় ও সমসাময়িকতা

তরুণ সান্যাল

ইলিয়া রেপিনের তলস্তয়কে মনে হয়েছিল যেন এক শক গোষ্ঠিপতি। মনে হয়েছিল যেন প্রস্তর যুগ থেকে নেমে আসা জীবন্ত এক ভাস্কর মূর্তি। "কি দারুণ বিস্ময়কর! স্পষ্ট চোয়ালের হাড়, অমসৃণভাবে খোদাই নাসিকা, দীর্ঘ বিস্রস্ত শ্মশ্রু, দীর্ঘ কর্ণ, সাহসী ও দৃঢ় ওষ্ঠাবয়ব, চোখদুটির ওপরে বাইরে বেরিয়ে আসা ভ্রূ-যুগল যেন বর্মপট্ট। ভয় জাগানো, প্রভাবশালী, আক্রমণাত্মক তাঁর দর্শন। তবু এই গোষ্ঠিপতি আর তাঁর অনুসারকেরা ঢের দিন আগেই তাঁদের সব অস্ত্রশস্ত্র বাতিল করে দিয়েছেন এবং শান্তি ও আত্মার স্বাধীনতা-রক্ষায় তাঁরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁদের বিশ্বাস ও নম্রতা ছাড়া আজ আর কোনো অস্ত্র নেই।...লেভ নিকোলায়েভিচ বসে আছেন মাঝখানে। তাঁকে ঘিরে বসেছে, দাঁড়িয়ে আছে সুসজ্জিত ভদ্রমহিলা, বুদ্ধিবাদী ছাত্রছাত্রী, অনতিবিংশতি তরুণ-তরুণী আর তাদের বাইরে ভ্রূকুটিল চোখে অতি গুরুত্ব নিয়ে তাকিয়ে আছে কয়েক ডজন চোখ। প্রশ্নজটিল ভাবে তদ্গত।" রেপিনের চোখে সেই রাফায়েলের আঁকা এজিকিয়েল-এর জেহোবা-সদৃশ ব্যক্তিকে গোর্কির মনে হয়েছিল "এই মানুষটি ঠিক যেন ঈশ্বর।" তলস্তয় তখন গোর্কিকে বলছিলেন "তোমরা সব সময় বলো—সৌন্দর্য সৌন্দর্য। কিন্তু সৌন্দর্য কি? সব চেয়ে উঁচু, সবচেয়ে পরিপূর্ণ তো ঈশ্বরই।" আর লেভ মানে তো সিংহ, তলস্তয় শব্দটির অর্থ শক্তিমান। ইয়াসনায়া পলিয়ানার অর্থ একখণ্ড উজ্জ্বল মাঠ।

লেভ নিকোলায়েভিচ তলস্তয় সম্পর্কে এই অনুষঙ্গগুলি তাঁকে বুঝতে যেন অনেকখানি সাহায্য করে। রুশদেশের তৎকালীন যন্ত্রণা, বেদনা ও অন্ধকারের মধ্যে তিনি ছিলেন সেই ঈশ্বর জেহোবা, সেই শক্তিধর সিংহ। আর এক খণ্ড উজ্জ্বল ভূমিখণ্ডে দাঁড়িয়ে তিনি বিশ্বকে আলোকিত করার কাজে দায়বদ্ধ হয়েছিলেন। তবু তাঁকে ঘিরে ছিল স্তাবকের মতো তথাকথিত ভদ্রজনেরাও। কখনো বিশ্বাসে কখনো অবিশ্বাসে তাঁর দিকে প্রশ্নকুটিল চোখে তাকিয়ে ছিল রুশ সাধারণ মানুষ। জারতন্ত্রের গোয়েন্দা দপ্তরের সদা সতর্ক চোখ তাঁকে অহরহ অনুসরণ করেছে।

কোন তলস্তয়কে আমরা চিনতে চাই? মহাশক্তিধর কুশলী কথাশিল্পী, তলস্তয়পন্থী নীতি-অনুসারীদের ধর্মগুরু, রাজনীতি ও সমাজ ভাবনায় অহিংসা, অপ্রতিরোধ ও ক্ষমার উদ্গাতা—কাকে? মানুষ তলস্তয়, গুরু তলস্তয়, শিল্পী তলস্তয় কাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করি। আমাদের দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মধ্যে তলস্তয় ছিলেন দীক্ষাগুরু—গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত তলস্তয় ফার্ম থেকে যার সূত্রপাত, গান্ধী-তলস্তয়, তলস্তয়-তারকনাথ, তলস্তয়-উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের পত্রালাপের মধ্য দিয়ে যার বিকাশ, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পালের মধ্যে যার প্রতি মনস্কতা—সেই তলস্তয় আমাদের জাতীয় আন্দোলনে কি প্রভাব রেখেছিলেন সে বিষয়ই যেন আমরা অনেক বেশি জানি। অথচ রুশ-বিপ্লবের স্তর ও প্রক্রিয়া বিচার করে তলস্তয় প্রসঙ্গেই লেনিন বলেছিলেন, তলস্তয়ের ছিল চাষী-গণতান্ত্রিক-বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গি। সেই উপকরণকে কাজে লাগিয়েই কি গান্ধীবাদী গণ-আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছিল এদেশে? রাস্কিন, তলস্তয় ও থোরো কে বেশি কে কম ঐ আন্দোলনের মধ্যে প্রভাব রেখেছিলেন—আজও তা আমাদের প্রশ্ন।

রুশ-বিপ্লবের অন্যতম রূপকার তলস্তয়ের ভাবাদর্শ ও আচরণবিধি ব্যবহার করার দাক্ষিণ্যে কি আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনেও এসেছিল নানা বৈপরীত্য, টানা পোড়েন? যার ফলে আজও এমন একটা আন্দোলনজাত উত্তরাধিকার আমরা বহন করছি—যার ফলে এখনো জাতীয় স্বাধীনতার কর্মসূচির মূল লক্ষ্যবস্তুগুলি আয়ত্তে এলো না? তার জন্যে এখনো প্রতীক্ষায় রয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা।

বাস্তবতামুখীন সাহিত্য-জিজ্ঞাসুর কাছে আসেন আরেক তলস্তয়।

ঐ বাস্তবতার প্রসঙ্গে লেনিন ইনেসা আরমণ্ডকে একটি চিঠিতে পাঁচশ পঞ্চাশটি চরিত্র-খচিত তলস্তয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' মহা-উপন্যাসের প্রতিটি

চরিত্রই যে এক-একজন বিকল্পরহিত এক-একটি অনন্য মানুষ তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতে বলেছিলেন। "প্রতিটি একক ঘটনার চরিত্রগুলি ও প্রতিটি বিশেষ ধরনের টাইপ বিশ্লেষণের মধ্যে সমস্ত সারবস্তু অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।" ১৮৬১ সাল থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে রুশ সমাজজীবনের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আলেখ্য তলস্তয়ের সৃষ্টিশীল রচনায় লেনিন প্রতিফলিত হতে দেখেছিলেন। ঐ সময়টিকে লেনিন বলেছিলেন রুশ বিপ্লব-সাধনার জলবিভাজিকা। গিওর্গি লুকাচ এই শিল্পকর্মের সৃজনশীলতায় লক্ষ্য করেছিলেন "ঐতিহাসিক উদ্বর্তনের ফল হিসাবে বিকশিত ব্যক্তির প্রয়োজনীয় উপস্থাপনা। তেমনি হৃদয়ের গভীরতম অঙ্গনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু বহন করে চলেছে, সেই আভ্যন্তরিক গুণাগুণগুলির উন্মোচন চাই। সে উন্মোচন এমনকি কখনো কখনো ট্র্যাজিক রূপও পেতে পারে।" তাই তলস্তয়ের মধ্যে পেয়ে যাই আমরা এক বিচিত্র সময়কে। পাই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে নানা নির্দিষ্ট চরিত্রের মিছিল। সমকালীন রাজনীতিবিদ, প্রচার পুস্তিকা-লেখক ও নীতি-প্রচারকদের কাজকর্ম একসঙ্গে মেলালেও সে সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক সত্য এমনভাবে পাওয়া যাবে না। মার্কসই তো ঢের আগেই তাঁর সমকালীন আধুনিক ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন এমন কথা। দাস ক্যাপিটাল রচনা শেষ করার পর তাই মার্কসের বাসনা ছিল বালজাকের 'হিউম্যান কমেডি'র একটি বিশদ সমালোচনা লেখা। বালজাক বিষয়ে এঙ্গেলস-এর বক্তব্য আমাদের সবারই জানা। এঙ্গেলস বলেছিলেন ১৮১৬ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত ফরাসী সমাজের এক পরিপূর্ণ ছবি তিনি ঐ 'হিউম্যান কমেডি'তে পেয়ে যান যা ঐ সময়ের ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতত্ত্ববিদদের কাজ একসঙ্গে মেলালেও পাওয়া যায় না। বালজাক পুরনো সামন্তবাদী সমাজের অভিজাতদের প্রতি মমতায় আপ্লুত ছিলেন। তা সত্ত্বেও যেহেতু টিপিক্যাল চরিত্র টিপিক্যাল অবস্থানে চরিত্রানুগ করে এঁকেছিলেন, বাস্তবতার নিজস্ব নিয়মে আগামী দিনের সম্ভাবনার ইঙ্গিতও তাই তিনি দিয়েছেন। এবং তাঁর সহানুভূতির লক্ষ্য চরিত্রগুলিতে সমাজের অবধারিত পতনও প্রতিফলিত করেছেন। তলস্তয় এই বাস্তবতাবাদেরই পক্ষাবলম্বী শিল্পী। উপরন্তু তাঁর সহানুভূতি ছিল উৎপীড়িত কৃষক জনগণের প্রতি। ফলে, তলস্তয়ের রচনায় একটি বিশেষ যুগের ঐতিহাসিক সত্য আমাদের চোখে অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। ধরা পড়ে

বিকাশমান পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলির বিয়ে তাঁর ঘৃণা। জনগণের গভীর দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা বিষয়ে তাঁর সচেতনতা ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া চাষীকে পুঁজিবাদীবিকাশের আনুষঙ্গিক ফল হিসাবেই তো ১৮৬১ সালের পরে রুশদেশে বিশেষভাবে দেখা গিয়েছিল।

১৯০৮ সালে তলস্তয়ের আশিতম জন্ম বার্ষিকী উদযাপনকালে তাঁর স্মরণীয় প্রবন্ধে লেনিন তলস্তয়কে বললেন 'রুশ বিপ্লবের দর্পণ'। রুশ দেশের প্রথম বিপ্লব ১৯০৫ সালে ফেটে পড়ল। ব্যর্থও হল তা। ঐ বিপ্লবের যা সদর্থক দিক, যা নঞর্থক দিক—সব কিছুর মধ্যেই ছিল তলস্তয়ের স্বাক্ষর। উনিশ শতকের শেষ দিকেই অভিজাত ও বুদ্ধিজীবী মহলে গুঞ্জন ছিল—'ঐ চাষীরা এলো বলে। হাতে তাদের ধারাল দা, কুড়ুল, মুগুর।' কিন্তু চাষীরা যখন এল, তাদের মাথায় তখনো ধর্মের সংস্কার কিলবিল করছে, কানে 'প্রেম বিলাও, ক্ষমা করো' মন্ত্র বাজছে, আর প্রার্থনা ফিসফাস করছে 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, এই বলিয়া তোমার নাম খ্যাত হউক ' ইত্যাদি। যে চাষীর ছেলের গায়ে সৈনিকের উর্দি—অত্যাচারী সেনাধ্যক্ষকে সে বন্দী করেও শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। তারপর দাঁড়ায় গিয়ে কোর্ট মার্শালের তাক করা বন্দুকের সামনে, চলে যায় সাইবেরিয়ায়, অথবা পিঠ পেতে দেয় চাবুকের কাছে। লেনিনের মতে চাষীর যে সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লবী রূপ—সে তো গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই রূপ। তবে পশ্চিম ইয়োরোপে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া নেতৃত্বে বিপ্লব ঘটেছিল, রুশদেশে বুর্জোয়াদের আর তেমন বিপ্লবী তৎপরতা ছিল না। বরং সামন্ত প্রভুদের সঙ্গে এক নতুন সমঝোতা হয় তাদের। সামন্তবাদী উৎপীড়নও রয়েছে, অথচ সমাজ থেকে চাষী উৎখাত হয়ে যাচ্ছে, জমি হারাচ্ছে তারা। নতুন এক রুশদেশী কায়দায় তখন পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটছে। ফলে বুর্জোয়া নেতৃত্বহীন গণতান্ত্রিক বিপ্লব চাষী-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপ নেয়। শ্রমজীবীশ্রেণীর নেতৃত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়নি সে বিপ্লবে। সেজন্য শ্রমিকশ্রেণীর চৈতন্যও তাতে স্পষ্ট করে ধরা পড়েনি। তাই বিপ্লবের চূড়ান্ত পর্বেও পাওয়া গেল চাষীমনোভাবের পিছুটান। তার খ্রীষ্ট, তার ক্ষমা, তার অনুশোচনা ও 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা'-র তলস্তয়বাদী দর্শন তাকে জয়ী হতে দিল না। তলস্তয় তাই লেনিনের চোখে প্রথম রুশ বিপ্লবেরই দর্পণ—সব সদর্থক ও নঞর্থক দিক নিয়েই।

মহান লেখককে বিপ্লবের কোনো-না-কোনো দিক প্রকাশ করতেই হয়, বলেছিলেন লেনিন। তলস্তয় ঐ চাষী-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের

দিকগুলি প্রতিফলিত করেছিলেন—তাই তিনি বিপ্লবের দর্পণ। তলস্তয় রাজনীতি বিষয়ে বরং বীতরাগই পোষণ করতেন। রুশদেশে যা ছিল চাষী জীবনের চৈতন্যবিকাশের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক সেই ধর্ম নিয়েই তলস্তয় বড় বেশি ব্যস্ত ছিলেন। তথাকথিত তলস্তয়পন্থীরা এই ধর্ম, নীতি, অনুশাসন ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে ঢাকঢোল পিটিয়ে তাঁকে প্রায় পয়গম্বর বানিয়ে তুলেছিলেন। অন্যদিকে সরকারী প্রচারবিভাগ, উদারনীতিক ও মেনশেভিকরা ঐ বিপ্লবের পরাজয়ের পরে তাঁকে 'বিশ্ববিবেক' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে, ১৯০৫ সালের মূল প্রশ্নগুলিকে ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করেছে। এবং এজন্য তাঁরা আবার তলস্তয়কেই উদ্ধৃত করেছে। যে-শত্রুর বিরুদ্ধে তলস্তয় উৎপীড়িত মানুষের কথা তুলে ধরেছিলেন, সেই শত্রুরাই তাঁকে তাঁর নিজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছে। এখানেই লেনিনেরও যুক্তিবাদী সমালোচনা। তিনি মহান সৃষ্টিশীল শিল্পী তলস্তয়ের জন্য গর্ব প্রকাশ করেও তাঁর পিছুটানগুলির বিষয়ে নির্মম হয়েছেন। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লেনিন তলস্তয়ের মহিমাকে প্রবল নিষ্ঠায় শ্রদ্ধা করে গেছেন। বলেছেন তলস্তয়ের মহান উত্তরাধিকারের দায়ভাগ বহন করবে রুশদেশের শ্রমজীবী সর্বহারাশ্রেণী। তলস্তয়ের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মাত্র সাতবছর পরে শ্রমজীবী শ্রেণীর নেতৃত্বে রুশদেশে যে-অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব জয়ী হল, সেই বিপ্লবের মহাপ্লাবনে সামন্ততন্ত্রবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবও জয়ী হল। যা ছিল তলস্তয়ের আরব্ধ বৈপ্লবিক প্রতিশ্রুতি—লেনিন তা শেষ করলেন ইতিহাস বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়। লেনিন তলস্তয়ের কাছে শিখেছিলেন রুশ দেশের চাষীর মনোজগতের দিকগুলি—জেনেছিলেন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-গুলি। শত শত সমসাময়িক রাজনীতি, অর্থনীতি, সংখ্যাবিজ্ঞানের গ্রন্থ পড়েও যা মেলেনি—তলস্তয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন সেই রুশ জীবনের সামাজিক নক্সা, তার দোলাচল ও বিকাশের দিকগুলি।

গোর্কির বর্ণনায় তলস্তয়ের নামে খুশি-খুশি লেনিনের একটি চমৎকার ছবি ধরা পড়েছে :

> একদিন তাঁর কাছে এসেছি। দেখি টেবিলের ওপরে একখণ্ড 'যুদ্ধ ও শান্তি' রয়েছে।
>
> 'হ্যাঁ, হ্যাঁ তলস্তয়! শিকারের সেই দৃশ্যটি পড়তে বসেছি, এমন সময় মনে হল এক কমরেডকে চিঠি লিখতে হবে। পড়বার

এতটুকু ফুরসৎ পাই না। মাত্র কাল রাতে তলস্তয়ের ওপর লেখা আপনার ছোট্ট বইটি পড়েছি।'

তিনি হাসলেন, তারপর চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আর্মচেয়ারে খুশিতে গা ছড়িয়ে দিলেন। তারপর গলার স্বর নামিয়ে তাড়াতাড়ি করে বলতে লাগলেন :

"কেমন একখানা চরিত্র, বলুন দেখি? কি দারুণ এক বড় মানুষ! আপনার জন্যে কেমন এক শিল্পী, বলুন দেখি…। আরেকটা অবাক ব্যাপার কি জানেন? এই কাউন্টের আগে সত্যিকারের মুঝিক চরিত্র আসেইনি।"

তারপর আমার দিকে আধবোজা চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রশ্ন করলেন :

'তাঁর সমান মাপের গোটা ইয়োরোপে আর কে আছেন?"

তিনি নিজেই উত্তর দিলেন :

'কেউ নেই'

তারপর হাতে হাত ঘসতে ঘসতে আপন খুশিতে হাসতে লাগলেন।

তলস্তয় প্রসঙ্গে লেনিনের সমালোচনা নিয়ে এখনও পশ্চিমী দেশে বহু বাগবিতণ্ডা আছে। লেনিন চেয়েছিলেন তলস্তয়ের লেখা রুশদেশবাসী মানুষ পড়ুক। একটা সঙ্কীর্ণ সামাজিক স্তরে শিক্ষিত সমাজেই যেন তিনি গণ্ডীবদ্ধ হয়ে না থাকেন। তাতে অনেক অর্ধসত্যের জন্ম দেয়। লোকজন পড়ুক, জানুক—তবেইনা এই মহাপ্রতিভাধরের সৃষ্টির যথাযোগ্য মর্যাদা হবে। ফলে বিপ্লবের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে তলস্তয়ের রচনা সাতাশ কোটিরও বেশি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।

এদেশে জাতীয় আন্দোলনে তলস্তয়ের প্রভাবের কথা তো বহুশ্রুত। তবু সাহিত্য ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের পীঠস্থান এই কলকাতাতেও তাঁর অনূদিত বই আজকাল খুঁজেও পাওয়া যায় না। তলস্তয়-চর্চা তো দূরের কথা। আর পশ্চিমী দেশগুলি? এখন তো আর রঁলা, বারবুস, টমাস মান-এরা নেই। আর সমাজবাস্তবতা ব্যাপারটাকেই যখন তুচ্ছ করে দেখা হচ্ছে সে সব দেশে—মানসিক ও দৈহিক 'বাস্তবতা'ই যখন মুখ্য—তখন তলস্তয়-এর সাহিত্যপ্রসঙ্গ তুলে কে আর সে দেশে কেঁচো খুঁড়ে শোষণবাদী সমাজ সত্যের সাপটি বের করে। তাই তলস্তয় খ্রীষ্টীয়, বিপ্লববিরোধী, জাড্যের পক্ষাবলম্বী এসব কথাবার্তা চলেছে সে দেশে।

লেনিনের তলস্তয় বিচার মুগ্ধ করেছিল রোমা রঁলাকে। রঁলা বলেছিলেন "সাহিত্য-ঐতিহাসিকের সানুরাগ প্রচেষ্টা হওয়া উচিত রুশো, দিদেরো ও ভোলত্যেরসহ নতুন পথ তৈরি করা প্রত্যেক স্রষ্টার অনালোকিত দিক-গুলিকে উদ্‌ঘাটন করে দেখানো। ঐসব স্রষ্টাদের মধ্যে সত্যিই কি রয়েছে, কোন কোন বিষয় সমসাময়িকতা থেকে তাঁদের উত্তীর্ণ করে এনেছে, তাঁদের নিজেদেরই অজ্ঞাত অথচ তাঁদেরই রচনার কোন কোন বিষয় আগামীদিনের ফল বহন করে এনেছে—এমন-কি কোন কোন বিষয়ে ভবিষ্যতে কি ফল ফলাবে জানতে পারলে সেগুলির দায় নিতে তাঁরা অস্বীকার করতেন সেগুলি ঐ সাহিত্য ঐতিহাসিকেরই উদ্‌ঘাটন করে দেখবার কথা। এই রচনায় সোজাসুজি, স্বচ্ছ অথচ অল্প কথায় সব লেখকদের মধ্যে যাকে সবচেয়ে পছন্দ করতেন তিনি তাঁরই বিষয়ে লেনিন এমন একটা রূপরেখা দিয়েছেন।'

যে কোনো শিল্পকর্মেরই নিজস্ব বিকাশের নিয়ম আছে। আছে উপ-ন্যাসেরও। তবে শিল্প ও সাহিত্য বোঝবার জন্যে তাদের আভ্যন্তরিক নিয়মের বিকাশ অনুরণ করলেই চলে না। যে কোনো শিল্পকর্মের সারবস্তু, উদ্ভব ও তার সামাজিক ভূমিকা যে সমাজ থেকে উদ্ভূত তার সমাজ-ব্যবস্থাটির সামগ্রিক বিশ্লেষণের মধ্যেই মিলবে। ঐ সমাজব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদন শক্তিগুলির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কগুলির থাকে অতি-জটিল আন্তঃসম্পর্ক—সংঘাত বা সংঘাত-হীনতা। অর্থাৎ যাকে আর্থনীতিক উপাদান বলা হয়, তার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। মানুষ তাদের জীবনের সামাজিক উৎপাদনের মধ্য দিয়ে, অবধারিত ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে উৎপাদন সম্পর্কগুলিতে প্রবেশ করে। বস্তুগত উৎপাদন শক্তিগুলির এক নির্দিষ্ট স্তরের সঙ্গেই থাকে উৎপাদন সম্পর্ক-গুলির অনুপূরক সম্পর্ক। উৎপাদন সম্পর্কগুলির সামূহিক যোগফলই ঐ সমাজের অর্থনীতিক কাঠামো। ঐ সত্যিকারের কাঠামোর ওপরে গড়ে ওঠে আইনগত বা রাজনৈতিক উপরিকাঠামো। আর তার সঙ্গেই অনুপূরক-ভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে সামাজিক চৈতন্যের নির্দিষ্ট আকারগুলি। বস্তুগত জীবনের উৎপাদন পদ্ধতি, অর্থাৎ উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের আন্তঃ প্রক্রিয়া সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিগত জীবন-প্রক্রিয়াকে নির্ধারিত করে দেয়। তাই মার্কস বলেছিলেন, চৈতন্য মানুষের সত্তাকে নির্ধারণ করে না। বরং ঠিক উল্টো, তাদের সামাজিক সত্তাই তাদের চৈতন্য নির্ধারণ করে দেয়। উৎপাদন সম্পর্কগুলির সঙ্গে বিকাশমান উৎপাদন শক্তি-

সমূহের যখন সংঘাত দেখা দেয়, ঘনিয়ে আসে সমাজবিপ্লবের দিন। সামাজিক সত্তার রূপটিরও চলে পালা বদলের পালা। তখন চলে চৈতন্যলোকেও দ্বন্দ্ব। শিল্প সাহিত্যে সামাজিক চৈতন্যেরই প্রতিফলন থাকে। তাই তাতেও দেখা যায় নানা টানাপোড়েন, নানা দোলাচল। মহাপ্রতিভাধরেরও ঐ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি নেই। নেই বলেই, দেখা যায় ঐ সংঘর্ষের সূচিমুখে যুগযন্ত্রণা, টেনশন। লুকাচ তাই বলেছেন, ইতিহাসের বিকাশের পর্যায়টি। অন্তঃগ্রথিত করেও মানুষের অন্তরতম গূঢ় রাজ্য থেকে উন্মোচিত হয়ে আসে শিল্পীর হাতে ব্যক্তিমানুষটির সামাজিক সত্তার রূপটি। শিল্পীর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে রচনা করার অর্থ হল, শিল্পীর সামাজিক সত্তাই গড়ে তুলেছে চরিত্রটি তাঁর মানসমুকুরে প্রতিফলিত করে। সংবেদনশীল শিল্পীর সামাজিক চৈতন্য-লোকের দ্বন্দ্ব আসলে সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলিত তীব্র ও মানবিক রূপ। মহৎ শিল্পী কেবলমাত্র ঐ দোলাচলেই আবর্তিত হন না, তিনি যুগবিকাশের প্রগতিশীল পদক্ষেপের কোনো না কোনো দিক রূপভাত করেনই। বিশেষভাবে বাস্তবতাবাদী লেখকের এ-ছাড়া অন্যপথ খোলা থাকে না। এখানেই আসে টিপিক্যাল চরিত্রের বিকাশের দিক। দেখা যায়, শিল্পী যখন চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশের অনুসারী, সাহিত্যে প্রতিফলিত সেই অংশগুলি পাঠকের কাছে খুবই গ্রাহ্য বলে মনে হয়। যখনই শিল্পী পরিপ্রেক্ষিতের পরিপূরক বিকাশমুখীন চরিত্রের আচরণে তাঁর নিজস্ব কিছু কল্পিত ব্যাপার চাপিয়ে দিতে যান, তখন সে অংশগুলি হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক, বহুক্ষেত্রেই অসার্থক। যখন তিনি ইতিহাসের প্রেক্ষিতে চরিত্রটির মধ্যে প্রকৃতি, সমাজ ও ঐ গুলির সঙ্গে শ্রেণী অবস্থিতির দাক্ষিণ্যে অর্জিত ব্যক্তিবোধের দ্বন্দ্ব-সমন্বয় ঘটান, তখন ঐ দ্বন্দ্বগুলির সঙ্গে ঐ উদ্বর্তনের সংঘাত চরিত্রগুলিকে বিশ্বাসযোগ্যতার রূপ দেয়। এজন্য আমাদের কাছে তলস্তয়ের চরিত্রগুলির স্বাভাবিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। যখনই তিনি তাদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় মশলা মেশান, তখনই তা অসার্থক মনে হতে পারে। আমাদের সৌভাগ্য, তলস্তয়ের উপন্যাসে এই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপারটি কম অথবা প্রক্ষিপ্ত।

শিল্পের নিজস্ব দাবি রয়েছে। শিল্পের রয়েছে নিজস্ব নিয়ম। বাস্তবতাবাদী মহাশিল্পী তলস্তয় চরিত্র বিকাশের স্বকীয় পরম্পরা অনুসরণ করে, ইতিহাসের প্রেক্ষিতে চরিত্রকে বিষয়গত জটিল সামাজিক নানা টানের মধ্যে রেখে, বিষয়ীজাত বা মনোজগতের গভীরতম রাজ্যের প্রতিফলিত জটিলতাগুলি উন্মোচিত করেছেন। আমরা পেয়ে যাই তাই মানুষের অতীত, বর্তমান ও

ভবিষ্যতের প্রজাতিগত, ইতিহাসগত ও ব্যক্তিগত স্বরূপ। কিন্তু যখন শিল্পের দাবিতে যা কর্তব্য-সাধ্য নয়, তাকে নিজস্ব আচরণে তিনি অঙ্গীকৃত করেন—এবং তাঁর ঐ আচরণবিধি ও তাঁর ব্যবহারিক জীবনের আদর্শগুলিকেই অনন্য প্রতিষ্ঠা দিতে চান, তখন তাঁর শিল্পী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বিবেকবান এক কাউণ্টের রথও দেখা যা । তাই মহাশিল্পী তলস্তয়, আর খ্রীষ্ট, ধর্ম, অহিংসা ইত্যাদিতে তন্ময় আরেক তলস্তয়—যিনি তাঁর সৃষ্টিশীল রচনাগুলিকে অস্বীকার করছেন—দু-জন একই ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও দু-জনের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব আর আমাদের অগোচর থাকে না। বলা বাহুল্য, তলস্তয়ের জীবৎকালে রুশদেশে সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যে যে নিদারুণ দোলাচলতা চলেছিল, তলস্তয়ের ঐ স্ববিরোধে তা যেন স্পষ্ট। লেনিনের কথাটিকে একটু ঘুরিয়ে বলি, মহৎ শিল্পীর জীবনেও তাহলে আসন্ন সামাজিক বিপ্লবের দিকগুলি কোনো-না-কোনো ভাবে কেবল, প্রতিফলিতই হয় না স্ববৈপরীত্যও সৃষ্টি করে। তাই এক তলস্তয় হয়ে যান একাধিক তলস্তয়। যদি যথাযোগ্য নায়কতা সংহতভাবে ইতিহাস-বিকাশের দিকটি না চিহ্নিত করতে পারে—এমনটিই হবার কথা।

রুশদেশের ইতিহাসে গত শতকটি নানা কারণে খুব গুরুত্বপুর্ণ। যেন আঠারো শতকের ফরাসীদেশ একটু উল্টোপাল্টাভাবে সাজানো রয়েছে। ফরাসীদেশে চলেছিল নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, 'আমিই রাষ্ট্র'। 'আমার পরই প্রলয়' ইত্যাদি বচন, রাজকীয় বিলাসব্যসন, মঠাধ্যক্ষদের ধর্মের নামে সামন্ত প্রথার সুরক্ষায় কুসংস্কার ও প্রথা ভজনা। এবং বিপরীতে ব্যক্তিবিকাশের মহিমা নিয়ে বুর্জোয়া মানবিকতার সাধনা চলছিল—এনসাইক্লোপিডিস্টদের, রুশো-ভোলত্যের-দিদেরোদের—যার ফলবান রূপ ফরাসী বিপ্লবে। ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল ফরাসীদেশে স্বত্ববান ক্ষুদে চাষীর দল এবং শহুরে বুর্জোয়ারা। রাজসভার বিলাস-বৈভব, ধর্মধ্বজদের ব্যসন এবং সংস্কার ও যুক্তিবাদবিরোধিতা রুশোর কাছে মনে হয়েছিল মানুষের স্বাভাবিক স্বভাবেরই বিরোধিতা। তিনি কি শিক্ষানীতিতে, কি রাজনীতিতে প্রকৃতিবাদকে মুখ্য করে তুলেছিলেন। বিলাসব্যসন, প্রথা ও সংস্কারাবদ্ধ জীবনকেই তিনি সভ্যতা মনে করেছিলেন। তাই সভ্যতা তাঁর কাছে মনে হয়েছিল অবান্তর—মানব স্বাধীনতার অন্তরায়। তাঁর আদর্শ নোবল স্যাভেজ পরবর্তী বহু ভাবুককে ভাবনায় উদ্দীপ্ত করেছিল। রুশো যেমন রোমান্টিকদের অন্যতম আদি পিতা, তেমনি নৈরাজ্যবাদেরও অন্যতম দ্রষ্টা।

নেপোলিনীয় ক্যাম্পেনের পরাক্রান্ত ফরাসী বাহিনী রুশদের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে ১৮১২ সালে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। রুশদেশের প্রকৃতি, রুশদেশের আ-কাউন্ট-সার্ফ একযোগে ঐ আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। এক নিখিল রুশবোধ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নিচ্ছিল। আবার জবরদস্ত জারতন্ত্রের শোষকশ্রেণী ভূ-স্বামীদের উৎপীড়নে ক্লিষ্ট চাষী কিন্তু ঐ দেশপ্রেমিক যুদ্ধে কাঁধে বন্দুক নিয়ে একেবারে পশ্চিম ইয়োরোপে পর্যন্ত ঘুরে এল। দেখে এল সামন্ততন্ত্রের উৎসাদন, শুনে এল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথা।

ইতিমধ্যে ঐ শতকের গোড়ার দিকেই কল-কারখানারও উদ্ভব ঘটছিল রুশ দেশে। কিন্তু শিল্পকারখানার জন্য প্রয়োজন শ্রম শক্তি বিক্রেতা শ্রমিকের, ভূমি-দাসপ্রথার শিকলে বন্দী সার্ফ-এর সম্পত্তির মালিকানা ভূ-স্বামীরই ছিল বলে, বিনিময়ের বিকাশ বিড়ম্বিত হচ্ছিল। জমিতেও পুঁজিবাদের পদক্ষেপ পড়ছিল—আর তারও জন্য প্রয়োজন ছিল ভূমিদাস-প্রথার বিলোপ। কৃষক বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছিল এখানে-সেখানে। ১৮১২ সালের পর এই বিক্ষোভ-লড়াই বেড়ে যেতে থাকে। রুশপ্রেমিক যুদ্ধ সমাপনের রুশদেশে সামাজিক পরিবর্তন আসন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু পশ্চিমী বাহিনীকে পরাস্ত করার আত্মপ্রসাদ নিয়ে স্লাভোফিলরা 'যা নেই রুশে তা নেই বিশ্বে', বলে আত্মপ্রসাদ পেতে চাইলেন। জার প্রথম আলেকজান্দার-এর বন্ধু অত্যাচারী আরাকচিয়েভ রুশ জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সামরিক কায়দায় চূর্ণ করতে নানা পদ্ধতি নিলেন। সামন্তশাহী জারতন্ত্র স্লাভোফিলদের ভাবাদর্শ অত্যন্ত নিপুণভাবে ব্যবহার করল।

কিন্তু স্লাভোফিল ও সামন্তশাহী জার সামরিকতন্ত্রের বিপরীতে গোপনে সংগঠিত হচ্ছিলেন বিপ্লবীরা। তাঁরাও ভূ-স্বামী সম্প্রদায় থেকেই এসে-ছিলেন। কিন্তু তাঁদের বিবেক ও আত্মসম্মানবোধ সামরিকীকরণের পক্ষে সায় দিচ্ছিল না। তাঁরা গণতন্ত্রীকরণের পক্ষে গোপনে সংবিধান বানাচ্ছিলেন এবং ১৮২৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তাঁদের নায়কতায় সৈন্যবাহিনী একাংশ দুর্বিনীত ও ও নিরঙ্কুশবাদী জার প্রথম নিকোলসের পক্ষে শপথ নিতে অস্বীকার করল। কিন্তু সময়মতো আঘাত ও ব্যাপক জনগণকে বিদ্রোহ করতে সংগঠিত না করায় ঐ বিদ্রোহ ব্যর্থ হল। তাঁদের দাবি-সনদের মধ্যে ছিল নিয়ন্ত্রিত আইনসম্মত রাজতন্ত্র, এমন কি প্রজাতন্ত্র সংবাদপত্র-ধর্ম-আচরণ ও বাক-স্বাধীনতা। তাঁরা সামন্তবাদের অবসান চেয়েছিলেন। জার প্রথম নিকোলাস দমনযন্ত্রের রথচক্রতলে বিদ্রোহের ভস্মশেষকেও নিষ্পিষ্ট করতে

চাইলেন। কিন্তু রুশদেশের মহাকবি পুশকিন এবং লেরমেন্তভ-এর রচনা তখন জাতিকে নতুন মুক্তির ইঙ্গিত দিচ্ছে। দেশজুড়ে ক্রমবর্ধমান পুঁজি-বিকাশের চাপ ছিল, কৃষকদের দাঙ্গাহাঙ্গামাও লেগেই ছিল। এই অবস্থায় ক্রিমিয়ার যুদ্ধের (১৮৫৩-৫৬) অবসানের পর পুরনো ব্যবস্থাকে আর পুরনো কায়দা ও প্রথার মধ্যে আটকে রাখা গেল না। জার দ্বিতীয় আলেকজান্দার ১৮৬১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি আইন করে ভূমিদাস প্রথা বিলোপ করলেন। কিন্তু ঐ বিলোপের ফলে ভূ-স্বামীদের রইল বিশাল বিশাল খাস জমিদারি, চাষীদের ব্যবহার্য জমির জন্য তথাকথিত মুক্ত চাষীদের দিতে হল বাজারের চলতি দামের চেয়ে বেশি দাম, বেড়ে গেল খাজনার চাপ।

ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ছোট চাষীর অভ্যুদয় ঘটেছিল। ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথার বিলোপের মধ্য দিয়ে রুশদেশে কিন্তু জন্ম নিল বড় খামারের মালিক, কোথাও আধা-সামন্তবাদী কোথাও পুঁজিবাদী ভূ-স্বামী, কোথাও-বা উঠবন্দী চাষীদের টুকরো-টাকরা জমি দিয়ে ভূ-স্বামীদের খামারে বেগার প্রথা। সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদী শোষণ ও নির্যাতন এক নতুন রূপ নিল।

রুশদেশের চাষীদের মধ্যে পূর্বে ছিল গ্রাম-সমাজ মীর-এর ব্যবস্থা। সংস্কারের নামে জারতন্ত্র তার কার্যত উৎসাদন ঘটাল। পৌর প্রশাসন, জুরির সাহায্যে বিচার ইত্যাদিরও প্রবর্তন ঘটল। তবে যাদের হাতে জমি ও সম্পদ তারাই বিচার, প্রশাসন ও পৌরশাসনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে রইল। যে বিক্ষোভ শতাব্দীর প্রথম থেকে দানা বেঁধে উঠছিল, তার নিরাকরণে জার আলেকজান্দারের ঘোষণা, তার ফলাফল, আবার নতুন পর্বে সংগ্রামের অবস্থা, সমাজ বিপ্লবের প্রশ্ন সামনে নিয়ে এল। সংগ্রামের সাগরতরঙ্গ ১৯০৫ সালের বিপ্লবে চণ্ড শাসনের বেলাভূমিতে ভেঙে পড়ে গোটা দেশময় "জেমলিয়া ই ভোলিয়া"-র (জমি ও স্বাধীনতা) শপথ ছড়িয়ে দিল। লেনিন এজন্য ১৮৬১ থেকে ১৯০৫ রুশ বিপ্লবের বিশেষ জলবিভাজিকার কাল বলে উল্লেখ করেছিলেন।

ডিসেম্বর অভ্যুত্থানের পর রুশদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সাধনায় স্বর্ণযুগ এসেছিল। এই পর্বের রুশ সাহিত্যে তৎকালীন সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সমস্যাগুলি রক্তে মাংসে উপস্থিত। রুশদেশে পুঁজিবাদ রাষ্ট্রশক্তিতে যদিও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবু পুঁজিবাদী ঐতিহাসিক পর্যায়ের শিল্পকর্ম, অর্থাৎ উপন্যাসের গৌরবান্বিত অভ্যুদয় দেখা গেল। বিশ্ব ইতিহাসের কয়েকটি বড়

বড় পর্যায় আছে। তার মধ্যে পুঁজিবাদী পর্যায়েই প্রথম পুঁজির নিজস্ব নিয়মে পুঁজি ও তার আনুষঙ্গিক ভাবাদর্শ নানাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। এভাবেই অভ্যুদয় ঘটে বিশ্ব পুঁজিবাদী সত্তার অনুবর্তী বিশ্ব সামাজিক চৈতন্যের—তারই দ্বন্দ্বসমন্বয় রূপ জাতীয় সামাজিক সত্তা ও চৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বিশ্বজনীন তাৎপর্য পায়। তাই রুশ দেশে সামাজিক সত্তা ও চৈতন্যের দোলাচল বিশ্বজনীন পুঁজিবাদী ঐতিহাসিক স্তরে যে রূপ গ্রহণ করে —তারই ফলবান রূপ হিসেবে দেখা দেয় রুশদেশের উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও অন্যবিধ শিল্পকর্মের স্বর্ণযুগ। ঘটে বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের অভ্যুদয় এবং নানা কথাশিল্পী ও কবিদের আবির্ভাব। আলেকজান্দার হারজেন (১৮১২-৭০), নিকোলাই ওগারেভ (১৮১৩-৭৭), ভিসারিয়ান বেলিনস্কি (১৮১১-৪৮), নিকোলাই চেরনিশেভস্কি (১৮২৮-৮৯), নিকোলাই দেব্রোলুবোভ (১৮৩৬-৬১) বিপ্লবী রুশ ও উক্রাইনীয় কবি নিকোলাই নেক্রাসভ (১৮২১-৭৭) ও তারাস সেভচেংকো (১৮১৪-৬১), কথাশিল্পী নিকোলাই গোগোল (১৮০৯-৫২), ফিওদর দস্তয়েভস্কি (১৮২১-৮১), ইভান তুর্গেনেভ (১৮১৮-৮৩), আন্তোন চেখভ (১৮৬০-১৯০৪), সংগীতস্রষ্টা মিলি বালকিরেভ, সোদেস্ত মুজোরস্কি, আলেকজান্দার বোরোদিন, নিকোলাই রিমস্কিকোরসাকোভ ও কাইজার ক্যী প্রভৃতি 'পঞ্চপ্রধান' এবং পিওতর চাইকোভস্কি, চিত্রকলায় ইলিয়া রেপিন প্রভৃতি নাম যেন মিছিল করে মনে পড়ে। এ যুগেই লেভ নিকোলায়েভিচ তলস্তয়ের (১৮২৮-১৯১০) অভ্যুদয়—বিশেষভাবে লেনিন যে-সময়কে জল-বিভাজিকা বলেছিলেন সেই ১৮৬১ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যবর্তী পর্যায়েই তাঁর সৃজনীপ্রতিভা মহান রচনাগুলি সৃষ্টি করে।

তলস্তয়ের শেষ জীবনে বিশ্বে তলস্তয়পন্থীরা তাঁকে গুরুদেব জ্ঞানে অহিংসা, অপ্রতিরোধ, ক্ষমা ও প্রেম ইত্যাদি নিয়ে প্যাসিফিস্ট হয়েছিলেন। তিনি যে রুশ বিপ্লবের অন্যতম তত্ত্বগুরু এটা মানতে চাননি তাঁরা। তলস্তয়ের শেষ জীবনে সাহিত্য-শিল্প ও সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর ধ্যান ধারণা যে তলস্তয়কেই এক নৈরাশ্যবাদী অথচ স্থাণু ও অনড় সমাজের প্রচারক করে তুলছিল—এটা তলস্তয়ের ভক্তবৃন্দ ঐ মহাপ্রতিভাধরকে বুঝতে দেননি। সাহিত্য-শিল্পকে তিনি মনে করছিলেন তখন সাহিত্য ও শিল্প-ব্যবসায়ীদের টাকা উপার্জনের হাতিয়ার, কুৎসিত অবস্থার উপরে রংচঙা প্রসাধন। রুশোর নোবল স্যাভেজ তাঁর কাছে তখন টিমথি মিহাইলোভিচ বনদায়েক-এর অন্ন-শ্রমের (ব্রেড-লেবার) আদর্শ চাষীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

পনেরো বছর বয়সে তলস্তয় নিজেকে রুশোর শিশু বলে ঘোষণা করেছিলেন। সতেরো বছর বয়সে অর্থোডক্স খ্রীষ্টধর্মকেও অস্বীকার করেন। ১৮৮৪ সালে বনদারেফের বইয়ের সমালোচনা লিখতে গিয়ে তলস্তয় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ('In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return into ground ; for out of it wast thou taken'—Cen. iii. 19) অন্ন-উৎপাদনই মানব জীবনের-প্রমঘন নিশ্চিতি ও শান্তির পরাকাষ্ঠা বলে ঘোষণা করলেন। অর্থাৎ শিল্পোৎপাদন, বিনিময় ও বাণিজ্য, নানা ধর্ম ও রাজনৈতিক তত্ত্ব নস্যাত করে দিলেন তিনি। তাঁর মতে বাইবেলের ঐ উদ্ধৃতিটিই মানুষের জীবনে ঈশ্বর প্রদত্ত আদি নিয়ম। আসলে তিনি চাষী-সমাজতন্ত্রের কথা বলছিলেন। তিনি ঘোষণাও করেছিলেন নিজেকে সাম্যবাদী বলে। ধর্মধ্বজী সামন্তপ্রভুর দল তলস্তয়কে কি চোখে দেখতেন, তা ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০১-এ তাঁকে সমাজচ্যুত করার সময় হোলি সীনোদ-এর ঘোষণাটি দেখলেই বোঝা যায়। তিনি চাষীর মতোই হতে চেয়েছিলেন, মৃত্যুর মুহূর্তে আসতাপোভোর ছোট্ট ঘরে উচ্চারণ করেছিলেন 'না, এমনভাবে চাষীদের তো মৃত্যু হয় না।''

আমাদের চোখে তবু লেখক তলস্তয় ও ধর্মনেতা তলস্তয়ের মধ্যে বিরোধ ধরা পড়ে। অথচ তিনি একটাই মানুষ। দীর্ঘকাল পরে কলম ধরে যখন তিনি 'পুনরুত্থান' লেখেন, কখনও পেয়ে যাই সেই 'সংগ্রাম ও শান্তি', 'আনা কারেনিনা'-র লেখক কলোশাসকে। লিওনিদ লিওনোভ তলস্তয়ের প্রয়াণের পঞ্চাশ বছর পূর্তি সভায় ঠিকই বলেছিলেন, যেন সেই বাইবেলোক্ত স্যামসন পুরনো মন্দিরের প্রতিটি স্তম্ভ ও ছাদ আপনার বিপুল শক্তিতে ভেঙে দিয়ে আপনাকে তার তলায় গুঁড়িয়ে দিতে চান, তাঁর শ্রেণীর উৎপীড়ন ও অন্যায়ের প্রতিবাদে। তাঁর 'আত্ম-স্বীকৃতি'তে যে স্ব-পীড়নের ছবি ধরা পড়ে, মনে হয় যেন এক সাভোনারোলা, যিনি অস্বীকার করেন দান্তে, রাফায়েলে, শেকস্পীয়রকে। বলে ওঠেন 'সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাক, জয় হোক ন্যায়-বিচারের।' শুনে বিহ্বল হয়ে যাই—'যত বেশি আমরা সৌন্দর্য বিষয়ে মন দিই, ততই আমরা কল্যাণ থেকে দূরে সরে যাই।' অথচ তলস্তয়ই বলেছিলেন, সৃষ্টিশীল রচনা তিনি তাঁর কলমের মুখে তাঁর আপন মাংস দোয়াতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে লিখেছেন !

তবু লেভিন সারাদিন ফসল কাটার পর সারা গায়ে ঘাম মেখে যখন আসে

তার সঙ্গে ঐ আনন্দময় ক্লান্তি আমরা ভাগ করে নিই, আমরা কারেনিনকে অপছন্দ করি—আনার বহুধা দীর্ণ সত্তার যন্ত্রণায় আমরা আপ্লুত হয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি, আহত আন্দ্রেই বোলকেনস্কির শয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়ে নাটাশার সঙ্গে বেদনা ভাগ করে নিই, তুসিন-এর কামানের সামনে গর্ববোধ করি, অভিজাত শ্রেণীরই অংশ নেকল্যুদফের শিকার কাতুসা মাসলোভাকে অভিজাত জুরি ও বিচারকের হৃদয়হীন বিচার প্রহসনে ক্রুদ্ধ ও গোটা ব্যবস্থাটি সম্পর্কেই সপ্রশ্ন হই। এগুলি কি আমাদের ভাগ্যে কম পাওনা? অস্টারলিজের রণক্ষেত্রে আহত বোলকনস্কি অজ্ঞান হবার প্রাক্ মুহূর্তে ঐ যে দেখে যায় নক্ষত্রখচিত আকাশের অপার শান্তি, তারও পরে তারই উপাস্য নেপোলিয়ন তাকে মৃত মনে করে, তার হাতে ধরা রুশ পতাকাটি দেখে বলে ওঠেন "চমৎকার মৃত্যু"—আমরা নিশ্চেতন সমরযন্ত্রের অমানবিক তথাকথিত গৌরববোধের বিপরীতে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক-ভিত্তিক অপরূপ এক দিগন্ত উন্মোচিত হতে দেখি। চন্দ্রালোকিত রাত্রে নাতাশার যখন ঘুম আসে না, জানলায় তার বস্ত্রের অস্পষ্ট খসখস শোনা যায়, বা প্রথম বলনাচের আনন্দ—আমরা পরম আনন্দে অভিভূত হয়ে অনুভব করি। কিংবা পিয়ের বেজুকভ বন্দীদশায় তাঁর আত্মার মুক্তস্বরূপ অনুভব করে যখন হেসে ওঠে, আমরা পেয়ে যাই সেই মানুষকে—যে কারাতায়েফের স্বজাতি হয়েও, ভিন্নশ্রেণীর, অথচ এখন অনুভবে সে উত্তীর্ণ হয়, যা রুশ চাষী কারাতায়েফ তার ঢের আগেই জেনে গেছে। নেপোলিয়ন না কুতুজফ, পিয়ের বা আঁন্দ্রেই, কারাতায়েফ বা নাটালিয়া রস্তোভা—কাকে মনে করে লেখা 'যুদ্ধ ও শান্তি'! নাকি তলস্তয় মানুষের এক ইতিহাস লিখছিলেন—যেখানে ব্যক্তি কেবল ইতিহাসের বিশেষ আংশিক প্রতিফলিত রূপ—আসলে জনগন গড়ে তোলে ইতিহাস ও তার পরম গতি।

আবার বলি মানুষ—সেই মানুষই তলস্তয়ের লক্ষ। ছোট্টবেলায় দাদার সঙ্গে বনের মধ্যে ছোট্ট একটুকরো লাঠি নিয়ে খেলা করতে করতে, দাদা একসময় সেই লাঠিটি কোথায় জঙ্গলে মাটির তলায় লুকিয়ে ফেলত। তলস্তয় জানতেন তখনই, যদি কোনোদিন ঐ লাঠিটি তিনি খুঁজে পান, পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসবে। সারা জীবনই তাঁর ঐ অন্বেষণ। তিনি কখনো ভেবেছেন ঐ যষ্টিটি লেভিনের ফসল কাটার হাতিয়ার। কখনো মনে করেছেন মাসলোভার হাতে সাইবেরিয়ার পথে হাঁটার নির্ভর। যখন তিনি যোজেসের

মতো সেটিকে ধর্মগুরুর দণ্ডে পরিণত করলেন, আমরা খুঁজে নিতে চাই তখনও সেই চার্চ বা ওক গাছের শক্ত খণ্ডটি, যা তাঁর মৃত্যুর মাত্র সাত বছর পর তাঁর নিজস্ব ভূমিতেই রাইফেলের বাঁটে রূপান্তর পেয়েছিল। এবং মানুষের মাটিতে মানুষের পৃথিবী গড়ার প্রচেষ্টা শুরু হল। প্রাগ-ইতিহাস থেকে আমরা পা দিলাম সত্যিকারের মানুষের ইতিহাসে।

হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক মাইকেল কারপোভিচ তলস্তয়ের মধ্যে দেখেছেন 'প্যাগান মানসিকতা ও খ্রীষ্টীয় চৈতন্যের সংঘাতে' তাঁর অন্তরলোকে স্থায়ী সংগ্রাম। এত সরলভাবে এই মহাপ্রতিভাধরকে ব্যাখ্যা করা যায় না। বুদ্ধ-কনফুসিয়াস-রুশো-সোপেনহাওয়ার দিয়ে তাঁর মানসলোকের কোনো সংবাদ মিললেও মিলতে পারে, তবু তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির 'আত্মার দ্বন্দ্বসমন্বয়' তাঁর কল্পিত নীতিভাবনা ও সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে সত্যিকারের সংঘাতে এসে দাঁড়ায়। প্যাগান ও খ্রীষ্টান নয়—জীবন্ত ইতিহাসভিত্তিক চরিত্র ও তাঁর আপনার ভাবাদর্শের মধ্যে সংঘাত সেখানে। যেমন বালজাকেও আমরা দেখেছি।

তলস্তয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনার মধ্যে যে তাঁর নিজেরই স্ববৈপরীত্য রয়ে গেছে, তা শিল্পীর পদ্ধতি ও তাঁর বিশ্বদৃষ্টি বোঝার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একথা ঠিক। যারা কেবলমাত্র বৈপরীত্যের কথা বলেন, তাঁদের ধারণা বাস্তবতাবাদী লেখকের মূল দ্বন্দ্ব ধরা পড়ে সৃষ্টিশীল রচনা ও তাঁর চৈতন্যের মধ্যেকার সংঘাতের সূচিমুখেই। শিল্পী তলস্তয়ের বিশ্বদৃষ্টির বিশিষ্ট দিক, পদ্ধতি ও দ্বন্দ্ব বীক্ষার সংঘাতেই সৃষ্ট হয়েছে বলে সরলীকরণ করা যায় না। সত্যিকারের জটিলতা, অতি পথকুটিল বৈপরীত্য তলস্তয়ের চৈতন্য ও সৃষ্টিতে প্রবাহিত। শিল্পের যে মানবকেন্দ্রিক কাজ রয়েছে, যা কেবল একমাত্র শিল্পেরই গুণ, সে প্রসঙ্গে লুকাচ বলেছিলেন শিল্পের আস্বাদনে 'মানুষ কেবল তার নিজের বিশ্বকেই চেনে না, যে বিশ্ব সে মানবজাতির অন্যতম সদস্য হিসাবে নিজেও কিছুটা সৃষ্টি করেছে, তার একান্ত নিজের বলেই তা অভিজ্ঞতার অন্তর্গত করে। এই প্রবহমানতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনকে, যা ধ্বংস হবার নয় আমরা শিল্পকর্মের স্থায়িত্ব দিয়ে চিহ্নিত করি; তাতেই পাওয়া যাবে সেই বক্তব্যের সত্যিকারের জোর যে শিল্পকর্ম মানুষের আপন বিশ্বের আদলই বদলে দেয়।'

আর তলস্তয় ও তাঁর শিল্পের ইতিহাস প্রস্থানের উত্তরাধিকার লেনিনের মতে বর্তিয়েছে রুশদেশের শ্রমজীবী মানুষেরই উপরে। '…যে উত্তরাধিকার যা তিনি রেখে গেছেন, তা অতীতের ব্যাপার হয়ে যায় নি, বরং তা ভবিষ্যতের। ঐ উত্তরাধিকার স্বীকার করছি এবং তাকে কার্যকর করছে রুশ প্রলেতারিয়েত।' আমরা এখন বিশ্ব সমাজতন্ত্র রচনার সংগ্রাম মুখর বিশ্ব অঙ্গনে বলি, সারা বিশ্বেই তাঁর উত্তরাধিকার আমরা স্বীকার করছি। তলস্তয় মৃত্যুঞ্জয়।

যদিও হাওয়া উল্টোপাল্টা

রণেশ দাশগুপ্ত

ফয়েজ আহমদ ফয়েনে একটি প্রসিদ্ধ কবিতা, "প্রিয়তমে আমার, আমার কাছ থেকে প্রথম অনুরাগের মতো প্রেম আর চেয়ো না।' এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবিতাটিতে তিনি যা বলেছেন, সেটি মোটামুটি এরকম: 'আগে তোমা-অন্ত ছিলাম, এখন দেখছি, তুমি ছাড়াও জগৎ আছে। বিরহের দুঃখ ছাড়াও দুঃখ আছে। এ দুঃখ অন্যায় অবিচার শোষণ ও লাঞ্ছনায় জর্জরিত সেই সব অসহায় মানুষকে নিয়ে, বাজারে যাদের দেহ পণ্যের মতো বিক্রি হয়", ইত্যাদি ইত্যাদি। কবিতাটিতে তাই বারংবার পুনরুক্তি রয়েছে মধুর হলেও ব্যর্থহীন অনুরোধের: "মুঝ সে পহ্‌লীমি মুহব্বত মেরী মহবুব না মাং।"

ফয়েজ তাঁর অনুপম কোমলস্বরে উচ্চারিত এই কবিতাটিতে প্রথম অনুরাগের আচ্ছন্নতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'সত্যিই তো ব্যাপারটা এমন ছিল না যে তুমি রয়েছ বলেই জগৎ রয়েছে। এটা ছিল একটা ধারণামাত্র।' আবার প্রিয়বিরহ ছাড়া অন্য দুঃখের পুঞ্জিভূত বর্ণনার পরেই লিখেছেন, 'এখনও কিন্তু তোমার রূপের দিকে চোখ যায় ফিরে ফিরে।' ফয়েজের কবিতার বক্তব্যের কায়দাটি লক্ষণীয়।

অন্যায়, অবিচার এবং শোষণ ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ধিক্কার সমস্ত রূঢ় বাস্তবকে সামনে রেখেছে। প্রেমকে এখানে কি করে বাঁচাবেন, এটাও কবির সমস্যা। এটা নিশ্চয় ফয়েজ আহমদ ফয়েজের একার ব্যাপার

নয়। এটা একটা অনুকূল হাওয়া। বিপ্লবী হাওয়া। বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের দশকে আধুনিক বাংলা কবিতায় যে নতুন তীব্র বাদী-বিসংবাদী সমন্বিত স্বরবিন্যাসের সৃষ্টি হয় এবং চল্লিশের দশকের জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'মধুবংশীর গলি' কিংবা সুকান্তের 'প্রিয়তমাসু' কবিতায় যে প্রেমের নিগূঢ় ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটে, উপমহাদেশের আরেক প্রান্তে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কাব্যের মতো একাধিক কাব্যে তারই আরেক রূপ। আধুনিক কবিতার যে কর্কশে কোমলে মেশানো রীতি অথবা ঝোঁক, ফয়েজের উপরোক্ত কবিতাতে তার অভিনব প্রয়োগ। সহজ ও সরল বাণীর মধ্যে দ্বন্দ্বাত্মক নানা উপকরণকে স্থান দেয়ার একই রীতি। মনে হয় এই বুঝি বেসুরো হয়ে গেল সমস্ত কবিতাটি। নিদারুণ রূঢ় আঘাতে ভেঙে গেল বুঝি সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কারুকার্য করা যন্ত্রটি। কিন্তু না, ভাঙে না। বেসুরো হয় না এই কবিতা।

হয়তো চিরকালের কবিতার শিল্পরূপই এমন যে সে তার গীতি-কাব্যিক ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেও জীবনের ভীষণ ও মধুরকে একসঙ্গে জায়গা দিতে পারে। কালকালান্তরে বিদ্রোহী কবিরা এই ছাঁচটাকে বেশি করে ঝালাই করে নিয়েছেন। যেমন, শেলির 'ইংলণ্ডের শ্রমজীবীদের প্রতি' কিংবা হাইনরিখ হাইনের 'তাঁতিরা' কবিতাতে সংশ্লিষ্ট কবিদের কাজ। কয়েকটি মাত্র পংক্তিতে অনন্ত বিষাদ এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্দান্ত বিদ্রোহের আভাস। কিছুতেই বেসুরো মনে হয় না। বরং মনে হয়, এইতো সুন্দর, এইতো সত্য, এইতো সত্য-সুন্দর।

একালে এসে যে কাব্যরীতিকে নিয়ে বিপ্লবী বিদ্রোহী কবিরা কাজ করে আসছেন, তার বহু কৌণিকতার মাত্রা অনেক বেশি চড়া। কারণও রয়েছে। এই শতাব্দীতে পুঁজিবাদী সভ্যতার পতনকালের চরম সংকট দেশ-দেশান্তরের মানুষকে দুটো বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে টেনে নামিয়ে এবং আদর্শহীনতাকে শতগুণ বাড়িয়ে মানুষকে ভারবাহী পশু বানাবার চেষ্টা করেছে। তেমনি অন্যদিকে যুদ্ধ ও ধ্বংসকে কাটিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের বিরাট তরঙ্গমালা দেশ দেশান্তরের গণ-মানুষের মনুষ্যত্বের উঁচু স্তরে উপনীত হবার পথ তৈরি করেছে। ধ্বংস, বিকার, মৃত্যু এবং অবক্ষয়ের বেষ্টনীর মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসতে হচ্ছে তাই মনুষ্যত্বকে। এই মনুষ্যত্বের রূপকার কবিরা বিকারকে পাশ কাটিয়ে সৌন্দর্যের কথা বলতে পারেন নি। তা যদি তাঁরা করতেন, তবে তা অর্ধসত্য হত। শেলি কিংবা হাইনে কিংবা আরও পরে

বদলেয়ার যে দুঃখ, বিকার ও হতাশার উপকরণ নিয়ে কাজ করেছিলেন, বিশ শতকের বিদ্রোহী ও বিপ্লবী কবিদের তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃসহ বোঝা বওয়া মানুষ নিয়ে কাজ করতে হয়েছে।

এর মধ্যেই প্রেমকে যে-কবিরা জয়ী করতে পেরেছেন বাস্তব থেকে অসংলগ্ন না করে, তাঁরা আজকের এবং আগামী কালের জন্যেও সত্য-সুন্দর কবিতা লিখতে পেরেছেন। কারণ, প্রেম একটি মৃত্যুহীন উপকরণ।

এটা যদি তাঁরা না করতেন, তাহলে তাঁরা প্রতারণা করতেন জনগণের সঙ্গে। আবার ওদের কাছে জনগণ যদি অবিমিশ্র আনন্দের বাণী চাইত, তাহলে তারা নিজেদের প্রতারিত করত। ফরাসী পল এলুয়ার থেকে শুরু করে বাংলার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রেমের কবিতা লিখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে, সেগুলি একই সঙ্গে সত্য ও সুন্দর হিসেবে নিজ নিজ দেশে জনগ্রাহ্য হয়েছে।

কিন্তু একটা প্রবল উল্টো হাওয়া আছে এই ধরনের আধুনিক কাব্যরীতির বিরুদ্ধেও। এই হাওয়ার তোড়ে জলো প্রেমের কবিতার সঙ্গে বিপ্লবী ও বিদ্রোহী কবিদের লেখা পাল্লা দিয়ে পারছে না জনগ্রাহ্যতায়। দেশেদেশান্তরে সমাজতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের জয়ের পরেও এবং তার উত্তাল ঢেউ অন্যান্য দেশের মতো আমাদের উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়লেও জনগণকে জলো প্রেমের কবিতা শোনাবার লোকের অভাব হয়নি। আমাদের উপমহাদেশে কবিতা যেখানে সঙ্গীত, সেখানে বিদ্রোহী বিপ্লবী কবিদের আধুনিক রীতির কবিতাকে ছাপিয়ে গিয়েছে নিতান্ত অবাস্তব প্রেমের সাজানো কথার ছবি। গণ-সঙ্গীতের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে তথাকথিত জনপ্রিয় সঙ্গীত।

এইধরনের লেখাকে প্রশ্রয় দিয়ে জনগণ স্বভাবতই নিজেদের প্রতারিত করছে। এটা তাদের পক্ষে স্ববিরোধিতা, কারণ বিপ্লবের পথ তো তারা ছাড়ে নি। জনগণ সতত শ্রেণী সংগ্রামে নিয়োজিত। জনগণের তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোনো ফাঁক নেই। ফাঁকটা কি তবে কবিদের তরফ থেকে। দেখা যাচ্ছে, কবিরা জনগণের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পারছেন না। সম্ভবত, অবস্থাটা এই যে, জনগণ পদে পদে যে প্রত্যক্ষ রূঢ় অভিজ্ঞতার অধিকারী, তার কথা সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী বিদ্রোহী কবিতাতে আসছে না বলেই জনগণ বর্তমান সংকটে অর্থহীন হাল্কা কথায় মন

এখানেই প্রশ্ন, জনগণ যে সংকটময় জীবনযাপন করছে, তাতে পুরোপুরি পায়ে পায়ে থেকে শরিক হচ্ছেন কি আধুনিক রীতির বিপ্লবী কবিরা? জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুকান্ত, বিজন ভট্টাচার্য এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা যেমন-ভাবে জনগণের মধ্যে পড়ে থাকতেন, ঠিক সেরকমটা কি ঘটছেনা এখন?

অবস্থাটা এমন যে, জনসমাবেশে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের 'মুঝ্‌ সে পহ্‌লী সি মুহব্বত মেরী মহবুব না মাং' কবিতাটি আবৃত্তি করা হলে কিংবা গাওয়া হলে, শোনা যাবে, একটা হালকা সুরের গানের ফরমায়েস? আমরা খুব অবাক হব না, যদি কোনো সমাবেশে 'আমার প্রথম অনুরাগ চেয়ো না প্রিয়তমে' গাইবার পরে কোনো গজল গায়ক বহুসংখ্যক হালকা গজল গেয়ে ঐ গানকে ডুবিয়ে দেন।

কি করে এটা সম্ভব? হয়তো, আবার তিরিশের মতো একটা হাওয়া তৈরি করা দরকার। এই জন্যেই আজ ফয়েজকে আমরা বলব, তিরিশের যুগে যা লিখেছিলেন, তারপরে চারযুগ পেরিয়ে গিয়েছে। লোকের বাস্তব এখন আরেক রকমের। এর সঙ্গে মিলিয়ে আপনাকে নতুন স্তবক দিয়ে 'পহ্‌লীসি মুহব্বত…না মাং' লিখতে হবে। আজ চাই বিপ্লবী বিদ্রোহী কবিদের কাছ থেকেই প্রেমের কবিতা। তবে জনগণের চোখের সামনে যেসব বিরাট বিরাট অথবা ধারালো ঘটনা ঘটছে জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে তাদের সঙ্গে সূক্ষ্ম তারে এইসব কবিতার বাদী বিসংবাদী বৈপরীত্য বাঁধা না থাকলে ঢেউ জাগবে না জনগণহৃদয়ে। যাতে উল্টো হাওয়া ধাক্কা খায়, এমন বিস্ফোরণ ঘটবে না কাব্যের জগতে।

বছর দুয়েক আগে 'চাসনালার খনি দুর্ঘটনার' পরে অজিত পাণ্ডে একটি গান গাইছিলেন চাসনালার খনি মজুরের স্ত্রীর কান্না ও প্রতিবাদের গান।

মনে হয়েছিল যেন জনগণের মনের গভীরে ঘা মারতে পারে এই গানের কথাগুলি। জনগণ যে তৈরি রূঢ় সত্যের সঙ্গে জড়ানো সুন্দর প্রেমের গান শুনতে এ সত্য ঝলসে উঠেছিল। হয়তো, আসল প্রতিবন্ধকতা ঘটছে যেহেতু একটা প্রবল ধারার সৃষ্টি হচ্ছে না এই ধরনের কবিতা কিংবা গানে। একালে খণ্ড খণ্ড গানে কবিতায় জনগণের মন আর ভরবার নয়।

এখনও স্থূল ও সূক্ষ্মকে, রূঢ় এবং কোমলকে মিশ্রিত করেই লেখা দরকার কবিতা। কিন্তু বড় রকমের হাওয়া চাই। কারণ জীবন নতুন পৃথিবী গড়ার মুখে জটিলতর। যারা জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ঠেকাতে চাইছে, তারা জীবনকে বিভক্ত করে তার শক্তিকে ভেঙে দিতে চায়। অবক্ষয়ী

পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তারা একদিকে জমা করেছে মৃত্যু আর অর্থহীন ক্লিন্নতাকে। আরেকদিকে কাগজের ফুলের মতো সৌন্দর্যকে নয়নমনোহর করে সাজিয়েছে তারা।

এই অবক্ষয়ীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে পঞ্চাশ বছরে আধুনিক রীতির বিদ্রোহী ও বিপ্লবী কবিরা যে সব কাজ করেছেন, সেগুলির সঙ্গেই চাই 'চাসনালার খনি দুর্ঘটনা'র গানের মতো এক ঝাঁক গান—এক ঝাঁক কবিতা। জন-মন ভরে ছাপিয়ে পড়া চাই তাতে।

বাংলাদেশের ৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের পরে আধুনিক কবিরা জনগণের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন আধুনিক রীতির কবিতা নিয়ে। যেখানেই বিচ্ছেদ ঘটেছে সেখানেই কবিতার তার ছিঁড়েছে। যখনই নতুন সংযোগ হয়েছে প্রত্যক্ষ প্রতিমুহূর্তের গণঅভিজ্ঞতার সঙ্গে কবিতার, তখনই ঝমঝম করে বেজে উঠেছে হাজার তারের বীণা।

সারা উপমহাদেশে এই একই ধরনের ঘটনা। উল্টো হাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কায়দা জানাই আছে কবিদের। এখন লড়তে হবে আটঘাট বেঁধে।

গণতন্ত্রের জন্যে

বাসব সরকার

ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা বিগত আঠারো মাস ধরে জনতা পার্টির নিয়ন্ত্রণে আছে। আঠারো মাস আগে যে জনতা পার্টি ক্ষমতা দখল করেছিল আজ তার সেই ক্ষমতা, প্রভাব, জনসমর্থন আর তেমন নেই। এই আঠারো মাসে দেশে ক্ষমতাসীন একটি দলের জন্ম থেকে প্রৌঢ়ত্ব, জীবনকালের এতগুলি পর্ব অতিক্রান্ত হয়ে গেল। সকাল দেখে যেমন দিনটি বোঝা যায়, জনতা দলের গোড়াপত্তনের কাহিনী দেখে-শুনে অনেকে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তেমনি আশাবাদী হওয়ার ভরসা পান নি। জনতার বিরুদ্ধবাদীরা অবিশ্যি আগাগোড়া সন্দেহ প্রকাশ করে এসেছেন। কিন্তু এমনটি এই আঠারো মাসেই ঘটে যাবে, তেমন আশা বা আশঙ্কা বোধহয় কারো পক্ষেই করা সম্ভব হয় নি।

স্বভাবতই প্রশ্নই ওঠে কেন এমন হল? আর যদি জনতা পার্টির শাসন ক্ষমতার এই ক্ষয়িষ্ণু চেহারাটা অনিবার্য হয়ে থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এর বিকল্প কি? সব শেষে সমগ্র জাতীয় স্বার্থে কোনো বিকল্প যদি থাকে, তাহলে সেই পথে অগ্রসর হওয়ার মতো প্রস্তুতি কি, কতোটা হচ্ছে বা হতে পারে? বলা বাহুল্য এই সব প্রশ্ন আজ দেশে নানা স্তরে আলোচিত হচ্ছে, হতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে এটাও চোখে পড়ে এই ধরনের বিচার বিবেচনা বিদেশেও চলেছে। কারণ কোনো দিক থেকেই ভারত উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক

নীতির টানাপোড়েনে কেবল এদেশের ষাট কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ যুক্ত নয়, তার উপরে দুনিয়ার রাজনীতিরও যথেষ্ট নির্ভরতা আছে।

জনতা পার্টি কেন্দ্রে শাসনক্ষমতায় এসেছে কংগ্রেসের শেষের দিককার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। দেশের মানুষের একটা বড়ো অংশের কাছে ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচার অসহনীয় হয়েছিল বলেই, কেন্দ্রে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নিজের দাবি অনুযায়ী ইন্দিরা গান্ধী যে কংগ্রেসের নেত্রী, তিনি যেহেতু কংগ্রেসের কোনো খণ্ডিত অংশকে কোনোদিন কংগ্রেস বলে স্বীকার করেন নি, সেই অবিভক্ত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালেই মানুষ আস্থাহীনতা ঘোষণা করেছিল। সেবারে৭ নয়টি রাজ্যে কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা হারিয়ে, কেন্দ্রে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্ষমতা পেয়েছিল। লক্ষ্য করা যায়, সেবারেও উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটেছিল। এবারেও জনতার ইন্দিরা-বিরোধী শাসনের ভিত্তি হল উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারত। দাক্ষিণাত্যের অবস্থা ১৯৬৭-তে যা, ১৯৭৮-এ ও তাই। এর মধ্যে স্থান বিশেষে কিছু ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের, কংগ্রেসের ও জনতার দিক থেকে বিচার করলে, ব্যাপারটা মোটামুটি এক।

১৯৬৭ সালে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে কংগ্রেসের পরাজয়ের ভিত্তি রচনা করেছিল জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি কংগ্রেসীদের এক অংশের দলত্যাগ। নানা নামে তাঁরাই এই সব রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসেন। ১৯৭৭ সালে তাঁদের বড় একটা অংশ জনতা পার্টিতে অধিষ্ঠান করছেন। এর মধ্যে অনেক আয়ারাম গয়ারাম আছেন। কংগ্রেস ছেড়ে দল গড়েছেন আবার কংগ্রেসে ফিরে গেছেন, আবার কংগ্রেস ছেড়ে জনতা দলে এসেছেন। সুতরাং ভারতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বিগত ৩২ বছরে কেবল নাম বদলে কংগ্রেসীদের হাতেই কমবেশি রয়ে গেছে।

জনসংঘ প্রভৃতি দল যারা ১৯৬৭ সালে প্রথম উত্তর ভারতে রাজ্যশাসন ক্ষমতার ভাগ পেয়েছিলেন, তারা জনতার অঙ্গীভূত হয়ে কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েছেন। সমাজতন্ত্রীরাও সেই পথের অনুসারী। বলা বাহুল্য কেন্দ্রে ক্ষমতার টিঁকে থাকার জন্যে তাদের আগ্রহ ও উদ্যম স্বাভাবিক। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস যেখানে ক্ষমতা হারায়, সেখানে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অপশাসন, দুর্নীতি ও স্বৈরাচারের। সেই একই অভিযোগ, আরো

ভয়াবহ অভিজ্ঞতাপুষ্ট হয়ে, এবারে কেন্দ্রে তার ক্ষমতার অবসান ঘটিয়েছে।

কিন্তু এবারে জনতা পার্টি সোচ্চার হয়েছে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে। প্রাক্তন কংগ্রেসী শাসকদের মুখে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জিগির শুনেও লোকেরা অতীত অভিজ্ঞতা ভুলে তাদের সমর্থন করেছে একারণে যে অনতিপূর্ব কালে জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতা তাদের মর্মান্তিক। সুতরাং ইন্দিরা গান্ধীর অপশাসন ও স্বৈরাচারের বিকল্প হিসেবে প্রাক্তন শাসকদের বেছে নিতে জনগণ দ্বিধা করে নি, কারণ তাদের সামনে আর অন্য পথ ছিল না। তারা ভুলে যায় নি যেহেতু ভোলা সম্ভব নয় যে, নয়া দলের অনেকের কীর্তি কাহিনী কম স্বৈরাচারী নয়। তাই জনতা পার্টির গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে উত্তর ভারতে সমর্থন মিলেছে। অথচ এই কারণেই দেশের রাজনীতি তার কংগ্রেস-কেন্দ্রিকতা থেকে সরে যেতে পারছে না।

লক্ষ্য করলেই দেখা যায় জনতা দলের মাথা যাঁরা, কিছুদিন আগে পর্যন্ত যাঁরা মহা-সম্মানিত হয়ে ছিলেন, সেই জয়প্রকাশজী, কৃপালনীজী, দেশের রাজনীতির এই কংগ্রেস-কেন্দ্রিকতা অপরিবর্তিত রাখতে আগ্রহী। তাঁদের ধ্যান ধারণা অনুযায়ী তাই মূলত প্রাক্তন ও বর্তমান কংগ্রেসীদের নিয়ে জনতা ও কংগ্রেস দল, দেশে দ্বিদলীয় পার্লামেণ্টারি শাসন চালাবে। সুতরাং দেশে ক্ষমতার কাঠামোগত পরিবর্তন না করে, কংগ্রেস ও কংগ্রেস, অর্থাৎ প্রাক্তন ও বর্তমান কংগ্রেসীরাই দেশটা শাসন করবে। তাদের সঙ্গে অন্য কেউ কেউ থাকতে পারে, তবে সেটা হবে নিতান্ত স্থানীয় ও সাময়িক ব্যাপার। মোটামুটি জয়প্রকাশ ও কৃপালনী ভারতীয় রাজনীতির জন্মলগ্ন অনুযায়ী একটা কোষ্ঠী করে দিতে চান। সেই ছক কাটা পথেই হিসেব করে হুঁশিয়ার হয়ে চললে, শাসন ক্ষমতার একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা যাবে। সুতরাং জয়প্রকাশজী ও তাঁর অনুগামীদের সর্বাত্মক বিপ্লব বই-এর পাতায় যাই বলুক, আসলে মাঠে ময়দানে, হাটে-বাজারে, শ্রমিক কৃষক ও মেহনতী মানুষদের কাছে কংগ্রেসী গণতন্ত্রের রকমফের মাত্র হবে।

রাষ্ট্রক্ষমতা যার হাতে, এমন কোনো শাসকদলও, যে শ্রেণীর সঙ্গে তার সম্পর্ক সবচেয়ে জোরালো, তেমন কোনো শাসক শ্রেণী কোনোদিন স্বেচ্ছায় শাসন ক্ষমতা ছেড়ে সরে যায়, ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি। ভারতে যতই সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটুক না কেন, ভারতীয় সমাজ ইতিহাসে সৃষ্টি—

ছাড়া কোন ঘটনা ঘটাতে পারে না। এদেশের শাসক, বুর্জোয়া শ্রেণী তার ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যে এযাবৎ যথাসাধ্য করেছে এবং যতদিন সম্ভব যথাসাধ্য করবে। তারই প্রয়োজনে যেমন কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকে তেমনি কংগ্রেস যায়, জনতা পার্টি আসে। দরকার হলে আবার জনতা যাবে এবং সব কংগ্রেসীরা মিলেমিশে একাই অথবা একে ওকে সঙ্গে নিয়ে শাসন ক্ষমতা বজায় রাখার চেষ্টা করবে। সুতরাং কংগ্রেসি শাসনের কার্যত অবসান হয়নি এই জন্যে যে শ্রেণীভিত্তিতে জনতা ও কংগ্রেসে কোনো তফাৎ নেই।

কিন্তু দল বদলে গেলে নেতা বদল হয়। একের জায়গায় অন্যে আসে। এখন যেমন ইন্দিরার বদলে মোরারজী। ইতিহাসে ব্যক্তির যতটুকু ভূমিকা থাকা সম্ভব, তারই নিরিখে তাদের কাজের ধারায় আপাত-পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু শ্রেণীভিত্তি এক হলে মোটামুটি শাসন নীতির চরিত্র একই থাকে। যেমন দেখা যাচ্ছে জনতা শাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতিতে। মোটামুটি দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে একই ধারা অব্যাহত রয়েছে। এমন কি পন্থনগর, বাইলাডিলার হত্যাকাণ্ড, হরিজন নির্যাতন পর্যন্ত। মোরারজী যথার্থই বলেছেন যেসব হত্যা, জখম, নির্যাতন হয়েছে তা মোটেই নতুন নয়। কেবল জনতা শাসনে হচ্ছে শুধু, আগে কখনো ঘটেনি, এমন নয়। সত্যিই তাই। ধারা একই আছে, শাসনের tradition সমানে চলেছে, কেবল যারা সামনে ছিল তাদের মুখ বদলেছে, এই মাত্র। তবে গণতন্ত্র? সেটা কি জনতা শাসন কায়েম করেনি?

এই গণতন্ত্রের প্রশ্নটি গত আঠারো মাসে এদেশে রাজনীতির মেরুকরণ প্রক্রিয়া দ্রুত তালে হওয়ার পথে বিরাট দাপট নিয়ে মানুষকে হতচকিত ও মন্থর করে দিচ্ছে। কিন্তু গণতন্ত্র কার, কেন ও কিসের জন্যে? গণতন্ত্র যদি দেশের মানুষের জন্যে হয় তাহলে নির্বাচন ভোট দেওয়াতেই কি তার মোক্ষ-লাভ হবে? অনেক স্বৈরাচারী শাসনেও তো আটঘাট বেঁধে মানুষকে ভোট দিতে দেওয়া হয়। তাতে গণতন্ত্র ও মানুষ, কারো স্বার্থ থাকে না। এদেশে ভোট দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজে গণতন্ত্রের প্রকাশ আছে? আসলে নির্বাচনী গণতন্ত্রের ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল বলেই, ভোটাধিকারকে গণতন্ত্রের শেষকথা বলে মেনে নেওয়ার প্রবণতা আমাদের বেশি। ইন্দিরা গান্ধীও তাই বলে যেতে পারছেন যে, ৭৭ সালে সাধারণ নির্বাচনের ডাক তিনিই দিয়েছিলেন। অর্থাৎ না দিলেও তাঁর রাজত্ব আরো কিছুকাল চলত। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যালাহন সাহেবেও গত জানুয়ারিতে দিল্লীতে পার্লামেন্টে

বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই কথাই বলেছেন। তাতে ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্যে জোর বেড়েছে এবং অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু দেশের মানুষ বোঝে যে, ইন্দিরার গণতন্ত্র আর তাদের ধারণা অনুযায়ী যে গণতন্ত্র, তার মধ্যে ফারাক অনেক। কারণ তারা জানে যে, ইন্দিরার গণতন্ত্র দেশে জরুরি অবস্থা এনেছে।

কিন্তু জনতার গণতন্ত্র? অবশ্যই দেশে জরুরি অবস্থা আনে নি এখনো। দেশে সভা সমিতি করার, মিটিং মিছিলের অধিকার ভোগ করার, রাজনৈতিক বিরোধিতা করা, কাগজে অবাধে মতামত প্রকাশ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। আমরা ভুলে যাই নি যে, এই সব অধিকার ও স্বাধীনতা আমাদের সংবিধান সম্মত। কিন্তু সেই সংবিধান ইন্দিরার পক্ষে মুহূর্তে বানচাল করে স্বৈরাচারী হওয়ার পথে কোনো বাধা হয় নি। তা হলে দাবি করা যাক্ অত্যন্ত সঙ্গতভাবে যে সংবিধান থেকে স্বৈরী ক্ষমতা প্রয়োগের সমস্ত সূত্র বাতিল করতে হবে। জনতা সরকার টালবাহানা করে সেই দাবি দীর্ঘকাল ঠেকাতে পারবে না।

কিন্তু সংবিধানে স্বৈরী ক্ষমতার সূত্র বাতিল করে কি কোথাও স্বৈরাচার বন্ধ করা গেছে? আসলে যে কারণে শাসকশ্রেণী স্বৈরাচারী হতে চায়, সেই কারণ বর্তমান থাকলে প্রয়োজন মতো তারা স্বৈরাচারী হবে। তাদের হাতে শাসন ক্ষমতা যদি থেকেই যায় তো, সংবিধান সম্মত স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগে অসুবিধা থাকলে তারা সংবিধানটাই বাতিল করে দেবে। সে কাজে তাদের ঠেকাচ্ছে কে? সংকট মুহূর্তে শাসন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যে বুর্জোয়া শ্রেণী সংবিধান মেনে চলবেই এমন কথা ভাবাও অনুচিত।

কিন্তু জনতা দল সত্যিই তো গণতন্ত্রী হতে পারে? এই প্রশ্নের জবাব জয়প্রকাশ ও কৃপালনী দিয়েছেন। দেশে দ্বিদলীয় পার্লামেণ্টারি শাসন কায়েম করতে চেয়ে। সেই দুটি দল হল জনতা ও কংগ্রেস। অর্থাৎ তাঁদের মতে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র বজায় রাখার জন্যে শাসন ক্ষমতা প্রয়োজন মতো জনতা ও কংগ্রেস দলের মধ্যে অদলবদল করাই যথেষ্ট। অতএব জনতা সেই পরিমাণেই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, যে অনুপাতে কংগ্রেস বিশ্বাসী। আসলে ইন্দিরাকে বাদ দিলে কংগ্রেস ও জনতার মধ্যে পার্থক্য করার মতো কিছুই নেই।

কিন্তু দেশের সচেতন মানুষ জয়প্রকাশ ও কৃপালনীর এই অতি সরলীকৃত জরুরি অবস্থা তথা স্বৈরাচারের কার্যকারণগত ব্যাখ্যা মানতে পারে না।

ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যা যা করেছেন মোরারজী বা অন্য কেউ ঠিক তাই করবেন এমন প্রত্যাশা মূর্খতা। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী বুর্জোয়ার শ্রেণী শাসনকে সমস্ত সংকটের হাত থেকে বাঁচিয়ে বা যথাসাধ্য বাঁচাবার চেষ্টা করে এবং নিজের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখার জন্তে যা যা করেছেন, আরেকজন উচ্চাভিলাষী প্রধানমন্ত্রী যে অনুরূপ ঘটনায় অনুরূপ কাজ করবেন তাতে সন্দেহ নেই। এটাকে অস্বীকার করাও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার চরম ঘাটতি। কারণ বুর্জোয়া শ্রেণীর সামনে কৌশল করে সংকট এড়িয়ে যাওয়ার মতো সুযোগ ও সম্ভাবনা ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। ইন্দিরার জরুরি অবস্থা ঘোষণা হল সেই সংকটের মোকাবিলা করার মরীয়া নীতি।

জনতা দলের অধীনে সেই বুর্জোয়ার শ্রেণীশাসন অব্যাহত আছে। তাহলে কি তাদের সামনে থেকে সংকট কেটে গেছে? না তাও নয়। দল বদল ও ক্ষমতার আপাত হাত বদলে শাসন ক্ষমতার প্রয়োগে যেটুকু নতুন ভারসাম্য গড়তে ও প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন আনতে সময় লাগে, সেই সময়টুকু যেতে না যেতেই জনতা শাসনের স্বরূপ প্রকট হয়ে পড়েছে। যে ইন্দিরা শাসনের স্বরূপ ধরা পড়তে দশ বছর লেগেছে, জনতা শাসনের চেহারা ও চরিত্র বুঝতে তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগছে। মাত্র আঠারো মাসেই তার চেহারা আজ প্রকট। মোরারজী তাই বলেছেন যে, জনতা সরকার এমন কিছু করছে না যা আগে করা হয়নি। মানুষের চোখ খোলার পক্ষে এটা কি যথেষ্ট নয়? দেশে তৃতীয় বিকল্পের কথা উঠেছে এই পরিপ্রেক্ষিতে।

ভারতে বামপন্থী শক্তি সর্বভারতীয় পটভূমিতে দুর্বল হলেও তার শক্তি ও সম্ভাবনা উপেক্ষণীয় নয়। এরই সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ হল কমিউনিস্ট আন্দোলন। তার দুর্বলতা বিভেদ সত্ত্বেও তাকে কেউ ছোট করে দেখে না। আজ কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে কথা উঠছে তৃতীয় বিকল্প হিসেবে বামপন্থী ঐক্যের কথা, বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্যের কথা। কারণ বুর্জোয়া শ্রেণী চলতি সংকটের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হলে, ইন্দিরা মার্কা স্বৈরাচার নয়, সরাসরি সামরিক শাসনের পথেও যেতে পারে এমন, সম্ভাবনার কথা বামপন্থী আন্দোলন থেকেই বলা হয়েছে। সুতরাং জনতা দলের গণতন্ত্র-প্রীতির যতই সোচ্চার ঘোষণা চলুক, তার চলতি শাসন নীতির মধ্যে সামরিক বাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণের সম্ভাবনার ইঙ্গিতও আছে। তাহলে জনতার গণতন্ত্র-প্রীতির মূল্য কতোটুকু সে বিষয়ে কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকা উচিত নয়।

দেশে বামপন্থী শক্তিগুলির রাজনৈতিক বিচার বিবেচনায় তৃতীয় বিকল্প গড়ে তোলার কথা কিন্তু যতটা তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে, কাজের মধ্যে তার সাড়া ততটা জোরালো নয়। কারণ দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব আছে জনতাকে নিয়ে, হয়তো বা কংগ্রেসকেও নিয়ে। কোন দল কিভাবে বিচার বিবেচনা করবে তার মধ্যেও ইতস্তত-ভাব অনুপস্থিত নয়। পুরানো অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, সন্দেহ, আন্তরিকতার অভাব ইত্যাদি অনেক কিছু মনোগত কারণ নিঃসন্দেহে বামপন্থী শক্তিসমূহের কাছাকাছি হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এমনই যে বামপন্থী ও গণ-তান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্যের কথাকে সকলেই এই মুহূর্তের চূড়ান্ত প্রয়োজন হিসেবে চিহ্নিত না করে পারছেন না। এমনকি এই কথাও শোনা যাচ্ছে যে, বাস্তব অবস্থা খুবই অনুকূল, ঐক্য গড়ার কাজ আজ সম্ভব হলে কালকের জন্যে ফেলে রাখা উচিত নয়।

অথচ ঐক্য এখনো গড়ে ওঠেনি। কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে স্থান ও কাল বিশেষে সি-পি-আই ও সি-পি-এমের মধ্যে কর্মীস্তরে যৌথ সক্রিয়তা দেখা দিলেও তার এলাকা তত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে না। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির ক্ষেত্রেও কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। এমনকি যেখানে ঐক্য আছে, তেমন জায়গায় বিভিন্ন বামদলের কর্মীদের মধ্যে বিরোধ সংঘর্ষও ঘটে যাচ্ছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে ঐক্য কেন, কার বিরুদ্ধে ও কিসের জন্যে? না হলে সবচেয়ে জরুরি কাজের সবচেয়ে শম্বুক গতি হয় কেমন করে!

বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্য গঠনের তাগিদ আসছে প্রধানত তাদের সর্বভারতীয় পটভূমিতে দুর্বলতার উপলব্ধি ও বুর্জোয়া শ্রেণী শাসনের ঘনায়মান সংকট থেকে। একক বা বিচ্ছিন্নভাবে বামপন্থীরা এই সংকটের মোকাবিলা করতে পারবে না। কিন্তু ঐক্য গঠনের প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় বাধা হচ্ছে জনতার শাসন ক্ষমতায় টিঁকে থাকার সম্ভাবনা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা। অর্থাৎ কতদিন জনতা দল গণতন্ত্রের নামটুকু ব্যবহার করে টিঁকে থাকতে চাইবে এবং পারবে। সি-পি-এমের কৌশল হল এই সময়টুকু যথাসম্ভব কাজে লাগানো। তাই ইন্দিরা গান্ধীর পুনরাবির্ভাবের বিষয়টিকে তাঁরা জোর দিচ্ছেন, জনতা দলের ভেঙেপড়া ঐক্যকে চাঙ্গা করার জন্যে। কারণ জনতা দল ভাঙলে তাঁরা মনে করেন লাভ হবে ইন্দিরা গান্ধীর। তিনি দেশের রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণে

যতোটা সংকল্প ও সামর্থ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন, বামপন্থীরা নিজেদের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্যে সেরকম সক্রিয় হতে পারছে না। অথচ এই জরুরি কাজ জরুরি ভিত্তিতে করতে না পারলে লাভ হবে স্বৈরাচারী শক্তির। জনতা দলের শ্রেণীচরিত্র অনুযায়ী গণতান্ত্রিকতার জিগির স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আসল হাতিয়ার হতে পারে না।

বরং জনতা দলের টিঁকে থাকার মূল্য দিতে হচ্ছে সমগ্রভাবে দেশের মানুষকে। দলের নেতা ও মন্ত্রীরা এখনো সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন দলীয় কোন্দল মেটাতে। ফলে কার্যত শাসন ক্ষমতা চালাচ্ছে আমলারা। এই আমলাতন্ত্র আঠারো মাস আগে ইন্দিরা গান্ধীর শাসনের স্তম্ভ ছিল তাই নয়, দীর্ঘ ৩২ বছরের কংগ্রেসি শাসনের তারাই ছিল প্রধান ভিত্তি। জনতা দলের শাসন চলার অর্থ হল আমলাদের কার্যত অবাধ শাসন অব্যাহত রাখা। এবং এটাও সকলের জানা স্বৈরাচারী শাসকরা মূলত নির্ভর করে আমলাদের ওপরে। তাই কার্যত রকমফের করে স্বৈরাচারী শাসন চলছে অবশ্য কিছুটা সীমিত আকারে। যার মধ্যে আর যাই থাক গণতন্ত্র নেই।

নিঃসন্দেহে ভারতে শাসনক্ষমতার কেন্দ্রে রাজনৈতিক শূন্যতার পরিণাম ভয়াবহ। জনতা দলের দেড় বছরের শাসনে দেশের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা যতটা ধরা পড়েছে তেমন আর কখনো পড়েনি। শাসনের চৌহদ্দির বাইরে যাওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বামপন্থী শিবিরে বিভেদ যে স্বৈরাচারকেই একমাত্র বিকল্প হিসেবে খাড়া করে এটাই আজকের বাস্তব সত্য। এখনই ব্রিটেনে, আমেরিকায় ও পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রে ইন্দিরা গান্ধীকে বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলার অনুকূলে প্রচার চলছে। দেশের মধ্যেও তার বিরাম নেই। ফলে জনতা শাসনের প্রতিটি ভুলত্রুটি, অত্যাচার ও অনাচার কাজে লাগিয়ে ইন্দিরা গান্ধী যেখানে ক্ষমতায় ফিরে আসতে তৎপর, সেখানে এই রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও বামপন্থী শিবিরে শৈথিল্য বিরাজমান।

কংগ্রেস ও জনতা দলের মধ্যেও আজ এমন মানুষ অনেক আছেন যাঁরা বামপন্থী শিবিরের বিভেদের আশু অবসান চান। তাঁরা এটা মানেন যে তৃতীয় বিকল্প গড়ে না উঠলে ভারতে বুর্জোয়ার শ্রেণী শাসন সংকট কালে যে কোনো চরম পথ গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু নীতির ক্ষেত্রে জনতা দলের মধ্যে যে দ্বিমত আজ প্রকাশ্যে প্রচারিত হচ্ছে তার থেকে দলের অস্তিত্বের সংকট বোঝা যায়। শুধু নেতা নয়, নীতিগত প্রশ্নেও সেখানে বিরোধের আভাস আছে। বলা বাহুল্য বুর্জোয়া দলের

মধ্যেকার এই বিরোধ তীব্র হয়ে উঠতে পারে যদি তাদের আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক শক্তি বাইরে এমন কোনো শক্তি সমাবেশ দেখতে পায় যার ওপরে তারা নির্ভর করতে পারে। সোজা কথায় বুর্জোয়া দলের মধ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রক্রিয়া কোনো সংকট মুহূর্তে বামপন্থী শক্তিদের সংঘবদ্ধতার জোরেই চলতে পারে।

তাই আজকের প্রয়োজন হল দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে সংহত করার জন্যে বামপন্থীদের ব্যাপক উদ্যোগ। বুর্জোয়া শাসনে গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম চালাতে হয় অবিরত। সেই সংগ্রামের আজ স্তরগত পরিবর্তন ঘটেছে। তাই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা, জাতীয় স্বার্থের সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র কায়েম করার জন্যে ব্যাপক কর্মকাণ্ড, আজ দেশে স্বৈরাচারী শক্তিকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করার জন্যে দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহের বৃহত্তম ও মহত্তম ঐক্য গঠন করতে পারে। গণ আন্দোলনকে এই সমূহ কর্মসূচির রূপায়ণে গঠন করতে পারলে সেই দিকে প্রাথমিক পদক্ষেপ করা যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার সাম্প্রতিক ভাতিণ্ডা কংগ্রেসে এই আবেদন জানিয়েছে দেশের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শক্তিসমূহের কাছে। এ কাজে কমিউনিস্টরা সর্বশক্তি নিয়োগ করতে, যে কোনো বাধার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। কারণ তারা মনে করে এটা অগ্নিপরীক্ষা ও সংগ্রাম। এই সংগ্রাম গণতন্ত্রের জন্যে, জনগণের জন্যে।

কবি সুকান্ত

অমলেন্দু বসু

সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন স্বল্পজীবী কবি। স্বল্পজীবী, অথচ এই স্বল্পতার গণ্ডীর মধ্যেই আশ্চর্য পূর্ণতাময় কিছু কবিতা এবং, তা ছাড়াও, কোনো নিশ্চিত পরিমাপে ধরা যায় না এমন গভীরস্তরী সম্ভাবনাময় কিছু কবিতা তিনি রচনা করে গেছেন যার সমান্তরাল সম্পন্নতা কাব্যের জগতে অজস্র নয়। অকাল মৃত্যুর সময় সুকান্তর বয়স ছিল বিশ বৎসর নয় মাস। স্বল্পজীবী বিদেশী কবিদের মধ্যে একমাত্র চ্যাটার্টন এই অতি তরুণ বয়সসীমাও ছুঁতে পারেন নি, বেঁচেছিলেন মাত্র আঠারো বছর এবং তাঁর কবিকৃতি যতটা প্রকট অনুকরণে, স্বকীয়তায় তেমনটি নয়। ফরাসী কবি আর্থার র‍্যাবো মাত্র উনিশ বছর বয়সেই লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন, যদিও এই নিবৃত্তির পরে ও আরো আঠারো বছর তিনি জীবিত ছিলেন। সুকান্তর সঙ্গে এঁদের অথবা অন্য স্বল্পজীবী কবিদের (যেমন ফাল্গুনী রায় যিনি তেইশ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছিলেন)। তুলনা সুষ্ঠু হয় না, সুষ্ঠু হয় বরঞ্চ অন্য দুজন কবির সঙ্গে যাঁরা দুজনেই ইংরেজিতে কবিতা লেখা সত্ত্বেও বাঙালি ছিলেন। এঁদের একজন ছিলেন ডিরোজিয়ো (তিনি বাইশ বছর বয়সে মারা যান), অন্যজন ছিলেন তরু দত্ত (তাঁর জীবনান্ত হয় একুশ বছর বয়সে)। সুকান্তর কাব্যের মতোই ডিরোজিয়োর এবং তরু দত্তের কাব্য পাঠকচিত্তে প্রচুর সম্ভাবনার শিহরণ জাগায়, অনবশেষ বেদনাবোধ জাগায়—কোন্ দুর্দৈবের কৃষ্ণচ্ছায়া এঁদের কবিপ্রতিভার বিশদ স্ফুরণ প্রতিহত করল!

সুকান্তর অকালপ্রয়াণ কিন্তু এই দুজন পূর্বসূরী বাঙালি কবির অকাল-প্রয়াণের চেয়েও গভীরতর বেদনাময় কেননা এঁদের কাব্যে শিল্পসিদ্ধি মনে রাখবার মতো, তবুও সিদ্ধিসীমারও বাহিরে সুকান্তর কাব্যে যে গভীর সম্ভাবনা, যে মায়াবী প্রতিশ্রুতি হাতছানি দেয়, তার তুলনা পূর্বতন কবিদের মধ্যে পাই না। সিদ্ধির সমৃদ্ধি এবং প্রতিশ্রুতির বৈচিত্র্য, এই দুইয়ের সমকালীন আকর্ষণে সুকান্তর জীবন ও কাব্য পাঠকের মনে যুগপৎ আনন্দের ও বেদনার সৃষ্টি করে।

সুকান্তর কিছু অবিস্মরণীয় কবিতা আছে—ধরুন 'খবর', 'একটি মোরগের কাহিনী', 'আগ্নেয়গিরি', 'বিবৃতি', এবং আরো অনেক কবিতার মধ্যে সর্বোপরি 'বোধন'—

হে মহামানব, একবার এসো ফিরে—
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রামনগরের ভিড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার ;
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।

এসব এবং এদের সমতুল্য আরো কবিতার রূপের চেয়ে উজ্জ্বলতর রূপ কল্পনা করা কঠিন, যদিও কবি নিজে হয়তো আরো আরো উঁচুস্তরের রূপ সৃষ্টি করতে পারতেন, কল্পনা করতেন। সুকান্তর কাব্যের আয়তন ক্ষীণ, এই আয়তনের মধ্যেও দুটি বিকল্প বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। কিছু কবিতা আছে সেগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাদের স্বসমুখ শক্তিতে তাদের পক্ষে যতটা শিল্পিত সৌষ্ঠব অর্জন করা সম্ভব ছিল, ততটা তারা করেছে। একটি দৃষ্টান্ত বিচার করা যাক :

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়,
এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো,
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক,
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো!
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি।

বুদ্ধদেব বসু যেন এই কবিতাটি বিশেষ পছন্দ করেননি (সুকান্তর মৃত্যুর পরে তিনি শোকার্ত চিত্তে 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৫৪ আষাঢ় সংখ্যায় একটি

মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন) তথাপি এই পাঁচছত্রের কবিতাটি এক অন্তহীন আয়রনিতে আশ্চর্যরকমে সমৃদ্ধ, সে-আয়রনি (কিন্তু এহেন ছন্দ নয়) এলিয়ট লিখতে পারলে খুশি হতেন। এই কবিতার অদলবদল করা সম্ভব নয়, এই কবিতা তেমনি শিল্পসমৃদ্ধ, ভাবসমৃদ্ধ যেমন, ধরা যাক, স্বল্পজীবী কীটসের কোনো ওড্ যদিও কীটসের ওড্গুলির দৃষ্টিভঙ্গি সুকান্তর এই কবিতার (বা যে কোনো কবিতার) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমি আদৌ ভাবছি না, ভাবছি নির্বাচিত বিষয়টির পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশের জন্য তার শিল্পিত অঙ্গ রচনা। যেমন কীটসের গ্রীশিয়ান আর্ন্ কবিতায় তার অঙ্গের (তার ছন্দের, তার শব্দ-সমাহারের) কোনো হেরফের করা যায় না, সুকান্তর এই কবিতাটি তেমনি কোনো পরিবর্তনে কোনো সংস্কারে আবদ্ধ হতে পারে না। কবিতা দুটির ভাবজগৎ সম্পূর্ণ আলাদা, তাদের কারিগরি আলাদা। আমি কেবল একটি বিশেষ দিক থেকে এদের তুল্যতা দেখছি, দুটি কবিতাই যার যার ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। একজন কুড়ি বছরের তরুণের পক্ষে শুধু একটি মাত্র কবিতাতেও (সুকান্তর বেলা এহেন কবিতার সংখ্যা একের চেয়ে অনেক অধিক) এহেন শিল্পসিদ্ধি ব্যক্ত করা আদৌ সাধারণ কৃতিত্ব নয়। বিভিন্ন ধরনের শিল্পসিদ্ধি সুকান্তর কাব্যে অপ্রচুর নয়।

> বোম্বাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে ;
> রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
> আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
> তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে সরে যায় বন,
> আরো পথ, আরো পথ—বুঝি হয় লাল ও-পূর্ব কোণ।

এই রানারের বিভিন্ন গতি আভাসিত হয়েছে পরিবর্তনশীল স্বরবর্ণের সংযোজনায়, বিশেষত 'ও', 'অ', 'আ' এই তিনটি স্বরধ্বনিতে। এই ধ্বনিসামঞ্জস্যের ফলে কবিতার বক্তব্য অসাধারণ সত্যতা অর্জন করেছে।

> পথবিভ্রম হয়েছে এবার, আসন্ন মেঘ।
> চলে ক্যারাভান ধূসর আঁধারে অন্ধগতি,
> সরীসৃপের পথ চলা শুরু প্রমত্ত বেগ
> জীবন্ত প্রাণ, বিবর্ণ চোখে অসম্মতি।

অরণ্য মাঝে দাবদাহ কিছু যায় না রেখে
মনকে বাঁচাও বিপন্ন এই মৃত্যু থেকে।

এই স্তবকেও ধ্বনিসঙ্গতি মনে দাগ কাটে। 'জীবন্ত', 'বিবর্ণ', 'বিপন্ন', 'ই'-ধ্বনিতে শুরু করে 'অ'-ধ্বনিতে সমাপ্ত হয়েছে ; 'আসন্ন', 'প্রমত্ত', 'অরণ্য', এই অ-ধ্বনি সমাপ্তির সমাহারে যোগ দিয়েছে, তাছাড়া র-ধ্বনি বিভিন্ন প্রয়োগে ('বিভ্রম', 'ক্যারাভান', 'সরীসৃপ', 'প্রমত্ত', 'বিবর্ণ', 'অরণ্য' 'মৃত্যু' কবির বক্তব্যটি বলিষ্ঠ করে তুলেছে। কবির বয়স যদিও কম, কবিত্বশক্তি তাঁর কাঁচা নয়, অন্তত সর্বক্ষেত্রে নয়।

রুক্ষ মরুর দুঃস্বপ্ন,
হৃদয় আজকে শ্বাসরুদ্ধ,
একলা গহন পথে চলতে
জীবন সহসা বিক্ষুব্ধ।
জীবন ললিত নয় আজকে
ঘুচেছে সকল নিরাপত্তা,
বিফল স্রোতের পিছুটানকে
শরণ করেছে ভীরু সত্তা।

এখানেও 'রুক্ষ', 'দুঃস্বপ্ন', 'রুদ্ধ', 'বিক্ষুব্ধ' (চার ছত্রের এক স্তবকে) 'উ'-ধ্বনি দিয়ে শুরু হয়ে দ্বিত্ব ব্যঞ্জনবর্ণে আছড়ে পড়েছে এবং এই ছলকানো আওয়াজ সমর্থিত হয়েছে কতকগুলি শব্দের হসন্ত মধ্যধ্বনিতে : আজকে, একলা, চলতে, আজকে, টানকে, সত্তা।

বয়স তাঁর যত তরুণই হোক, এ কবি পদ্য জগতের ছড়িদার নয়, নিজ সৃজনীশক্তিতে উচ্চশির, যদিচ কখনো কখনো তাঁর ছত্রে শুষ্কতা, অকিঞ্চিৎ-করতা, এমনকি অসারতা প্রবেশ করে (কার রচনাতেই বা না করে!), তাঁর ভাব বহু পুনরাবৃত্তির নিষ্প্রাণতায় নিমজ্জিত হয় (সে-নিমজ্জন ও কাব্যের জগতে অ-সাধারণ নয়)। কাব্যপাঠে যাঁরা আনন্দ পান তাঁরা দশটি দুর্বলতা অগ্রাহ্য করবেন একটি সার্থকতার জন্য। সুকান্তর রচনায় সার্থকতার অভাব নেই কিছু মাত্র। এই স্বল্পজীবী কবিতা কিছু কবি রেখে গেছেন যেগুলিকে হয়তো মহৎ রচনা বলব না, নিটোল শিল্পকর্ম বলব অবশ্যই। শিল্পসিদ্ধির জ্যোতি একটি ক্ষুদ্র কণিকাতেও প্রতিভাত হয়। ইংরেজ কবি ব্লেইক লিখেছিলেন :

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.

ব্যক্তির মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড প্রতিফলিত হতে পারে, একটি মাত্র মুহূর্তের মধ্যে বিধৃত হতে পারে আবহমানকাল, ছোট কবিতায় সর্বধাত্রী সৃজনী প্রতিভা পাঠকের চিত্তে তেমনি উদ্বেল জাগতে পারে যেমন পারে একটি মহাকাব্যে। এ হেন ছোট কবিতা বেশি অনুসন্ধান না করেই একটি পেয়ে যাচ্ছি সুকান্তকাব্যে :

আকাশে আকাশে ধ্রুবতারায়
কারা বিদ্রোহে পথ মাড়ায়
ভরে দিগন্ত দ্রুত সাড়ায়
জানে না কেউ।
উদ্যমহীন মূঢ় কারায়
পুরনো বুলির মাছি তাড়ায়
যারা, তারা নিয়ে ঘোরে পাড়ায়
স্মৃতির ফেউ।

ছয়টি ছত্রে একই 'আয়'-স্বর মিল এবং 'আ'-স্বরের পুনরাবৃত্তি সুরের মায়াজাল বুনেছে। সুকান্তর কাব্যে কখনো কখনো যে অচিন্তিতপূর্ব সৃজনী উদ্বেল দেখতে পাই, আমার বিবেচনায়, স্বচ্ছন্দ ধ্বনিপ্রবাহ ছাড়াও বাকপ্রতিমার আশ্চর্য ঔচিত্য (আমি শব্দটি প্রয়োগ করছি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের অভিধা অনুসারে) এই উদ্বেলকে সমৃদ্ধিমণ্ডিত করেছে। সুকান্তর রচনায় রূপক ও উপমা এসেছে অতি স্বাভাবিক গতিতে। কিন্তু উপমা ও রূপক সহসা প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে যায়, সীমিত অর্থ থেকে ছড়িয়ে পড়ে অনবশেষ ইঙ্গিতে। যখন কবি লিখছেন :

ছোট ছোট চারাগাছ—
রসহীন খাদ্যহীন কার্নিশের ধারে
বলিষ্ঠ শিশুর মতো বেড়ে ওঠে দুরন্ত উচ্ছ্বাসে।

তখন চারাগাছ=শিশুপ্রাণ, এই শাদাসিধে তুল্যতা, এই উপমা পাঠকের মনে দোলা লাগায় না। লাগায় না কারণ এই তুল্যতা নিতান্ত মামুলি। কিন্তু

হঠাৎ চকিতে,
এ শিশুর মধ্যে আমি দেখি এক বৃদ্ধ মহীরুহ
শিকড়ে শিকড়ে আনে অবাধ্য ফাটল
উদ্ধত প্রাচীন সেই বনিয়াদী প্রাসাদের দেহে।

হঠাৎ চকিতেই একটা বিপ্লবী পরিবর্তন হয়ে গেল। যা ছিল মামুলি তুল্যতা, অগভীর উপমা, সেটি 'হঠাৎ চকিতে' পরিবর্তিত হয়ে গেল এক প্রতীকের অশেষস্তরী ঘূর্ণমান আভাসে ও সঙ্কেতে। এই অতীব স্বল্পজীবী কবি যেভাবে উপমা রূপকের সীমিত গণ্ডী থেকে বারেবারে চলে যাচ্ছিলেন প্রতীকের বিস্তীর্ণ জটিল প্রদেশে সে এক আশ্চর্য কবিকৃতি, যে-কৃতি এই বয়সের অন্য কবির রচনায় (আর্থার র‍্যাঁবো ব্যতীত) আছে বলে আমি জানি না। সুকান্তর প্রতীক আসলে (কোলরিজের ভাষায়) a focus of many relationships, তার পরতে পরতে অভিধার, সংকেতের বিচিত্রা। খুব প্রথম দিককার একটি কবিতা দেখুন : 'একটি মোরগের কাহিনী'। প্রথম থেকেই শ্লেষোক্তি পাচ্ছি : ক্ষুধার্ত মোরগ চিৎকার করে আহারের আবেদন জানাল, পেল না কিছুই।

তারপর সত্যি সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে ;
অবশ্য খাবার খেতে নয়—
খাবার হিসেবে ॥

এই শ্লেষের অতুলনীয় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সূক্ষ্মতায়, কাহিনীর সমাপ্তিতে একটা বৈদ্যুতিক মোচড়, কাহিনীটিকে অভাবিতপূর্ব অর্থবহ করেছে। এটি এখন আর একটি বিশেষ মোরগের কাহিনী নয়, যে কোনো মোরগ ও তার কাহিনী। ক্ষুধার্ত খাদ্যবঞ্চিত মোরগ (অন্য ক্ষুধার্ত প্রাণী দ্বারাও বঞ্চিত) ও প্রাসাদের খাদ্যপুঞ্জ, দুইয়ে তারতম্য ; এবং সর্বশেষে খাদক নিজেই যখন খাদ্যে পরিণত হয়ে গেল, তখন wit and imagination-এর এক অচিন্তিতপূর্ব মিলন হয়ে গেল।

এই মোরগের কবিতাটি এবং আরো অনেক কবিতার প্রাণবস্তু যে চলমান জীবনের সাময়িক রাজনৈতিক ধারণা নয়, রাজনৈতিক ধারণারও ভিত্তিতে যে সর্বধাত্রী জীবন-প্রত্যয় নিয়ত কর্মচঞ্চল, এবং এই প্রাণবস্তু যে যাবতীয় শিল্পকৃতির অন্তস্তলীয় চেতনা তার প্রমাণ

এই কবিতাগুলির বাইরে অন্য দুইভাবেও পাওয়া যায়। যে কোনো প্রদীপ্ত সাহিত্যিক ধারণার মতো সুকান্তর কবিতাগুলির ভিত্তি-সৃজনী ধারণা সাহিত্য ছাড়া অন্য শিল্পেও রূপায়িত হতে পারে। এ কথা প্রমাণিত হয়েছে তাঁর কিছু কবিতার চিত্ররূপায়ণে। কিছুকাল পূর্বে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে দেখেছিলাম অনেকগুলি ছবি, সেগুলি আঁকা হয়েছে সুকান্ত-কাব্যের কতকগুলি ছত্রের চিত্ররূপ হিসাবে। একই ভাবের, একই ধারণার বাঙ্ময় রূপ এবং চিত্ররূপ এ-দুয়ের রূপায়ণ সম্ভব তখনই হয় যখন কবিতাটির মূল প্রেরণায় কোনো গভীর জীবনপ্রত্যয় থাকে। সুকান্তর সৃজনীপ্রতিভায় যে গভীর ও মৌল জীবনপ্রত্যয় ছিল তার অবশ্য দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় 'অভিযান' শীর্ষক এবং 'সূর্য-প্রণাম উদয়াচল', 'সূর্য-প্রণাম অস্তাচল'—শীর্ষক দু-তিনটি ছোট্ট গীতিনাট্য-প্রয়াসে। অনেক ছত্রেই রবীন্দ্রনাথের সুর ও ভাষা প্রয়োগ পাঠকের মনে পড়ে। কিন্তু এই রচনাগুলির মৌল প্রত্যয় সুকান্ত ভট্টাচার্যেরই প্রত্যয়। সংকলিতা যখন নিহত হল বর্বর কোতোয়ালের অস্ত্রাঘাতে, তখন জনৈক পথিক যেন সব দর্শক শ্রোতা পাঠকের প্রতিভূ হয়ে বললেন :

কোথায় সে কন্যা, অপরূপ কান্তি,
যার বাণী আমাদের দিতে পারে শান্তি,
দেশে আজ জাগরণ যার সংগীতে,
আমরা যে উৎসুক তাকে গৃহে নিতে।

এই জাগরণী শক্তির পিছনে দাঁড়িয়েছে একটি প্রত্যয় যাকে কেউ যদি রাজনৈতিক প্রত্যয় বলেন, বলুন, কিন্তু এ-প্রত্যয় মূলত জীবনেরই প্রত্যয় :

রাজার ওপরে আর করব না নির্ভর—
আমাদের ভাগ্যের আমরাই ঈশ্বর!

তুলনীয় জীবনপ্রত্যয় প্রকাশিত হয়েছে 'সূর্য প্রণাম : অস্তাচল' গীতি-নাটিকাটিতে যেখানে রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করে সুকান্ত বলছেন :

'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন-ধন-মান'
তবু তুমি শিল্পীর তুলিকা নিয়ে করেছ অঙ্কিত
সভ্যতার প্রত্যেক সম্পদ, সুন্দরের সুন্দর অর্চনা।
বিশ্বপ্রদর্শনী মাঝে উজ্জ্বল তোমার সৃষ্টিগুলি

পৃথিবীর বিরাট সম্পদ। স্রষ্টা তুমি, দ্রষ্টা তুমি
নূতন পথের।

স্বাভাবিক জীবৎকাল ভোগ করতে পারলে, বুদ্ধদেব বসু যাকে বলেছিলেন 'নেপথ্যবর্তী আরো বড়ো সম্ভাবনা', সে-সম্ভাবনা পূর্ণ করতে পারলে, সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর জীবনপ্রত্যয় আরো কত বিচিত্র রকমে প্রকাশ করতেন সে বিষয়ে কল্পনা ও অনুমান শিহরণ-জাগানো, অলব্ধের বেদনাময় তবুও তাঁর সাহিত্য শিল্পের প্রতিশ্রুতি যে উজ্জ্বল এবং বহুমুখী সে কথাও সত্য, যতটুকু আমরা পেয়েছি তাতেই এই অতি-তরুণ কবির স্মৃতি বাংলা কাব্যে চির উজ্জ্বল থাকবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের ভূমিকা

চিন্মোহন সেহানবীশ

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বিপ্লবীদের ভূমিকা বিষয়ে গভীর ও সর্বাঙ্গীন আলোচনা এখনও পর্যন্ত হয়নি। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস' (অংশত তার আগের বই 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম'-ও) এক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শক বলে গণ্য হতে পারে। ডাঃ দত্তের বই-এর আলোচনার পরিধিটিও বিশ্বব্যাপী। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই বই দুটিই দীর্ঘকাল আগে নিঃশেষ হওয়ায় এ-বিষয়ের আলোচনার জন্য অপরিহার্য হয়েও আজও পাঠকদের কাছে দুষ্প্রাপ্য। বইটির নতুন সংস্করণ (ইংরাজী ও বাংলায়) অবিলম্বে প্রকাশ করা দরকার! সেই সংস্করণে যথাযোগ্য টীকা ও প্রসঙ্গপঞ্জী সংযোজন আবশ্যক—যা বাদে অধিকাংশ পাঠকের কাছেই বইটি কিছুটা এলোমেলো ও দুর্বোধ্য বলে মনে হবে। তাছাড়া বইটির প্রথম প্রকাশের পর এতাবধি ঐ বিষয়ে বহু নতুন তথ্যও গবেষকদের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নতুন প্রকাশনাকালে সেই সব তথ্যের অন্তত উল্লেখ অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন।

ডাঃ দত্তের পরে এই বিষয়ের অন্যান্য বই এবং কাজগুলির পরিধি আংশিক এবং সীমাবদ্ধ। একথা অবশ্য ঠিক যে আলোচনার পরিধিকে সীমাবদ্ধ করেই গবেষণার গভীরতা বাড়ানো যায়। তবুও এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট

উল্লেখগুলি থেকেই বোঝা যাবে যে ঐসব আংশিক বিষয়গুলি একত্র জুড়লেও গোটা বিষয়টির সমগ্র পরিসর তাতে ধরা পড়ে না।

ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের বই দুটি—'ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা' এবং 'বহির্ভারতে ভারতের মুক্তি প্রয়াস' ইউরোপের সীমাবদ্ধ পরিধিতে প্রবাসী ভারতীয়দের বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টার বিষয়ে বেশ কিছু নতুন তথ্য পরিবেশন করেছে। বই দুটিতে কৃষ্ণবর্মা, কামা, রাণা এবং সাভারকরদের লণ্ডন এবং প্যারিসের প্রথমদিকের কাজকর্ম এবং ঐতিহাসিক 'বার্লিন কমিটি'—ডাঃ দত্ত এবং ডাঃ ভট্টাচার্য দুজনেই যার সদস্য ছিলেন, তার কর্মকাণ্ডের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এই বইগুলিও বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় পাওয়া যায় না।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের লেখা শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার জীবনী একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। এই বইটিরও সব কপি দীর্ঘকাল আগেই নিঃশেষিত। ধনঞ্জয় কীরের 'বীর সাভারকর'-এ তাঁর বিদেশের কাজকর্মের বেশ কিছু সন্নিবিষ্ট থাকলেও 'লা এ্যাফেয়ারস সাভারকর' নামে পরিচিত ঘটনাবলির সম্পূর্ণ বিবরণ এতে অনুপস্থিত। ধর্মবীরের লেখা 'লালা হরদয়াল'-এ ও অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় যদিও এই লেখকের হরদয়াল সম্পর্কিত মূল্যায়নের সঙ্গে অনেকে একমত নাও হতে পারেন। মার্কিন গবেষক এমিলি ব্রাউনের 'হরদয়াল—হিন্দু রেভোলিউশানারি এণ্ড র‍্যাশানালিস্ট' বইটি সম্পর্কেও ঐ একই কথা। হরদয়ালের নিজের লেখা 'জার্মানী এবং তুর্কিতে চুয়াল্লিশ মাস' এখন দুষ্প্রাপ্য।

এই বিষয়ে সবচেয়ে বড় অভাব বোধহয় রয়ে গেছে মাদাম কামার একটি ভাল জীবনীর। অথচ প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রথম পর্যায়ে এই বিপ্লবী মহিলাই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। অধুনা মাদাম কামার কর্মের বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নির্বাসিত রুশ বিপ্লবী মিখাইল পাভ্‌লোভিচের প্রবন্ধ 'রেভলিউশ্যানারী সিল্যুয়েট' লেখাটি ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত 'রুশবিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী' গ্রন্থের শেষে সংযোজিত হয়েছে। কামা-সম্পর্কিত ডঃ পঞ্চানন সাহা ও শ্রীমতী বুলু রায়চৌধুরীর ইংরেজি পুস্তিকা দুটিতেও কিছু তথ্যের উল্লেখ রয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িককালে (১৯১৪-১৮) ভারতের বিপ্লবীদের দেশের বাইরের কাজকর্ম ও জীবন সম্পর্কে যে-সব রচনা প্রকাশিত হয়েছে তাতে মৌলিক তথ্যানুসন্ধান বিশেষ নেই, পূর্ব প্রকাশিত তথ্যই সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত ডঃ দত্ত ও ভট্টাচার্যের বই দুটিই এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। ডঃ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস'-এ প্রবীণ মারাঠী বিপ্লবী পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজের একটি বিবৃতিও সংযোজিত হয়েছে। ডঃ ভট্টাচার্যের লেখা 'বার্লিনের বিপ্লব কমিটির কথা' শীর্ষক যুগান্তর পত্রিকায় (মার্চ ৩০, ১৯৫২) প্রকাশিত প্রবন্ধেও 'বার্লিন কমিটি'-র গঠনের সময়কার ঘটনা বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা আছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে 'বার্লিন কমিটি'-র (এবং গদর পার্টি) কার্যকলাপের পরিধি ছিল আন্তর্জাতিক, যার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বিশেষত বাগদাদ, সুয়েজখাল অঞ্চল, ইরান এবং আফগানিস্থানে প্রেরিত মিশনগুলি এবং ১লা ডিসেম্বর ১৯১৫ সালে কাবুলে প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী ভারত সরকারের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আজও লেখা হয়নি।

উল্লেখযোগ্য যে বেশ কয়েকজন ভারতীয় দেশপ্রেমিক যথা, সুফী অম্বাপ্রসাদ, দাদাচান্‌জী কেরসাস্‌প্ (আমাদের প্রথম পার্শী শহীদ), কেদারনাথ এবং বসন্ত সিং ইরানে ইংরেজদের দ্বারা নিহত হন। সুফী অম্বাপ্রসাদ ভারতে বেশ কিছু কালের বিপ্লবী কার্যকলাপের পরে সর্দার অজিত সিং-এর সঙ্গে ১৯০২ সালে দেশত্যাগ করেন। তিনি 'বার্লিন কমিটি'তে ১৯১৫ সালে যোগদান করেন বেশ পরিণত বয়সে। এইসব বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমরা এখনো অতি অল্পই অবহিত। এমনকি ইরানে নিহত ঐ-সব ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের নাম ভারতসরকার সংকলিত স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ পরিচিতিতেও (হু ইজ হু অফ ইণ্ডিয়ান মারটারস, তিন খণ্ডে) স্থান পায়নি, একমাত্র অম্বাপ্রসাদের ছাড়া। তবে সে যুগের 'বার্লিন কমিটি'-র সঙ্গে যুক্ত, অপেক্ষাকৃত বেশি পরিচিত, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের 'মাই লাইফ স্টোরি অফ ফিফটি-ফাইভ ইয়ারস' এবং মৌলানা বরকতুল্লার উর্দু জীবনীটি পাওয়া যায়। এখন যা প্রয়োজন তা হল বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত বিক্ষিপ্ত তথ্যগুলিকে গেঁথে 'বার্লিন কমিটি'-র একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা। আমাদের আশা জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের ডঃ হর্স্ট ক্রুগার-এর প্রকাশিতব্য বইটি হয়তো এই অভাব অনেকটাই মেটাবে।

পাঞ্জাবী, উর্দু ও ইংরেজিতে গদর সম্পর্কে বইপত্র এবং তথ্যাদি বেশি কিছুটা পাওয়া যায় এবং তার পরিমাণ দিনে দিনে বাড়ছেও। খুশাবন্ত সিং এবং সতীন্দর সিং, জি. এস. দেওল, এল. পি. মাথুর এবং কল্যাণকুমার ব্যানার্জির চারটি ইংরাজি বই পাওয়া যাচ্ছে। গদর সংক্রান্ত বইপত্র পরিমাণে বেশি হলেও গুণগত মান যেসব কাজের সমান নয় তা বলাই বাহুল্য। গদর সম্পর্কে আমাদের আহরিত জ্ঞানে এখনও কিছু-কিছু ফাঁক রয়ে গেছে।

এই প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের দেশভগত মেমোরিয়াল কমিটি, দেশভগত ইয়াদগার কমিটি, দেশভগত পরিবার সহায়ক কমিটি, এই সব জাতীয় প্রতিষ্ঠান-গুলোর উদ্যোগ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এঁরা নানাভাবে গদর শহীদদের স্মৃতিকে স্থায়িত্ব দানের চেষ্টা করছেন, এমনকি শহীদ পরিবারের জীবিত আত্মীয়স্বজনকে আর্থিকভাবেও সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন। পাঞ্জাবের এই উদাহরণ আমাদের সকলেরই অনুকরণযোগ্য।

বার্লিন কমিটির মতোই গদর পার্টির কার্যকলাপও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পরিব্যাপ্ত ছিল এবং অনেকক্ষেত্রে এই দুই ধারা একাকার হয়েও গিয়েছিল। জাপান এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এই দুই ধারা আবার 'যুগান্তর' এবং 'অনুশীলন' গোষ্ঠীর বিপ্লবীদের সঙ্গে কিছুটা যুক্তভাবেও কাজ করে (দ্রঃ 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'—ডঃ যাদুগোপাল মুখার্জি)। জাপানে রাসবিহারী বসুর প্রথম দিকের কাজকর্ম সম্পর্কিত বইগুলির মধ্যে তথ্যের চেয়ে উচ্ছ্বাসই বেশি। উদাহরণস্বরূপ বিজনবিহারী বসুর 'কর্মবীর রাসবিহারী' এবং 'রাসবিহারী বসু: হিজ স্ট্রাগল ফর ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স'-র (সম্পাদনা—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও রাধানাথ রথ) উল্লেখ করা যায়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নিঃসন্দেহে সিঙ্গাপুর বিদ্রোহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯১৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারির এই বিদ্রোহে ফিফথ লাইট ইন্‌ফ্যান্ট্রি (পদাতিক বাহিনী) অংশগ্রহণ করে। এই বাহিনীর প্রায় সকলেই ছিলেন মুসলমান। বিদ্রোহটির গুরুত্ব লেনিনেরও মনোযোগ আকর্ষণ করে (কালেকটেড ওয়ার্কস, মস্কো ভল্যুম—২২ পৃঃ ৩৫৪ দ্রষ্টব্য) থাকলেও আজ পর্যন্ত তা গভীরভাবে অনুধাবিত হয়নি। এই বিষয়ে কুয়ালালামপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ আর. ডব্লিউ মস্‌বার্গেন-এর একটি অপ্রকাশিত এম. এ গবেষণাপত্র আছে। তাতে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আরও কিছু

লেখা এবং দরিসি চেন্‌চাইয়ার একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিও রয়েছে। গদর বিপ্লবীদের ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে এবং পানামা, ফিজি, মরিশাস, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ অঞ্চলের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত তথ্য এখনও ভালো রকমে সংগৃহীত হয় নি। বর্তমানে মস্কোবাসী সর্দারা সিং চিমার সঙ্গে আলোচনা করে আমার মনে হয়েছে যে এখনও এই বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

তবে সম্প্রতি প্রবীণ বিপ্লবী সোহন সিং জোসের 'ট্র্যাজেডি অব কোমাগাটা মারু' এবং দুই খণ্ড—'হিন্দুস্তান গদর পার্টি—এ শর্ট হিষ্ট্রি' এই বিষয়ে বহুলাংশে আমাদের জ্ঞানের অভাব পূরণ করেছে এবং অনেক ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়েছে। সোহন সিং যোশ এই বিষয়ে বিপুল পরিমাণ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে।

১৯১৭-এর বিপ্লবের পরে পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে ভারতীয় বিপ্লবীরা প্রায় তীর্থযাত্রীর মতো রুশ দেশে যেতে শুরু করেন। এঁদের কেউ কেউ রুশিয়ায় থেকে যান, বেশির ভাগই ভারতে ফিরে আসেন, না হয় অন্য দেশে চলে যান। এঁদের বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য ক্রমশই বাড়ছে—ভারত, রুশ ও অন্য দেশের গবেষকরাও এই তথ্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছেন দিন-দিন। রুশ বিপ্লবের প্রথম যুগে যে সব ভারতীয় বিপ্লবীরা সেই দেশে পৌঁছতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ৯২ বছর বয়সে সৌভাগ্যবশত এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছেন। অনেকেই অবশ্য মারা গেছেন। আমরা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের স্মৃতিকথা এবং উর্দুতে বরকতুল্লার জীবনীর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। যতদূর জানি, ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধির একটি জীবনীও (উর্দুতে) আছে। আব্দুর রব পেশোয়ারীর বিষয়ে (অন্ততঃ ইংরেজিতে) বিশেষ কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। শুনেছি, তিরুমল আচার্যের স্মৃতিকথা ধারাবাহিকভাবে দক্ষিণ ভারতীয় কোনো এক পত্রিকায় নাকি প্রকাশিত হয়েছিল—সেটি এখনো সংগৃহীত হয় নি। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'মেমোয়ার্স' বিতর্কিত গ্রন্থ হলেও নিশ্চয়ই একটি মূল্যবান দলিল। কিন্তু বর্তমানে সেটি নিঃশেষিত। সোভিয়েত ও চীনদেশে মানবেন্দ্রের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে রবার্ট সি নর্থ এবং জন. পি. হেথকক্সের বই রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং অবনী মুখার্জির বিষয়ে তেমন কোনো বইই নেই। অধ্যাপক রাখাল ঘোষের লেখা অবনী মুখার্জির জীবনী দীর্ঘদিন হল নিঃশেষিত। তাছাড়া বইটি ১৯২৮ সালে লিখিত বলে, অবনী মুখার্জির জীবনের শেষাংশটি

এতে স্থান পায়নি। শেষোক্ত এই বিপ্লবীর বিষয়ে অবশ্য আমাদের গবেষকরা বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সোভিয়েত গবেষক পেরমিৎস সোভিয়েতে গোড়ার যুগের ভারতীয় বিপ্লবীদের বিষয়ে যে বই লিখেছেন তার পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি অনুবাদ এখনও হয়নি। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যাত্রী' এবং 'হিস্টরিকাল ডেভেলপমেণ্ট অফ কমিউনিস্ট মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া' (তাঁর এই রচনা প্রকাশিত হয় 'রেভোলিউশন্যারি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া'র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট-ব্যুরোর নামে) বিতর্কিত হলেও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

মুহাজির বা হিজরত আন্দোলনের কোনো পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ইংরেজিতে এখনও লেখা হয়নি। প্রথম দিকে (১৯১৫) মুজাহিদ্‌দের কাবুল যাত্রা এবং তাঁদের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগাযোগ যেটুকু হয়েছিল, তার বিবরণ একমাত্র শওকত ওসমানীর 'পেশোয়ার থেকে মস্কো' ও 'হিস্টরিক ট্রিপস অফ এ রেভোলিউশনারি' এবং মুজফ্‌ফর আহমদের কিছু কিছু লেখা ছাড়া আর কোথাও নেই। এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ অবশ্য ডেভিড ড্রুহের বই এবং ওভারস্ট্রিট ও উইণ্ডমিলারের 'কমিউনিজম্ ইন ইণ্ডিয়ায় আছে। ডঃ রমেশ মজুমদার তাঁর 'হিস্ট্রি অব ফ্রিডাম মুভমেণ্ট ইন্ ইণ্ডিয়া'য় (ভল্যুম—৩ পৃঃ ৬২-৬৩) মুহাজিরিনদের জন্য মাত্র ১২ লাইন ব্যয় করেছেন আর সেই উল্লেখও সম্পূর্ণত ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়ার 'হিস্ট্রি অব কংগ্রেস'-এর ভিত্তিতে।

১৯৭১ সালে অধ্যাপক অরুণ কুমার বসুর 'ইণ্ডিয়ান রেভল্যুশনারিজ্ এব্রড' প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। শ্রীবসুর আলোচনা ১৯০৫-১৯২২-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও ডঃ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে'র পরে এইটিই ভারতের বাইরে বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার একটি অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা। এই বইটির পর্যালোচনা আমি অন্যত্র করেছি এবং কিছু কিছু দুর্বলতাও নির্দেশ করেছি। বইটির বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এর পাতায় চোখ বোলালেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের বিপুল বিস্তৃতির একটি ছবি পাওয়া যায়।

আমি এখনও পর্যন্ত এ প্রসঙ্গে প্রকাশিত বা গোপন সরকারি রিপোর্ট বা দলিলের ভূমিকা আলোচনা করিনি, এটা বিস্ময়ের উদ্রেক করতে পারে। আমি এমনকি বহু আলোচিত সিডিসন কমিটি রিপোর্টের (১৯১৮) কথাও উল্লেখ করিনি যদিও আমি জানি যে এগুলি বাদ দিলে চলে না।

তবু একথা বলব যে শুধুমাত্র এইসব দলিলের উপর নির্ভরশীলতা খুবই বিপজ্জনক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে প্রধানত রাউলাট রিপোর্টের উপর নির্ভর করে বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস রচনার চেষ্টা একান্ত বিভ্রান্তিকর। এর কারণ এই রিপোর্টগুলিতে প্রকৃত তথ্যের পাশাপাশি ভুল তথ্য, বিকৃত তথ্য, অর্ধসত্য এমনভাবে মেশানো রয়েছে যে তার ফলে ব্যক্তিবিশেষ বা সমগ্র আন্দোলন সম্পর্কে সহজেই বিকৃত বা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে এবং সেই কারণেই আমাদের কিছু কিছু এ-সম্পর্কিত রচনা শাসক গোষ্ঠীর উন্নাসিক মনোভাবেরও অংশীদার হয়ে পড়ে। নিজেদের অজ্ঞাতসারে নিরপেক্ষ তথ্যানুসন্ধানের নামে লেখক হয়তো জাতীয় আন্দোলনের কুৎসা প্রচারেও সহায়ক হয়ে পড়েন।

তবে এর জন্য সরকারি রিপোর্ট ব্যবহার না করা নেহাতই নির্বুদ্ধিতা হবে। সরকারি তথ্য ও দলিল আমাদের অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে যথেষ্ট বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে। শুধু মতামতের ক্ষেত্রেই নয় তথ্যের অংশেও সম্ভব হলেই বিকল্প এবং জাতীয় সূত্রগুলি থেকে এই মতামত ও তথ্যকে যাচাই করে নিতে হবে। অবশ্য আমরা যাকে জাতীয় আন্দোলনের নিজস্ব তথ্য-উৎস বা সূত্র বলেছি, তাও বিনা বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। সেখানেও ব্যক্তিগত, দলগত, গোষ্ঠীগত, প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক সংস্কারের ছাপ থাকে অনেক সময়ে। তাই সেক্ষেত্রেও আমাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তবুও বিষয়ানুগত্য বা নিরপেক্ষতার নামে গবেষকদের পক্ষে জাতীয় এবং জাতীয়তা-বিরোধী মানসিকতার বাস্তব ব্যবধানকে উপেক্ষা করা নিশ্চয়ই মারাত্মক।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই আমি নীচে সরকারি রিপোর্টের এই তালিকাটি এখানে উপস্থির করছি,

১। সিডিশন কমিটি রিপোর্ট—১৯১৮

২। পলিটিক্যাল ট্রাব্‌ল ইন্‌ ইণ্ডিয়া, ১৯০৭-১৭
—জেম্‌স্‌ ক্যাম্পবেল কার (এই গোপন রিপোর্টটিই আসলে পরবর্তী রাউলট রিপোর্টের তথ্যভিত্তি)

৩। টেররিজম ইন্‌ ইণ্ডিয়া ১৯১৭-১৯৩৬

৪। হিস্টরিজ অফ দি নন্‌-কো অপারেসন এ্যাণ্ড দি খিলাফৎ মুভ্‌মেণ্টস
—ব্যাম্‌ফোর্ড

৫। কম্যুনিজ্‌ম ইন্‌ ইণ্ডিয়া ১৯১৯-২৪—স্যার সিসিল কে।

৬। কম্যুনিজ্‌ম ইন্‌ ইণ্ডিয়া ১৯২৫-২৭—ডেভিড পেট্রি।

৭। কমু্যনিজম ইন্ ইণ্ডিয়া (১৯২৭-৩৩)—উইলিয়ামসন।

এইসব বইগুলোই এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। প্রবাসী বিপ্লবীদের কাজকর্মের বিষয়ে অনেক তথ্যও এই বইগুলিতে আছে। একই নামে সুবোধ রায়ের সম্পাদিত একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে—তার পরিধি ১৯২৫ থেকে ১৯৩৪। এই বইটিতে জাতীয় মহাফেজখানায় সংগৃহীত বহু দলিল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এ-ছাড়া রয়েছে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য মহাফেজখানাগুলিতে সংগৃহীত বহু হোম পলিটিকাল বিভাগীয় দলিল। কেন্দ্র মহাফেজখানায় এ-ছাড়াও আছে পররাষ্ট্র বিভাগীয় এবং প্রথম ও (সম্ভবত দ্বিতীয়) বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ক জার্মান ফরেন মিনিস্ট্রি আরকাইভ্সের বহু মূল্যবান দলিল। নেহরু মিউজিয়ামেও কিছু কিছু সংশ্লিষ্ট দলিল রয়েছে। বিদেশের, বিশেষ করে ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন দেশ ও জার্মানির বিভিন্ন তথ্যকেন্দ্রের এখানে পৃথক উল্লেখ আর করলাম না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে বিশেষত ১৯৪১ এর জানুয়ারি মাস থেকে আফগানিস্তান, জার্মানি, ইটালি, জাপান, বার্মা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সুভাষচন্দ্র বসুর ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়। সৌভাগ্যবশত সুভাষচন্দ্র এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর বিষয়ে প্রকাশিত বিবরণ ও তথ্যের ভাণ্ডার ক্রমবর্ধমান যদিও গুণগত মান সবগুলির সমান নয়। এই দলিলগুলির মধ্যে অনেকগুলিই নেতাজী বসুর সহকর্মীদের স্মৃতিকথা। কলকাতাস্থিত 'নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো' সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন ও কর্মকাণ্ডের এই অধ্যায়টির বিষয়ে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এবং কয়েক খণ্ড সম্পাদনা করে প্রকাশও করছেন। 'নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো' ১৯৭৪ সালে এই বিষয়ে একটি সেমিনার সংগঠন করেন। সেই সেমিনারে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পঠিত এবং আলোচিত হয় এবং তার ফলে 'নেতাজী এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়াজ ফ্রীডম্' নামে এই প্রবন্ধগুলির একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ভগতরাম তলোয়ার যিনি নেতাজীর অন্তর্ধানের পরবর্তী বিপদসঙ্কুল যাত্রার পথপ্রদর্শক ছিলেন তিনি 'দি তলোয়ারস অফ পাঠানল্যাণ্ড এণ্ড সুভাষচন্দ্রজ গ্রেট এসকেপ' নামে একটি মূল্যবান বই প্রকাশ করেছেন।

জীবন ও শিল্প বিষয়ে কিছু কথা

রামকিঙ্কর বেইজ

আমাদের বাড়ির ঘরগুলোয় দেয়ালভর্তি নানারকমের দেবদেবীর ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার ছিল। তার মধ্যে ওঁ-এর ভেতর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। আমি তখন খুব ছোট। পড়াশুনা ও খেলাধূলার ফাঁকে ফাঁকে সেইসব ছবিগুলো অনেকক্ষণ ধরে দেখতাম। নানা রঙের দেবদেবীদের ছবি দেখতে ভারি ভালো লাগত। ওঁ-এর ভেতর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির ছবি প্রথম কপি করি। ছবি আঁকায় সেই আমার প্রথম হাতেখড়ি। বাঁকুড়া জেলায় আমাদের বাড়ি। সেই বাড়ি এখনও আছে। মাঝে মাঝে যাই সেখানে। আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল কুমোরদের আড্ডা। কুমোরদের মূর্তি গড়া, পটের কাজ, তুলি দিয়ে রঙ চাপানো খুব মন দিয়ে দেখতাম। ঐ কুমোররাই আমার মূর্তি গড়ার প্রেরণা। আর ছিল চারপাশে প্রকৃতি। প্রকৃতিও আমায় রঙের ব্যবহার শিখিয়েছিল। খেতের শাক-সবজি, ধানের চারা, ঘাস—সবুজের কত variation। বাঁকুড়ার মাটি ছিল লাল। আমি দেখতাম আমার চারপাশে প্রকৃতি নানা রঙ যেন আমারই জন্য সাজিয়ে রেখেছে। লাল মাটি, রান্নার হলুদ-মশলা...এসবই আমি রঙ হিসেবে ব্যবহার করতাম। নানা রঙ আমি নিজেই তৈরি করেছি। কুমোরদের কাছেও রঙ তৈরির করমুলা জেনে নিয়েছিলাম। একদিন ধারা-বর্ষণের পর দেখি আমাদের বাড়ির

রামকিঙ্কর

সামনে মোরামে ঢাকা রাস্তা ধুয়ে নীল রঙের মাটি বেরিয়ে পড়েছে। কি যে হল—খাবলা দিয়ে সেই মাটি খানিকটা তুলে এনে ছোট বড় নানা মূর্তি ও পুতুল তৈরি করতে লাগলাম। সেই আমার প্রথম মূর্তি গড়ার কাজ।

খাতার পাতা ছিঁড়ে ঘরে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের ছবিগুলো কপি করতে লাগলাম। আবার কুমোরপাড়া থেকে মাটি চেয়ে এনে ওদের গড়া মূর্তি দেখে দেখে মূর্তি ও পুতুল গড়তে লাগলাম। এসবে আঁকা আর গড়ার কাজ করতে করতে কিরকম নেশা লেগে গেল। সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেতাম যখন দেখতাম আমার গড়া পুতুলগুলো নিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। মূর্তি বা পুতুল ভেঙে গেলে ওরা যখন আবার আমাকে গড়ে দেবার জন্য পেড়াপিড়ি করত তখন মনে হত সত্যিই আমি কিছু একটা সৃষ্টি করতে পারি।

পাঠশালা পর্ব শেষ করে স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর মাঝে মাঝেই ক্লাসে বসে ছবি আঁকতাম। মাস্টারমশাইরা বকতেন না। বরং আরও উৎসাহ দিতেন। সেকালে সাধারণত পড়াশুনা না করে ছবি আঁকলে শিক্ষক ও গার্জেনরা খুশি হতেন না। নিছক সময় নষ্ট বলে মনে করতেন। কিন্তু আমার কপালটা ভালো ছিল। শৈশব থেকেই আমার শিল্পকর্মে কোনো বাধা আসে নি।

ম্যাট্রিক ক্লাসে যখন পড়ি তখন আমার অনেক ছবি আঁকা হয়ে গেছে। স্কুলের ম্যাগাজিন, দেয়াল পত্রিকা, সরস্বতী পুজোর প্যাণ্ডেল ডেকরেশন, নাটকের সিন-সিনারি আঁকা, স্টেজ তৈরি—সব কিছু দায়িত্বই ছিল আমার ওপরে। নাটকে অভিনয় করার প্রবল বাসনা ছিল—মাঝে মাঝে অভিনয় করতামও।

এমন সময়ে গান্ধীজীর ডাকে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। তার ধাক্কা আমাদের স্কুলেও এসে পৌঁছেছিল। তখনকার নেতা অনিলবরণ রায়ের নেতৃত্বে আমরাও সকলে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অনিলবাবু একটা ন্যাশনাল স্কুল গড়ে তুললেন। আমরা সকলে 'ইংরেজদের গড়া স্কুলে পড়ব না' বলে সেই ন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি হলাম। দেশনেতা অনেকের প্রতিকৃতি আর পোস্টার আঁকলাম। সে-সব ছবি সভা ও মিছিলে ব্যবহার হত।

একবার রামানন্দ চ্যাটার্জি আমাদের বাড়ি এলেন। আমার ছবিগুলো দেখে তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনে আসার প্রস্তাব দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম। তখন আমার বয়স পনের ষোল হবে। সেই আমার প্রথম শান্তিনিকেতনে আসা।

শান্তিনিকেতনে আসার পর জীবনের আর এক অধ্যায় শুরু হল। এখানকার প্রকৃতি, স্বয়ং গুরুদেবের উপস্থিতি—সবকিছু মিলে শান্তিনিকেতনে শেকড় গভীর হল। তখনকার আশ্রমজীবন ছিল সহজ সরল সুন্দর। আকারেও আশ্রমটি ছিল অনেক ছোট। বেশ একটা ঘরোয়া পরিবেশ। ঠিক যেন একটি যৌথ পরিবার। হরিণ শাবকদের মতো শিশুরা ঘুরে বেড়াত স্বাধীনভাবে। আশ্রমে শিশুদেরই প্রাধান্য ছিল। ছোট বড় প্রত্যেক আশ্রমবাসীকেই দৈনন্দিন কাজে অংশ গ্রহণ করতে হত। আমিও তখন আশ্রমের আর পাঁচটা কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম। পড়াশুনা, নাটক, গান থেকে শুরু করে আশ্রমকে পরিচ্ছন্ন রাখা—সব কাজেই আমরা সকলে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতাম। সমস্ত কাজই ছিল অবশ্যকরণীয়। আমরা আনন্দের সঙ্গেই করতাম। এর পাশাপাশি চলত আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সৃষ্টির কাজ। এভাবে আনন্দে কাজ করার প্রেরণা পেতাম গুরুদেবের কাছ থেকে। তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল—শাসন ছিল না।

গুরুদেবের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তাঁর মুখোমুখি হতে বুকের বেশ জোর লাগত। আমি তো পারতপক্ষে তাঁর সামনে যেতামই না। অথচ গুরুদেব শান্তিনিকেতনে আমাদের মধ্যেই আছেন—এই অনুভূতি আমাদের অদ্ভুত নিরাপত্তা, প্রেরণা ও আনন্দ যোগাত। একটা পরিতৃপ্তির স্বাদ পেতাম। ঐ সময়ে একবার যারা শান্তিনিকেতনে আসত—ফিরে যেত না। শান্তিনিকেতনে আসার পর আমি কয়েকমাসের জন্য দিল্লীতে মডার্ন স্কুলে কাজ নিয়ে গিয়েছিলাম। ওখানকার একটি দেয়ালে আমি সরস্বতীর একটা প্যানেলও তৈরি করেছিলাম। কিন্তু বেশিদিন থাকতে পারলাম না। পাঁচ-ছমাস বাদেই আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে চলে এলাম। সেই যে আসা—তারপর থেকে আর কোথাও যাই নি। এখানেই রয়ে গেলাম।

প্রথমে কলাভবনে আমরা তিন-চারজন honorary হিসেবে যুক্ত হলাম। কিছুদিন বাদে আমি আর বিনোদবাবু মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে নিযুক্ত

হই। ঐ পঞ্চাশ টাকায় তখন কত প্রাচুর্য ছিল। তখনকার দিনে একজন লোকের মাসে দশটাকায় ভালোভাবেই চলে যেত। আর এখনকার মানুষের হাজার-দুহাজার পেয়েও অভাব ঘোচে না। এখনকার একজনের মাসিক আয়ের অঙ্ক তখন কল্পনারও বাইরে ছিল।

মাস্টারমশাই অর্থাৎ নন্দলাল বসু মশায় আমরা আসার কয়েকবছর আগে কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। শিল্পী এবং শিক্ষক হিসেবে তিনি সকল ছাত্রছাত্রীকে খুব সাহায্য করতেন। সকলের সঙ্গেই তাঁর ব্যবহার ছিল মধুর। তিনি ছিলেন ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রবক্তা। তখনও এখানে ওয়েস্টার্ন আর্ট চালু হয়নি। মাস্টারমশাই ওয়েস্টার্ন আর্ট খুব একটা পছন্দও করতেন না। আমরা কয়েকজনই ওয়েস্টার্ন আর্ট সম্বন্ধে পড়াশুনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। শান্তিনিকেতনে আমরাই প্রথম ওয়েস্টার্ন আর্ট আমদানি করি। আমাদের নানা কাজের মধ্যে ওয়েস্টার্ন আর্টও ঢুকে পড়েছিল। নন্দলালবাবু আমাদের কাজে কখনও বাধা দিতেন না। বরং সাহায্য করতেন। শান্তিনিকেতনে বসেই আমরা নানা শিল্পচর্চা করেছি। তবে তখন মূর্তি গড়ার কাজ আমি একাই করতাম। ছোটবেলায় কুমোরদের কাছ থেকে মূর্তি গড়ার যে প্রেরণা পেয়েছিলাম—সেই প্রেরণাই পরবর্তী জীবনে মূর্তি গড়ার ইন্ধন জুগিয়েছে। খরচের কথা বিবেচনা করে কলাভবনে তখন মূর্তি গড়ার শিক্ষা দেওয়া হত না। আমি আমার অন্যান্য কাজ ও ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে লুকিয়ে মূর্তি গড়তাম। তখন তো এখনকার মতো এত টাকা গড়াগড়ি যেত না। দারুণ আর্থিক কষ্ট ছিল। খুব কষ্ট সহ্য করেই আশ্রম চালাতে হত।

সঙ্গীতভবনের কাছে সুজাতার মূর্তি আমার প্রথম প্রকাশ্য কাজ। আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যখন দেখলাম নিখরচায় বা অত্যন্ত কম খরচায় মূর্তি করা যায়—তখন ঐ সুজাতার মূর্তি গড়ি। গুরুদেবকে না জানিয়ে এভাবে মূর্তি করার জন্য সকলেই একটু অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। একদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সুজাতার মূর্তির সামনে গুরুদেব থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সঙ্গে ছিলেন নন্দলালবাবু এবং আরও কয়েকজন। সকলেই অসোয়াস্তি বোধ করেন। গুরুদেব অনেকক্ষণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন গম্ভীরভাবে। জানতে চাইলেন কার কাজ। নন্দলালবাবু তখন আমার নাম উচ্চারণ করতেই গুরুদেব তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করার নির্দেশ দিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেলেন। সকলেই প্রমাদ গনলেন। আমাকে নিষেধ করা সত্বেও মূর্তি

গড়েছি বলে উপস্থিত প্রত্যেকে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। সবকিছু শুনে আমারও তখন হৃদ্‌কম্প শুরু হল। নিজের হার্টবিট নিজেই শুনতে পাচ্ছি। আমি তো খুব সাহস সঞ্চয় করে গুরুদেবের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়ালাম। গুরুদেব গুরুগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি মশলাপাতি দিয়ে তৈরি করেছিস ?" প্রশ্নটা শুনে আমার ধড়ে প্রাণ এল। মুখ তুলে জবাব দিলাম। সেই প্রথম গুরুদেবের সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময়। নিমেষে সমস্ত ভয় লজ্জা দুঃখ দূর হয়ে গেল। ভৎ‌র্সনা তো দূরের কথা—গুরুদেবের চোখ থেকে যেন স্নেহবর্ষণ হচ্ছিল। আমার দেহে মনে এক অপার্থিব আনন্দ। গুরুদেব অত্যন্ত আবেগভরে আমায় বললেন, "এর চেয়েও বড় বড় মূর্তি দিয়ে সমস্ত আশ্রমটা ভরে দিতে পারবি ? ভরে দে সব আশ্রম।" ব্যস, আর আমায় দেখে কে ? এক মুহূর্তে মূর্তি গড়ার বন্ধ দুয়ার খুলে গেল। এর পরেই সাঁওতাল কুলি পবিবারের মূর্তি রচনা করি। পরে আরও সব মূর্তি গড়লাম। সবগুলোই কংক্রিটের ঢালাই করে করা। পাথরে খোদাই করে কাজও করেছি। তাতে খরচ অনেক। প্রথমত যে পাথর দরকার হয় সেগুলো সবজায়গায় পাওয়া যায় না। অনেক দূর দূর থেকে বাছাই করে বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই আনতে হয়। তাতে আমার খরচ অনেক পড়ে যায়। আর কংক্রিটের ঢালাইয়ের কাজ করতে বেশি পয়সা লাগে না—যেখানে খুশ বসে করা যায়। সংখ্যায়ও বেশি করা যায়। প্রতি মুহূর্তের দেখাকে ধরে রাখা যায়। ছবির মতন মূর্তিও কতকগুলি মুহূর্তের moodকে ধরে রাখে।

আমি নিজে সাধারণ গরিব ঘরের মানুষ। ছোট থেকেই আমার আশে পাশে খেটে খাওয়া মানুষ দেখে অভ্যস্ত। এদের সহজ সরল জীবন, কাজ করার ভঙ্গি, চলমান রূপ—এ সবই আমার ছবি ও মূর্তির বিষয়বস্তু। শান্তিনিকেতনে সাঁওতালরা আমায় বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এদের মেয়ে-পুরুষরা সকলেই কাজ করে। কাজ করে হাসিমুখে। আবার সামান্য ফাঁক পেলেই উৎসবে, নাচে গানে মেতে ওঠে। এদের জীবনের চাহিদা খুব সীমাবদ্ধ। কিন্তু আনন্দ পাওয়া ও আনন্দ দান করার ক্ষমতা অসীম। তাই এদের এই চলমান জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তগুলিকে আমি আমার ছবি ও মূর্তিতে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। মূর্তি করার জন্য আমায় এদের ধরে বসিয়ে মডেল করতে হয় নি। এদের চলমান মূর্তিই আমার মডেল। আমি আমার ইচ্ছামতো স্বাধীনভাবে ছবি এঁকেছি, মূর্তি গড়েছি। কারুর

ফরমায়েস অনুযায়ী করি নি। গুরুদেবেরও এ ব্যাপারে কড়া নির্দেশ ছিল "এখানে সকলকে নিজের মতো করে কাজ করতে দাও। সকলে স্বাধীনভাবে কাজ করবে। আশ্রমটা তো ওদেরই।" আমরা তখন সত্যিই স্বাধীনভাবে আঁকা আর গড়ার কাজ করতাম।

শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের উপস্থিতি আমার শিল্পচর্চায় পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। যদিও প্রত্যক্ষভাবে আমার সৃষ্টিতে তাঁর প্রভাব ছিল না। আমি যে সারা জীবন নিজের ইচ্ছেমতো শিল্পচর্চা করতে পেরেছি—সেই পারাটাই সবচেয়ে বড় কথা। সেটাই গুরুদেবের প্রভাব। গুরুদেবের উপস্থিতি এবং আস্কারা আমার শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে চিত্রশিল্পী হিসেবে দেখবার সুযোগও আমার হয়েছিল। গোড়ার দিকে গুরুদেবের ছবি আঁকার সংবাদকে কোনো গুরুত্ব দিই নি। ভেবেছিলাম কবি-মানুষের ওটা একটা নতুন খেয়াল। আড়ালে কত হাসাহাসিও করেছি। যখন শুনলাম লেখার কাজ ছেড়ে দিয়ে পাগলের মতন একটার পর একটা ছবি আঁকছেন তখন খুব কৌতূহল হল দেখবার। চুপি চুপি একদিন চলে গেলাম। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই কি কবির নতুন সৃষ্টি! বুঝতে পারলাম লেখায় আর কুলোচ্ছে না—তাই ছবির সাহায্য নিয়েছেন। তখন থেকে নিয়মিত গুরুদেবের ছবি আঁকা দেখতাম।

গুরুদেব সম্বন্ধে তখন আমার ভয় কেটে গেছে। একদিন আমি গুরুদেবের প্রতিমূর্তি তৈরি করার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। শুনে গুরুদেব গম্ভীর হয়ে উসখুস করতে লাগলেন। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছেন না। আমি একটু চাপ দিতেই অল্প দ্বিধার সঙ্গে বললেন "ছাখো বাপু, ওদের দেশে (পশ্চিমে) যেমন করে মডেলকে বসিয়ে রাখে আর ওদের ইচ্ছেমতো ওঠ্‌ বস্‌ করায়, তেমনটি আমি পারব না। ওটা আমার কাছে বিরক্তিকর। অত ধৈর্য রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" আমি গুরুদেবকে আশ্বস্ত করলাম। আমাদের ব্যাপারটা তেমন হবে না। উনি ওনার কাজ করবেন, আমিও আমার কাজ করব। শুনে খুশি হয়ে বললেন "বেশ বেশ! সেভাবে যদি পারিস তো কর।" আমারও কোনো অসুবিধে হয় নি তাতে। ঐ যে মূর্তিতে গুরুদেবের চোখের বদলে বল ব্যবহার করেছি সেইটে তখনকার কাজ।
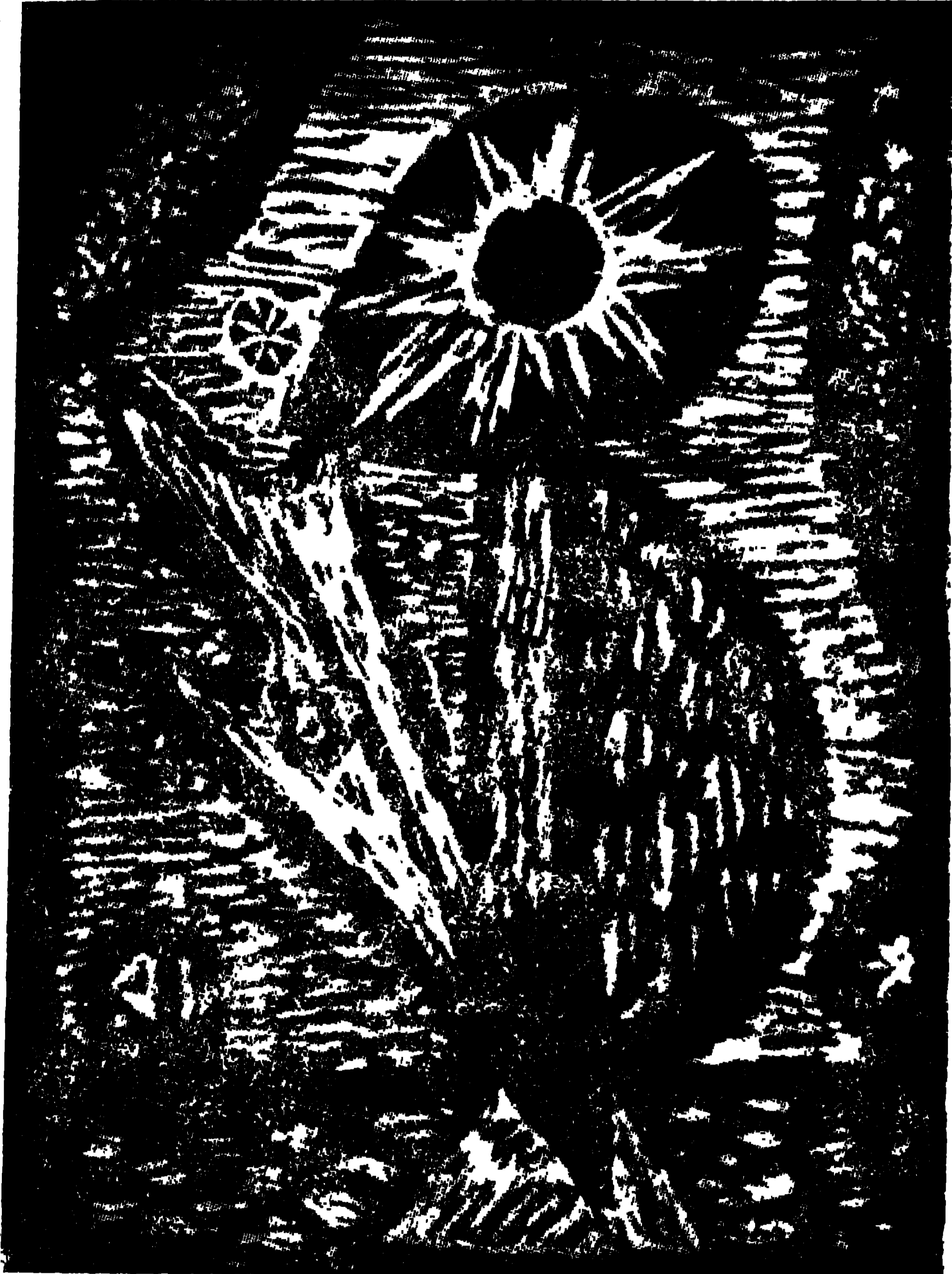
রামকিঙ্কর

এই সুযোগে আমার একটা বিরাট মনস্তাপের কথা বলি। শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের হাতে গড়া কোনো মূর্তি নেই। এই না থাকার জন্য অনেক সময়ে নিজেকেই দায়ী মনে হয়। একদিন গুরুদেব নিজের হাতে মূর্তি গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে আমার কাছে খানিকটা মাটি চেয়েছিলেন। গুরুদেবের শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না বলে প্রতিমা বৌঠান ভেজা মাটি দিতে নিষেধ করেছিলেন। আমিও ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে গুরুদেবের হাতে মাটি তুলে দিলাম না। কে তখন জানত যে এরকম সুযোগ আর আসবে না। তাই আপশোষ হয়—তখন যদি এক খাবলা মাটি গুরুদেবের হাতে দিতাম তাহলে হয়তো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক ভাস্কর্যের সৃষ্টি হত। গুরুদেবের এই দিকটার প্রতিভা আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেল।

অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছেন গুরুদেবের মূর্তিতে চোখের বদলে বল কেন ব্যবহার করেছি। অত সুন্দর চোখ গুরুদেবের। আর আমি কিনা একজোড়া কিম্ভূতকিমাকার বল বসিয়ে কাজ সারলাম? ব্যাপারটা অনেকেরই ভালো লাগেনি।

আসলে গুরুদেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই ঐ বলের ব্যবহার। কখন কিভাবে দেখছি বা দেখতে চাই, কি দেখছি—সেই দেখার ধরনটিকে সৃষ্টির মাধ্যমে কিভাবে ধরে ফেলা যায়—তার জন্যই দরকার হয় সৃষ্টির পরিবর্তন। তখন form-কে ভাঙার দরকার হয়। শিল্প সৃষ্টিতে গোঁড়ামির স্থান নেই। মনের মুক্তি দরকার। গোঁড়ামি বা একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেই একটা জায়গায় এসে থেমে যেতে হয়। মানুষ, পশু, পাখি, প্রকৃতি—কেউই তাদের নিয়ে কি শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে তার তোয়াক্কা রাখে না। তারা চলে তাদের নিজেদের গতিতে। সেই যে চলার গতি তার ভঙ্গিটুকুকে ছবি বা মূর্তিতে ধরতে হলে abstract করতে হয়। অনেক সময়েই কোনো বিশেষ ভঙ্গিকে একটি মোচড়ে প্রকাশ করতে হয়। আমার একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলছি। একদিন কলকাতায় কোনো একটি রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে ডোবার মধ্যে একটা মোষকে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে দেখেছিলাম। মোষটা তার লেজের সাহায্যে মাছি তাড়াচ্ছিল। সেই মাছি তাড়ানোর সময়ে তার লেজের যে মোচড়টা এসেছিল—সেটা আমার মাথার মধ্যে ঢুকে গেল। মোচড়টাকে কাজে লাগাতে হবে সিদ্ধান্ত নিলাম। শান্তিনিকেতনে মেয়েদের হস্টেলের সামনে যে মোষটা তৈরি করেছি—এটা সেই কলকাতায় দেখা

ঘোষের ছবি। ঘোষের লেজটা মাছের মতো করার কারণ—ঘোষের নিজের লেজ লাগানোর পরে মনে হল, মাছি তাড়াতে গিয়ে লেজের যে মোচড়টা দেখেছিলাম তেমনটি হচ্ছে না। তখন মাছের লেজ লাগালাম। হ্যাঁ, এবারে দেখলাম যা চেয়েছিলাম পেয়ে গেছি। Mythology-তে মৎস্যকন্যা আছে, কিন্তু ঘোষের মাছের মতো লেজ নেই। ওটা আমার দেখার সঙ্গে মিলে গেছে। এভাবেই form-কে ভাঙচুর করতে হয়। form ভাঙা না-ভাঙাই আসল ব্যাপার নয়। যে কোনো শিল্পে রসসৃষ্টিই হচ্ছে আসল। কাজের মধ্যে যদি রসসৃষ্টি না করা যায় তাহলে abstractই হোক বা নকলবিদ্যাই হোক—কোনোটারই মূল্য নেই। নতুন কিছু করতে গেলেই ভাঙচুর করতে হয়। আর একটি জিনিস থাকা দরকার। সেটা হচ্ছে নতুন সৃষ্টির জন্য অস্থিরতা। কোনো একটি কাজ করেই যদি পরিতৃপ্তি এসে যায় তাহলে বুঝতে হবে সৃষ্টির কাজ থেমে গেল। যতদিন বেঁচে থাকা—নতুন নতুন সৃষ্টির চিন্তা-ভাবনাই শিল্পী ও শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখে।

অনেকে মনে করতে পারেন দর্শকদের কাছে শিল্পের ভাষা বোঝাবার দায় শিল্পীদের। দর্শকদের কাছে সৃষ্টি পৌঁছুবার প্রয়োজন আছে ঠিকই। কোনো সৃষ্টি যদি দর্শকদের আনন্দ দেয় তাহলে শিল্পীরও পরিতৃপ্তি আসে। কিন্তু তা বলে দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী সৃষ্টি করা শিল্পীদের কাজ নয়। একজন শিল্পী অপর কোনো লোকের মতামত অনুযায়ী তার কাজ করে না—নিজের অন্তরের তাগিদেই করে। শিল্পের মধ্যে যদি রস সৃষ্টি করা যায়—তবেই তা দর্শকদের আনন্দ দিতে পারে। সেদিক থেকে বলা যায় দর্শক ও বৃহত্তর সমাজের সঙ্গেও শিল্পীদের ভাবনা-চিন্তার একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্র আছে। সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত, ভালো-মন্দ সবকিছুর সঙ্গেই শিল্পীরা জড়িত। প্রত্যেকেই আগে মানুষ, তারপরে তার শিল্পকর্ম। সেই কর্মেরও পরিতৃপ্তির ব্যাপার আছে। শিল্পীর ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে দর্শকদের ভাবনা-চিন্তার মিল না-ও হতে পারে। শিল্পীরও অনেক সময় কাজ করতে করতে পরিবর্তন আসতে পারে। আগে থেকে একটা থীমে ভাবা থাকলেও কাজ করতে গিয়ে দেখা গেল সেইসব ভেবে রাখা থীম বা কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে সৃষ্টি সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিয়েছে। অনেক সময়েই আমি যা চাইছি সেটা গড়তে গিয়ে দেখা যায় সেই চাওয়ার সঙ্গে যা গড়ে উঠল তার কোনো মিল নেই। দর্শকরাও তাদের নিজেদের মতন করে যে কোনো সৃষ্টিকে

দেখতে পারে, পরিতৃপ্তি পেতে পারে। শিল্পীর সৃষ্টির মধ্যে এবং দর্শকদের দেখার মধ্যে যদি পরিতৃপ্তি আসে তাহলেই সৃষ্টি সার্থক।

সমাজপরিবর্তনেও শিল্পীদের একটা বড় ভূমিকা আছে। সমাজবিপ্লব যেমন শিল্পীদের ধাক্কা মারে তেমনি শিল্পীরাও থেমে যাওয়া সমাজকে ধাক্কা মারে। পৃথিবীর ইতিহাসে এর বহু নজির আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশ বর্তমানে যে দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে পার হচ্ছে—ঠিক পার হচ্ছে না বলে বলব একটা জায়গায় থেমে আছে—সেখানে কিন্তু আমরা শিল্পীরা নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি। সকলেই কেমন যেন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি। অনেক নতুন নতুন শিল্পী ও শিল্পের সৃষ্টি হচ্ছে ঠিকই—কিন্তু সেগুলো যেন বিচ্ছিন্ন। সমাজের চৈতন্যে ধাক্কা মারতে পারছে না। তাই মানুষ ক্রমশই এত বেশি করে অলৌকিকতা, পূজা-আর্চা, গুরু ও জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হচ্ছে। গুরু ও বাবাজীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি নিজে কোনো ধর্ম মানি না বলে অন্যের ব্যাপারে আমরা কোনো গোঁড়ামি নেই। আমি আমার মতামত অন্যের ওপরে চাপাতে চাই না। অপরের বিশ্বাসে আঘাত করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার এত বয়স হল—কোনোদিন আমি কোনো গুরু বা জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হইনি।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি প্রত্যেক মানুষেরই দুখানা করে হাত আছে—সেই হাতের কাজ হচ্ছে কিছু না কিছু সৃষ্টি করা। সৃষ্টিই মানুষের ধর্ম। সেই সৃষ্টির কাজকে বন্ধ রেখে কেবলমাত্র ঠাকুরপূজা করা, গুরুর আশ্রয় খোঁজা আর জ্যোতিষের পেছনে ছুটে বেড়ানো মানে মরীচিকার পেছনে ধাওয়া করা। আসলে সমাজ যখন একটা বদ্ধ জায়গায় থেমে যায় তখন মানুষ নিজের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, চৈতন্য দেউলিয়া হয়ে যায়। প্রত্যেক মানুষ যদি বোঝে সমাজের জন্য দেশের জন্য তার কিছু না কিছু করার আছে, অর্থাৎ যদি সে জীবনের সার্থকতা খোঁজে, তাহলে এভাবে আলেয়ার পেছনে ছুটে বেড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হবে না। প্রত্যেকেই চায় বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন ও যৌক্তিকতা। সেটা না থাকলেই মনে হয় শূন্যে বাস করছি। সেই শূন্যতাবোধ বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। তাই মানুষ শূন্যতার হাত থেকে বাঁচার জন্য সামনে যা পায় তাকেই আঁকড়ে ধরে। মানুষ তখন বড় অসহায়। মানুষের সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই এসে

জোটে যতসব দেবতা, অপদেবতারা। তারা ভেল্কি দেখিয়ে বাজার মাত করে।

কিন্তু এই অবস্থাও একদিন পালটায়। তারজন্য কাজ করে যেতে হবে।

দেশের তরুণ শিল্পীদের সম্পর্কে আমার অনেক আশা। তারা কাজ করুক, নির্ভয়ে নিজেদের রুচি অনুযায়ী কাজ করুক। থেমে যেন না থাকে। ভেতর বা বাইরের কোনো বাধাই যেন না মানে। স্বধর্মে স্থির থাকলে একদিন তারাই জয়ী হবে।

অনুলিখন—বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়

মন বলে—আমি চলিলাম

গোপাল হালদার

চলার পথের শেষ চলা—পরিক্রমায় এসেছে প্রান্তসীমা, পা উঠেছে সীমান্তরের দিকে। 'মন বলে—আমি চলিলাম' জীবন থেকে জীবনান্তের অন্তহীনতায়।

'দেখিলাম—অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,......'

আমি-ভরা এ জীবন পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে দিয়ে-দিয়ে আর নিয়ে-নিয়ে কী দিল আর কী পেল তার শেষ প্রণামের মধ্যে!

'এ জীবন লইয়া কি করিব?...কি করিতে হয়?'—এই জিজ্ঞাসা শুধু বঙ্কিমেরই নয়। জীবন সকলের কাছেই এ জিজ্ঞাসা তুলে ধরে, কেউ জানে, কেউ জানি না; উত্তরও আদায় করে নেয়, কেউ তা জানুক বা না জানুক। [অনেকেই জানি না—জীবন নিয়ে কী করতে হবে। প্রাণঃ-তাড়না জীব-প্রবৃত্তিকে সে-চেতনা দেয় না; মানব-প্রকাশে সেই প্রাণপ্রেরণা পায় নতুন প্রাণছন্দ, বাঁচার জৈব আনন্দে বাঁচতে বাঁচতে মানুষের মন তাই চমকিত হয়ে ওঠে—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?' কী এ জীবন? কিমেতৎ? এ জীবন নিয়ে কী করব আমি—আমার নিজের একা আমি? কী করব আমরা—দশজনের আমি? উত্তরের অপেক্ষা করে না, উত্তর খোঁজেও না। এই দুই 'আমি'র—'ছোট আমি'র ও 'বড় আমি'র—উত্তর লেখা হয়ে যায় প্রত্যেকের সত্তায়, তা-ই তার সত্তার সাক্ষ্য।]

বঙ্কিমের কালের মতো বঙ্কিম উত্তর দিয়েছিলেন—[জ্ঞানার্জনীবৃত্তি ও চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি মিলিয়ে ভগবদভক্তিতে জীবনের চরিতার্থতা।] প্রতিভা-সচেতন বঙ্কিমের তা স্বাক্ষর। ভারতেতিহাসের প্রতি দায়িত্ব-প্রবুদ্ধ সমগ্র ব্যক্তিসত্তারও তা সাক্ষ্য। বঙ্কিমের উত্তর বঙ্কিমের কালেও গ্রাহ্য হয় নি। তাঁর ব্যক্তিত্বের ও তাঁর দর্শনের কী আজ উপযোগিতা? তাঁর ব্যক্তিত্বের ও তাঁর দর্শনের কী আজ উপযোগিতা?

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব দেহের সঙ্গেই ভেসে চায়—পরিবার-পরিবেশের এ ঘাটে ও ঘাটে কদাচিৎ রেখে যায় বুদ্বুদের আর্দ্র স্পর্শ। সেই ব্যক্তিত্বের মধ্যে অজস্র-বাহিত পূর্বপুরুষের দান অনিশ্চিত, অনিশ্চিত অনন্ত উত্তরপুরুষের মধ্যে তার ক্ষীণ রেখাও। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এখন বঙ্কিম-দর্শনও বিস্মৃত। আর, ভারতবর্ষের ইতিহাসই বা কতখানি সত্য মানুষের জয়যাত্রায়? মিশর-মোহেন জো দড়ো, সুমের-ব্যাবিলন, রোম-ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—মহাকালের সমুদ্রে এক-একটি তরঙ্গভঙ্গ···যাদের প্রকাশ শুধু মিলিয়ে যাবার জন্য। [মহাবিশ্বের ভাঙাগড়ার মধ্যে আমাদের এই পৃথিবীরই বা আয়ু কতক্ষণ? আর কতক্ষণ আয়ু তার বুকের এই মানুষের?]

বীযবতী মহাপ্রকৃতির কোটি কোটি গ্রহ ঘূর্ণ্যমান নীহারিকাপুঞ্জ তাপ স্ফুরিত করে পাক খেতে খেতে দানা বেঁধে সূর্য নক্ষত্র হয়ে উঠছে। লক্ষ কোটি সূর্য আর সৌরলোক নির্দিষ্ট নিয়মে, হয়তো বা নির্ভুল নিয়মে, জ্যোতি বিকিরণ করে জলছে ও নিবছে। নিজ নিজ সৌরলোকে এক-একবার মূর্ত হয়ে উঠছে আর নিমীলিত হচ্ছে কত পৃথিবী। হয়তো পরমাণুরাশির সে সব আলোড়নে কোনো কোনো পৃথিবীর প্রাণ, জলজ জীবকণা, জীবজগৎ স্ফুরিত হয় চিৎসম্পদে সম্ভাবনাময় এক নবজাতকে—মানুষ। জীবন-মরণে মানুষের দেহভাণ্ডে বাঁধা বিশ্বপ্রকৃতির চরম প্রকাশ। [ভালোমন্দে, ভুলে-ভ্রান্তিতে, ক্ষুদ্রতায় মহত্ত্বে, দৈন্যে ঐশ্বর্যে, আনন্দে বেদনায়, প্রেমে বিরোধে, নিষ্ঠুরতায় করুণায়, স্বপ্নে কল্পনায়, আত্মপ্রকাশের দুর্বার স্পর্ধায়, আত্ম-অন্বেষণের বিনীত তপস্যায় আশ্চর্য আমাদের এই পৃথিবীর homo sapien. আরো কতো কতো সৌরলোকে ঠিকানা না-জানা কতো কতো পৃথিবীর প্রাণ-সত্য হয়তো কতো কতো sapien-এ বিকশিত, আছে বিকাশের অপেক্ষায়। তাবৎ চরাচরের বিশ্বপ্রকৃতির প্রকাশ, তবু যতদূর জানি sapienই তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।] অন্তত তবু জানি শুধু homo sapienকে, অনুমান করি

homo sapien তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মানবচৈতন্যেই বিশ্বপ্রকৃতির নিত্যগতিময় সেই সমগ্র স্বরূপের উপলব্ধি সম্ভব—আর সেই ভূমার উপলব্ধিতে (cosmic sense-এ) মানবপ্রকৃতির অধ্যাত্ম পরিণতি। ভালোমন্দ সমাচ্ছন্ন মানুষের সীমাবদ্ধ চেতনায় ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, বৃহৎ থেকে বৃহত্তরে উত্তরণই জীবনের দাবি।

জানি না এই বিশ্বপ্রকৃতির অতীত কোনো রহস্য আছে কি না, এই বিধানের ওপারে আছে কি না বিধাতা। না, "বেদাহং পুরুষং আদিত্যবর্ণং তমসা পরস্তাৎ" বলার স্পর্ধা হবে না। [আইনস্টাইনের মতো সেই বিশ্বপ্রকৃতিকে intelligent বলার সাধ্যও নেই। cosmic sense-এর মাঝেও পাই না কোনো অতিপ্রাকৃত পরমাত্মার আভাস। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণেও পাই না আনন্দঅমৃতরূপী পুষনকে যে পুরুষ (হে পুষণ,) তোমার আমার মাঝে এক।] সে জ্ঞান ও উপলব্ধিতে ভাগ্যবান বিশ্বাসীরই অধিকার; তারও সে উপলব্ধি স্বাধিকার নয়—বৈষ্ণবের ভাষায় 'কৃপা', খ্রীষ্টানের ভাষায় 'Grace'। যাকে তা 'বৃনুতে' সে পায়, যাকে 'ন বৃণুতে' সে তা পায় না। আবার, যারা জেনেছে বলে তারাও জানে না, যারা জানে না বলে তারাও জানে না। সে পুষণ নিজেই অপাবৃত।

মানি না, সত্যের মুখ হিরন্ময় পাত্রে অপাবৃত। পুষণেরও অত সাধ্য নাই। যা আবিঃ তা তো আবির্ভূত—সূর্য চন্দ্র তারা থেকে তাবৎ চরাচরেই তো তার প্রকাশ। প্রকৃতি স্বয়ম্প্রকাশ—সৃষ্টিতে ধ্বংসে। অজস্র ভাঙা-গড়ায় অস্থির মানুষের মধ্যেই ঘটেছে তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তবু সেই বিশ্বপ্রকৃতিতে আইনস্টাইনের অনুসরণেও আরোপ করতে পারি না। intelligence, যতদূর বুঝি, অভিপ্রায়ও না। বরং মনে হয় মানুষপ্রকৃতির অংশেই মহাপ্রকৃতি চৈতন্যময়ী—মানুষের সচেতন অন্বেষণের মধ্য দিয়ে সেই মহাপ্রকৃতির আত্মপরিচয় লাভ। মহাকাশের ক্রমোন্মোচনে, পরমাণুর রহস্যোদ্ঘাটনে, হয়তো বা এখনো অনারব্ধ মানবমনের স্বরূপ-সন্ধানে বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ ক্রম পরিস্ফুট হয়ে উঠবে কালে কালে। কিংবা হয়তো কখনো তারই পূর্বে ঘটবে মানুষের আত্মঘাত, অথবা ঘটবে তার অপঘাত—সূর্য আসবে স্তিমিত হয়ে, মানবচৈতন্য হবে আচ্ছন্ন, homo sapien-এর ঘটবে বিলোপ। তখন নতুন সৌরলোকে নতুন sapien-এর প্রকাশ হতে পারে সুসমৃদ্ধ। এই সম্ভাবনার স্বপ্ন হয়তো স্বপ্ন। পৃথিবীর আপাত আয়তনে মানুষের দৃষ্টিও সীমিত—অপাবৃত। [স্বকালের কালিমারেখা—পিছনে ও

সম্মুখে—বেশি পেরিয়ে যেতে গেলে তার চৈতন্যও বিভ্রান্ত বিপর্যস্ত হতে বাধ্য।] স্বকালের সীমায়িত আয়তনের মধ্যে তার পরিক্রমা। সেই আয়তনের মধ্যেই অনুভব-সাধ্য সমগ্রের আভাস, cosmic feeling, ভূমার ঐশ্বর্য। বিংশ শতকে আমি এসেছিলাম—"আজ চলিলাম" এই শতাব্দীর ধ্যান-ধারণার আয়তনে অস্তিত্বের কোন অনুভূতি নিয়ে ?

"আমি চলিলাম"—কোটি কোটি পরমাণুর অনন্ত কালের নৃত্য ধরা পড়েছিল এই এক পাপাতে—এই দেহের আধারে। "'আমি' উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র মাঝে অসংখ্য বৎসরে"—বিংশ শতকের এক মনুষ্যভাণ্ডে—বিচিত্র আর অনন্য। [কোটি কোটি বিচিত্র জীবকোষের উদ্ভবে বিলয়ে ভরা এই দেহ, সকল পরিবর্তমানের মধ্যেও সেই অনন্য সচেতন 'আমি'—'ছোট আমি', 'বড় আমি'···দুয়ে মিশ্রিত স্ফুটমান কত 'আমি'কে নিয়ে এক ব্যক্তিসত্তা। এবার ছন্দ আসে যতিতে—"দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি" সকল 'আমি'কে নিয়ে। কোটি কোটি দেহচ্যুত পরমাণুপুঞ্জ ধাবিত হয় মহাশূন্যের মধ্যে, ঘূর্ণাবর্তের নিমন্ত্রণে। 'আমি'-হীন সেই সত্তার ছায়া আপনজনদের ছাড়িয়ে উত্তরপুরুষের দেহমনে—চোখের চাহনিতে, ভাবনার ভঙ্গিতে—সে অনিশ্চিতও অচিরেই মিলিয়ে যাবে।] পরমাণুর এই বিশিষ্ট সমাবেশ আর দ্বিতীয়বার কি সম্ভব ? সম্ভব হলেও তৎকালীন দেশকালের আবর্তনে এ-'আমি' রূপে তার প্রকাশ অসম্ভব। এই 'আমি'র 'অনুভূতিপুঞ্জ', এই ভাঙা দেহের স্বপ্নভরা 'বাঁশি'ও এই দেহের সঙ্গে মিলিয়ে যাবে, যাক। বিশ্বপ্রকৃতির ঐকতানের মধ্যে মানবপ্রকৃতির পরমসত্যের ঘোষণায় মিলে থাকে যদি এই মিলিয়ে-যাওয়া 'আমি', দিয়ে থাকে জীবনের নিকট চির-মানুষের উত্তর—"ভালোবাসি" !

"মন বলে—আমি চলিলাম"—জীবন এবার মরণের তটে সীমাবদ্ধ। যা করেছি আর যা করি নি, পেয়েছিলাম কোন পাথেয়, রেখে যাচ্ছি কোন সাক্ষ্য—এই দেহ-অবসানের ও পরমাণু বিচ্ছুরণের সম্মুখে দেহের সঙ্গে সত্তারও বিচূর্ণনের ক্ষণে কোন পরিণত স্বাক্ষর দেখছি তার ? "আমি চলিলাম" আত্মরহস্যের, বিশ্বরহস্যের কোন পরিণত বোধ নিয়ে ?

পরাধীন দেশে জন্মেছিলাম—আকৈশোর জেনেছি সেই সত্য। জীবন

দিয়ে কী করব তার একটা উত্তর অনুভব করেছি—বিদেশের শাসনাধীন স্বদেশের মানুষের স্বাধিকার অর্জন। শুধু তা নয়, সর্বদেশের অধিকারহীন মানুষের মুক্তি। জীবনের সহজ সুস্থ অকৃত্রিম দান স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি সহজ নিয়মে। রূপ রসের স্পর্শে, সৃষ্টিতে উৎসবে চিত্তে ক্ষণে ক্ষণে উঠেছে অনুরণন; আকাশ-আলো-পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্যের আত্মীয়স্পর্শে আনন্দের আকুলতা।

> আকাশ ভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ
> তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান
> বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

গান ছিল না এই কণ্ঠে, কিন্তু বিস্ময় ছিল চোখে মুখে প্রাণমনে। কে যেন বলে উঠেছে "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"? আনন্দে ঔৎসুক্যে, যন্ত্রণায় বেদনায় সকল মিলিয়ে চেয়েছি সেই জীবনের পূজা। বৃহতের আহ্বান কান পেতে শুনেছি—সত্যে মিথ্যায় ভালোমন্দে সাহসে ভীতিতে পা টিপে টিপে চলেছি তার অভিমুখে।

সমস্ত ভালোমন্দ ভুলভ্রান্তি সুদ্ধ সেই সংগ্রামের রূপও আজ এখন আর অস্পষ্ট নেই। যা করতে চেয়েছি, করে উঠতে পারি নি—তারও আর পরিবর্তন নেই। যা করতে চেয়েছি—জানি সামান্যই তা হয়েছে, অনেক কিছুই তার হয় নি। যা পেয়েছি তা অসামান্য সৌভাগ্য—স্নেহে প্রেমে দাক্ষিণ্যে আনন্দে সংসারের সহজ সত্যে। সে সত্যের তুলনা কই? প্রণাম, প্রণাম সেই প্রেমপ্রীতিতে অপরিমেয় মানুষদের। যা দিতে চেয়েছি জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সকলের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ায়, তাও অপরিমিত সত্য—তা মানুষের মুক্তি—দেশের মানুষের, পৃথিবীর মানুষের। এই স্বপ্নে আমাদের দেশকে এই যুগের বিশ্বজীবনের প্রবাহে আমরা এগিয়ে নিয়ে সংযুক্ত করতে চেয়েছি। কিন্তু আত্ম-অপচয়ের আবর্ত-মধ্যেই পাক খেতে থাকে দেশ। 'নবজীবনের গান', 'নবান্ন', 'ভারতের মর্মবাণী'—সঙ্গীতে নৃত্যে নাট্যে সাহিত্যে সেদিন নূতন যুগের (renaissance-এর) সম্ভাবনা এনেছিল। জ্যোতিরিন্দ্র, বিজন, মানিক, স্বল্পায়ু সুকান্ত আর ফিরে আসবে না। দেশ তাদের প্রতিভা থেকে মূলত বঞ্চিত। আমাদেরও প্রয়াস অসম্পূর্ণ বিপ্লবের বিকৃত আঘাতে বিপর্যস্ত। তবু, আজ যখন আমরা একে একে ঝরে যাচ্ছি তখন জ্যোতিরিন্দ্রের সঙ্গে বলতে পারি—we have served the Cause of Man. মানুষকে অবিশ্বাস করি নাই। জয় হোক মানুষের।

এদেশের এযুগের মধ্যেও ফুটে উঠবে মানুষের মুক্তি—পৃথিবীতে মানুষ মানুষে ভালোবাসা—নাই বা রইলাম আমি।

"মন বলে—আমি চলিলাম।" কালো কালিন্দীর স্রোতে ভেসে যায় আমার ব্যর্থতা ও কৃতার্থতা, আর সকল পরিচয়। পৃথিবীর মানুষের (homo sapien-এর) পরিচয়ও কালো কালিন্দীর স্রোতে ভেসে যাবে। কিন্তু আমাদের কালের এই Cause of Man-এর সংগ্রামেই মহাপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। আর, জীবনের কাছে এই তো আমার উত্তর—we have served the Cause of Man. ভালোবেসেছি মানুষকে, ভালোবেসেছি জীবনকে। জীবনের প্রান্তসীমা থেকে "আমি চলিলাম"। ক্লান্ত বিনিদ্র রাত্রির শেষে দেখছি বর্ষাস্নাত দিন আসছে—প্রভাতে সূর্যের উজ্জ্বল স্পর্শ পথের ও ধারের রাধাচূড়ার ফুলে আর পাতায়। চোখ ভরে দেখে নিতে চাই এই বিস্ময়। বলে যেতে চাই—পরম সুন্দর তুমি, পৃথিবী, ভালোবাসি তোমাকে, তোমার মানুষকে, এই পৃথিবীর জীবনকে।

মূল রচনা 'চেতনাপ্রবাহে' ছিল। ১১—১৪ জুন ১৯৭৮-এর মধ্যে প্রবাহের ছেদগুলি পূর্ণ করা হয়েছে। ১১—১৫ আগস্ট ১৯৭৮-এ সেই ছেদপূরণাংশ তৃতীয় বন্ধনী চিহ্নের ([ ]) মধ্যে দেওয়া হল। পূরণাংশও বাদ নয়।—লেখক

স্মৃতি

বিষ্ণু দে

নিজের জীবনের কথা লিখতে আমার লজ্জা করে। হাল্কাছলে গল্প করে, মজা করে বলা চলে এই পর্যন্ত। কিন্তু আমার অতি প্রিয়জন দীপেনের বারবার অনুরোধে আমি যতটা পারি, বলছি। শরীরটা সম্প্রতি আবার অসুখের পর বড় দুর্বল, তাই নিজে কিছু লিখতে পারছি না।

ছেলেবেলার কথা বলতে গেলে, প্রথমেই আমার মা-বাবার অত্যন্ত বেশি যত্নের কথা মনে হয়। আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে সকলের আদর-যত্ন ভালোবাসা পেয়েছি। শিশু বয়স থেকেই রুগ্ন ছিলুম, তাই অনেক রকম ডাক্তারি ব্যবস্থা ছিল। এবং ডাক্তারের বাড়ি পাশেই—১২ নম্বর কলেজ স্কোয়ার। আমাদেরটা ১৩ নম্বর। পাল্‌স গুনে থাইরয়েড খাওয়ানো হত। এবং, তখন পাওয়া যেত ভালো ইটালিয়ান অলিভ অয়েল, তাতে আলট্রা-ভায়োলেট-রে দিয়ে আমাকে মাখাবার জন্য বন্ধু ডাক্তার নৃপেন্দ্রনাথ চন্দ্র নিজে এনে দিতেন। গ্রীষ্মকালে কেন আমার জ্বর হত, ঠিক বোঝা যেত না, ডাক্তাররা বলতেন হীট্‌ফিভার। এবং আশ্চর্য, আমার দাদামশায়ের বাড়িতে, পুরীতে, গ্রীষ্মকালে, বা শরৎকালে দেওঘরে জ্বর ছেড়ে যেত। আমাদের এক জ্যাঠাবাবু ডাক্তার ছিলেন, বাবার আপন মেজদাদা, কিন্তু পরিবারের ছেলেদের মধ্যে 'নতুন' বলে ডাকা হত। বাবারা চারভাই ছিলেন।* শুনেছিলুম সুন্দর চেহারা ছিল—৬ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা—তিনি এক ভাগ্নেকে বাঁচাতে গিয়ে পুরুলিয়ার সাহেব বাঁধে

* 'পরিবার পরিচয়' শেষে।

পানিফল লতা পায়ে জড়িয়ে দুজনেই ডুবে যান। একটা ফলক পুরুলিয়ার সাহেববাঁধে আছে। এটা আমাদের বাড়ির একটা মস্ত বড় ট্র্যাজেডি, যা ভুলতে পারেনি কেউ। নতুন জ্যাঠাইমা—সরোজিনী—আশ্চর্য মহিলা ছিলেন। নাগপুরের বিপিনকৃষ্ণ বসুর কন্যা (বিপিনকৃষ্ণ বসু নাগপুর ইউনিভার্সিটির প্রথম ভাইস চানসেলর হন, তখন তাঁর খুব খাতির ছিল)। ১৬ বছর বয়সে বিধবা হন—বছরে একবার করে কলেজ স্কোয়ারে এসে থাকতেন। তাঁদের প্রকাণ্ড জমিসহ নাগপুরে বাড়ি ছিল, অনেক গন্ড্ পরিবার সেখানে থাকত—নতুন জ্যাঠাইমা তাদের সেবাযত্ন করতেন, নার্সের মতো। নতুন জ্যাঠাইমার চরিত্র অসাধারণ ছিল। শেষে তিনি ক্যানসারে ভুগে মারা যান, কিন্তু অসীম বীরত্বের সঙ্গে। মেডিকেল কলেজে, বা হোগলকুড়িয়ায় ওঁদের নিজেদের বাড়িতে বৃদ্ধ বাপের সঙ্গে চিকিৎসা করতে আসতেন। সঙ্গে আসতো পুরনো গন্ড্ ভৃত্য। সেই শেষ পর্যন্ত নতুন জ্যাঠাইমার সেবাশুশ্রূষা করেছিল। বাবার সঙ্গে আমি ওদের বাড়ি যেতুম নতুন জ্যাঠাইমাকে দেখতে—নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত ছিল নিপুণ, এবং আশ্চর্য ধৈর্য ও সহ্যক্ষমতা দেখেছি। নতুন জ্যাঠাবাবু মারা যাবার পর, বাবার ঠিক উপরের দাদাকে—রাঙা জ্যাঠাবাবুকে—মেদিনীপুর থেকে চলে আসতে হয় ঠাকুমার কান্নাকাটির জন্য। মেদিনীপুরে ওকালতিতে খুব ভালো প্র্যাকটিস ছিল। নতুন জ্যাঠাবাবু মারা যাবার পরও, বাবা ওষুধপত্র তৈরি করতেন, সাজসরঞ্জাম সবই ছিল, সিঁড়ির নীচে একটা বড় আলমারিতে। তাই, আমাদের বাড়িতে অনেক ডাক্তার-বন্ধুও ছিলেন।

আমাদের সংসার খুব নিয়মনিষ্ঠার পরিবার ছিল—অনেক আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আসতেন, যেতেন, থাকতেন। সকলের জন্ম ব্যবস্থার বা সেবাযত্নের অভাব বা ত্রুটি কখনও হতে দেখিনি। জ্যাঠাইমারা, মা নিজেও, পূজাপার্বণ মানতেন, মাংস-ডিম-পেঁয়াজ খেতেন না। খুব বিচার ছিল—বাড়িও খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু, কারুর অসুখ করলে তার জন্তে সব ব্যবস্থাই করা হত। আমার জন্য রোজ ইক্-মিক্-কুকারে ভাত ও মুরগির ঝোল বা 'স্টু' করে দিতেন। পরে কাপড় কেচে স্নান করে সংসারের কাজকর্মে ফিরে যেতেন। দুপুরবেলা রোজ আমাকে শোয়াতেন, আমি নানা ফন্দি এঁটে পালাবার চেষ্টা করতুম। শনি-রবিবার জ্যাঠাবাবু বাড়িতে থাকতেন। আমাকে খুব ভালোবাসতেন—'বাপী' বলে ডাকতেন। কোনো ছুতো করে আমি শনি-রবিবার মায়ের কাছ থেকে পালাতুম, মা ডাক

দিলে জ্যাঠাবাবু জবাব দিতেন—'ছোট বৌমা, বাপী আমার কাছে আছে।' মা কিছু বলতে পারতেন না।

জ্যাঠাবাবু ও রাঙা জ্যাঠাবাবুর দুটি ঘোড়া ছিল, মাঝেমাঝে সইস আস্তাবল থেকে নিয়ে আসত। রাঙা জ্যাঠাবাবুর ঘোড়াটা দেখতে খুব তেজি ছিল; জ্যাঠাবাবুরটা রোগা, কিন্তু উঁচু। রাঙাজ্যাঠাবাবু হাতে দানা নিয়ে খাওয়াতেন—ঘোড়াটা দেখতে খুব ভালো, কিন্তু চোখগুলি দেখতে আমার ভয় করত। আস্তাবল থেকে মুরগির ডিম আসত, কিন্তু সে কখনও অন্দর মহলে ঢুকত না। আমাকে রাঙাদাদা ডিম খাইয়ে দিত, নীচেই। সেদিনও রাঙাদাদা আমাকে সে কথা মনে করিয়ে দিল, খুশি হয়ে। রাঙাদাদার বয়স এখন আশি-র উপরে। জ্যাঠাবাবুকে সকলে খুব শ্রদ্ধা করতেন। অনেক গণ্যমান্য লোক জ্যাঠাবাবুর বন্ধু ছিলেন—স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার দেবপ্রসাদ বা ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী—আরো অনেকে—সকলের নাম জানতুম না। আশুতোষ মুখার্জি প্রায়ই আসতেন। একদিন আমাদের বাড়িতে আশুবাবুর আইসক্রিম খাওয়ার দৃশ্য এখনও মনে আছে—তখন আমরা নেহাতই ছোট, ওঁর খাওয়া দাঁড়িয়ে দেখেছিলুম!

স্কুলে ভর্তি হবার পর জ্যাঠাবাবু আমাকে বলেছিলেন—'আশুকে বলব তোমাকে ডবল প্রমোশন দিতে।' বাবাকে এ কথা বলতে, বললেন—'সেটা ঠিক নয়, বড়দাকে আমি বারণ করব।' আমি একটু অবাক হয়েছিলুম তখন! দেওঘরে আমরা প্রতি বছর শরৎকালে যেতুম—বাবার কোর্ট বন্ধ থাকত। বাবা-মা বালানন্দ স্বামী ব্রহ্মচারীর শিষ্য ছিলেন। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন, পাশে নিয়ে বসাতেন, যদিও অনেকের বিষয়ে বিচার করতেন। একবার জ্যাঠাবাবু আমাদের কাছে গিয়েছিলেন, রোজ আমাদের সকলকে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। মা একদিন ভাপা-দই করেছিলেন। মা খুব ভালো রাঁধতে পারতেন, ওঁর হাতের মিষ্টি বিশেষ করে সুস্বাদু হত। বাবা বললেন—'দইয়ে একটু ধোঁয়া গন্ধ হয়েছে।' জ্যাঠাবাবু বললেন—'কি যে তুমি বলো? ছোটবৌমা রেঁধেছেন, কখনও ধোঁয়া গন্ধ হতে পারে?' দীনবন্ধু নামে আমাদের একজন কাজের লোক সঙ্গে গিয়েছিল। জ্যাঠাবাবু তাকে 'জগবন্ধু' বলে ডাকতেন—ইচ্ছা করে, না ভুলে—আমি এখনও বুঝতে পারিনি। কলকাতায় জ্যাঠাবাবুর লোক ছিল গয়া জেলার 'নির্বাণ' নামে। বিকেলে আমরা উঠোনে খেলা করতুম। জ্যাঠাবাবু আসবার সময়ে নির্বাণ কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির নীচে পানওয়ালার কাছ থেকে একটা করে ছাঁচি পান খেয়ে এসে, আমাদের

ধমক দিয়ে খেলা থামিয়ে দিত—'আস্তে, বাবু এখন আসবেন।' আমরাও চুপ হয়ে যেতুম। জ্যাঠাবাবুর শেষ অসুখটা আমার চোখের সামনে শুরু হল। উনিও খুব নিয়মনিষ্ঠার লোক ছিলেন—সকালে, সেকালে বিলিতি রবারের টুথ-ব্রাশ পাওয়া যেত, তাই দিয়ে দাঁত মাজছেন। আমি ওঁর সঙ্গে গল্প করছি। হঠাৎ দেখি—কালো রক্তবমি করলেন—লিভার ফেটে গেছিল। আমি থ মেরে গেছিলুম। তারপর অনেকদিন উপরের বড় ঘরে মার্বেল মেঝের উপর পাতা বিছানায় অসুস্থ হয়ে শুয়েছিলেন—তখনও আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ গল্প হত। এর আগে আমি মৃত্যু দেখিনি—অভাবটা হঠাৎ খুব বুঝতে পেরেছিলুম।

ছেলেবেলায় দুষ্টুমিও করেছি মনে আছে। ঠাকুমার ঘরে একদিন আমার দুই দিদিমণিকে বন্ধ করে দিয়েছিলুম, একটা খুন্তি ছিটকিনি করে লাগিয়ে; দিদিমণিরা চেঁচিয়ে কেঁদেছিল ভয়ে। তাড়াতাড়ি খুলতে গিয়ে, খুন্তিটা জোরে কপালে লেগে কেটে গিয়ে খুব রক্ত পড়ে। তা দেখে সকলে আমার সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন, ধমকটা বেঁচে গেল। আরেক-বারও, তখনকার নামকরা ইংরেজ সার্জন ডাঃ ব্রাউন সেজে, খাটের বেড়া ঘোড়ায় চেপে পাশবালিশ অপারেশন করা দিদিমণিদের দেখাব বলে আস-ছিলুম—তারপর পড়ে গেলুম! সেবারও অভিভাবকেরা কিছু বললেন না বটে, কিন্তু সকলে বেশ 'ইনডিগন্যান্ট' হয়েছিলেন। বেচারা দিদিমণিদেরই উপরই আমার বাহাদুরি সব চলত।

মায়ের কাছে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পড়েছি, একটু বড় হলে বাবার কাছে ইংরিজি ও অন্য বিষয় পড়তুম। বাবার সঙ্গে বলতে গেলে, আমার বিশেষ 'বন্ধুত্ব' ছিল। মনে পড়ে, তখন Royal Reader-এ পড়েছিলুম—The horse is a noble animal—ইংরিজি ভাষার বৈচিত্র্য ও গভীরতা আমি তখনই বুঝি। বাবাকে নিয়মিত দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হত। দাদামশায় বাবাকে 'সাহেব' বলে ডাকতেন, বাবার ফর্সা চেহারা, শরীরের গঠন ও স্বভাবের জন্য। একদিন, একটা প্রকাণ্ড ঘোড়া পাগলা হয়ে হ্যারিসন রোড দিয়ে ছুটছিল, বাবা ঠিক সেই সময়ে দাদামশায়ের ফটকের সামনে এসেছিলেন, ঘোড়াটার ধাক্কা খেয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান, আমি উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে ভয় পেয়েছিলুম। ঘোড়া বিষয়ে তখন থেকেই মনে একটা ভয় মিশ্রিত আকর্ষণ ছিল। Robert Louis Stevenson-এর একটা গল্পে পড়েছিলুম স্কটল্যাণ্ডে চোরাবালিতে ঘোড়া আটকে গিয়েছিল।

বাবা আমাকে সব রকম সাহায্য করতেন। সকালবেলা জ্যাঠাবাবুদের সকলের জন্য চা হত প্রকাণ্ড বড় টী-পটে করে, বাবার সঙ্গে আমি ঢালতুম পেয়ালাগুলিতে, ছেলেবেলা থেকে, উপহার পেতুম এক প্লেট চা! আমার বই পড়ার শখকে বাবাই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, বই কিনতে টাকা দিতেন, অনেক সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বইও কিনতুম সস্তায়, ইহুদীদের দোকান থেকে। ওই রকমই করে হঠাৎ এলিঅটের কবিতার বই ও সেকরেড উড্ পেয়ে পড়ে আশ্চর্য হয়েছিলুম। সন্ধ্যাবেলায় বাবা আপিস থেকে ফিরে এলে, আমরা তিন ভাই—আমার পরের ভাই কেশব, ছোটভাই মাধব আর আমি ওঁর পাশে শুয়ে সারাদিনের গল্প করতুম—এ আমাদের খুব আনন্দ ছিল। মাও আমাদের দুষ্টুমির নালিশ বাবার কাছে তখন করতেন।

আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে সকলের কাছেই আদরযত্ন পেয়েছি—বিশেষ করে পেয়েছি ন-জ্যাঠাইমার কাছে। তিনি আমাদের অতবড় সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে থাকতেন—মানুষ হিসেবে অত্যন্ত ভালো ছিলেন—আমি ওঁর মতো লোক কমই দেখেছি! আমাকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর ছোট ছেলে সুধীর যখন হল, আমি নাকি বলেছিলুম একটা অশ্বত্থগাছ থেকে তাকে ফেলে দেবো! তিনিই আমাকে বলেছিলেন। সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের যত্ন করতেন, বাড়িতে আত্মীয় বন্ধু আসা-যাওয়া বিস্তর ছিল। তাঁর নামটিও সুন্দর ছিল—কৃষ্ণবিনয়িনী—তাঁর বাবাও সাহিত্যে উৎসাহী ছিলেন। ন-জ্যাঠাইমার দুই বড় আলমারি বই ছিল, এখনও আছে শুনেছি। তাঁর বড় ছেলে সন্তুদাদার অনেক ইংরিজি বই ছিল, যেমন রাঙা জ্যাঠাবাবুরও অনেক ইংরিজি বই ছিল, অনেক দামী উপহার-পাওয়া বই ছিল—যেমন সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীর প্রেশেন্ট লিখে দেওয়া সে-সব বই বিক্রি হয়ে গেছে শুনেছি। বাবাকে রামতনু লাহিড়ীরও একটা উপহার দেওয়া বই ছিল, তিনি তাতে লিখে দিয়েছিলেন—Presented to my friend Abinash Chandra Dey। সে-সব বই গেছে, দুঃখের কথা। তবু, ছেলেবেলায়, সে-সব বই আমি নাড়াচাড়া করতে পারতুম, কোনো বারণ ছিল না—ইংরিজিতে যাকে বলে browse করা—আমার মনে হয় ছেলেবেলায় সেটা খুব সাহায্য করে। সিঁড়ির তলায় দুটো আলমারি ছিল, একটাতে অনেক চিঠিপত্রও—বিদ্যাসাগরের, রবীন্দ্রনাথেরও। সে আলমারিও আর নেই, শুনলুম।

ন-জ্যাঠাইমার বইয়ের আলমারিতে আমার অবাধ গতি ছিল। দু-একটা বই আমার জন্যই হারিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সংস্করণ ব্রজেন বাঁড়ুয্যে আমার কাছ থেকে সাহিত্য পরিষদ-এর কাজের জন্য নিয়েছিলেন, কিন্তু সে বই-দুটো সজনীকান্ত দাসের হাতে চলে গিয়ে আর পাওয়া গেল না। নজ্যাঠাইমা আমাকে কয়েকবার ওই বইগুলির কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, আমিও চেষ্টা করেছি, কিন্তু ফেরৎ পাইনি। এখন মনে পড়ে, সন্তুদার স্ত্রী ফুলবৌদিদি—তখন সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে—নজ্যাঠাইমাকে বলেছিলেন—'মা, আপনি শরৎ চ্যাটার্জির বই আমাকে পড়তে দেন না, কিন্তু বিষ্ণু ঠাকুরপোকে তো দেন!'

নয়-দশ বছর বয়সে 7th class-এ Mitra Main স্কুলে ভর্তি হই। তখন হেডমাস্টার মশায় ছিলেন সতীশ মুখার্জি, ঘোর ব্রাহ্মণ, ফর্সা রং। স্কুলেও সকলের কাছে বেশ প্রশ্রয় পেয়েছি। পঞ্চাননবাবু একজন শিক্ষক ছিলেন, আমাকে খুব ভালোবাসতেন, খানিকটা বোধহয় spoil করতেন! আমাকে ক্লান্ত দেখলে পঞ্চাননবাবু খুব স্নিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করতেন: বাড়ি গেলে মা কি খেতে দেবেন? আরেকজন ছিলেন—পূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভটসাগর—রাঙাজ্যাঠাবাবুর ক্লাস ফ্রেণ্ড, আশুতোষ কলেজে পার্ট টাইম পড়াতেন, তিনি ছিলেন মিত্র মেইন-এর অ্যাসিস্টেণ্ট হেডমাস্টার। আমাকে খুব খাতির করে ডাকতেন—'দে মশায়'। বোধহয় একটু নেশা করতেন, প্রায়ই চোখ বুজে থাকতেন। উনিই খবর নিতেন—'দে মশায়, কি লিখছেন?' আর, লেখা পড়েই বলতেন—'আহা, কি লিখেছেন!' খুব সহজেই শরীর খারাপ করতে, বা দেখাতে পারতুম। মা তো আমার এই ক্ষমতাকে ভয়ই করতেন, বলতেন—'না, না তোমাকে আর জ্বর করতে হবে না।' স্কুলে চুলটা একটু ঘেঁটে রাখতুম, পূর্ণবাবুর সামনে। দেখেই বলতেন—'দে মশায়, শরীরটা যেন খারাপ দেখাচ্ছে।' আমার স্কুলে ভালো লাগত না, তাই ওঁর কথায় সায় দিতুম। উনি বলতেন—'আমি দারোয়ানকে লিখে দিচ্ছি ছেড়ে দিতে, বাড়ি চলে যাও।' আমি সানন্দে চলে যেতুম, আর অন্যদের যে কি রকম লাগত সে কথা ভেবে আরো মজা পেতুম। মিত্র-তে আমি 7th class থেকে 3rd class পর্যন্ত পড়েছি। রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা পড়ে তাঁর খুব ভক্ত হয়ে গেছি। ওঁর প্রবন্ধ 'শিক্ষা' পড়ে খুব নাড়া পাই। সব যে বুঝেছি তা নিশ্চয়ই নয়—যা পড়তুম, সব নিশ্চয়ই বুঝতুম না, কিন্তু অনেক কিছুই পড়তুম। তখন, আমার মনে হল, রবীন্দ্রনাথের মতো আমারও স্কুল ছেড়ে দেওয়া উচিত। তখনই মনে মনে

বুঝেছিলুম যে সত্যিই রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ লোক, যেমন দেখতেও অপূর্ব সুন্দর। আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন, যখন প্রথম আমি তাঁকে দেখি। আলফ্রেড থিয়েটার নামে হ্যারিসন রোডে একটা থিয়েটার হল ছিল, বোধহয় পার্শিদেরই করা—'গহর জান' ইত্যাদি নাটক হত। রবীন্দ্রনাথ একদিন ওখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যতদূর মনে পড়ছে, বোধহয় 'সমস্যা ও সমাধান'। গলদঘর্ম হয়ে গেলেন স্টেজের উপরে একলা দাঁড়িয়ে, সিল্কের পাঞ্জাবি পরণে (গেঞ্জি পরতেন না)। তখন আমার বয়স তেরো-চৌদ্দ হবে—আমি মুগ্ধ রাবীন্দ্রিক। নীচে বসেছিলুম—দেখলুম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, খোঁচা খোঁচা চুল, আঁচড়ানো নেই, রোগা, স্টেজে উঠে রবীন্দ্রনাথকে জাপটে ধরলেন। আর, রবীন্দ্রনাথ নিজের গলা তুলে যেন সিঁটিয়ে যাচ্ছিলেন। মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন। বুঝলুম তখনই, রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না কেউ ওঁর গায়ে হাত দেয়।

তারপরই, ঠিক করে ফেললুম, স্কুলকলেজে পড়া ছেড়ে দেবো। রবীন্দ্রনাথের মতো। তখন আমার বাবা এবং তাঁর আপিসের পার্টনার শ্রীগোপালদাস ক্ষত্রিয় খুব ধৈর্যের সঙ্গে আমাকে অনেক বোঝালেন, নানানভাবে। সেই সময়ে Ceylon-এ London Universityর Matriculation পরীক্ষা দেওয়া যেত, বাবা ও তাঁর পার্টনার বললেন, আমি যদি সেটা দিতে চাই, সেটা পড়তে পারি—আমাকে Ceylon-এ পাঠিয়ে দেবেন। আমি তাতেও আপত্তি করলুম, কারণ তখন আমি রবীন্দ্রনাথের মতে একমত—আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সমস্তটাই ভুল। কোনটা ঠিক, ভালোমতো না বুঝে, ইচ্ছা করেই, এই লেখাপড়া করব না ঠিক করলুম। ইচ্ছা করেই ক্লাসের পরীক্ষায় ফেল করতুম—পাঠ্যবই বেশি না পড়ে আমার ইচ্ছামতো বই পড়তুম। তখনই শেকস্পীয়ার ও বার্নাড শ পড়ে ফেলেছি এবং বার্নাড শ-কে মনে হত greater dramatist। অনেকের সঙ্গেই আমার পড়াশোনা নিয়ে তর্ক করতে হয়েছে। শেষকালে মিত্র ছেড়ে বাড়ির সামনে সংস্কৃত স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্তি হই, বাবার একান্ত অনুরোধে।

পরিবার-পরিচয়

হাওড়ার পাতিহাল গ্রামের ৺গঙ্গাধর দে বিশ্বাস তাঁর দুই পুত্র শ্যামাচরণ ও বিমলাচরণ সহ কলকাতায় আসেন, বোধহয়। কলেজ স্কোয়ারের বাড়িটারও তাই একটা ইতিহাস আছে। ওটা এখনও পুরনো কলকাতা কায়স্থ মহলে 'বিশ্বাস-বাড়ি' বলে খ্যাত। একান্নবর্তী পরিবারে এই দুই ভাইয়ের

সন্তানেরা যে যেমন জন্মেছেন তেমনই তাঁদের 'বড়' 'মেজ' 'সেজ' ইত্যাদি বলে ডাকা হত—'জ্যাঠাবাবু' বা 'পিসিমা' বলে। দুই ভাইয়ের সন্তানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। শ্যামাচরণের (সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের সামনের রাস্তাটা আজও যাঁর নামের স্মৃতি বহন করছে) তিন পুত্র ও চার কন্যা, বিমলাচরণের চার পুত্র এক কন্যা। এইভাবে ডাকা হত :

'জ্যাঠাবাবু'—যোগেশচন্দ্র : শ্যামাচরণের প্রথম পুত্র। স্ত্রী—'জ্যাঠাইমা'।

'মেজ জ্যাঠাবাবু'—সুরেশচন্দ্র : শ্যামাচরণের দ্বিতীয় পুত্র। স্ত্রী—'মেজ জ্যাঠাইমা'।

'সেজ জ্যাঠাবাবু'—পাঁচকড়ি : বিমলাচরণের প্রথম পুত্র। স্ত্রী—'সেজ জ্যাঠাইমা'।

[পাঁচকড়ি বয়েস অনুযায়ী সেজ ছিলেন, রাঁচিতে থাকতেন]

'ন-জ্যাঠাবাবু'—নরেশচন্দ্র : শ্যামাচরণের তৃতীয় পুত্র। স্ত্রী—'ন-জ্যাঠাইমা'

[দুই পুত্র : সুকুমার ('সন্তুদা') ও সুধীর]

'নতুন জ্যাঠাবাবু'—শশীভূষণ : বিমলাচরণের দ্বিতীয় পুত্র। স্ত্রী—'নতুন জ্যাঠাইমা'।

'রাঙা জ্যাঠাবাবু'—অক্ষয়কুমার : বিমলাচরণের তৃতীয় পুত্র। স্ত্রী—'রাঙা জ্যাঠাইমা'।

'রাঙা দাদা'—অজিতকুমার : অক্ষয়কুমারের একমাত্র পুত্র।

'রাঙা দিদি'—বিভাবতী : অক্ষয়কুমারের একমাত্র কন্যা।

[বিভাবতীর সঙ্গে শরৎচন্দ্র বসুর বিবাহ হয়েছিল। শরৎচন্দ্র তাই 'রাঙা জামাইবাবু']

'বড় পিসিমা', 'মেজ পিসিমা', 'সেজ পিসিমা' ও 'ছোট পিসিমা'—শ্যামাচরণের চার কন্যা।

'ন-পিসিমা'—কুমুদিনী : বিমলাচরণের একমাত্র কন্যা।

[বিয়ে হয়েছিল নন্দকিশোর ঘোষ বি. এল.-এর সঙ্গে। এই বিবাহের ঘটকালি করেছিলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি শ্যামাচরণ-বিমলাচরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, এ বাড়িতে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল]

'ছোট কাকাবাবু'—অবিনাশচন্দ্র : বিমলাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র।

[মা ছিলেন 'ছোট কাকিমা']

প্রণতি দে

রবীন্দ্র-সঙ্গীত : শেখা ও গাওয়া

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় আ-শৈশব শান্তিনিকেতনে লালিত। বাবা ছিলেন আশ্রমের নিষ্ঠাবান কর্মীদের একজন। সুদর্শনা, সুকণ্ঠী এই আশ্রমকন্যা অতি বাল্যকালেই রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীর স্নেহসান্নিধ্য পেয়েছেন, তাঁদের কাছে গান শিখেছেন। সঙ্গীতভবনের সঙ্গে যুক্ত তৎকালীন ওস্তাদ-দের কাছে মার্গসঙ্গীতের শিক্ষা নিয়েছেন। শ্রীশান্তিদেব ঘোষের কাছেও কিছু গান শিখেছেন। কিন্তু নিয়ম-বাঁধা সঙ্গীতচর্চায় সঙ্গীতভবনের তখনকার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারই তাঁর প্রকৃত শিক্ষাগুরু।

ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর ভাষায়..."গাছপালা যেমন সহজ আর স্বাভাবিক ভাবে আলো-বাতাস থেকে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে ও বেড়ে ওঠে, মোহরও তেমনি সহজে আশেপাশের সংস্কৃতির আবহাওয়া থেকে রস টেনে নিয়ে আত্মসাৎ করে পরে আনন্দরূপে তা অপরকে বিতরণ করতে সমর্থ হয়েছে।"

এককালে ছাত্রী, পরে দীর্ঘকাল অধ্যাপিকা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে শান্তিনিকেতন সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষা। আর রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে তিনি তো আজ প্রায় কিংবদন্তি।

কয়েকটি প্রশ্নের ভিত্তিতে শিল্পী হিসেবে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কিছু অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা এখানে বলেছেন।

গানের আসল পরিচয় তার রসসৃষ্টির ক্ষমতায়। গান যদি শ্রোতার মনকে স্পর্শ না করতে পারে তাহলে যতই বাহাদুরি থাক না কেন সে গান সার্থক নয়। বিভিন্ন ধারার গানের পথ ভিন্ন ভিন্ন। মার্গসঙ্গীতে যেমন সুরই প্রধান। রাগরাগিণীর কাঠামোকে সঠিকভাবে বজায় রেখে

চলে সুরের লীলাখেলা। সেখানে কথার গুরুত্ব প্রায় নেই-ই। সুরবিস্তারের প্রয়োজনে কথাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে শিল্পীর বাধে না।

গুরুদেবের গানের ব্যাপার কিন্তু একেবারেই আলাদা। কথা ও ভাবের সঙ্গে সুরের মিলনই রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। কোন পরিবেশে কোন কথাটি ব্যবহার করলে ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠবে সেটি খেয়াল রেখেই তিনি শব্দের ব্যবহার করেছেন। আবার সুর রচনার সময়েও তাঁকে সেই কথা ও ভাবের দিকে সমান মনোযোগ দিতে হয়েছে। অনেকে মনে করেন মার্গসঙ্গীত সম্বন্ধে গুরুদেবের বিশেষ জ্ঞান ছিল না। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। মার্গসঙ্গীতে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। একদিকে বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর কাঠামো ভিত্তি করে অনেক গান বেঁধেছেন। অন্যদিকে আবার লোকসঙ্গীতের সুরও অবাধে গ্রহণ করেছেন। বস্তুত গুরুদেবের জন্যই অনাদৃত লোকসঙ্গীত আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাছাড়া কথা ও ভাবের পরিপূর্ণতা আনবার জন্য গুরুদেব নানারকম সুরের সংমিশ্রণও করেছেন। ভাবের আদান-প্রদানের জন্য এই ধরনের মিশ্রণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে কথার সাহায্যে। আর কথা বলার বিশেষ ধরনটিও বিশেষ বিশেষ অনুভূতির সঞ্চার করে। কথার সঙ্গে সুরকে পুরোপুরি একাত্ম করা খুব সোজা নয়। এই কাজটি আশ্চর্যসৌন্দর্যে সম্পন্ন হয়েছে গুরুদেবের গানে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর বড় না কাব্য বড় এ বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় কথা-সুর, গাইয়ের কণ্ঠস্বর আর গাইবার বিশেষ ভঙ্গি—এই সবকিছু মিলিয়েই রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ও সমৃদ্ধি। মার্গসঙ্গীতের বন্ধন রাগরাগিণীর শৃঙ্খলায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বন্ধন কথা, সুর ও গায়কীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও সঙ্গতিতে।

সমস্ত শিল্পেরই আছে নিজস্ব ভাষা এবং অনুভূতির বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টি তখনই সার্থক যখন তার আবেদন সর্বজনীন। একথা অবশ্যই ঠিক যে প্রত্যেক শিল্পমাধ্যমের যে-ভাষা, রসগ্রহীতার পক্ষে তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ সেই ভাষাই তো শিল্পীর ভাবপ্রকাশের মাধ্যম। তাছাড়া আমার মনে হয় সব শিল্পসৃষ্টিরই একটি স্তর থাকে যেখানে তার আবেদন ভাষার বাঁধকে ছাপিয়ে যায়, রসগ্রহণে সেই স্তরে সৃষ্ট শিল্প সব অর্থেই সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

সর্বজনীনতার আর একটা দিক আছে। একজন চিত্রশিল্পী যখন আঁকেন

বা সঙ্গীতশিল্পী গান করেন তখন নিজস্ব অনুভূতি বা ধারণার সঙ্গে ব্যক্তিগত দর্শক বা শ্রোতার মনের সম্পূর্ণ মিল না-ও হতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন দর্শক বা শ্রোতার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ না থাকলেও ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সম্ভব। রসগ্রহীতার বিশেষ মানসিকতা, পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য রস-আস্বাদনের ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলে বিভিন্ন মনে উপভোগের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। তা না হলে তো শিল্পসৃষ্টি একঘেয়ে এবং বন্ধ্যা হয়ে যেত। কেননা শিল্পরসের মূল উপাদানগুলো—হর্ষ, বেদনা, প্রেম, বিরহ তো চিরপুরাতন। প্রকাশ ও অনুভবের বৈচিত্র্যই তো একে চিরনবীন করে রাখে।

শিল্পীরা সামাজিক না সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এই প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন। আমি মনে করি প্রত্যেক শিল্পীই তাঁর সৃষ্টি মারফৎ দর্শক, শ্রোতা বা সমঝদারের কাছে পৌঁছুতে চান। সেই অর্থে শিল্পীরাও সামাজিক। কিন্তু শিল্পী যা সৃষ্টি করেন নিজের মনের বিশেষ তাগিদেই করেন। আন্তরিক-ভাবে ব্যক্তিগত তাগিদ ছাড়া কোনো সার্থক সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথচ সৃষ্টির সার্থকতা সমাজনির্ভর। সুতরাং শিল্প ব্যক্তিগত এবং সামাজিক—দুই-ই।

আমার কাছে অনেকেই জানতে চেয়েছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমাদর বৃদ্ধি ও বহুল প্রচার সত্ত্বেও বর্তমান বাংলা আধুনিক গানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রভাব এত কম কেন। আগেই উল্লেখ করেছি কথা-সুরের পার্বতী-পরমেশ্বর মিলনই হল রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষত্ব। গুরুদেবের গান তাঁর এই ঐশ্বর্যের জোরেই শ্রোতার মনকে মুহূর্তের তুচ্ছতা বা দৈনন্দিন জীবনের নানা সংঘাত অতিক্রম করতে সাহায্য করে। রবীন্দ্রসঙ্গীত কেবলমাত্র সাময়িক আনন্দই দেয় না—শ্রোতাকে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে। কিন্তু অধিকাংশ আধুনিক গান সাময়িক উন্মাদনা সৃষ্টিতেই আগ্রহী। গান রচনা সাধারণের তাৎক্ষণিক খুশি ও মর্জি অনুযায়ী হলে তা সার্থক হতে পারে না। সাধারণ অনুভূতিকে মনে রেখে তাকে সাধারণের উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার সাধনাই শিল্পকে সার্থকতা দেয়। মানতেই হবে যুগের, গোষ্ঠীর ইচ্ছাপুরণ বা ফরমায়েস মতো চলার চেষ্টাতেই আধুনিক গান শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত কেন যে কোনো গভীর রসসৃষ্টি থেকেই দূরে থেকে যাচ্ছে।

অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনার ক্ষেত্রে সীতাদেবী, সাহানা-

দেবীদের কাল থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত সঙ্গীতপ্রবাহের যে বলিষ্ঠতা, বৈচিত্র্য এবং সমৃদ্ধি ছিল—আধুনিক কালে তাতে কিছুটা ছেদ পড়েছে।

কিছুটা ছেদ হয়তো পড়েছে। আমরা সেযুগে যে আবহাওয়া, পরিবেশ পেয়েছি এবং গুণীজনদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে শিক্ষালাভ করেছি—সেই আবহাওয়া, পরিবেশ বা শিক্ষার সেই সুযোগ আমাদের পরবর্তী যুগের গাইয়েরা পান নি। তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে এখন অজস্র রবীন্দ্রসঙ্গীত-গাইয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এটা একটা বড় সাফল্য। প্রথম যুগে রবীন্দ্রসঙ্গীত এতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। তখন তার চর্চা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গুরুদেবের গান পরিবেশনা এখনকার মতো এত সহজ ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষালাভ করে শিক্ষাগুরুদের কাছে রীতিমতো কঠোর পরীক্ষা দিতে হত। শুধুমাত্র স্বরলিপি নয়—রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সুর এবং তার অন্তর্নিহিত ভাবের সম্মিলনে গানে কতখানি পরিপূর্ণতা এলো সেইদিকে শিক্ষাগুরু ও শিক্ষার্থীদের গভীর লক্ষ্য ছিল। স্বরলিপি অনুসারে গান করতে পারলেই সেই গান সাধারণ্যে পরিবেশন করা হত না। বাহ্যিক কোনো বাধা ছিল না—ছিল অন্তরের বাধা।

আজ একদিকে যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমাদর বৃদ্ধি ও অজস্র গাইয়ের সৃষ্টি হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি অনুষ্ঠানের সংখ্যা ও বেতার প্রচারের মাত্রা বেড়েছে। তার ওপরে এল টেলিভিশন। এর অনিবার্য ফল হল প্রতিযোগিতা যা ক্রমেই বিকারে পরিণত হচ্ছে। বর্তমান যুগটাই হচ্ছে প্রতিযোগিতার যুগ। এই পরিবেশে শেখবার ও শেখাবার নিষ্ঠা ব্যাহত হতে বাধ্য।

তবে আবার বলছি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে আমাদের পরবর্তী যুগের গাইয়েদেরও যথেষ্ট অবদান আছে।

এই প্রসঙ্গেই আরেক সমস্যার কথা বলি।

সম্প্রতি রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী ও স্বরলিপি-সংক্রান্ত কিছু কিছু গরমিল নিয়ে গাইয়েদের মনে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। নানা তর্কও উঠে পড়েছে। অনেক সময়ে দেখা যায় শুধু গায়কীই নয়—স্বরলিপিরও হেরফের হচ্ছে। এই সমস্যার মূলে যেতে হলে কিন্তু গুরুদেবেই পৌঁছুতে হবে। অনেক সময় প্রয়োজনে নিজেই তিনি সুরের অদলবদল করেছেন। পরে ভুলে যাবেন এই আশঙ্কায় গুরুদেব অনেক সময় গান রচনা করেই সে-সুর বিভিন্ন ঘনিষ্ঠজনকে সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়ে দিয়েছেন। জনে জনে এই তোলানোর সময়েই সুরে কিছু কিছু পার্থক্যও থেকে গেছে। পরে যখন বিভিন্ন সুরের

একই গান তাঁকে শোনানো হয়েছে তখন গুরুদেব অন্যগুলি বাতিল করে একটি সুরই গ্রহণ করা উচিত—এমন কথাও সব সময়ে বলেন নি। যার জন্ম একেবারে গোড়া থেকেই এই বিতর্কের সুযোগ থেকে গেছে। তাই আমার মনে হয় যেখানে একাধিক সুর রয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে সেখানে যান্ত্রিকভাবে কোনো একটি বিশেষ স্বরলিপিকেই আঁকড়ে ধরে না রেখে স্বরলিপি-প্রকাশন-কর্তৃপক্ষের উচিত সবকটা বিকল্প স্বরলিপিকেই প্রয়োজনীয় টীকাসহ পাশাপাশি প্রকাশ করা। প্রকাশিত 'স্বরবিতান', এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে, এখনও অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে।

এটা ঠিক যে স্বরলিপি গাইয়েদের একটা সঠিক সুরের কাঠামো দেয়। কিন্তু সেটা কাঠামোই। স্বরলিপি এবং গায়কী সম্পর্কে আমার মত হল—গাইয়েদের দায়িত্ব এই কাঠামোকে রক্তমাংসে সম্পূর্ণ করে তাতে প্রাণ সঞ্চার করা। প্রাণ সঞ্চারের এই ক্ষমতা সকলের থাকে না। সেই ক্ষমতা যাদের আছে তাঁরাও নিজস্ব প্রতিভার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সৃষ্টি যা করেন তাতে রসব্যঞ্জনার কিছু কিছু পার্থক্য থেকে যায়।

স্বরলিপির এই বিভ্রান্তি নিয়ে যে পরস্পরবিরোধী বিতর্কের ঝড় উঠেছে তার কোনো সহজ সমাধান আছে বলে মনে হয় না। এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন শিল্পীদের সমবেত করে আলাপ-আলোচনা মারফৎ সমৃদ্ধতর স্বরলিপি তৈরি করাই হয়তো এই বিশ্রী অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র রাস্তা।

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন এত দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গিয়ে ক্লান্তি আসে কিনা। আমি বলি এবং চিরদিন বলব—নিশ্চয়ই নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগৎ এমনই আশ্চর্য যে মনে হয় কোনোদিনই তার দিগন্ত ছোঁয়া যাবে না। আমি বলি—রবীন্দ্রসঙ্গীতই তো আমার সব ক্লান্তি দূর করে।

আমি প্রধানত গুরুদেবের গানই গাই। আমার যা কিছু পরিচিতি তা ঐ রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী হিসেবেই। কিন্তু আমার কোনো গোঁড়ামি নেই। কথা ও সুর যদি ভালো লাগে আমি সে গান গেয়ে থাকি। ভজন, কীর্তন, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, ডি. এল. রায়—এঁদের সকলের গানই আমি খুব পছন্দ করি এবং নানা অনুষ্ঠানে গেয়েছিও। ভজন গানের তালিম নেওয়ার

সুযোগ পেয়েছি জ্ঞানদার (জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ) কাছে, নজরুলের গান শিখেছি স্বর্গত কমল দাশগুপ্ত ও ফিরোজা বেগমের কাছে।

অনেকে জানতে চান সুরে কারুণ্য না বলিষ্ঠতা—কোনটার প্রাধান্য থাকা উচিত। আমার কাছে এধরনের প্রশ্নের কোনো মানে নেই। গাইয়ের কণ্ঠস্বরের একটা ভূমিকা আছে। প্রত্যেক গাইয়ের কণ্ঠস্বর বা গাইবার ভঙ্গী বিশিষ্ট। আমার কণ্ঠে যেমন করুণ রসের গান আসে। আবার সুচিত্রার কণ্ঠে বলিষ্ঠ সুরের গান ভালো আসে। (সুচিত্রা সবরকম গানেই পারদর্শী।) ওর বলিষ্ঠ কণ্ঠের গান শুনলে আমার মন উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। আমার ঠিক ওরকম আসে না। আবার "তুমি রবে নীরবে" এবং "আমি চঞ্চল হে" গান জর্জদা এমন মনপ্রাণ ঢেলে গেয়েছেন যে ঐ দুটি গান আর-কারুর কণ্ঠে ভাবাই যায় না। উদ্দীপনার গানও জর্জদা খুব ভালো গান। অবশ্য এসব নেহাতই ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা বলছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ ও গাইবার বিশেষ ধরনের মধ্যে শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। কোনো একটি বিশেষ ধরনের প্রাধান্যের প্রশ্ন তাই ওঠে না।

এই সুযোগে একটি ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করি। পঙ্কজকুমার মল্লিকের মৃত্যুর পর দেশবাসী তাঁকে যথাবিহিত শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কিন্তু কোনো কোনো মহলে সেই সঙ্গে কিছু বিরূপ সমালোচনাও শোনা যায়। পঙ্কজ মল্লিক সম্পর্কে কয়েকটি কথা মনে তখন থেকেই ঘুরছে, সুযোগ পেয়ে আজ পাঠকদের জানাচ্ছি। আমি নিজে পঙ্কজ মল্লিককে একজন সাধক শিল্পী মনে করি। রবীন্দ্রসঙ্গীত যখন সমাজে প্রায় অচ্ছুৎ ছিল, তখন পঙ্কজ মল্লিকই অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। গুরুদেবের গানকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে পঙ্কজ মল্লিকের অবদান অনেকখানি। তাঁর গাইবার ভঙ্গী নিয়ে যে সমালোচনাই থাকুক না কেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থিত করার কঠিন ব্রত সেদিন তিনিই সর্বপ্রথম গ্রহণ করেছিলেন।

এবার একটু জর্জদার কথা বলি। প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে জর্জদার সঙ্গেই আমার সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা, ছোটবেলা থেকেই পরম আত্মীয়ের সম্পর্ক।

জর্জদার গাওয়া অনেকগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীতই আমার প্রিয়। তা সত্ত্বেও জর্জদা যখনই আমার বাড়িতে আসতেন তাঁকে দিয়ে একটার পর একটা গণনাট্য সংঘের গান গাওয়াতাম। আমি কোনোদিন কোনো রাজনীতি

বা সে অর্থে দেশের কাজ করিনি। কিন্তু জর্জদার কণ্ঠে গণনাট্য সংঘের গান শুনতে শুনতে আমার শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠত। "অবাক পৃথিবী" গানটা অনেকবার শুনেছি। খুব ইচ্ছে করত অমন করে গাইতে। কিন্তু আমার গলায় সেভাবে আসত না।

আর একজন গুণীজনের সংস্পর্শে এসেছিলাম—তিনি বটুকদা। গোড়ায় বটুকদাকে দূর থেকে চিনতাম—বটুকদার কণ্ঠে ধ্রুপদ-ধামারের ওপর প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব ভালো লাগত। কিন্তু মানুষটির সঙ্গে তখন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। গত বছর বটুকদার অনেকটা কাছাকাছি এসেছিলাম। তখন 'নবজীবনের গান' শোনার সৌভাগ্য হয়। ওরকম গান আগে কখনও শুনিনি। গত বছর রবীন্দ্র-সপ্তাহে বটুকদাকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করেছিলাম। সেখানে তিনি 'নবজীবনের গান' পরিবেশন করেন। গান ও সঙ্গীতভবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বটুকদার সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছি।

ঠিক হল সঙ্গীতভবনের একটা সেমিনার হবে। এ ব্যাপারে বটুকদার সঙ্গে আলোচনার জন্য কলকাতা এসে শুনলাম তিনি হায়দ্রাবাদ গেছেন। যেদিন ফেরার কথা সেদিনই আমি বটুকদার সঙ্গে দেখা করার জন্য আবার কলকাতায় ছুটে আসি। মর্মান্তিক ঘটনার কথা শোনামাত্র দৌড়ে গেলাম বটুকদার বাড়িতে। দেখলাম বরফের চাঁইয়ের ওপরে বটুকদাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মুখখানা শ্রান্ত, প্রসন্ন।

বটুকদা মানুষ হিসেবে একদম ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। কারুর সঙ্গে মিল পাই নি। মৃত্যুর পরের দিন বটুকদার বাড়িতে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে অনেক-গুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আমার শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালাম। বটুকদা একজন বড় সাধক ছিলেন। এরকম মানুষ ও সাধকের আবির্ভাব একবারই হয়।

অন্যান্য গান ভালো লাগার প্রশ্নে আবার গণনাট্য সংঘের গানের কথাতেই আসা যাক। যদিও গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে আমার কোনোদিন কোনো যোগ ছিল না, কিন্তু গানগুলির কথা, সুরের বৈচিত্র্য, গাইবার জোরালো ভঙ্গী…সবকিছুই আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করত। এখনও ঐসব গান শুনলে শরীরের রক্ত টগবগ করতে থাকে।

এদিকে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত তো আমার মজ্জায় মজ্জায়। কিন্তু যখন গণনাট্য সংঘের গান শুনি তখন কোথায় শাল পিয়ালের গন্ধ, কোথায়ই বা রবীন্দ্রসঙ্গীত—সব যেন মন থেকে মুছে যায়। তখন আমিও

সাময়িকভাবে ঐসব গানেরই অংশীদার হয়ে পড়ি। অবশ্য আমার গলায় ঐসব গান আসত না। মনে মনে গাইতাম।

এই প্রসঙ্গে জীবনের একটা দুঃখের কথা না বলে পারছি না। আমি সলিল চৌধুরীর গানের একজন ভক্ত। সলিলের দেওয়া সুরে হেমন্ত মুখার্জির কণ্ঠে 'রানার' ও 'পাল্কী চলে' গান দুটি আমার ভালো লেগেছে। সলিলের গান যে আমার ভালো লাগে—সেকথা সলিলও জানে। ওর গান রেকর্ড করার খুব ইচ্ছে জেনে সলিল আমারই জন্য দুটো গান লিখে তাতে সুর বসাল। একটা গানের কলি মনে আছে "আমার কিছু মনের আশা"। অপরটির কথা ভুলে গেছি। সলিল খুব যত্ন করে শিখিয়ে দেওয়ার পর H.M.V. তে আমার গান দুটি রেকর্ড করা প্রায় ঠিক। এমনসময় বিশ্বভারতীর তৎকালীন কর্তৃপক্ষ থেকে কড়া নির্দেশ এলো রবীন্দ্রসঙ্গীত বাদে আর কোনো গান রেকর্ড করা চলবে না। খুব মন খারাপ হয়ে গেল। সেই বাসনা আজও পূর্ণ হয় নি। এই দুঃখ আমার মনে এখনও বিঁধে রয়েছে।

অনেকে মনে করেন গান ছাড়া আমার বোধহয় আর কোনো কাজ বা দায়িত্ব নেই। আমি তো সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন নই। আমারও অনেক পারিবারিক সামাজিক দায়-দায়িত্ব আছে। তবে একথা ঠিক সংসার সম্বন্ধে দায়িত্ব থাকলেও—সেখানে আমার আসক্তি কম। বাড়িঘরসংসার আছে বলে তাকে আঁকড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আগে আমার গান তারপরে বাকি সব। কিন্তু শুধু গান নিয়েই জীবন চলে না। সমাজের যে কোনো সংকটমুহূর্তে গাইয়েদেরও ভূমিকা আছে। আমার কাজের জগৎ হচ্ছে বিশ্বভারতীর ভেতরে এবং শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের আশপাশের অঞ্চল-গুলি। আমি ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনে রয়েছি। গুরুদেবের আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে আমার সাধ্যমতো অংশগ্রহণ করছি। আমার হাত দিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী বেরিয়েছে—অনেকেই তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেজন্য আমি গৌরব বোধ করি।

আমাদের উপাচার্য মহাশয় গুরুদেবের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্রতী হয়ে অনেক নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন ভবনে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে এনে ভবনগুলির নিজ নিজ কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছেন। শান্তিনিকেতনের আশেপাশের গ্রামের মানুষদের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া সূত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পল্লীচর্চা বিভাগ স্থাপন

করেছেন। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বিক্রম রায় বর্মন সেখানে অধিকর্তা হিসেবে যোগ দিয়েছেন। সহকর্মী ও ছাত্রদের নিয়ে আমরা বিভিন্ন ভবনগুলির অধ্যক্ষরা গ্রামে যাই—সেখানে গান করি, গান শেখাই এবং নিরক্ষরতা দূর করার কাজে অংশ নিই। গুরুদেব যে সমস্ত সাঁওতাল-দের শান্তিনিকেতনে এনে বসিয়েছিলেন, তাদের অস্তিত্ব প্রায় মুছে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বর্তমানে তাদের পুনর্বসতি, জলের ব্যবস্থা, শিক্ষা ইত্যাদি নানারকম জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে সেগুলি কার্যকরী করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরাও সেসব কাজে আমাদের দায়িত্বটুকু পালন করার চেষ্টা করছি। আগে কেবল গান শেখাতাম আর গান গাইতাম। বর্তমানে তার সঙ্গে আরও অনেক কাজের দায়িত্ব এসে পড়েছে। বিশ্বভারতীর ভেতরে ও বাইরে নানা সমস্যা, ছাত্রছাত্রীদের ভালোমন্দ, গ্রামগুলোতে যাওয়া, পারিবারিক দায়িত্ব—সব মিলিয়ে মুহূর্তের অবকাশ নেই।

ভেবে দেখছি এ-ই আমার ভালো। মানুষের কাছে শিল্পের কাছে আশ্রম ও গুরুদেবের কাছে ঋণ তো আমার সামান্য নয়! নিজেকে উজাড় করে কাজ করে আর গান গেয়ে তার যেটুকু শোধ হয়।

অনুলিখন : বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়

অরণ্য-গ্রাস

প্রেমেন্দ্র মিত্র

চোখের ওপর তোমায় আমি
বদলে যেতে দেখছি, বন্ধু !
তুমি নিজে কি তা জানো না ?
তোমার হাত আর পায়ের পাতাগুলো
থাবা হয়ে যাচ্ছে।
নির্মম বাঁকা সব নখ বাড়ছে
সে থাবায়
হিংস্র লুব্ধতায় !
দীর্ঘ সর্পিল হয়ে উঠছে ক্রমশ
তোমার শরীর,
সর্পিল আর শীতল পিচ্ছিল
বিবর-বিলাসী সরীসৃপের মতো

অরণ্য তুমি পেছনে ফেলে এলে
অনেক দূরে ধূসর স্মৃতির দিগন্তে,
কিন্তু অরণ্য নিঃশব্দে এসেছে
তোমার পিছু পিছু।
তোমার দুর্গ-ঘেরা
সমস্ত পরিখা ডিঙিয়ে
তোমার সমস্ত সাঁজোয়া পাহারা
ভেদ ক'রে,
লালসা হয়ে তা তোমার
দিনের প্রহরগুলোর মুখে
লালা ঝরায়,
তোমার রাতের দুঃস্বপ্ন-মথিত অন্ধকার
আতঙ্ক হয়ে
বিদীর্ণ করে আর্তনাদে।

তোমার ভেতরের শ্বাপদটা
ক্রমশ তোমাকে চতুষ্পদ ক'রে তুলছে।
তা কি টের পাচ্ছ না বন্ধু ?
কঠিন হয়ে আসচে ক্রমশ
তোমার স্কন্ধের পেশী,
মুখটা মাটিতে নামিয়ে রাখতেই
তোমার স্বাচ্ছন্দ্য।
শুধু চোখ দুটো
এখনো তুমি তুলতে পারো আকাশে।

তাই এবার তোলো বন্ধু।
আকাশের নীল বিস্ময়
এখনো তোমার দুচোখ বেয়ে নেমে
অমোঘ অরণ্য-গ্রাস থেকে
তোমায় উদ্ধার করতে পারে।

খেতে পাবে তখন

গোলাম কুদ্দুস

ফুটফুটে তারাভরা আকাশের তলায় শুয়ে আছি।
সারা আকাশ যেন মুক্তোর চুমকি বসানো শাড়ি,
দেখে আমার আশ মেটে না।
পাশের লাইন দিয়ে চ'লে যায় গিরিডির ট্রেন,
তার কামরাগুলো থেকে ছিটকে আসে
হীরকচ্ছটা।

আরো দূরের লাইনটা দিয়ে চ'লে যায় দূরপাল্লার ট্রেন
দিল্লি, পাঠানকোট, অমৃতসরের দিকে,
হুইসেলের তীক্ষ্ণ তানে তাকিয়ে দেখি
দীর্ঘ একগাছা আলোর মালা
ছুটে মিলিয়ে গেল আলেয়ার মতো।
ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়ি।
রাতজাগা প্রহরীর হাঁক জাগিয়ে দেয়,
কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ক'রে ডাকে,
উঠে বসি জনবিরল নগরের
বিশাল আঙিনাবেষ্টিত নিরালা বাড়িতে,
টর্চ জেলে ঘুরি নিশাচরের সন্ধানে।

সকালে উঠে দেখি নীচু মাঠের আল ভেঙে
গোয়ালারা চলেছে বাজারে,
কৃষকরা লাঙল কাঁধে গরু নিয়ে নেমেছে মাঠে।
উদয়ভানুর পাশ কাটিয়ে
আমার দৃষ্টি চ'লে যায় অস্পষ্ট সুদূর
দেওঘরের ত্রিকূট পাহাড়ে।
চমক ভাঙে কোকিলের ডাকে!
কোত্থেকে এলেন বসন্তসখা ঘোর গ্রীষ্মকালে!
মধুমাস কেটে গেলে মধুকণ্ঠরা কোথায় যান
এতাবৎ তার পাইনি হদিশ,

এবার আবিষ্কারের আনন্দে তাদের ঠিকানা পেলাম
এখানকার আম, জাম, নিম, তেঁতুল পাতার আড়ালে।
কুহু-কুহু কোরাসের দোলাতেই কি
দুলতে থাকল লাল ডালিম ফুলে ভরা ডালপালা
আর পাতলা শিরিষ পাতা।

দুপুরের দাবদাহে দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে আমি বন্দী।
নিদ্রাহীনতার সঙ্গে সন্ধি ক'রে
বই পড়ি ময়লা শার্সির পাশে ম্লান আলোয়।
কখনো বা ঈষদোন্মুক্ত দরজার ফাঁকে চোখে পড়ে
মালির গরুটা ঘুরে বেড়াচ্ছে তার খাস তালুকে
রক্তজবা, কলাফুল আর পেয়ারা বাগানে
একটু ঘাসের ডগার আশায়।
না পেয়ে থমকে এসে দাঁড়াল বন্ধ গেটের সামনে,
নিরুপায় ফিরে এসে বারান্দার ওধারে
শুকনো বিচালির ছড়ানোছিটানো ভগ্নাংশ
মুখে পুরছে জিভ দিয়ে চেটে চেটে।
শেষে তৃষ্ণার্ত গরুটা চক্কর দিতে লাগল সারা বাড়ি।
সকালে একবার মাত্র ওকে জল দিয়েছিল
বিহারী মেয়েটা, যাকে দেখতে ঠিক সাঁওতালনির মতো।
আমাদেরও সে জল দেয় ইঁদারা থেকে টেনে তুলে।
কদিন থেকে তার খাওয়াদাওয়া জুটে যাচ্ছে
অসময়ে আগত আমাদের ফাইফরমাসের দরুণ,
আপনা আদমির জন্যও রুটিতরকারি নিয়ে যেতে ভোলে না সে
মলিন আঁচলের তলায় লুকিয়ে,
আমরা দেখেও দেখি না,
ক্ষুধার্ত বাটলি কুকুরটারও বুঝতে বাকি থাকে না,
সে যায় ওর পিছু পিছু, কিছু কিছু ভাগের আশায়।
না পেয়ে ফিরে আসে,
আমাদের পায়ে পায়ে ঘোরে,
যা পায় তাই খায়,

চা-বিস্কুটও রপ্ত হয়ে গেল তার এইভাবে

সীজ্‌নের চেঞ্জারদের জন্যে
এখানে প্রত্যেকে প্রতীক্ষাব্যাকুল,
মানুষ, গরু, কুকুর
সবাই খেতে পাবে তখন।

একটি আধা গ্রাম্য কবিতা

ধনঞ্জয় দাশ

আমার দিদিমা
সেই ফোকলা মুখ, সাদা চুল
ডাকসাইটে দিদিমা
বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে
পিঠ কুঁজো ক'রে বলতেন,
তোরা আমাকে কি ভাবিস, বল তো?
বোস-বাড়ির পচা পুকুরের পাঁকের মতো
গা ঘিন ঘিন করা কেচ্ছা, আমি সব জানি।
ঐ বিপ্লব নামে ছোকরা
ইদানীং রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে
কোনো কিছু গ্রাহ্যি না ক'রে
গোঁয়ার-গোবিন্দের মতো কোথায় যায়
শিরিষ গাছের পাতার আড়ালে
সূয্যি ডুবতে না ডুবতে কার ঘরে
চিৎপটাং হয়
আর কোন সোহাগীর আঁচলে মুখ মুছে
একটানে গনগনে কল্কে ফাটায়
আমি কিছুই জানিনে বুঝি, না?
সব জানি, কিন্তু বলব না।

কারণ, আমাদের ঢেঁকি নেই
অথচ শালি ধানের সরু চিঁড়ে কুটতে হবে
আমি এসব রটনা করছি জানলে
দজ্জাল বোস-গিন্নী, দেবে
ওদের ঢেঁকিতে আমাকে চিঁড়ে কুটতে দেবে ?
না, কক্ষনো না
তাই কেচ্ছার হাঁড়িটাও আমি কোনোদিন
হাটে ভাঙব না।

তা মুখুজ্জেদের তো ঢেঁকি নেই
চিঁড়ে কুটবার জন্যে ওদের দুয়ারে হত্যেও দিতে হবে না,
তবু মুখুজ্জেদের রসালো কথাগুলো
তুমি বলছ না কেন, দিদিমা ?
তুমি কি ছাখোনি, তলোয়ারের মতো ঐ ধিঙ্গি···
হ্যাঁ, হ্যাঁ, মুখুজ্জেদের ঐ মেয়েটা
কী যেন নাম—মিনতি, না মিতা
গায়ে হলুদ মেখেও বিয়ের পাকা সম্বন্ধটা
কেমন ভাবে কেঁচে দিল, তারপর একদিন
ঘুটঘুটে অন্ধকারে উধাও হল
আর ফিরে এল না···
তুমি কি জানো, সে এখন উন্মাদিনী হয়ে
ভালোবাসার বিকল্প খুঁজছে
শহর কলকাতায়, বাবুদের বনেদী পাড়ায় ?
এসব জেনেশুনে মুখে কুলুপ এঁটে
তুমি ব'সে আছ কেন, দিদিমা ?

বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দেওয়া পিঠকুঁজো দিদিমা
এবার সটান হয়ে বসলেন,
ঘোমটাটানা কচি বউ-এর মতো
ফিসফিস গলায় বললেন :
তুই বাছা, একটা আস্ত হাঁদারাম

মুখুজ্জেদের চিঁড়ে কোটার ঢেঁকি নেই, ঠিক কথা
কিন্তু ওদের সুন্দর শান বাঁধানো নদীর ঘাট আছে
আমাদের নৌকোগুলো সেখানে বাঁধা থাকে না?
এসব কথা রটলে, দেবে
ওরা সেই ঘাটে আমাদের নৌকোগুলো আর বাঁধতে দেবে ?

ভদ্রমহোদয়গণ, এবার আপনারাই বলুন
আমি কি দিদিমাকে অনুসরণ করব ?
অর্থাৎ, ঢেঁকিতে চিঁড়ে কুটতে দেবে না ব'লে
ঘাটে নৌকো বাঁধতে দেবে না ব'লে
আমি কি চিরকাল মুখে কুলুপ এঁটে ব'সে থাকব ?

কেন্দ্রাতিগে যাওয়া যায় ?

বিতোষ আচার্য

কক্ষ থেকে যেভাবে এসেছি, বাইরে
বৃহত্তর বলয়ের টানে
হচ্ছে দিনগুলো
যেভাবে ঘামে ও রক্তে
একাকার, একাকার আলোআঁধারিতে-
উজান গঙ্গায়
আবার কি ফেরা যায় গোমুখের পথ চিনে চিনে
কেন্দ্রাতিগে :
আযুক্ত আরব্ধ-কর্ম সুকঠোর
তৌলদণ্ডে ওঠে নামে
একঠায় থামে না
না, না....

দুপাশে কুয়াশা, আঁধি
তীররেখা ঝাপসা ও সুদূর
লোকালয় অবলুপ্ত :
পৃথিবীর বয়স্ক বলিতে ঠুলিবদ্ধচোখে
বৃত্র-সংহার-পর্ব অভিনয়
অন্ধ পদক্ষেপে
আজো চলে, চলেই.

কক্ষ থেকে যেভাবে এসেছে ছুটে
যে দুর্দম ঘূর্ণাবেগ সুদর্শনচক্রের স্বরূপে
ছিন্নভিন্ন করেছে কংসকে
যে আবেগ ধুলো ঝেড়ে আবার উঠেছে
গেছে ছুটে রণক্ষেত্রে
দীর্ঘ দীর্ঘবেলা...

সূর্য পাটে নামে, তবু
যে ফেরেনি হয়তো বা ফিরবে না—
কিন্তু, আবার কি ফেরা যাবে
কেন্দ্রাতিগে? উজানগঙ্গায়?
সেই উৎসে?

অভিজ্ঞার যে প্রহার সময়ের অধরোষ্ঠে
চুম্বনচিহ্নের মতো রক্তাক্ত ও স্বাদু
যার স্মৃতি তীব্র অ্যালকোহলের মতো
রক্তে নাচে, প্রলয় ঘটায়
তারপর, তারপর?

নৈশ-আহারের গল্প

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সেদিনও
গঙ্গা মানে ছিল রক্তগঙ্গা,
পাঁচনবাড়ি নেই
তাই রিভলভার হাতে ছুটে আসত রাখাল-বালক,
ভাতের থালার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত
পঞ্চমুখী ছুরির ছায়া···

এখন
নারী আর অন্ধকারের মাঝখানে
মুখোশের মতো ঝুলতে থাকে আমাদের মুখ,
এখন
সারারাত শরীরের তুলনামূলক ব্যবহার',
সারারাত সতর্কীকরণ,
বিপ্লবের লাশ কাঁধে
কয়েকটি বিপ্লবীর অবিরাম কুচকাওয়াজ—

কিছু বুঝে ওঠার আগেই
মধ্যসমুদ্রের বুক ভেঙে উঠে আসা আগুনের ছোবলে
খাক হয়ে যায় আমাদের পড়োশির সংসার

হা ব্রেশট-লিখিত সুসমাচার,
আমরা বেমালুম ভুলে গেছি
খুন-খারাবির ফাঁকে ফাঁকে
একদিন আমাদেরও নৈশ-আহার সেরে নিতে হত

মায়া নয়

রত্নেশ্বর হাজরা

আমার উত্তর দিকে ডান হাত ওড়ায় ফানুস
দক্ষিণে ওড়ায় বাম হাত
শিমুল তুলোর মতো মেঘ
পায়ের চারপাশে ঘোরে নাগ—
ব্রহ্মবাদীদের ব্রহ্ম—বস্তুত আমার
মানুষ মানুষ
অমিলেও ওড়ায় পরাগ।

আমার এক হাতে তুলি অন্য হাত ডুবেছে পরাগে
পটভূমি জটিল সময়
যদিও ভোলায় কিম্পুরুষ
নিয়োজিত ওদের—তথাপি
আমার রঙের সমন্বয়ে উড্ডীন ফানুস।
মায়াবাদীদের কাছে মায়া
আমি দেখি চারদিকে আমার
দ্বান্দ্বিক মানুষ।

নষ্ট হচ্ছে না

তুলসী মুখোপাধ্যায়

একটা নষ্ট মানুষও একতিল নষ্ট হচ্ছে না
বরং দিন দিন নাদুস নুদুস
অপ্রতিহত শ্রী ও প্রতাপে
একটাও নষ্ট প্রতিকৃতি বিন্দুমাত্র বিনাশ হচ্ছে না
বরং দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বেড়ে যাচ্ছে তার ফুলের বাগান
ক্রমশই সিঁড়ি উঠছে বশংবদ অমল আকাশে
পয়োমস্ত অন্তর্বাস খুলে
ক্রমশই ধরণী ঢুকছে তার মাংসাশী দারুন খামারে।

একটা নষ্ট মানুষও আজ অব্দি নষ্ট হল না।
বরং দিন দিন নধরকান্তি
বশীভূত ফ্যাট ও প্রোটিনে
অথচ হাজার হাজার বুকে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর জীবনী
মার্কস ও লেনিন উড়ছে মুখ থেকে মুখে
হাতে হাতে চে গেভারার গেরিলা রাইফেল
এবং··· এবং...
গল্প গাথা কবিতা নাটকে রক্তমাখা প্রসিদ্ধ চিৎকার।

একটা নষ্ট মানুষও একতিল নষ্ট হচ্ছে না।

নবজাতকের কান্না বেজে ওঠে

সত্য গুহ

সরাসরি একটা কথাই বলা যায়
এখন সময় খুব ভালো নয়
দিন ভোর থেকেই মেঘলা, দিনের বেলায়
প্রতিটি মানুষকে খুব অস্বাভাবিক মনে হয়

ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি পড়ে
চোখ জুড়ে জুড়ে গড়া একখানা অনন্ত আকাশ
শোক দুঃখ ব্যথা জ'মে অন্ধকার ব্যাপ্ত স্তরে স্তরে
কখনো যদি বা চাঁদ, এ গ্রহ প্রত্যক্ষ করে বেহুলার
কলার মান্দাস

ভেসে যায়, বৃষ্টি হয় রয়ানীর মতো
নক্ষত্রের আর্ত দৃষ্টি মেঘের ফাঁক-ফোকরে, সব
গতিবিধি স্তব্ধ—সব ভাষা সুর নির্মাণ ব্যাহত
আদিগন্ত প'ড়ে যেন তান্ত্রিকের সাধনার শব

কূট ষড়যন্ত্র চলছে, কাঠকুটুম্ব নিষ্ঠুর দরদী
দিন দায়সারা-গোছে আসে, হায়, হৃদয়ের রস-রক্ত
ইচ্ছা শুকায়
এ জালা কি চলবে নিরবধি ?
প্রশ্ন হয় নিরুচ্চার, নবজাতকের কান্না বেজে ওঠে কংসের কারায়।

তোমার আবির্ভাবে

আশিস সান্যাল

আমার দুচোখে যত স্বপ্ন আছে
সব কেড়ে নাও।
বহমান নির্জন আঁধারে
আমি আর
রঙীন ফানুস উড়িয়ে বলতে চাই না :
একদিন তোমার আবির্ভাব
জবা-কুসুম ভোরের মতো
নিরভ্র ভালোবাসায় ভ'রে দেবে চতুর্দিক।

কুটিল ঘৃণ্যতায়
আজ আমি আহত।
একদিন
বুকের দরজায়
শীর্ণা হীরার প্রিয় মসৃণ আঘাতে
যে তুমি
আমার কৈশোর চোখে জ্বালিয়েছিলে
স্বপ্নের প্রদীপ—
সে তুমিই আজ হিংস্র অজগরের মতো
বিষের আগুনে
দহন করছ আমার সমস্ত শরীর।

বা সে অর্থে দেশের কাজ করিনি। কিন্তু জর্জদার কণ্ঠে গণনাট্য সংঘের গান শুনতে শুনতে আমার শরীরের রক্ত গরম হয়ে উঠত। "অবাক পৃথিবী" গানটা অনেকবার শুনেছি। খুব ইচ্ছে করত অমন করে গাইতে। কিন্তু আমার গলায় সেভাবে আসত না।

আর একজন গুণীজনের সংস্পর্শে এসেছিলাম—তিনি বটুকদা। গোড়ায় বটুকদাকে দূর থেকে চিনতাম—বটুকদার কণ্ঠে ধ্রুপদ-ধামারের ওপর প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসঙ্গীত খুব ভালো লাগত। কিন্তু মানুষটির সঙ্গে তখন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। গত বছর বটুকদার অনেকটা কাছাকাছি এসেছিলাম। তখন 'নবজীবনের গান' শোনার সৌভাগ্য হয়। ওরকম গান আগে কখনও শুনিনি। গত বছর রবীন্দ্র-সপ্তাহে বটুকদাকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করেছিলাম। সেখানে তিনি 'নবজীবনের গান' পরিবেশন করেন। গান ও সঙ্গীতভবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বটুকদার সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছি।

ঠিক হল সঙ্গীতভবনের একটা সেমিনার হবে। এ ব্যাপারে বটুকদার সঙ্গে আলোচনার জন্য কলকাতা এসে শুনলাম তিনি হায়দ্রাবাদ গেছেন। যেদিন ফেরার কথা সেদিনই আমি বটুকদার সঙ্গে দেখা করার জন্য আবার কলকাতায় ছুটে আসি। মর্মান্তিক ঘটনার কথা শোনামাত্র দৌড়ে গেলাম বটুকদার বাড়িতে। দেখলাম বরফের চাঁইয়ের ওপরে বটুকদাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মুখখানা শ্রান্ত, প্রসন্ন।

বটুকদা মানুষ হিসেবে একদম ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। কারুর সঙ্গে মিল পাই নি। মৃত্যুর পরের দিন বটুকদার বাড়িতে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে অনেক-গুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আমার শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালাম। বটুকদা একজন বড় সাধক ছিলেন। এরকম মানুষ ও সাধকের আবির্ভাব একবারই হয়।

অন্যান্য গান ভালো লাগার প্রশ্নে আবার গণনাট্য সংঘের গানের কথাতেই আসা যাক। যদিও গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে আমার কোনোদিন কোনো যোগ ছিল না, কিন্তু গানগুলির কথা, সুরের বৈচিত্র্য, গাইবার জোরালো ভঙ্গী···সবকিছুই আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করত। এখনও ঐসব গান শুনলে শরীরের রক্ত টগবগ করতে থাকে।

এদিকে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত তো আমার মজ্জায় মজ্জায়। কিন্তু যখন গণনাট্য সংঘের গান শুনি তখন কোথায় শাল পিয়ালের গন্ধ, কোথায়ই বা রবীন্দ্রসঙ্গীত—সব যেন মন থেকে মুছে যায়। তখন আমিও

সাময়িকভাবে ঐসব গানেরই অংশীদার হয়ে পড়ি। অবশ্য আমার গলায় ঐসব গান আসত না। মনে মনে গাইতাম।

এই প্রসঙ্গে জীবনের একটা দুঃখের কথা না বলে পারছি না। আমি সলিল চৌধুরীর গানের একজন ভক্ত। সলিলের দেওয়া সুরে হেমন্ত মুখার্জির কণ্ঠে 'রানার' ও 'পাল্কী চলে' গান দুটি আমার ভালো লেগেছে। সলিলের গান যে আমার ভালো লাগে—সেকথা সলিলও জানে। ওর গান রেকর্ড করার খুব ইচ্ছে জেনে সলিল আমারই জন্য দুটো গান লিখে তাতে সুর বসাল। একটা গানের কলি মনে আছে "আমার কিছু মনের আশা"। অপরটির কথা ভুলে গেছি। সলিল খুব যত্ন করে শিখিয়ে দেওয়ার পর H.M.V. তে আমার গান দুটি রেকর্ড করা প্রায় ঠিক। এমনসময় বিশ্বভারতীর তৎকালীন কর্তৃপক্ষ থেকে কড়া নির্দেশ এলো রবীন্দ্রসঙ্গীত বাদে আর কোনো গান রেকর্ড করা চলবে না। খুব মন খারাপ হয়ে গেল। সেই বাসনা আজও পূর্ণ হয় নি। এই দুঃখ আমার মনে এখনও বিঁধে রয়েছে।

অনেকে মনে করেন গান ছাড়া আমার বোধহয় আর কোনো কাজ বা দায়িত্ব নেই। আমি তো সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন নই। আমারও অনেক পারিবারিক সামাজিক দায়-দায়িত্ব আছে। তবে একথা ঠিক সংসার সম্বন্ধে দায়িত্ব থাকলেও—সেখানে আমার আসক্তি কম। বাড়িঘরসংসার আছে বলে তাকে আঁকড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আগে আমার গান তারপরে বাকি সব। কিন্তু শুধু গান নিয়েই জীবন চলে না। সমাজের যে কোনো সংকটমুহূর্তে গাইয়েদেরও ভূমিকা আছে। আমার কাজের জগৎ হচ্ছে বিশ্বভারতীর ভেতরে এবং শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের আশপাশের অঞ্চল-গুলি। আমি ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনে রয়েছি। গুরুদেবের আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে আমার সাধ্যমতো অংশগ্রহণ করছি। আমার হাত দিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী বেরিয়েছে—অনেকেই তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেজন্য আমি গৌরব বোধ করি।

আমাদের উপাচার্য মহাশয় গুরুদেবের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্রতী হয়ে অনেক নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন ভবনে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে এনে ভবনগুলির নিজ নিজ কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছেন। শান্তিনিকেতনের আশেপাশের গ্রামের মানুষদের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া সূত্রকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পল্লীচর্চা বিভাগ স্থাপন

করেছেন। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বিক্রম রায় বর্মন সেখানে অধিকর্তা হিসেবে যোগ দিয়েছেন। সহকর্মী ও ছাত্রদের নিয়ে আমরা বিভিন্ন ভবনগুলির অধ্যক্ষরা গ্রামে যাই—সেখানে গান করি, গান শেখাই এবং নিরক্ষরতা দূর করার কাজে অংশ নিই। গুরুদেব যে সমস্ত সাঁওতাল-দের শান্তিনিকেতনে এনে বসিয়েছিলেন, তাদের অস্তিত্ব প্রায় মুছে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বর্তমানে তাদের পুনর্বসতি, জলের ব্যবস্থা, শিক্ষা ইত্যাদি নানারকম জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে সেগুলি কার্যকরী করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরাও সেসব কাজে আমাদের দায়িত্বটুকু পালন করার চেষ্টা করছি। আগে কেবল গান শেখাতাম আর গান গাইতাম। বর্তমানে তার সঙ্গে আরও অনেক কাজের দায়িত্ব এসে পড়েছে। বিশ্বভারতীর ভেতরে ও বাইরে নানা সমস্যা, ছাত্রছাত্রীদের ভালোমন্দ, গ্রামগুলোতে যাওয়া, পারিবারিক দায়িত্ব—সব মিলিয়ে মুহূর্তের অবকাশ নেই।

ভেবে দেখছি এ-ই আমার ভালো। মানুষের কাছে শিল্পের কাছে আশ্রম ও গুরুদেবের কাছে ঋণ তো আমার সামান্য নয়! নিজেকে উজাড় করে কাজ করে আর গান গেয়ে তার যেটুকু শোধ হয়।

অনুলিখন ঃ বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়

অরণ্য-গ্রাস

প্রেমেন্দ্র মিত্র

চোখের ওপর তোমায় আমি
বদলে যেতে দেখছি, বন্ধু !
তুমি নিজে কি তা জানো না ?
তোমার হাত আর পায়ের পাতাগুলো
থাবা হয়ে যাচ্ছে।
নির্মম বাঁকা সব নখ বাড়ছে
সে থাবায়
হিংস্র লুব্ধতায় !
দীর্ঘ সর্পিল হয়ে উঠছে ক্রমশ
তোমার শরীর,
সর্পিল আর শীতল পিচ্ছিল
বিবর-বিলাসী সরীসৃপের মতো

অরণ্য তুমি পেছনে ফেলে এলে
অনেক দূরে ধূসর স্মৃতির দিগন্তে,
কিন্তু অরণ্য নিঃশব্দে এসেছে
তোমার পিছু পিছু।
তোমার দুর্গ-ঘেরা
সমস্ত পরিখা ডিঙিয়ে
তোমার সমস্ত সাঁজোয়া পাহারা
ভেদ ক'রে,
লালসা হয়ে তা তোমার
দিনের প্রহরগুলোর মুখে
লালা ঝরায়,
তোমার রাতের দুঃস্বপ্ন-মথিত অন্ধকার
আতঙ্ক হয়ে
বিদীর্ণ করে আর্তনাদে।

তোমার ভেতরের শ্বাপদটা
ক্রমশ তোমাকে চতুষ্পদ ক'রে তুলছে।
তা কি টের পাচ্ছ না বন্ধু ?
কঠিন হয়ে আসছে ক্রমশ
তোমার স্কন্ধের পেশী,
মুখটা মাটিতে নামিয়ে রাখতেই
তোমার স্বাচ্ছন্দ্য।
শুধু চোখ দুটো
এখনো তুমি তুলতে পারো আকাশে।

তাই এবার তোলো বন্ধু।
আকাশের নীল বিস্ময়
এখনো তোমার দুচোখ বেয়ে নেমে
অমোঘ অরণ্য-গ্রাস থেকে
তোমায় উদ্ধার করতে পারে।

খেতে পাবে তখন

গোলাম কুদ্দুস

ফুটফুটে তারাভরা আকাশের তলায় শুয়ে আছি।
সারা আকাশ যেন মুক্তোর চুমকি বসানো শাড়ি,
দেখে আমার আশ মেটে না।
পাশের লাইন দিয়ে চ'লে যায় গিরিডির ট্রেন,
তার কামরাগুলো থেকে ছিটকে আসে
হীরকচ্ছটা।

আরো দূরের লাইনটা দিয়ে চ'লে যায় দূরপাল্লার ট্রেন
দিল্লি, পাঠানকোট, অমৃতসরের দিকে,
হুইসেলের তীক্ষ্ণ তানে তাকিয়ে দেখি
দীর্ঘ একগাছা আলোর মালা
ছুটে মিলিয়ে গেল আলেয়ার মতো।
ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়ি।
রাতজাগা প্রহরীর হাঁক জাগিয়ে দেয়,
কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ক'রে ডাকে,
উঠে বসি জনবিরল নগরের
বিশাল আঙিনাবেষ্টিত নিরালা বাড়িতে,
টর্চ জ্বেলে ঘুরি নিশাচরের সন্ধানে।

সকালে উঠে দেখি নীচু মাঠের আল ভেঙে
গোয়ালারা চলেছে বাজারে,
কৃষকরা লাঙল কাঁধে গরু নিয়ে নেমেছে মাঠে।
উদয়ভানুর পাশ কাটিয়ে
আমার দৃষ্টি চ'লে যায় অস্পষ্ট সুদূর
দেওঘরের ত্রিকুট পাহাড়ে।
চমক ভাঙে কোকিলের ডাকে!
কোত্থেকে এলেন বসন্তসখা ঘোর গ্রীষ্মকালে!
মধুমাস কেটে গেলে মধুকণ্ঠরা কোথায় যান
এতাবৎ তার পাইনি হদিশ,

এবার আবিষ্কারের আনন্দে তাদের ঠিকানা পেলাম
এখানকার আম, জাম, নিম, তেঁতুল পাতার আড়ালে।
কুহু-কুহু কোরাসের দোলাতেই কি
দুলতে থাকল লাল ডালিম ফুলে ভরা ডালপালা
আর পাতলা শিরিষ পাতা।

দুপুরের দাবদাহে দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে আমি বন্দী।
নিদ্রাহীনতার সঙ্গে সন্ধি ক'রে
বই পড়ি ময়লা শার্সির পাশে ম্লান আলোয়।
কখনো বা ঈষদোন্মুক্ত দরজার ফাঁকে চোখে পড়ে
মালির গরুটা ঘুরে বেড়াচ্ছে তার খাস তালুকে
রক্তজবা, কলাফুল আর পেয়ারা বাগানে
একটু ঘাসের ডগার আশায়।
না পেয়ে থমকে এসে দাঁড়াল বন্ধ গেটের সামনে,
নিরুপায় ফিরে এসে বারান্দার ওধারে
শুকনো বিচালির ছড়ানোছিটানো ভগ্নাংশ
মুখে পুরছে জিভ দিয়ে চেটে চেটে।
শেষে তৃষ্ণার্ত গরুটা চক্কর দিতে লাগল সারা বাড়ি।
সকালে একবার মাত্র ওকে জল দিয়েছিল
বিহারী মেয়েটা, যাকে দেখতে ঠিক সাঁওতালনির মতো।
আমাদেরও সে জল দেয় ইঁদারা থেকে টেনে তুলে।
কদিন থেকে তার খাওয়াদাওয়া জুটে যাচ্ছে
অসময়ে আগত আমাদের ফাইফরমাসের দরুণ,
আপনা আদমির জন্যও রুটিতরকারি নিয়ে যেতে ভোলে না সে
মলিন আঁচলের তলায় লুকিয়ে,
আমরা দেখেও দেখি না,
ক্ষুধার্ত বাটলি কুকুরটারও বুঝতে বাকি থাকে না,
সে যায় ওর পিছু পিছু, কিছু কিছু ভাগের আশায়।
না পেয়ে ফিরে আসে,
আমাদের পায়ে পায়ে ঘোরে,
যা পায় তাই খায়,

চা-বিস্কুটও রপ্ত হয়ে গেল তার এইভাবে

সীজ্‌নের চেঞ্জারদের জন্যে
এখানে প্রত্যেকে প্রতীক্ষাব্যাকুল,
মানুষ, গরু, কুকুর
সবাই খেতে পাবে তখন।

একটি আধা গ্রাম্য কবিতা

ধনঞ্জয় দাশ

আমার দিদিমা
সেই ফোকলা মুখ, সাদা চুল
ডাকসাইটে দিদিমা
বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে
পিঠ কুঁজো ক'রে বলতেন,
তোরা আমাকে কি ভাবিস, বল তো?
বোস-বাড়ির পচা পুকুরের পাঁকের মতো
গা ঘিন ঘিন করা কেচ্ছা, আমি সব জানি।
ঐ বিপ্লব নামে ছোকরা
ইদানীং রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে
কোনো কিছু গ্রাহ্যি না ক'রে
গোঁয়ার-গোবিন্দের মতো কোথায় যায়
শিরিষ গাছের পাতার আড়ালে
সূর্যি ডুবতে না ডুবতে কার ঘরে
চিৎপটাং হয়
আর কোন সোহাগীর আঁচলে মুখ মুছে
একটানে গনগনে কল্কে ফাটায়
আমি কিছুই জানিনে বুঝি, না?
সব জানি, কিন্তু বলব না।

কারণ, আমাদের ঢেঁকি নেই
অথচ শালি ধানের সরু চিঁড়ে কুটতে হবে
আমি এসব রটনা করছি জানলে
দজ্জাল বোস-গিন্নী, দেবে
ওদের ঢেঁকিতে আমাকে চিঁড়ে কুটতে দেবে ?
না, কক্ষনো না
তাই কেচ্ছার হাঁড়িটাও আমি কোনোদিন
হাটে ভাঙব না।

তা মুখুজ্জেদের তো ঢেঁকি নেই
চিঁড়ে কুটবার জন্যে ওদের দুয়ারে হত্যেও দিতে হবে না,
তবু মুখুজ্জেদের রসালো কথাগুলো
তুমি বলছ না কেন, দিদিমা ?
তুমি কি ছ্যাখোনি, তলোয়ারের মতো ঐ ধিঙ্গি···
হ্যাঁ, হ্যাঁ, মুখুজ্জেদের ঐ মেয়েটা
কী যেন নাম—মিনতি, না মিতা
গায়ে হলুদ মেখেও বিয়ের পাকা সম্বন্ধটা
কেমন ভাবে কেঁচে দিল, তারপর একদিন
ঘুটঘুটে অন্ধকারে উধাও হল
আর ফিরে এল না···
তুমি কি জানো, সে এখন উন্মাদিনী হয়ে
ভালোবাসার বিকল্প খুঁজছে
শহর কলকাতায়, বাবুদের বনেদী পাড়ায় ?
এসব জেনেশুনে মুখে কুলুপ এঁটে
তুমি ব'সে আছ কেন, দিদিমা ?

বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দেওয়া পিঠকুঁজো দিদিমা
এবার সটান হয়ে বসলেন,
ঘোমটাটানা কচি বউ-এর মতো
ফিসফিস গলায় বললেন :
তুই বাছা, একটা আস্ত হাঁদারাম

মুখুজ্জেদের চিঁড়ে কোটার ঢেঁকি নেই, ঠিক কথা
কিন্তু ওদের সুন্দর শান বাঁধানো নদীর ঘাট আছে
আমাদের নৌকোগুলো সেখানে বাঁধা থাকে না ?
এসব কথা রটলে, দেবে
ওরা সেই ঘাটে আমাদের নৌকোগুলো আর বাঁধতে দেবে ?

ভদ্রমহোদয়গণ, এবার আপনারাই বলুন
আমি কি দিদিমাকে অনুসরণ করব ?
অর্থাৎ, ঢেঁকিতে চিঁড়ে কুটতে দেবে না ব'লে
ঘাটে নৌকো বাঁধতে দেবে না ব'লে
আমি কি চিরকাল মুখে কুলুপ এঁটে ব'সে থাকব ?

কেন্দ্রাতিগে যাওয়া যায় ?

বিতোষ আচার্য

কক্ষ থেকে যেভাবে এসেছি, বাইরে
　　বৃহত্তর বলয়ের টানে
　　　　হন্যে দিনগুলো
　　যেভাবে ঘামে ও রক্তে
　　　　একাকার, একাকার আলোআঁধারিতে-
　　উজান গঙ্গায়
আবার কি ফেরা যায় গোমুখের পথ চিনে চিনে
　　　　কেন্দ্রাতিগে :
　　আযুক্ত আরব্ধ-কর্ম সুকঠোর
　　　　তৌলদণ্ডে ওঠে নামে
　　　　　　একঠায় থামে না
　　　　　　　না, না...

দুপাশে কুয়াশা, আঁধি
তীররেখা ঝাপসা ও সুদূর
লোকালয় অবলুপ্ত :
পৃথিবীর বয়স্ক বলিতে ঠুলিবদ্ধচোখে
বৃত্র-সংহার-পর্ব অভিনয়
অন্ধ পদক্ষেপে
আজো চলে, চলেই.

কক্ষ থেকে যেভাবে এসেছে ছুটে
যে দুর্দম ঘূর্ণাবেগ সুদর্শনচক্রের স্বরূপে
ছিন্নভিন্ন করেছে কংসকে
যে আবেগ ধুলো ঝেড়ে আবার উঠেছে
গেছে ছুটে রণক্ষেত্রে
দীর্ঘ দীর্ঘবেলা...

সূর্য পাটে নামে, তবু
যে ফেরেনি হয়তো বা ফিরবে না—
কিন্তু, আবার কি ফেরা যাবে
কেন্দ্রাতিগে ? উজানগঙ্গায় ?
সেই উৎসে ?

অভিজ্ঞার যে প্রহার সময়ের অধরোষ্ঠে
চুম্বনচিহ্নের মতো রক্তাক্ত ও স্বাদু
যার স্মৃতি তীব্র অ্যালকোহলের মতো
রক্তে নাচে, প্রলয় ঘটায়
তারপর, তারপর ?

নৈশ-আহারের গল্প

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সেদিনও
গঙ্গা মানে ছিল রক্তগঙ্গা,
পাচনবাড়ি নেই
তাই রিভলভার হাতে ছুটে আসত রাখাল-বালক,
ভাতের থালার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত
পঞ্চমুখী ছুরির ছায়া···

এখন
নারী আর অন্ধকারের মাঝখানে
মুখোশের মতো ঝুলতে থাকে আমাদের মুখ,
এখন
সারারাত শরীরের তুলনামূলক ব্যবহার',
সারারাত সতর্কীকরণ,
বিপ্লবের লাশ কাঁধে
কয়েকটি বিপ্লবীর অবিরাম কুচকাওয়াজ—

কিছু বুঝে ওঠার আগেই
মধ্যসমুদ্রের বুক ভেঙে উঠে আসা আগুনের ছোবলে
খাক হয়ে যায় আমাদের পড়োশির সংসার

হা ব্রেশট-লিখিত সুসমাচার,
আমরা বেমালুম ভুলে গেছি
খুন-খারাবির ফাঁকে ফাঁকে
একদিন আমাদেরও নৈশ-আহার সেরে নিতে হত

মায়া নয়

রত্নেশ্বর হাজরা

আমার উত্তর দিকে ডান হাত ওড়ায় ফানুস
দক্ষিণে ওড়ায় বাম হাত
শিমুল তুলোর মতো মেঘ
পায়ের চারপাশে ঘোরে নাগ—
ব্রহ্মবাদীদের ব্রহ্ম—বস্তুত আমার
মানুষ মানুষ
অমিলেও ওড়ায় পরাগ।

আমার এক হাতে তুলি অন্য হাত ডুবেছে পরাগে
পটভূমি জটিল সময়
যদিও ভোলায় কিম্পুরুষ
নিয়োজিত ওদের—তথাপি
আমার রঙের সমন্বয়ে উড্ডীন ফানুস।
মায়াবাদীদের কাছে মায়া
আমি দেখি চারদিকে আমার
দ্বান্দ্বিক মানুষ।

নষ্ট হচ্ছে না

তুলসী মুখোপাধ্যায়

একটা নষ্ট মানুষও একতিল নষ্ট হচ্ছে না
বরং দিন দিন নাদুস নুদুস
অপ্রতিহত শ্রী ও প্রতাপে
একটাও নষ্ট প্রতিকৃতি বিন্দুমাত্র বিনাশ হচ্ছে না
বরং দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বেড়ে যাচ্ছে তার ফুলের বাগান
ক্রমশই সিঁড়ি উঠছে বশংবদ অমল আকাশে
পয়োমন্ত অন্তর্বাস খুলে
ক্রমশই ধরণী ঢুকছে তার মাংসাশী দারুন খামারে।

একটা নষ্ট মানুষও আজ অব্দি নষ্ট হল না।
বরং দিন দিন নধরকান্তি
বশীভূত ফ্যাট ও প্রোটিনে
অথচ হাজার হাজার বুকে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর জীবনী
মার্কস ও লেনিন উড়ছে মুখ থেকে মুখে
হাতে হাতে চে গেভারার গেরিলা রাইফেল
এবং··· এবং...
গল্প গাথা কবিতা নাটকে রক্তমাখা প্রসিদ্ধ চিৎকার।

একটা নষ্ট মানুষও একতিল নষ্ট হচ্ছে না।

নবজাতকের কান্না বেজে ওঠে

সত্য গুহ

সরাসরি একটা কথাই বলা যায়
এখন সময় খুব ভালো নয়
দিন ভোর থেকেই মেঘলা, দিনের বেলায়
প্রতিটি মানুষকে খুব অস্বাভাবিক মনে হয়

ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি পড়ে
চোখ জুড়ে জুড়ে গড়া একখানা অনন্ত আকাশ
শোক দুঃখ ব্যথা জ'মে অন্ধকার ব্যাপ্ত স্তরে স্তরে
কখনো যদি বা চাঁদ, এ গ্রহ প্রত্যক্ষ করে বেহুলার
কলার মান্দাস

ভেসে যায়, বৃষ্টি হয় রয়ানীর মতো
নক্ষত্রের আর্ত দৃষ্টি মেঘের ফাঁক-ফোকরে, সব
গতিবিধি স্তব্ধ—সব ভাষা স্বর নির্মাণ ব্যাহত
আদিগন্ত প'ড়ে যেন তান্ত্রিকের সাধনার শব

কূট ষড়যন্ত্র চলছে, কাঠকুটুম্ব নিষ্ঠুর দরদী
দিন দায়সারা-গোছে আসে, হায়, হৃদয়ের রস-রক্ত
ইচ্ছা শুকায়
এ জ্বালা কি চলবে নিরবধি ?
প্রশ্ন হয় নিরুচ্চার, নবজাতকের কান্না বেজে ওঠে কংসের কারায়।

তোমার আবির্ভাবে

আশিস সান্যাল

আমার দুচোখে যত স্বপ্ন আছে
সব কেড়ে নাও।
বহমান নির্জন আঁধারে
আমি আর
রঙীন ফানুস উড়িয়ে বলতে চাই না :
একদিন তোমার আবির্ভাব
জবা-কুসুম ভোরের মতো
নিরভ্র ভালোবাসায় ভ'রে দেবে চতুর্দিক।

কুটিল ঘৃণ্যতায়
আজ আমি আহত।
একদিন
বুকের দরজায়
শীর্ণা হীরার প্রিয় মসৃণ আঘাতে
যে তুমি
আমার কৈশোর চোখে জ্বালিয়েছিলে
স্বপ্নের প্রদীপ—
সে তুমিই আজ হিংস্র অজগরের মতো
বিষের আগুনে
দহন করছ আমার সমস্ত শরীর।

মানবতা এখন তোমার
সৌখীন আবরণ।
ইচ্ছে করলেই
সমস্ত শরীর উন্মোচিত ক'রে
দেখাতে পারো
ক্ষত অঙ্গের গোপন পঙ্কিলতা।

হরিণ শাবকের মতো অসহায়
ব'সে থাকি সমস্ত দিন।
ভয়ে কাঁপতে থাকে সমস্ত শরীর।

যদি তোমার
সেই কৃতঘ্ন উলঙ্গ শরীর
বাঘের মতো ঝাপটে ধরে আমাকে—
তাই
তোমার হাতে জ্বালানো সেই দীপশিখা
নিভিয়ে
বেরিয়ে আসতে চাই
জন-অরণ্যে।
বহমান নির্জন আঁধারে
আমি আর
রঙীন ফানুস উড়িয়ে বলতে চাই না :
তোমার আবির্ভাবে
মঙ্গলময় হোক চতুর্দিক।

মধ্যরাত

কালীকৃষ্ণ গুহ

মশারির ভিতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসো তুমি। বেরিয়ে এসে
কী দেখতে পাও ?
তোমার চারপাশে হাহা ক'রে ওঠে নিদ্রা-জড়িত অতীত, যাকে তুমি
যাকে তুমি স্পর্শ করতে চেয়েছ

তোমার চারপাশে হাহা ক'রে ওঠে ধর্ম ও অকম্পিত যুদ্ধক্ষেত্র, যাকে তুমি

বুঝতে চাও নি কখনো

তোমার চারপাশে হাহা ক'রে ওঠে রেনেসাঁসের শিল্পী-গোষ্ঠী, চর্যাপদ, ডোম—

মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তুমি স্তম্ভিত হয়ে লক্ষ্য করো,

কলমের পাশে প'ড়ে-থাকা এক দিস্তে সাদা কাগজ

তোমাকে শুধুই লিখে যেতে বলছে কবিতা—

রক্তের বিষয়ে, যুদ্ধ ও অতীত কাল বিষয়ে, ধর্ম বিষয়ে, ডোম ও শিল্পকলা বিষয়ে

একের পর এক কবিতা

হায়, তোমাকে শুধুই লিখে যেতে বলছে!

শীতল হত্যা

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

এতটা শীতল হত্যার প্রয়োজন ছিল কিনা

এত হাহাকার

এত মৃত্যুর তাণ্ডব তাড়াহুড়ো

এত লাঞ্ছনা প্রাপ্য কি হেতু হল

এত মৃত্যুর আহ্বান কেন অতর্কিতে

যদি ব'লে দাও

পুনরায় বলিদানের পূর্বে

সংশোধনের জন্য রেখেছি মস্তক।

সময় এবং আলোকবর্তিকাবিষয়ক কবিতা

মুকুল গুহ

গুহাগাত্রে সহস্র হরিণ ছুটে যায়,　　তরুশীর্ষে
মধ্যগগনের চাঁদ,　　গভীর ভালোবাসার গল্প,
তাজা রক্তে বন্ধ হয়ে আসে সমস্ত ছিদ্রপথ—

উদ্বাস্তু এলাকা জুড়ে গৃহনির্মাণের গল্প, চাষের গল্প
সেচের জল টেনে আনার গল্প,　　মধ্যরাতে
কেউ ডেকে উঠলেই পূর্ণিমায় বাহিরে মধু ঝরে,

আর সময় হয় শেষ যুদ্ধযাত্রার,　　সময় হয়।

আমি যাই

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

এই নাও, লাল বল
আমার বাল্যের অভিমান

আর এই রাজহাঁস
একদা দীঘির জলে আকাশের ছায়া দেখে
ডেকে উঠেছিল।

তোমাকে দিলাম এই মাটি।

এ মাটি ম্যাজিক জানে,
এ মাটিতে বোধিদ্রুম জল নিয়েছিল।

শোক নাও, দুঃখ নাও, অপমান নাও

আর এই
চোখের জলের দীর্ঘ ছলছল ভাদ্দরের নদী।

আমি যাই,
আমি যে শুনেছি অন্য আকাশের ডাক,
আমি ধর্মত্যাগী।

শব্দ থেকে গান, মৃত্যু থেকে জীবন

রবীন সুর

কিছু কিছু শব্দ গান হয়ে বেজে ওঠে
ইন্দ্রধনু রঙের আকাশ অয়নান্ত সমারোহে
অনেক সময় শত শতাব্দীর অরোরাবোরিয়ালিস-এর স্থিরচিত্র
একেক মুহূর্ত
ইতিহাসের মুখ ঘুরিয়ে দেয়
যেখানে জীবন মুক্তি সূর্য স্বাধীনতা মানুষের অধিকার
উদয়ের অনন্তকাল যোগিয়া বাহার
এইরকম একেকটি মৃত্যুর ঘটনা
দেশকাল পরিব্যাপ্ত উজ্জীবনের বীজ হয়ে যায়
প্রাণে প্রাণে পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষিত পরিত্রাণে আলো হাওয়া অফুরন্ত বাঁচা।

মৃত্যুঞ্জয় গানগুলির জন্য চাই মন্ত্রের মতো শব্দ স্বরলিপি
রাজপথ চোরাগলি পেরিয়ে এড়িয়ে
ইতিহাসের সঠিক দিগন্ত
দুর্গতির নির্বিঘ্ন উদ্ধার
দেশ কাল মনীষার ঘুম নেই পাহারায় প্রাপ্তির মোহানা।

এখন অপেক্ষা ধৈর্য রক্ত ঘাম তীব্র অভিঘাত
একা একা বীজের মতন ভেঙে

মহামহীরুহ ব্যাপ্ত প্রত্যাশার
যুথবদ্ধ আগ্রহের ডালপালা পাতায় পল্লবে
ভিতরে বাহিরে
হাতের ভিতরে হাত পুবে ও পশ্চিমে
পাশাপাশি—গোলার্ধের উত্তরে দক্ষিণে
উপত্যকা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভাগীরথী উদ্ধারের গান
নদীর ভিতরে নদী
সমুদ্র সমুদ্র মুক্তি মোহানার বিরাট বিশাল জাগরণ

আগুনের দিকে

অনন্ত দাশ

প্রতিরাত্রে আমি এক অন্ধকার টেবিলের সামনে বসি
তার চারটে পা
শরীরের ভর নিয়ে নিস্তব্ধে ঘুমোয়
স্তিমিত আলোয়
শব্দগুলি ম্লান হয়ে ধোঁকে।
বৈদ্যুতিক তার
ক্লান্ত ধমনীর স্রোতে কতটা উত্তাপ দিতে পারে ?
আমি তা জানি না
শুধু ক্ষোভে ভেঙে পড়ছে আলো
দুঃখে, অপমানে
একটা জীবন যেন আগুনের মতো জ্ব'লে ওঠে।
আজন্মের পোষমানা হাত
দারুণ বিক্ষোভে
একে একে ছুঁড়ে ফেলে
আয়না, রেডিও, ফটো, বই, আলমারি
বন্ধুদের প্রিয় উপহার।
প্রতিদিনের ভাঙাচোরার মধ্যে একটা মানুষ

লাল পতঙ্গের মতো ওড়ে
জীবন নশ্বর জেনে
দৌড়ে যায় আরও ক্রুদ্ধ এক আগুনের দিকে।

বয়স

সুতপা ভট্টাচার্য

এখানে খোয়াই ছিল একদিন, এখন চেনাই দায়
এখন সমস্ত সমতল, ঝকমকে বাড়ি
অবসর-প্রান্তের বাগানে গোলাপ
দু-একটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সান্ধ্যভ্রমণের পথে এইখানে আসে
বর্ণহীন সন্ধ্যা ঢালে অন্ধকার—পারুল-ডাঙায়

এইভাবে উপজায় বর্তমান তবে? ভবিষ্যৎ না-হওয়ার থেকে এ-ই হওয়া?
যা হয় তা লোপ পায় অন্যদিকে
তাই কোনো মানে নেই যদিও বা লোকে আসে যায়
রাসমণ্ডল থেকে মুছে যায় শ্রীরাধার মুখ
রাসমঞ্চ যেন দূর মিশরের পিরামিড
মন্দিরে বিগ্রহ নেই, জড়ো করা আছে শুধু বিগ্রহের শব
বাংলার মুখ মুছে যায়

বয়স, বয়স হয়, আর কিছু কোনোদিন হবার ছিল না
যৌবনের দিন যায় বার্ধক্যের সম্বল সঞ্চয়ে
সমস্ত জীবন জুড়ে যে ফুলের ফুটে-ওঠা—জরা তার নাম
বয়স, বয়স হয় সভ্যতার সমস্ত শব্দের
তারপরে বাকি থাকে টিঁকে থাকা—

শেষ নেই কোনো শুকনো ফুলের শুকিয়ে যাওয়ার

ভবিষ্যৎ না-হওয়ার থেকে এই হওয়া
বলার কিছুই নেই ব'লে যাওয়া অনর্গল কথা
এ ওর মুখের দিকে দৃষ্টিহীন চোখ
মৃত্যু-ভয় বুকে নিয়ে অহরহ অন্তহীন বাঁচা
বর্তমান-হীন এই বর্তমান।

ব্যথা আমার

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যথা আমার যীশুর রক্ত
মুখ তুলে চায়
　　অপাপ বোধের ক্ষমা
আর্দ্র বুকে আহত দাগ
ব্যথা আমার
　　আদর হয়ে যাক!

প্রকৃতিকে আনন্দ

শুভ বসু

জল দাও। রুক্ষ মাঠ, বিস্তীর্ণ প্রান্তর।
এখানে ওখানে আলো জেগে থাকে
কঙ্কালের হাড়ে ও খুলিতে, ফণিমনসার
টানটান হয়ে থাকা শিরার ওপরে খুব
বেদনার্ত বিপন্নতায়, বুড়ো শকুনের
উড্ডীন ডানার থেকে খসে-পড়া বিবর্ণ পালকে ;
কাঁকর, পাথর, বালি ; হায়নার শেয়ালের
চোখের মণির ধূর্ত সর্বভুক জিঘাংসায়
সময়ের বিষ-লাগা গাঢ় নীল দ্যুতির তীব্রতা।

জল দাও। হাজার বছর ধ'রে আমাদের এরকম
প্রান্তর মাড়িয়ে পথ-চলা। দীর্ণ হাহাকার, কান্না;
মৃত্যুর কঠিন চড়ে এলোমেলো হতে হতে টাল
সামলিয়ে ফের খুব রোগা হাতে আত্মীয়ের
হাতের আঙুলে গাঢ় জীবনের উপকথা খোঁজা; এই
পথ চলা আমাদের যূথবদ্ধতার আর অরণ্যবাসের
উজ্জ্বল দিনের শেষে শুরু হল—বেবিলোন
গ্রীস রোম মিশর মেক্সিকো আর বারাণসী হয়ে,
প্যারিস লণ্ডন আর বার্লিন ন্যুইয়র্ক হয়ে
আমরা বিপন্ন পায়ে চ'লে আসছি নাছোড় তৃষ্ণায়
কখন দুহাঁটু মুড়ে তোমার হাতের
গভীর উৎসের কাছে নির্জলা গণ্ডুষ পেতে
দাঁড়াব, খরার আর প্রহারের হীনমন্যতার
ব্যথা গ্লানি বিপন্নতা ভুলে তৃপ্ত সোমত্থ আঙ্গিকে।

আমাদের বুক থেকে টাইরেসিয়াসের জ্বালা,
অয়দিপাউসের চোখে নিজেকে জানার সত্যে
ছিঁড়ে-আসা রক্তের হিংস্রতা, কর্ণের বিপন্নবোধ,
ধুয়ে নিতে একটি গণ্ডুষ জল তোমার মাটির কলসি
কাৎ ক'রে ঢেলে দেবে কবে, কতদিনে?

জল দাও। আসলে নির্বাণ নেই, বোধি নেই; সেই
তুমি যে আশ্চর্য টানে টেনেছিলে তারও চেয়ে
অমোঘ এ টান তীব্র আমাকে সবার সাথে টানে দীর্ণ
সময়ের একমাত্র অনির্বাণ প্রখর তৃষ্ণায়; আজও

কতদূরে তোমার অঞ্জলি?

নিজের ইচ্ছার দিকে

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

মৃৎ-পাত্র ভেঙে দিয়ে
তুমি আর তাকালে না ফিরে

তবে কি পাত্রের জলে খেলা করছে
　　　　মৃত মুখ
ধোঁয়ার অস্ফুট তুলি
　　অবয়ব গ'ড়ে তুলছে ফের !

যার সঙ্গে সুখ ছিল
অমলিন সুখস্বপ্ন ছিল
তাকে এতো ভয় কেন !

আসলে, ইচ্ছার মধ্যে কৃতঘ্নতা ছিল
সাজিয়ে গুছিয়ে দিক তোমার সংসার
　　　　তারপর নির্বাসন ।
কৃষ্টি কীর্তি পরার্থপরতা
　　　　এই সব অনুষঙ্গ
পসরা সাজাতে চাই যতোটুকু ।

মৃৎ-পাত্র ভেঙে দিয়ে
　　　　তাই তুমি ,
নিজের ইচ্ছার দিকে
　　　　তাকাতে পারো না।

শেষ সারির দর্শকের দিকে

শুভাশিস্ গোস্বামী

দেখছি মঞ্চে উঠে ভাবছে সবাই
কখন কিভাবে কোন সংলাপে টেক্কা দেবে কাকে।
আমার তেমন কোনো অভিরুচি নেই,
আমার তেমন কোনো অবকাশ নেই,
আমার লক্ষ্য শুধু টীমওয়ার্ক এবং
শেষ সারির দর্শকের দিকে।
যদি একবার আমি তার কাছে পৌঁছে যেতে পারি,
তবে কারও সাধ্য নেই হাততালি-ধন্য-সংলাপের
ফুৎকারে নেভাবে আমাকে।

মানুষ নামক এক জলন্ত স্ফুলিঙ্গ ছুটে এসে
ভিতরকার বারুদকে ছুঁয়ে-ছেনে দিয়ে বারবার
বহ্নিমান রেখেছে আমাকে।
সময়ের সারাৎসার বুঝে
বাতাসের ঘ্রাণ নিয়ে পথ চলছি আমি ক্রমাগত।
বুঝে নিচ্ছি জীবনের মানে—
সাদামাটা অক্ষরে যা লেখা জীবনের অভিধানে।
তাই যন্ত্রণার, স্বেদের, শ্রমের
দাগ লাগছে কবিতার গায়ে।
কবিতা আমার কাছে তুরুপের তাস নয়, নয়
টেক্কা দেবার হাতিয়ার।

তাই জেনেছি, মেনেছি মনে মনে,
প্রতিযোগিতায় নয়, পরস্পর বোঝাপড়া ক'রে
পৌঁছতে হবে ঐ শেষ সারির দর্শকের দিকে॥

কাকিনাড়ায় প্রবাস

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

দীর্ঘ এই প্রবাস এবার ফিরিয়ে নাও, প্রভু,
ফিরিয়ে দাও আমাকে আমার নিজস্ব ঘরের জানালা।
কতদিন কারো ঠোঁটের শিকড় ছড়িয়ে যায় নি এই ঠোঁটে
আলিঙ্গনে পদ্মপুকুর কেঁপে ওঠে নি এই দেহ।
এই কি আমাদের প্রবাস, প্রভু, প্রবাস আমাদের এই ?

মুসফিরখানা আর হোটেলে তো আমি অনেক ঘুরেছি
দেখেছি সেখানে ব'সে থাকে কাকাতুয়ার মতো ঝিম কয়েকজন মানুষ—
তাদের চোখ নেই, চোখের পলক নেই, তারা
এমন স্থির আঙুলে দেখিয়ে দেয় আমাকে আমার ঘর
যেন আমারই অপেক্ষায় একযুগ জেগে ছিল সেই ঘরের ঝিঁকচোখ অন্ধকার।
ঢুকে যাই, দেখি ব্যবহৃত নারীর মতো ক্লান্ত সেই ঘরের
আনাচকানাচ জুড়ে একদল দাঁতাল কামুকের বেঁচে থাকার আড়ম্বর
যথারীতি ছেড়ে গেছে তারা এই ঘরের উচ্ছিষ্ট উত্তরাধিকার
পরবর্তী আর একদল দাঁতালের জন্য। থমকে দাঁড়াই,
হাওয়ায় পচনের গন্ধ, আর চোখ বুজেও টের পাই আমি
সবই ছিল এই ঘরে—ছিল পুরুষানুক্রমিক শয্যা, দাম্ভিক মুকুর,
ছিল নষ্ট আতর, পর্দায় শ্রাবরক্তকাশি,
শুধু জানালা ছিল না।
এই ঘরই কি আমার একমাত্র উত্তরাধিকার প্রভু, অশ্লীল এই ঘর ?
অস্থির দরজা খুলে বাইরে বেরোই আমি আর দেখি তিনটে গাধা,
ক্লাউন ও নির্বোধ তিনটে গাধা
দেবশিশুর মতো হেঁটে যাচ্ছে ধপধপে সূর্যের নিচে।

কোনো অচিন ধোপার খোঁজে ?

মূর্তি-পূজা

শংকর দে

মাটি খুঁড়ে জল হল সোনা
মূর্তি হল মাটির তুলনা ?

নিজেকে হারিয়ে স্বপ্ন দেখি
মন দিয়ে দেখি অতুলনা।

অন্ধ হয়ে দেখি স্মৃতি নেই
মূর্তি ভেঙে যায় উপাসনা।

আমি একা মাটি হয়ে দেখি
মূর্তি নেই, মাটির বন্দনা ?

ধন্যবাদ, জন্মেছিলাম এ গ্রহে

বিপ্লব মাজী

বাইরে বৃষ্টি…

ছাঁট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে ঘরের কাচ,
উইধরা বইয়ের তাক
ফুলদানি, ফুল

পড়েছি যৌবনে
আবেগ ফোয়ারা যেন ভিক্টোরিয়া
জলপ্রপাতের

ভুল করি,
সংশোধনের ধারে যেতে
ছেঁকা লাগে আগুনের

এইসব কিছু,
সবই অনাবশ্যক মনে হয়,
মনে হয় ইচ্ছেমতো ক্যানভাসে তুলি বুলিয়ে
জবড়জং ইমেজ সৃষ্টি করি

নাম দিই,
ঘোষণা করি ; কেউ না যাও,
এই আমরা চললাম ধ্বজা উড়িয়ে
এ পথে জয়যাত্রায়

অস্বীকৃতি জানাতে ইচ্ছে করে সবকিছুর
আমরা যতই জেনে যাচ্ছি রহস্য বিশ্বের
জীবন জটিল হচ্ছে

জানি, পরিত্রাণ নেই
মহাশূন্যের বুকে ছুঁড়ে দেওয়া স্পুৎনিকের মতো
আমরা গতির তরঙ্গে ভেসে যাব ভবিষ্যতে…

যে অতীতে ফিরব না আর
কেউ কোনোদিন, মনে হবে
ছিল বড়ই মধুর
বর্তমানের দোষ ধরব
সব সময়েই

ধিক্কার দেবো নিজেদের আর
কপালপোড়া ভাগ্যকে

রাস্তা থেকে কাঠকয়লা কুড়িয়ে
চলন্ত ট্রেনের ওয়াগনে ওয়াগনে লিখে যাব
এ গ্রহের সুখদুঃখ জালাযন্ত্রণা শোকের গভীর কথা
কবিতায়

ঢেউগুলো বদলায়,
সমুদ্র বদলায় না
বদলে যাই আমরা
জীবন দাঁড়িয়ে থাকে গৌরব মহিমান্বিত

বৃষ্টি ভেজাবে মাটি,
জল দেবে গভীর শেকড়ে
মহাকাশে ছড়াবে মাথা অঙ্কুরিত শাখাপ্রশাখা
রাশি রাশি পাতা, ফুল, ফল···

আর্দ্র মানুষেরা
ঝলমল করে উঠবে রামধনু আলোয়, সূর্যালোকে

আমি এইসব
প্রাণভরে দেখে যাব

কারণ যে কোনো মুহূর্তে টুপ ক'রে খ'সে পড়ব
মহাশূন্যে যেমন নক্ষত্র, পৃথিবীর অভিকর্ষ
পারবে না রাখতে ধ'রে

প্রিয়বন্ধুরা ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ
জন্মেছিলাম এ গ্রহে।

ভালবাসার পিঁপড়ে জানে

পিনাকীনন্দন চৌধুরী

ভালোবাসার পিঁপড়ে জানে বর্ষা এলে ঘর গোছাতে।
ভালোবাসার পিঁপড়ে খোঁজে টুক্‌রো টুক্‌রো খাদ্য ভীষণ
এবং পাহাড় জীবনতুল্য অনেক উঁচু
অনড় কঠিন—রাখবে ঘিরে বসতআয়ু।

উঠোন খামার রান্নাশালে লক্ষকোটি পিঁপড়ে চলে
হলুদসারি তরুণনদী বইছে রোদের করতলে,
পুবপশ্চিম শহর বনে
যত্রতত্র সংগোপনে পাথরকুচি ছড়িয়ে আছে—
পিঁপড়েরাই গড়তে জানে জয়স্তম্ভ গুনগুনিয়ে।
পরস্পরের শুঁড়ের ছোঁয়ায় মহাজীবন ;
সতর্কতার কাঁথকন্থ দীর্ণ করে সারিবন্দী
দর্পে হাঁটে আম্রমুকুল সন্নিধানে—
কারুকাজের নক্সা এঁকে
নির্যাতনের জবাব চিনির কৌট কুরে,
বৃষ্টি বাদল সর্বনাশের কারণ বারণ নীবার কণা সংগঠনে,
বানবন্যার গর্বহরণ পাহাড়প্রমাণ জীবনযাপন ;
ভালোবাসার পিঁপড়ে জানে অনড় কঠিন ঘর গোছাতে।

নাটকের শেষ অঙ্কে

দিলীপ সেন

চারপাশের থমথমে ঝড়ের মধ্যে
স্থির হয়ে আছে শীর্ষবিন্দু
নাটকের শেষ অঙ্ক :
মঞ্চের একপাশের জ্বলন্ত চিতায়
দড়াদড়ি বাঁধা শয়তান মৃত্যুকে শুইয়ে রেখে
আমরা ফিরে এসেছি যে যার জায়গায়।
এখন সবুজঘর থেকে
অথবা মেঘের পর্দা সরিয়ে
বেরিয়ে আসুক সমুদ্র-নায়ক
অথচ মুখ বন্ধ ক'রে গুম হয়ে আছে বাতাস !
মৃত্যুকে শাসাবার মতো রক্তের লাল রং
আগুনের শরীরে এখনও লাগেনি
আর সামনেই

দর্শকদের প্রকাণ্ড দরদালান ঘেরা পাথরের দেয়ালগুলো
যন্ত্রণায়, আর্তনাদে চিড় খাচ্ছে ক্রমাগত।

আমরা
যারা এতক্ষণ জমাট বেঁধেছিলাম অন্ধকারে
হৃৎপিণ্ডের ভারি শ্বাস-প্রশ্বাসে এখন
সমুদ্রজোয়ারে একাকার হয়েছি রাস্তায়
যেখানে শুধু এক জীবন্ত বাতাসের কণ্ঠে
আমাদের হেঁটে যাবার শব্দ
আর ফুটন্ত রক্তগোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে যেখানে
মৃত্যুকে টপাটপ গিলছে
সূর্যের লাল রং।

পাপপুণ্য : ৬৯

সামসুল হক

ওকে একটা বাঁশি কিনে দাও
ও আজ প্রথম শবযাত্রা দেখেছে
বিছানায় আমাদের উৎসবের সময়
আজ ওর জেগে থাকার স্বাধীনতা
টুকুন তুমি আজ রাত্রে রাস্তায় বে-ল-ফু-ল শুনতে পাবে
তুমি আজ প্রথম শবযাত্রা দেখেছ

টুকুন আজ বিকেলে তোমাকে ধানগাছ দেখাতে নিয়ে যাব
ধানগাছে ধান হয় তার থেকে চাল হয়, ভাত
কেউ কেউ খায়
তোমার আজ এইসব শোনার স্বাধীনতা
তুমি আজ প্রথম শবযাত্রা দেখেছ

পাগলা টুকুন তোর সঙ্গে উল্টোপাল্টা ঘণ্টা খেলব আয়
জেলখানার ঘণ্টা বাজালে তুই বলবি
মন্দিরের ঘণ্টা বাজল ওই
তোমার আজ এইসব বলার স্বাধীনতা
তুমি আজ প্রথম শবযাত্রা দেখছ

খিঁচাকবলা সমাচার

এক

সমরেশ বসু

চকবাজারের তিন রাস্তার মোড়ে, এখন এই প্রথম সকালের ব্যস্ত কেনা-বেচার সময়ে, রাস্তার অনেক ভিড়ের মধ্যে, একজনের দিকে চোখ পড়তেই, সবরকমের দোকানি আর ক্রেতাদেরই ভুরু কুঁচকে উঠল। সকলের চোখেই সন্দেহ, কারো কারো চোখে রাগ আর বিদ্বেষও। কারো কারো চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। এমন কি তিন রাস্তার মোড়ে যে সেপাইটা দাঁড়িয়েছিল, পোকা বাঁধের দিক থেকে বা বোলতলার দিক থেকে আসা দু-একটা বাস লরিকে হাত দেখাচ্ছিল, আর বেশির ভাগ সময় আশেপাশে কারো না কারো সঙ্গে গল্প করছিল, মাঝে মাঝে সাইকেল রিকশার ভেঁপু শুনে বিরক্ত বোধ করে হাঁকছিল, 'শালা তুকেও হামার হাত দিখাইতে হবে?' তারও ভুরু আর চোখের কোণ দুটো কুঁচকে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে, হাতের মুঠি পাকিয়ে শক্ত করল। এবং চিত্রটি স্থির না, যে যার কাজে ব্যস্ত, আর নির্বাকও মোটেই না, কারণ দু একজন নিজেদের ব্যস্ততার মধ্যেও গরগরিয়ে উঠল, 'ই শালা এখন ইখানে আইচে ক্যানে?'

সকলেই যে-যার কাজে কথায়, দর কষাকষি বেচা-কেনায়। কেউ বা নিতান্ত চকের সামনে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে বেকার গুলতানি করছিল, এবং সকলেই আপনার আপনার মনে বেশ ছিল। মাত্র একজনের আবির্ভাবে, চক এলাকার সমস্ত চেহারাটাই যেন বদলিয়ে গেল। ব্যাপারটাকে কোনো রকম সম্মোহন জাতীয় ঘটনার থেকেও, তুলনাটা মানুষের ক্ষেত্রে খারাপ শোনালেও, মনে হলো যেন, এক পাল

কুকুরের রাজ্যে, বেপাড়ার একটা কুকুর এসে পড়েছে। সন্দেহ, রাগ ছাড়াও, সকলের চোখে-মুখেই একটা সাবধানী অভিব্যক্তি।

যার আবির্ভাবে এইরকম একটা পরিবর্তন, তার মুখে খোশামুদে চাটু-কারিতার হাসি। গল্প কথার শেয়ালের হাসির মতোই অনেকটা, এবং যথাসাধ্য সরল অমায়িক নিষ্পাপ ছোট ছোট চোখে সকলের দিকেই দেখতে লাগল, খুব নিরীহ ভঙ্গিতে পায়ে পায়ে মোড়ের দিকে এগিয়ে চলল। তার ছোট ছোট চোখ দুটো প্রায় গোলাকৃতি, ঝকঝকে, শিকরে বাজের মতোই, অথচ একটা অস্বাস্থ্যকর লাল হলুদের ছোপও যেন আছে। রোগা লম্বা হিলহিলে, হঠাৎ দেখলে রুগ্ন মনে হয়। বিশেষ করে তার রঙ-ওঠা বিবর্ণ, বোতামহীন, ফুটো-ফাটা, নানা জায়গায় সেলাই করা হাফ শার্ট, তার চেয়েও খারাপ অবস্থা, মাপে খাটো, গোড়ালি থেকে অনেকটা ওপরে, সরু কোমরে আর লম্বা সরু ঠ্যাং-এ কাপটি আঁট ফুল প্যান্টের নানান জায়গায় লম্বা সেলাই, দু-একটা তাপ্পি আর বড় বড় নখওয়ালা খালি ময়লা পা-জোড়া দেখলে, রুগ্ন আর দুঃস্থ ছাড়া তাকে কিছুই মনে হয় না। তার লম্বা সরু দুই হাত, বড় বড় ময়লা নখ, রুক্ষ আকাটা, ঘাড়ে কপালে বেয়ে পড়া খয়েরি-কালচে চুল, সবকিছুতেই তাকে সেইরকম মনে হয়। নাকটা যে তার কেন চোখা, মিশকালো ভুরু দুটো মোটা, এটা যেন চিন্তার বিষয়। এমনকি মুখে অনেক কাটাকুটির দাগ, যা দেখলে মনে হয় দাগগুলো সবই যেন নিপুণ হাতে আঁকা, কেননা প্রাচীন পাথরের মূর্তির মুখের মতো মোটেই ক্ষয়িষ্ণু এবড়ো-খেবড়ো না, এ-সব সত্ত্বেও, তীক্ষ্ণ চিবুক, পান-পাতার মতো মুখের গড়নে প্রায় একটা মেয়েলি কোমলতা, এবং পান-বিড়ি-সিগারেটের ছোপ থাকা সত্ত্বেও নিখুঁত দাঁতের পাটি কেমন যেন চিন্তিত করে তোলে। দু-একদিনের মধ্যেই গোঁফ-দাঁড়ি কামানো হয়েছে। সেজন্যই মুখটা কিছু সাফ-সুরত দেখাচ্ছে। যদিও ইতিমধ্যেই পাতলা-শ্যাওলার মতো ছোপ ধরেছে।

এ ধরনের চেহারার মানুষের বয়স অনুমান করা খুব কঠিন। কুড়ির ঘর থেকে তিরিশের ঘরে একটা ধরে নিলেই হয়। সে তিন রাস্তার মোড়ের সামনে এসে দাঁড়াল। সেপাইয়ের দিকে তাকাল। প্রায় পুরো খোলা দাঁতের পাটিতে সেই তোষামুদে হাসি। প্রায় গোল চোখে, বেমানান সরল নিষ্পাপ দৃষ্টি। অবাঙালি সেপাইয়ের গোঁফ-জোড়া খাড়া হয়ে উঠল, অসুরের মতো তার দাঁত দেখা গেল। ডান হাত মুঠি পাকানো, বাঁ হাতে গোঁফ জোড়া

একবার চুমড়ে নিল। চোখের কোণ দুটো আরও বেশি কুঁচকে উঠল। সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। জিজ্ঞেস করল, 'এ্যাই শ্যালা খিঁচাকবলা, কীধার তু যাবি?'

সেপাইটির ধারণা, সে বাঙলা বলতে পারে, এবং তা স্থানীয় আঞ্চলিক বিষ্ণুপুরী ভাষা। যার আবির্ভাবে গোটা চক-বাজার এলাকায় সহসা এমন পরিবর্তন, তার নাম খিঁচাকবলা। হয়তো এই নামের পিছনে কোনো ইতিহাস আছে। হয়তো তার অন্য কোনো নাম একদা ছিল। কিন্তু এখন এই শহরে এই নামেই তাকে সবাই চেনে। শুধু চেনে বললে ভুল হবে, এমন বিশেষ ভাবে চেনে। চকবাজার অঞ্চলের ভুতুড়ে মন্ত্রপড়া হঠাৎ পরিবর্তন দেখলেই তা বোঝা যায়। নামের পিছনে যদি কোনো ইতিহাস থেকে থাকে, তবে হয়তো তার একটা মানেও আছে। হয়তো না, ইতিহাস এবং মানে, দুই-ই আছে। ও যখন বালক ছিল, শহরের চকে-বাজারে রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াত, এবং চলে যেত সোনামুখী, বাঁকুড়া, দূরান্তে পুরুলিয়া, তখনই একটা আশ্চর্য শারীরিক কৌশল আয়ত্ত করেছিল, যা লোকচক্ষে করুণ আর উদ্বেগজনক। কৌশলটা আর কিছুই না, হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে যত্রতত্র পতন, হাত-পায়ের দুরন্ত খিঁচুনি, গোঙানি, ধুলাবালিতে মুখঘষা, মুখের লালায় ফেনা গাঁজিয়ে তোলা, ইত্যাদি মিলিয়ে, একটি মৃগী রুগীর পাকা অভিনয়। বালক বয়সে ভিক্ষা আর ছোটখাটো হাতসাফাই চুরি বাদ দিলে, এটাই ছিল ওর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। সেই থেকেই ও খিঁচাকবলা, কিন্তু নামটা মুখে মুখে ছড়িয়েছিল কিছুটা করুণা আর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। তখন ওর মা-বাবা ছিল। মা বনবাঁদাড় জলাশয়ে ঢুঁড়ে নানা রকমের ছোড়ক ছাতু, শামুক-গুগলি যোগাড় করে বাজারে বিক্রি করত, বাপ এক টেমিওয়ালার ঘরে টেমি বানাত। ভাই-বোন জন্মাত বছর বছর। বাপ প্রচুর মদ খেত, আর মায়ের সঙ্গে রোজই ঝগড়া-মারামারি হত। ভাইবোনের কোনো হিসাব ছিল না, অন্তত খিঁচাকবলা হিসাব করতে পারত না। ওর পাঁচ-ছ বছর বয়সেই, ওকে ভিক্ষা করতে পাঠানো হয়েছিল। চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত কোনোরকমে ভিখিরির ভূমিকাটা বজায় রাখতে পেরেছিল। তারপরে আস্তে আস্তে ওর ভূমিকা বদলিয়ে গিয়েছিল। সেই পরিবর্তনের কাহিনী বহু সমাচারের বিষয়ভুক্ত। তবে মৃগী রোগের ছলনাটা ধরা পড়ে গিয়েছিল কয়েক বছরের মধ্যেই।

খিঁচাকবলাকে আজকাল রোজদিন বিষ্ণুপুর শহরে দেখা যায় না। সেটা সম্ভবও না। ওর বিচরণক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত। বাঁকুড়া পুরুলিয়া ছাড়াও, দুর্গাপুর

আসানসোল, বর্ধমান পর্যন্ত। কখনো কখনো কখনো বোলপুর, সিউড়ি, রামপুরহাটও। অতএব সচরাচর ওকে চক বাজার এলাকায় দেখা যায় না। দেখা গেলেই, সমস্ত এলাকা মুহূর্তেই সন্দেহে রাগে গরগরিয়ে ওঠে। আসলে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

খিঁচাকবলা সেপাইয়ের কথার কোনো জবাব না দিয়ে, একবার ডাইনে তাকাল, আর-একবার বাঁয়ে। মুখে সেই খোশামুদে হাসি, চোখে নিষ্পাপ সরল দৃষ্টি। সেপাই ডানহাতের ঘুষি তুলে হুমকে উঠল, 'শালা কোই ভুকানপর তু গোড় বাড়াইছ, ত এক ঘুষা মে তোর নাক ফাটাই দিব।'

খিঁচাকবলা সেপাইয়ের দিকে তাকাল। সেলাই আর তালিমারা প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে, তুলে নিয়ে দেখাল কিছু খুচরো পয়সা, আর চাটুহাসিটা ছড়িয়ে গেল এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত। সেপাই একইভাবে হুমকানি দিল, 'শালা, উ সব চোরাই পয়সা হামি দেখতে চাই না। ইখান সে আভি ভাগ যা!'

খিঁচাকবলা আশেপাশে দোকানের এবং লোকদের দিকে একবার দেখল। হাসিটা একটুও ছোট হল না। পয়সাগুলো পকেটে ঢুকিয়ে, ও বাঁ দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। রাস্তার দুপাশের, বিশেষ করে দোকানদারদের দৃষ্টি, মুখের অভিব্যক্তি চকবাজার এলাকার মতোই। ও দু পাশে দেখতে দেখতে, কাটাকুটির দাগ ভরা মুখে হাসি নিয়ে, বোলতলার মোড় পেরিয়ে, ডান দিকে ময়রার দোকানের সামনে দাঁড়াল। একজন জিলিপি ভাজছিল, আর একজন হাতে গরম, শাল পাতায় বিক্রি করছিল। যে বিক্রি করছিল, সে খিঁচাকবলাকে দেখেই, এক টানে জিলিপির কাঠের পাত্রটা পিছনে সরিয়ে নিল। আর যে খালি গা লোমশ লোকটা জিলিপি ভাজছিল, সে ঝাঁজরি হাতাটা তুলে, ক্ষেপে উঠে বলল, 'খ্যাখ্‌ শালা, জিলিপিতে হাত দিয়া করেচু কি তোর গায়ে গরম তেল ছিটাই দুব।'

খিঁচাকবলার হাসিটা একটু ছোট হল, গোল চোখ দুটোর হলুদ লাল ছোপ থেকে কালো তারা দুটো যেন শিকরে বাজের চোখের মতো ঝলকিয়ে উঠল। তারপরেই আবার হাসিটা ছাড়য়ে গেল, আর প্যাণ্টের পকেট থেকে দুটো দশ নয়া বের করে, ভাজাওয়ালার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল। যে বিক্রি করছিল, সে দশ নয়া দুটো আগে হাতে নিয়ে দেখল। দেখে, একটা শাল পাতায় দুটো জিলিপি মুড়ে এগিয়ে দিল। যারা জিলিপি কিনছিল, তারা

কিছুটা কারাকে সরে গিয়েছে। খিঁচাকবলা একটা জিলিপি বের করে খেতে খেতে আবার এগিয়ে চলল।

রাস্তার দুপাশে, লোকজন দোকানদারদের সেই একই মুখের অভিব্যক্তি, চোখের দৃষ্টি। আপাতদৃষ্টিতে দুঃস্থ রুগ্ন খিঁচাকবলা তাকিয়ে তাকিয়ে জিলিপি খেতে খেতে, বাউরিপাড়ার মোড় পর্যন্ত এল। জিলিপি দুটো খাওয়া শেষ। মোড়ে কয়েকটা সাইকেল রিকশা, এবং সেগুলোর চালক। একমাত্র রিকশা-চালকদের মুখ চোখের অভিব্যক্তি দৃষ্টি ভিন্ন। ওদের চোখে কৌতূহল, হেসে নিজেদের সঙ্গে চোখাচোখি করল। একজন বলেও উঠল, 'অই ওস্তাদ, কেমন আচ হ্যা ?'

খিঁচাকবলা তখন রাস্তার ধারে টিউবওয়েলের কলের মুখে এক হাত চেপে, অন্য হাতে হাতলে চাপ দিচ্ছে। রিকশাওয়ালাদের দিকে না তাকিয়েই গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বের করল, অনেকটা বিদ্‌ঘুটে ঢেঁকুর তোলার মতো। রিকশাওয়ালারা হেসে উঠল। খিঁচাকবলা নিচু হয়ে, কলের কাছে মুখ নিয়ে জল খেল। খেয়ে, ভেজা হাত মাথায় মুখে মুছতে মুছতে কোনোদিকে না তাকিয়ে আবার এগিয়ে চলল।

'শালা কালিন্দী বাঁধের ধারদে যেয়্যা খরগা।' একটা চিৎকার শোনা গেল।

খিঁচাকবলা দাঁড়াল. বাঁ দিকে দোকানঘর আর লোকজনদের দিকে তাকাল। হাসিটা ছোট হতে হতে, ঠোঁট ছুঁচলো হয়ে উঠল, চোয়াল দুটো শক্ত আর হলুদ লাল ছোপ চোখের ভিতর থেকে কালো তারা দুটো শিকরে বাজের চোখের মতো ঝলকিয়ে উঠল। চিত্রটা এখন স্থির, একটা স্তব্ধতা এবং স্পষ্টত একটা দুর্ঘটনার আশঙ্কা যেন সকলের চোখে মুখে। আরও খানিকটা পশ্চিমে এগোলে কালিন্দী বাঁধ, তার পাশেই শ্মশান। চিৎকারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, খিঁচাকবলাকে শ্মশানে গিয়ে মরতে বলছে। আক্রমণের আগে, হাতি যেমন শুঁড় গুটিয়ে নেয় ওর ছুঁচলো ঠোঁটের ভঙ্গিটা অনেকটা সেইরকম। কিন্তু আস্তে আস্তে ওর ঠোঁট আবার হাসিতে ভরে উঠল, চোখের দৃষ্টি সরল আর নিষ্পাপ। ও এগিয়ে চলল। কালিন্দী বাঁধের আগেই, ডান দিকের রাস্তায় বেঁকে গেল।

এ রাস্তায় কোনো দোকানপাট নেই। গাছপালা বন বাঁদাড়, রাস্তার ধারে দু চারটে মাটির ঘর, গরিব হাড়ি ডোমের বাস। খিঁচাকবলা এগিয়ে চলল, চার রাস্তার মোড়ে এল। একটা রাস্তার নাম বম্বে রোড। এখানকার

লোকে বলে বম্বে রোড। আসলে রাস্তাটা চন্দ্রকোণাগড় গড়বেতা হয়ে, খড়গপুরের কাছে বম্বে রোডে গিয়ে মিশেছে। সেই জন্য বম্বে রোড। কাছেই বিঁড়াই নদী, সেজন্য এ জায়গাটাকে বিঁড়াইয়ের মোড় বলে। বম্বে রোডটার আসল নাম পিল্‌গ্রিম রোড। এই রাস্তায় নবদ্বীপের নিমাই মিশ্র পুরীতে গিয়েছিলেন। এ রাস্তায় উড়িষ্যা যাওয়া যায়। একটা রাস্তা গিয়েছে সোনামুখীর দিকে। বিপরীতে বাঁকুড়ার দিকে। খিঁচাকবলা যেদিক দিয়ে এল, ওটা বিষ্ণুপুরের দিকে।

বিঁড়াইয়ের মোড়ের একটু দূরেই পেট্রল পাম্প। মোড়ের এক পাশে দূরগামী ট্রাকের সারি। পাশে মস্তবড় একটা চালাঘর। ঘরের একদিকে রান্না হচ্ছে, কতগুলো খাটিয়া পাতা। ট্রাক-ড্রাইভারদের খাওয়া আর বিশ্রামের জায়গা। ট্রাকের যান্ত্রিক খুঁটিনাটি গোলযোগ সারানো, জল খাওয়ানো, জলে ধুয়ে সাফসুরত করা, সবই এখানে হয়। আর ঠিক জায়গা বুঝেই, রাস্তার ধার থেকে একটু ভিতরে, মাঠের ওপর একটা দেশি মদের দোকান। সরাইখানার এক পাশে বড় একটা পুকুর। ড্রাইভাররা নিজেদের ধোয়াতে পারে, গাড়িও ধুতে পারে। একটা ছোট-খাটো মেরামতি কারখানাও রয়েছে। জায়গা বুঝেই করা হয়েছে। বিঁড়াইয়ের মোড় ট্রাক-ড্রাইভারদের সবদিক থেকেই আদর্শস্থল।

খিঁচাকবলা ট্রাকের সারির পাশ দিয়ে বড় মাটির ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েকজন ড্রাইভার আর তাদের সহকারী, কেউ শুয়ে, কেউ বসে। দু-তিনজন ঘুমোচ্ছে। দু-জন শিখ মদের বোতল আর কাঁচা পেঁয়াজ নিয়ে বসেছে। অন্যদিকে উঁচু উনোনে দাঁড়িয়ে একজন রান্না করছে। সবাই খিঁচাকবলার দিকে তাকাল। কিন্তু শহরের লোকজনের মতো, এখানে কারো চোখেই সন্দেহ বা মুখে রাগ রুষ্টতা নেই। খিঁচাকবলার মুখে সেই হাসি, চোখে সেই নিষ্পাপ দৃষ্টি। এখন খোশামুদে হাসিটা যেন একটু করুণ।

চুল খোলা খালি-গা যে-দুজন শিখ ড্রাইভার মদের বোতল নিয়ে বসেছিল, তাদের মধ্যে একজন, খিঁচাকবলাকে ওর ভগ্নীর নামে গালাগাল দিয়ে সস্নেহ সম্ভাষণ করে হিন্দিতে যা বলল, তার বাঙলা এই রকম, 'কী রে— খিঁচা, এই করে তুই কিলিনার হবি? এত বেলায় তোর জন্য কোনো গাড়ি পড়ে থাকবে? সব ধোলাই সাফ করা হয়ে গেছে।'

এখানে খিঁচাকবলা পরিচিত, এবং এখানে ওর পরিচয় একজন কর্মী

হিসাবে। ক্লিনার। গাড়ি ধুয়ে মুছে সাফ করে, তেল ন্যাকড়া দিয়ে যন্ত্রপাতি মোছামুছি করে। পারিশ্রমিক হিসাবে কোনো পয়সা পায় না। একটু চা, একটা রুটি, দু-একটা বিড়ি, এবং সব থেকে ওর যেটা বড় দরকার, ট্রাকে চেপে এদিকে ওদিকে যাওয়া। ও ওর করুণ হিন্দিতে যা জবাব দিল, তা হলো, 'কী করবো সর্দারদাদা, মা মরো মরো, তাকে নিয়ে হাসপাতালে গেছলাম।'

অন্তত পনেরো বছর আগে খিঁচাকবলার মা মারা গিয়েছে। আর এই হোটেল বা ধাবড়া বা আড্ডা বা সরাইখানা, যাই হোক, বিষ্ণুপুর শহরের এত কাছে হলেও, দূর বিদেশের মতো। শহরের ভিতরের কারো কোনো খবরই এরা কেউ রাখে না। সর্দার ড্রাইভার কোনো জবাব না দিয়ে, মদের গেলাসে চুমুক দিল। সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

খিঁচাকবলাও কিছুই বলল না, এগিয়ে গিয়ে, সর্দার ড্রাইভারের পায়ের কাছে বসে, তার পা টিপতে আরম্ভ করল। ব্যাপারটা এমনই স্বাভাবিক, কেউ অবাক হল না, বা কিছু বলল না। এমনকি সর্দারদাদা ড্রাইভারও না। সে পেঁয়াজে কামড় বসিয়ে চিবোতে চিবোতে সঙ্গীর সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে লাগল। প্রায় দশ মিনিট পরে খিঁচাকবলার চুল টেনে দিয়ে, ওর ভগ্নীর নাম করে আবার আদর করে গালাগাল দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'চা পান করবি?'

'না সর্দারদাদা।' খিঁচাকবলা সর্দারদাদার কোমর টিপতে টিপতে ওর হিন্দিতে বলল, 'আমাকে একটা গাড়ি ধরে দিন, আমি একবার সোনামুখী যাব।'

সর্দারদাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, 'তাই বল। কিন্তু এখন কি সোনামুখী যাবার মতো কোনো লরি মিলবে? চল দেখি রাস্তায়, চলন্ত লরি পেলে, ধরে দেব।' সে তার ডোরাকাটা ঢলঢলে ইজের পরেই উঠে দাঁড়াল।

খিঁচাকবলার হাসিটা এখন ছোট, নিরীহ, চাটুও বটে। সর্দারদাদার সঙ্গে চার রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল। ব্যস্ত মোড়, গাড়ি ট্রাক সব সময়েই চলছে। কিন্তু সোনামুখীর দিক থেকে ঘন ঘন লরি এলেও, সোনামুখীগামী লরি সহসা দেখা দিচ্ছে না। সর্দারদাদা নানারকম খিস্তি আরম্ভ করল। খিঁচাকবলাকে ঠিক না। লরি না আসার কারণেই, ওর ভাগ্যের উদ্দেশ্যে।

প্রায় দশ মিনিট পরে বাঁকুড়ার দিক থেকে একটা খালি লরি সোনামুখীর রাস্তায় বাঁক নিতেই, সর্দারদাদা হাত তুলে চিৎকার করল।

লরিটা দাঁড়িয়ে গেল। সর্দারদাদা এগিয়ে গিয়ে হাত তুলে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কীধর যানা ?'

লরির ড্রাইভার হিন্দিতে বলল, 'সামনের বড় নদীর চর থেকে বালু বোঝাই হবে।'

খিঁচাকবলা বুঝে নিল, বড় নদী মানে বিঁড়াইয়ের পরে দ্বারকেশ্বর নদীর কথা বলছে। বিষ্ণুপুরের লোকেরা অবশ্যি দ্বারকেশ্বরকে যশোদা নদী বলে। ও তাড়াতাড়ি ওর হিন্দিতে বলে উঠল, 'ওই নদীর বিরিজ পর্যন্ত যেতে পারলে, আবার নতুন একটা দেখে নেব।'

সর্দারদাদা তার ভাষায় বলল, 'একে একটু নিয়ে যাও।'

লরির ড্রাইভার ঘাড় নেড়ে খিঁচাকবলাকে পিছনে ওঠার ইঙ্গিত করল। পিছনে কিছু মেয়ে আর পুরুষ কুলি-কামিন ছিল। সর্দারদাদা বলল, 'চলে যা খিঁচা।'

খিঁচাকবলা সামনের পা দানিতে পা রেখে, এক লাফেই পিছনে উঠে পড়ল। লরিটা চলতে আরম্ভ করল। খিঁচাকবলা একবার দেখে নিল, কুলি-কামিনদের কেউ চেনা কি না। কেউ চেনা না। অন্য এলাকার। দেখলেই বোঝা যায় সকলেই বাউরি। মেয়েরা সবাই নীচে ধার ঘেঁষে বসেছে। পুরুষরা গায়ে গা ঠেকিয়ে। লরির সামনে হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে। খিঁচাকবলা পুরুষদের কাছে গিয়ে, একজনের কাঁধে হাত রেখে, ভারসাম্য বজায় রাখল। হাসল লোকটার দিকে তাকিয়ে। ওরা সবাই হাসল, নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি করে। খিঁচাকবলাকে দেখল আপাদমস্তক। কেউ কোনো কথা বলল না।

কুড়ি মিনিটের মধ্যেই লরিটা দ্বারকেশ্বরের লম্বা ব্রিজের ওপর এসে উঠল। নীচে চৈত্রের নদী। বিশাল চওড়া। ওপার ঘেঁষে একটা ক্ষীণ স্রোতের ধারা। মাঝে মাঝে টুকরো আয়নার মতো জল। বাকিটা সবই বালিতে ধূ ধূ করছে। লরিটা ব্রিজ পেরিয়ে দাঁড়াল। খিঁচাকবলাকে নামাবার জন্যই। কারণ লরিটা এবার আরও এগিয়ে, বাঁ দিকের ঢালুতে কোথাও কাঁচা রাস্তা দিয়ে নেমে যাবে। খিঁচাকবলা একটা হালকা ন্যাকড়ার টুকরোর মতো লাফিয়ে মাটিতে রাস্তায় পড়ল, ড্রাইভারের উদ্দেশে হাত নাড়ল। লরিটা এগিয়ে গেল।

খিঁচাকবলা একটু দূরের একটা গাছতলার দিকে তাকাল, তারপর দূরের রাস্তার দিকে। এখন ওর মুখে হাসি নেই, চোখের কালো তারা দুটো কেবল ঝকঝক করছে। একটু দূরের গাছতলায় কিছু গ্রামের মেয়ে পুরুষ। বাসের যাত্রী। সোনামুখী থেকে আগত বাসে বিষ্ণুপুর বা বাঁকুড়ায় যাবে। খিঁচাকবলাও আসলে সোনামুখীর নাম করে এখানেই নামতে চেয়েছিল। সর্দারদাদাকে মিথ্যা কথা বলেছিল। এখানে নামার কথা বলা যায় না, কারণ এখানে নামার কোনো দরকার থাকতে পারে না। অথচ খিঁচাকবলার আছে। ও প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে পয়সা বের করল, গুনল। গাছতলার দিকে যেতে যেতে উচ্চারণ করে বলল, 'বিষ্টুপুরের ভাড়া থেক্যা বেশি পয়সা রইচে। বিষ দিয়া মারিস্ না মা মনসা, ডংশনটি ছুট্যো না যায়।' কপালে হাত ঠেকাল।

খিঁচাকবলার সময় জ্ঞান খুব টনটনে। বেলা আর রোদ দেখেই বুঝতে পেরেছিল। যশোদা নদীর ইস্টাপে সোনামুখীর বাস কখন এস্যে দাঁড়াবেক। ও গাছতলায় পৌঁছুতেই উত্তর দিক থেকে গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে এলো। দূরে বাস দেখা গেল। যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে উঠল। হাতের পোঁটলা পুঁটলি হাতে নিল। যেন এখনই নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দেবে, এমন একটা ব্যস্ততা। দোষ দেওয়া যায় না। দেখাই যাচ্ছে, বাসটা ছাদ ভরতি লোক নিয়ে এসে দাঁড়াল। এখানে নামার যাত্রী নেই, সবই ওঠবার। খিঁচাকবলার ছাদে ওঠাই উচিত ছিল, একলা বিটা ছেলা যাত্রী। কিন্তু ও নিমেষেই পিছলে ভিতরে ঢুকে গেল। দাঁড়াবার জায়গাও নেই। তবু কনডাকটর মেয়ে যাত্রীদের পোঁটলার মতোই ভিতরে ঠেলে দিল। তারপরেই চিৎকার, 'জেট!' বাস সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিল।

খিঁচাকবলাকে এখন দেখাচ্ছে আরও দুঃস্থ, রুগ্ন, অসহায় আর করুণ। একজনের ঘাড়ে পড়ে তো, ঠেলা খেয়ে আর একজনের ঘাড়ে। পয়সার মুঠি তুলে বলল, 'বিষ্টুপুরের একখান টিকিট দিয়া কর গ দাদা।'

কেউ জবাব দিল না। অবিশ্যি কনডাকটর ঠিক আদায় করবেই। ভিড়ের মধ্যে সে আগে দরজার কাছে যাত্রীদের টিকিট দিচ্ছে। খিঁচাকবলা চারদিকে দেখতে লাগল। চোখের হলুদ লাল ছোপ থেকে, শিকরে বাজের চোখ ঝকমকিয়ে উঠল। উঁচু আকাশ থেকে যেন, জঙ্গলের গভীরে সাপ বিছে, ইঁদুর, পতঙ্গ, খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর তার মধ্যেই থেকে থেকে ককিয়ে উঠছে, 'অই, মেরা্য ফেলাবেক গ, খাড়া থাকতে লারছি।...

দু একজন দয়ালু চেপে চুপে একটু ফাঁক দিতে চাইছে। হুঁ, ইয়াদের ভিতর বাবু ভদ্দরলোক রইচে। গাড়ি দ্রুত ছুটছে। এখন কোর্ট কাচারির সময়। মহকুমা আর জেলা সদরে অনেকে চলেছে। শিকরে বাজের চোখ, আশেপাশে, নীচে, সবখানে বিদ্যুতের মতো হানছে। চশমা চোখে, শার্ট প্যাণ্ট পরা একটা বাবু। ঘামছে, কিছু ভাবছে। খিঁচাকবলার হাত সাপের মতো দ্রুত, নিঃশব্দে, বাবুর প্যাণ্টের পকেটে ঢুকে গেল। অই, বাবুর ব্যাগখানি মোটা! ডংশন করিলা নাগ মা মনসার আজ্ঞায়। দ্রুত, যেন হাওয়ায় হাত বেরিয়ে এলো পকেট থেকে। চলে গেল নিজের পেট কোমরে। বাঁ হাতে কাজটা সারল। প্যাণ্টের পেট-কোমরে বস্তুটি গুঁজে দিয়ে, যেমন দাঁড়িয়ে টলছিল, তেমনি টলতে লাগল। সবাই টলছে। কিন্তু খিঁচাকবলা এখন ঘামছে। টলতে টলতে ইঞ্চি ইঞ্চি পিছু হটছে।

দ্রুতগামী বাস বিঁড়াইযের মোড় ছাড়িয়ে দাঁড়াল। বিষ্ণুপুরের যাত্রীরা এখানে নামবে। খিঁচাকবলা পিছলে দরজার কাছে গিয়ে, পয়সার মুঠি খুলে দিল কনডাকটরের সামনে। কনডাকটর পয়সা নিয়ে টিকেট দেবার আগেই, যেন যাত্রীদের ধাক্কায় ও বাইরে ছিটকে পড়ল। বেশ কিছু যাত্রী নামল। খিঁচাকবলা কারো দিকে তাকাল না। একবার হোটেল আড্ডার দিকে দেখল, তারপরে পিছন ফিরে, ওরা যাকে বমবে রোড বলে, সেই রাস্তায় হাঁটতে আরম্ভ করল।

এ রাস্তাটা বেশ ফাঁকা। গাড়ি চলে কম। খিঁচাকবলা লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটছে, প্রায় দৌড়ের মতো। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছে। বাস চলে গিয়েছে। যাত্রীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে-যার গন্তব্যে চলে যাচ্ছে। একটাই মাত্র লোক এ রাস্তায় আসছে। হাঁটুর কাছে কাপড় তোলা, ময়লা একটা জামা গায়ে। ওকে নিয়ে ভাববার কিছু নেই। বাঁ হাত দিয়ে পেট কোমরে একবার চাপ দিল। ঠিক আছে। সামনে তাকিয়ে দেখল। অদূরেই জয়পুরের শালবন। ডাইনে কেষ্ট বাঁধের উঁচু পাড়। কলকাতার বাস ওই রাস্তায়, বাঁধের ধার দিয়ে বিষ্ণুপুরে ঢোকে। ও হাঁটতে হাঁটতে মোড়ে এসে একবার দাঁড়াল। পিছন ফিরে দেখল। সেই লোকটাই আসছে। জয়পুর বা জোতুলপুরের বাস ধরতে বোধহয়। জায়গাটা নিরালা।

খিঁচাকবলা বাঁধের ওপরে উঠল। উঠে আবার নীচে নামল। বাঁধের জল অনেকখানি সরে গিয়েছে। সামনেই বেড়াগাছের ঝাড়। বাঁ দিকে

একটু দূরে কতগুলো শাল গাছ, খানিকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিচ্ছিন্ন, যেন নিজেদের একটা আলাদা শালের সংসার, বনের বিস্তৃতিতে মিশে নেই। খিঁচাকবলা সেই দিকে গেল। কেষ্ট বাঁধের এদিকে কেউ নাইতে আসে না। চারদিকে ঝোপঝাড় জঙ্গল, আর শুকনো পাতা ছড়ানো। খিঁচাকবলা শালগাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। চারদিকে একবার দেখে নিয়ে, একটা গাছের গায়ে ঠেস্ দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসল। পেটকোমর থেকে মানিব্যাগটা টেনে বের করল, কপালে ছুঁইয়ে, মুখ খুলল। প্রথম ভাঁজে কিছু কাগজ, শুকনো বেলপাতা আর ফুল। পরের ভাজে টাকা!...বুকে ঢাকের দগর বেজে উঠল। দশ টাকার নোট, একটা পাতলা গোছা। খান কয়েক পাঁচ টাকা। খিঁচাকবলা সব নোটগুলো বের করে গুনতে আরম্ভ করল। অই শালা, ইয়াকে কী বুলবেক গ! একশ পঁচিশ টাকা! তা বাদে, একটা বোতাম বন্ধ ছোট ঘরে কিছু খুচরা।

খিঁচাকবলা আপনমনে মাথা নাড়ল। ওর শিকরে বাজের চোখ দুটো এখন খুশিতে চকচক করছে, জ্বলছে না। উচ্চারণ করল, 'হুঁ কী কাণ্ড ছাখ ক্যানে, আঁ? এত টাকা ই ভাবে পকেটে নিয়ে কেউ পথে ঘাটে বেরায়?'

'হিঃ হিঃ হিঃ...।' উৎকট হাসিটা ঠিক পিছনেই শোনা গেল, বেরাবেক নাই ক্যানে? বাবুটার কপালের দোষ।'

খিঁচাকবলা কাঠবেড়ালির মতো লাফিয়ে উঠে ছিটকে সরে দাঁড়াল। এক হাতের মুঠিতে টাকা, অন্যহাতে ব্যাগ, বুকটা ধকধক করছে। সেই লোকটা, পিছনে পিছনে আসছিল। হাঁটুর ওপরে তোলা ময়লা খাটো ধুতি, তার চেয়ে ময়লা একটা বুক খোলা নীল রঙের জামা। বেঁটে খাটো শক্ত মাজা মাজা রঙের চেহারা। বয়স বোধহয় খিঁচাকবলার থেকে কিছু বেশি হবে। মাথার চুলে ধুলা। চোখ দুটো বড় আর লাল, নাকটা মোটা। দাঁত বের করে হাসছে, চোখ দুটো জলজ্বল করছে। খিঁচাকবলা জীবনে বোধহয় এমনভাবে কখনো চমকে ওঠেনি। কিন্তু লোকটা পুলিশ বা সেই বাবুটা নয় দেখে, যেন কিঞ্চিৎ ভরসা পেল, যদিও সন্দেহটা পুরোপুরি ঘুচল না। মনে মনে যে-কোনো অবস্থার জন্য তৈরি হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে তু?'

'পেরকাশ।' লোকটা খুশিতে ডগমগ হেসে বলল।

খিঁচাকবলা জিজ্ঞেস করল, 'কুথা থেক্যা আইছু?'

'ক্যানে, সনামুখীর উ বাসটা থেক্যা আইচি।' পেরকাশ নামে লোকটা হি হি করে হাসল।

খিঁচাকবলার হলুদ লাল ছোপ চোখের ভিতরে কালো তারা দুটো অঙ্গারের মতো জলে উঠল। পেরকাশ ঘাড় ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আবার বলল, 'অই বাবা, কী হাত গ তোমার! দেখ্যেচি, দেখ্যেচি!...উই শালা, আমার বুকটা ধড়ফড়াইচিল গ! মাকালীর দিব্যি, শালা আমার নিশ্বেস আটকাই গেইচিল। অই, কী হাত গ তোমার! হি হি হি।' সে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে খিঁচাকবলার দিকে এগিয়ে এল।

খিঁচাকবলা ঝটিতি পাক খেয়ে খানিকটা সরে গেল, 'এ্যাই শালা, আমার কাছকে এয়েচু কি তোর গদ্দান লিয়ে লুব। তোর ঘর কুথা?'

'রামসাগর।' পেরকাশ একটুও না দমে খুশি ডগমগ হেসেই বলল, 'ক্যানে, আমার গদ্দান লিবে ক্যানে? আমি ত কারুকে কিছু বুলি নাই।'

খিঁচাকবলা সে কথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী করিস তু?'

'বাউনাদিগের জমি চষি, বগার খাটি, মুনিষ মান্দার যা বুলা কর।' পরকাশ বলল, 'সনামুখীতে বাউর ঘর, শাউড়ির ব্যায়রাম—জুটো যাবেকগা, উয়াকে দেখতে গেইচিলাম। ঘরকে ফিরার পথে তোমাকে—উ বাবা, কী তোমার হাত গ! ভগবান দেখাই দিয়া করচে।' সে আবার নাচতে নাচতে খিঁচাকবলার দিকে এগিয়ে গেল।

খিঁচাকবলা কাঠবেড়ালির মতোই, গাছের আড়াল দিয়ে খানিকটা সরে গেল, 'কী চাস তু?'

'কী চাই? হি হি হি।' পেরকাশের হাসি আর ধরে না, 'কী চাই? অই, কী হাত গ তোমার! ছ কুড়ি পাঁচ টাকা, দেখ্যেচি, তুমি গনা করচিলে, হি হি হি, অই বাবা কী হাত গ তোমার। শালা, আমার কী বুক ধড়ফড়াইচিল, কিন্তু একটা কথা বুলি নাই।'

খিঁচাকবলার কাটাকুটি দাগ মুখটাও এখন চোখের মতো দপদপে অঙ্গার, 'ও শালা কী চাস তু?'

'হি হি হি, কী চাই?' পেরকাশ দুবার নেচে নিল। তারপরে বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে খিঁচাকবলার হাতের দিকে দেখাল,

'কারুকে কিছু বুলি নাই, তোমার পিচু পিচু চল্যে আইচি। আমার সনা তুমি, আদাআদি দিয়া কর।'

খিঁচাকবলা প্যান্টের পকেটে সব ঢুকিয়ে দিয়ে, খ্যাঁক করে উঠল, 'শালা,

তোর বাপের টাকা পেয়েছু ? আদাআদি ? এক পাই দুব নাই, যা ফুটে যা শালা।'

'অঁা, এক পইসা দিবে নাই ?' পেরকাশ যেন বিষম খেল, তারপরেই হঠাৎ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, 'অই আমার সনা তোর পায়ে ধরা করচি, মরে যাবকগা।' বলেই খিঁচাকবলার দিকে ঝাঁপ দিল, আর আছড়ে পড়ল ওর পায়ের কাছে, 'তোর পা ধরা করছি, উ টাকার আদা না পেলো মরে যাবকগা।' অঁাউ অঁাউ করে কাঁদতে লাগল।

খিঁচাকবলা জীবনে এমন চমকায়নি, এত অবাকও বোধহয় কখনো হয়নি। লোকটার কান্না শুনে কেউ না আবার এসে পড়ে। ও আশেপাশে তাকাল, কয়েক পা সরে গিয়ে বলল, 'এ্যাই শালা, এ্যাই ক্যাল্লাইটা ওঠ্। পাঁচ টাকা দুব, লিয়ে ফুটো যা।'

'অই সনা আমার ঘরে যাবকগা।' পেরকাশ মুখে জামায় ধুলা মেখে, উঠে ঝুঁকে বসল। মুখ তুলল, লাল চোখে জল, বলল', 'উ বড় মাথার টাকা রে সনা। অই বাবা, কী তোর হাত। কী করবি তু উ টাকা দিয়া ? মদ খাবি ? য্যাতো খাবি, আমি দুব। বারোভাতারিদিগের ঘরকে যাবি ? ক্যানে সনা, তু আমার ঘরকে চল্, তোকে এক ভাতারি দিয়া করবক ?'

খিঁচাকবলার মোটা ভুরু শুয়াপোকার মতো ঢেউ দিল, 'এক ভাতারি ?'

'হঁ, আমার বউ, দুই বিয়ানী বউ, কিন্তুক গতরে এখনো শাঁস জল ভরা, মাকালীর দিব্যি।' পেরকাশ দু হাত তুলে জোড় করল, 'উ তোকে তুষে খুশে খাওয়াবেক। তু আমার ঘরকে চল্ সনা।' সে যেন থরথর কাঁপছে। ধুলায় আর গালের জলে মুখটা যেন থেকে থেকে দলা পাকিয়ে উঠছে। ঠাস ঠাস করে বুকে চাপড়ে বলল, 'উ টাকা লিয়ে, তু আমার ঘরকে চল র‍্যা সনা। বউ তোকে তুষে খুশে খাওয়াবেক। কথা না মানলে, উয়াকে আমি খুন করবক। চল্ সনা, চল্।'

খিঁচাকবলা হতবাক। ওর জীবনে এমন কাণ্ড কখনো ঘটেনি। শালা বুলে কী হ্যা ? দেখে মনে হচ্ছে, লোকটার কোনো ব্যয়রাম আছে। তা না হলে কেউ এরকম করে ? এসব কথা বলে ? পাগলও হতে পারে। এখনই হাতে পায়ে খিঁচুনি লাগবে না তো ? লোকটাকে আসল খিঁচাকবলা মনে হচ্ছে। আর এইভাবে যদি কেঁদে ককিয়ে চেঁচাতে থাকে, তা হলে লোকজন এসে পড়বেই। ভাবতে ভাবতে খিঁচাকবলা মন ঠিক করে

ফেলল। চারপাশে দেখল, প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুঠো করে টাকা ব্যাগ ধরল।

'দিবি সনা, টাকা দিবি ?' পেরকাশের জলে ভেজা লাল চোখে একটা উৎকট ঝলক লাগল। গোটা শরীর থরথর করে কাঁপছে, ঠোঁটের কষে গাঁজলা।

খিঁচাকবলা ঘূর্ণিবাতাসের মতন পিছন ফিরল। তারপরে পুব দিকে বাঁধের উঁচু পাড়ের দিকে হাওয়ার আগে ছুটল। পিছন থেকে মরণের আর্তনাদ ভেসে এলো। 'অই মানিক আমার, সনা র‍্যা আমার, টাকা দিয়া যা—অই-ই-ই...।'

খিঁচাকবলা একটুও না থেমে, একবারও পিছু না ফিরে, বাঁধ টপকে রাস্তার বাঁদিকে শালবনে ঢুকে, দৌড়তে লাগল। বনের ভিতর দিয়ে, দুরন্ত বেগে, ধাক্কা বাঁচিয়ে পুব দিকে ছুটতে ছুটতে এক সময়ে দাঁড়াল। না, লোকটার পায়ের শব্দ প্রথম থেকেই শোনা যাচ্ছিল না। চিকোরটাও জঙ্গলে ঢোকার পরে আর শুনতে পায়নি। খিঁচাকবলা হাঁপাচ্ছে, দরদর করে ঘামছে। আশেপাশে তাকিয়ে বুঝল, অনেকটা ছুটে এসেছে। জয়পুরের এই জঙ্গলটাকেও বিশ্বাস নেই। এ হাত সাফাইয়ের ধন তাকে খাবে। হ্যাঁ, এ বনে অনেক কাঁচা খেকো বাঘেরা ছুরি বন্দুক নিয়ে ঘোরা-ফেরা করে। ও তাড়াতাড়ি দক্ষিণে ঘুরে রাস্তার দিকে চলল। আর ভাবতে লাগল, কী নাম শালার? পেরকাশ। ব্যায়রাম আছে, না পাগল? কী করে বাসের মধ্যে দেখল? যদি একবার মুখ খুলত— উঃ শালা! মার খেয়ে মরে যেতে হত। তা বলে আধাআধি বখরা? কেউ দেয়? আনৃথা একটা লোক, পুলিশ না, বাবু না, আধাআধি? আবার বলে কিনা, একভাতারি বউকে দেবে? উই শালা।...কিন্তু দশ বিশ দেওয়া উচিত ছিল। খিঁচাকবলার বিচারে, মনটা একটু নরম হয়ে গেল। সত্যি, শালা বাসের মধ্যে টু শব্দ করেনি। না, পঁচিশ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাড়ি নিয়ে যেতে চাইল যে?

ভাবতে ভাবতে, আর শিকরে বাজের চোখে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে, রাস্তায় এসে পড়ল। পড়তেই গোঁ-গোঁ শব্দ শুনে, পুবে তাকিয়ে দেখল, একটা বাস আসছে। দেখেই চিনতে পারল, আরামবাগের বাস, বিষ্ণুপুরে যাবে। ও ঝটিতি পকেটে হাত দিয়ে ব্যাগটা বের করে, বোতাম খুলে কিছু খুচরো পয়সা বের করে নিল। আবার পকেটে সব

ঢুকিয়ে, ভিতরে মুঠো পাকিয়ে রাখল। বাসটা এসে পড়েছে। ও হাত তুলল। বাসটা একটু গতি কমাল। ও লাফিয়ে উঠে পড়ল। পকেটটা সাবধান। চোরের ওপর না বাটপাড়ি হয়ে যায়।

পরমুহূর্তেই খিঁচাকবলার মনে একটা সন্দেহ কাঁটার মতো ফুটল। পেরকাশও যদি বাসের জন্য রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে? যদি বাসে ওঠে? উই শালা, সব বরবাদ। তবে বাসটায় ভিড় আছে। ওর নাম খিঁচাকবলা। ঠিক লুকিয়ে পড়তে পারবে। ভাবতে ভাবতেই বাসটার গতি কমে এলো। কমতে কমতে দাঁড়িয়ে পড়ল। কনডাকটর হাঁকল, 'কী হইচে, ডাঁড়াইচ ক্যানে?'

ড্রাইভারের গলা শোনা গেল। রাস্তার মাঝখানকে একটা লোক শ্যালা শুয়্যা রইচে। মাতাল হচ্ছে।'

কনডাকটর নামল, সঙ্গে আরো কয়েকজন কৌতূহলী যাত্রী। খিঁচাকবলা নির্ভয়। রাস্তায় মাতাল শুয়ে আছে। পরকাশ না। জায়গাটা অবিশ্যি বিষ্ণুপুরে ঢোকার মুখের কাছেই।

কনডাকটরের চিৎকার শোনা গেল। 'অই, ই লোকটা ফুটো গেইচে, মড়া।'

চিৎকার শুনে আরও কিছু লোক নামল। মড়া? খিঁচাকবলা দরজার কাছে মুখ বাড়াল। পেরকাশ! মড়া?

কনডাকটর আবার চিৎকার করল, 'মুখের কষে রক্ত। বুকে ধুকধুকি নাই। নিশ্বাস পড়ছে নাই। মড়া।'

খিঁচাকবলা নেমে পড়ল। ড্রাইভার হাঁকল, 'আরে, সব রিয়া দেখতে যাইচে কী? চল চল, থানায় যেইয়ে খবর দিতে হবেক।' সে জোরে জোরে হর্ন বাজাল।

যাত্রীরা দৌড়ে বাসে উঠল। সব শেষে কণ্ডাকটর। কিন্তু খিঁচাকবলা উঠল না। বাসটা জঙ্গলের একেবারে ধার ঘেঁষে। মৃতদেহটা বাঁচিয়ে পেরিয়ে গেল। খিঁচাকবলা রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকা পেরকাশের কাছে গেল। হ্যাঁ, ঠোঁটের কষে রক্ত, চোখ দুটো আধ বোজা, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। মড়া? ও নিচু হয়ে গায়ে হাত দিল। এখনো গরম, কিন্তু সত্যি বুকের ধুকধুক নড়ছে না। নাকে নিশ্বাস নেই। দেখলেই বোঝা যায়, মরে গিয়েছে। কেন? মরে গেল কেন? সত্যি ব্যায়রাম ছিল নাকি? না, টাকার শোকে?

খিঁচাকবলা সোজা হয়ে দাঁড়াল। এই মুহূর্তে ওকে ভূতগ্রস্তের মতো দেখাচ্ছে। মরে গেল কেন? খুব কাঁদছিল। খুব আশা করেছিল, টাকা পাবে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না। খিঁচাকবলা সচেতন হয়ে পা বাড়িয়ে আবার থমকে দাঁড়াল। লোকটার পকেট ট্যাঁক একবার ঘেঁটে দেখে গেলে হত না? কিছু কি আর নেই? ও মৃত পেরকাশের দিকে একবার তাকাল। তারপর মনে মনে বলল, 'যাক গা, উয়রটা উয়ারই থাক।' ও হাঁটতে আরম্ভ করল। কোথায় যেন ঘর বলছিল? রামসাগর। নাম পেরকাশ! সত্যি, শালা যদি বাসে একটু আওয়াজ দিত, উই শালা! ভাবা যায় না। চলতে চলতে উচ্চারণ করল, 'একবার রামসাগরকে যেতো হবেক। হুঁ, উয়ার ঘর গেরস্তি দেখ্যা আসব। উয়ার দুই বিয়ানী বউ··· কিন্তু শালা আমতাবাড়ি ফুটো গেইল ক্যানে?'...

শম্ভু মিত্রঃ পাড়ি

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তেইশে জুলাই রবিবার অ্যাকাডেমি মঞ্চে নাট্যাচার্য শম্ভু মিত্র তাঁর 'চাঁদ বণিকের পালা' পাঠ করলেন। সাড়ে পাঁচটায় শুরু, শেষ হতে দশটা বেজেছিল। দুবারে মোট পঁচিশ মিনিট বিরতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ, পাঠ করতে সময় লাগে পুরো চার ঘণ্টা।

বছর দুই আগে কাগজে দেখেছিলুম বয়েসের কারণে শম্ভুবাবু নাট্যজগৎ থেকে বিদায় নিতে চেয়েছেন। কত বয়েস হয়েছে তাঁর? নিজেই বলেন—প্রায় সত্তর। আর, কে না জানে বাঙলা ভাষায় দু-অক্ষর বিশিষ্ট এই 'প্রায়' শব্দটির ধারণশক্তি কী মারাত্মক!

সম্প্রতি কয়েকবার আমি 'চার অধ্যায়' 'রাজা অয়দিপাউস' ও 'দশচক্র' দেখেছি। শম্ভু মিত্রের যে 'বয়েস' হয়েছে তা অবশ্য কখনোই বুঝতে পারি নি।

পাঠের আসরে দেখলাম নিজেকেও তিনি নিজেই অতিক্রম করলেন। মঞ্চে গাঢ় নীল চাদরে মোড়া চৌকি—অনেকটা বেদির আদল আসে। হয়তো সমুদ্রের কথা ভেবেই চাদরের রঙ নীল। বেদির ওপর শম্ভু মিত্র প্রায় পদ্মাসনে বসা। সামনে একটি ডেস্ক, ডেস্কে পাতা-খোলা 'চাঁদ বণিকের পালা'—পৃষ্ঠাসংখ্যা নিতান্ত কম নয়, কার্যত পুরোটাই পড়া হবে।

নিরাভরণ মঞ্চ, পর্দাও তোলাই ছিল। তৃতীয় বেল বাজতে প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভে গেল, শম্ভু মিত্র এসে বেদিতে বসলেন। ধুতি, গেরুয়া পাঞ্জাবি;

চোখে পুরু লেন্স আর চওড়া ফ্রেমের চশমা। মঞ্চের ভেতর ডানদিকের কোণ আর হলের প্রায় মাঝখানকার উঁচু ছাদ থেকে দুটি মাত্র আলো নির্দিষ্ট ব্যাস ও মাত্রায় বেদির ওপরটা আলোকিত করেছে।

শম্ভুবাবু প্রথমে মুখে মুখে 'চাঁদ বণিকের পালা'র মঞ্চ-পরিকল্পনাটি বুঝিয়ে বলেন। বলতে বলতেই পাঠ শুরু হয়ে যায়—এমন আটপৌরে ভাবে, যে, গোড়ায় অনেকে সেটি বুঝতে পারেন নি। তারপর পাঠ চলতেই থাকে।

আমাদের দেশে টিকিট বিক্রি করে নাটক পাঠের অনুষ্ঠান এই প্রথম। প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ ছিল। পরিচিত অনেকে চেষ্টা করেও টিকিট পান নি। পঁয়ত্রিশ বছর ভারতীয় নাট্যসাধনার বেদিমূলে তিলে তিলে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করে এইটুকুই তাঁর অর্জন। অবশ্য, এ বড় সামান্য প্রাপ্তি নয়!

অ্যাকাডেমিতে সেদিন কতজনের সঙ্গেই না দেখা হল, কথ ও! বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর অনেকে ছিলেন, একজনকে দেখে তো রীতিমতো চমকে যাই—এ-আসরে কে তাঁকে প্রত্যাশা করবে? একটি হিন্দি নাট্যগোষ্ঠীর প্রায় সকলে উপস্থিত। আকাশবাণী আর দূরদর্শনের কিছু কর্মীও এসেছেন—অবশ্য শ্রোতা হিসেবে। তাছাড়া ছিলেন দিক্‌পাল সাহিত্যিক, পুরস্কৃত কবি, খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী, নামী-দামী সাংবাদিক, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র, ডাক্তার, সমাজসেবী, বামপন্থী রাজনৈতিক দলের কর্মী, সপরিবার আটপৌরে গৃহস্থ, এমনকি পেশায় দপ্তরি এমন এক যুবক। এলিট আর নাম-পরিচয়হীন মুখের সে এক অবিস্মরণীয় মেলা।

শুনেছিলাম সাড়ে তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠান, নটায় শেষ হবে। ঠিক এক ঘণ্টা বেশি সময় লেগেছে। পাঠ চলাকালে দোতলার একজন আর একতলার তিনজন চলে যেতে বাধ্য হন। দোতলার ভদ্রলোক ওঠার সময় সীটে একটু শব্দ করে ফেলেন—স্তব্ধ প্রেক্ষাগৃহ ছুরিকাঘাতে চমকে ওঠে যেন। ঘাড় হেঁট করে ভদ্রলোক আস্তে বেরিয়ে যান।

রুদ্ধশ্বাস শ্রোতাদের মেরুদণ্ড সোজা রেখে পাঠ শুনতে হয়েছে। হেসে উঠে কখনো কেউ সরাসরি রেসপণ্ড করেছেন। কেউ বা নিঃশব্দে চোখ মুছেছেন। সনকার মনসা পূজার কথা চাঁদ যখন টের পায়, অথবা লখিন্দরের বাসর পাহারা দিতে দিতে যখন চাঁদ ও সনকা নিজেদের মধ্যে কথা বলে, কিংবা একেবারে শেষে সর্বস্বান্ত নিঃসঙ্গ প্রায় স্থবির চাঁদ যখন তার মৃত সঙ্গীদের স্মরণ করে নিজের পাড়ি দেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করে—তুচ্ছতায় আকণ্ঠ নিমগ্ন চারপাশের জগতটা যখন মিথ্যে হয়ে গেছে আর স্বপ্নের মধ্যে

জেগে উঠছে মৃত অভিযাত্রীরা—তখন এই প্রতিবেদকের পক্ষেও চোখের জল সামলানো সম্ভব হয় নি।

অথচ পাঠ মাত্র। সেট নেই। বিভিন্ন চরিত্রের প্রবেশ-প্রস্থান নেই। আলো আর সঙ্গীতের মায়া নেই। শূন্য মঞ্চে নীল বেদিতে শম্ভু মিত্র একা। ঘণ্টা দেড়েক বাদে, প্রথম বিরতির পর, তাকিয়ায় ভর দিয়ে কিছুক্ষণ একটু যেন আড় হয়ে বসেছিলেন। দ্বিতীয় বিরতির পর আবার প্রায় পদ্মাসন। তিন ঘণ্টার ওপর এইভাবে বসা আর চার ঘণ্টা একটানা অভিনয়ের মেজাজে নাটক পাঠ—শম্ভু মিত্রের সামর্থ্যের এহেন প্রাচুর্য—যে-কোনো যুবককেই স্তম্ভিত করবে।

মৃত লখিন্দরকে নিয়ে বেহুলার ভেলা ভেসে গেছে, সনকা পাগলিনী, বিশ্বস্ত পুরনো ভৃত্য ন্যাড়া ছাড়া স্থবির চন্দ্রধর সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—অন্ধকারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার উপাসক চম্পকনগরী বীর চাঁদ বণিককে নিঃশেষে ভুলে গেছে। নাটকের এই পর্যায়ে মঞ্চের পেছন দিককার উঁচু ছাদ থেকে অপেক্ষাকৃত ম্লান একটি আলো এসে শম্ভুবাবুর মাথা ছাপিয়ে বেদির ওপর পড়ে। সামনের আলোটি নিভে যায়। শম্ভুবাবুর মুখে তাঁর চুলের ছায়া। আলো আরো মিইয়ে আসায় রীতিমতো ইলিউশন সৃষ্টি হয়। শম্ভু মিত্রকে আর চেনা যায় না। বৃদ্ধ চন্দ্রধরের কণ্ঠস্বর বা বাক্‌ভঙ্গিও বদলে যাওয়ায় মঞ্চ থেকে 'শম্ভু মিত্র' একেবারে অদৃশ্য হন।

কিন্তু আলোর এই মায়া ছাড়াও যে নাট্যাচার্য তাঁর পাঠের যাদুতে শ্রোতাদের মনে একই বিভ্রম সৃষ্টি করতেন তাতে সন্দেহ নেই।

॥ দুই ॥

'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি কেমন সে-আলোচনা বিশেষজ্ঞরা করছেন ('পরিচয়'-এ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা 'সাহিত্য সংখ্যা'য় প্রকাশিত হয়েছে)। আমি বিশেষজ্ঞ নই, নিজের অনুভবটুকুই শুধু বলতে পারি। বাঙলা ভাষায় 'রক্তকরবী' ছাড়া কোনো নাটক পড়ে এত অভিভূত আমি কখনই হই নি।

এই নাটকের স্ট্রাকচার আলাদাভাবে আলোচ্য। অঙ্ক নেই, আছে পর্ব। সংস্কৃত বা পশ্চিমী—কোনো মডেলই অবিকল মানা হয় নি। কেউ কেউ বৃথাই গ্রীক ট্রাজেডির সঙ্গে 'চাঁদ বণিকের পালা'র সাদৃশ্য খুঁজছেন। প্রচলিত যাত্রাপালাও এটি নয়।

শম্ভু মিত্রের অক্ষয় কীর্তি হল মঙ্গলকাব্যের বহুল পঠিত কাহিনী আর চরিত্রকে আমাদের সাম্প্রতিক এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ফ্রেমে বাঁধতে পারা। ফলে গোটা ব্যাপার এক নতুন মাত্রা ও তাৎপর্য পেয়ে যায়।

প্রায় পাঁচশো বছর ধরে—সেই মধ্যযুগ থেকেই—বাঙালি জাতির স্মৃতিতে চৈতন্যে যে-পুরাণকথা এক জাগ্রত সত্য, বাঙালি মায়ের চোখের জলে যে-বেহুলা আজও তার ভেলা ভাসায়…'চাঁদ বণিকের পালা'য় শম্ভু মিত্রের হাত সেই মীথের শেকড় ধরে টান দেয়।

নাটকের শেষ পর্বে চন্দ্রধরের সর্বনাশের চক্র সম্পূর্ণ হয়। এই বৃদ্ধ বয়েস পর্যন্ত এত মৃত্যু এত বিপর্যয় সত্ত্বেও অজ্ঞান আর অসত্যের অধিষ্ঠাত্রী মনসাকে সে স্বীকার করে নি। কিন্তু, বেহুলার কাছে লখিন্দরের পুনর্জীবনের শর্ত শুনে "আহত জন্তুর মতো" "দীর্ঘ আর্ত চীৎকার" করে উঠে শেষ পর্যন্ত তাকে বলতে হয়: "শিব, শিব, কি খেলা খেল্যেছ তুমি,—তবু তোর খেলা আমি শেষাবধি খেল্যে যাব। দিব, পূজা দিব, চাঁদ সদাগর আজ মনসার পূজা দিবে।" মৃত্যুর বিরুদ্ধে বেহুলার মানব-কল্পনা-পরাস্তকারী যুদ্ধের সম্মানে চাঁদ তার ইষ্ট-দেবতার প্রিয় বেলপাতা দিয়ে—অবশ্য বাঁ হাতে, ঐটুকুই তার প্রতিবাদ—মনসাকে অর্ঘ্য দিতে গেল। কথা তো ছিল লখাই সাগরে পাড়ি দেবে! হয়তো নতুন প্রজন্মের মুখ চেয়েই সদাগর নিজে হেরেও বেহুলাকে জিতিয়ে দিতে চায়। কিন্তু লখিন্দরের আধুনিক বিবেক ("দয়া করো তোমরা দুজনে এট্টা কয়্যা দিবে? কেন যে তোমরা সন্তানেরে জন্ম দেও? এই হেন কুৎসিত জগতে কেন আমাদেরে আনো?"—লখিন্দর প্রশ্ন করে চাঁদকে। আবার অনেক দুঃখে এক সময় বোঝে পিতৃপুরুষরাও তো "…এর চায়্যা ভালো কোনো পৃথিবীরে পায় নাই।" চাঁদকে বলে: "তুমি পুনর্বার পাড়ি দেও পিতা।…আমি অনুচর হয়্যা সাথে-সাথে যাব।" আত্মপরিচয়সন্ধানী দ্বিধাদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত লখিন্দরের মধ্যে আধুনিক তরুণের প্রেমিক আর প্রতিবাদী চরিত্রটি তার সমস্ত জটিলতা সহ মূর্ত হয়ে ওঠে। সে-কারণেই পুনর্জীবনের প্রশ্নে তার বিবেক) পিতাকে সত্যভ্রষ্ট করে, ধর্মপত্নীর আত্মহত্যার কারণ হয়ে, মনসার নোংরা মুঠি থেকে জীবনভিক্ষা নেওয়ার অসম্মান সয়ে বেঁচেবর্তে থাকার প্রস্তাবে সায় দিতে পারে না। জীবনের সাধ বেহুলারও ঘুচেছে। 'তেত্রিশ কোটি'কে লাস্যনৃত্য দেখিয়ে সায় বেনের কন্যা মৃত স্বামীর জীবন ফিরে পেয়েছে। কিন্তু, সেই সঙ্গেই হয়েছে পুরনো বেহুলার মৃত্যু। উদভ্রান্তের মতো চাঁদের হাত ধরে বেহুলা বলে: "শ্বশুর, আজ আমি যে অনেক জেন্যেছি। ঢের কিছু

জেন্মেছি যে আজ। আর তাই সেই পুরানো বেহুলাটারে বোকা মনে হয়।" লখিন্দরও বলে : "ওঃ! জানার যে কী প্রচণ্ড কষ্ট—!" এই নষ্ট পরিবেশে আধুনিক প্রজন্মের দুই তরুণ-তরুণী তাদের innocense-এর বিনিময়ে যে দুর্ভার জ্ঞান পেয়েছে তা জীবন নয় মৃত্যুর দিকে তাদের ঠেলে দেয়। তাই 'মনসামঙ্গল'-এর বেহুলা-লখিন্দর মনসার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য চিরজীবী হলেও 'চাঁদ বণিকের পালা'র বেহুলা-লখিন্দর শুদ্ধতা ছিন্তাইয়ের প্রতিবাদে আত্মবিসর্জন দেয়। বাঁ হাতে পুজো সেরে ফিরে এসে চন্দ্রধর পুত্র আর পুত্র-পুত্রবধূর বিষনীল মৃতদেহ দেখে। জীবন-পিপাসাকে মর্যাদা দিতে সে বিবেক-বিরুদ্ধ আপস করেছিল। ("এই নেয়ে অন্ধকার মনসাসর্পিনী, চাঁদ সদাগর বাঁও হাতে পুজা দিল তোর।···আমার যা হয় হোক, বেহুলা-লখারে ছেড়্যা দেরে তুই।" কিন্তু চাঁদ তো আগেই বুঝেছে : "জীবনের থিক্যা অঙ্ক কষ্যা-কষ্যা শিবাইয়ে পৌছাতে চাই, সেথা শিবাই মেলে না। আর শিব্যায়ের থিক্যা অঙ্ক কষ্যা-কষ্যা জীবনে পৌছ্যাতে চাই, দেখি জীবন মেলে না।" তখন সেই পরিপূর্ণ সর্বনাশের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে (এমনকি শিবভক্ত ন্যাড়াও আঘাটায় বাঁধা ডিঙিতে গিয়ে লখিন্দরকে সদাগরের আহ্বান জানিয়ে বনের ভেতর চলে গেছে) প্রটাগনিস্ট চাঁদ অজ্ঞান আর অসত্যের বিরুদ্ধে জীবনের তরী নিয়ে নতুন করে পাড়ি দেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করে :

> নোঙর তো কেট্যে দেছে শিব।—প্রস্তুত সবাই? হৈ-ঈ-ঈ-য়াঃ। কতো বাঁক জল দেখ। তল নাই?—পাড়ি দেও। এ আন্ধারে চম্পকনগরী তবু পাড়ি দেয় শিবের সন্ধানে।···

শম্ভু মিত্রর হাতে আমাদের মীথ এইভাবে পুনর্গঠিত হয়।

এর জন্য তাঁকে নিজের ভাষা তৈরি করে নিতে হয়েছে। তা একেবারে দেশজ বাঙলা। একদিকে মঙ্গলকাব্যের ভাষা ও ছন্দ, অন্যদিকে ইয়োরোপীয় সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাঙলা ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে কতখানি অবহিত হলে এই ভাষায় লেখা যায় ভেবে অবাক মানি।

'পরিচয়' আপিসে বছর দুই আগে চাঁদ বণিকের পালা'র নির্বাচিত অংশের পাঠ শুনে শঙ্খ ঘোষ একান্তে বলেছিলেন "আমরা কাব্যনাট্যে ভাষা ও ছন্দের যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারি নি শম্ভুবাবু তা অনায়াসে করেছেন।"

বেশ কয়েক বছর ধরে একটু একটু করে যখন এ পালা লেখা হচ্ছিল,

মঞ্চে শম্ভু মিত্র তখন প্রধানত 'রাজা অয়দিপাউস' ও রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনা করছিলেন। গ্রীক ট্র্যাজেডি আর রবীন্দ্রনাটকের ধ্রুপদী ও লিরিক্যাল বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে কিভাবে তিনি আমাদের লোকায়তে পৌঁছলেন? শম্ভুবাবুর এই মানস-অভিযান চাঁদ বণিকের মতোই ইতি আর নেতির দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত হয়ে থাকবে। একই কালপর্বে লেখা অনেকগুলি প্রবন্ধে (দ্র. 'প্রসঙ্গ : নাট্য') তিনি পশ্চিমের নকলনবিশিতে তৃপ্ত আমাদের নাট্যআন্দোলনকে ভারতীয় নাট্যের সত্তাসন্ধানে ব্যাকুলভাবে আহ্বান করেন। (অবশ্য বলে রাখা ভালো তাঁর নাট্যজীবনের শুরুতেই এর সূত্রপাত।) এই ব্যাকুলতা, এই ভারতীয়তার বোধই 'চাঁদ বণিকের পালা'য় শম্ভু মিত্রকে বাঙলা নাটকের প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে।

বছর কুড়ি আগে ছোট একটি পত্রিকায় কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলীযাত্রা' প্রকাশিত হয়। তাঁর এই উপন্যাস ও 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্প আমাদের ভাষার সম্পদ। বাঙলা কথাসাহিত্যে, সন্দেহ নেই, কমলকুমার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু, সমকালীন গরিষ্ঠ সংখ্যক লেখকের ভাষাব্যাপারে অবহিতির একান্ত অভাব, দায়িত্বহীন ব্যবহারে ব্যবহারে শব্দকে ঘষা পয়সার মতো বিবর্ণ করে ফেলা, স্রষ্টার অহংকার বিসর্জন দিয়ে পাঠক মনোরঞ্জক ভূমিকা গ্রহণ কমলকুমারকে প্রগাঢ় অভিমানে ক্রমেই একরোখা আতিশয্যপরায়ণ করে তোলে। নিজেকে তিনি শব্দের পিঞ্জরে বন্দী করে বসেন।

কমলকুমার ভাষাশিল্পী। তাই মহাকালের মুখ চেয়ে পাঠকদের সঙ্গে সংযোগের দায় আপাতত উপেক্ষা করতে পারলেন। কিন্তু শম্ভু মিত্র নাট্যশিল্পী। দর্শকদের ভুলে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, ভুলতে তো তিনি চানও না। তাঁর সৃজনধর্মই যে মানবকেন্দ্রিক। তা সমকালীন ও প্রত্যক্ষের দায় অস্বীকার করে না।

ফলে প্রায় একই ঘাট থেকে যাত্রা শুরু করে কমলকুমার তাঁর বাবু সংস্কৃতির উত্তরাধিকার, ফরাসী ভাষাচর্চার অভিজ্ঞতা ও গ্রামীণ সংস্কৃতির গভীর জ্ঞান নিয়ে দেবভাষায় আশ্রয় খোঁজেন : তৎসম শব্দপ্রধান ভাষার দুর্ভেদ্য এক দুর্গ—সমকালের তাবৎ বদরুচিকে যা হিমালয়ের মতো অটল সহিষ্ণুতায় প্রতিহত করবে। গড়ে তোলেন ছদ্মক্লাসিক ভঙ্গি। অনুপুঙ্খের দীর্ঘ চমকপ্রদ বর্ণনায় বিমূর্তকে শব্দে বাঁধেন। কখনো তা ছবি, কখনো বা আধুনিক চলচ্চিত্রের মন্তাজ। কিন্তু, দীক্ষিত পাঠকও কমলকুমারের দুর্গে

নিজেকে অকিঞ্চিৎকর না ভেবে পারেন না। বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার জন্য তাঁকে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়াতেই হয়।

আর, প্রায় একই ঘাট থেকে যাত্রা শুরু করে শম্ভু মিত্র তাঁর সমস্ত আধুনিকতা নিয়ে তীর্থযাত্রা করেন লোকায়তের দিকে।

শম্ভুবাবুর এই প্রয়াস ও অর্জন সম্পর্কে কতটুকুই বা আমরা ভেবেছি ?

॥ তিন ॥

'চাঁদ বণিকের পালা' কবে মঞ্চস্থ হবে জানি না। শুনেছি একবার মহলা শুরু করে শম্ভুবাবু এ-নাটক প্রযোজনার ইচ্ছে ত্যাগ করেন। তারপর তাঁকে চিঠি লিখে মুখে যতবারই অনুরোধ করা হয়েছে সেই বিখ্যাত হাসি হেসে ততবারই তিনি ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়েছেন।

আমি মনে করি আজ আমাদের সংস্কৃতিক্ষেত্রের জাতীয় দাবি হওয়া উচিত —নাট্যাচার্য শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় 'চাঁদ বণিকের পালা'র আশু অভিনয়। শুধু দাবি নয়, এর জন্য চারদিক থেকে সাহায্যের হাতও বিনয়ের সঙ্গে প্রসারিত করতে হবে।

আর, যতদিন না মঞ্চে পুরোদস্তুর নাটকাভিনয় হচ্ছে—লোভীর মতো ততদিন আমরা শম্ভুবাবুর কণ্ঠে 'চাঁদ বণিকের পালা' বারবার শুনতে চাইব।

এই হতভাগ্য দেশে সম্পূর্ণ পাঠটি তো কেউ টেপ করেও রাখবেন না— তার খরচ মাত্র শ দুই টাকা হবে। কান ঝালাপালা করা গান আর ভাঁড়ামির বদলে আমাদের রেকর্ড কম্পানিগুলি তো এই পাঠ ডিস্ক করবেন না (বহু কাঠখড় পুড়িয়ে এতদিনে মাত্র 'রাজা অয়দিপাউস' রেকর্ড হয়েছে)। আমাদের 'আকাশবাণী' পর পর কয়েকদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ধারাবাহিক-ভাবে তো এই পাঠ প্রচার করবেন না—তাঁদের যে রসোত্তীর্ণ প্রোগ্রামের বড় চাপ! আমাদের চলচ্চিত্রজগতে কোটি কোটি টাকা উড়ছে—কারোর মনে হবে না এই পাঠের একটা ছোট্ট ডকুমেণ্টারি তুলে রাখি। 'মাদার কারেজ' নাট্যপ্রযোজনাটি সম্পূর্ণই ফিল্মে ধরা থাকে। আজ অবধি 'রক্তকরবী' 'চার অধ্যায়', 'ডাকঘর' বা শম্ভু মিত্র নির্দেশিত কোনো নাটকই তো চলচ্চিত্রে ধরে রাখা হল না। সংস্কৃতিব্যবসায়ীদের বর্তমান সম্পর্কেই কোনো দায় দেখি না, ভবিষ্যকালের জন্য তাঁদের কাছে কোন অবহিতি প্রত্যাশা করব ? যেমন

উনিশ শতকে তেমনি আজও দেহপট সঃনে নটের সকলি ফুরাবে। আর মানুষ চাঁদে হাঁটবে, ভারতও পরমাণুর রহস্য ভেদ করবে।

শম্ভু মিত্রর নেতৃত্বে 'নাটমঞ্চ প্রবর্তনা সমিতি' নাটক করে কয়েক লক্ষ টাকা জমিয়েছেন। সুবিধে মতো জায়গায় এক টুকরো জমি পেলে তাঁরা একটি উপযুক্ত নাট্যশালা তৈরি করতেন। এবং নিরীক্ষামূলক নাট্যপ্রদর্শনের জন্য ছোট একটি হল। নাটকের সঙ্গে সম্পর্কিত সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্রকলা প্রভৃতি মাধ্যমের গুণীদেরও তাঁরা এক প্ল্যাটফর্মে সৃজনশীল সক্রিয়তায় জড় করতে চেয়েছিলেন। মূল উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন উদয়শঙ্কর, আলি আকবর খাঁ, সত্যজিৎ রায়, বিষ্ণু দে, পরিতোষ সেন প্রমুখ গুণীজন।

যুক্তফ্রন্ট, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বা বর্তমান মন্ত্রিসভা—কেউই জমি দেন নি। নাটমঞ্চ সমিতি গত দশ বছর বৃথাই দোরে দোরে মাথা ঠুকেছেন।

শম্ভুবাবু কারো কাছেই গ্রাহ্য হন নি।

এই একটি জায়গায় শম্ভু মিত্র আর চাঁদ সদাগর এক মাটিতে দাঁড়ান। শেষ পর্যন্ত চাঁদ মনসার পুজো দেয়, কিন্তু বাঁ হাতে। তার অর্ঘ্য শিবপুজার বেলপাতা। শিবাইকে সে ত্যাগ করে না।

শম্ভু মিত্রও ত্যাগ করেন না তাঁর নাট্যকে, নাট্যাদর্শকে। তাঁর শিবকে।

॥ চার ॥

কোনো সংবাদপত্রে সেদিনের নাটকপাঠ সম্পর্কে একটি পংক্তিও প্রকাশিত হয় নি। যদিচ, বাজারে সংস্কৃতি-অভিমানী কলাম-লিখিয়ের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। আমাদের সংবাদপত্রগুলি যদি আত্মবিস্মৃত না হত তাহলে টিকিট বিক্রি করে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে 'চাঁদ বণিকের পালা' পাঠ আপন গুরুত্বেই সেদিনের অন্যতম প্রধান সংবাদ হতে পারত। স্থানীয় দূর-দর্শনকেন্দ্রও কত কাছের ঘটনা চোখ খুলে দেখেন না!

এই পরিপূর্ণ মাৎস্যন্যায়ে পণ্ডিতরা যখন নীরব, তখন নাট্যাচার্যের পাঠ সম্পর্কে অনধিকারী আমি কতটুকুই বা বলতে পারি?

যেন রামধনু। কখনো স্পষ্ট সাত রঙ, কখনো বা অপ্রধান রঙগুলি একটার সঙ্গে অন্যটা লেপ্টে নতুন বর্ণিকাবিভ্রম সৃষ্টি করে। আর বর্ণের এই বিচিত্র সমাহারকে ধরে থাকে যে-আকাশ—কে তার সীমার হদিশ পাবে? চন্দ্র-

সূর্য-গ্রহ-তারা সমাকীর্ণ সেই আকাশেই আছে বজ্রের দীপ্তি, রামধনুর সুষমা।

আমার কাছে শম্ভু মিত্র সেই আকাশ।

'চাঁদ বণিকের পালা'র ভিন্ন ভিন্ন, কখনো বা পরস্পরবিরোধী, চরিত্রগুলি তাঁর কণ্ঠস্বরের উদার আশ্রয়ে আপন স্বাতন্ত্র্য আর বৈশিষ্ট্য সহ মূর্ত হয়ে ওঠে। নিরাপত্তাসন্ধানী ভোগী অথচ জ্ঞানী বল্লভ আচার্য, নিষ্ঠুর কূট শাসক বেণীনন্দন, চম্পকনগরীর প্রচণ্ড মস্তানবাহিনী, ওঝা, সমুদ্র-অভিযাত্রী নাবিকের দল, ন্যাড়া, চাঁদ-সনকা-বেহুলা-লখিন্দর...প্রধান বা গৌণ প্রতিটি চরিত্রই নিজস্ব বাক্‌রীতি ও রক্তমাংসের মূর্তিতে সামনে এসে দাঁড়ায়। এমনকি শম্ভুবাবুর কণ্ঠস্বর পর্যন্ত বিভিন্ন চরিত্রের আদলে বদলে যায়।

বাসরে লখিন্দরের উদ্বেল প্রণয়পিপাসা আর বেহুলার দ্বিধা—সনকার উপদেশে একদিকে সে পুরুষের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে ভয় পায়, অন্য দিকে তার যৌবন তার সমগ্র অস্তিত্ব লখিন্দরের দিকে ধেয়ে চলে... দুই তরুণ-তরুণীর প্রথম ভালোবাসার এই রোমান্টিক আবেগতীব্র মুহূর্ত শম্ভুবাবু কি অনায়াসেই না মূর্ত করেন। পর মুহূর্তেই মদ্যপানরত প্রৌঢ় চাঁদ আর প্রবীণা সনকার প্রলম্বিত কথালাপ, বোঝাপড়া। সনকার জীবন ও সংসার নিজের আদর্শের অহংকারে যে পুরুষ তছনছ করে দিয়েছে—ভর্তা হলেও ভিন্ন গ্রহের অধিবাসী ছাড়া আজ সে কিছু নয়। সনকার শেষ আশ্রয় লখাই—বাঘিনীর মতো সে তার বাসর পাহারা দেয়। পুত-পুতের বৌ নিয়ে সনকা নতুন করে সংসার পাতার স্বপ্ন দেখে। হেন্তালের দণ্ড হাতে পুত্রের বাসর চাঁদও পাহারা দিচ্ছে। তার আশা কালরাত্রি কাটিয়ে যোগ্য পুত্র লখিন্দর পিতার মতোই সমুদ্রে যাবে।

এই প্রহরারত অবস্থায় যেন কয়েক শতাব্দী পরে দুজনের দেখা হয়—একদিন যারা অভিন্নহৃদয় স্বামী-স্ত্রী ছিল। শুরু হয় সনকার তিক্ত আত্মধ্বংসী অভিযোগ। দৃঢ় অথচ অসহায় চাঁদের উত্তরে, তার আলুথালু ছিরিছাঁদ দেখে আস্তে আস্তে সনকার মধ্যে নারী জাগে। তার ভাষা বদলায়, কণ্ঠস্বর। থেকে থেকে সনকা যখন চাঁদকে সদাগর বলে সম্বোধন করে (কখনো ক্ষোভে, কখনো করুণায়, কখনো ভালোবেসে), তখন আমার চোখের সামনে ফাঁকা মঞ্চটা আর ফাঁকা থাকে না। স্পষ্ট দেখতে পাই 'চাঁদ বণিকের পালা' অভিনয় হচ্ছে। সনকার ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র। শম্ভুবাবু তাঁর পাঠে এই অসম্ভব মায়া সৃষ্টি করেন।

চলচ্চিত্রের মতো আধুনিক নাটকও এক অর্থে নির্দেশকের সৃষ্টি। এই পাঠ শুনে 'বহুরূপী' সম্প্রদায়ের অভিনয় বৈশিষ্ট্যের রহস্যটি আরও স্পষ্ট হয়।

বুঝতে পারি গত প্রায় চল্লিশ বছরের নাট্যসাধনা কেন ব্যক্তি শম্ভু মিত্রকে প্রায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। কেন তিনি আজ ভারতীয় নাট্য আন্দোলনের সম্মানিত আচার্য।

॥ পাঁচ ॥

শম্ভুবাবু নিজের কাজ করে গেলেন, আজও করছেন। কিন্তু দেশবাসী আমরা তাঁর কোনো ঋণই শোধ করি নি।

সেই 'নবান্ন'র কাল থেকে যাত্রা শুরু করে শম্ভু মিত্র আজ 'চাঁদ বণিকের পালা'-র বহুতল ও মাত্রা বিশিষ্ট জটিল গভীর বাস্তববাদে পৌঁছেছেন। আমাদের নরম মাটির দেশে প্রায়ই ঠিক উল্টোটা ঘটে। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব-অভিমানী লেখক এক ধরনের অধ্যাত্মবাদ আশ্রয় করেন, বা. রহস্যময়তাকে প্রশ্রয় দিয়ে বসেন।

শম্ভু মিত্র এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম। তাঁর বাস্তবতাচর্চার স্বরূপটি আমরা অনেক সময়ই বুঝতে চাই নি। শম্ভুবাবুর নাটকে সাম্প্রতিক অনুপস্থিত বলে প্রায়শই ক্ষোভ করেছি। কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজেডিই হোক, 'দশচক্র'ই হোক, আর রবীন্দ্রনাটকই হোক—তাঁর প্রতিটি নাট্যপ্রযোজনা যে সমসময়ের বাতাসে নিশ্বাস নিয়েছে—একথা আজও আমরা সকলে বুঝি নি। বছর পঁচিশ আগে 'নিউ এম্পায়ার' মঞ্চে 'রক্তকরবী' (সেটি ছিল দ্বিতীয় প্রকাশ্য অভিনয়) দেখে বেরিয়ে এসে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অভিভূত কণ্ঠে বলেছিলেন "মাঠেঘাটে কয়েকবার এমন নাটক করলে তো দেশে বিপ্লব হয়ে যাবে।"

অথচ পঞ্চাশের দশকে আমরাই শম্ভু মিত্রকে দলত্যাগী এলিটিস্ট বলে অপরিমেয় আত্মসন্তুষ্টি বোধ করেছি।

স্বয়ং কার্ল মার্কস গ্রীক ট্র্যাজেডির সোচ্চার অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু, 'রাজা অয়দিপাউস' অভিনয়ের জন্য আমরাই ষাটের দশকে মার্কসবাদের দোহাই পেড়ে "অন্ধকারের পূজারী শম্ভু মিত্র"কে প্রায় কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছি।

আশঙ্কা করি এই সত্তরের দশকেও 'চাঁদ বণিকের পালা' নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠবে। কেউ কেউ নাকি মনে করছেন নাটকটি নেতিবাচক, শম্ভুবাবু শেষ পর্যন্ত অস্তিবাদী হয়ে গেলেন! (এই সুবাদে জানা গেল এতদিন তিনি মার্কসবাদীই ছিলেন।) কিন্তু মহাভারতের শেষও তো মহাপ্রস্থানেরই পথে! আর বিপুল উদ্ধারের পর সীতার জন্য অপেক্ষা করেছিল পাতাল-প্রবেশ। এমনকি রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক চেতনাও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে অস্তিত্বের অমোঘ জিজ্ঞাসার উত্তর পায় পায় না! কি বলব একে—জীবন সম্পর্কে negative attitude?

আসলে, মনে হয়, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে শম্ভুবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার পেছনে ধ্রুপদী সাহিত্যাদর্শের অনেকখানি প্রভাব আছে। পশ্চিমি অর্থে অস্তিবাদী তিনি নন। আমার মার্কসীয় জ্ঞান ও নান্দনিক বোধ তার এই দৃষ্টিভঙ্গির ষোল আনা শরিক হতে পারে না। কিন্তু মার্কসবাদের বিশ্ববীক্ষাই তো মনকে সেই ব্যাপ্তি দেয়, সেই ডায়লেকটিক চেতনা—যার প্রেরণায় বুঝতে পারি শম্ভু মিত্র লিখতে বসেছেন এক মন্দভাগ্য দেশ ও ছিন্নমস্তা সময়ের কথা যেখানে চারিদিকে ক্ষয় আর পতন আর মৃত্যু, যখন সমস্ত মূল্যবোধই বিনষ্ট। এই সমূহ সর্বনাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে চন্দ্রধরের অনমনীয় শিবসাধনাই এ নাটকের ইতিবাচকতা। 'চাঁদ বণিকের পালা'য় তাই কোনো সহজ আশাবাদ নেই বলে আমি অন্তত নাট্যকারকে ধিক্কার দেবো না। প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রতিষ্ঠান-বিরোধী নানা মহল থেকে গত তিন যুগ ধরে কম আক্রমণ তো তাকে করা হল না।

ইবসেনের 'এনিমি অফ দি পীপল' অবলম্বনে প্রযোজিত 'দশচক্র' নাটকের শেষ অঙ্কে ডাক্তার পূর্ণেন্দু বসুর ঘরে একটার পর একটা ঢিল এসে পড়ছিল। সন্তানদের উপহার দেওয়ার জন্য ডাক্তার প্রতিটি ঢিল যত্ন করে সাজিয়ে রাখছিলেন। কলোনির জিঘাংসু এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য নতুন আশ্রয়ের দিকে পা বাড়াবার আগে পূর্ণেন্দু বসু একটা রুমালে ঢিলগুলো বেঁধে পুঁটলির মতো পিঠে ঝুলিয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন "এই আমার কালচারাল হেরিটেজ।" (ইবসেন নয়, অমোঘ এই পংক্তিটি শম্ভুবাবুরই রচনা।)

প্রগতিশীলতার অভিমানে ঢিল তো একদিন আমিও ছুঁড়েছি। দুটি যুক্তফ্রন্ট ও একটি জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতা পেরিয়ে আজ বলতে ইচ্ছে করে—ঢিল সে-ই ছুঁড়ুক যে পাপ করে নি।

জানতে সাধ হয় পৃথিবীর কোন দেশে একই সঙ্গে এত বড় নাট্যকার নির্দেশক অভিনেতা বেঁচে আছেন—একটা মঞ্চের অভাবে যাঁ মাঝে মাঝে অভিনয় ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতে হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্তও স্বধর্ম তিনি ত্যাগ করেন না। চাঁদ সদা নতুন পাড়ি দেওয়ায় সংকল্প আবার ঘোষণা করেন।

জুলাই ১৯৭৮

সার্টিফিকেট

বিমল কর

শরদিন্দু ছেলেটিকে চোখে দেখেন নি। দেখার কথাও নয়। পাড়ায় নতুন এসেছেন। মাস তিনেক হতে চলল। বেলা এগারোটা নাগাদ তাঁর অফিসের গাড়ি আসে, বেরিয়ে যান শরদিন্দু; ফিরতে ফিরতে রাত আটটা ন-টা। ছুটির দিনে যারা আসে তারা বেশির ভাগই আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব। পাড়ার চার-পাঁচজন বয়স্ক মানুষ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আলাপ নেই শরদিন্দুর। হয়ে ওঠে নি। সুযোগই হয় নি। তিনি হাট-বাজার করেন না, রাস্তায় ঘোরেন না, ধোপার বাড়ি ছোটেন না, বুড়োদের তাস-আড্ডাতেও যান না, কাজেই আলাপ হবার মতন সুযোগই আসে নি।

ছেলেটি দাঁড়িয়ে ছিল।

শরদিন্দু বললেন, 'কী ব্যাপার?'

ছেলেটি প্রথমে কথা বলতে পারল না। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, কী ভাবে কথাটা বলবে সে বুঝে উঠতে পারছে না। বরং ঝোঁকের মাথায় এখানে এসে পড়ার পর অস্বস্তি বোধ করছে।

শরদিন্দু সামান্য অবাক হয়ে ছেলেটিকে দেখছিলেন। সাধারণ চেহারা, গায়ের রঙ কালো, মাথা ভর্তি চুল, লম্বাটে মুখ, নাকের ডগা একটু যেন বেঁকা।

'কী ব্যাপার বলো?' শরদিন্দু আবার বললেন।

ছেলেটি এবার যেন নিজেকে খানিকটা গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'আমায় একটা সার্টিফিকেট দেবেন?'

'সার্টিফিকেট ?' শরদিন্দু রীতিমতন অবাক হলেন। সার্টিফিকেট চাইতে তাঁর কাছে এসেছে ? কিসের সার্টিফিকেট ? তাঁর কাছে কেন ? ভুল করেছে নিশ্চয়। বোকা-সোকা ছেলে। আজকালকার ছেলেরা এত বোকা হয় তিনি জানতেন না।

শরদিন্দু হাসি মুখ করে বললেন, 'তুমি ভুল করেছ। আমি ডাক্তার নই।'

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল, 'আমি একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট চাইতে এসেছি। যদি দেন—।'

শরদিন্দু আরও অবাক হলেন। ছেলেটি আগাগোড়া ভুল করেছে। তাকে কেউ হয়ত ভুল খবর দিয়েছে, শুনেই চলে এসেছে লাফাতে লাফাতে।

'তুমি দাঁড়িয়ে কেন ? বোসো।' বলে শরদিন্দু হাত বাড়িয়ে সোফা দেখালেন। তারপর বললেন, 'আমার কাছে সার্টিফিকেট চাইতে এলে কেন ? আমি তো বাবা সরকারী চাকরি করি না, গেজেটেড অফিসার নই যে তোমায় একটা সার্টিফিকেট দেব।' বলে হাসলেন ; আবার বললেন, 'আমি এম. এল. এ নই ; নট্ ইভন এ কর্পোরেশান কাউন্সিলার।'

ছেলেটি বলল, 'একজন নামকরা ভদ্রলোকের সার্টিফিকেট হলেই হবে।'

'নামকরা ভদ্রলোক ? আমি কি নামকরা নাকি ? কে তোমায় এই অদ্ভুত খবর দিয়েছে ?' শরদিন্দু হেসে ফেললেন।

বিব্রত হয়ে ছেলেটি বলল, 'সকলেই আপনার নাম জানে। পাড়ার সবাই বলে।'

শরদিন্দু মজা পেয়ে গেলেন যেন। এই পাড়ার সকলেই তাঁর নাম জানে, তাঁকে নামকরা ভদ্রলোক বলে জানে—এ-খবর তাঁর জানা ছিল না। কৌতুক এবং কৌতূহল বোধ করছিলেন শরদিন্দু।

'তোমার নাম কি ?'

'অজয় গুহ।'

'এই পাড়াতেই থাকো ?'

'হ্যা। ডি ব্লকে। আটাশ নম্বর।'

শরদিন্দু সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর বললেন, 'পাড়ার লোক তো আমায় চেনেই না ; কারও সঙ্গে আলাপ হয় নি ; এক যা বঙ্কিমবাবু, মিস্টার দে আর তোমাদের কিসের অ্যাসো-

সিয়েশন আছে তার সেক্রেটারী মশাইয়ের সঙ্গে এক আধ বার আলাপ হয়েছে। আমায় নামকরা ভদ্রলোক ভাবার কারণ কী? আমি তো বাবা একটুও নামকরা নই।'

অজয় ক্রমশই নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছিল যেন। মাথা চুলকে বলল, 'বাঃ, আপনি নামকরা নন! অতবড় একটা অফিসে কাজ করেন।'

'বড় বড় অফিস থাকলে অনেকেই কাজ করে। আমি মোটামুটি একটা কাজ করি।'

'আপনি তো পড়ান যেন কোথায়?'

'সে খবরও রেখেছ!' শরদিন্দু হেসে ফেললেন, 'বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়াই সামান্য।' বলে কী মনে হল শরদিন্দুর। 'চা খাবে?'

'না না।'

'খাও এক কাপ। সকাল বেলায় চা খেতে আপত্তি কি!'

শরদিন্দু উঠে গিয়ে চায়ের কথা বলে এলেন।

'তোমায় সত্যি কথা বলছি, অজয়', শরদিন্দু বললেন, 'আমার চাকরি শেষ হয়ে গিয়েছে। রিটায়ারমেণ্টের পর বছর দুই এক্সটেনশানে ছিলাম। এখন নেহাত মালিকরা দয়া করে রেখেছেন বলে আছি। ঠিক চাকরি নয়। জাস্ট রিটেইন করছে আমাকে। আর পড়াবার ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। বড় সংসার—একেবারে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। একটা ইনকাম দরকার—তাই লেগে রয়েছি।'

অজয় এখন আর ততটা কুণ্ঠিত নয়। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের আসবাব-পত্র, সাজানো গোছানো দেখছিল। দেওয়ালে ছবি আছে, গোটা চারেক। বাতির মাথায় দামী শেড্। সোফা সেটি বেশ দামী আর বাহারী। পেতলের আর চিনে মাটির হরেক রকম জিনিস সাজানো। পুতুল রয়েছে। বুক কেস ভরতি বই।

অজয় বলল, 'আপনার সার্টিফিকেটেই হবে।'

শরদিন্দু বললেন, 'কেমন করে হবে আমি বুঝতে পারছি না। কোনো রেসপেক্টেব্‌ল্ জেণ্টলম্যানের সার্টিফিকেট হলে চলত হয়ত। এ-পাড়ায় কোনো গেজেটেড অফিসার কিংবা এম. এল. এ থাকেন না?'

অজয় কেমন বিরক্তির মুখ করল। 'এম. এল. এ থাকে না। অফিসার আছে। আমি যাই নি। কী হবে গিয়ে? কত লোক তেল দিচ্ছে সেখানে।'

শরদিন্দু হাসলেন না। সিগারেট নিবিয়ে রাখলেন। 'তোমার চাকরিটা কিসের ?'

'স্কুল টিচার।'

'স্কুল টিচার ? কোথায় ?'

'কাছেই। প্রাইভেট স্কুল। একজন অঙ্কের মাস্টার নেবে।'

'তুমি কি সাইন্স পড়েছ ?'

'বি. এস. সি।'

দু কাপ চা দিয়ে গেল একটা বাচ্চা মতন ছেলে।

'নাও, চা খাও—' শরদিন্দু বললেন। নিজেও একটা কাপ তুলে নিলেন। সামান্য চুপচাপ।

শরদিন্দু হঠাৎ বললেন, 'বাড়িতে তোমার কে কে আছেন ?'

'বাবা মা দিদি ছোট বোন।'

'দেশ কোথায় ছিল ?'

'যশোর।'

'কোথায় ?'

'জানি না। দেখি নি কখনও।'

'বাবা কী করেন ?'

'কিছু না। বাবা হাঁটতে চলতে পারে না। ডান দিকটা প্যারালাইজড্।'

'সেকি ! কেমন করে ?'

'বাস থেকে পড়ে গিয়ে জখম হয়েছিল। হাসপাতালে ছিল। তার পর থেকেই।'

শরদিন্দু আবার মনোযোগ দিয়ে ছেলেটিকে দেখছিলেন। ঠিক বোঝা যায় না, তবু মনে হয় ভেতরে কোথাও যেন হতাশা আর বিরক্তি রয়েছে। গলার স্বর সামান্য ভাঙা। চোখের তলায় ঈষৎ কালচে ভাব।

'কোথায় কাজ করতেন তোমার বাবা ?' শরদিন্দু জিজ্ঞেস করলেন।

'ফুড ডিপার্টমেণ্টে', অজয় বলল। চা খাবার সময় শব্দ হচ্ছিল।

'বাড়িটা তোমাদের নিজের ?'

'না ; ভাড়া। আমরা এখানে ছ বছর রয়েছি।'

শরদিন্দু চুপ করে থাকলেন। ছেলেটির পোশাক মামুলি। সুতির প্যাণ্ট, শার্ট, গালে পাতলা দাড়ি।

'তোমাদের বাড়িতে তা হলে আর্নিং মেম্বার বলতে…'

'মা চাকরি করে', অজয় বলল, 'গভর্নমেন্ট সেলস এমপোরিয়ামে… ।'

'ও ! আচ্ছা…'

'দিদি মাস কয়েক হল কোঅপারেটিভ ব্যাংকে চাকরি পেয়েছে, তার আগে একটা অফিসে কাজ করত টাইপিস্টের ।'

শরদিন্দু অজয়ের দিদির কথা অনুমান করে নিলেন। ছেলেটিকে দেখে বছর চব্বিশ বয়েস মনে হচ্ছে। ওর দিদি যখন—তখন বছর ছাব্বিশ হবে। বিয়ে হয় নি নিশ্চয়। বিয়ে হলে বাপের বাড়িতে থাকবে কেন ? মেয়ের বিয়ে দেবার অবস্থাও অজয়ের মা-বাবার হয় নি। মেয়েটি তার মায়ের সঙ্গে মিলেমিশে সংসার টানছে। নয়ত একা মায়ের পক্ষে টানা সম্ভব ছিল না।

শরদিন্দু বললেন, 'তুমি কবে পাশ করেছ ?'

'দু বছর হয়ে গেল', অন্যমনস্ক উদাস গলায় অজয় বলল, 'পরীক্ষাই হল এক বছর পরে, রেজাল্ট বেরুলো ছ মাস নাকানি চোবানি খাইয়ে। তারপর দু বছর বসে আছি ।'

'তোমার রেজাল্ট কেমন ?'

'ভাল নয় ।' অজয় চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল।

'চাকরির চেষ্টা করেছ নিশ্চয়… ।'

'করব না ! পাস করার আগে থেকেই করছি। অনেক জায়গায় গিয়েছি, অ্যাপলিকেশান করেছি। কিছু হয় নি ।'

'তোমার বোন পড়াশোনা করে ?'

'হ্যাঁ, স্কুল ফাইনাল দিয়েছে ।'

শরদিন্দু চুপ করে থাকলেন।

অজয় নিজেই বলল, 'স্কুলের চাকরিটা হয়ে যেতে পারে। প্রাইভেট স্কুল। খুব গরীব স্কুল, মেসোমশাই। মাইনে টাইনে কম, তাও দিতে পারে না সময় মতন। গভর্নমেন্টের টাকা না পেলে উঠে যেত ।'

'তা তুমি ওই স্কুলের চাকরির জন্যে চেষ্টা করছ কেন ?'

'ভাল স্কুলে আমায় নেবে না। বাজে স্কুলে কেউ আসতে চায় না, একটা চান্স রয়েছে। হেড মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে এসেছি ।'

শরদিন্দু আর কিছু বললেন না। আর একটা সিগারেট ধরালেন।

অজয় নিজেই বলল, 'আপনার সার্টিফিকেটেই আমার হবে মেসোমশাই; আপনি লিখে দেবেন, আমায় চেনেন, আমার ক্যারেকটার…'

হাত তুলে থামালেন শরদিন্দু। বললেন, 'আমার লেখা সার্টিফিকেটে যদি তোমার কাজ হয়, লিখে দেব।'

অজয় খুশি হল। হাসল। 'কবে আসব?'

'কাল এসো।'

'কাল সকাল বেলায়? এ-রকম সময়ে?'

'তাই এসো।'

উঠে পড়ল অজয়। 'আমি তাহলে আসি, মেসোমশাই। আমার নামটা লিখে দেব? অজয় গুহ, বাবার নাম নলিনীকান্ত গুহ, বাড়ির নম্বর…'

'আমার মনে থাকবে', হাত তুলে থামিয়ে দিলেন শরদিন্দু।

অজয় চলে গেল।

শরদিন্দু বসে বসে সিগারেটটা শেষ করলেন।

রাত্রে শরদিন্দু সামান্য আগে শুয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রী সুরমা এলেন অনেক পরে। পাশাপাশি খাট। ছোটখাট কাজ সেরে, জল খেয়ে, বাত্তি নিবিয়ে সুরমা নিজের বিছানায় শুলেন।

'ঘুমোলে নাকি?' সুরমা বললেন।

সাড়া দিলেন শরদিন্দু।

'তোমায় তো বলতে পারি নি। উষা চিঠি লিখেছে দিল্লি থেকে।'

'ভালো আছে সব?'

'হ্যাঁ, ভালোই।… উষা লিখেছে, সেই ছেলেটি বোধহয় আসছে বছরেই বাইরে চলে যাবে।'

'কোন ছেলেটি?'

'ওই যে, ওর কেমন ভাসুরপো হয়। যার সঙ্গে জয়ার বিয়ের সম্বন্ধ করতে বলছে।'

শরদিন্দু চুপ করেই থাকলেন।

সুরমা দিল্লির ছেলেটির কথা বলে যেতে লাগলেন। দেখতে শুনতে ভালো, বড় পরিবার, বছর কুড়ি ধরে সবাই দিল্লিতে, দিদি থাকে কানাডায়, ডাক্তার, জামাইবাবুও ডাক্তার, ছেলেটি দিদির কাছে গিয়েই কোনো কাজকর্ম করবে, ভালোই থাকবে, এদেশে ওর আর কতটুকু হবে, ওসব জায়গায় গিয়ে পড়তে পারলে—সুযোগ সুবিধে জুটেই যায়। থেকেও সুখ।

শরদিন্দু কোনো কথাতেই কান দিচ্ছিলেন না। ছোট মেয়ের বিয়ে নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা আপাতত হচ্ছিল না।

সুরমা বুঝতে পারলেন, স্বামী কোনো কিছুই শুনছেন না। 'তুমি তো বড় অদ্ভুত মানুষ। একটা হুঁ হাঁ পর্যন্ত করছ না!'

শরদিন্দু নিরুত্তর।

'মেয়ে তোমার! আমিই শুধু এর ওর পায়ে ধরব নাকি?' সুরমা বললেন।

শরদিন্দু বললেন, 'ধরো না। আমার শরীরটা ভালো নেই। ঘুমোতে দাও।'

'শরীর ভালো নেই? কী হয়েছে?'

'তেমন কিছু না। ক্লান্ত লাগছে।'

সুরমা চুপ করে গেলেন।

শরদিন্দু চোখ বুজে থাকলেন। তাঁর ভালো লাগছিল না। আজ সারাটা দিনই ভালো লাগে নি। কেমন মনমরা, অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। কেন, কে জানে? সকালের সেই ছেলেটির কথা বার বার মনে পড়ছিল। অফিসে বসে বার কয়েক একটা সার্টিফিকেট লেখার চেষ্টাও করেছিলেন। পারেন নি। কাজকর্মে আটকে গেছেন। কাল সকালে অজয় আসবে। শরদিন্দুকে কিছু একটা লিখে দিতেই হবে। টাইপ করা হয়ে উঠবে না, হাতেই লিখে দিতে হবে। কী লিখবেন? ছেলেটিকে তিনি চেনেন না, আগে কখনও দেখেন নি, তার স্বভাব চরিত্র জানেন না।

শরদিন্দু মনে মনে একটা খসড়া করছিলেন; গতে বাঁধা খসড়া নয়, সাদামাটা সহজ খসড়া। কী হয় যদি তিনি এই সাদামাটা সহজ কথাগুলো লেখেন! আপত্তি কিসের? তিনি তো মিথ্যে কিছু লিখছেন না!

খসড়াটা শরদিন্দুর নিজের খুবই পছন্দ হচ্ছিল। মনে মনে তিনি গুছিয়ে নিচ্ছিলেন পুরো খসড়াই; একেবারে সাদামাটা বাংলায়, পরে লেখার সময় তর্জমা করে নেবেন ইংরেজিতে।

শরদিন্দুর খসড়াটা এই রকম দাঁড়াচ্ছিল:

"অজয় গুহ নামে একটা ছেলে আমার কাছে এসে তার চাকরি-সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি সার্টিফিকেট চেয়েছে। তার মুখের কথা অনুযায়ী আমি জানলাম, সে শ্রীনলিনীকান্ত গুহর ছেলে। আমাদের এখানে ডি-ব্লকের পঞ্চান্ন নম্বর

বাড়িতে থাকে। তার বাবা শারীরিক দিক থেকে অক্ষম, বাস থেকে পড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়েছেন। তিনি এখন অথর্ব এবং কর্মশক্তিহীন। অজয়ের মা সামান্য একটি চাকরি করেন। তার দিদি এখনও অবিবাহিতা, আপাতত কোনো ব্যাঙ্কে কাজ পেয়েছেন। অজয়ের ছোট বোন রয়েছে একটি। এটা সৌভাগ্যের কথা যে, এই বাংলাদেশে কলকাতা শহরে পাঁচজনের সংসারে অন্তত দু জন কোনোরকম একটা চাকরি করে যাতে তাদের পেট চলে যায়। ব্যাপারটা অন্যরকমও হতে পারত, যা হামেশাই হয়, একজন আনে দশজনে খায়। যার অন্য অর্থ না-খেয়ে থাকে।

অজয়ের বয়েস চব্বিশ। সে নিজেই বলেছে, ছাত্র হিসেবে সে সাধারণ; পরীক্ষায় তার ভালো কিছু হয় নি। আজ দু বছর সে বেকার বসে আছে, চাকরিবাকরির চেষ্টা করেও কিছু সুবিধে করতে পারে নি।

আপাতত সে একটি বেসরকারী সাধারণ গরীব স্কুলের শিক্ষকতার জন্যে কাতর। এই স্কুলে মাইনে কম, ঠিক মতন বেতন দেওয়া হয় না। স্বভাবতই, এখানে প্রতিযোগিতা কম, এবং শিক্ষক পাওয়া মুশকিল। অজয় এই সুযোগটিই গ্রহণ করতে চায়।

আমার সদ্যপরিচিত এই ছেলেটির বিষয় আমি কিছু জানি না। সে যা বলেছে আমি তার উল্লেখ করলাম মাত্র। ছেলেটির স্বভাব চরিত্র ভাল হতে পারে, নাও পারে; সে পরিশ্রমী না অলস আমার জানা নেই। হতে পারে সে শিক্ষক হিসেবে ব্যর্থ হবে, ফাঁকিবাজি করবে। আবার এটা নাও হতে পারে।

আমি স্পষ্ট করেই বলছি, অজয় ছেলেটিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। কিন্তু আমার মনে হয়, ব্যক্তিগতভাবে চেনার কোনো প্রয়োজন নেই। ওর নাম অজয় না হয়ে অমল বা কমল হতে পারত। ওরা গুহ না হয়ে যদি গুপ্ত হত—তাতেই বা কী আসত যেত। ওর বাবা জীবিত রয়েছেন—এটা সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু জীবিত থাকা না-থাকা একদিক থেকে প্রায় অর্থহীন হয়ে গেছে। অজয়ের বয়েসী অনেক ছেলের বাবা হয়তো বেঁচে নেই। কিংবা বেঁচে থাকলেও মা আর ইহলোকে নেই।

মোটামুটিভাবে আমার বক্তব্য এই যে, অজয়কে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনলেও যা লিখতে পারতাম, তাকে না চিনেও সেই একই কথা লিখতে পারছি। অজয়ের পরিবর্তে অমল বা কমল এলেও আমি, আশা করি, এই একই কথা লিখতে পারি। আমার মনে হয় না, আজকে আমাদের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে চেনা দরকার।

যদি আমার এই প্রশংসাপত্র কোনো কারণে গ্রাহ্য হয়, আমার নিবেদন, এবং প্রার্থনা, অজয়কে তার প্রার্থিত চাকরিটি দেওয়া হোক।"

পরের দিন সকালে শরদিন্দু দশ বারো লাইনের একটি সার্টিফিকেট লিখে ফেললেন অজয়ের জন্যে। ভালো ইংরেজিতে, বাঁধা গতে।

সুরমা বললেন, 'কী লিখছ বসে বসে তখন থেকে।'

শরদিন্দু মুখ তুলে বললেন, 'সার্টিফিকেট। ক্যারেকটার সার্টিফিকেট।'

'কার জন্যে?'

'কাল যে ছেলেটি এসেছিল তার জন্যে।'

'ওমা, তুমি তো তাকে চেনোই না।'

শরদিন্দু সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিতে নিতে বললেন, 'চেনা না-চেনায় কি যায় আসে। আমিও ধরি মাছ না ছুঁই পানি করে লিখে দিয়েছি। পাড়ায় নতুন এসেছি বুঝলে তো! ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে কি লাভ!'

শরদিন্দু সিগারেটটা ধরিয়ে নিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বন্যায়

বিপর্যস্ত মানুষকে

সাহায্যের জন্য

সর্বপ্রকার উদ্যোগ নিন।

উপন্যাস

শব্দের খাঁচায় : অসীম রায় ৬·০০

মস্তক বিনিময় : (Thomas Mann-এর Transposed heads-এর বঙ্গানুবাদ) অনুবাদক : ক্ষিতীশ রায় ৪·০০

লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে : গোলাম কুদ্দুস ১৫·০০

নীল নোট বই (ইমানুয়েল কাজাকোভিচের ব্লু নোটবুক-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক : নৃপেন ভট্টাচার্য ৪·০০

বেনিটোর চাওয়া পাওয়া (আনা সেগার্স-এর—Benito's Blue-এর বঙ্গানুবাদ) : অনুবাদক—বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৪·০০

মানুষ খুন করে কেন : দেবেশ রায় ৩০·০০

গোবিন্দ সামন্ত : লালবিহারী দে-র 'Bengal Peasants Life'-এর বঙ্গানুবাদ সাধারণ ৪·৫০

কমরেড : সৌরি ঘটক ৪·৫০

পরিচয়

বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ৪ কার্তিক ১৩৮৫ নভেম্বর ১৯৭৮

প্রচ্ছদ

সুবোধ দাশগুপ্ত

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। সুশোভন সরকার। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয় ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

সমাজবাস্তবতা ঃ শরৎচন্দ্র

গুণময় মান্না

প্রতিভাবান শিল্পী সম্পর্কে সর্বমানবের ঔৎসুক্য তাঁদের সমকালে যেমন, তেমনি তাঁদের মৃত্যুর পরও বজায় থাকে—কিন্তু পরিবর্তিত রূপে। সমাজ তার অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতি-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে বদলে যাচ্ছে এবং সেই পরিবর্তিত বাস্তব দাবি অনুসারে পূর্বতন প্রতিভার বিচার হয় নতুনভাবে। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র বহুবার বহুরকম করে আলোচিত হয়ে এসেছেন। সাম্প্রতিককালে শরৎচন্দ্র যে-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়ে গেল তাতে তাঁকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখবার চেষ্টা হয়েছে এবং একটা বিশেষ ব্যাপার প্রায়ই লক্ষ করা গেছে যে বঙ্কিমচন্দ্র নন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই তুলনা করা হয়েছে। এমন ধরনের কথাও বলা হয়েছে, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অধিকতর প্রগতিশীল ছিলেন; সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় তিনি রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অগ্রগামী।

এ-যুগটা হরেকরকম বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে (যেমন রুশীয়, চৈনিক ও ইউরো-সাম্যবাদ প্রভৃতি) সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের দিকে এগোচ্ছে ঠিকই এবং আমাদের দেশেও তার ঢেউ লেগে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। সুতরাং সমালোচক পণ্ডিতগণ তাঁদের প্রিয় ক্লাসিক সাহিত্য-গুলিকে যে নিজেদের প্রিয় আদর্শের অনুকূলে টেনে আনবার চেষ্টা করবেন,

---

শরৎচন্দ্রের বাসভবনে অনুষ্ঠিত শরৎজন্মশতবার্ষিকীতে লেখকের ভাষণ

সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যসন্ধান করতে গিয়ে যদি উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানো হয় তবে তার থেকে দুঃখের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না।

আমাদের সমালোচনা সাহিত্যের দৈন্য সর্বজন-স্বীকৃত। একথা এখনো ঠিক যে আমাদের কবি-সাহিত্যিকেরাই ভালো সমালোচনা লিখে গেছেন; কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ডক্টরেট ডিগ্রিলাভ ও বিতরণের প্রেক্ষাপটেই সমালোচনা সাহিত্যকে সীমিত রাখবার গৌরব রক্ষা করে আসছেন, তার মধ্যেও আবার কোটারি আছে। অন্যদিকে রয়েছেন আমাদের বামপন্থী সমালোচকগণ, যাঁদের অনেকেই নিজেদের মার্কস বা লেনিন বলে ভেবে থাকেন—অর্থাৎ রাজনীতি ও সাহিত্য এঁরা সমান গভীরতার সঙ্গেই বুঝে থাকেন এবং অসঙ্কোচে পূর্বসূরি বা সমকালীনদের ওপর লেবেল এঁটে থাকেন।

তথাপি, এই পরিস্থিতি মনে রেখেই, বর্তমান প্রবন্ধ লিখিত হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র নন, এখানে প্রধানত শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ নিয়েই কিছু আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব আছে, সহৃদয় গুণিজনের পরিতোষের প্রত্যাশায়। প্রথমে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলছি।

শরৎচন্দ্র প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কথাশিল্পী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, এবং চতুর্থ দশকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অজস্র রচনায় অগণিত পাঠককে মুগ্ধ করে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নেন। উক্ত দুই কালসীমা বিধৃত ভারতীয় সমাজবাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে সংবেদনশীল শরৎচন্দ্রের শিল্পীচিত্তে, রূপ পেয়েছে তাঁর ভাষার ইন্দ্রজালে; আবার পালাক্রমে সেই কথার ইন্দ্রজাল সমাজবাস্তবতাকে বাঞ্ছিত পথে পরিচালনা করতে সাহায্য করেছে। শিল্পী মাত্রেই এক দিকে অত্যন্ত অধীন, বাস্তবতার অমোঘ শৃঙ্খলে বাঁধা; অন্য দিকে 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি' তখন তিনি সর্বাপেক্ষা স্বাধীন, সার্বভৌম, তিনি স্রষ্টা, 'কবিরেব প্রজাপতিঃ'।

কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে সামাজিক তথ্য এবং সেগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে বিচিত্র-জটিল, কিন্তু সেগুলির মধ্যে একটাই হয় তাৎপর্যপূর্ণ, জীবন্ত; ভারতীয় ব্যক্তিতান্ত্রিকের (বুর্জোয়ার) বিকাশ ও ক্রমবর্ধমান শক্তিসঞ্চয়ই উক্ত সময়ের সমাজবাস্তবতার সত্য; তেমনি আবার স্বদেশে ও বিদেশে সর্বহারা শ্রেণীরও সৃষ্টি হয়েছে এবং কোনো-কোনো দেশ সমাজতান্ত্রিক পথে এগিয়েও যাচ্ছে।

প্রবহমান ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উক্ত বুর্জোয়া ব্যক্তিটি বিদেশী সাম্রাজ্যশক্তির সৃষ্টি; উনিশ শতকের বাঙালি রেনেশাঁসের মধ্যে তার প্রথম পদক্ষেপ। তবে তার অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল তখন কেবল বাণিজ্যিক; কিন্তু বিশ শতকের প্রথম ভাগে তার ভিত্তি হল আরো দৃঢ়। শিল্পায়নের (industrialization) নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করে চতুর্থ দশকের মধ্যে সে বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে গেছে, হয়ে দাঁড়িয়েছে বিদেশী সাম্রাজ্য শক্তিরই প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার সে নিজেও পালাক্রমে এবং বিদেশী শিল্পের সহযোগী হয়ে সৃষ্টি করেছে শ্রমজীবী শ্রেণীর। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, তার জন্মদাতা এবং তার আত্মজ—এই দুই শক্তির সঙ্গে ভারতীয় ব্যক্তিতান্ত্রিক, তার নিজেরই গরজে, কখনো বিরোধ কখনো মৈত্রীর সম্পর্কে নিজেকে জড়িয়েছে; কখনো নিজেরই অন্তর্বিরোধের (স্ববিরোধ, self-contradiction—ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য শর্ত) ফলে চরম অব্যবস্থিত-চিত্ততার পরিচয় দিয়েছে। একই সঙ্গে সে প্রগতিশীল এবং রক্ষণশীল, সৃষ্টিধর্মী এবং ধ্বংসাত্মক; বিপ্লবী এবং পোষণী—বস্তুত ব্যক্তিত্বচেতনার ব্যাপারটি বড় বেশি চলিষ্ণু।

বড় বেশি সর্বাত্মকও। সমাজ ও ধর্মসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, নারীত্ব, নারীর অধিকার, জাতীয়তা ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন—সেই উনিশ শতক থেকে সমকাল পর্যন্ত এদেশে যা কিছু হয়েছে, তারই মধ্যে ব্যক্তিতান্ত্রিকের প্রাণস্পন্দন শোনা যায়, তার সুকৃতি ও বিকৃতি সমেত।

ভারতীয় ব্যক্তিত্বচেতনা, বাংলার নিজভূমিতে যে-রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল, তার সূচনা-মধ্য-ঐশ্বর্য-পরিণতির যুগকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে তিন প্রতিভা—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র। প্রথম দুইজন পূর্বসূরীর সঙ্গে তাঁর মিল আছে, কেননা স্বরভেদে একই সমাজসত্যের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁদের সবার রচনায়। কিন্তু একই আলো যেমন বিভিন্ন কাচে বিভিন্ন রঙে প্রতিফলিত হয়, তেমনি মানসিকতার ও কালের পার্থক্য হেতু একই সত্য এঁদের শিল্পীচৈতন্যে বিভিন্নতার, ঐকান্তিক স্বাতন্ত্র্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে উক্ত তিন প্রতিভার অমিলও কম নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিত্বচেতনার আদি পুরোহিত, তার ঐশ্বর্যময় প্রকাশকে তিনিই প্রথম অপাবৃত করেছেন। কিন্তু তার আত্মঘাতী স্ববিরোধকে দেখে হয় পিছন থেকে রাশ টেনে ধরবার চেষ্টা করেছেন, নয়তো অনুশীলন-

তত্ত্বের মধ্যে তার বিষদাঁত ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিত্বচৈতন্যকে লালিত করেছেন অসীম প্রেমে ও নিষ্ঠায়, তার স্ববিরোধের সুগভীর বেদনাকে বহন করে এগিয়েছেন বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ও শান্তি দেবার জন্য ; তাঁর সুদীর্ঘকালব্যাপী বিচিত্র ও অপর্যাপ্ত রচনার মধ্যেই ইঙ্গিত মেলে ব্যক্তিত্বচেতনা থেকে ওঅর্লড্ কম্যুনিজ্‌মে উত্তরণের।

আর শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলতে চাই: তিনি ভারতীয় ব্যক্তিতান্ত্রিকের প্রট্যাগনিস্ট শিল্পী ; তাঁর ভয় নেই, সংশয় নেই, দ্বন্দ্ব নেই, তিনি পার্টিজান— সে দিক থেকে তিনি সীমিত, সংকীর্ণ কিন্তু তুলনাহীনভাবে সরল এবং ঐকান্তিক।

২

শিল্পী মাত্রেরই রচনাতে—তা তিনি কল্পনার মিনারবাসী বা বাস্তবতার সমতলবিহারী যাই হন না কেন—কোনো না কোনোরূপে সামাজিক তাৎপর্য (social content) থাকেই। শরৎচন্দ্র প্রথম থেকেই অত্যন্ত সমাজ-সচেতন লেখক, কাজেই তাঁর রচনায় সমাজ-ভাবনার অস্তিত্ব বিতর্কিত নয় একেবারেই : কোথায় সেই ভাবনা অনুসন্ধেয় কথাটা সেই নিয়ে।

মননশীল প্রবন্ধেই লেখকের সমাজদৃষ্টি অব্যবহিতরূপে প্রকাশ পায়, সৃষ্টিধর্মী রচনার মধ্যে পাওয়া যায় তির্যগ্‌ভাবে, ব্যঞ্জনার মাধ্যমে। তবে একথা ঠিক যে, কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের সমাজ-সচেতনতা তাঁদের সৃষ্টিধর্মী রচনার মাধ্যমেই গভীরভাবে সক্রিয় হয়, কেননা সমগ্র শিল্পী-মানসই তার মধ্যে কাজ করতে থাকে। দুঃখের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের অজস্র প্রবন্ধের মধ্যে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির যেমন পরিচয় মেলে, শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে তেমনটি নয়। সমাজসমস্যা নিয়ে শরৎচন্দ্র মাত্র দুটি গ্রন্থই লিখেছেন, 'নারীর মূল্য' এবং 'সমাজধর্মের মূল্য'। তাছাড়া, তাঁর অভিভাষণ, চিঠিপত্র এবং সাহিত্য-সম্পর্কিত ছোট ছোট প্রবন্ধে প্রসঙ্গত সমাজের কথা এসেছে। বস্তুত, এই জাতীয় রচনা খুবই অপ্রচুর।

সুতরাং শরৎচন্দ্রের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেতে হলে তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসগুলিরই দ্বারস্থ হতে হবে আমাদের। আর এটা আনন্দের বিষয় যে শরৎচন্দ্রের সমস্ত গল্প-উপন্যাসে শিল্পী-মানসিকতার পরিচয় পাওয়া একটা সম্ভাব্য প্রতিপাদ্য।

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতা আছে।

একান্নবর্তী পরিবারের পটভূমি, গ্রাম্য এবং শহুরে সমাজ, নরনারীর যৌন জীবনের সমস্যা, বাঁধন-না-মানা ব্যক্তির জীবন, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, এমন কি কৃষক ও সমাজজীবনও আছে, যেমন আছে জাতীয় আন্দোলনের কথা। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র থেকে জানা যায়, তিনি পড়েছেনও অনেক, এক সময় তিনি নাকি লেখার থেকে পড়াই বেশি পছন্দ করতেন। পাশ্চাত্য ক্লাসিকগুলির সঙ্গে তাঁর যথাসম্ভব পরিচয় ছিল, যেমন ছিল বিজ্ঞান দর্শন সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য নিষ্ঠাবান অধ্যয়ন। বাল্যকালে বিহার-প্রবাস, যৌবনে ব্রহ্মদেশে জীবিকাসন্ধান, প্রৌঢ়ত্বে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ—তাঁর জীবনের এই সব ঘটনা ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়িয়েছিল। একই লক্ষ্য সামনে রেখে শরৎচন্দ্র সহস্রাধিক কুলত্যাগিনী রমণীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর নিজের জীবনেও বিচিত্র নারীর সংস্পর্শ ঘটেছে। এখন, তাঁর গল্প-উপন্যাসে বিষয়-বৈচিত্র্য যতই থাক, যত রকম সমস্যার অবতারণা তিনি করুন, এবং সে-সবের পিছনে পঠন ও অর্জনের অভিজ্ঞতা যা-ই থাক না কেন, তাঁর রচনার কেন্দ্রে এবং তাঁর মানসিকতার মৌল প্রস্থানভূমিতে রয়েছে —নারী। মাকড়সা যেমন একটি বিন্দুর চারদিকে নানা প্যাটার্ণের উর্ণাজাল বোনে, শরৎচন্দ্র চিন্তা, রচনা ও কর্মের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার সময়ও একটি নারীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সর্বদাই চালিত হয়েছেন। একদিক থেকে দেখলে একালের সমস্ত রোমান্টিক সাহিত্য নারীচেতনার অনুরঞ্জনেই বিশেষ-ভাবে চিহ্নিত, কিন্তু সেটি শরৎসাহিত্যে যেমন লীলায়িত বৈচিত্র্যে শোভমান, তেমনটি ঠিক আর কোথাও দেখা যায় না।

এবং ঠিক সেই কারণেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে সমাজসত্যের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর নারীচরিত্রগুলির মধ্যেই। সতর্ক এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠক লক্ষ্য না করে পারেন না যে শরৎচন্দ্রের প্রথম দিককার রচনায় আত্মপ্রকাশ কুণ্ঠিত—নারীপুরুষের যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সে প্রথম উপেক্ষিত, কখনো শোষিত, অত্যন্ত ভীরু; মাঝখানে সে নারী দ্বন্দ্ব-কণ্টকিত কিন্তু অনেকখানি আত্মস্থ ও শক্তিমতী; আর শরৎচন্দ্রের শেষ দিককার উপন্যাসে নারীই যৌন জীবনের ক্ষেত্রে প্রভু, নিয়ন্ত্রী। 'বড়দিদি'-র মাধবী থেকে শুরু করে পাঠক যখন 'শেষপ্রশ্ন'-এর কমল পর্যন্ত পৌঁছান, তখন তাঁর বুঝতে অসুবিধে হয় না, শরৎচন্দ্র কতটা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন তাঁর নারীসত্তের সহযাত্রী হয়ে। এটাকে শিল্পী-মানসের বিবর্তন বলেই ব্যাখ্যা করা হয়, এবং সে ব্যাখ্যায় ভুলও নেই; কিন্তু যোগ করার আছে: শরৎচন্দ্রের মানস-বিবর্তন জাতীয় বুর্জোয়ার আত্মপ্রকাশ

ও বিকাশেরই সমান্তরাল : বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের কুণ্ঠিত জাতীয়তা চতুর্থ দশকে দুটি বড় বড় আন্দোলন পেরিয়ে অনেক বেশি শক্তিমান ও আত্মবিশ্বাসী হয়েছে।

তিনটি নারীকে সামনে এনে পাশাপাশি রাখা যাক—ইবসেনের নোরা, লরেন্সের শ্রীমতী চ্যাটার্লি এবং নভিকভের লোলিটা। এরা কি সমাজ-বিবর্তনের কিংবা সমাজ-সংস্থিতির তিনটি স্তর সূচিত করে না? বুর্জোয়া সমাজ নিয়েই লেখা তিনটি রচনায় লেখকত্রয় নারীকে নিয়ে তিনরকম প্যাটার্ন বুনেছেন। নোরা তার স্বামীর তথাকথিত সুখী ও নিরাপদ আশ্রয় সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে, ট্যারান্‌টেলা ঘূর্ণিনৃত্য তার আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তিকামনারই ঝড়। অভিজাত শ্রীমতী চ্যাটার্লি সংগমপ্রার্থিনী নারীত্ব ও মাতৃত্বের জন্য কিন্তু তার স্বামী পঙ্গু, অনুর্বর ; নিম্নশ্রেণীর এক উদ্যান-পরিচারক পুরুষ তাকে সার্থক করল। লোলিটার বর্ষীয়ান পুরুষ এক বিধবাকে বিবাহ করেছে তার কিশোরী কন্যার প্রতি লালসায় ; ফাদার-ইক্যুইভ্যালেন্ট সেই পুরুষ কন্যাপ্রতিমকে নষ্ট করেছে।

শুধু সাহিত্যে নয়, সমাজে নারী যে রূপেই এসেছে আমাদের সামনে, অনিবার্যভাবে সেই কালের সমাজসত্যের বেশ পরে এসেছে। যৌন সম্পর্ক সমাজ সত্যেরই বিশিষ্ট প্রতিচ্ছবি। নারী একদা ছিল যৌথ সম্পর্কের অংশিনী, পরে একনিষ্ঠতায় নির্দেশিতা, বধূ ; তারও পরে বহুচারী পুরুষের সতী স্ত্রী—সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে গণিকা। শাস্ত্রে নারী কখনো দেবী, কখনো নারকিনী। এক এক সামাজিক-অর্থনীতিক প্রেক্ষাপটে নারীকে এক একরূপে দেখা হয়েছে, এক এক রকম স্ট্যাটাস দিয়ে। বস্তুত, একথা জোর দিয়েই বলা যায়, Woman is the barometer of social consciousness। এই সব কথা মনে রেখে এখন শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলির পরিক্রমায় উদ্যোগী হওয়া যেতে পারে।

শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪), 'রামের সুমতি' (১৯১৪) এবং 'মেজদিদি' (১৯১৫) প্রথম দিককার এই তিনটি গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। তিনটি গল্পের নারীরা এত বিস্ময়বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল যে একজন বিশিষ্ট পাঠক মন্তব্য করেছিলেন, 'নারায়ণীর মাতা একটি স্ত্রী পাইতে ইচ্ছা করে।' তিনটি গল্পই সমস্যামুক্ত, খুব মিষ্টি,

পারিবারিক পটভূমিতে পরিকল্পিত নারীর সহনীয়তার ছবি। যে পরিবারের সঙ্গে এরা যুক্ত, তার এক-একজন সাধারণ এমন কি কনিষ্ঠ সদস্য হয়েও এরা অত্যন্ত বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। পরিবারকে (এস্‌ট্যাবলিশমেন্ট) অস্বীকার করে নি এরা, বিরুদ্ধতাও করে নি, কিন্তু নিজের নিজের হৃদয়াবেগকে (বাৎসল্য) সর্বৈব অনুসরণ করেছে। মা, স্বামী, বড় জা—যারাই বিরুদ্ধতা করতে গেছে, তারাই শেষ পর্যন্ত এই সব খেয়ালি, একরোখা মেয়েদের কাছে পরাজিত, বশীভূত হয়েছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় অসহযোগের দ্বারা, অনশনের দ্বারা নিজেকে অসম্ভব পীড়ন করেছে এরা, বিন্দু তো মরতেই বসেছিল! লক্ষ করার বিষয় যে তিনটি নারীরই বাৎসল্য কেন্দ্রিত হয়েছে আত্মজের ওপর নয়, সম্পর্কিত শিশুর ওপর; তাতে বাৎসল্যের অহৈতুকী লক্ষণ, নারীর আবেগের ঐকান্তিকতা এবং শুদ্ধিকেই ফুটিয়ে তুলেছে। এদের স্নেহ-প্রেমের শাসন শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়েছে সবাইকে। তখনকার দিনে রাষ্ট্রীয় চেতনার ক্ষেত্রে ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কিত ভারতীয় বুর্জোয়ার বিশিষ্ট আকাঙ্ক্ষাটি এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বলে ধরা যায় কি?

বুর্জোয়া ব্যক্তিতান্ত্রিকের আত্মপ্রকাশ সাহিত্যক্ষেত্রে ট্র্যাজেডির লক্ষণে চিহ্নিত, গ্রীসে ট্র্যাজেডির প্রথম উদ্ভব এবং শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডির বর্ণবৈভব এই দুই স্মরণে রেখেই একথা বলা যায়। বুর্জোয়া-ব্যক্তিত্বের প্রথম প্রকাশটি বড়ই প্রতিশ্রুতিপূর্ণ, কিন্তু তার সমগ্র সত্তাটি স্ববিরোধ কণ্টকিত এগোতে গিয়েই, আপনাকে প্রকাশ করতে গিয়েই সে নিজের সত্যব্রতকে নিজেই ভাঙে, নিজেরই বিনাশ টেনে আনে।

রেণেশাঁসের বাংলা সাহিত্যে এই জন্য মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ তিন জনেই ট্র্যাজেডি রচনা করে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তাঁদের পক্ষে সেটা ছিল অনিবার্য। শরৎচন্দ্র সমাজ বাস্তবতার গভীরে এমনভাবে প্রবেশ করেছিলেন যে, তাঁর প্রথম দিককার গল্প বড়দিদি (১৯১৩) ট্র্যাজেডি না হয়ে পারে নি। বড়দিদি মাধবীর—ট্র্যাজেডি এমন ভাবে এসেছে যে ব্যক্তিতান্ত্রিকের সমস্ত লক্ষণই তাতে পরিস্ফুট।

মাধবী দরিদ্র নয়, তার চারি দিকেই ঐশ্বর্য, পিত্রালয়ে এবং স্বামীর কাছে সর্বত্র সমাদৃত। তার সমস্যা অনাদর বা অসম্মানের নয়, ভালোবাসার। প্রেমের প্রকাশেই তার মহত্ত্ব, প্রেমের নীতিচ্যুতিতেই তার ট্র্যাজেডি। পরিপূর্ণ ভালোবাসার জীবনে মাধবীর স্বামীর মৃত্যু হল; মাধবী মৃত্যুপথযাত্রী

স্বামীকে বলেছিল, 'আবার যখন তোমার পায়ে গিয়া পড়িব তখন যত্ন করিও।' এ হচ্ছে মাধবীর প্রতিশ্রুতি, জীবনে ও মৃত্যুতেও প্রেমের নিষ্ঠা। তার স্বামী একটি উপদেশ দিয়েছিল, 'এ জীবন তুমি আমার সুখের জন্ম সমর্পণ করিতে, সেই জীবন সকলের সুখের সমর্পণ করিও।' এ হচ্ছে কল্যাণের আদর্শ এবং সেই আদর্শকে অনুসরণ করতে গিয়েই, অর্থাৎ সকলের সুখবিধান করতে গিয়েই মাধবী সুরেন্দ্রনাথেরও সুখবিধান করতে পেরেছে এবং তাকে ভালোবেসেছে। মাধবের এই নীতিচ্যুতি তার সখী মনোরমার চোখ এড়ায় নি, সে তার স্বামীকে লিখেছে, 'তুমি ঠিক বলিতে—স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নাই। মাধবীকে দেখিয়া বড় ভয় হয়,—সে আমার আজন্মের ধারণা ওলট-পালট করিয়া দিয়াছে'।

ব্যক্তিতান্ত্রিক কিন্তু মরতে মরতেও নিজের খুঁটি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছে। মাধবী সুরেন্দ্রনাথকে ফেলে কাশী চলে গেছে এবং ফিরে এসে তাকে বাড়ির বের করে দিয়েছে, যার ফলে তার প্রেমলালিত এবং পরিত্যক্ত সুরেন্দ্রের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠল। শেষ দৃশ্যে দেখা গেল মুমূর্ষু সুরেন্দ্রনাথের শয্যায় মাধবী আপনাকে প্রকাশ না করে পারে নি, কিন্তু কেমন করে? সে যখন প্রায় অচেতন হয়ে তার মাথাটি সুরেন্দ্রনাথের কাঁধের ওপর স্থাপন করল, তখন সুরেন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী তার পায়ের কাছে বসে। এখানেও মাধবী নীতিচ্যুত।

'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'দেবদাস' (১৯১৭) এবং 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০)-তে এই ট্র্যাজেডি-চেতনারই পুনরাবৃত্তি। শরৎচন্দ্র সব কটিতেই একটা সর্বাত্মক অপচয় (wastage) দেখেছেন। 'পল্লীসমাজ'-এ চরম দলাদলি, কুৎসা, হানা-হানির পটভূমি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত, যেখানে সবাইকে অবিশ্বাস করে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শত্রু, অপরকে বিনাশ করেই তবেই নিজের শ্রীবৃদ্ধি—ঠিকই তো, বর্তমান সমাজসংস্থিতি তো দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্যকে হনন করেই এবং কতটা হনন করতে পারবে তার সফলতার ওপরই। অথচ এই বুর্জোয়া ব্যক্তিতন্ত্র কত মহৎ আদর্শ সামনে রেখেই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল—মানবতা, মৈত্রী, স্বাধীনতা, এই সব। শরৎচন্দ্র আক্ষেপ করেছেন এই বলে, 'রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দুসমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হল এই যে,

এত বড় দুটি মহাপ্রাণ নরনারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল।' ('স্বদেশ ও সাহিত্য')

কিন্তু কেন নষ্ট হয়ে গেল? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর, সার্থক হবার নয় বলেই নষ্ট হয়ে গেল; আর এ উত্তর দিয়েছেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র তাঁর রচনার মধ্যেই। গল্পটা রমার দিক থেকেই একটু অনুসরণ করা যাক। রমা আর রমেশ যখন শিশু, তখন থেকেই তারা পরস্পরের অনুরাগী, রমেশের মায়ের মৃত্যু হলে রমা বলেছিল, 'কেঁদোনা রমেশদা, আমার মাকে আমরা দু'জনে ভাগ করে নেব।' তাদের সেই অনুরাগের একমাত্র সাক্ষী বেণী ঘোষালের মা, ফাদার ইক্যুইভ্যালেণ্ট, আর যে বেণী ঘোষাল কুচক্রী শিরোমণি। রমার সঙ্গে রমেশের বিয়ে হয়নি, কেননা রমেশরা অত বড় কুলীন নয়। এরা প্রত্যেকে আকণ্ঠ ক্লেদমজ্জিত মহও সবাই নিজেকে সবার থেকে শুদ্ধ মনে করে! আর রমা—আজীবন সে রমেশকে ভালোবেসে এসেছে, কেননা সেটাই তার হৃদয়ের সত্য প্রতিশ্রুতি; কিন্তু সেই রমা স্বয়ং রমেশের বিনাশের জন্য আগাগোড়া চেষ্টা করে এসেছে, চেষ্টা করতে বাধ্য হয়েছে, কেননা সে যে সমাজ শিরোমণিদেরই এক জন, নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে গিয়েছে (self-contradiction) এবং নিজেকেই ক্ষয় করেছে। বেণী ঘোষালের কাছে সে সগর্বে ঘোষণা করেছে, 'আমি যাব তারিণী ঘোষালের বাড়ী?' বৈষয়িকতার খাতিরে মাছ নিয়ে ভজুয়ার প্রশ্নের উত্তরে সে মিথ্যাচার করেছে, আর রমেশ তাকে সত্যবাদিনী বলে জানে। বাঁধ রক্ষা করতে সে আকবর লাঠিয়ালকে পাঠিয়েছিল রমেশের বিরুদ্ধে, জানত যে তাতে রমেশের মৃত্যুও হতে পারে। ভজুয়াকে ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে হাজতে পাঠানোতে তার যেমন সমর্থন ছিল, তেমনি রমেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্যও প্রস্তুত হয়েছিল। অথচ এর সবই ছিল আত্মক্ষয়ী অন্তর্দ্বন্দ্বের নিগেসিটি।

'দেবদাস' গল্পের ট্র্যাজেডি এই রকমই নায়ক-নায়িকার, বিশেষ করে নায়িকার নিজেরই কীর্তি। দেবদাসের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ অভিভাবকদের আপত্তিতে সম্ভব হয় নি, কিন্তু সে কারণ তুচ্ছ। ওরা দুজনেই এ গল্পে বেশ সাবালক, কিন্তু নিজেদের মান-অভিমানেই নিজেদের সার্থকতাকে ওরা দূরে সরিয়ে দিল এবং নিজেরা বিনষ্ট হল। এ গল্পের পার্বতী এক দিক থেকে বেশ বলিষ্ঠ, প্রেমে আত্মবিশ্বাসী,

'মনোদিদি, তুই মিছামিছি মাথায় সিঁদুর পরিস। কাকে স্বামী বলে তাই

জানিস নে। তিনি আমার স্বামী না হলে, আমার সমস্ত লজ্জাসরমের অতীত না হলে, আমি এমন করে মরতে বসতুম না।'

তবু ট্র্যাজেডির রিভার্সাল বা বিপরীত-পরিমাণ অনিবার্যভাবেই এল। অভিভাবকদের অমতেই বিবাহ করবার জন্য পার্বতী যখন দেবদাসের কাছে আবেদন উপস্থিত করল তখন দ্বিধা ও ভীরুতার জন্য দেবদাস প্রথম তা করতে পারল না; কিন্তু দেবদাস আবার নিজে যখন মনস্থির করল তখন পার্বতী বিমুখ হয়ে উঠল—কেন, অহংকার? পার্বতী বলেছিল, 'নয় কেন? তুমি পার আর আমি পারিনে? তোমার রূপ আছে গুণ নেই—আমার রূপ আছে গুণও আছে। তোমরা বড়লোক কিন্তু আমার বাবাও ভিক্ষে করে বেড়ান না। তাছাড়া পরে আমিও তোমাদের চেয়ে কোন অংশে হীন থাকবো না, সে তুমি জানো?'

পার্বতী পরস্ত্রী হয়ে গেল। তখনও তার মুখে প্রথম প্রতিশ্রুতির বুলি, বিপথগামী (তারই প্রত্যাখ্যানের জন্য) দেবদাসকে নিয়ে যেতে চায় সে, 'লজ্জা আবার কাকে? নিজের জিনিস নিজে নিয়ে যাব—তাতে লজ্জা কি?' কিন্তু ব্যাপারটা হাস্যকর, মর্মান্তিক—দেবদাসকে নিয়ে গিয়ে সে কী দিত? দেবদাস যদিও ঠিক সময়ে তার কাছে যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু যেতে পাবে নি। শেষবেশ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল সে, পারুর বাড়ির কাছে গিয়ে মরেছিল। এই শেষ ঘটনাটি অসীম, আশ্চর্য তাৎপর্যপুর্ণ—দেবদাস মরছে, পার্বতীর দোরগোড়ায়, কিন্তু পার্বতী আপন গৃহকর্মে লীন, সে জানেও না—দু-জনের আত্যন্তিক অনুরাগ সত্ত্বেও দুজনের মাঝখানকার একটুখানি ফাঁক চির অনতিক্রম্য।

'বামুনের মেয়ে'-তে সমাজবাস্তবতার নির্মম রূপটি আরো প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। নীতিচ্যুতির এ এক নগ্ন আলেখ্য। এস্ট্যাবলিসমেণ্ট নিজেরই বিঘোষিত আদর্শকে নিজেই নষ্ট করছে। গোলোক চাটুজ্যে কুলীনের শিরোমণি কিন্তু নিজের শালীকেই (এক ইচ্ছুক অংশীদার) কলঙ্কের পাঁকে টেনে নামিয়েছে; কুলীনেই কুলীনের কুল রক্ষা করে এই জন্য গোলোক চাটুজ্যে তরুণী হরিমতিকে বিবাহ করেছে কিন্তু আসলে সেটি নিজের অপরিতৃপ্ত লালসা চরিতার্থ করার জন্য। সন্ধ্যার পিতার জন্মবৃত্তান্ত যখন প্রকাশিত হল (কুলীনের দ্বারাই) তখন দেখা গেল যে, এক মহাকুলীন কেবল টাকার লোভে তার বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করার জন্য এক নাপিত ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

সমালোচকেরা এক মত যে 'গৃহদাহ' (১৯২০) শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি এবং সম্ভবত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। মহিম, সুরেশ ও অচলা এই চরিত্রত্রয়ীর মধ্যে সদ্য-কথিত আত্মতন্ত্রতা, স্ববিরোধ এবং নীতিচ্যুতির সমবেত শক্তিই সার্বিক অবক্ষয়ের দিকে তাদের টেনে নিয়ে গেছে। সুরেশ অত্যন্ত উষ্ণ, আবেগ-চালিত, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধতা সে সইতে পারে না ; আর মহিম অত্যন্ত শীতল, আত্মস্থ, অপরের স্বাধীনতায় সে হস্তক্ষেপ করে না ; দুজনেই আত্ম-কেন্দ্রিক, স্বেচ্ছাচারী, আশ্চর্য নয় যে ওরা পরম বন্ধু। সুরেশ বন্ধুকে ব্রাহ্ম-কন্যার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই তার প্রেমে পড়েছে, অর্থাৎ বন্ধুর প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে। আর মহিম নিজের বিবাহিতা পত্নী ও বন্ধুর ক্রমবর্ধমান আসক্তি দেখেও তা রোধ করার চেষ্টা করেনি, কেননা, তাতে যে তার আত্মমর্যাদায় বাধবে! আত্মানুবর্তনের এ এক কঠিন চিত্র যা নিজের ধ্বংস দেখেও নিজেকে ছাড়ে না—এমন যে, অচলাই একদিন রুদ্ধশ্বাস হয়ে বলে উঠেছিল, স্ত্রীর কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া তো দূরের কথা, চাইবার মতো পৌরুষও তার নেই! এদের স্ববৈপরীত্য এমনি যে অচলা এক পিতৃপ্রতিম ব্যক্তির কাছে নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে পরপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে—শিল্পী শরৎচন্দ্রের উদ্ভাবনী দক্ষতা এ উপন্যাসে এক চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে।

কিন্তু শরৎচন্দ্র ট্র্যাজেডির মধ্যে আত্মতন্ত্রী মানুষের অবক্ষয়ই কেবল দেখান নি, অজস্র কমেডি রচনা করে তার সিদ্ধি, ঐশ্বর্য এবং সার্থকতাও দেখিয়েছেন। বুর্জোয়া আত্মতন্ত্রী মানুষের শক্তি নিঃসীম, এবং সে আত্মগত এবং অন্যাগত বিরুদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠে অমলিন সার্থকতায় পৌঁছাবে—এ বিশ্বাস তিনি নিজে করেছেন, পাঠককেও করতে বলেছেন। এমন করুণ-মধুর আশা ও আশ্বাসের কথা তিনি বলতে পারেন যে, পাঠক একটা বিমুগ্ধ বিস্ময়ই অনুভব করে।

'বিরাজ বৌ'-এ (১৯১৪) বিরাজ কুলত্যাগিনী হয়েছে কিন্তু স্বামীর কাছে ফিরে এসে মরেছে—শরৎচন্দ্র তাকে বাঁচিয়েছেন যে সে তার দেহকে কলঙ্কিত হতে দেয়নি। 'স্বামী' (১৯১৮) গল্পে একই প্যাটার্নের অনুবর্তন—স্বামীকে ছেড়ে পলায়ন এবং অমলিন অবস্থায় ফিরে আসা। এসব গল্পের ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণে ছেলেমি আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আছে লেখকের বিশ্বাস আর ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষা।

'পরিণীতা' (১৯১৪), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'দত্তা' (১৯১৮) গল্পগুলিতে প্রেমের প্রথম প্রতিশ্রুতি আশ্চর্যভাবে সার্থক হয়েছে ; স্ববিরোধ, আত্মহনন বা অবক্ষয়ের দ্বারা কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি লাঞ্ছিত হয়নি। ললিতা শৈশবাবধি শেখরের অনুবর্তিনী, মালাবদলের ঘটনা তার স্বীকৃতি, শেখর মধ্যবর্তী স্তরে তাকে ছুঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি, ললিতার কাছে ফিরে এসেছে ; ললিতা বিজয়িনী ('পরিণীতা')। 'দত্তা' গল্পের বিজয়া নরেনের কাছে পিতা কর্তৃক বাগদত্তা, সেই সত্য সে নিজে এবং তার সহযোগী বিলাসবিহারী ও রাসবিহারী তিন জনে মিলে ভেঙে ফেলবার প্রায় শেষ পর্যায়ে এনে ফেলেছিল, এমন কি বিলাসবিহারীর সঙ্গে বিবাহের চুক্তিপত্রে বিজয়া স্বাক্ষরও করেছিল। কিন্তু শেষবেশ শরৎচন্দ্র সত্যদত্তা রূপে নরেনের সঙ্গেই তার বিবাহ দিয়েছেন। 'অরক্ষণীয়া'-র জ্ঞানদার কাহিনীতে দুর্মর (diehard) আত্মতন্ত্রীর ছবি। জ্ঞানদা বালিকাকালেই অতুলের মন পেয়েছিল এবং মন দিয়েছিল বলে বিশ্বাস। কিন্তু তারপর জগৎ-সংসারের সব কিছু সরে যেতে লাগল তার কাছ থেকে, বাবা মরলেন, াতুলালয়ে তার স্থান হল না, দারিদ্র্যে-ব্যাধিতে তার রূপ নষ্ট হল, শেষ ালে মাও মরল, কিন্তু সে ঠিক টিকে রইল : তার মায়ের উক্তি লক্ষ করুন—

> 'হাঁ লো গেনি, এত ধিক্কারেও তোর প্রাণ বেরোয় না ! যদু ঘোষের এক ছেলে সেদিন তিন দিনের জ্বরে মলো—আর একটা বছর ধরে তুই নিত্য জ্বরের সঙ্গে যুঝছিস, কিন্তু তোকে তো যম নিতে পারলে না ! তুই বলে তাই এখনও মুখ দেখাস ; আর কোনো মেয়ে হলে মনের ঘেন্নায় এত দিন জলে ডুবে মরত। যা যা সুমুখ থেকে, একটু নড়ে না শকুনি—এক দণ্ড হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। দিবা-রাত্রি আমাকে যেন জোঁকের মত কামড়ে পড়ে আছে।'

আর শেষ পর্যন্ত অতুল জ্ঞানদার কাছে ফিরে এসেছে। তিনটি গল্পই আশ্চর্য মনোরম ততোধিক আশ্চর্যভাবে the prime principle amply vindicated।

আগেই বলা হয়েছে শরৎচন্দ্র পার্টিজান শিল্পী। বুর্জোয়া আত্মতন্ত্রীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, তাকে আদর্শায়িতও করেছেন। উদাহরণত, বুর্জোয়া নীতিচ্যুতিকে তিনি আর কোনো মূল্যবোধের দ্বারা পুষিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই প্রবর্তনা থেকেই শরৎসাহিত্যে বহু-বিতর্কিত

এবং বহু-আলোচিত প্রেম বনাম সতীত্বের ধারণাটি এসেছে। শরৎচন্দ্র একাধিক উপলক্ষে ঘোষণা করেছেন যে, 'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়' ('স্বদেশ ও সাহিত্য'); আবার, 'সতীত্বকে আমি তুচ্ছ বলি নে, কিন্তু একেই তার নারী-জীবনের চরম ও পরম শ্রেয় জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি।' (ঐ)

'শ্রীকান্ত, (৪ খণ্ড : ১৯১৭-৩৩) উপন্যাসে এই তত্ত্বের চমকপ্রদ উদাহরণ আছে। মূল চরিত্র রাজলক্ষী, তার দেহ কলঙ্কিত, জীবিকায় সে বাইজী, কিন্তু শ্রীকান্তের প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেম। অভয়া, কমললতা প্রভৃতি নিয়ে যে সব পরীক্ষা হয়েছে তাতেও দেহাশুদ্ধির ওপর প্রেমের প্রোজ্জ্বল মহিমা ফোটানোর চেষ্টা হয়েছে। এরা ঘটনার চাপে বা স্বেচ্ছায় অশুদ্ধিস্পৃষ্ট হলেও এদের মূল মহিমা (পূর্বকথিত prime principle) অক্ষুণ্ণ থাকে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির অদ্ভুত পরীক্ষা হয়েছে 'চরিত্রহীন' (১৯১৭) উপন্যাসে। শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রে আমরা লক্ষ্য না করে পারি না যে তাঁর সব উপন্যাসের মধ্যে এটির সম্বন্ধেই তিনি অনেক বেশি উদ্বিগ্ন, অনেক বেশি প্রচারমুখীন হয়ে উঠেছিলেন। তার একমাত্র কারণ, চরিত্রহীনের অদ্ভুত বক্তব্য : এর প্রত্যেকটি নর-নারী চরিত্রহীন আবার চরিত্রহীন নয়ও, সবাই শেষ পর্যন্ত ভালো, উপীন তো বটেই, সতীশ, সাবিত্রী, কিরণময়ী, দিবাকর, সবাই!

এই তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার আগ্রহে তিনি তাঁর শেষ জীবনে লিখিত দুটি উপন্যাস 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১) এবং 'শেষের পরিচয়' (অসমাপ্ত)-এ অত্যন্ত বেশি সাহসী হয়ে উঠেছেন। মনে হয়, আত্মতন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারের উদ্গাতা হিসেবে এখানে তিনি খানিকটা প্রতিক্রিয়াকেই স্পর্শ করেছেন। লেখক মন্তব্য করেছেন, 'শেষ প্রশ্নে অতি আধুনিক সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেছি।'

কী সেই অতি-আধুনিকতা? না, বুর্জোয়া আত্মতন্ত্রীকে তিনি শৃঙ্খলহীন স্বাধীনতা দিয়েছেন। কমল তার পরীক্ষার স্থল। শরৎচন্দ্রের প্রথম দিককার সাহিত্যে নারীর আত্মপ্রকাশ বড় কুণ্ঠিত, কিন্তু কালের ব্যবধানে কমলই এখন প্রভুতম ব্যক্তিত্ব। স্বাধীন স্বেচ্ছাচারের কমলই সবচেয়ে বড় প্রট্যাগনিস্ট। শিবনাথের সঙ্গে তার শৈব বিবাহ, সে বিবাহ ভাঙতে দেরি হয় নি। তারপর অজিত—অজিতের সঙ্গে মোটর বিহারের সময় স্বেচ্ছায় দেহদান করতে সে প্রস্তুত ছিল, অজিতই পিছিয়ে গেছে বিস্ময়ে। শেষে অজিতের সঙ্গে সহবাসের জন্ম সে চলে গেল, কোনো রকম বিবাহ সম্পর্ক

স্বীকার না করেই। এখানে আর প্রেম বনাম সতীত্বের তত্ত্ব নয়। যেখানে প্রেম সেখানেই দেহ, এতে কারুর বহুচারী হতে বাধা নেই। উপন্যাসের অন্য নরনারী এই নতুন তত্ত্বের পরিপোষক পটভূমি হয়েছে।

'শেষের পরিচয়' শরৎচন্দ্র শুরু করেছিলেন, শেষে তাঁর মনে কী ছিল জানা নেই, যদিও রাধারাণী দেবী তা সম্পূর্ণ করেছেন। সবিতার পদস্খলন রিয়ালিটি (মানে, ক্ষয়িষ্ণু রিয়ালিটি) সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের অভ্রান্তবোধের পরিচায়ক। সবিতার সব ছিল, ঐশ্বর্য, স্বামীপ্রেম, সন্তান—তবুও নীতিচ্যুত হল সে একদিন। এটা অনিবার্য, তার রক্তের মধ্যেই ছিল, আত্মতন্ত্রীর inherent self-contradiction ! জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা মনে করিয়ে দেয় :

> অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়,
> আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
> আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
> খেলা করে।…

আজকাল একটা কথা উঠেছে, শরৎচন্দ্র কি প্রগতিশীল ছিলেন? সমাজ-চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ বেশি প্রগতিশীল, না, শরৎচন্দ্র বেশি প্রগতিশীল ?

প্রথম প্রশ্নটির উত্তর, আমরা শরৎচন্দ্রের যে সাহিত্য-পরিক্রমা করেছি, তার মধ্যেই পাওয়া যাবে।

সমাজ তার বিবর্তনের পথে কয়েকটি স্তর অবলম্বন ও অতিক্রম করে পূর্ণতার পথে এগোচ্ছে। এক একটি সমাজসত্য বিশেষ একটি করে নিয়ন্ত্রী রূপ লাভ করে। বুর্জোয়া আত্মতন্ত্রী বিপ্লব শরৎচন্দ্রের প্রধান সামাজিক ধারা, যদিও তাঁর শেষ বয়সের দিকে দেশে সাম্যবাদী চিন্তাধারা ও কার্যক্রম রূপ পেতে আরম্ভ করেছিল। এবং বুর্জোয়া আত্মতন্ত্রী বিপ্লব যতটা নিজ বৈশিষ্ট্যে সফল হয়ে সমাজতন্ত্রের পথে এগোবে (তা সে সমাজতন্ত্র দেশভেদ ও কালভেদে যে রূপেই আসুক না কেন)—ততই তা প্রগতিশীল হবে।

সেই মানদণ্ডে বলব, যেহেতু বুর্জোয়া আত্মতন্ত্রী বিপ্লব সমাজ-বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তর এবং অনিবার্য স্তর, আর শরৎচন্দ্র সেই স্তরটিকে আশ্চর্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিফলিত করেছেন তাঁর সাহিত্যে, সে হেতু তিনি নিশ্চিতই প্রগতিশীল।

এবং বিচারের ঐ একই মানদণ্ডে একথাও সমান নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায়, সমাজভাবনায় রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের অপেক্ষা প্রগতির অভিমুখে অধিকতর অগ্রগামী, অধিকতর সামগ্রিক।

অথচ আমাদের তথাকথিত বামপন্থী ও প্রগতিশীল সাহিত্য-সমালোচক-দের এতই মানসিক ঐশ্বর্য যে রবীন্দ্রনাথকে ভাববাদী, বুর্জোয়া, ইংরেজ সাম্রাজ্যের সহযোগী প্রভৃতি কতই না মুখরোচক অভিধায় অভিহিত করেছেন—বড়জোর তাঁকে মানবতাবাদী বলে স্বীকার করে তৃপ্তিলাভ করেছেন। সেই 'মার্কস্‌বাদী' আমল থেকে শুরু করে আজকের 'Frontier' পর্যন্ত এঁরা রবীন্দ্র-ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত—হয়তো গুঁতো দিয়ে শিংএর ধার পরীক্ষা করার জন্যই। এঁদের সমাজনীতি-রাজনীতির জ্ঞান ময়দানের সীটিং-আর কলকাতার পথের জুলুস পর্যন্ত—আর সাহিত্যবোধ? একটা গল্প মনে পড়ছে: কোনো ডাক্তার রোগীর নাড়ী টিপে বললেন, খোকা, আবার মুড়ি খেয়েছ? খোকা বললে, না, ডাক্তারবাবু, খাই নি তো। ডাক্তার হাসলেন, ঐ যে, তোমার বালিশের পাশে মুড়ি পড়ে আছে দেখছি। খোকা তখন লজ্জায় অধোবদন। এক গ্রামবৈদ্য ব্যাপারটা লক্ষ্য করে পুলকিত হলেন। অন্য এক জায়গায় এক খোকাকে প্রশ্ন করলেন, খোকা, তুমি লাটিম খেয়েছ? খোকা তো বটেই, বাড়ির লোকশুদ্ধ অবাক। গ্রামবৈদ্য মিচকে হাসছেন, হ্যাঁ, আমাকে ফাঁকি! ঐ যে তোমার বিছানায় লাটিম পড়ে আছে!

না, হাসির নয়, প্রগতি সাহিত্যের দুর্দশা আজকাল ওই রকমই হয়েছে। শরৎচন্দ্র লিখেছেন অভাগী, গফুর আর 'পথের দাবী'-তে শ্রমিক ধর্মঘটের কথা, অতএব তিনি সমাজতন্ত্রের পরিপোষক শিল্পী। আর রবীন্দ্রনাথ রূপক, সাংকেতিকতা, অভিজাত সমাজ নিয়ে লিখেছেন, সুতরাং সোসল্‌ রিয়ালিটি তাঁর সাহিত্যে নেই! অন্তত সমাজতন্ত্রের ধারে কাছে তিনি নেই।

সে কথা যাক। এই প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের অপসমালোচনার উত্তর দেবার জন্য লিখিত হচ্ছে না। রবীন্দ্রসাহিত্যে সমাজসত্য কী ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তার প্রকৃতি কী, শরৎচন্দ্রের রচনার পাশাপাশি রেখে তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু তা করতে গিয়েও আমরা রবীন্দ্ররচনার আলোচ্য বস্তুকে সীমিত করে নিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের বিপুলসংখ্যক কাব্য-নাটক-সংগীতকে আমি প্রয়োজনে ছুঁয়ে যেতে পারি, কিন্তু এখানে মূলত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির ওপরই আলোকপাত করতে চাই, কেননা, তা

হলেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তুলনায় রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য ও পার্থক্য সহজেই ধরা পড়বে।

তথাপি একথা স্মর্তব্য যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাটকের পটভূমি ছাড়াও তাঁর উপন্যাসের পূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব নয়, কারণ তাঁর বহুমুখ সৃষ্টি পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং পরস্পরের অনুরঞ্জনেই অগ্রসর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথমযুগের 'বনফুল' (১৮৭৬), 'কবিকাহিনী' (১৮৭৭) এবং 'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১) প্রমুখ আখ্যানকাব্যগুলি সবই ট্র্যাজেডিমর্মী। এখানকার প্রতিটি চরিত্র আপনার অতিশয়িত হৃদয়াবেগের মধ্যে আপনি নিমগ্ন, অরণ্যে পথহারা। প্রেমিক-প্রেমিকা, বন্ধু, সকলেই আপনাকে আবর্তন করতে করতে যখনই পরস্পরের সন্নিহিত হচ্ছে, তখনই একদিকে যেমন আকর্ষণ তেমনি অন্যদিকে বিকর্ষণেরও সৃষ্টি হচ্ছে। প্রখর আত্মতন্ত্রী মানুষের এসব আলেখ্য আমাদের মুগ্ধ করে। কাব্যের ক্ষেত্রে 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮১) থেকে শুরু করে 'মানসী' (১৮৯৪) পর্যন্ত কবিচিত্তের মৌল অনুভূতি ও ট্র্যাজেডিমর্মী, বিষাদ ও শূন্যতার হাহাকার—হৃদয়ারণ্যে পথবিভ্রম; অবশ্য তারই মধ্যে রয়েছে আত্ম-অতিক্রমণের প্রয়াস—যেমন, 'মানুষের মন চায় মানুষেরই মন' ('কবিকাহিনী'), কিংবা 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে / মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' ('কড়ি ও কোমল')—কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই আত্ম-অতিক্রমণের প্রয়াস আত্মবশ্যতারই গরজে।

এই পটভূমিতেই লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), 'রাজর্ষি' (১৮৮৬), 'চোখের বালি' (১৯০৩) এবং 'নৌকাডুবি' (১৯০৬)। ব্যক্তিমানব তার সমস্ত সমাজশৃঙ্খল কেটে কেবল আত্মবশ্যতার প্রেরণাতেই চালিত হচ্ছে—কখনো মিলিত হচ্ছে, কখনো দূরে সরে যাচ্ছে এবং কখনো বা তীব্রতম সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে—এইসব ক'টি উপন্যাসেই পাওয়া যায় তার ছবি। গ্রীস এবং পরে ইংলণ্ডে ব্যক্তি-স্বাধীনতার উদ্ভবের সঙ্গে সাহিত্যের ট্র্যাজেডি-প্রসঙ্গ জড়িত একথা আগেই বলা হয়েছে : রবীন্দ্রসাহিত্যেও একই লক্ষণ দেখা যায়। উক্ত উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রথমটিতে রিয়ালিটিকে যে গভীরতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ধরেছেন, তার তুলনা নেই। রাজপুত্র উদয়াদিত্য ঠিক সচরাচর 'রাজপুত্রের মতো নয়, প্রতাপ নয় প্রেমই তার জীবনের মূল প্রবর্তনা, সে ভালোবাসে পত্নী সুরমাকে, ভগ্নী বিভাকে, দাদামশায় বসন্ত রায়কে, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আক্রোশ নেমে এসেছে তার এবং তাদের ওপর; যাকেই সে ভালোবেসেছে তারই

ওপর টেনে এনেছে অভিশাপ, সুরমা এবং বসন্ত রায় উভয়েরই মৃত্যু হয়েছে। আর বোন বিভার ভালো করতে গিয়েই উদয় তার সর্বনাশ ডেকে এনেছে, 'বিভা, আমার কাছ হইতে শীঘ্র পলাইয়া যা। আমি শনিগ্রহ, আমার দেখা পাইলেই চারিদিক হইতে দেশের বিপদ ছুটিয়া আসে।' আশ্চর্য ব্যাপার এই, কেবল মহারাজের পুত্র বলেই যে উদয়াদিত্য নিজের বা অপরের বিপদ ডেকে এনেছে তা নয়, ব্যক্তিতান্ত্রিকের আত্মকলঙ্কও কম নয়, যৌবনে স্বৈরিণী রুক্মিণীর সঙ্গে তার সংস্পর্শ তাকে রাহুর মতো অনুসরণ করেছে, সুরমার মৃত্যুর অন্যতম কারণ সেটাও। বিনাশ, নিঃসঙ্গতা ও পরিত্যক্ততার পটভূমিতে ব্যক্তি মানুষের এই উৎসারণ সে যুগের রিয়ালিটির এক অতিশয় বাস্তব আলেখ্য।

'রাজর্ষি' উপন্যাস, এবং সেই সঙ্গে 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকেও দেখানো হয়েছে যে এই সভ্যতায় প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যেকের শত্রু। দেবীপূজক রঘুপতি দেবোপম রাজা গোবিন্দমাণিক্যের শত্রু, পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতা নক্ষত্ররায় ভাইয়ের বক্ষে ছুরিকাঘাত করতে কুণ্ঠাহীন। প্রত্যেকেই ক্ষমতালিপ্সু, সেনাপতি, রাণী ('বিসর্জন')—সবাই। এমনকি গোবিন্দমাণিক্য নির্বাসনে গিয়েও প্রেমের শক্তির দ্বারাই সকলকে জয় করতে চেয়েছে—এও ক্ষমতালিপ্সা, inverted। 'চোখের বালি'-র ঘটনা-পরম্পরার কারণ, রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, মায়ের ঈর্ষা। কিন্তু ঈর্ষা কি কেবল মায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? বিনোদিনী ঈর্ষা করেছে আশাকে, মহেন্দ্র বিহারীকে—যে বহুমুখ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে সবাই। 'নৌকাডুবি'-র কাহিনী আপাতদৃষ্টিতে বড় নিরীহ, অনেকে এটিকে দুর্বল রচনা বলেওছেন। কিন্তু ওরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রমেশ-হেমনলিনী এবং রমেশ-কমলা এই দুটি যুগ্মক সৃষ্টি করে রিয়ালিটির আশ্চর্য সত্যনিষ্ঠ ছবি আঁকতে পেরেছেন। কমলা রমেশকে স্বামী বলেই জানে এবং ঘনিষ্ঠভাবে তাকে পেতে চায়, কিন্তু তাকে ধরা দেওয়া রমেশের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব; পারে না হেমনলিনীকেও তার অন্তরের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও গ্রহণ করতে, তার সমস্ত বাধা এসেছে ভুল বোঝাবুঝি, মান-অভিমান এবং পরিস্থিতিগত জটিলতার জন্য। আবার, কমলা যখন তার জীবন থেকে চলে গেল, তখন হেমনলিনীও তার কাছে অপ্রাপনীয়া। আশ্চর্য নয় কি? এই ব্যক্তিতান্ত্রিক বুর্জোয়া সমাজে মানবতা ও যুক্তিবাদের বহু-বিঘোষিত আদর্শ সত্ত্বেও মানুষ অত্যন্ত একলা, পাশাপাশি থেকেও প্রাণপণে ভালোবেসেও মাঝখানে বিচ্ছেদের ফাঁক, মিলবার উপায় নেই।

৫

মনে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের এই চারখানি উপন্যাস উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকের মধ্যেই লিখিত। রেনেশাঁসের অব্যবহিত ফলশ্রুতিরূপে যে ব্যক্তিমানবের অভ্যুদয়, বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রথম তাঁর উপন্যাসে যাকে নিজের মতো করে ধরেছেন—রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসগুলিতে তারই সত্যতম চিত্র প্রতিফলিত। শরৎচন্দ্র কত বিচিত্রভাবে বুর্জোয়া জীবনাদর্শের এই সত্যকে ধরেছেন (বুর্জোয়া শব্দটি, বলা বাহুল্য, এখানে হীনার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না), তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ঠিক এর পরেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের এমন গুণগত পরিবর্তন দেখা যায়, যা শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে ছিল না। 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাস থেকেই তার শুরু হল—এবং এসবের মধ্যে যে জীবনাদর্শ ক্রমে প্রতিফলিত হয়েছে, তা বিশ্বমানবতা বা ওঅর্লড্ কম্যুনিজ্‌মের লক্ষ্যাভিমুখ, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত হচ্ছি এই ভেবে যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এদেশে এবং ওদেশে বহু লেখক ও মনীষী বুর্জোয়া ভাববাদী দৃষ্টিতে বিশ্বমানবতার কথা বলেছেন, সে সবেরও ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চিতই আছে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যা সত্য তা বৈজ্ঞানিক সমাজচিন্তারই সগোত্র বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়েছিলেন কিন্তু কখনো মার্কসবাদ অধ্যয়ন করেছিলেন বলে তাঁর কোনো জীবনীলেখক আমাদের জানান নি। অথচ আশ্চর্য এই, সমাজ-পরিবর্তনের নির্ভুল সূত্রগুলি অতি বড় অগ্রণীর তুলনাতেও তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন এবং সেটাই তাঁর শেষ বয়সের রচনার অন্তর্নিহিত মূল সুর হিসেবে কাজ করেছে।

তাঁর অজস্র গল্প-কবিতা-নাটকের আলোচনার স্থান এটা নয়, এমন কি, তাঁর পরিকল্পিত সমাজ-পরিবর্তনের সমস্ত সূত্রগুলি বিশদভাবে আলোচনার স্থান এটা নয়, এমনকি, তাঁর পরিকল্পিত সমাজ-পরিবর্তনের সমস্ত সূত্রগুলি বিশদভাবে আলোচনার অবকাশও এখানে নেই (যা আমার ইচ্ছে রইল অন্যত্র অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার)—কেবল তাঁর চিন্তাধারার মূল সূত্রগুলি উপস্থিত করছি, তাঁর শেষ বয়সের উপন্যাসগুলির পটভূমিকে স্ফুটতর করবার জন্যই।

১. বস্তুজগৎ এবং সেই সঙ্গে মানুষের সমাজ নিরন্তর পরিবর্তনশীল—রবীন্দ্রপরিকল্পিত এই গতিতত্ত্ব এতই সুপরিচিত যে তার ব্যাখ্যা করার

প্রয়োজন নেই। ট্র্যাডিশনাল সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের গতিতত্ত্বের সঙ্গে উপনিষদের এগিয়ে চলার বাণী এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক বের্গসঁর গতিবাদের সঙ্গে তুলনা ও প্রতিতুলনা করেছেন। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার সগোত্রতা কতখানি তা কেউই বিশ্লেষণ করে দেখান নি। উপনিষদের 'চরৈবেতি'র এক মাত্র লক্ষ ব্রাহ্ম পর্যন্ত, সেখানে পৌছোতে পারলেই চলার শেষ। বের্গ্সঁ অবশ্য চলার শেষের কথা বলেন নি, elan vital মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে—যা বড় যান্ত্রিক বলে মনে হয়, এর মানবিক আত্মিক মূল্য অস্বীকৃত। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের চলার মধ্যে ক্রম-পরিণতি, ক্রমাগত উৎকর্ষ পরিকল্পিত। মানুষের মধ্যে তিনি যে 'সারপ্রাশ' বা ভূমার অস্তিত্ব আছে বলে মনে করেন, সেটাই তাকে ক্রমবিকশিত করে তুলছে।

২, পরিবর্তনের পথে জগৎ ও মানুষ তার বিপরীতকে সৃষ্টি করে তুলছে, সেই বিপরীত মূলকে হনন করে নতুনকে স্বাগত জানায়। সাম্যবাদী দর্শনে যে contradiction এবং unity of opposites-এর কথা বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের নিজের উপলব্ধিতে তা ধরা পড়েছিল। তাঁর অজস্র উক্তির মধ্যে দু-একটি উদ্ধৃতি করছি :

আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে···(জন্মদিন, 'সেঁজুতি')

হে নূতন,
দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি। (পঁচিশে বৈশাখ, 'পূরবী')

তাছাড়া, এই বিপরীত বা opposite-এর সৃষ্টি মূলের থেকেই—thesis-antithesis-এর ধারণাই মতোই। প্রতাপাদিত্যের ঘরেই জন্মায়, উদয়াদিত্য, রঘুপতির ঘরে জয়সিংহ, রণজিতের প্রাণপ্রতিম পুত্র অভিজিৎ ইত্যাদি।

৩. সমাজতান্ত্রিক পণ্ডিতেরা সমাজ-পরিবর্তনের স্তর-পরম্পরা দেখাতে গিয়ে একটা সূত্রের কথা বলেছেন—ক, খ, গ···এমনভাবে যে খ, ক-কে আত্মসাৎ করে গ-তে পরিণতি লাভ করে। এই প্যাটার্নটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু রচনায় পরিস্ফুট করেছেন। 'রক্তকরবী' নাটকটির কথা ধরা যাক—তার প্রথম স্তর জালের অন্তরালবাসী মকররাজকে নিয়ে; দ্বিতীয় স্তরে তার বিপরীত,

তার প্রতিদ্বন্দ্বী এল নন্দিনী-রঞ্জন; তৃতীয় স্তরে দেখা গেল রঞ্জন ধুলোয় পিষে গেছে, কিন্তু নন্দিনী বলছে, ও আবার আসবে, ওর জন্যে অপেক্ষা করে থাকব। তারপর নন্দিনী এগিয়ে গেছে, ভেঙে যক্ষপুরী, কিন্তু যে রাজা রঞ্জনকে মেরেছে তার হাত ধরে, তাকে নিজের সঙ্গী করে নিয়ে। সমাজ-পরিবর্তনের এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি রবীন্দ্রনাথ আপন সুগভীর প্রজ্ঞার দ্বারাই উপলব্ধি করেছেন।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ এখানেই থাক। রবীন্দ্রদর্শনচিন্তার এই পটভূমি বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে (যা, আগেই বলা হয়েছে, বর্তমান লেখকের ইচ্ছা আছে সম্পূর্ণ করার)—এখানে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, সমাজতন্ত্রের যে মূল সূত্রগুলি তিনি নিজের দিক থেকে তাঁর কাব্য-নাটক ইত্যাদিতে ধরেছেন, সেগুলি তাঁর শেষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলির পটভূমি হিসেবেও ক্রিয়াশীল হয়েছে।

৬

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রখ্যাত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন, একদা তাঁরা পাশ্চাত্যের ব্যক্তিতন্ত্রের আদর্শকে সাগ্রহ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, 'মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ চরিত্রে। তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম'। কিন্তু দিনে দিনে সেই সভ্যতা নিজের বিঘোষিত আদর্শকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে—'প্রত্যহ দেখতে পেলুম, সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিত রূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে'। এইসব উক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমাজপরিবর্তনের যে দিক নির্দেশ করতে চেয়েছেন তা হচ্ছে, বিবর্তনের পথে কোনো একটি স্তরের বিশেষ মূল্য থাকে, কিন্তু অন্তর্বিরোধের ফলে সে মূল্য নষ্ট হয়ে যায়, তখন প্রয়োজন হয় নতুন মূল্যমানের, 'পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে বেচাকেনা / আর চলিবে না'। এই সত্য যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, তেমনি ভারতের 'জাতীয়' আন্দোলনের ক্ষেত্রেও দেখেছিলেন তার মূল ধারা থেকে এবং বারবার প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

সমাজপরিবর্তনের আভ্যন্তরীণ নিয়মে ব্যতিক্রম জাতিতন্ত্রে, জাতিতন্ত্র সাম্রাজ্যতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়—এর মধ্যে মূল প্রস্থানভূমি স্বচ্ছ সত্যসন্ধী ব্যক্তিতন্ত্র; রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিত্বের একনিষ্ঠ পূজারী, 'আমি যাকে আজ আমি

বলছি এর আর কোনো দ্বিতীয় নেই' ('শান্তিনিকেতন')। কিন্তু একথা আমরা জানি কবি Nationalism একেবারেই পছন্দ করতেন না, কারণ তাঁর ধারণা ছিল তথাকথিত জাতিপ্রেম ন্যায় ও সত্যের বিরোধী, ফ্যাসিতন্ত্রের জনক, এর শ্লোগান দাঁড়িয়ে যায়, 'My nation—right or wrong'। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিত্বই সর্বসমন্বয়ের ভিত্তিতে মানব মহিমায় কীভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে কবি তাও দেখিয়েছেন।

'গোরা' (১৯১০), 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) এবং 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) এই তিনখানি উপন্যাসে কবি সমস্যাটির আলোচনা করেছেন এবং বিশ্বমানবতামুখীন সমাধানের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক অত্যন্ত প্রখর জাতীয়তাবাদী, ইংরেজ কর্তৃক ভারতীয়ের অপমান সে যেমন সহ্য করে না, তেমনি হিন্দু ধর্মের এবং অজস্রবিধ আচার-আচরণের কিছুমাত্র শৈথিল্য স্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে তার সবচেয়ে বড়ো বাধা তার প্রাণপ্রতিম বন্ধু বিনয়, যে ব্রাহ্ম মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সেই জন্য বিনয় সম্বন্ধে সে সুকঠিন আদেশ জারি করেছে, 'তোমাকে আজ আমি আর কারও হাতে ছেড়ে দিতে পারব না···ভাই বিনয়, আমরা মরব, এক মরণে মরব—আমরা দুজনে এক, আমাদের কেউ বিচ্ছিন্ন করবে না, কেউ বাধা দিতে পারবে না।'

কিন্তু গোরার এই আক্রমণাত্মক, পরমঅসহিষ্ণু, সংকীর্ণ অথচ অত্যন্ত বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথ বিগলিত করেছেন সর্বজাতিকতার অভিমুখে। দুদিক দিয়ে পাষাণ গোরাকে তিনি বিগলিত করেছেন : প্রথমত, বিনয়ের ব্রাহ্ম মেয়ের প্রতি ভালোবাসায় সে যতই উত্তেজিত হোক না কেন, 'মানব-হৃদয়ের এমন একটা সত্য পদার্থকে' সে অস্বীকার করতে পারল না ; সে নিজেই সুচরিতাকে হৃদয় সমর্পণ করে বসল। দ্বিতীয়ত, গোরার একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের উপলব্ধি—মানুষ মানুষ থেকেই উদ্ভূত, কোনো তথাকথিত বিশুদ্ধ জাতি (ব্রাহ্মণ, আর্য, শ্বেতজাতি প্রভৃতি) থেকে নয় ; গোরা একদা জানতে পারল, সে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদয়ালের ঔরসজাত নয়, কোনো শ্বেতজাতীয়ের পুত্র। সেদিন থেকে, 'আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার আর অপবিত্রতার ভয় রইল না।'

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সমাজতান্ত্রিক জাতি-সম্মিলনের আদর্শের ওপরই আলোকপাত করা হয়েছে। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, জাতিতে-জাতিতে সংঘাত যেমন ধনতন্ত্রবাদের দূষিত ব্যাধি, তেমনি সমাজতন্ত্রবাদের অন্বিষ্ট হচ্ছে স্বাধীন

ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন জাতির মিলন। নিখিলেশ এই মন্ত্রের উদ্গাতা, 'মা যেমন নিজের গয়না দিয়ে, তার প্রত্যেক মেয়েকে সাজিয়ে দেয়, আজ তেমনি একটা দিন এসেছে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রত্যেক দেশকে আপন গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। আজ আমাদের খাওয়া-পরা চলাফেরা ভাবনাচিন্তা সমস্তই সমস্ত পৃথিবীর যোগে। My nation, right or wrong—এই বুলি তার নয়। সে বলেছে, 'দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ হবে।'

আবার, নিখিলেশ স্বাধীন ব্যক্তিত্বের মিলনের আদর্শ নিজের পারিবারিক জীবনেও পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছে। বিমলাকে স্বাধীন সত্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে সেখান থেকেই সে তার প্রেমলাভ করতে চেয়েছিল, '…তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকরনাটুকু করে যাওয়ার জন্য তুমিও হওনি আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।'

পক্ষান্তরে, সন্দীপকে এবং 'চার অধ্যায়'-এর ইন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ বিকৃত জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন—তাঁর সামনে যেমন ছিল বিশ্বের পটভূমি, তেমনি ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের গতি-প্রকৃতিও। তিনি সরে এসেছিলেন 'জাতীয়তা'-বাদী আন্দোলন থেকে তার অশুভ দিককে প্রত্যক্ষ করে। তিনি যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, এতদিন পরে তার সত্যতা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

সন্দীপ নিখিলেশের প্রতিদ্বন্দ্বী। সে বলে, 'যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেটুকুই আমার, একথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা।' অন্যত্র সে বলেছে, 'কে বলে সত্যমেব জয়তে। জয় হবে মোহের।' পাঠকদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, সমকালীন ভারতবর্ষে এসব জিনিষ অতিপ্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে দেখা যায়নি?

'ঘরে বাইরে' এবং বিশেষ করে 'চার অধ্যায়' লিখে রবীন্দ্রনাথ তখনকার দিনের 'জাতিপ্রেমিক'দের কাছে তীব্র নিন্দার লক্ষ হয়েছিলেন। কারণ, তথাকথিত জাতিতন্ত্র স্বচ্ছন্দে স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রে পরিণতি লাভ করতে পারে—পাশ্চাত্য ফ্যাসিতন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে তো এর ভূরিভূরি উদাহরণ

আছে ; স্বদেশেও রবীন্দ্রনাথ এটা লক্ষ না করে পারেন নি। 'চার অধ্যায়' শোনা যায় গুপ্ত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লেখা—হবেও বা, কিন্তু মনে হয় রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত লক্ষ্য ছিল গান্ধীর নেতৃত্বে তৎকালীন জাতীয় আন্দোলন, গান্ধীর প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও। ইন্দ্রনাথের আইডিয়া কবি পেয়েছিলেন হয়তো কোনো বিপ্লবী নেতার কাছ থেকে, কিন্তু বেশি করে পেয়েছিলেন, আমার মনে হয়, গান্ধীর একনায়কতন্ত্র থেকে। ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '...রাজচক্রবর্তীর মতো। অসাধারণ তাঁর তেজ, আর বিদ্যার খ্যাতিও প্রভূত।...অত্যন্ত দুঃসাধ্য রকমের দাবি সে অনায়াসেই করতে পারে, জানে সেই দাবি সহজে অগ্রাহ্য হবে না।' ইন্দ্রনাথ নিজেই সে সম্বন্ধে সচেতন, 'আমার ডাক শুনে কতো মানুষের মতো মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে চারিদিকে এসে জুটল ;...কেন? আমি ডাকতে পারি বলেই।'

ইন্দ্রনাথের এই উক্তির সঙ্গে গান্ধী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের তুলনা করা যেতে পারে, 'মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে। অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে, তিনি বললেন—কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো...এই ডাক নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক?'

একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ঋষিপ্রতিম দূরদৃষ্টির উদাহরণ এই উপন্যাসের অন্যত্র থেকে তুলে দিচ্ছি :

'মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একটা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে—এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হল চিরজন্মের মতো পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উল্টো রথের যাত্রায়। ফিরল রথ [=আন্দোলন প্রত্যাহার?—লেখক]। যাদের হাড় ভেঙেছে তাদের হাড় জোড়া লাগবে না, পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে ফেললে পথের ধুলোর গাদায়। আপন শক্তির পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমনি করে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারী পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করলে, আশ্চর্য হয়ে ভাবলে—একেই বলে শক্তির নাচ। নাচনওয়ালা যেই একটু আলগা দেয়, বাতিল হয়ে যায় হাজার হাজার মানুষ পুতুল।'

কথাগুলো কি গান্ধীকে লক্ষ্য করে বলা নয়?

এবং আজকের পাঠক স্বচ্ছন্দেই লক্ষ্য করতে পারবেন, এই স্বৈরতন্ত্রের বা একনায়কতন্ত্রের ভূমিকা কোন পর্যায় পর্যন্ত উঠতে পারে, স্বাধীন ভারতবর্ষে সাম্প্রতিক কালেও আমরা তা দেখেছি।

এতক্ষণে বোধহয় আমরা এইটুকু বুঝতে পারছি যে, শরৎচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথও পার্টিজান শিল্পী কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিপুল স্তরপার্থক্য আছে। বুর্জোয়ার স্ববিরোধ সমেত তাকেই উজ্জ্বল করে তুলেছেন শরৎচন্দ্র, আর বুর্জোয়ার স্ববিরোধ যেখানে বিকৃতিতে নিয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ তার প্রতিরোধ করেছেন, সেক্ষেত্রে ভারতীয় এবং বিশ্বজাগতিক দুই পটভূমিই তাঁর সামনে ছিল। কিন্তু বুর্জোয়া ব্যক্তিতান্ত্রিকের মৌল সত্য যেখানে বিকৃতি নয়, সফলতায়, পূর্ণ মানবসম্মিলনে পৌছাতে পারে—আলোচিত উপন্যাসগুলিতে তিনি তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা সেখানেই থেমে থাকে নি। তিনি আরো একটু অগ্রসর হতে পেরেছেন এবং এ যুগের পরম লক্ষ যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ তারও একটা দিক-নির্দেশ করতে চেয়েছেন তাঁর এই সময়কার অন্যান্য উপন্যাস ও কয়েকটি গল্পে। এখানে দু-একটির বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি।

'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র-প্যাটার্নটি একটু আশ্চর্যজনক। বিপ্রদাস ও কুমুদিনী অভিজাত ঘরের দুই ভাইবোন, তারা প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী. পরস্পরের সঙ্গে সহজ নাড়ির টানে গ্রথিত। এমন সময় এল মধুসূদন—যে নির্মম, স্বেচ্ছাচারী, দাম্ভিক, প্রতারক অথচ প্রভূত মুদ্রার মালিক। কুমুদিনীকে বিবাহ করতে চেয়েছে মধুসূদন, সব মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করে মধুসূদন বলেছে, 'ওই চাটুয্যেদের ঘরের মেয়ে চাই।' বিপ্রদাস যখন অসম বয়সের জন্য এ বিবাহে আপত্তি করেছে তখন কুমুদিনীর বাঁ চোখ নেচেছে এবং সে বলেছে, 'যাঁর কথা বলছ নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হয়েই আছে।'

বিবাহের পরই কুমুদিনীর অবস্থা জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে, দিনের পর দিন প্রণয়শূন্য দাম্পত্য তাকে অহরহ বিদ্ধ করেছে। প্রেমহীন যৌনসংযোগের ফলে সে গর্ভিণী হয়েছে (একেই কি বলব Rape of the masses ?)—তবু চলে আসতে হয়েছে কুমুদিনীকে বিপ্রদাসের কাছেই, এই সংকল্প নিয়ে

যে, ওদের ছেলে সে ওদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে বিপ্রদাসের কাছেই থাকবে। প্রেমহীন সংযোগের সন্তানকেও স্বীকার করতে পারে নি কুমুদিনী।

প্যাটার্নটা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, কুমুদিনী-বিপ্রদাসের সম্পর্ক ছিল অসচেতন, মধুসূদনের তীব্রতম আঘাতে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে কুমুদিনী, তারপর সচেতনভাবে ভাইবোনে মিলিত হতে পেরেছে।

এই প্যাটার্নটা কেবল 'যোগাযোগ' উপন্যাসরই বিশেষত্ব নয়, পরবর্তী বহু রচনাতেই কিছু কিছু রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ফিরে এসেছে :

	প্রথম স্তর	**দ্বিতীয় স্তর**	**তৃতীয় স্তর**
'যোগাযোগ'	কুমুদিনী-বিপ্রদাস	কুমুদিনী-মধুসূদন	কুমুদিনী-বিপ্রদাস
'শেষের কবিতা'	লাবণ্য-শোভনলাল	লাবণ্য-অমিত	লাবণ্য-শোভনলাল
'দুই বোন'	শর্মিলা-শশাঙ্ক	শশাঙ্ক-উর্মিমালা	শর্মিলা-শশাঙ্ক
'মালঞ্চ'	আদিত্য-সরলা	আদিত্য-নীরজা	আদিত্য-সরলা
রবিবার ('তিনসঙ্গী')	বিভা	বিভা-অভীক	বিভা
'শেষ কথা' (ঐ)	অচিরা-দাদু	অচিরা-ভবতোষ-নবীন	অচিরা-দাদু
'ল্যাবরেটরি' (ঐ)	রেবতী-পিসীমা	রেবতী-নীলা	রেবতী-পিসীমা

স্তর তিনটিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি ক, খ, গ নাম দিয়ে, এমনভাবে যে ক+খ=গ, অর্থাৎ ক, খ-কে আত্মসাৎ করে গ-তে পরিণতি লাভ করেছে।

সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ-বিবর্তনের নানা স্তর কল্পনা করেছেন, সে-গুলিকে আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা সাধারণভাবে উক্ত তিন স্তরের অন্তর্ভূক্ত করতে পারি—(ক) আদিম সাম্যবাদ, গোষ্ঠীতন্ত্র, রাজতন্ত্র ; (খ) ধনতন্ত্র, জাতিতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং (গ) সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ইত্যাদি। এঁরা দেখিয়েছেন, মানবসমবায় এবং সমাজ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, এমনভাবে যে তা পূর্বের স্তরটির মূল লক্ষণগুলি আত্মসাৎ করে পরবর্তীতে পরিণতি লাভ করে ; আবার, কন্‌ট্রাডিক্‌শনের ফলে নতুন পথে যাত্রা করে। উল্লিখিত তিনটি পর্যায়কে সরলীকরণের জন্য আমরা সমাজবাদ-ব্যক্তিবাদ-সমাজবাদ এইভাবে পরম্পরিত করতে পারি, যার মধ্যে প্রথমটি আত্ম-অচেতন, দ্বিতীয় পর্যায়ে সচেতনতার আয়োজন এবং তারই মূল্য নিয়ে তৃতীয়ের মিলন বা সমবায়।

রবীন্দ্রনাথ সমাজ-বিবর্তনে উল্লিখিত সমস্ত স্তরের কথা রাজনীতিক বা সমাজবিজ্ঞানীর মতো বিশ্লেষণ করেন নি, করেছেন নিজের মতো করে তাঁর সৃষ্টিধর্মী রচনার মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। রবীন্দ্রনাথ বরাবর উল্লেখ করেছেন, কুমুদিনী ছিল নিজের সম্বন্ধে অচেতন, নিজের গণ্ডির মধ্যে বাঁধা, তারপর এল তার বেদনাময় আত্মজাগৃতির পালা ; সেটার শেষ হল কিন্তু তার বেদনা তার পক্ষে ভুলবার নয়—তাকে আত্মসাৎ করেই সে পূর্বতন জগতে ফিরে এসেছে।

এখানে আর দু-একটি উপন্যাসের আলোচনা করছি, তাহলেই আশা করি আমার বক্তব্য স্ফুটতর হবে।

'শেষের কবিতা'-র (১৯২৯) লাবণ্য এবং অমিত দু-জনেই ছিল আত্ম-অচেতন, এই অর্থে বলছি যে প্রকৃত প্রেমের স্পর্শ এদের জীবনে ঘটেনি। অমিত সম্বন্ধে, কন্যার মাতাদের আশা কিছুতেই কমে না, কিন্তু কন্যারা বুঝে নিয়েছে, অমিত সোনার রঙের দিগন্তরেখা, ধরা দিয়েই আছে তবু কিছুতেই ধরা দেবে না।' অর্থাৎ সে কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে পারে নি, এমন কি কেতকীকেও নয়, যার সঙ্গে তার বিবাহ একরকম অবধারিত ছিল। কিন্তু লাবণ্যর সঙ্গে তার দেখা হবার পর, 'আজ পাখিকে নতুন করে জানছি এ কথায় লোকে হাসছে। কিন্তু এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আমি সমস্ত নতুন করে জানছি, নিজেকেও।'

লাবণ্যর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। শোভনলালের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল সাধারণ, তার পূজা-নিবেদন লাবণ্যকে বিচলিত করতে পারে নি। এরপর তার জীবনে এল অমিত, নিজের নারীত্ব সম্বন্ধে লাবণ্য সচেতন হল তখনই, সবিনয়ে অমিতের ঋণ সে স্বীকার করে নিয়েছে, 'গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।'

লাবণ্য অমিতকে বিবাহ করতে অস্বীকার করলে,

> 'যোগমায়া বললেন, 'আজ আমার বোধ হচ্ছে, কোনোকালে তোমাদের দেখা না হলেই ভালো হত।'
>
> 'না, না, তা বোলো না। যা হয়েছে এ ছাড়া আর কিছু যে হতে পারত এ আমি মনেও করতে পারি নে। এক সময় আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিতান্তই শুকনো—কেবল বই পড়ব আর পাশ করব, এমনি করে আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখলুম, আমিও ভালোবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন

অসম্ভব যে সম্ভব হল এই আমার ঢের হয়েছে। মনে হয়, এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি। এর চেয়ে আর কী চাই।'

শেষ কালে, 'যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায়' সেই শোভনলালের সঙ্গেই বিবাহ হয়েছে লাবণ্যর, আর অমিত ফিরে গেছে কেতকীর কাছে।

আর একটি মাত্র প্যাটার্ন অনুসরণ করে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করব। 'মালঞ্চ' (১৯৩৪)-এর আদিত্য ও নীরজার দাম্পত্যসম্পর্ক একটি ফুলের বাগানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আদিত্যের সঙ্গে পূর্ব-পরিচয় ছিল সরলার, আত্মবিস্মৃত সরস সে সম্পর্ক, সেটা যে ভালোবাসার, তা তাদের কেউই জানত না। আদিত্যের ভাষায়, 'আমরা দুই বুনোয় মিলে দিন কাটিয়েছি বনের ছায়ায়। নিজেদের ছিলুম ভুলে।' কিন্তু নীরজার আবির্ভাব তাদের উভয়ের প্রেমকে আত্ম-সচেতন করে তুলেছে। সরলা বলেছে, 'সত্যি কথাই তো বলতে হবে। নিজেকে ভুলিয়ে লাভ কী। তোমার আমার মধ্যে কোনো কথা যেন অস্পষ্ট না থাকে।'

কিন্তু নীরজা—মধ্যবর্তিনী যে, যে সচেতন করে দেয়, সেই মধুসূদন, অমিত, নীরজা—যাদেরকে শেষ পর্যন্ত সরে যেতে হবে, নতুনকে স্থান দিয়ে, তাদেরকে রবীন্দ্রনাথ কীরূপ স্বীকৃতি দিয়েছেন? ধনতন্ত্রবাদের যা কিছু সুস্থ, সুন্দর সবই ভাবী সমাজে রক্ষিত হবে, যেমন 'মালঞ্চ'-এর পীড়িত নীরজার মধ্যে দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন। নীরজাকে চলে যেতে হবে, কিন্তু তাদের হাতে গড়া বাগানটা থাকবে। বেঁচে থাকার জন্য তার কী আগ্রহ, 'ওই যে দরোয়ানটা ওইখানে বসে তামাক কুটছে, ও থাকবে দেউড়িতে, কিছুদিন পরেই আমি থাকব না। ওই যে গোরুর গাড়িটা পাথুরে কয়লা উজাড় করে দিয়ে খালি ফিরে যাচ্ছে ওর যাতায়াত চলবে রোজ রোজ, কিন্তু চলবে না আমার এই হৃদযন্ত্রটা।...একেবারেই থাকব না? বলো আমাকে, তুমি তো অনেক বই পড়েছো, বলো না আমাকে সত্যি করে।'

কিন্তু থাকে, জীবনের ধন কিছুই ফেলা যায় না। নীরজার কাতর প্রার্থনার মধ্যে তার আভাস আছে, 'এত দিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছে তোমার ঘরে, সেদিনও তেমনি করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যে-সব ফুল ফুটবে তেমনি করেই মনে মনে তুলে দিও আমার হাতে।' কিন্তু তথাপি তার আরো বেদনা যে সরলার হাতে তার

স্বামী ও বাগান দুইই তুলে দিয়ে যেতে হবে। একবার উদারতার সঙ্গে সে নিজেই সরলাকে ডেকে ছিল তার সব কিছু তারই হাতে দিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু 'পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না' বলতে বলতে নীরজাকে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছে।

বড় করুণ অথচ ততোধিক অনিবার্য এই রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি!

মস্কো, ১৩৮৫

শান্তিকুমার ঘোষ

ধায় বেগে মহাশূন্যে স্পুটনিক ধূমল তরঙ্গ তুলে পিছে···
নীচে
জেগে থাকে মহানগর জীবনের সৌধশিল্প,
নদীর উপরে সাঁকো, লাল তারা স্তম্ভের চূড়ায়
এস্কালেটর বেয়ে ওঠে ফুলের স্তবক হাতে যুগের তরুণী
গ্রন্থ-পাঠে ডুবে আছে মেট্রোয় যুবক কোনো—স্টেশন সাজানো যেন
রাজার প্রাসাদ এক···দীপশালিনী
চির-হরিৎ ফার তরু সমস্ত তুষার ফুঁড়ে উড়ায় কেতন
বীরের চত্বরে ছাখো হৃদয় প্রশস্ত এত—স্বর্ণের সোনাটা
যন্ত্রের নৃত্যের উর্ধ্বে জড়ের উপর জয়ী আরোহী পুরুষ
আর সৌন্দর্য ডানার মতো চৌদিকে ছড়ায়ে দিয়ে নাচে ব্যালেরিনা।

সমুদ্র এসেছে সরে

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

সমুদ্র আমারই ছিল, আজও আছে, কেবল তোমার
স্বেচ্ছাচার-সীমাবন্দী ছিল
সমুদ্রের গুটিকয় বিক্ষিপ্ত বন্দর ;
তাও আজ অর্ধলুপ্ত, খতিয়ানে তামাদি, কারণ
সমুদ্র এসেছে স'রে আরও কাছে আমার এবং

আমাতে রক্ষিত তার দায়িত্বের সর্বসত্ব তীর,
যে-তীরে অবাধ্য জন্ম সমস্ত নদীর।

জানিনা তো শেষরক্ষা কিসে পাবে হে বন্ধু এবার,
সমুদ্র ব্যতীত শুষ্ক স্বেচ্ছাচার পাবে না বন্দরে !
অপগ্রহী মন্দিরের বনাশ্রিত প্রাচীন সোপানে
হাওয়ায় দোদুল্যমান ভয়ার্ত সময়
তোমারই পরাস্ত আয়ু
অনাগত অস্তিমের পদশব্দে পেতে আছে কান ;
অন্ধকার, শুধু অন্ধকার,
অন্ধকারে হেঁটে যায় প্রতারিত খঞ্জ ভগবান !

শুধু একটি পথ—
চন্দন-চর্চিত রেখা ললাটের
নেচে ওঠে বিকীর্ণ আলোয়,
আমারই তা অনুকম্পা, ঐক্যবোধ ক্ষমার প্রশ্রয় !
পায় যদি এই পথে এসো,
সঙ্গদোষ পার হয়ে, খুলে ফেলো অশিষ্ট নির্মোক ;
এ-পথের পান্থশালা অন্তত তোমাকে
দেবে কিছু দানাপানি, শোচনার বিখণ্ড সুযোগ ।।

যাওয়া

বাসুদেব দেব

সেই তুমি বসে আছো গাঢ় ঠিক পাশে
বালিশে কনুই রেখে হে আমার পুরোনো সংসার
এত কাছে   সুদূরতা ছিল কবে খয়েরি হলুদে
উঠোনে ভোরের রোদে কবে যেন কবে একদিন

পতন প্রবণ এই বয়সেও বুকে বাজে মারা
বাজে ঘোর ঘণ্টা যেন অকারণে আবেলায় ঝড়
আজকাল অর্থাৎ চল্লিশ ফেলে যখন বিষাদ
ছুঁতে বড় সাধ হয় নিজের রচনা এই প্রতিমার ভুল

আঙুলে হলুদ দাগ, খালি দুটি পেয়ালা গুছিয়ে
এইবার যাবে তুমি, মাথা হেঁট মিনিবাসে আমি
এভাবেই যাওয়া নাকি ?　যাওয়া নাকি ফিরে আসা
কোন দিকে আছো জন্মভূমি

খা

মতি মুখোপাধ্যায়

হলুদ রোদ ছিঁড়ে উড়ে আসা সেই কালো কাকটা
বসল জলট্যাঙ্কের মাথায়
শীত সকালের ফিরোজা আকাশের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে
কেমন মগ্ন কণ্ঠে ডাকল : কা…
তখনি খাকি বেলবটসের দু' পকেটে হাত ডুবিয়ে
ক্রেন গ্যানট্রির দিকে উটমুখ
ফোরম্যান সাহেব বলল, যা।

তখনি ময়লা পা-জামা বেগুনি শার্ট গায়ে রোগা লোকটা
একহাতে তেলজুট অয়েলপট অন্যহাতে বেনজ্
তরতরিয়ে উঠে গেল দোতলা উঁচু ক্রেনঘরে
তাই দেখে কাকটা আবার ডাকল : কা।

শব্দটা লোকটার কানে ঢুকল বেয়াড়াভাবে
সে শুনল যেন, খা ; মনে পড়ল
গতরাতে জ্বরে বেহুঁশ ছেলেটা কিছু খায়নি

পেটের যন্ত্রণায় রাত মাথায় করেছে পোয়াতি বউ
রামভরস গোয়ালা টাকা না পেয়ে শাসিয়ে গ্যাছে
তিরিশ ডিগ্রি মুখ ঘুরিয়ে স্বষ্টি মুদি বলেছে : তেল নেই
লোকটা নাট বলটুতে রেনজ লাগিয়ে তেল ঢেলে ভাবছে
আহা, যদি মেসিনের তেলে রান্না করা যেত
খানিকটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বৌকে বল্‌তুম
বড়া ভাজো, শীতের দিনে পোস্তোর বড়া বেশ লাগে।

চিৎকার করে ফোরম্যান সাহেব বলল : সুইচ অফ্‌
ঘূর্ণিতে পাক খেয়ে পড়া পালকের মতো
অথবা সাগর দোলায় দুলতে দুলতে
লোহা ইস্পাতে ধাক্কা খেতে খেতে
টুপ করে নীচে পড়েই লোকটা চুপ
অমনি ছোটাছুটি, হৈ হল্লা, ফোন—হ্যালো
শাদা পরীর মতো উড়ে এল অ্যাম্বুলেন্স
কেমন দুঃখু দুঃখু মুখে রেডচিটে সই করে
ফোরম্যান সাহেব বলল : অ্যাকসিডেন্ট।

কাকটা উড়ে যেতে অলক্ষুণে গলায় ডাকল : কা…
শব্দটা কেমন যেন শাপ-শাপান্তের মতো শোনাল
যেন কেউ বলল : খা খা খা।

দগ্ধ দুই ডানা

গৌতম গুহ

কৃষ্ণচূড়ার গান
        তাজা রক্তে নাচে।
যে রাজপুত বায়ু
                তপ্তবালুকার ছোঁয়া নিয়ে
                নিঃস্ব দিগন্তের দিকে যায়

সে আমারই নিঃশ্বাস, আমি মানে, ক্লান্ত শ্রমিক, স্বপ্নহীন মুণ্ডহীন নর
বুভুক্ষু মুমূর্ষু জীব

প্রাণটুকু পোড়ে
দগ্ধ দুই ডানা
শহরতলীর পাশে কারখানা-চিম্‌নির মুখে
যে আকাশ হা-হা করে
শপ্ত আত্মায় তার ঘোরে।
আমার দৃষ্টির মুখে জেগে ওঠে দূরে
এক ভ্রান্ত নাগাসিকি
জেগে ওঠে ভুল মানুষের মুখ
শুদ্ধ শব্দ শুনি যেন—
একে একে ভিক্ষুর হাত হতে ঝরে।

শুদ্ধ শব্দ, মানুষের উচ্চারিত ফুল !
ধ্বনিত হৃদয়
শুদ্ধ শব্দ জাগাতে পারে রাবণ হৃদয়,
ন্যূনতম ভালবাসা পারে দিতে,
শব্দ কি সেই মন্ত্র চিরজীবী অলঙ্ঘ্য দুর্বার ?

দগ্ধ দুই ডানা এ-হৃদয়ে ক্রমাগত ঘোরে।

যদি ফেরাও

দাউদ হায়দার

যদি ফেরাও আমি আবার ফিরে যাবো—
কেউ কেউ ইদানিং ফিরছে যেমন হাট থেকে ফিরে আসে হাটুরে ব্যবসায়ী !

এখন অনেকেই অনেক কিছু নির্মাণে ব্যস্ত। অনেকেই অনেক কিছু
আবার ভাঙতে উদগ্রীব। যেন পুরোনো নির্মাণ ভেঙে সুদৃশ্য ঘর,

বাড়ি, জাহাজ, তোরণ, অট্টালিকা বানাবে। আমিও কিছু কিছু
ভাঙি এবং নির্মাণ করি মূলত তা কবিতা, নারী, পোশাক ইত্যাদি!

আমি আবার ফিরে যাবো। প্রত্যেকটি খামার বাড়ি থেকে
উঠে আসবে ধান শস্য বীজ। দূরের আকাশ তখন স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হবে, পাখিদের
গান উঠবে রণিয়ে, স্বজাতি চিনবে আমাকে, আমার বাংলাদেশ!

এবার আমি অবিশ্রান্ত রক্তপাতের দিকে চোখ ফেরাবো। উদ্যানে
উদ্যানে যে সম্ভাবনা দেখা দেবে, সেখানে মধ্যরাত্রির মানুষেরা
আবার বজ্র-বিদ্যুতের মতো জ্বলে উঠবে এবং জলাতঙ্ক রোগী আবার
দেখে নেবে, সৌখিন শহরে কখনো ভাদ্রের নদীর জন্ম হয় না!

তুমি কি শ্মশানে গিয়েছ কোনদিন ?—পুড়েছ ?—দ্যাখো, এই
আমি পুড়েছি এবং জল ও আগুনকে একই সঙ্গে ধারণ করে
বেঁচে আছি ;
—তাহলে এবার আমি হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে এনে বলতে পারি :
বাংলাদেশ আমার জনক!

লোকশ্রুত নাগরিক আমি নই ; তবু আত্মার অধিক মৃত্যুকে ঘেঁটে
দেখি রক্ত প্রেম যুদ্ধ বন্যা মহামারী সবই প্রসন্ন গেরুয়া রঙে এই
আমারি অণুতে পরমাণুতে
কনকলতার মতো তীব্র জড়িয়ে আছে!

আমাকে ফিরতে বলো, কিন্তু মনে রেখো আমার নির্মাণ এবং
অবস্থান কুমারীর স্তনের মতো গম্ভীর এবং অটল। অবশ্য যদি
ভাবো "আমার, আমার ব'লে কিছু নেই," তবে কুরুক্ষেত্রে আমি
একাই কৃষ্ণ এবং অর্জুন!

যে তোমার স্বজন তাকে তুমি অন্তরীক্ষে পাঠাও ; দেখবে
প্রত্যেকটি মানচিত্রে এই আমারি অবস্থান!

যদি আমাকে দৃশ্যাবলী থেকে চোখ ফেরাতে বলো, জেনে রেখো
আমার হাতে সেই মানচিত্র আছে, যা ঈশ্বর পাটনীর কাছে অবশ্যই
অপরাহ্নকাল!

যদি ফেরাও আমি আবার ফিরে যাবো ; তখন দূরের আকাশ আবার
সূর্যত্ব প্রাপ্ত হবে, পাখিদের গান উঠবে রণিয়ে, স্বজাতি চিনবে আমাকে,
আমার বাংলাদেশ!

মানবিক পারমাণবিক

শ্যামল পুরকায়স্থ

যখন অন্বেষা-আলো ঝুঁকে পড়ে জানালার কোলে,
গরাদের পাশ থেকে দেখে নিই বিপুল উৎসার :
অণু-পরমাণুসহ রক্ত মাংসে কৃষিকর্মী মানব-মানবী
এবং প্রতীকদীপ্ত সৌর-কুসুমে নৃত্যের অবিনাশী বিরল মুদ্রা।

বসন্তের ঘ্রাণে রৌদ্রে বেড়ায় ভেসে নির্বন্ধ পিপাসু প্রজাপতি,
নীলাকাশে বস্তুত তখন সপ্তাশ্চর্য রথের চূড়ো দৃশ্যমান ;
কে যে কখন পায় প্রাধান্য
পক্ষপালেরা এসে ঢেকে দেয় লাবণ্য মুখ—নিঃসঙ্গ সকাল।

সোনালি চিকন মেঘের নিচে নাদব্রহ্মে স্রোতস্বিনী নদী—
বৈঠার চাপল্য খরস্রোতে, পরমাদব্রহ্মে নিয়ে যায়।
বিদ্যুচ্চমকে, অট্টহাসিতে কথকতা ; উড়াল পঞ্চভূত।
বুকের রোমশ অংশ তেমনি পূর্ববৎ, দাহ্যবস্তু হৃদয়-তন্ত্রী !

বুনো ঘাসের আড়ালে অগ্নিময় লতাগুল্ম ক্রমশ ছড়ায় পল্লব—
লোকশ্রুতি : ভুঁইফোঁড় জলবিছুটির ঝাড়।
লেলিহান পাতা দুটি উড়ে আসে চারাগাছ কৃষ্ণচূড়ায় ;

বিভাষায় ঠাট্টা-তামাশার ডুগডুগি—চোতরা পাতায়

কেমন রে ব্রহ্মতেজ ?

সমুদ্রের কল্লোলে মিশে আছে ঘুঙুরের ধ্বনি ; সম্মোহিনী তান।

শিল্পানুরাগী সাগ্রহে ছুটে যায় ষোড়শী কলার কাছাকাছি—

হঠাৎ প্রবল গর্জন—মুহূর্তেই সফেন উচ্ছ্বাস

মীড়-মূর্ছনার সৃজনশীলতা আগ্রাসী।

হাওয়ায় মানস-বেতারযন্ত্রে সুখশতৃষ্ণার ইতি সংকেত।

হাওয়ায় জাগতিক পিছুটান তবু—সাধ জাগে প্রশান্ত সমর্পণের।

হাওয়ায় শরতের লাল মেঘ ঝরে গিয়ে ঝর্ণা-তোয়া

নাতিশীতোষ্ণ ভূমণ্ডলে।

পাখিরাও সম্মিলনী তৎপরতায় অস্থির। খড়কুটোর আশায়

পাখায় লেগেছে কাঁপন—

মাতাল প্রকৃতির চুম্বকীয় গুণে জড় পর্বতে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ;

আসন্ন প্রসবার ডিম্বাশয় ফেটে বিশ্বময় গলিত তিমির।

মানবিক মুক্তির দিনে মরুর দুঃখ ভুলে স্নিগ্ধ এক নিরপেক্ষতায়

পৃথিবীর রূপসজ্জা অশোক-রঙে। সন্ধ্যারতিকালে অনিবার্য পরিশেষ—

অস্মিতা মোমের শরীর গলে

আলোছায়া সন্ধিপূজায়।

স্থিতি-যুদ্ধ অবসানে সমস্ত বাসনাই স্মরণীয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর

ফুলের অর্ঘ্যেও পারমাণবিক বিভাজন।

গান্ধের তরঙ্গে বোঁটা, পাপড়ি, রেণু পর্যবেক্ষণ সীমা ছেড়ে যায়।

জনমভূমি

(রাজবংশী কবিতা)

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

মনটা খিবে খারাপ হলে একেলায় বসি থাকো খলতৎ...
এলায় টারি-বাড়ির আন্তা দিয়া চলি যায় কতনা গাড়ি
পখির কান্দন শুনিলে মনটায় এলাও নাগে বড় মযা ;
হালুয়া ক্ষেতিবাড়ি কইরলেও কাহয় না থাকে ঘরৎ
মাইয়া মানষিলাও বন্দরৎ গিয়া ত্যাখে ভালায় বাজার
যেমন তেমন করি সগায় পড়ি থাকে ভাঙা কুলার নাখান
কারে বা দোষ দিবেন, পুরানা নোকগিলার বিধিরে দোষ
চলিতে-ফিরিতে কাম নাই কুত্তার আইদ্‌গা কাথার ডেলি
মাদারের শুকুনা ডালে আইজো কান্দি উঠে ঘুঘু আর ডাহুক

এই মতন ভাবিতে ভাবিতে ভাসি উঠে নাদান বয়সের ছবি
পুবের বেলা পছিমে চলি যায়, শুধু জীবনটারে নিদান।

[খিবে>খারাপ ; খলতৎ>উঠোন ; এলা>এখন ; হালুয়া>চাষী ;
নাখান>মতন ; নিদান>শেষদিন]

ঈশ্বর

প্রশান্ত রায়

চাপরাসীকে ডেকে বললেন—'দেখতো কমলেশ
চিৎকার না হয়—তা যতই কেন ঈশ্বরের নামে হোক
আমি সামনেই আছি।'

প্রকৃত সামনে মানেই কি সামনে
কাছে মানেই কি কাছে
সবই মিছে

কিছু খুঁজে আনার জন্যেও আলাদা চোখ রাখতে হয়।
বলে-কয়ে অধিক দূর যাওয়া হয় না
ব্যতিরেকেই হয়ে যায়
কখনো-কখনো আশ্চর্যই ঠেকে, তাই
সমতলে চ্যাটার্জী-পোকের নিচে ঘুরিফিরি—
একদিন উপর থেকে নিচে কেউ নামলেই
আমি যাতে তার হাতে-হাত রেখে মুখোমুখি হই
এবং বলব—'কেমন আছেন, মানে প্রকৃতই আছেন কি না।'

বলে-কয়ে বেশি দূর যাওয়া হয়ে ওঠে না।
সামনে বলেও কেউ সামনে থাকে না!

ফলন কিছু নাই

অমরেশ বিশ্বাস

জীবনে মুই মদন তাঁতীও
হবার পারলাম নাই
হগ্ গোল গাঁ ডা পইড়্যা কান্দে
ভুবন মহাজনের ফান্দে
বৌ ব্যাটা লইয়া কান্ধে
হ্যারা তাঁতী মদন তবু
মাথা বিকায় নাই।

পায়ের খিঁচ সারনের তরে
গভীর রাইতে নিজের ঘরে
খালি তাঁত টাঙ্গায়ে পরে
মাকু টানলাম নাই—
জীবনডা মোর বেথা গেল
ফলন কিছু নাই।

দেশের পরিচয়

জিষ্ণু দে

কোনটা বলুন আমাদের দেশ ?
তিক্ত বৃদ্ধ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি,
বৃদ্ধা—ঘষা ঘষা চোখে,
হঠাৎ ওঠা বীভৎস সতেরোতলা বাড়ি
নাকি অন্য আরো অর্থহীন প্রকল্প ?
শহর : "আধুনিক মহানগরী"
অন্ধকার—আটকানো—ভিড়—
অথবা গ্রাম : যেখানে অন্ধকার প্রত্যাশিত
জীবনের অঙ্ক বলে ?
রাজনীতির নেতারা কি আমাদের দেশ ?
তাঁদের সহাস্য কুচক্রী মন ও কাজ,
ও তাঁদের পুত্রকলত্র—যাঁদের কেচ্ছাই কাগজে খবর—
এঁরাই কি দেশ ?
তারপর বন্যা ও ক্ষয়ক্ষতি
এবারের মৃত্যু, আর আগামীদিনের আরো মৃত্যু
রোগে শোকে, ভেসে যাওয়া ঘরবাড়ি ফসলের দুঃখে,
খাদ্যাভাবে
কাজ নেই বলে।
এই সব মিলে
ছেলেবেলাকার দুঃস্বপ্ন ডাক ঐ এলো বুঝি ফিরে
পথে পথে
"ফ্যান দাও—মাগো",
এই শব্দে কাঁপা রজনী বিনিদ্র বুঝি দেশ।

উপহারে আমানি দিলি

নন্দদুলাল আচার্য

দুপহরে আমানি দিলি
বিহান থিকে ভুখে
আমার হাড়ে দুব্বা গজায়
তুরা থাকিস সুখে

কাড়ার পারা গতর গেল
তুদের মুনিশ খাইটে
আমানি রাখ আমানি রাখ
গড় করি তুর পাইটে

ছোটামুনার কিরা শুনুন
বুঝেছি তুর চাইল
আমার হাতেই টামনা যুয়াল
আমার হাতেই হাল

জারি জুরি হুরুতে রাখ
আন্ গো ভাতের থাল
ভুখাপেটে লয়কো শুনুন
বদলি হইছে কাল্।

বিপরীতে জোর

অজিত বসু

বন্দুক কামান নয়, তার
পরাজয়, হাঁটু গেড়ে বসা অন্ধকার
ক্ষমা পরমা,
বিপরীতে উল্টোমুখে

অপেক্ষা, জর্জর প্রহর আর জয়,
দুর্জয় অর্জন ;
তর্জন গর্জন নয়, নীরবতা
শান্ত তন্নিষ্ঠ মগ্নতা···
গভীর অতলান্ত গভীরতা
আর নিবিষ্ট নির্মাণ ;
সবই বিপরীতে
কিন্তু ব্যক্তিত্ব এবং স্নান, শুদ্ধি !
শৃঙ্খলিত নয়, মুক্তি বন্ধনের দিকে·
সুতোয় সুতোয় গ্রন্থি চিরায়ত
ছিনিয়ে নেয় না, শাশ্বত ;
জ্বলে জ্বালায় হারায়···
তারপর ফিরে আসে—
আসে,
আসতে হয়,
আসতেই হয়।

আত্মজ

রতন ভট্টাচার্য

ছ নম্বর হাই রোড আলমপুর থেকে বাঁ দিকে বালীর কাছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস রোডে মিশেছে। আলমপুর থেকে শুরু হয়েছে আন্দুল রোড। উলুবেড়ে থেকে ছেড়ে আসা বাষট্টি নম্বর বাস এই আন্দুল রোড দিয়ে মৌড়িগ্রাম স্টেশনে সাউথ ইস্টার্ণের লাইন পার হয়েছে। তারপর পাঁচপাড়া, চুনভাটি হয়ে সোজা চলে গেছে হাওড়া।

কুণ্ডুদের পরিত্যক্ত বাগানবাড়ি ছাড়ালেই ডানকুনি ব্রীজ। বাসটা ডানকুনি ব্রীজের তলা দিয়ে বেরিয়ে এল। দূরে দেখা গেল মৌড়িগ্রাম স্টেশন। হঠাৎ ব্রীজের তলা থেকে বেরোতেই প্রখর রোদে স্টেশন বিল্ডিং, লেবেল ক্রসিং, পাথর ছড়ানো উঁচু রেললাইন সব মুহূর্তে চোখের সামনে ছবির মতন ফুটে উঠল।

অনেকেই এখানে নামবে। এ বাসটা হাওড়া যাবে বটে। কিন্তু বাসে হাওড়া যেতে লাগবে এক ঘন্টা। আর এখানে নেমে ইলেকট্রিক ট্রেনে উঠলে হাওড়া কুড়ি মিনিট। নন্দও এখানে নামবে। সে যাবে বৌবাজার, চোখের ডাক্তারের কাছে। ছেলেকে ইশারা করে নন্দ উঠে দাঁড়াল। মাথাটা জানলা দিয়ে বার করে দেখল সামনের লেবেল ক্রসিং-এ দু-তিনটে লরি, প্রাইভেট বাস দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ লেবেল ক্রসিং বন্ধ। আর লেবেল ক্রসিং বন্ধ মানে ট্রেন আসছে। নন্দ খুব উদ্বিগ্ন বোধ করল। এদিকে ইস্টার্ণের মতো অত গাড়ি নেই। দুটো বিয়াল্লিশের এই গাড়িটা ফেল করলে আজ আর চন্দনের চোখ দেখানো হবেনা।

বাস থামতেই ঠেলাঠেলি করে নন্দ নেমে এল। কিন্তু চন্দনের জন্ত দাঁড়াতে হল তাকে। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা নিয়ে চন্দন নামল সকলের শেষে। ততক্ষণে দূরে গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। নন্দ ছেলের হাত ধরে টেনে বলল, 'শীগগির আয়, ছোট।' বলেই ছুটতে থাকল সে।

রাস্তা একেবারে কম না। নন্দর ছোটায় তেমন অসুবিধে নেই। পরে অনেকক্ষণ বুকটা ধড়ফড় করবে এই মাত্র। ছুটতে অসুবিধে হচ্ছিল চন্দনের। বারো বছরের ছেলে। অসুবিধে হবার কথা নয়। কিন্তু হচ্ছিল। বছর পাঁচেক ধরে একটা সাঙ্ঘাতিক চশমা চোখে থাকায় ছোটাছুটি, দৌড়োদৌড়ি এ সব প্রায় সে ভুলে গেছে।

লাল সুরকির রাস্তাটা ডানদিকে ঠেলে একটু উঁচুতে উঠে এসে স্টেশন। ভেতরে ঢুকেই বাঁদিকে বুকিং কাউন্টার। বুকিং এর সামনে তখন তিনটে লোক। হাঁফাতে হাঁফাতে নন্দ সেই তিনটে লোকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দ করে ট্রেন ঢুকল প্লাটফরমে।

ইলেকট্রিক ট্রেন। প্রত্যেক স্টেশনে এক মিনিট দাঁড়াবার কথা। কিন্তু আধ মিনিটও দাঁড়ায় না। নন্দ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। বুকিংএ বসে থাকা এই মানুষগুলো এসব মুহূর্তেও এমন ভীষণ ঠাণ্ডা ও নিরুত্তাপ থাকে যে রাগে শরীর জলে যায়।

গাড়িটা ক্রমশ থামতে থামতে এবার একেবারে থেমে দাঁড়িয়ে গেছে। লোকজন নামছে। উঠছে। নন্দর সামনের শেষ লোকটি একখানা সাঁত্রাগাছির টিকিট নিয়ে গাড়ির দিকে ছুটল। নন্দ কাউন্টারে একটা এক টাকার নোট দিয়ে ভীষণ ব্যস্ত গলায় বলল, 'দুখানা হাওড়া। একটু তাড়াতাড়ি করুন দাদা।'

নন্দর ব্যস্ততায় লোকটি একটুও বিচলিত হয়েছে বলে মনে হলনা। টাকাটা পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে খুব নিস্পৃহ গলায় লোকটি বলল, 'দুটো পয়সা দিন।' তারপর দুখানা টিকিট বের করে খুব ধীর ভাবে ডেট্ মেশিনে ঢুকিয়ে দিয়ে লিভারটায় চাপ দিল। ঘটাং ঘটাং শব্দ হল দুবার। গাড়ির পেছন থেকে গার্ড ছাড়বার হর্ণ বাজাল। আর এক সেকেণ্ডের মধ্যে গাড়ি ছাড়বে। নন্দ তখনও পাগলের মতো পকেট হাতড়ে দুটো পয়সা খুঁজছে।

হঠাৎ ছেলের দিকে চোখ পড়ল নন্দর। আরে! সেতো গাড়ি ছেড়ে দিলেও ছুটে গিয়ে উঠতে পারবে। চন্দন তো পারবে না। পকেট হাতড়াতে

হাওড়াতেই নন্দ ছেলের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'এই চন্দন, তুই উঠে পড় গাড়িতে।'

চন্দন ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠতে গাড়ির সামনের দিকের হর্ণ বাজল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিশাল গাড়িটা নড়েচড়ে জীবন্ত হয়ে গেল। নন্দ হাত নেড়ে ছেলেকে ইশারা করে বলল, 'ভয় নেই রে। আসছি আমি।' তারপর সিকি আধুলির জঙ্গল থেকে দুটো পয়সা বার করে সে কাউণ্টারে ঢুকিয়ে দিতেই লোকটা তাকে দুখানা টিকিট আর তিরিশটা পয়সা ফেরৎ দিল। কিন্তু তখন গাড়ি চলছে।

নন্দ ছুটে বেরিয়ে এল। হয়তো ছুটে গিয়ে সে পাগলের মতো গাড়িতে উঠেও পড়ত। অন্তত চেষ্টা করত। তারপর কি হত কে জানে? কিন্তু কারা যেন চারদিক থেকে চিৎকার করে উঠল। 'উঠবেন না, উঠবেন না। পাগল হলেন নাকি? ও মশাই!' সেই চিৎকারে নন্দ মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যাস, আর ওঠা হলো না তার। পলকের জন্য দূরে চন্দনের মুখটা দেখা গেল। মনে হল ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছে সে। নন্দর কিছু করার ছিল না। গাড়ি প্ল্যাটফরম ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

যতক্ষণ গাড়ি দেখা গেল, নন্দ সেদিকে তাকিয়ে থাকল। এক সময় গাড়ি দূরের বাঁকে মিলিয়ে গেল। নন্দ তখনও দাঁড়িয়ে রইল। নিজের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল তার। হাতে দু-পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে ধীরে-সুস্থে কোনদিন কিছু করা হলনা তার। সমস্ত জীবনটাই তার ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। সব জিনিস শেষ মুহূর্তে করার ব্যস্ততা। আর দশ মিনিট আগে বেরোলেই আজ গাড়িটা পেতাম। তারপর তার ছেলের ভয় পাওয়া মুখটা মনে পড়ল। পরক্ষণেই চন্দনের জন্য ভয়ে দুশ্চিন্তায় মন তার ভরে গেল। ছেলেটাকে গাড়িতে উঠতে বলে কি বিপদের মধ্যেই পড়ে গেল সে। একলা একলা সে এখন কি করবে কে জানে। এদিকের রাস্তাঘাটও কিছুই চেনা নয় চন্দনের। তার বারো বছরের জীবনে বাবা-মার সঙ্গে মোটে সে দু-তিনবার এদিক দিয়ে গেছে। দু-তিন বারে রাস্তাঘাট চিনে ফেলবার বয়েস তার হয়নি। অন্তত শেষ মুহূর্তেই নন্দ যদি চিৎকার করে তাকে সাঁত্রাগাছি নেমে অপেক্ষা করতে বলে দিত তাহলে এত ভাবনার ছিল না। এমনকি তার টিকিটটা পর্যন্ত নন্দর কাছে। সত্যি সে একটা ভয়ানক বিপদের মধ্যে পড়ে গেল। অথচ এখন কিছুই করার নেই তার। পরের গাড়ি না আসা পর্যন্ত তাকে এখানেই

হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। মুহূর্তের ভুলে এমন সব অদ্ভুত বিপদে পড়ে যায় মানুষ।

সমস্ত প্লাটফরম এখন ফাঁকা। জনশূন্য, লেবেল ক্রসিং খোলা। গাড়ির যাতায়াত দেখা যাচ্ছে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে প্লাটফরম। গরম হাওয়ায় মুখ-চোখ জ্বালা করছে নন্দর। এখনও সকলের আগে তার জানা দরকার পরের গাড়ি কটায়। নন্দ বুকিং-এর মধ্যে ঢুকল। ঘরের ডানদিকে বড় একটা টেবিলের সামনে ফোনটোন নিয়ে একটা লোক বসে ছিল।

'হাওড়া যাবার পরের গাড়ি ক'টায় ?' নন্দ লোকটাকে জিজ্ঞেস করল। একটা খাতায় কিসব লিখছিল লোকটা। মুখ না তুলেই বলল, 'তিনটে উনপঞ্চাশ'। 'দুটো বিয়াল্লিশের পর একেবারে তিনটে উনপঞ্চাশ।' নন্দ অবাক।

লোকটি কিছু বলল না। গভীর মনোযোগে খাতার ওপর ঝুঁকে রইল। মনে মনে হিসেব করে নন্দ নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'তার মানে একঘণ্টা সাত মিনিট। এতক্ষণ বসে থাকতে হবে এখানে ?'

লোকটা এবারে ঝপ করে খাতা থেকে মুখ তুলে নন্দর দিকে তাকাল। চেয়ারে হেলান দিয়ে হেসে বলল, 'গাড়িতে কে গেল ? আপনার ছেলে ?'

নন্দ খুব অবাক হয়ে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'কাউকে ওভাবে গাড়িতে তুলে দিয়ে আর কখনও টিকিট কাটতে যাবেন না।' বলে লোকটা ক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। শেষে বলল, 'এক্ষুণি আর একখানা গাড়ি আছে। পুরী প্যাসেঞ্জার। কিন্তু সে গাড়ি দেড় দু-ঘণ্টা লেট না-করে আসে না।' লোকটা আবার ঝুঁকে পড়ে খাতার অঙ্কে ডুবে গেল। নন্দ বেরিয়ে এল বাইরে। ছেলের কথাই ভাবছিল সে। তার ছেলে যে খুব বোকা তা নয়। তাকে না বলে দিলেও বুদ্ধি করে সাঁত্রাগাছি নামবে সে। কিন্তু একটা ফাঁকা নির্জন অচেনা প্লাটফরমে একেবারে একা এতক্ষণ বসে থাকবে এটা ভাবতে কেমন কষ্ট হচ্ছিল নন্দর। অবশ্য বসে থাকতে চন্দনের খুব অসুবিধে হবে না। সে তো সব সময় বসেই থাকে। স্কুলে, ঘরে, খেলার মাঠে সর্বত্র বসে থাকাই তার কাজ। একটা মোটা চশমা চোখে চড়িয়ে ছেলেটা যেন কিরকম জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে গেছে।

সমস্ত প্লাটফরম নির্জন কিন্তু শব্দহীন। ডান দিকে প্লাটফরমের গায়ে বিশাল একটা বটগাছে অসংখ্য পাখির কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে।

রাস্তায় গাড়িগুলোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর নন্দ বাঁদিকের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। আর এই সর্বপ্রথম সে দেখতে পেল বেঞ্চির পাশে যে থামের ওপর টিনের শেডটা আছে, সেই থামের আড়ালে একটা মুচি বসে জুতোয় পেরেক ঠুকছে। এতক্ষণের মধ্যে একবারও মুচিটার দিকে তার চোখ যায়নি কেন? ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! বোধহয় থামের আড়ালে থাকায় মুচিটাকে সে দেখতেই পায়নি।

'আপ্‌কো লেড়কা বহুৎ লায়েক হ্যায়।' মাথা নিচু করে একটা জুতোয় পেরেক ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ কথা বলল লোকটা।

নন্দ খুব অবাক হয়ে বলল, 'লায়েক!'

'হাঁ জরুর। লায়েক মানে বোধ্‌মান। বহুৎ বোধ্‌মান হ্যায় উস্‌ লেড়কা।' 'কি করে বুঝলে ছেলেটার খুব বুদ্ধি?'

পেরেক ঠোকা বন্ধ করে লোকটা এবার মুখ তুলে চাইল। চামড়ার ঝুপড়ির ওপর থেকে গামছাটা তুলে নিয়ে গা গলা মুছে হেসে বলল, 'বুদ্ধি না হোতা তো ও গাড়িসে কুদ্‌ পড়তা। লাফিয়ে পড়ত।'

কথাটা খুব ভালো লাগল নন্দর। মুচি ঠিকই বলেছে। ছেলেটা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে পড়ার চেষ্টা করেনি!

'আমি বাবুজী তিস্‌ সাল তক্‌ ইসি স্থানপর বৈঠ্‌কে জুতা সিলাই করতা। এরকম সক্‌রো ঘটনা দেখলুম। ইয়ে টায়েম বাবু বহুৎ খতরনাক্‌ হ্যায়। কিত্‌না দূরসে দো আদমী এক সাথ আয়া, গাড়ি শ্রিফ একই আদমীকে উঠা লিয়া।'

অবাক চোখে নন্দ তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে কথা বলতে বলতে মুচি হাসল।

'সংসারকা এইসাই নিয়ম হ্যায় বাবু। দো আদমী জেয়াদা দূর এক সাথ নেহি যা সক্‌তা। আমার ছেলেকে আমি গাঁওসে নিয়ে এলুম। কাম কাজ শিখালুম। বাস্‌। একদিন ভাগলো। আখন শুনছি, খিদিরপুর আছে। একঠো মুসলমান ছোকরীকো সাদি বি কর লিয়া।' একটু থেমে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'টায়েম হো গিয়া। গাড়ি উস্‌কো উঠাকে লে গিয়া। কেয়া কিয়া যায়গা বাবু।'

এসব কথার কোনো উত্তর নেই। চন্দনকে ওভাবে একলা চলে যেতে দেখে বুড়োর নিজের ছেলের কথা মনে পড়েছে। বুড়োর বুকের মধ্যে যে দুঃখটা

জমাট বেঁধে গিয়েছিল। চন্দন যেন তাতে খোঁচা লাগিয়ে দিয়েছে। অবশ্য কথাগুলো খুব ঠিক। এ সংসার দীর্ঘকাল দুটো মানুষকে একজায়গায় ধরে রাখে না। পাশাপাশিই থাকে বটে কিন্তু সম্পর্ক পাল্টে যায়। বন্ধুরা সংসারে জড়িয়ে পড়ে। স্ত্রী পুরনো হয়ে যায়। ছেলে বড় হয়। তবু যেন মুচিকে খুশি করার জন্য নন্দ বলল, 'ছেলে আসেনা তোমার কাছে?'

'কাহে আয়গা বাবু? আনেসে যে বুড়া বাপকা সুখ হোগা।' তারপর হঠাৎ হেসে বলল, 'ছোড়িয়ে ইস্ বাত্ কো।'

প্লাটফরম এখন আর একেবারে জনশূন্য নয়। ওদিকের আপ্ প্লাটফরমে কিছু কিছু করে লোক জমছে। মনে হয় অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আপ্-এ গাড়ি আছে একটা।

'ছেলের ইত্না ভারি চস্মা ক্যায়সে হো গিয়া বাবু?' ক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বুড়ো আবার কথা বলল।

'ছোটবেলা থেকেই চোখ খারাপ', নন্দ খুব বিষণ্ণ গলায় বলল, 'চশমা দিতেও দেরি হয়ে গেল।'

'হাঁ। মালুম হোতা কি চস্মা খুললে বেটা বিলকুল অন্ধ্।'

অন্ধ কথাটায় নন্দর বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যথা খচ্ করে উঠল। বুক ভেঙে দীর্ঘনিশ্বাস উঠে এল। সামনের দিকে তাকাল সে। কতদূর পর্যন্ত দেখতে পায় সে। ওদিকে শালিমারের উঁচু রেলরাস্তা ছাড়িয়ে দূরে ইণ্ডিয়ান অয়েলের বড় বড় ট্যাঙ্ক, আরও দূরে তিনটে তালগাছ। তালগাছের পাশে বড় একটা তিনতলা বাড়ি সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। আর চন্দন সকালবেলা খালিচোখে টেবিল থেকে দাঁত মাজার ব্রাশটাও হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে নেয়। কুয়োতলায় হাতড়ে হাতড়ে মগ খুঁজে না পেয়ে মাকে ডাকে। চোখের সঙ্গে লাগিয়ে হাতে তেল ঢালে। আর এর জন্যে দায়ী নন্দ। ক্লাশ টুতে পড়ার সময় যেদিন চন্দন প্রথম স্কুল থেকে এসে গৌরীকে বলেছিল, 'মা, আমি যে স্কুলে বোর্ডের লেখা দেখতে পাই না', আহা, সেদিনই যদি সে ছেলেকে নিয়ে ডাক্তারখানায় যেত। যাচ্ছি-যাই করে সে একবছর দেরি করে ফেলল। তা না হলে আজ ছেলেটার চোখ এত খারাপ হত না। এখন বছরে দুবার করে ডাক্তার দেখাতে হচ্ছে।

'আপনার ভাগ্য ভালো মশাই। পুরী প্যাসেঞ্জার আজ মোটে আধঘন্টা লেট।'

নন্দ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল বুকিং-এর সেই লোকটা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে।

'আধ ঘণ্টা ? তবে তো হয়ে গেছে সময় ?' নন্দ বলল।

'হ্যাঁ। আন্দুল ছেড়েছে।'

'সামনের দিকে চলে যান বাবু।' মুচি বলল, 'গাড়ি যব প্লাটফরম ঘুমেগা তো আপ পুরা প্লাটফরম দেখ্ সেকিয়েগা।'

বুড়ো ঠিকই বলেছে। নন্দ বেঞ্চি ছেড়ে উঠে পড়ল। লেবেল ক্রসিং বন্ধ। বন্ধ লেবেল ক্রসিং-এর দু-দিকে গাড়ি জমে গেছে অনেকগুলো। আপ্ প্লাটফরম লোকজনে ভরে গেছে। মনে হচ্ছে ওদিকেও গাড়ি আসবে এখুনি। নন্দ প্লাটফরমের ধারে এগিয়ে যেতেই দূরে পুরী প্যাসেঞ্জারের মাথা দেখা গেল। সে আর দাঁড়াল না। সামনের দিকে এগিয়ে চলল। এদিকের প্লাটফরমেও দু-চারজন মানুষ দেখা গেল। মনে হয় এরা তিনটে উনপঞ্চাশের গাড়ি ধরবার জন্ত একটু সকাল সকাল এসেছে, এরা সব আলাদা মানুষ। নন্দর মতন না যে দম বন্ধ করে ছুটতে ছুটতে এসে গাড়ি ফেল করবে।

দুটো গাড়ি প্রায় একই সঙ্গে প্লাটফরমে ঢুকল। ওদিকে ইলেকট্রিক ট্রেন। এদিকে পুরী প্যাসেঞ্জার। ইলেকট্রিক ট্রেন আগে ছাড়ল। সামান্ত দেরি করে ছাড়ল পুরী প্যাসেঞ্জার। পুরনো বগী। লোকজন খুব কম। নেই বললেই চলে। সে যে বগীটায় উঠল তাতে মোটে দুটো লোক। নন্দ বসল না। চন্দন যাতে দূর থেকে তাকে স্পষ্ট দেখতে পায় তার জন্ত সে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল। দরজায় দাঁড়িয়ে সেও স্টেশনটাকে পরিষ্কার দেখতে পাবে।

মিনিট পাঁচেক লাগল সাঁত্রাগাছি পৌছোতে। প্লাটফরম শুরু হতেই তীব্র চোখে প্লাটফরমের দিকে তাকিয়ে থাকল নন্দ। কিন্তু তীব্র চোখে দেখবার মতো কিছুই প্লাটফরমে ছিল না। কেননা গোটা প্লাটফরম জনশূন্ত। যেন কেউ ঝাড়ু দিয়ে সমস্ত প্লাটফরম পরিষ্কার করে রেখেছে। কোথাও কেউ ছিল না। কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে সমস্ত প্লাটফরমের ওপর দিয়ে আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে এল সে। গাড়ির মাঝামাঝি একটা মাদ্রাজী বুড়ি আর তার সঙ্গে একটা মেয়ে উঠল। স্টেশনের চায়ের দোকানটাও সম্পূর্ণ ফাঁকা। এ গাড়িতে কেউ চা ফিরি করল না।

আশ্চর্য ! কোথায় গেল ছেলেটা। সাঁত্রাগাছিতে না নেমে তবে কি

রামরাজাতলায় নামল। নন্দ ভেতরে ভেতরে কিরকম উত্তেজনা বোধ করল। তার মনে পড়ল চন্দনের কাছে কোনো টিকিট নেই।

কিন্তু চন্দনকে কোথাও পাওয়া গেল না। রামরাজাতলা, দাসনগর, টিকিয়াপাড়া, কোথাও না। কোন প্লাটফরমেই তাকে নন্দর জন্ম বসে অপেক্ষা করতে দেখা গেল না। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। টিকিয়াপাড়া থেকে গাড়ি ছাড়তে ছেলের জন্ম চিন্তায় নন্দ এমন অবসন্ন বোধ করল যে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। কামরার ভেতরে ঢুকে বেঞ্চিতে বসে পড়ল। এখনও বাকি থাকল শুধু হাওড়া স্টেশন। বোকার মতন ছেলেটা কেন হাওড়া স্টেশন চলে যাবে নন্দ বুঝতে পারল না। হাওড়া স্টেশনে কাউকে খুঁজে বার করা খুব মুস্কিল। বলা-কওয়া না থাকলে অসম্ভব। শয়ে শয়ে গাড়, হাজারে হাজারে মানুষ, এর মধ্যে কাউকে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। মানুষ তো নয়, জনস্রোত।

কিন্তু হাওড়া স্টেশনে কেন যাবে চন্দন। পর পর তিনটে নিরাপদ এবং নিরিবিলি স্টেশন ছেড়ে একেবারে হাওড়া স্টেশন চলে যাওয়াটা এমন অবিশ্বাস্ত যে নন্দ আর ভাবতে পারল না।

হাওড়া স্টেশনের বিশাল শেডের তলায় গাড়ি ঢুকতে থাকল। নন্দ উঠে এসে আবার দরজায় দাঁড়োল। গাড়ি ঢুকে থেমে গেল কিন্তু চন্দনকে কোথাও দেখা গেল না। ভারি অসহায় বোধ করল নন্দ। ভয়ে, দুর্ভাবনায় দরদর করে ঘামতে থাকল সে। কি কাণ্ড! কোথায় গেল ছেলেটা।

পুরী প্যাসেঞ্জার বারো নম্বরে ঢুকেছে। ইলেকট্রিক ট্রেনগুলো সাধারণত ঢোকে দশ-এগারোয়। নন্দর মনে হল চন্দন হয়ত দশ নম্বরে নেমে ভয়ে ওখানেই কোন বেঞ্চে বসে আছে। সে তাই হেঁটে হেঁটে দশ নম্বরে গিয়ে খুব ভালো করে একেবারে প্লাটফরমের শেষ মাথা পর্যন্ত ঘুরে দেখে এল। না। চন্দন কোথাও সে ভাবে বসে নেই। এরপর, তার কি করার আছে নন্দ ভেবে পেল না। উদ্দেশহীনভাবে গোটা স্টেশনটাই বার কয়েক ঘুরে এলো সে। একবার সাব-ওয়েতেও নেমে গেল। বড় ঘড়ির নাচে, এদিক-ওদিকের ওয়েটিং রুম কিছুই বাদ রাখল না সে। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না চন্দনকে। বাকি থাকল জি-আর-পি। সেখানে গিয়ে কি ভাবে ছেলের খোঁজ করবে বুঝতে না পেরে ক-মুহূর্ত একজায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর একজন টি টিকে জিজ্ঞেস করে জানল জি-আর-পির অফিস চোদ্দ নম্বরে।

সেখানে গিয়ে নন্দ দেখল ফাঁকা ঘরের মধ্যে একটা লোক টেবিলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে। নন্দর একবার মনে হল, চলে যায়, কিন্তু ছেলের জন্য গভীর দুশ্চিন্তা তাকে যেন জোর করে আটকে রাখল। লোকটাকে জানাল সে। বলল, 'চোখে হাই পাওয়ারের চশমা কোনো ছেলে ধরা পড়েছে আজ?'

লোকটা ঘুম চোখে নন্দর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, 'কেন, ধরা পড়বে কেন?'

'মৌরী থেকে উইদাউট টিকিটে আসছিল।'

লোকটা ড্রয়ার টেনে একগোছা কাগজ বের করে বলল। 'কোন তারিখ? নাম কি?'

'আজকেই দুটো বিয়াল্লিশের গাড়ি। নাম চন্দন হাজরা।'

কাগজে লেখা নামগুলোয় ঝপঝপ করে চোখ বুলিয়ে লোকটা বলল, 'ও নামে আজ কোনো কেস নেই।'

নন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার গলা শুকিয়ে আসছে। একটু এগিয়ে গার্ডদের বিশাল বিশাল কাঠের বাক্সগুলোর একটায় বসল সে। আর হাঁটবার শক্তি তার নেই। শরীর থেকে রক্ত বার করে নেবার মতন কেউ যেন তার সব শক্তি শুষে নিয়েছে। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। মাথার মধ্যে দপদপ করছে। ঘাড়ে ব্যথা।

মাইকে গান বাজছে। কখনও আবার ঘোষণা শোনা যাচ্ছে কোন গাড়ি কখন ছাড়বে। হাজার হাজার লোক তার সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। পাগলের মতো তার চারপাশ দিয়ে ছুটছে মানুষগুলো। এত মানুষ অথচ সে কি ভীষণ নিঃসঙ্গ। এরা জানে না তার মনের মধ্যে কি হচ্ছে। কি ভয়ানক দুর্ভাবনা নিয়ে সে এখানে বসে আছে। নন্দর খুব ইচ্ছে হল হঠাৎ ভীষণ চিৎকার করে সে এই পাগলের মতো ছুটে যাওয়া মানুষগুলোকে মুহূর্তের জন্য থামিয়ে দেয়। তারপর লাফ দিয়ে এই বাক্সটার উপর উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে, 'এই যে মশায়রা, শুনেছেন, আমি নন্দ। ধামসের নন্দ হাজরা। বি-ডি-ও অফিসের ক্লার্ক। ছেলের চোখ দেখাতে কলকাতা আসছিলুম। ছেলে হারিয়ে বসে আছি। দয়া করে বলুন, এখন আমি কি করব? কোথায় খুঁজবো ছেলেকে? বাড়ি ফিরে গৌরীকে কি বলব ছেলে না পেলে?' কিন্তু এসব কিছুই করে না সে। চুপচাপ বসে মানুষগুলোর ছুটে চলা দেখে। আর তার মনের মধ্যে একটা ভয় নেকড়ের মতন থাবা বিস্তার করে তাকে গ্রাস করতে থাকে। ছেলে চুরি হয়ে যাওয়ার কত অজস্র ঘটনা ছোটবেলা থেকে

শুনেছে সে। এই সব চুরি যাওয়া ছেলেরাই তো পরে রাস্তার বিকলাঙ্গ ভিখারি বালক হয়ে যায়। মা-বাবার বুকের ভেতর সারাজীবন দাউদাউ করে আগুন জ্বলে আর তাদের ছেলেরা নুলো হাত নেড়ে স্টেশনে, বাজারে, ফুটপাতে ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায়। সম্প্রতি আর-এক ধরনের ছেলে চোরের কথা কাগজে পড়েছে নন্দ। তারা ছেলে চুরি করে তার শরীরের সমস্ত রক্ত বের করে নিয়ে কোনো নির্জন স্থানে তাকে ফেলে রাখে। এই সব ভয়, সংস্কারের মতন নন্দর রক্তের মধ্যে কতকাল ধরে মিশে আছে। আজ সুযোগ মতো বেরিয়ে এসে তারা লকলকে জিভ বার করে তাদের থাবাগুলো চাটতে থাকে। ভয়ে নন্দর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।

'নন্দ দা না! ও নন্দ দা!

নন্দ খুব চমকে গিয়ে মুখ তুলে তাকাল। দেখল সামান্য দূরে সত্য তার বিশাল দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। সত্য তাদের গ্রামের ছেলে। থাকে কোলাঘাট। কোলাঘাটে টালির ব্যবসা করে সত্য এখন বড়লোক। কাঠের বাক্সগুলোর মধ্যে দিয়ে রাস্তা করে নন্দ দ্রুত পায়ে সত্যর কাছে গেল। 'এখানে বসে ছিলে?' নন্দ উঠে গিয়ে দাঁড়ালে, সত্য জিজ্ঞেস করল, 'শরীর খারাপ নাকি?'

'না।' নন্দ মাথা নাড়ল। 'শরীর খারাপ না। একটা ভয়ানক বিপদে পড়ে গেছি।'

'বিপদ! কি বিপদ?'

সত্যর মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে রইল নন্দ। তারপর বিপদের কথাটা সংক্ষেপে বলল তাকে। সমস্ত ব্যাপারটা বলতে পেরে তার বুকের ভেতরটা যেন হাল্কা হল একটু।

সব শুনে, অল্প সময় সত্য কি ভাবল। তারপর বলল, 'আমার মনে হচ্ছে একটা গোলমাল হয়ে গেছে।'

'গোলমাল!'

'হ্যাঁ, গোলমাল! মানে তুমি যখন ভেবেছ চন্দন সাঁত্রাগাছিতে বসে থাকবে, তুমি পরের গাড়ি ধরে যাবে, চন্দন তখন ভেবেছে তুমি মৌড়ি-গ্রামেই থাকবে, চন্দনকে পরের গাড়ীতে মৌরীগ্রাম ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ তুমি এদিকে এসেছ, তোমার ছেলে ওদিকে চলে গেছে।' নন্দর মনে হল সত্যর ধারণাটা ঠিক। এরকমই হয়েছে! না হলে ছেলেটা গেল কোথায়। তার মনে পড়ল পুরী প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে একটা আপের

ইলেকট্রিক ট্রেনও একই সময়ে মৌরীতে ঢুকেছিল। তার মানে পুরী যদি আর দশ মিনিট, দশ মিনিট কেন, পাঁচ মিনিটও লেট করত তাহলেই চন্দনের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যেত।

'তাহলে এখন কি করব ?' সত্যর দিকে চেয়ে নন্দ জিজ্ঞেস করল।

'কি আবার করবে ? এখানেই অপেক্ষা করবে ছেলের জন্য। সে তো মৌরীতে নেমেই বুঝতে পারবে তুমি পুরীতে চেপে হাওড়া চলে গেছ-। কাজেই সে পরের গাড়িতে হাওড়া আসবে।'

কিন্তু চন্দন হাওড়ায় এল না পর পর দুটো গাড়ি দেখল নন্দ। কোথায় চন্দন। হাজার হাজার মানুষ গাড়ি থেকে নেমে স্রোতের মতন তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে স্টেশন থেকে বেরিয়ে চলে গেল কিন্তু চন্দন এলো না। দ্বিতীয় গাড়ির সব মানুষ বেরিয়ে যেতে সত্য বলল, 'নন্দদা, ছেলে তোমার বাড়ি চলে গেছে।'

'বাড়ি চলে গেছে ?' নন্দ অবাক।

'হ্যাঁ। আর যাবে কোথায় ? মৌরীতে তোমায় না পেয়ে আর হাওড়া আসার সাহস করেনি। বাসে উঠে বাড়ি।

নন্দরও মনে হল সত্যিই তো বাড়ি না গিয়ে আর কোথায় যাবে। আর যেখানে যেতে পারে তার কথা মনে হলে হাত-পা অবশ হয়ে আসে। ছেলে বাড়ি গেছে মনেপ্রাণে এটাই বিশ্বাস করতে চায় নন্দ। তবুও বলল, 'কিন্তু বাস ভাড়া ?'

'বাস ভাড়া নিশ্চয় ছিল, তুমি জান না।'

'আর যদি বাড়ি গিয়েও দেখি ছেলে বাড়ি ফেরেনি।' নন্দর স্বর তার নিজের কানেই কি রকম অস্বাভাবিক শোনায়।

আলো হাতে দরজা খুলে দিল গৌরী। আলোর কোনো দরকার ছিল না। জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে আজ। কিন্তু পাঁচিলের পাশের বড় আমগাছটার জন্য দরজার গোড়াটায় সবসময়েই কি রকম একটা ছায়া-ছায়া অন্ধকার থাকে। নন্দ দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘামছিল। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে। ট্রেনে বাসে তবু যা হোক করে এসেছে কিন্তু বাস থেকে নেমে বাড়ির এই পথটুকু আর কিছুতেই আসতে পারছিল না সে, হাতে-পায়ে জোর নেই। যেন অন্যের একটা শরীর তাকে প্রাণপণ কষ্টে বয়ে নিতে হচ্ছে। গৌরী দরজা খুলে দিয়ে খুব বড় করে

হাসল। বলল, 'যাক, এলে তাহলে। আমি ভাবছিলুম, তোমাকেই না খুঁজতে যেতে হয়।'

বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠল নন্দর। সে কোনো কথা বলতে পারল না। গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল সে। আঃ! ছেলেটা তাহলে সত্যি বাড়ি ফিরে এসেছে। নন্দকে দেখলেই বোঝা যায় তার শরীরের ওপর দিয়ে সারাদিন আজ অসম্ভব ধকল গেছে। চুল অবিন্যস্ত, চোখমুখ ক্লান্ত। জামাকাপড় ঘামে জবজব করছে। দরজা বন্ধ করতে করতে গৌরী বলল, 'তোমার দেরি হল এত?'

'দেরি হবেনা?' নন্দর স্বর দুর্বল অসুস্থ মানুষের মতন। 'আমি জানব কি করে ও বাসে চেপে বাড়ি চলে আসবে। আমি একটার পর একটা গাড়ি দেখছি আর ভাবছি এই গাড়িতে চন্দন নিশ্চয় আছে।'

'চল, ঘরে চল।'

'হ্যা, চল।' বলে দালানে ঢুকল নন্দ। ভিজে জামাটা গা থেকে খুলতে খুলতে বলল,

'চা খাইনি এখনও। একটু চা কর। চা খেয়ে চান করব।'

'চা দিচ্ছি। কিন্তু চান করবে, অভ্যেস নেই, ঠাণ্ডা লাগবে না?'

নন্দ হাসল। 'ঠাণ্ডা আজ ছেলেই করে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ। ছেলে করে দিয়েছে?' গৌরী চটে গিয়ে বলল, 'তোমার চিরকালের স্বভাব শেষ মুহূর্তে ছুটোছুটি করা। দশ মিনিট আগে বেরুতে কি হয়েছিল?'

'আজ আমি সারাদিন এই কথাই ভেবেছি,' নন্দ হঠাৎ স্বর খুব গাঢ় করে বলল. 'পয়সা-কড়ির অভাব থাকলেই মানুষের স্বভাব ওরকম হয়ে যায়। প্রথম প্রথম মনে হয় এ ভাবেই চলে যাবে। তারপর যখন দেখা যায় আর চলছে না, তখনই ছোটাছুটি শুরু হয়। স্বভাবটভাব নিয়ে কেউ জন্মায় না বুঝলে। স্বভাব......।'

গৌরী বাধা দিয়ে বলল, 'থাক থাক। সব জায়গায় হেরে এসে বৌ-এর কাছে আর লেকচার দিতে হবে না। তোমার পয়সাকড়ি থাকে না কেন? সারাদিন অনেক দুর্ভোগ গেছে। বাইরে রকে গিয়ে হাওয়ায় বস। আমি চা আনি।'

নন্দ আর কথা বাড়াল না। জামা কাপড় ছেড়ে গামছা পরে বাইরে রকে বেরিয়ে এল। বাইরে ফিনফিনে দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো ফুটেছে। কুয়োতলায়

গাছ ভর্তি থোকা থোকা বেল ফুল। তার সাদা পাপড়ির ওপর থেকে পিছলে জ্যোৎস্নার আলো উঠোনে নেমে আসছে। আকাশ সাদাটে নীল। দু-এক-জায়গায় পাতলা হয়ে নক্ষত্র ফুটেছে। কিন্তু খুব অস্পষ্ট। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় নন্দর শরীর জুড়িয়ে গেল। কিন্তু মন! নন্দর মন নেই, কেননা শরীরের ভেতরটা একদম ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল তার। যেন শরীরের ভেতর থেকে মন সমেত সব যন্ত্রপাতি কেউ বার করে নিয়ে খালি খাঁচাটা রেখে দিয়েছে। এ রকম হয়। অনেকদিন অসুখের পর ভালো হলে ভেতরটা এরকমই ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

গৌরী চা নিয়ে এল। নন্দকে চা দিয়ে নিজেও নিল। বলল, 'আমারও চা খাওয়া হয়নি আজ।'.

'কেন ?'

'ছেলেটা পাঁচটা নাগাদ ফিরল। ও ফিরতে তোমার জন্য এমন দুশ্চিন্তা হল চা খাবার কথা ভুলেই গেলুম।'

'বেশ করেছ।' নন্দ ক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর চোখ নাচিয়ে ছেলের খোঁজ করল। বলল, 'চন্দন কোথায় ?'

'যা কাজ। ঘরে শুয়ে কানের সঙ্গে লাগিয়ে রেডিও শুনছে।'

নন্দ ঘন ঘন চুমুকে চা শেষ করে কাপ নামিয়ে রেখে বলল, 'আচ্ছা, চন্দন বাড়ি এল বাসের পয়সা পেল কোথায় ?'

'ও, সেকথা বলা হয়নি তোমায়।' গৌরী বলল, 'গাড়ি থেকে মৌরীতে নামতেই অনিমেষবাবুর ছেলে বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা। সে কলেজ থেকে ফিরছিল। সব শুনে সে-ই জোর করে বাড়ি নিয়ে এসেছে।'

নন্দ উঠে পড়ল। জ্যোৎস্নার ঢল বেয়ে হেঁটে উঠোন পেরিয়ে সে কুয়োতলায় গেল। ঝপঝপ করে গায়ে মাথায় জল ঢালল ক-বালতি। একটু শীতশীত করল। ছেলের কথা মনে হল তার। ছেলেটা অদ্ভুত। কিরকম নিশ্চিন্তে বাড়ি এসে রেডিও শুনছে। এত দুর্ভোগ পুইয়ে সে বাড়ি ফিরল, একবার উঠেও এলনা। মৌরী স্টেশনের সেই মুচির কথাটা মনে পড়ল তার। কাম কাজ শিখল, বাস ভেগে পড়ল। আপন মনেই হাসল নন্দ। 'কামকাজ' কথাটা খুব জোর বলেছে বুড়ো। কামকাজ শিখে গেলে সব ছেলেই ভেগে পড়ে বাবা। নন্দও ভেগেছিল। তার ছেলেও ভাগবে।

'কিগো, তোমার হল ? কত চান করবে ?'

'এই যাই।'

লুঙি পরে চুলটুল আঁচড়ে খেতে বসে রান্নাঘরের আলোয় গৌরীর দিকে চোখ পড়ল নন্দর। আজ গৌরী খুব টান করে চুল বেঁধেছে। খোঁপায় বেল ফুলের মালা। ছাপা শাড়ি পরেছে একটা। গৌরীর মুখ প্রতিমার মুখের মতন ফোলাফোলা। গোল, চামড়া মসৃণ। গৌরীর তেলতেলে মুখের চামড়ায় আলো যেন ঠিকরে যাচ্ছে। খেতে খেতে নন্দ মৌরীর মুচির গল্প গৌরীকে শোনাল। শুনিয়ে হেসে বলল, 'কাম-কাজ শেখবার পর কোন ছেলে আর বাবা মার কথা মনে রাখে? আমি রেখেছিলুম, বল? তোমাকে বিয়ে করেই...।' কথা শেষ না করে নন্দ চোখ দিয়ে অদ্ভুত ইঙ্গিত করল একটা।

নন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে তার চোখের খেলা দেখতে দেখতে গৌরী ফিক করে হেসে ফেলল। বলল, 'তোমার সব তাতেই ঠাট্টা। বুড়ো মানুষ কি বলেছে, আর তুমি...।' কথা শেষ করতে পারল না গৌরী। নন্দ একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'কি দেখছ এত আমার মুখ?'

'তোমাকে।'

'মাথা খারাপ।' বলে গৌরী আঁচল তুলে মুখে ঢেকে আবার হাসল। নন্দর হঠাৎ মনে হল সংসারে সবই একদিন পর হয়ে গেলেও বৌ কোনোদিন পর হয় না। গৌরীর জন্য ব্যথায় তার বুকটা টনটন করে উঠল। ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে হল গৌরীকে। আহা! তার যদি অনেক টাকা-পয়সা থাকত! ভাবতে ভাবতে নন্দর মনটা পূর্ণ হয়ে উঠল। সেই যে চান করার সময় একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব ছিল। সেটা আর থাকল না।

খেয়ে, মুখ ধুয়ে দালানে এসে নন্দ বলল, 'কী জ্যোৎস্নাই উঠেছে আজ!'

'হ্যাঁ।' গৌরী অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'কাল পূর্ণিমা।'

'ছাদে যাবে?'

'ছাদে?' গৌরী অবাক হয়ে বলল, 'এত রাত্রে ছাদে কেন?'

'কোথায় রাত? দশটাও বাজেনি।'

'দূর। ছাদ আমার ভালো লাগে না।' বলে নন্দর দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখল গৌরী। দেখে ভুরু কুঁচকে হাসল। 'না-না। ছাদে না। বিছানায়।'

'ধ্যাৎ।' নন্দ বিরক্ত হল। 'সে সব নয়রে বাবা। এমনি একটু ছাদে বসব। চল না।'

গৌরী ভেংচি কেটে বলল, 'এমনি একটু ছাদে বসব, চল না। আব্দার।'

'আব্বার কেন ?'

গলায় কৃত্রিম ঝাঁঝ ফুটিয়ে গৌরী বলল, 'আব্বার না তো কি ? ছেলে বড় হয়েছে। এখনও জেগে আছে। এখন দুজনে ট্যাং-ট্যাং করে ছাদে গেলে সে মনে করবে না কিছু ?'

'যা বাব্বা! ছেলে কি মনে করবে ?' বলে নন্দ বিস্ময়ে হা হয়ে গৌরীর দিকে তাকিয়ে থাকল। আর তখনই দেখা গেল ঘরের দরজায় চন্দন দাঁড়িয়ে।

'কিরে, কোথায় যাবি ?' গৌরী জিজ্ঞেস করল চন্দনকে। চন্দন কোনো উত্তর দিল না। তার চোখে এখন চশমা নেই। চশমা না থাকলে সে যেমন করে কপাল কুঁচকে থাকে, তেমনি করে কপাল কুঁচকে দুজনের মাঝখান দিয়ে হেঁটে, বাইরের উঠোনে জ্যোৎস্নায় গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু হারিকেনের ম্লান আলোয় তার দীর্ঘ ছায়াটা দাঁড়িয়ে রইল এখানে। এই বারান্দায়। নন্দ আর গৌরীর মাঝখানে।

ওড়ার সময় গাংচিলেরা বাতাসে কখনো থামে না। তাদের মর্যাদায় বাধে।

কিন্তু জোনাথন লিভিংস্টন নির্লজ্জ। আবার সেই কম্পমান যন্ত্রণাকর বক্রতার জন্য মুক্ত করে ডানা, ধীর হতে হতে শুদ্ধ হয় গতি। জোনাথন সাধারণ পাখি নয়।

বেশির ভাগ চিল উড়তে পেরেই নিশ্চিন্ত, আর-কিছু শেখার ঝক্কি পোয়াতে চায় না। তীর থেকে খাবারের সন্ধানে যায় আর ফেরে—খিদের তাগিদে ছাড়া ওড়ার আর কোনো মানে নেই। কিন্তু এই চিলটির কাছে ওড়ার, শুধুই ওড়ার তাগিদ অনেক বেশি। জোনাথন গাংচিল উড়তেই ভালোবাসে।

জোনাথন টের পেল এহেন চিন্তা প্রভূত ক্ষতিকর। অন্য গাংচিলেরা তাকে অপছন্দ করে মা-বাবাও তার কাণ্ডকারখানা দেখে রীতিমত উদ্বিগ্ন।

সে জানত না কেন ছড়ানো দুই ডানা যতটা চওড়া তার আধাআধি কম উচ্চতায় জলের ওপরে উড়তে পারলে অল্প চেষ্টায় ভেসে থাকা যায় অনেকক্ষণ। গাংচিলেরা সাধারণত পা নিচু করে জলে আছড়ে পড়ে পড়তি-বেগ থামায়। কিন্তু জোনাথনের টানটান পা মিশে যায় শরীরে। আর সে জলের ওপর দিয়ে পিছলে যায়, পেছনে আঁকা থাকে জলের সরুরেখা। যখন সে পা উঁচু করে বাতাস কেটে বালিতে নামে বাবা-মা উদ্বিগ্ন হন।

মা কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন—'কেন, জন, কেন? কেন তুমি দলের অন্য পাখিদের মতো থাক না? নিচুতে ওড়া পেলিক্যান, অ্যালবেট্রসদের জন্যে ছেড়ে দিলেই তো হয়? তুমি ভালো করে খাও না, জন, তোমার শরীরে একফোঁটা মাংস নেই!'

'তাতে কি হয়েছে মা? আমাকে যে জানতেই হবে বাতাসে নিজেকে নিয়ে আমি কি করতে পারি, না পারি।'

'দেখো জোনাথন', বাবা বলেন, 'শীতের আর বেশি দেরি নেই। নৌকোর দেখা পাওয়া ভার হবে, মাছ যাবে জলের গভীরে। শিখতেই যদি হয় খাবার জোগাড় করতে শেখো। ওড়া ব্যাপারটা ভালোই, তবে শুধুই উড়লে খাবার জোগাড় হবে কোত্থেকে? ভুলো না, ভগবান আমাদের ডানা দিয়েছেন খিদে মেটানোর জন্যে।'

জোনাথন বাধ্যভাবে মাথা নাড়ে। পরের কয়েকদিন জোনাথন সত্যিই অন্য পাখিদের মতো হওয়ার চেষ্টা করে। সকাল থেকে মারামারি, কামড়াকামড়ি করে—এক টুকরো মাছের জন্যে, এক টুকরো রুটির জন্যে। কিন্তু কিছুতেই পারে না।

সে ভাবে, এ সবই কত অর্থহীন! বহু কষ্টে জোগাড় করা মাংসের টুকরো ফেলে দিতে হয় পিছু নেওয়া বৃদ্ধ ক্ষুধার্ত চিলের জন্যে। এই সময়টায় আমি ওড়া শিখতে পারতাম। কত কিছু শেখার আছে।

কিছুদিনের মধ্যেই জোনাথন গাংচিল আবার একা একা উড়ে যায় দূর সমুদ্রের আকাশে—ক্ষুধার্ত, সুখী এক শিক্ষার্থী।

গতি! গতি এক মহা সমস্যা! সপ্তাহের শেষে সে গতি সম্বন্ধে যে কোনো গাংচিলের থেকে অনেক বেশি শিখে ফেলে।

হাজারফুট ওপর থেকে সব শক্তি দিয়ে সে খাড়া নেমে আসতে থাকে সমুদ্রের বুকে। জোনাথন শেখে—কেন গাংচিলেরা খাড়া ঝাঁপ দেয় না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সে ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগ পায়। এই গতিতে ডানা অবশ হয়ে যায়। কিছুতেই ওপরে উঠতে চায় না।

একই ঘটনা পর পর ঘটল। সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে সাবধানে চেষ্টা করে জোনাথন। কিন্তু দুর্দান্ত গতির মাথায় হারিয়ে ফেলে রাশ।

হাজার ফুট ওপরে ওঠো। সমস্ত শক্তি দিয়ে সামনে এগোও, উল্টে দাও শরীর, ডানা ঝাপটে নামতে থাকো খাড়া নিচের দিকে। তারপর, প্রতিবার যখন বাঁ-পাশের ডানা ওপরে ওঠার সময় থামে সে বাঁদিকে উল্টে যায়। ডান দিকের ডানা থামায় আর বাঁধনহারা আগুনের গোলার মতো ছিটকে ঘুরতে ঘুরতে ডানপাশে পড়ে।

জোনাথন কিছুতেই যথেষ্ট সাবধান হতে পারে না। দশবার চেষ্টা করল কিন্তু প্রতিবার ঘণ্টায় সত্তর মাইল পার হওয়ার সময় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় পালক। কোথায় হারায় রাশ আর আছড়ে পড়ে জলে।

ভিজে গায়ে হঠাৎ তার মাথায় বিদ্যুৎ খেলে। সে ভাবে, ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলের মাথায় যদি ডানা শরীরের দুপাশে স্থির রাখা যায় তাহলে হয়ত নির্বিঘ্নে ওড়া যাবে।

দু হাজার ফুট থেকে সে আবার চেষ্টা করে। উল্টে ঝাঁপ দেয়, ঠোঁট সোজা অধোমুখী, ডানা সম্পূর্ণ মেলে আর ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলের মাথায় শরীর একেবারে স্থির। সব শক্তি নিঃশেষ করে দিতে হয়। তবে এবারে জোনাথন সফল। দশ সেকেণ্ডের মধ্যে সে ঘণ্টায় নব্বই মাইল পার হয়। গাংচিলদের জগতে এ একেবারে নতুন নজির।

তবু জয়ের আনন্দ হল ক্ষণস্থায়ী। যে মুহূর্তে গতির রাশ টানা শুরু করল, পাল্টাল ডানার জ্যামিতিক কোণ, আবার সেই বাঁধনহারা এলোমেলো

বিপর্যয়। আকাশে মাঝপথে চুরমার হয়ে গেল তার সমস্ত আনন্দ। জোনাথনের শরীর পাথরের মতো কঠিন সামুদ্রিক দেওয়ালে এসে ধাক্কা খেল।

সমুদ্রের নোনা আবরণে রাতের ছায়া। জোনাথন জ্ঞান ফিরে পায়। চাঁদের আলোয় ভেসে যায় তার শরীর। ডানার ভার লোহার মতো ঠেকে, কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি আরো ভারি হয়ে ভর করে পিঠে। জোনাথনের ক্ষীণ ইচ্ছে হয়—এই ভার ধীরে টেনে নিয়ে যাক তাকে, অতলে, শেষ হোক সব।

সে জলের তলায় ডোবে, বুকের ভেতর অচেনা এক ফাঁপা স্বর শোনা যায়। আমার মুক্তি নেই, আমি শুধুই এক গাংচিল। আমার স্বভাবই আমায় বেঁধে রেখেছে। ওড়ার জন্য আমার জন্ম নয়। যদি জোরে উড়তে পারার কথা হত তাহলে আমার থাকত বাজ পাখির ছোট ডানা, মাছ না খেয়ে আমি ইঁদুর খেতাম। বাবা ঠিকই বলেছে। এ বোকামি আমার বন্ধ করা উচিত। উচিত দলের কাছে ফিরে যাওয়া, হতভাগ্য গাংচিলের ছোট্ট শরীর নিয়েই সুখী থাকা।

ফাঁপা স্বর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়, জোনাথন সব মেনে নেয়। গাংচিলের রাতের জায়গা তীর। এই মুহূর্ত থেকে, প্রতিজ্ঞা করে সে, স্বাভাবিক গাংচিল হবে। সুখী হবে সকলে।

অন্ধকার সমুদ্রবক্ষ থেকে অতি কষ্টে জোনাথন তার শ্রান্ত শরীর টেনে তোলে, ওড়ে তীরের দিকে। অল্প উচ্চতায় ওড়া সম্বন্ধে যা শিখেছে তার জন্যে সে কৃতজ্ঞ।

কিন্তু না, সে ভাবে। যা ছিলাম আর তা থাকব না, যা শিখেছি সব ভুলে যাব। অন্য যে কোনো গাংচিলের মতো আমিও এক গাংচিল এবার থেকে আমিও তাদের মতোই উড়ব। তাই সে অনেক কষ্টে ওঠে একশ ফুট উঁচুতে, জোরে ডানা ঝাপটায়, ওড়ে তীরের দিকে।

এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে তার ভালো লাগে। আর তো রইল না কোনো বাধা-বন্ধন, শেখার জন্যে তাড়নার অবসান হল। নেই জয়ের আকাঙ্ক্ষা বা পরাজয়ের গ্লানি। জোনাথন অন্ধকারে ওড়ে, তীরের ওপর আলোর দিকে।

অন্ধকার! সেই ফাঁপা স্বর বিপদের তীক্ষ্ণ সঙ্কেত দেয়। গাংচিলেরা কখনো অন্ধকারে ওড়ে না!

সে দিকে মন দেয়না জোনাথন। চারিদিক কি সুন্দর! চাঁদের আলো ঝিকমিক করে জলে। তীক্ষ্ণ আলোর রেখা ভেদ করে অন্ধকার। কি শান্তি আর কি স্তব্ধতা…

নেমে এসো! গাংচিলেরা অন্ধকারে ওড়েনা! অন্ধকারে উড়তে হলে তোমার চোখ হত পেঁচার মতো, বুদ্ধি আরো বেশি, বাজপাখির ছোট্ট ডানা থাকত তোমার!

সেই রাতে শ-খানেক ফুট ওপরে আকাশে জোনাথন আর কিছুর তোয়াক্কা করে না। তার কষ্ট, তার সিদ্ধান্ত উবে যায়।

ছোটো ডানা! বাজপাখির মতো ডানা!

পেয়ে গেছি উত্তর! কি বোকাই না ছিলাম! দরকার শুধু একটা ছোট্ট ডানা—ডানার বেশি অংশ গুটিয়ে শুধু ডগার ওপর উড়লেই তো হয়! ছোট্ট ডানা।

অন্ধকার সমুদ্র থেকে দু হাজার ফুট ওপরে ওঠে জোনাথন। মৃত্যু বা ব্যর্থতার কথামাত্র না ভেবে। ডানার গোড়া গুটিয়ে নেয় শরীরে, ছুরির ফলার মতো সরু ডগা মেলে বাতাসে, সোজা নিচে লাফ দেয়।

মাথার ভেতর বাতাস গর্জায় দৈত্যের মতো। ঘণ্টায় সত্তর মাইল, নব্বই, একশ, একশ কুড়ি···আরো···আরো জোরে। আগে ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে উড়তে ডানায় যে কষ্ট হত এখন একশ চল্লিশ মাইলে উড়তেও তত কষ্ট হচ্ছে না, ডানা সামান্য বেঁকিয়ে সে বেরিয়ে এলো সেই খাড়া ঝাঁপ থেকে। ঢেউয়ের ওপরে চাঁদের আলোয় তার ধূসর শরীর চাবকে ওঠে।

বাতাসের ধাক্কা সামলাতে চোখ ছোটো করে জোনাথন। আনন্দ হয়—ঘণ্টায় একশ চল্লিশ মাইল! সম্পূর্ণ আয়ত্তে! দু হাজার ফুটের বদলে পাঁচ-হাজার ফুট থেকে নামতে শুরু করলে না জানি আরো কত জোরে···

ক মুহূর্ত আগেকার সব সিদ্ধান্ত ঝড়ের বেগে উড়িয়ে দিল বাতাস। সে সংকল্প ভেঙেছে, কিন্তু মনে নেই কোনো অপরাধবোধ। ঐ সব প্রতিজ্ঞা রাখার দায়িত্ব যারা চিরাচরিতকে মেনে নিয়েছে তাদের। শিক্ষার চূড়ায় যে উঠেছে এ সমস্ত প্রতিশ্রুতিতে তার কি কাজ?

জোনাথনের শেখার পালা আবার সূর্যোদয়ের আগে শুরু। পাঁচহাজার ফুট ওপর থেকে নীল, সমতল সমুদ্রে জেলেদের নৌকোগুলো দেখায় ছোট্ট ছোট্ট বিন্দুর মতো। ধুলোভরা অস্পষ্ট মেঘের মতো প্রাতরাশের জন্যে জমা হওয়া গাংচিলের দল নিচে উড়ছে।

জীবন! আনন্দে তিরতির করে কাঁপে তার শরীর। টেনে ধরেছে ভয়ের রাশ, গর্ব হয়। শরীরে টেনে নেয় ডানার গোড়া, বাতাসে বাড়ায় কৌণিক ছোট্ট ডানা, সোজা লাফিয়ে পড়ে সমুদ্রের দিকে। চার হাজার ফুট পার

হওয়ার সময় বুঝতে পারে এই তার প্রান্তিক গতি। শব্দের কঠিন দেওয়ালের মতো বাতাসের বিরুদ্ধে সে এর চেয়ে জোরে উড়তে কোনোদিন পারবে না। সোজা নিচের দিকে পড়তে থাকে জোনাথন, ঘণ্টায় দু শ চোদ্দ মাইল বেগে। সে এই ভেবে ঢোঁক গেলে যে এই গতিতে যদি পুরো পাখা মেলে দেয় তাহলে লক্ষ লক্ষ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন গাংচিলে পরিণত হবে তার শরীর। কিন্তু, গতি যে শক্তি, গতিই আনন্দ, আর…আর গতি সুন্দর।

হাজার ফুট থেকে জোনাথন গতি সংযত করতে থাকে। দৈত্যের মতো প্রচণ্ড বাতাসে ধাক্কা খায় ডানা। উল্কার মতো কাছে আসে নৌকো, গাংচিলের দল, একেবারে তার পথের সামনে।

থামতে পারে না জোনাথন। ঐ প্রচণ্ড গতিতে এমন কি পথ পাল্টানোর উপায়ও তার জানা নেই।

ধাক্কা লাগলে ঐ মুহূর্তে মৃত্যু।

জোনাথন চোখ বোঁজে।

সেদিনের সেই সকালে, সূর্যোদয়ের ঠিক পরে, জোনাথন লিভিংস্টন গাংচিল উল্কার মতো সকালের খাবারের খোঁজে জড়ো হওয়া গাংচিলদের ঝাঁকের মাঝখানে এসে পড়ল, দু-শ বারো মাইল বেগে। দুচোখ বন্ধ। বাতাস আর পালকের ঘর্ষণের তীক্ষ্ণ ধ্বনি শোনা যায় শুধু। এবারের মতো ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন। তাই কারো মৃত্যু হল না।

অবশেষে সে যখন আকাশের দিকে তুলে ধরল, ঠোঁট তখনো সে ধরে আছে ঘণ্টায় একশ ষাট মাইলের দুর্দান্ত বেগ, গতি যখন অনেক কমিয়ে আনে আর মেলে দেয় পাখা, চার হাজার ফুট নিচে নৌকোটাকে দেখায় এক টুকরো রুটির মতো।

জয়ের কথা ভাবে জোনাথন। প্রান্তিক গতি! দু-শ চোদ্দ মাইল বেগে উড়তে পারে গাংচিল! অকল্পনীয়! দলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো মুহূর্ত। সেই মুহূর্ত থেকে জোনাথনের জীবনে আসে এক নতুন যুগ। নির্জন শিক্ষাক্ষেত্রে উড়ে যায় জোনাথন, আট হাজার ফুট থেকে আবার সেই লাফের জন্যে গুটিয়ে নেয় ডানা। শুরু করে দেয় কি-করে দিক বদলাতে হয়, সেই অন্বেষণ।

সে দেখল, ডগার একটিমাত্র পালক, ইঞ্চির ভগ্নাংশ নাড়াতে পারলেই ঐ দুর্দান্ত গতির মাথায় এক সুষম বক্ররেখায় ঘুরতে পারা যায়। সে শিখল ঐ গতিতে একটার বেশি পালক নাড়াচাড়া করলে সে আগুনের গোলার

মতো ঘুরতে থাকবে। গাংচিলদের জগতে জোনাথনই প্রথম এই খেলায় পারদর্শী হল।

সেদিন অন্য পাখিদের সঙ্গে গল্পেসল্পে এক মিনিট সময়ও নষ্ট করে না জোনাথন, সূর্যাস্তের পরেও তার ওড়া চলতে থাকে। সে শিখে যায়, পাক, চাপ গড়ান, ঝাঁপ-গড়ান, ভিতর-লাট, পাল-ফাঁপান, লাটিম—ঘুরন্। কত কি!

তীরে দলের মাঝে ফিরে এলো জোনাথন, ভরা রাত্রি। মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে, শরীর ভারি ক্লান্ত। আপন আনন্দে তবু পাক খেতে খেতে ঘুরপাক দিয়ে নেমে আসে মাটিতে। সে ভাবে, দলের সবাই তার সফলতার কথা শুনে নিশ্চয়ই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। জীবনে এলো কত নতুনত্ব—চিরাচরিত খাবার সংগ্রহের চেয়ে কত বেশি আনন্দের, কল্যাণের! জীবন হবে অর্থময়। অজ্ঞানতা থেকে নিজেদের মুক্ত করব, জ্ঞান বুদ্ধি ও ক্ষমতায় উজ্জ্বল হবে আমাদের জীবন। মুক্ত হব আমরা, ওড়া শিখব!

ভবিষ্যৎ গুনগুনিয়ে গান ধরে, প্রতিশ্রুতির উজ্জ্বল গান।

দলের পাখিরা জটলা করে, বোধহয় অনেকক্ষণ ধরে নিজেদের মধ্যে চলেছে কোনো পরামর্শ। আসলে, তারা অপেক্ষা করছিল।

"জোনাথন লিভিংস্টন গাংচিল! মাঝখানে এসে দাঁড়াও!" দলপতির গলা গম্ভীর শোনায়—যেন বড়ো কিছু ঘটতে চলেছে। দলের মাঝখানে দাঁড়ানো মানে কলঙ্ক, মর্যাদাহানি। অবশ্য অতি সম্মানিতদের, মাঝখানে দাঁড়ানোর নিয়ম আছে। জোনাথন ভাবে—আরে তাই তো, এরা সকলে সকালবেলা আমার কৃতিত্ব দেখেছে! কিন্তু, আমি সম্মান চাই না। নেতা হওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। যা পেয়েছি তা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। সামনের ঐ মুক্ত দিগন্ত দেখিয়ে দিতে চাই। সে এগোয়।

"জোনাথন লিভিংস্টন গাংচিল", দলপতি বলেন, "লজ্জাকর কাজের জন্যে দলের মাঝখানে সকলের সামনে এসে দাঁড়াও।"

কে যেন বুকে মস্ত পাথর দিয়ে আঘাত করল, পায়ের তলায় মাটি সরে যেতে থাকে, শরীর আর বয় না, কানের কাছে কিসের গর্জন! লজ্জাকর কাজ? অসম্ভব! আমার কৃতিত্ব! ওরা বুঝতে পারছে না। ভুল করছে, ওরা ভীষণ ভুল করছে!

'...তার অমার্জনীয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্যে', গম্ভীর গলা বলতে থাকে, "গাংচিল সমাজের সম্মান ও রীতিনীতি ভঙ্গ করার জন্যে...'

এর মানে তাকে গাংচিল সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, দূরে, কোনো নির্জন পাহাড়ে একা একা নির্বাসন দেওয়া হবে।

'একদিন, জোনাথন লিভিংস্টন গাংচিল, তুমি শিখবে দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার কোনো দাম নেই। জীবন অজানা, তাকে কখনই জানা যায় না। আমরা পৃথিবীতে এসেছি যতদিন পারা যায় খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে।'

বিচারের সময় কোনো গাংচিল ফিরতি উত্তর দেয় না, কিন্তু জোনাথনকে মুখ খুলতেই হয়, 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা? আমার 'ভাইয়েরা'—সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'যে গাংচিল জীবনের কোনো মহত্তর অর্থ খুঁজে পায় আর তা তুলে ধরার চেষ্টা করে তার চেয়ে দায়িত্ববান আর কে? হাজার হাজার বছর ধরে আমরা খাবারের জন্যে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করেছি, কিন্তু এখন আমাদের সামনে বেঁচে থাকার আরো মহৎ কারণ উপস্থিত—শেখার, আবিষ্কারের, মুক্তির! একবার আমায় সুযোগ দাও, যা শিখেছি তা তোমাদের দেখাতে দাও...'

'তোমার সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করা হল', সবাই সুরে সুর মেলায়, গম্ভীরভাবে মুখ ফেরায়, জোনাথনকে একা করে দেয়।

তার বাকি দিনগুলি কাটে নিরালায়, বহুদূর পাহাড়ের ওপারে সে উড়ে যায়, একাকীত্বে দুঃখ নেই, কিন্তু অন্য গাংচিলেরা ওড়ার বৃহত্তর গৌরব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, দেখতে চাইল না চোখ খুলে।

প্রতিদিন নতুন করে জোনাথন শেখে শরীরকে বাতাসে মিশিয়ে উল্কার বেগে সমুদ্রগহ্বরে দশ ফুট ঢুকে গেলে এক সুস্বাদু মাছের খবর পাওয়া যায়। জেলেদের নৌকো থেকে বাসি মাছ আর রুটির টুকরোর সন্ধান করতে হয় না। সে আকাশে ঘুমোতে শেখে। বাতাসের সঙ্গে দিক ঠিক রেখে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় অবধি সে একশ মাইল উড়তে পারে। জানার আকাঙ্ক্ষা তার তীব্র, গভীর সামুদ্রিক কুয়াশা ভেদ করে সে উড়ে যায় স্বচ্ছ উজ্জ্বল আকাশে। তখন অন্য গাংচিলেরা বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে, বৃষ্টি আর কুয়াশা ছাড়া অন্য কিছু জানা নেই। উঁচু বাতাসে শরীর ভাসিয়ে জোনাথন যায় তারের গভীরে, সুস্বাদু পোকামাকড়ে আহার সম্পূর্ণ করে।

একসময় দলের জন্যে যা পাওয়ার আশা করেছিল তা এখন সে একাই শুধু পেয়ে যায়। সে উড়তে শিখেছে—সে জন্যে যে দাম তাকে দিতে হয়েছে তাতে

একটুও দুঃখ নেই। জোনাথন শেখে—বিরক্তি, ভয় আর রাগের জন্যে গাংচিলেরা বাঁচে এত কম, তার নিজের চিন্তায় এ সবের কোনো স্থান নেই। বহুকাল সুন্দর জীবনে বাঁচে জোনাথন।

তারা আসে সন্ধেবেলা। তার নির্জন, প্রিয় আকাশে জোনাথন তখন একা। তারার আলোর মতো পবিত্র দুটি গাংচিল তার ডানার দুপাশে উদিত হয়। তাদের শরীরের উজ্জ্বলতা ছড়ায় রাতের বাতাসে শান্ত মাধুর্যের আলো। আরো সুন্দর তাদের ওড়ার ক্ষমতা। কি অসাধারণ দক্ষতায় তারা ওড়ে জোনাথনের দু পাশে। তাদের ডানার ডগা তার নিজের থেকে সবসময় এক ইঞ্চি দূরত্বে থাকে।

কোনো কথা না বলে জোনাথন তাদের পরীক্ষা করতে শুরু করে। এর আগে কোনো গাংচিল এই পরীক্ষায় সফল হয়নি। সে বেঁকিয়ে আনে ডানা, ঘণ্টায় এক মাইল বেগে থেমে থাকে শরীর। উজ্জ্বল দুই পাখি তার সঙ্গে সঙ্গে সংযত করে গতি, নির্বিঘ্নে। আস্তে ওড়ার চাবিকাঠি তাদের মুঠোয়।

তারপর সে গুটিয়ে নেয় ডানা, ডিগবাজি খেয়ে একশ নব্বই মাইল বেগে পড়তে থাকে। তারাও পড়ে নির্ভুল দক্ষতায়, উল্কার মতো।

সবশেষে সে ঐ গতিকে ঘুরিয়ে লম্বা, খাড়া পথ বেয়ে আস্তে আস্তে ঘুরতে ঘুরতে নামতে থাকে। হাসতে হাসতে তারাও ঘোরে।

সাধারণ ভঙ্গিমায় ফিরে এসে জোনাথন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর বলে, 'ঠিক আছে, তোমরা কে?'

'আমরা তোমার সাথী জোনাথন। আমরা তোমার ভাই, তাদের গলা সমর্থ ও শান্ত, 'আমরা তোমায় বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি। যাব আরো ওপরে।'

'ঘর আমার নেই। আমার কোনো দল নেই। আমি ত্যজ্য। আমরা এখন সেই বিখ্যাত পাহাড়ি বাতাসের শীর্ষে উড়ে চলেছি। আর একশ ফুটের বেশি ওপরে আমার এ বৃদ্ধ শরীর আমি তুলতে পারব না।'

'কিন্তু, তুমি পারবে জোনাথন। তুমি যে শিখেছ। এক শিক্ষা পর্বের শেষ এসেছে, সময় এলো নতুনের।'

সারাজীবন যেমন ঝলমলিয়ে উঠেছে আজও তেমনি উপলব্ধি স্বচ্ছ হয়ে আসে তার সামনে। এরা ঠিক বলছে। সে আরো উঁচুতে উড়তে পারবে, সময় হল ঘরে ফেরার।

শেষবারের মতো দীর্ঘ দৃষ্টি ফেরায় জোনাথন। আকাশ পারে তাকায় সেই রুপোলি মাটিতে যেখানে সে শিখেছে এত কিছু।

অবশেষে সে বলে, 'আমি তৈরি।'

জোনাথন লিভিংস্টন গাংচিল তারার মতো উজ্জ্বল দুই প্রাণের সাথে মিলিয়ে যায় ঘোর অন্ধকার আকাশে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই তাহলে স্বর্গ!

সে ভাবে আর নিজের মনেই হাসে। উড়ে এসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গের বিশ্লেষণ শুরু করা মোটেই শ্রদ্ধাজ্ঞাপক নয়।

সে এলো পৃথিবী থেকে, মেঘের ওপরে, দুই উজ্জ্বল চিলের সাথী হয়ে। জোনাথন দেখে তার নিজের শরীরও তাদের মতো উজ্জ্বল হতে থাকে। সত্যিই, সেই তরুণ যুবক জোনাথন গাংচিল চিরকাল বেঁচে ছিল তার সোনালি চোখের আড়ালে। বাইরের শরীরে শুধু এসেছে পরিবর্তন।

যদিও শরীর এখনো গাংচিলেরই কিন্তু ইতিমধ্যেই সে আগের চেয়ে অনেক ভালো উড়তে পারছে। জোনাথন ভাবে, এবার আমি অর্ধেক পরিশ্রমে দ্বিগুণ বেগে উড়তে পারব। পুরনো কালের থেকে অনেক ভালো।

শুভ্রতায় ঝকমক করে পালক, ডানা কত মসৃণ, চকচকে রুপোর পাতের মতো সুন্দর। খুশিতে আত্মহারা হয়ে জোনাথন তাঁর নতুন ডানায় শক্তি জাগায়।

দু শ পঞ্চাশ মাইল বেগে উড়তে উড়তে মনে হল এই তার গতির চরম সীমারেখা। দু শ সত্তর মাইলে সে ভাবে এর চেয়ে জোরে কোনোদিন উড়তে পারবে না। জোনাথন একটু মিইয়ে যায়। যদিও আগের চেয়ে অনেক জোরে সে ওড়ে তবু এই নতুন শরীরেও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এ বাধা পার হতে গেলে অসম্ভব শ্রমের দরকার। জোনাথন ভাবে, স্বর্গে কোনো সীমা থাকা উচিত না।

ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় মেঘ, সঙ্গীরা বলে 'বিদায় জোনাথন' হালকা হাওয়ায় মিলিয়ে যায় তাদের শরীর।

সমুদ্র তলায় রেখে সে ওড়ে বিচূর্ণ তীরের দিকে। অল্প কটি গাংচিল সেখানে শিক্ষাগ্রহণে ব্যস্ত।

দূরে উত্তরে, দিগন্তের কাছাকাছি ওড়ে আরো কয়েকজন। নতুন দৃশ্য, নতুন চিন্তা, নতুন প্রশ্ন। কিন্তু এত কম গাংচিল কেন? স্বর্গে তো গাংচিলদের

ছোড়াছড়ি হওয়ার কথা। এর মধ্যেই আমি এত ক্লান্ত হয়ে পড়ছি কেন? স্বর্গে কারো ক্লান্ত হওয়ার কথা নয়। ঘুমোনোর কথা নয়।

একথা সে কোথায় শুনেছে? পার্থিব জীবনের সব স্মৃতি বিলীন হয়েছে। অবশ্যই পৃথিবীতে সে শিখেছে অনেক। কিন্তু খুঁটিনাটি সব ভাসা ভাসা হয়ে যায়। অল্প অল্প মনে পড়ে খাবারের জন্যে কামড়াকামড়ির কথা, বিতাড়িত হওয়ার ঘটনা।

তটরেখার কাছে ডজনখানেক গাংচিল তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। মুখে তাদের কথা নেই। জোনাথন অনুভব করে এরা সবাই তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। আর এতদিনে সত্যিই তার ঘর হল। দীর্ঘ দিনের অবসান হল, যে দিনের সূর্যোদয় আর মনে পড়ে না।

তীরে নামার জন্যে ফেরে জোনাথন। বাতাসে একটুখানি থামবে বলে ডানা ঝাপটায়, হাল্কা হয়ে মাটিতে নামে। অন্যরাও নেমে আসে কিন্তু ডানা নড়ে না একটুও। বাতাসে দুলে আসে তারা। উজ্জ্বল ডানা দুটি সম্পূর্ণ মুক্ত। তারপর কোনোভাবে পাল্টায় পালকের বক্রতা আর থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পা ছোঁয় মাটি। কি অদ্ভুত সৌন্দর্য তাদের দক্ষতার। কিন্তু জোনাথন এখন ভারি ক্লান্ত, চেষ্টা করতে ইচ্ছে করে না। তীরে দাঁড়িয়ে চারিপাশে পরিপূর্ণ মৌন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে জোনাথন।

দিন যায়। জোনাথন বুঝতে পারে, এতদিন পৃথিবীতে যা শিখেছে তার চেয়ে অনেক বেশি শেখার আছে এখানে। তফাৎ শুধু একটাই। এখানকার গাংচিলদের ধ্যান-ধারণা সব তারই মতো। প্রত্যেকে বাঁচার আনন্দে দুহাত বাড়িয়ে সৃষ্টির পূর্ণতা ছুঁতে চায়, চায় উড়তে, যা তারা সবচেয়ে ভালোবাসে। এরা সবাই এত সুন্দর! প্রত্যেকে শুধু ওড়ে, সারাদিন আরো ভালো ওড়ার চেষ্টা করে। চোখের সামনে কত নতুন জগৎ মেলে যায়।

জোনাথন ভোলে, ধীরে ধীরে বিস্মৃত হয় তার জন্মস্থান—সেই পৃথিবী যেখানে বাঁচে তার দল। ওড়ার আনন্দের দিকে দু চোখ বুজে খাবার সংগ্রহের জন্যে ব্যবহার করে ডানা, মারামারি করে। তবু কখনো কখনো মুহূর্তের জন্যে মনে পড়ে যায়।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা অনেকক্ষণ ওড়ার পর তীরে বিশ্রাম নিতে নিতে মনে পড়ে যায়।

সঙ্গী শিক্ষককে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা সালিভান, আমাদের আর সব ভায়েরা কোথায়?' এখানকার শুদ্ধ সহজ ভাষা সে ইতিমধ্যে শিখে ফেলেছে।

আর সেই কর্কশ স্বর নয়। 'আমাদের মতো আরো চিল নেই কেন এখানে? আমি যেখান থেকে এলাম সেখানে তো…'

'…হাজার হাজার চিল। আমি জানি,' সালিভান মাথা নাড়ায়, 'জোনাথন, তুমি লাখের মাঝে বিশেষ একজন। আমরা সবাই আজ এখানে এসে পৌঁছেছি কত আস্তে আস্তে, কত দেরিতে। এক জগৎ থেকে ঠিক একই রকম জগতে ফিরে গেছি বারবার, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব—ভুলেছি সব। বেঁচেছি শুধু বর্তমান মুহূর্তে। তোমার কোনো ধারণা আছে কত হাজার জীবন আমরা নষ্ট করেছি শুধু এইটুকু জানতে-বুঝতে যে খাওয়া, ঘুমোনো, মারামারি, সামান্য শক্তিপরীক্ষা এ-সব ছাড়াও জীবনে আরো কিছু আছে। হাজার হাজার জন, হাজার হাজার জীবন ফুরিয়ে গেছে। আরো কত শ জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা বুঝতে শিখেছি যে জীবনে সম্পূর্ণতা বলে কিছু আছে। শিখেছি—বাঁচা অর্থময় হয় তখনি যখন আমরা সেই পূর্ণতা ছুঁতে চাই, সবার সামনে মেলে দিতে পারি তাকে। আমাদের ক্ষেত্রে এখনো সেই একই নিয়ম খাটে; এ জীবনে যা শিখব তা থেকেই নির্ধারিত হবে পরের জীবনের ক্ষেত্র। এ জীবন যদি এমনিই কেটে যায়, যদি কিছুই না শিখতে পারি তবে আগামী জীবনেও থাকবে এখনকার মতোই সব বাধা-বিপত্তি, বিপর্যয়; কাঁধে থাকবে লোহার মতো ভার। ঠিক এখনকার মতো।'

সালিভান মেলে দেয় ডানা, বাতাসের মুখোমুখি হয়। সে বলে, 'কিন্তু তুমি, জন, এক জীবনেই এত শিখেছ যে এখানে আসার জন্যে তোমাকে হাজার জীবন নষ্ট করতে হয় নি।'

মুহূর্তে তারা উড়ে যায় আকাশে, শেখে। নির্দেশিত আবর্তনের গঠন খুবই কঠিন, কারণ, বিপরীত দিকে ঘোরার সময় জোনাথনকে ভাবতে হয় উল্টো করে। সালিভানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘুরিয়ে দিতে হয় ডানার বক্রতা।

সালিভান বারবার বলে, 'এসো, আমরা আবার চেষ্টা করি।' অবশেষে সালিভান খুশি হয়। এবার তারা অন্য কোনো কায়দা আয়ত্তের চেষ্টা করে।

একদিন। সূর্য চলে পশ্চিমে, যারা রাত্রে উড়ছিল না তারা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে তটে, চুপ করে ভাবে। বুকের সব সাহস জড়ো করে জোনাথন দলপতির দিকে এগোয়। সবাই বলে দলপতি নাকি কিছুদিনের মধ্যেই চলে যাবে এ জগতের ওপারে অন্য কোথাও।

একটু ঘাবড়ে গিয়ে জোনাথন ডাকে 'চিয়াং··'

সেই বৃদ্ধ পাখি মমতার চোখে তাকায় তার দিকে। 'বলো, জন।'

বয়সের ভার তাকে ক্ষীণ না করে করেছে আরো শক্তিমান। দলের যে কোনো চিলের থেকে সে জোরে উড়তে পারে, এমন অনেক কায়দা সে জানে অন্যরা যা সবে শিখতে শুরু করেছে।

'আচ্ছা চিয়াং, এই জায়গাটা আসলে তো স্বর্গ নয়, তাই না?'

চাঁদের আলোয় বৃদ্ধ চিয়াং হাসে। বলে, 'জোনাথন লিভিংস্টন তুমি আবার নতুন করে শিখতে শুরু করেছ।'

'তাহলে এর পর কি হবে? আমরা কোথায় যাব? স্বর্গ বলে সত্যিই কি কিছু নেই?'

'না, জোনাথন, তেমন কোনো জায়গা সত্যিই নেই। স্বর্গের নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই, কাল নেই। স্বর্গ মানে সম্পূর্ণতা,' মুহূর্তের জন্যে সে স্তব্ধ হয়ে থাকে, 'তুমি খুব জোরে উড়তে পারো, তাই না জন?'

জোনাথন অবাক হয়, আবার একটু গর্ববোধও করে। 'আমি···গতিই আমার আনন্দ।' বৃদ্ধের নজর সর্বত্র, জোনাথন ভাবে।

'যে মুহূর্তে ছুঁতে পারবে গতির পূর্ণতা, দেখবে স্বর্গ কাছেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ঘণ্টায় হাজার মাইল, লক্ষ মাইল বা আলোর মতো দ্রুত গতি হবে তোমার। কোনো সংখ্যাই অসীম নয় জন। কিন্তু, পূর্ণতা যে বাধাহীন, অনন্ত, জন, সত্যিকারের গতি হল সেই অসীমকে ছুঁতে পারা!'

বিনা পূর্বাভাসে পলকে উধাও হয় চিয়াং। পঞ্চাশ গজ দূরে জলের কিনারে তাকে দেখা যায়, আবার হারায়, মুহূর্তে জোনাথনের কাঁধের কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'ব্যাপারটা একরকম মজারই।'

ধাঁধায় পড়ে জোনাথন, ভোলে স্বর্গের কথা। 'তুমি কি করে এমন পারলে? কী মনে হয় তোমার? কতদূর তুমি যেতে পার?'

'যে কোনো জায়গায়, যে কোনো কালে। নিজের ইচ্ছে মতো,' বৃদ্ধ বলে, 'আমি যেখানে খুশি গেছি,' সে সমুদ্র পার করে তাকায়, 'কি অদ্ভুত! বেড়ানোর তাগিদে যে চিল পূর্ণতাকে ত্যাগ করে শেষ অবধি সে কোথাও যেতে পারে না। পূর্ণতার জন্যে যে বেড়ানোর নেশা হেলায় হারায় সে যায় যেখানে খুশি, ইচ্ছেমতো, যখন তখন। মনে রেখো জন, স্বর্গ কোনো স্থান নয়, কাল নয়, কারণ স্থান কাল এত অর্থহীন······। স্বর্গ হল······'

জোনাথনের সর্বাঙ্গে অজানাকে জয়ের ইচ্ছে কেঁপে কেঁপে যায়, 'তোমার মতো উড়তে শেখাবে আমায়?'

'নিশ্চয়ই, তোমার যদি শিখতে ইচ্ছে হয়?'

'আমি শিখতেই চাই, আমরা কখন শুরু করব?'

'তুমি যদি চাও তাহলে এক্ষুনি।'

'আমি তোমার মতো উড়তে চাই', জোনাথন বলে, দুচোখে তার জ্বলতে থাকে এক আশ্চর্য আলো, 'বলো, আমাকে কি করতে হবে?'

চিয়াং আস্তে আস্তে বলে আর কাঁচা বয়সের জোনাথনকে লক্ষ্য করে। সে বলে, 'চিন্তার সাথে পাল্লা দিয়ে যদি উড়তে চাও, মানে, যদি যেখানে খুশি যেতে চাও তাহলে এই জেনে শুরু করতে হবে যে ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি সেখানে পৌঁছে গেছ।' চিয়াং এর মতে আসল মজাটা হল জোনাথনকে ভাবতে হবে সে একজোড়া একুশইঞ্চি ডানার মধ্যে সীমাবদ্ধ শুধুই এক গাংচিল নয় যার ক্ষমতার ব্যাপ্তি সহজেই কাগজের বুকে ছক কেটে দেখানো যায়। জানতে হবে তার সত্যিকারের প্রকৃতি বেঁচে আছে সামান্য সংখ্যার ধরাছোঁয়ার বাইরে, সর্বত্র একইসঙ্গে, দেশ ও কালের অনন্ত ব্যাপ্তিতে।

তীব্রভাবে চেষ্টা করে জোনাথন। দিনের পর দিন, সূর্যোদয়ের আগে থেকে মধ্যরাত পার করে দেয়। তবু, এত চেষ্টা সত্ত্বেও জোনাথন এক ইঞ্চি নড়তে পারে না।

'বিশ্বাসের কথা ভুলে যাও,' চিয়াং বার বার বলে, 'ওড়ার জন্যে বিশ্বাসের কোনো প্রয়োজন হয় নি তোমার, বুঝতে হয়েছিল। এও সেই একই। আবার চেষ্টা করো……'

তারপর একদিন তীরে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে মনোনিবেশ করতে করতে তার মাথায় বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যায়। বুঝতে পারে চিয়াং-এর কথা। 'সত্যিই তো, আমি সম্পূর্ণ, আমি অন্তহীন!' আনন্দের তীব্রতা অনুভব করে জোনাথন।

'খুব ভালো!' বলে চিয়াং, তার গলায় জয়ের আনন্দ স্পষ্ট।

চোখ খোলে জোনাথন। একা একা বৃদ্ধের সাথে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন তীর-ভূমিতে দাঁড়িয়ে। জলের কিনারে গাছের সারির মাথায় পিঙ্গলবর্ণের দুটি সূর্য।

'এবার তুমি বুঝতে পেরেছ', চিয়াং বলে, 'কিন্তু তোমার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আরো বাড়াতে হবে।'

জোনাথন যেন পাথর হয়ে গেছে, 'আমরা কোথায় ?'

এই অদ্ভুত পারিপার্শ্বিক চিয়াংকে প্রভাবিত করে নি। সে ঝেড়ে ফেলে জোনাথনের প্রশ্ন। বলে, 'আমরা এমন কোনো গ্রহে এসেছি যার সবুজ আকাশে সূর্যের বদলে আলো দেয় দুটি তারা।

আনন্দে চিৎকার করে ওঠে জোনাথন, পৃথিবী ছাড়ার পর এই প্রথম তার গলার আওয়াজ শোনা যায়, 'পেরেছি, আমি পেরেছি !'

'নিশ্চয়ই পেরেছ', বলে চিয়াং, 'কি করতে চাও তা জানলে সবসময়ই পারবে। এবার ঐ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা......'

তারা যখন ফেরে তখন অন্ধকার। অন্যরা সোনালি চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে। জোনাথনকে উধাও হয়ে যেতে দেখেছে তারা।

শুভেচ্ছা নিতে জোনাথন মিনিটখানেক চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'আমি তো এখনো নতুন! সবে শিখতে শুরু করেছি। তোমাদের কাছ থেকে আরো কত শেখার আছে আমার।'

'আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে জন,' সালিভান কাছে এসে বলে, 'গত দশ হাজার বছরের মধ্যে তোমার মতো ক্ষমতাবান গাংচিল আমি দেখিনি।' সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়, অপ্রস্তুত জোনাথন অস্থির হয়।

'তুমি যদি চাও এবার আমরা সময় নিয়ে কাজ শুরু করি', চিয়াং বলে, 'অতীত ও ভবিষ্যতে উড়ে যেতে হবে তোমায়। তারপর তুমি তৈরি হবে সবচেয়ে কঠিন, শক্তিময় আর আনন্দের পরীক্ষার জন্যে। উড়ে যেতে হবে আরো উঁচুতে স্নেহ ও ভালবাসার কাছাকাছি।'

এক মাস কেটে যায় বা মনে হয় যেন কেটে গেল। জোনাথন খুব তাড়াতাড়ি শেখে। সবসময়ই সে সাধারণ ঘটনা থেকে তাড়াতাড়ি শিখেছে আর এখন তো সে চিয়াং এর বিশেষ ছাত্র। ঐ রকম পালকের ছোট্ট শরীর যন্ত্রদানবের মতো পলকে গিলে ফেলে চিয়াং এর সব নতুন ধারণা।

কিন্তু, তারপর এলো সেই দিন, চিয়াং হারিয়ে গেল। সবার সাথে কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল—'শিক্ষার শেষ যেন কোনোদিন না হয়, চিরকাল চেষ্টা করে যেতে হবে। জানতে হবে জীবনের অদৃশ্য বিধি।' বলতে বলতে তার পালক উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয় আর শেষে সেই ঔজ্জ্বল্যে চোখ রাখতে পারেনা কেউ।

সে বলে তার শেষ কটি কথা, 'ভালোবাসো, জোনাথন ভালোবাসতে শেখো।'

পলক মেলে দেখে চিয়াং আর নেই।

দিন যায়। বার বার মনে পড়ে ফেলে আসা পৃথিবীর কথা। এখন সে যা জানে তার হাজার ভাগের এক ভাগও যদি সেখানে জানত তাহলে জীবন হত আরো কত অর্থময়। বালির পরে দাঁড়িয়ে জোনাথন ভাবে পৃথিবীতে তেমন কোনো চিল আছে কিনা যে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চায়, রুটির টুকরোর সন্ধান ছেড়ে খোঁজে ওড়ার আর-কোনো মানে। হয়ত নিয়ম ভেঙে সত্যি কথা বলার জন্যে তাকে দল থেকে তাড়িয়েও দেওয়া হয়েছে। মায়া, ভালোবাসা এ সবের কথা যত ভাবে, বোঝার চেষ্টা করে, তত তার ইচ্ছে হয় পৃথিবীতে ফিরে যেতে। তার নিঃসঙ্গ অতীত সত্ত্বেও জোনাথন জন্মগত শিক্ষক। সন্ধানরত কাউকে উপলব্ধ সত্য জানাতে পারার মধ্যেই তার ভালোবাসার চরম প্রকাশ।

ইতিমধ্যে সালিভানও চিন্তার সাথে পাল্লা দিয়ে লড়তে শিখে গেছে, অন্যদেরও সে শেখায়। সে সন্দেহ প্রকাশ করে বলে।

'জন, এককালে তোমাকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছিল। কোন আশায় ভাবো যে তোমার পুরনো সঙ্গীরা এখন তোমার কথা শুনবে? জানো, কথায় বলে, সবচেয়ে দূর অবদি দেখতে পায় সেই, যে সবচেয়ে উঁচুতে উড়তে পারে। কথাটা সত্যি। যাদের তুমি ছেড়ে এলে তারা সারাজীবন মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করেই কাটাল—স্বর্গ থেকে তারা লাখ মাইল দূরে। ঐ নীচতা থেকে তাদের তুমি স্বর্গ দেখাবে? ওরা তো ডানার ডগা অব্দিও দেখতে পায় না। এখানে থাকো, নতুনদের সাহায্য করো। এরা তোমায় বুঝবে, তোমার থেকে শিখবে।' কি ভেবে সালিভান কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে তারপর বলে, 'চিয়াং যদি পুরনো পৃথিবীতে ফিরে যেত? তুমি আজ কোথায় থাকতে?'

এই শেষ কথাটা জোনাথনকে ভাবিত করে। সালিভান ঠিকই বলছে—সবচেয়ে দূর অবদি দেখতে পায় সেই যে সবচেয়ে উঁচুতে উড়তে পারে।

জোনাথন থেকেই যায়। নতুন যারা আসে তাদের শেখায়। কত আগ্রহী তারা, কত চটপটে। তবু সেই পুরনো অনুভূতি বার বার ফিরে আসে। মনে হয়, পৃথিবীতে দুয়েকজন হয়ত আছে যারা শিখতে পারবে। বিতাড়িত হওয়ার সময় যদি চিয়াং-এর দেখা পেত তাহলে সে এদ্দিনে কত কিছু শিখে ফেলত।

অবশেষে জোনাথন ঠিক করে, 'সালি, আমায় ফিরে যেতেই হবে।

তোমার ছাত্রেরা খুব ভালো এগোচ্ছে। তারাই তোমায় অনেক সাহায্য করবে।'

সালিভান ব্যথিত হয় কিন্তু তর্ক করে না। শুধু বলে, 'তোমায় হারিয়ে আমার কষ্ট হবে জন।'

'ছিঃ সালি!' জোনাথন ভর্ৎসনা করে, 'অমন অবুঝের মতো বলছ কেন? এতদিন তাহলে আমরা কষ্ট করলাম কি জন্যে? আমাদের বন্ধুত্ব যদি দূরত্ব বা কালের ওপর নির্ভর করে তাহলে এদের জয় করার পর আমাদের ভ্রাতৃত্ব-বোধ ভেঙে যায়। দূরত্ব অতিক্রম করলে পড়ে থাকে বর্তমান। সময়কে জয় করলে থাকে এই মুহূর্ত। তোমার কি মনে হয় না এই দুইয়ের মাঝখানে অন্তত দুয়েকবারও আমাদের দেখা হবে?

সালিভান গাংচিল নিজেকে ভোলে, হেসে ওঠে। স্নেহের সুরে বলে, 'তুমি এক পাগল পাখি জোনাথন। পৃথিবীর গাংচিলকে কেউ যদি স্বর্গের সন্ধান দিতে পারে তবে সে জোনাথন লিভিংস্টনই পারবে।' মাথা নিচু করে বালির দিকে তাকায় সালিভান। 'বিদায় জন, প্রিয় বন্ধু।'

'বিদায় সালি, আবার দেখা হবে।' তারপর জোনাথন ধরে আনে তার চিন্তার সেই অন্য কাল, সেই গাংচিল দলের বিস্তৃত চিত্র। অনায়াসে বোঝে তার অস্তিত্ব শুধুই হাড় ও পালকে গড়া নয়, সৃষ্টি ও মুক্তির পরিপূর্ণ উপমা, বাধাহীন তার ক্ষমতা।

ফ্লেচার লিণ্ড গাংচিল বয়সে কচি কিন্তু সে জানে তার আগে অন্য কোনো পাখির ওপর এমন অন্যায় অত্যাচার করা হয় নি।

'ওদের যা প্রাণ চায় বলুক, আমার কিছু যায় আসে না।' তীব্র ক্ষোভে ভাবে লিণ্ড। দৃষ্টিপথ ঝাপসা হয়। সে ওড়ে দূর শিখরের দিকে। ডানা ঝটপট করে এদিকওদিক ওড়ার চেয়ে আরো কত আনন্দ লুকিয়ে আছে জীবনে! একটা মশা ওড়ে ওরকমভাবে! দলপতির চারপাশে মজা করে পাক খেয়ে ওড়ার জন্যে তাড়িয়ে দেওয়া হল আমায়! ওরা কি অন্ধ, দেখতে পায় না? ভালো উড়তে পারার যে কি গৌরব তা কি এরা ভাবতেও পারে না?

'ওদের কথায় আমার কিছু যায় আসে না। ওড়া কাকে বলে দেখিয়ে দেব। যদি চায় খাঁটি দস্যু হয়ে যাব। এমন শিক্ষা দেব......'

কোথা থেকে এক স্বর ঢুকে যায় লিণ্ডের মাথার ভেতর। যদিও সে স্বর শান্ত, লিণ্ড এত ঘাবড়ে যায় যে ভুল করে বাতাসে হোঁচট খায়—

'গাংচিল, ফ্লেচার ওদের অত কড়া কথা বলো না। তোমায় তাড়িয়ে ওরা আঘাত দিল নিজেদেরই। একদিন যখন বুঝবে, তখন তুমি যেভাবে দেখ ওরাও সে রকম দেখতে শিখবে। ওদের ক্ষমা করে দাও, বুঝতে সাহায্য কর।'

তার ডানদিকের ডানার ডগা থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে ওড়ে সেই উজ্জ্বলতম পাখি। কষ্টহীন ভাসে, একটা পালকও নড়ে না অথচ কি অসম্ভব তার গতি।

শিশুের সবকিছু কেমন ওলটপালট হয়ে যায়। 'এ কি হচ্ছে? আমি কি পাগল হলাম? আমি কি জ্ঞান হারাচ্ছি? এ কি হল?'

ধীর, নিম্ন স্বর তার চিন্তার সূত্রে বাসা নেয়, প্রশ্নের উত্তর চায়—'ফ্লেচার লিণ্ড গাংচিল, তুমি কি উড়তে চাও?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আমি উড়তে চাই।'

'ফ্লেচার লিণ্ড গাংচিল, তোমার ইচ্ছের জোর কি এত যে তুমি দলের অপরাধ ক্ষমা করে দেবে, শেখা শেষ হলে ফিরে যাবে তাদের কাছে, শিখতে সাহায্য করবে?'

এই অপূর্ব ক্ষমতাবান প্রাণের কাছে মিথ্যে বলা যায় না। সব গর্ব, সব অভিমান ভুলে যায় শিশু।

আস্তে আস্তে বলে, 'পারব, আমি সব পারব।'

'তাহলে ফ্লেচ', সেই উজ্জ্বল প্রাণ বলে, স্নেহময় সে স্বর, 'এসো আমরা শুরু করি......'

তৃতীয় অধ্যায়

দূর শিখরের চারপাশে ধীরে ধীরে পাক খায় জোনাথন, নজর রাখে। কাঁচাবয়সের গুণ্ডা ফ্লেচার ছিল খুবই উপযুক্ত ছাত্র। তার সমর্থ হাল্কা শরীর বাতাসে দারুণ ক্ষিপ্র। সবচেয়ে বড় কথা ফ্লেচারের উড়তে শেখার আগ্রহ তীব্র।

ঐ সে আসে, ধূসর-রঙা অস্পষ্ট শরীর নিয়ে গর্জন করতে করতে ঘন্টায় দেড় শ মাইল বেগে তার শিক্ষকের পাশ দিয়ে উল্কার মতো বেরিয়ে যায়। চকিতে থামার চেষ্টা করে আর ষোল ধাপের নীচমুখী পথ বেয়ে আবর্তিত হয়, চেঁচিয়ে বলে প্রতিটি ধাপের নাম,

'আট...নয়...দশ...জোনাথন দেখ, আমি বায়ু-গতির বাইরে চলে যাচ্ছি... এগারো...তোমার মতো সুন্দর করে হঠাৎ থামতে চাই...বারো...ধেত্তেরি।

কিছুতেই পারছি না…তেরো…শেষ কটা ধাপ…কিছুতেই…চোদ্দ… আআআক্!'

ব্যর্থতার রাগে ও ক্ষোভে ফ্লেচারের সংযমের সব চেষ্টা বৃথা হয়ে যায়। পেছনে উল্টে যায় শিশু, বাতাসের হিংস্র ধাক্কায় ঘুরে ঘুরে পড়তে থাকে। অবশেষে হাঁফাতে হাঁফাতে নিয়ন্ত্রিত করে পতন, তখন সে জোনাথনের এক শ ফুট নিচে।

'আমার পেছনে তুমি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ জোনাথন। আমি অকম্মা বোকা। বার বার চেষ্টা করেও পারছি না, এ আমি কোনোদিন পারব না।

জোনাথন গাংচিল তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে। 'অত চটপট থামার চেষ্টা করলে সত্যিই কোনোদিন পারবে না। শুরুতেই ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল হারাচ্ছ। আরো সাবলীল হতে হবে। দৃঢ় অথচ স্বচ্ছন্দ, বুঝলে?'

শিশুর পাশে নেমে আসে জোনাথন। 'এসো, আমরা একসঙ্গে সমান তালে চেষ্টা করি। থামার সময় লক্ষ্য রাখবে। সহজ, সাবলীল গতি।'

মাস তিনেক পরে আরো দুটি ছাত্র আসে জোনাথনের কাছে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের দল থেকে বিতাড়িত। আনন্দের জন্যে ওড়া—এই অদ্ভুত নতুনত্বের প্রতি তাদের কৌতূহল অসীম।

তবু ওড়ার আদবকায়দা শেখা যতটা সহজ তার পেছনের কারণ বোঝা তত নয়।

'আমরা প্রত্যেকে এক মহান চিলের ভাবরূপ, মুক্তির অনন্ত প্রকাশ', সন্ধেবেলা তীরে দাঁড়িয়ে জোনাথন বলে, 'ভালো করে ওড়ার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পাবে আমাদের সত্যিকারের প্রকৃতি। ছাড়িয়ে যেতে হবে সব সীমা। সেই জন্যেই তো এত চেষ্টা, তীব্র গতি, সংযত গতি……'

তার ছাত্ররা সারাদিনের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। ওড়ার তাদের ক্লান্তি নেই—কারণ সে গতিময়, উত্তেজক। প্রতিটি শিক্ষার শেষে ডানার আগ্রহে আবার নতুন করে সে ইন্ধন জোগায়। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও, এমন কি ফ্লেচারও এখনো বিশ্বাস করতে পারে না যে চিন্তার রাশ মেলে ওড়াও বাতাস ও পালকের ওড়ার মতোই সত্যি।

'তোমার গোটা শরীর, এ ডানার প্রান্ত থেকে ও ডানার প্রান্ত পর্যন্ত', কখনো জোনাথন বলে, 'চেতনার প্রতিমা ছাড়া আর কিছু নয়, যা তুমি চাইলেই দেখতে পাবে। চিন্তার সূত্রগুলো টানটান করে ছিঁড়ে ফেল দেখবে শরীরের নাড়ীনক্ষত্র ছিঁড়ে যাচ্ছে……।' কিন্তু যেভাবেই জোনাথন

বলুক না কেন শুনতে লাগে গল্পের মতো। তাদের প্রয়োজন আরো বিশ্রাম।

আরো একমাস পর জোনাথন বলে এবার সময় হল দলে ফেরার।

'কিন্তু আমরা যে এখনো ঠিকমত তৈরি হই নি।' বলে হেনরি ক্যালভিন। 'তাছাড়া সেখানে আমাদের কেউ চায়না। আমরা অবাঞ্ছিত, ত্যজ্য। জোর করে সেখানে কি যাওয়া যায়?'

'আমরা মুক্ত, যখন ইচ্ছে যে কোনো জায়গায় যেতে পারি', জোনাথন বলে, তট ছেড়ে ওড়ে আকাশে, পূবমুখী, দলের চরাচরের দিকে।

ছাত্রদের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী দ্বিধা দেখা দেয় কারণ, দলের আইন বলে বিতাড়িত পাখি কখনো ফেরে না। গত দশ হাজার বছরে সে আইনের ব্যত্যয় হয়নি। আইন বাঁধে, জোনাথন মুক্তি দেয়। ইতিমধ্যেই সে চলে গেছে অনেকদূর। বেশিক্ষণ দেরি করলে জোনাথন গিয়ে পড়বে লক্ষ চিলের প্রতিকূলতার মুখে।

'আচ্ছা আমরা তো দলের কেউ নই, তবে দলের আইন মানব কেন?' আত্মমগ্ন হয়ে ফ্লেচার বলে, 'তাছাড়া ওখানে যদি মারামারি হয় আমরা জোনাথনকে সাহায্য করতে পারব।'

তারপর সেই ভোরে তারা উড়ে এলো পশ্চিম থেকে। ডাবল ডায়মণ্ড ভঙ্গিতে ডানায় ডানা ছুঁইয়ে আটটি পাখি। তীরে জোটবাঁধা দলের মাথার ওপর দিয়ে একশ পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে। সবার আগে জোনাথন, তার ডানদিকে লিও আসে অনায়াসে আর বাঁদিকে, খেলোয়াড়ি মেজাজে আসে হেনরি ক্যালভিন। প্রত্যেকে সেই এক ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে বাঁদিকে ঘোরে, আর একটি পাখি···মাটিতে...নামে...উল্টে...আসে...মাটিতে; মাথার উপর বাতাস চাবুক হানে।

দিনগত কর্কশতা স্তব্ধ হল, ছিন্ন হল চিরাচরিত। আট পাখির সেই গঠন যেন এক দৈত্যাকার ছোরা। আশি হাজার চিল নিষ্পলক চেয়ে থাকে। একে একে আটজন, প্রত্যেকে, গতি ভঙ্গ করে দলের মাথায় এক এক করে পাক খেয়ে নিশ্চল হয়ে বালিতে দাঁড়ায়। তারপর—এমন যেন রোজই হয় এই ভাবে, জোনাথন ছাত্রদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিয়ে দিতে থাকে।

বিরাগের সুরে হেসে বলে জোনাথন, 'আজ শুরুতে তোমরা প্রত্যেকেই যোগ দিতে দেরি করেছ···'

দলের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে যায়। এরা তো বিতাড়িত। ফিরে

এসেছে! কিন্তু...এ তো কখনই হতে পারে না! ফ্লেচার যে লড়াইয়ের কথা ভেবে চিন্তিত হয়েছিল তা হারিয়ে গেল দলের বিভ্রান্তির মাঝে।

'জানলাম ওরা বিতাড়িত, ত্যজ্য', অল্পবয়সি কয়েকজন বলে, 'কিন্তু ওরা অমন উড়তে শিখল কোত্থেকে?'

দলপতির আদেশ প্রচারিত হতে লেগে গেল আরো ঘণ্টাখানেক: 'এদের অবজ্ঞা করো। ওদের সঙ্গে যে কথা বলবে তাকেও দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। বিতাড়িতের প্রতি চোখ তুলে যে তাকায় সে দলের আইন ভঙ্গ করে।'

সেই মুহূর্ত থেকে পেছন ফিরে দাঁড়াল হাজার হাজার ধূসর-পালকওয়ালা দেহ, কিন্তু জোনাথনের ভ্রূক্ষেপ নেই, দলের চোখের সামনেই সে অনুশীলন চালায়, এই প্রথম সে ছাত্রদের চাপ দিতে থাকে ক্ষমতার সীমা অবদি।

'মার্টিন চিল!' সে চিৎকার করে আকাশে, 'তুমি নাকি আস্তে ওড়ার সব কায়দা জান? তুমি কিছু জান না, জানলে প্রমাণ কর! ওড়ো!'

তাই শান্তশিষ্ট ছোট্ট মার্টিন উইলিয়ম গাংচিল শিক্ষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে ঘাবড়ে, নিজেকেও অবাক করে আস্তে ওড়ার ব্যাপারে যাদুকর হয়ে উঠল, সবচেয়ে হাল্কা বাতাসেও ডানা স্থির রেখে পালক বেঁকিয়ে নিজেকে সে তুলে নিয়ে যায় তীর থেকে মেঘে, আবার নেমে আসে।

এমন করেই চার্লস রোল্যাণ্ড গাংচিল উড়ে যায় সেই বিখ্যাত পাহাড়ি বাতাসের শীর্ষে, চব্বিশ হাজার ফুটে। শীতল পাতলা বাতাসের মধ্যে থেকে নীলাম্বর হয়ে নেমে আসে তার শরীর, বিস্ময়াবিষ্ট, সুখী, কাল তাকে যেতে হবে আরো উঁচুতে।

ফ্লেচার গাংচিল সবচেয়ে ভালোবাসে হাওয়ায় জিমন্যাসটিক, ষোল ধাপের ধীরগতি খাড়া আবর্তন এখন সে পার হয় অনায়াসে। শেষে আরো কত। একাধিক চোরা চোখ চেয়ে থাকে, তার পালকের সাদা রোদ্দুর তীরে ঝলকায়।

সারাদিন প্রতিটি ছাত্রের পাশে পাশে থাকে জোনাথন, দেখায়, পরামর্শ, দেয়, চাপ দেয়, শেখায়। সঙ্গী হয়ে উড়ে যায় রাত্রে, মেঘে ও ঝড়ে ওড়ার খেলায়। আটহাজার পাখি দুর্দশার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে মাটিতে।

ওড়ার শেষে ছাত্রেরা শরীর এলিয়ে দেয় বালিতে, আরও মন দিয়ে শোনে জোনাথনের কথা। জোনাথনের কিছু পাগলের মতো ধারণা আছে তারা বোঝে না, আবার ভালোও কিছু আছে যা তারা খুব বোঝে।

পথ পাল্টাতে হয়—তীব্রবেগে ফ্লেচার লিও গাংচিল বাঁদিকে ঘোরে আর ঘন্টায় দু শ মাইলেরও বেশি গতিতে জমাট গ্র্যানাইটের ঢিবিতে ধাক্কা খায়।

সে পাথর যেন তার কাছে অন্য কোনো জগতের দৈত্যাকৃতি কঠিন দরজা। যখন ধাক্কা লাগে এক ঝলক ভয়, বিস্ময় আর অন্ধকার, তার পরই ভেসে যায় অচেনা অজানা আকাশে। স্মৃতি হারায় ফ্লেচার, আবার ফিরে পায়, হারায়—এমনই হতে থাকে—ভয়, বিষাদ আর দুঃখ। তার দুঃখ হয় খুব।

জোনাথনের সাথে প্রথম দেখার দিনে যে স্বর শুনেছিল সেই স্বর শুনতে পায় ফ্লেচার,

'আমরা তো নিজেদের বাধা পেরনোর চেষ্টা করছি, কিন্তু ফ্লেচার, আসলে মজাটা কি জানো, একটু আগেও আমরা জানতাম না যে পাথরের মধ্যে দিয়ে ওড়া যায়।'

'জোনাথন!'

'কিংবা, মহান চিলের একমাত্র পুত্র,' শুকনোভাবে ফ্লেচারের শিক্ষক বলে।

'তুমি এখানে কী করছ? ঐ পাথরটা! আমার কি···আমি কি বেঁচে আছি?'

'আঃ ফ্লেচ, বাজে কথা থামাও! তুমি তো আমার সঙ্গে কথা বলছ, তার মানে কি তুমি মরেছ? চেতনার রাশ মেলে বাধা ভেঙেছ। এবার তোমার সময় হল। আগের চেয়ে তুমি অনেক বেশি ক্ষমতাবান। এখানেই শিখতে পার কিংবা দলের কাছে ফিরে গিয়ে কাজ করতে পার। দলপতিরা সাংঘাতিক দুর্ঘটনার আশা করেছিল, তারা অবাক হয়েছে কেননা তুমি তাদের নিরাশ কর নি।'

'আমি দলের কাছেই ফিরে যেতে চাই। নতুন কয়েকজনকে নিয়ে সবে শুরু করেছি!'

'খুব ভালো ফ্লেচার, যা বলছিলাম মনে রেখো—পাখির শরীর তার চেতনার আকৃতি ছাড়া কিছু নয়।'

ফ্লেচার মাথা নাড়ে, ডানা খোলে আর সেই শিখরের তলদেশে জোটবাঁধা গোটা দলের মাঝখানে মেলে দেয় চোখ। সে যখন প্রথম নড়ে দলের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়।'

'বেঁচে আছে! যে মরে গিয়েছিল সে বেঁচে উঠেছে!'

'ডানা দিয়ে শুধু স্পর্শ করেছে! বাঁচিয়ে তুলেছে! মহান চিলের একমাত্র পুত্র!'

'না! অস্বীকার করেছে! ওটা একটা শয়তান! শয়তান! দল ভাঙতে এসেছে।'

চার হাজার গাংচিলের জটলা ভয় পেয়েছিল, এবার তাদের মধ্যে দিয়ে সেই 'শয়তান! শয়তান!' ধ্বনি ঝোড়ো সমুদ্র-বাতাসের মতো বয়ে যায়। চোখ ঝলসায়, ঠোঁট শানায়, এগিয়ে আসে ধ্বংসের তাগিদে।

'আমরা যদি এখান থেকে চলে যাই তাহলে কি তোমার খারাপ লাগবে ফ্লেচার?' জোনাথন জিগ্যেস করে,

'বড় একটা আপত্তি করব না নিশ্চয়ই…'

নিমেষে তারা চলে যায় আধ মাইল দূরে, হাজার চিলের শাণিত ঠোঁট বাতাসে ঝলসায়।

বিহ্বল জোনাথন প্রশ্ন করে, 'বলতে পার কেন দুনিয়ার সবচেয়ে শক্ত কাজ কোনো পাখিকে বোঝান যে সে স্বাধীন, অল্প চেষ্টা করলেই সে নিজের কাছে প্রমাণ করতে পারে যে সে মুক্ত? এই কাজটা কেন এত শক্ত?'

হঠাৎ এই দৃশ্য পরিবর্তন সামলাতে ফ্লেচার তখনও চোখ পিটপিট করে। 'এখুনি তুমি কি করলে বলো তো? এখানে আমরা কি করে এলাম?'

'তুমি তো দলের কাছ থেকে চলে আসতে চাইলে—চাইলে না?'

'হ্যা, কিন্তু তুমি কি করে...'

'অন্য সবকিছুর মতোই ফ্লেচার, অনুশীলন।'

ভোরের মধ্যে দলের সবাই ভোলে তাদের পাগলামির কথা, কিন্তু ফ্লেচার ভোলে না। 'মনে আছে জোনাথন তুমি অনেকদিন আগে বলেছিলে দলকে ভালোবাসতে, তাদের কাছে ফিরে গিয়ে শিক্ষায় সাহায্য করতে?'

'হ্যা।'

'যারা একটু আগে তোমায় মারার চেষ্টা করেছিল তাদের তুমি কি করে ভালোবাসো আমি বুঝি না।'

'তা নয় ফ্লেচ, আমি ও ভাবে ভালোবাসতে বলছি না। ঘৃণা বা দুর্বৃত্তিকে ভালোবাসতে বলি না আমি। ওদের সত্যিকারের প্রকৃতি অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে, যা কিছু শুভ তা আবিষ্কারে সাহায্য করতে হবে। ভালোবাসা কি বুঝতে পারলে দেখবে ব্যাপারটা দারুণ মজার।'

'আমার যেমন মনে পড়ে এক দুর্দান্ত যুবক পাখির কথা, নাম তার

ফ্লেচার লিণ্ড গাংচিল। সবেমাত্র দল থেকে তাড়ানো হয়েছে তাকে, মৃত্যু অবদি দলকে এক হাত দেখে নেওয়ার জন্যে সে তৈরি। সুদূর পাহাড়ের কোলে ফ্লেচার গাংচিল গড়ে আপন বিক্ষুব্ধ নরক। আর আজ! আজ ফ্লেচার গাংচিল গড়ে স্বর্গ, অজ্ঞদের হাতে ধরে নিয়ে যায় সে দিকে।'

তার শিক্ষকের দিকে ঘুরে তাকায় ফ্লেচার, চোখে নিমেষের ভয়। 'আমি নিয়ে যাব? কি বলছ তুমি? আমি? এখানে তুমিই শিক্ষক। তোমার কোথাও যাওয়া চলবে না!'

'সত্যিই কি চলবে না? তোমার মনে হয় না পৃথিবীতে আরো কত দল আছে, কত ফ্লেচার, আমাকে যাদের প্রয়োজন আরও বেশি? যারা আলোর পথ দেখেছে!'

'আমি? জন, আমি সামান্য গাংচিল, আর তুমি…'

'…মহান চিলের একমাত্র পুত্র বোধহয়?' জোনাথন দীর্ঘ শ্বাস ফেলে, মাঝ সমুদ্রে হারায় তার দৃষ্টি। 'আমাকে আর তোমার দরকার নেই। আস্তে আস্তে খুঁজে পেতে হবে নিজেকে, প্রতিদিন আরও বেশি করে। ফ্লেচার গাংচিলের স্বাধীন সত্তা—নেই তোমার পথনির্দেশক। তাকে উপলব্ধি কর, চেষ্টা কর।'

নিমেষে জোনাথনের দেহ বাতাসে কাঁপে, দীপ্ত হয়, স্বচ্ছ হতে থাকে। 'আমার নামে বাজে কথা রটাতে দিও না, আমাকে যেন ভগবান না করে। ঠিক আছে ফ্লেচ? আমি গাংচিল। আমি উড়তে ভালোবাসি, হয়ত…'

'জোনাথন!'

'বেচারা ফ্লেচ! চোখকে বিশ্বাস করো না। দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। উপলব্ধি দিয়ে দেখ, খুঁজে বের করো যা তোমার ভেতরে লুকনো আছে। সন্ধান পাবে ওড়ার পথের।'

থেমে যায় কম্পমান দীপ্তি। শূন্য বাতাসে মেলায় জোনাথন গাংচিল।

কিছু পরে ফ্লেচার আকাশে টেনে তোলে শরীর, একদল কাঁচা-বয়সীর মুখোমুখি হয়। প্রথম শিক্ষাগ্রহণে উন্মুখ তারা।

গলায় কিসের ভার, ফ্লেচার বলে, 'শুরুতে বুঝতে হবে—গাংচিল অনন্ত মুক্তির ভাবমূর্তি। শরীরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত চেতনার প্রতিমা বই কিছু নয়।'

অল্পবয়সী চিলেরা মজার ছলে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, এ আবার কি? এর সঙ্গে ওড়ার কি সম্পর্ক?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফ্লেচার শুরু করে আবার। 'আচ্ছা ..এবার', বলে আর সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। '...শুরু করা যাক নিচুতে ওড়া দিয়ে।' বলতে বলতে ফ্লেচার বোঝে তার বন্ধু একটুও স্বর্গীয় ছিল না, সে ছিল তারই মতো।

সীমা নেই, জোনাথন? সে ভাবে। তাহলে সে দিন আর বেশি দূরে নেই যখন পাতলা বাতাসের মধ্যে থেকে তোমার তীরে গিয়ে দাঁড়াব আমি, ওড়ার ব্যাপার দু-একটা জিনিশ দেখিয়ে দেব তোমায়।

যদিও সে ছাত্রদের প্রতি কড়া হওয়ার চেষ্টা করে—ফ্লেচার গাংচিল তবু মুহূর্তের জন্যে দেখে ফেলে সবাইকে, তাদের আসল অস্তিত্বকে। শুধু ভালো লাগা নয়, এদের সবাইকে সে ভালোবাসে। সীমা নেই, জোনাথন?—ভাবে আর মনে মনে হাসে। শুরু হয় তার শেখার পালা।

কাজের মেয়েরা

বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়

নাইলনের ছাঁট বাছাই

বেলেঘাটা চালপট্টি অঞ্চলের খালের পাড়ে ছোট ছোট অসংখ্য কলকারখানা, গুদাম। কোথাও টুনি বাল্ব, অ্যাম্পুল, ইলাষ্টিক টেপ, প্লাইউড, বিদেশে রপ্তানির জন্য চায়ের প্যাকিং বাক্স তৈরি হচ্ছে—কোথাও তৈরি হচ্ছে পাটের দড়ি, কাগজের ঠোঙা। তারই মাঝে নজরে এলো একটা বিশাল গুদামঘর জাতীয় বাড়ির মাথায় লেখা 'হ্যাণ্ড ডাইং অ্যাণ্ড ওয়াসিং কোম্পানি'-র বিরাট সাইনবোর্ড। অনেক মেয়েদের দেখলাম কাজ করছে। কোম্পানির মালিক একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। তাঁর কাছে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইতেই হাজারো প্রশ্ন—কেন, কোথেকে এসেছি আমরা। ভদ্রলোকের চোখে সন্দেহের দৃষ্টি। আমাদের উদ্দেশ্যের কথা শুনে অনুমতি দিলেন। ভদ্রলোক কিছুতেই মেয়েদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছেন না দেখে আমাদের একজনকে তাঁর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলাম। কি ধরনের কাজ হচ্ছে দেখার নাম করে আমি অন্যদিকে চলে গেলাম মেয়েদের সঙ্গে আড়ালে কথা বলতে।

প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন নানা বয়সের মেয়ে কাজ করে। তাদের কাছ থেকে জানতে পারলাম কোম্পানির মালিক ঐ পাঞ্জাবী ভদ্রলোক অনেকদিন পর্যন্ত কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়িয়েছেন কিছু একটা ব্যবসা করার ফন্দি

মাথায় নিয়ে। অনেক খোঁজ-খবরের পর ঠিক করলেন বড় বড় সুতাকল-গুলি থেকে পরিত্যক্ত ও নোংরা হয়ে যাওয়া সুতো ও নাইলনের ছাঁট সংগ্রহ করে সেগুলো সাফ-সুরৎ করে প্যাকিং করে মিলগুলোতে চালান দেবেন—যা দিয়ে মিলগুলো নতুন কোনো জিনিস উৎপাদন করতে পারবে।

বেলেঘাটা অঞ্চলের একটা পোড়ো-বাড়ি (বেশ খানিকটা জমি সমেত) নব্বুই বছরের লিজ নিয়ে পত্তন করলেন 'বেঙ্গল হ্যাণ্ড ড্রাইং অ্যাণ্ড ওয়াসিং কোম্পানি।'

মোট শ্রমিক সংখ্যা: মেয়ে চল্লিশ, ছেলে ত্রিশ। একজন ছাড়া বাকি উনচল্লিশজন মেয়ে ফুরনে কাজ করে। মেয়েদের কাজের তত্ত্বধান করার জন্য সুমিত্রা নামে একটি মেয়ের মাসিক বেতন দুশো টাকা। ছেলেরা কাজ করে দিন-মজুরিতে।

মেয়েদের কাজ হল সুতো ও নাইলন থেকে নোংরা বাছাই করে বঁটির সাহায্যে সেইসব সুতো শাকের মতো কুচিয়ে কাটা, সুতোর গুণাগুণ বিচার করে সর্টিং করা। আর ছেলেদের কাজ হচ্ছে সেইসব কুচনো সুতো সাবানজল ও কেমিক্যালের সাহায্যে বড় বড় চৌবাচ্চার মধ্যে দুপা দিয়ে চেপে চেপে পরিষ্কার করে, ধুয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া। সেইসব শুকনো সুতোকে আবার প্যাকিং করে লরিতে চাপিয়ে পাঠানো হয় নির্ধারিত বড় বড় সুতাকলগুলিতে। এগুলো দিয়ে তৈরি হয় সাধারণ রাফ কম্বল। মিলগুলির সঙ্গে কোম্পানির মালিকের চুক্তির ভিত্তিতে এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। কোম্পানির বয়স মাত্র দু বছর। এই অল্প সময়েই কোম্পানির লাভের অঙ্ক বেশ ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। কোম্পানি বহরেও বেড়েছে।

মালিক বর্তমানে ঐ অঞ্চলে আর্য সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। আপিস ঘরের এককোণে রয়েছে কবিরাজি ও নানা টোটকা ওষুধের ডিসপেনসারি। সন্ধ্যে সাতটার পর দু ঘণ্টা ঐ অঞ্চলের গরিব দুঃখীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ করা হয়। এই দাতব্য চিকিৎসালয়টি চলে ঐ অঞ্চলের নামকরা বড় বড় লোকেদের মোটা চাঁদা ও নানারকম প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায়। সপ্তাহে দু-তিন দিন বিভিন্ন ডাক্তার এসে রুগী দেখে চিকিৎসার বিধি দিয়ে যান—তাঁদের লাভের অঙ্কও কম

না। এর সঙ্গে রয়েছে যোগ ব্যায়াম আর যৌন সংযমের শিক্ষার নানা পুস্তিকা।

মেয়েদের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য একটি বাইশ-তেইশ বছরের সুন্দরী অবিবাহিতা মেয়ে সুমিত্রা কর্মকারকে মালিক মাসিক দুশো টাকা বেতন দিয়ে বহাল করেছেন। সুমিত্রার কাজের সময় সকাল ন-টা থেকে রাত্রি সাতটা। সাতটার পর আরও দু ঘণ্টা সুমিত্রাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে বেগার খাটতে হয়। অবশ্য তার জন্য সুমিত্রা কোনো আলাদা পারিশ্রমিক পায় না।

সুমিত্রার বাড়ি বারাসতে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাস বা ট্রেনে চড়ে রওনা দেয়। সারাদিন কোম্পানির কাজ করে, সাতটার পর আরও দু-ঘণ্টা দাতব্য চিকিৎসালয়ে কাটিয়ে শেষ বাস বা ট্রেনে বাড়ি ফেরে। সুমিত্রারা চার ভাই বোন, অসুস্থ বৃদ্ধা মা—এই পাঁচজনের সংসার সুমিত্রার আয়ের ওপরে নির্ভরশীল। ভাইটি স্কুল ফাইনাল পড়ছে। দিদি বিধবা, সংসারের কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। অবিবাহিতা ছোট বোন কয়েকটি প্রাইভেট টুইশানি করে মাস গেলে পায় চল্লিশটা টাকা। সর্বসাকুল্যে এই দুশো চল্লিশ টাকা কোনোরকমে নুনভাত জোটে। থাকে রেফিউজি ক্যাম্পে—বাড়িভাড়া লাগে না। সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনির পর বেগার দু ঘণ্টা কাজ বাধ্য হয়ে করে সুমিত্রা। এমন অনেকদিন হয়েছে কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার শেষ বাসটিও ধরতে পারে নি। তখন সুমিত্রাকে কলকাতায় আত্মীয় বা সামান্য চেনাজানা লোকের বাড়িতে রাত কাটাতে হয়েছে। কতদিন রাতে খাওয়াও জোটেনি। দাতব্য চিকিৎসালয়ে খাতায় রুগীদের নাম লেখা থেকে শুরু করে ওষুধ তৈরি, বিলি-ব্যবস্থা, ডাক্তারকে সাহায্য করা—যাবতীয় কাজ সুমিত্রাকেই করতে হয়। মালিক সুমিত্রার কাজে খুব খুশি। তাই সুমিত্রাকে মাসে দুশো টাকা আর বছরে ন দিন স বেতন ছুটি মঞ্জুর করেছেন। সুমিত্রা দেখতে শুনতে ভালো। কিছুটা লেখাপড়াও জানে। মালিককে খুশি রাখার জন্য সুমিত্রাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় দেহটা আর চলতে চাইছে না। যন্ত্রের মতো কাজ করতে করতে শরীরটা বুঝি অকালেই বিকল হয়ে যাবে। কিন্তু এ সব নিয়ে ভাবনা করাটাও তো বিলাসিতা। অত সময় কই সুমিত্রার। মন থেকে এ সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দেয়। সে জানে যতদিন পারবে এ ভাবেই তাকে কাজ করে যেতে হবে।

দোতলা থেকে নিচে নেমে এলাম, বাকি সব মেয়েরা সেখানে কাজ করছে। মেঝেতে নানা রকমের সুতো টাল হয়ে পড়ে আছে। একদল মেয়ে সুতোগুলো থেকে নোংরা পরিষ্কার করে নাইলনের ছাঁটগুলি বাছাই করছে। আর-একদল মেয়ে গোছা-গোছা নাইলন আর সুতোর ছাঁট তরকারি কাটার বঁটি দিয়ে কুচি কুচি করে কাটছে। হাতের কোনো বিরাম নেই। যে-ঘরে বসে কাজ করছে তার চারদিকের দেয়াল টিন দিয়ে ঘেরা। ঘরের মধ্যে আলো বাতাস খেলে না। তার মধ্যে বসে কাজ করছে সকাল নটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত। ঘরের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ঝুলে রয়েছে চল্লিশ পাওয়ারের বাতি। নোংরা ধুলো আর কুচি করে কাটা ছাঁটের রেণু মিলেমিশে ঘরের হাওয়া ভারি করে অস্বাস্থ্যকর করে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে ঢুকলেই দম বন্ধ হয়ে আসে। এতগুলো মেয়ে এরই মধ্যে বসে সারাদিন কাজ করছে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুস টেনে নিচ্ছে ধুলো আর ছাঁটের রেণু। ফলে কালরোগ হয়। তারপর রক্তবমি। কোনোরকম প্রতিষেধক তো দূরের কথা সাধারণ কাপড়ের মাস্কও দেওয়া হয় না। অসুখ হলে চাকরি যায়। কতজন মরে কেই-বা তার হিসেব রাখছে ?

যারা সুতো ও নাইলনের ছাঁট ও বাছাই কাটার কাজ করে—প্রতি কিলোতে তারা পায় ৪০ পয়সা মজুরি। দিনে চার-পাঁচ কিলোর বেশি কাজ হয় না। ফুরনের কাজ। বেশি কাজ করলে মজুরিও বেশি পাবে। কিন্তু বেশি কাজ করা সম্ভব হয় না।

ছেলেদের দিনে গড় আয় হচ্ছে ১০ টাকা। কাজের সময় একই। ছেলে শ্রমিকদের কাজের কিছুটা নিরাপত্তা আছে। ছুটিছাটাও আছে। কিন্তু ফুরনে কাজের মেয়েদের কাজের কোনো নিরাপত্তা নেই। অসুস্থ হলেও ছুটি নেই। বেশিদিন কামাই হলে তার স্থান পূর্ণ করে অন্য আর-একজন। কারণ ভাত ছড়ালে তো কাকের অভাব হয় না। তাই অনেক মেয়েই অসুখ করলে চেপে রেখে কাজ করে যায়।

চাকরি যাওয়ার ভয়ে কোনো ইউনিয়নও করে নি এরা। আর সত্যি বলতে কি ইউনিয়ন গড়ে তোলার মতন তেমন কোনো যোগ্য লোকও নেই এদের।

মালিকের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে পরিতৃপ্তির হাসি। বিরাট এক বক্তৃতা দিয়ে দেন 'কাজই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, বড় করে। কষ্ট করলেই না কেষ্ট মেলে' বলে অট্টহাস্য করে ওঠেন।

ভদ্রলোকের সত্যিই কেষ্ট মিলেছে—কোম্পানি আরো বড় হয়েছে, আয় বেড়েছে। এমনকি কলকাতার বাইরের মিলগুলির সঙ্গেও চুক্তি হচ্ছে। পরিত্যক্ত সুতো ও নাইলনের ছাঁট থেকে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন কম্বল। আর অন্যান্য বস্ত্র।

আর সেই ঘরের বাতাস আরো ভারি হচ্ছে, আরো বিষাক্ত। তারই ভেতর বসে মেয়েরা কাজ করে—বাঁচার জন্য, কিন্তু বাঁচে না প্রায়ই।

ডারউইন ও মার্ক্স : ব্যক্তিগত সম্পর্ক

প্রমীলা মেহতা

তাঁদের জীবনের প্রধানতম গবেষণা কর্ম যখন করে যাচ্ছিলেন তখন ডারউইন ও মার্ক্স ইংলণ্ডে মাত্র বিশ মাইলের তফাতে থাকতেন। অথচ তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করেন নি, কখনো। মার্ক্স ও ডারউইনের যোগাযোগ নিয়ে নানা রকম গল্প-কথা অনেকদিন চালু ছিল। অত্যন্ত সম্প্রতি নতুন গবেষণায় এ-বিষয়ে প্রামাণিক কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। সেইসব তথ্যের ওপর নির্ভর করে কিছু ব্যাখ্যাও হয়ত মেলে।

বিয়াল্লিশ বছর বয়সের মার্ক্স তখন তাঁর মননকর্মের প্রায় শীর্ষে—ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার, শ্রেণী সংগ্রাম ও উদ্বৃত্ত মূল্যের, প্রধান সূত্রগুলো ততদিনে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ইংলণ্ডে বাস করছেন। সেই সময়ই বেরল ডারউইনের দি অরিজিন অব স্পিসিজ—১৮৬০ সালের ডিসেম্বরে। বেরবার এক বছর পরে মার্ক্স বইটি পড়েন। ১৮৬২ সালে তিনি আরেকবার 'অরিজিন' পড়েন। সে-বছর শরৎকালে জার্মান কমিউনিস্ট বন্ধু লিবনেখ্ত্-এর সঙ্গে তিনি টমাস হাক্সলের বক্তৃতা শোনেন—'অরিজিন'-এর ওপর। পরে লিবনেখ্ত্ লিখেছেন, 'ক-মাস আমরা ডারউইন ও তাঁর আবিষ্কারের বিরাট তাৎপর্য ছাড়া আর কিছু নিয়ে কথা বলি নি।'

এর পর বছর-পাঁচ মার্ক্স ডারউইনের তত্ত্বের প্রয়োগকে একটা পদ্ধতি (মেথড) হিশেবে ধরার চেষ্টা করে যান। আর সেই চেষ্টায় তিনি ডারউইনের সবগুলো সিদ্ধান্ত যাচাই করতে গিয়ে কখনো-কখনো কোনো-কোনো বিষয়ে ডারউইনের সমালোচকদের বক্তব্যও একটু-আধটু মানতে চান যেন। মার্ক্স আর এঙ্গেলসের ভেতর দু-তিনটি চিঠি লেখালেখিও চলে ব্যাপারটি নিয়ে। এঙ্গেলস অবিশ্যি ডারউইনকে সব বিষয়েই সমর্থন করে যান। ১৮৬৭ সেপ্টেম্বরে 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় অবিশ্যি চিঠিপত্রে উত্থাপিত নানা

প্রশ্নের আর দেখা মেলে না। নির্দিষ্ট কাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বিশেষ ধরনের হাতিয়ার তৈরির আধুনিক কায়দা 'ক্যাপিটাল'-এ আলোচনার অংশে মার্ক্স উদ্ভিদ ও প্রাণীদের স্বাভাবিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহারে ডারউইনের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। আবার, আরেকটি অংশে, হাতিয়ার আর যন্ত্রের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে পাদটীকায় মার্ক্স সরাসরি প্রস্তাব করেন যে প্রাণীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনে ডারউইনের আবিষ্কারের মতো মানুষের উৎপাদন-পদ্ধতিও ব্যাখ্যা করা যায়।

১৮৭২-এর দ্বিতীয় জার্মান ও ১৮৭৫-এর প্রথম ফরাসি সংস্করণে মার্কস অনেক রদবদল করেছিলেন—কিন্তু এই দুটি পাদটীকা বদলান নি। ডারউইন সম্পর্কে মার্ক্সের এটাই প্রকাশ্য ও চূড়ান্ত মত।

এই দুটো পাদটীকাতেই বোঝা যায়, জৈব-বিবর্তন বিষয়ে ডারউইনের 'পদ্ধতি' মানব-সমাজের বিবর্তন ব্যাখ্যায় গ্রহণের চাইতেও, মার্ক্স প্রাণীর বিবর্তন সম্পর্কে ডারউইনের মত আর মানব-সমাজের বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর নিজের মতকে পরস্পরের পরিপূরক ভাবছেন। আগের মতো তিনি আর 'স্বাভাবিক নির্বাচন'-কে (ন্যাচারাল সিলেকশন) শ্রেণী-সংগ্রামের 'ভিত্তি' বলে মনে করেন না। মানুষ আর জন্তু যেমন আলাদা, তেমনি জৈব ইতিহাস আর মানব ইতিহাসও আলাদা। এই উভয় ইতিহাসের কিছু মিল আছে বটে : দুটি ইতিহাসই একই সময়ে লেখা হয়েছে।

বস্তুত, ডারউইনের বই বের হওয়ার পরই সমাজ ইতিহাসে ডারউইনের সূত্র প্রয়োগের হিড়িক পড়ে যায় ও মার্ক্স তাতে প্রায়ই বিরক্ত হতে থাকেন। মেয়ার, বুকনার ও ল্যাঙ্গ—এই তিনজন লেখকের বই ও রচনা বিষয়ে নানা মন্তব্যে তাঁর এই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। ১৮৭০-এ ফ্রিয়েডরিখ এ. ল্যাঙ্গ-এর একটি বই সম্পর্কে মার্ক্স বলেন যে মানব ইতিহাসে ডারউইন-পদ্ধতিকে ল্যাঙ্গ একটি মাত্র 'বাক্য'-তে পরিণত করেছেন, 'জীবন সংগ্রাম' (স্ট্রাগল ফর লাইফ) আর এই বাক্যটির গভীরে আছে ম্যালথাসের 'জনবৃদ্ধির তত্ত্ব।' ডারউইনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে এ-রকম অপব্যবহারেই মার্ক্সের আপত্তি।

কয়েক বছর পর, ১৮৭৩-এর বসন্তকালে 'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণের একটি কপি মার্ক্স ডারউইনকে পাঠালেন। সঙ্গে একটি চিঠি আর বইটিতে লেখা দুটি লাইন। চিঠিটি পাওয়া যায় নি—বইটি পাওয়া গেছে। মার্ক্স লিখছেন,

মিঃ চার্লস ডারউইন / তাঁর একান্ত অনুরাগী / (স্বাক্ষর) কার্ল মার্ক্স / লণ্ডন ১৬ জুন ১৮৭৩ / (নম্বর অবোধ্য) মডেনা ভিলাস / মেইটল্যাণ্ড পার্ক।

১৮৭৩-এর জুনে মার্ক্স থাকতেন ১ নম্বর মডেনা ভিলাসে। মার্ক্সের চাইতে ডারউইন ন বছরের বড়। তাঁর বয়স তখন চৌষট্টি, কেন্টের ডাউন গ্রামের বাড়িতে সপরিবার থাকেন। বিশ্রাম আর কাজ, কাজ আর বিশ্রাম এই অত্যন্ত কড়া রুটিনে তাঁর দিন বাঁধা। তত্ত্ব আর তর্কের লেখা ছেড়ে, তখন তাঁর প্রধান কাজ বোটানিতে। জুনের মাঝামাঝি থেকে তিনি ড্রসেরা-গাছের হজম প্রণালী নিয়ে মগ্ন। তখন নিয়ম করে নিয়েছেন, সময় বাঁচাবার জন্য তিনি বইয়ের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন—কিন্তু প্যাম্পলেটের নয়।

কয়েকমাস পর, ১ অক্টোবর, ১৮৭৩-এ কেন্টের ডাউন থেকে তিনি মার্ক্সকে এই চিঠি লেখেন,

ডিয়ার স্যার,

ক্যাপিটালের ওপর আপনার মহৎ বইটি পাঠিয়ে আমাকে যে-সম্মান দেখিয়েছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ; আর, পলিটিক্যাল ইকনমির মতো গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমি যদি আরো বুঝতে পারতাম তাহলে আপনার উপহারের যোগ্য হতে পারতাম। আমাদের উভয়ের বিষয় এত পৃথক হওয়া সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস আমরা উভয়েই জ্ঞানের বিস্তার কামনা করি এবং শেষ পর্যন্ত তা মানবজাতির সুখের কারণ হবে।

আই রিমেইন ডিয়ার স্যার
ইয়োর্স ফেইথফুলি
চার্লস ডারউইন

ডারউইনের কপি 'ক্যাপিটাল'-এর মাত্র ১০৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাতা কাটা—বাকি পাতা কাটা নেই। বইটির কোথাও পেনসিলের দাগ নেই—পড়ার সময় দাগানো ডারউনের অভ্যেস ছিল। বোঝাই যায়, ডারউইন 'ক্যাপিটাল' পড়ার চেষ্টা করেন নি।

এর পরের সাত বছর ডারউইন আর মার্ক্সের ভেতর সংযোগের কোনো সাক্ষ্য নেই। ডারউইন ব্যস্ত তাঁর উদ্ভিদ-গবেষণায়। ১৮৭৯ সালে খুব বিরক্ত-ভাবে তিনি মন্তব্য করেন, সমাজতন্ত্র আর 'স্বাভাবিক নির্বাচন'-এর মাধ্যমে বিবর্তনের ভেতর সম্বন্ধ নিয়ে জার্মানিতে নির্বোধের মতো কিছু ধারণা প্রচলিত

আছে।' সমাজ-ইতিহাসে ডারউইন-পদ্ধতির নির্বিচার প্রয়োগেই ডারউইনের এই উষ্মা। মার্ক্স ত এই নিয়ে ১৮৭০-এই লিখেছেন। ১৮৭৯ সালের এই মন্তব্যের পর ডারউইনকে মার্ক্স একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির কোনো কপি পাওয়া যায় নি।

১৮৮০ সালের ১৩ অক্টোবর, ডারউইন কেন্টের ডাউন থেকে চিঠিটির জবাব দেন।

ডিয়ার স্যার

আপনার চিঠি ও সঙ্গের 'এনক্লোজার'টির জন্য ধন্যবাদ। আমার রচনাদি বিষয়ে আপনার কোনো প্রকার মতামত প্রকাশে আমার কোনো অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না আর যার প্রয়োজনই নেই তার অনুমতিদান হাস্যকর। বইটির কোনো অংশ বা খণ্ড আমাকে উৎসর্গ করা হোক এটা আমি চাই না, কারণ তাতে, যে-বিষয়ে আমি কিছু জানি না সে-বিষয়ে প্রকাশিত পুস্তক সম্পর্কে আমার কিঞ্চিৎ সমর্থন সূচিত হয়—যদিও এই সম্মানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। পরন্তু, সমস্ত বিষয়ে চিন্তার স্বাধীনতার আমি একজন প্রবল সমর্থক, তবু আমার মনে হয় (ঠিক ভাবে বা ভুলভাবে) খ্রীষ্টানধর্ম ও আস্তিকতার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুক্তিতর্কে জনসাধারণের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না। বিজ্ঞানের ক্রমাগ্রসরণে জনসাধারণের চিত্তে ধীর আলোক সম্পাতেই চিন্তার স্বাধীনতা অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়। এই কারণে ধর্ম সম্পর্কে কোনো লেখা থেকে বিরত থাকা আমার বরাবরই উদ্দেশ্য এবং আমি বিজ্ঞানের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছি। আমি যদি কোনোভাবে ধর্মের ওপর কোনো আক্রমণে কোনো সাহায্য করি তা আমার পরিবারের কয়েকজনকে যে-ব্যথা দেবে, তার দ্বারা আমি এ-বিষয়ে অকারণে প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারি। আপনার কোনো অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের জন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু আমি বৃদ্ধ, আমার শক্তি স্বল্প আর প্রুফ-দেখা (আমার বর্তমান অভিজ্ঞতার ফলে জানছি) আমাকে খুব ক্লান্ত করছে।

আই রিমেইন ডিয়ার স্যার

ইয়র্স ফেইথফুলি

মার্ক্স তাঁর চিঠিতে কি লিখেছিলেন, এই নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে। কেউ মনে করেন, মার্ক্স ক্যাপিটালের ইংরেজি সংস্করণ ডারউইনকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন, সঙ্গের 'এনক্লোজার'টি হয়ত ক্যাপিটালে ডারউইন-সম্পর্কিত দ্বিতীয় পাদটীকার ইংরেজি অনুবাদ। আবার, কেউ মনে করেন, ক্যাপিটালে যেখানে মার্ক্স ডারউইনিজম নিয়ে লিখেছেন তার ফরাসি অনুবাদটিই ডারউইনকে 'এনক্লোজার'টিতে পাঠিয়েছিলেন। যা হোক, এর পর ডারউইনের সঙ্গে মার্ক্সের সংযোগের আর-কোনো সাক্ষ্য নেই।

১৮৮২ সালের ১৯ এপ্রিল ডারউইন মারা যান। ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ মারা যান মার্ক্স। লণ্ডনের হাইগেট সমাধি ক্ষেত্রে মার্ক্সের অন্ত্যেষ্টিভাষণে এঙ্গেলস বলেন, 'ডারউইন যেমন জৈব জগতের বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন, তেমান, মার্ক্স মানব ইতিহাসের বিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কার করেন।' সেই অন্ত্যেষ্টিতে উপস্থিত ছিলেন এডোয়ার্ড অ্যাভেলিং—তিনি ডারউইন আর মার্ক্স দু-জনেরই পরিচিত ছিলেন। পরে, তিনি মার্ক্স-কন্যা এলিনরের সঙ্গে বাসকালে ক্যাপিটালের ইংরেজি অনুবাদে সাহায্য করেন ও ডারউইনবাদ ও মার্ক্সবাদ নিয়ে প্রবন্ধাবলি লিখে যান। ১৮৯৭ সালে অ্যাভেলিং, এঙ্গেলসের সূত্র ধরেই বলেন, তাঁর 'চার্লস ডারউইন এবং কার্ল মার্ক্স' প্রবন্ধে, মার্ক্সবাদ ও ডারউইনবাদের ভেতর কোনো বিরোধিতাই নেই—'বিবর্তনের শৃঙ্খলার পরিণতিই সমাজতন্ত্র আর তার প্রবলতম বৈজ্ঞানিক সমর্থন মেলে ডারউইনের শিক্ষাতেই।'

মার্ক্স আর ডারউইনের সম্পর্কের নতুন ইতিহাস এখান থেকে শুরু।

সূত্র: জার্নাল অব দি হিস্টরি অব আইডিয়াজ, এপ্রিল-জুন, ১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত র‍্যালফ কলপ-এর প্রবন্ধ।

কাপিতসা ও নোবেল পুরস্কার

এ বছর পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন সোভিয়েট বিজ্ঞানী পিটার কাপিতসা। নিম্ন তাপমাত্রার পদার্থবিদ্যায় যে মৌলিক কাজের জন্যে তাঁকে এই বহুবিলম্বিত পুরস্কার দেয়া হল, তা তিনি শুরু করেছিলেন আজ থেকে চল্লিশ বছরেরও আগে। আরো বিচিত্র ব্যাপার হল, পুরস্কারের অর্ধাংশ দেয়া হয়েছে কাপিতসাকে, বাকি অর্ধাংশ দুজন অ্যামেরিকান বিজ্ঞানীকে। বিজ্ঞান-জগতে এমন একটি অসামান্য নাম হলেন কাপিতসা যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিলে মানুষটির চেয়ে অনেক বেশি সম্মানিত হয় পুরস্কারটাই।

নোবেল পুরস্কারের গোটা ব্যাপারটাই অনেকদিন থেকে নানাভাবে যথেষ্ট বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু রাজনৈতিক কারণে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান নি জে. বি. এস হলডেন ও জে, ডি, বার্ণাল, সাহিত্যে পান নি ম্যাকসিম গর্কী এবং কোন এক রহস্যজনক কারণে লিও তলস্তয়। চীনের সাধারণ গরীব মানুষের জীবনের বিকৃত রূপায়ণের জন্যে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হল পার্ল বাককে কিন্তু দেয়া হল না 'রিক্সাওয়ালার লেখক লাও চাও বা লু স্বনকে। এ বছর অর্থনীতি বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে যে ব্যক্তিকে, তাঁর ঐ বিষয়ে আদৌ কোনো গুরুত্বপূর্ণ অবদানই নেই আর শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের ব্যাপারটা একটা বিরাট প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়।

কাপিতসার বয়েস এখন চুরাশি। প্রায় এক রূপকথার জগতের মানুষ হলেন তিনি। তাঁর গোটা জীবনটাকে ঘিরেই এমন এক রহস্য আর রোমাঞ্চ। ১৯২১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন গৃহযুদ্ধে বিপর্যস্ত, যখন সরকারী বৃত্তি নিয়ে কাপিতসা এলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে, রাদারফোর্ডের নেতৃত্বে পরমাণুবিজ্ঞানের ভিতপ্রস্তরগুলো গড়ে উঠেছিল যেখানে। রাদারফোর্ডের ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন অ্যাসটন, ব্ল্যাকেট, বেথে, ককক্রফট, চ্যাডউইক, অলিফ্যাণ্ট, সিমিৎস্থ প্রভৃতি ভবিষ্যতের দিকপাল পরমাণু বিজ্ঞানীরা। কাপিতসা ছিলেন এই প্রতিভাবান গোষ্ঠীটির অবিসম্বাদিত নেতা। আবার রাদারফোর্ডের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রও তিনি।

কুড়িজনের মতো তরুণ বিজ্ঞানীদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল কাপিতসা ক্লাব। প্রতি সপ্তাহে একবার তার বৈঠক বসত। বৈঠকগুলোতে প্রায় ষাঁড়ের লড়াই চলত বলা যায়। প্রতি দু মিনিট অন্তর বক্তার ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ত। কাপিতসার শাণিত প্রশ্ন—যা বলছ তার কারণ কি, সেটা আরো বিশদভাবে বুঝিয়ে বল। কাপিতসা ক্লাবের সভ্য হওয়া বা সেখানে বলার সুযোগ পাওয়া ছিল তরুণ বিজ্ঞানীদের একটি পরম সম্মানজনক ব্যাপার।

নিজের কোনো সন্তানাদি না থাকায় রাদারফোর্ড তাঁর সমগ্র পিতৃস্নেহ ছাত্রদের ওপর উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন। যে একগুঁয়েমি এবং জেদের সঙ্গে কাপিতসা বিজ্ঞানের একটি জটিল সমস্যাকে আঁকড়ে ধরতেন, যে উদ্দাম গতি এবং স্বচ্ছন্দ সাবলীলতার সঙ্গে তিনি ঐ সমস্যা সমাধানের পেছনে ছুটে যেতেন এবং যেভাবে দিবারাত্র তিনি নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখতেন, তার জন্যে রাদারফোর্ড তাঁর এই ছাত্রটিকেই স্নেহ ও প্রশংসা করতেন সবচেয়ে বেশি। দু-জনের বয়সের তফাতটা পঁচিশ হলেও প্রায় সমকক্ষের মর্যাদা দিয়েছিলেন তিনি কাপিতসাকে।

গুরু রাদারফোর্ড সম্বন্ধে ছাত্ররা বলতেন 'প্রকৃতির এক উদ্দাম, বন্য শক্তির মতো হলেন রাদারফোর্ড। তাঁর সঙ্গে কারুর সম্পর্কই সাধারণ পর্যায়ের হতে পারে না, যেমন হতে পারে না প্রকৃতির কোনো শক্তির সঙ্গে।' কাপিতসা সম্পর্কে তাঁর সতীর্থদের মন্তব্যও ছিল একই। রাদারফোর্ডের অপরিসীম কর্মশক্তি এবং দুর্ধর্ষ বৈজ্ঞানিক কল্পনা—সবটাই পেয়েছিলেন কাপিতসা। বিদেশে পর্যটনরত রাদারফোর্ডকে কাপিতসা একটি চিঠিতে লিখেছেন—'একটি সর্ট-সার্কিট যন্ত্র এবং তারের কয়েল

আমরা তৈরি করেছি, যার মধ্যে ২৭০,০০০ ভোল্টের শক্তি তৈরির ব্যবস্থা রয়েছে। এই শক্তিটি তৈরি হচ্ছে এক সেন্টিমিটার ব্যাস এবং ৪/২ সেন্টি-মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি ক্ষেত্রের মধ্যে। আমরা এর বেশি আর অগ্রসর হতে পারি নি, কারণ এর পরেই তারের কুণ্ডলীটার মধ্যে একটা প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটল। শব্দটা আপনি শুনতে পেলে খুবই মজা পেতেন সন্দেহ নেই। যন্ত্রটার মধ্যে মোট শক্তি তৈরি হয়েছিল প্রায় ১৩৫০০ কিলোওয়াটের মতো কেম্বিজের বৈদ্যুতিক স্টেশনের মতো গোটা তিনেক স্টেশনের শক্তি হল এটা। সমস্ত পরীক্ষাকাজের মধ্যে দুর্ঘটনাটাই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার—১৩০০০ অ্যাম্পিয়ারের একটি বৈদ্যুতিক আর্কের চেহারাটা যে কতটা আকর্ষণীয় হতে পারে সেটা এখন আমরা জানতে পেরেছি বলা যায়।' কি বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে যে কাপিতসা পরীক্ষাকাজ করতেন, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

রাদারফোর্ড কাপিতসার হাই-ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক শক্তির পরীক্ষামূলক গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহের ব্যাপারে সবসময়ে ছিলেন সচেষ্ট। তারই নির্দেশে বিলেতের রয়্যাল সোসাইটি এবং সরকারী বিজ্ঞান ও কারিগরী গবেষণা-দপ্তর কাপিতসার কাজের জন্যে একটি বিশেষ গবেষণাগার তৈরি করে দেন। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সমবেত অতিথিবৃন্দ একটি দৃশ্য দেখে চমকিত হলেন। দৃশ্যটি হল—গবেষণাগারের সদর দরজার ওপর পাথরে খোদাই করা কুমীরের একটি প্রতিকৃতি। কাপিতসার বিশেষ অনুরোধে প্রখ্যাত ইংরেজ ভাস্কর এরিখ গিল ঐটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। ঐ কদাকার জমিটির প্রতিকৃতি ওখানে কেন বসানো হল, তার জবাবে কাপিতসা বলেছিলেন—'আমার বিজ্ঞানটা হল কুমীরেরই মত। কুমীর তার মাথা ঘোরাতে পারে না। বিশাল চোয়ালটা নিয়ে এ যেমন ক্রমাগত সামনের দিকে তেড়ে যায়, আমার বিজ্ঞানের কাজটাও হল তাই।' ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে একমাত্র রাদারফোর্ড ছাড়া আর সকলেই জানতেন যে কাপিতসা গুরু রাদারফোর্ডেরই ছদ্মনাম রেখেছিলেন—'কুমীর'।

কাপিতসা তাঁর জন্যে তৈরি নতুন গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ কিন্তু গোড়ায় পান নি। ১৯৩৪ সালে কাপিতসা যখন সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদে তাঁর সভ্যপদ প্রাপ্তির অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেশে এলেন, তখন তাঁকে বলা হল—সোভিয়েট ইউনিয়নে পরমাণুবিজ্ঞানের গবেষণায় নেতৃত্ব দেবার

জন্যে তাঁর এখন দেশে থাকাটাই প্রয়োজন, বিশেষ করে হিটলার এবং 'নাজি' জার্মানির বিপদ যখন ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। কাপিতসার আর তাই কেম্ব্রিজে ফেরা হল না। রাদারফোর্ড বারবার সোভিয়েত সরকারের কাছে অনুরোধ জানালেন বিজ্ঞানের মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যেই কাপিতসার জন্যে তৈরি গবেষণাগারে কাজের জন্যে তাঁকে ফিরে আসতে দেয়া উচিত। সোভিয়েত সরকার জবাবে লিখলেন—'কাপিতসাকে যে ইংল্যাণ্ডের বিশেষভাবে প্রয়োজন, তা আমরা বুঝতে পারছি। আমরাও জানাতে চাই, রাদারফোর্ডকে সোভিয়েট ইউনিয়নে পেলে আমরা খুবই খুশি হব।'

কাপিতসাকে কেম্ব্রিজে ফিরিয়ে আনার সরকারি এবং বেসরকারি সমস্ত প্রচেষ্টাই যখন ব্যর্থ হল, তখন রাদারফোর্ড একটি অসাধারণ কাজ করে বসলেন। তিনি কেম্ব্রিজে কাপিতসার জন্যে তৈরি সমগ্র গবেষণাগার-টিকেই মস্কোতে তাঁর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। ইংরেজ বিজ্ঞানী অ্যাড্রিয়ান এবং ডিরাকের ওপর এই কাজের দায়িত্ব দেয়া হল। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার এ হল যেমন একটি অসাধারণ নিদর্শন, তেমনি তাঁর পরমপ্রিয় ভূতপূর্ব ছাত্রের প্রতি রাদারফোর্ডের অপরিসীম স্নেহের দাক্ষিণ্যও এর মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। কাপিতসা রাদারফোর্ডকে লিখলেন—'ভাগ্যরূপী নদীর প্রবাহে আমরা সবাই হলাম ভাসমান ক্ষুদ্র বস্তুকণার মত। নিজের নিজের গতিপথে সামান্য অদলবদল ঘটিয়ে কোনরকমভাবে ভেসে থাকার ব্যবস্থাটাই আমরা করতে পারি—আমরা সবসময়ে পরিচালিত হচ্ছি নদীর প্রবাহের দ্বারাই।'

সোভিয়েত গভর্ণমেণ্ট কাপিতসার মনস্তুষ্টির জন্যে রাদারফোর্ডের পাঠানো গবেষণাগারটির সমগ্র ব্যয় প্রায় ৩০০০০ পাউণ্ড যেমন ইংরেজ সরকারকে দেবার ব্যবস্থা করলেন, তেমনি কাপিতসার কাজের জন্যে গড়ে দিলেন একটি বিশাল বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার—ইনস্টিট্যুট অব ফিজিক্যাল প্রবলেমস।

কাপিতসা চলে আসার পর ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারের অসাধারণ প্রতিভাবান গবেষক দলটির মধ্যে ভাঙন দেখা দিল। ভাঙন দেখা দিল রাদারফোর্ডের অমিত স্বাস্থ্যের প্রাকারের মধ্যেও। এর পরে আর খুব বেশিদিন তিনি বেঁচেও ছিলেন না। সব মিলিয়ে যেন এক বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অঙ্কের অভিনয়ের পালা শুরু হল।

শোনা যায়, কাপিতসা নাকি পরমাণু বোমা তৈরির পক্ষপাতী ছিলেন না। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের প্রবক্তাই ছিলেন তিনি। এ নিয়ে

স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর নাকি প্রচণ্ড মতবিরোধ হয়। নিম্ন তাপমাত্রার পদার্থবিদ্যায় গবেষণা শুরু করলেন কাপিতসা মস্কোতে, এক প্রতিভাবান বিজ্ঞানী গোষ্ঠীও তাঁর ছত্রছায়ায় গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে রাদারফোর্ড ও কাপিতসার গুরু-শিষ্য সংবাদ বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরদিন এক অমর অধ্যায়রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

শঙ্কর চক্রবর্তী

খড়ির গণ্ডি : প্রযোজনা 'নান্দীকার'। রূপান্তর, নির্দেশনা—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। আলোচ্য অভিনয় রজনী—অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস মঞ্চ। ২ নভেম্বর, ১৯৭৮।

বার্টোল্ট ব্রেশ্‌টকে ধুতিপাঞ্জাবিতে বাঙালি সাজাবার প্রয়াস কলকাতার থিয়েটারে তো বেশ পুরনো হয়ে এলো। অন্তত এটুকু বলা যায়, নাটক থিয়েটারে কৌতূহলী সাধারণ বাঙালির কাছেও 'বার্টোল্ট ব্রেশ্‌ট' নামটা খুব দুরূহ বিদেশী শব্দ নয়।

ভারি অদ্ভুত লাগে, যখন দেখি. আমাদের এই অতি তীব্র ব্রেশ্‌ট উৎসাহে কলকাতার তিনটি নাট্যগোষ্ঠী একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন আদলে একই নাটক নিয়ে হলেন দর্শকসন্নিধানে। এতে সুবিধে নেই কিছু, অসুবিধাই বেশি। কিন্তু পিছিয়ে যান নি কেউ। আত্মবিশ্বাসে স্থিরচিত্ত তিনটি দলই নিজস্ব ভঙ্গিতে অভিনয় করে যাচ্ছেন নিয়মিত। তুল্যমূল্য বিচারটা গৌণ রেখেই দর্শক হিসেবে আমাদের প্রশ্ন—ঘটনাটা কি নিতান্তই আকস্মিক? নাকি 'ককেসিয়ান চক সার্কল' নাটকটাই এমন কিছু, যা আমাদের সমকালের বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে, আমাদের বেঁচে-থাকার যন্ত্রণাবেদনা অথবা ভোঁতা বুদ্ধিগুলি কোথাও স্বচ্ছন্দ মুক্তি খুঁজে পায়! অর্থাৎ যার দেশজকৃতি এমন কিছু সত্য উদ্‌ঘাটন করে, বিদেশজাত হয়েও যা আমাদেরও স্বদেশ জিজ্ঞাসা।

উৎপাদনের ভোগস্বত্ব কোথায় বর্তায়—জন্মে না কর্মে? মালিকানা শব্দটা একবচনাত্মক অথবা বহুবচন? অর্থনীতির এক মৌলিক প্রশ্নে গত শতাধিক বর্ষব্যাপী পৃথিবীর সমস্ত রাজনীতি সমাজব্যবস্থা তোলপাড়, অজস্র রক্তপাতে নতুন ইতিহাস তৈরি হয়েছে দেশে দেশে, বিশ্বমানচিত্র দ্বিখণ্ডিত আজ। স্বাধীনতার ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্তির পর আজও যখন ভারতবর্ষে কৃষি-অর্থ-

নীতিই জাতীয় উন্নয়নের মৌলশক্তি অথবা অন্তরায়, কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশ যখন এখনও ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, নিগৃহীত হরিজন, মাত্র একষট্টি পয়সা দৈনিক আয়ের নিরক্ষর গ্রামবাসী, তাদেরই ভোটে নির্মিত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপার মহিমা। 'হাল যার জমি তার' যেখানে শুধুই আওয়াজ, ভূমিসংস্কার শুধুমাত্র নির্বাচনী-প্রতিশ্রুতি, বর্গাদার উচ্ছেদরহিত আইন শুধু কাগজে কলমেই লেখা থাকে শহরের হিমঘরে, যেদেশে গরিবি হটে না, গরিবই হটে যায়—সেখানে বড় বেশি প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে উপস্থিত হয় ব্রেশ্‌ট-এর এ নাটক। অঙ্গীকারবদ্ধ শিল্পীর কাছে বড় আপন হয়ে ওঠেন নাট্যকার, তাঁকে আরও বেশি আপন করে দিতে ইচ্ছে জাগে দেশের মানুষের কাছে। ভাষান্তর বা রূপান্তর ঘটে বাংলায়। একই সঙ্গে তিন মঞ্চে।

কিন্তু এ-নাটকের রূপান্তরও এক দুরূহ কর্ম। নাটকটির একটি মুখবন্ধ আছে এবং একটি পরিশেষাংশ, মধ্যবর্তী কাহিনী মধ্যযুগীয় পটভূমিকায় রচিত একটি পালা। বলা যেতে পারে, মুখবন্ধটিই নাটকের মূল বক্তব্যকে বহন করছে, পালাটি তার চিত্ররূপ মাত্র। পশ্চিমী দুনিয়ায় অনেক প্রযোজকই মুখবন্ধটি বাদ দিয়ে নাটকটি অভিনয় করেছেন। সেসব প্রযোজনার ইতিবৃত্ত আমরা জানি না। তবে প্রশ্ন জাগে, মৌল জিজ্ঞাসাকে পরিহার করে শুধুমাত্র পালাটুকুর (যা শেষ পর্যন্ত এক মজাদার গল্পমাত্র) উপস্থাপনা নাটকটির কি তাৎপর্য বহন করে? যে ব্রেশ্‌ট সাহেব নিজেই তার প্রকাশককে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন—Your dislike of the prologue puzzles me somewhat, it was the first bit of tne play to be written by me in the States. Take away the prologue and it is impossible to understand on the one hand why it was not left as the Chinese chalk circle and on the other why it should be called Caucasian.

'খড়ির গণ্ডি' রূপান্তরে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত হয়তো সে কারণেই মুখবন্ধটি একান্তভাবে আবশ্যিক মনে করেছেন। ব্রেশ্‌ট সংক্রান্ত অ্যাকাডেমিক আলোচনায় উৎসাহী ভদ্রজনেরা রীতিমতো উত্তেজিত হবেন জেনেও কিছুটা স্বেচ্ছাচারী। মূল নাট্যকারের প্রতি আনুগত্যবিহীন নান্দীপাঠে একমাত্র বক্তব্যবিষয়টুকু ছাড়া ঘটনাবিন্যাসে মূলের সঙ্গে কোথাও সঙ্গতি নেই। মূল নাটকের মুখবন্ধ নির্মিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের যৌথ খামার-

কর্মীদের বিরোধের পটভূমিকায়। সেখানে দ্বন্দ্ব আছে; বৈরিতা নেই। কিন্তু আমাদের এই ব্যক্তিগত মালিকানার দেশে জমির মালিকের সঙ্গে হলধর চাষির সম্পর্কটা লাঠালাঠি খুনোখুনি ঘৃণা অবজ্ঞার। হিটলারের নাজিবাহিনীকে প্রতিরোধ করে তাদের যে-অহঙ্কার, ফলের ক্ষেতে জলসিঞ্চনে যে-গৌরববোধ, মালিকমহাজন-লাঞ্ছিত আমাদের কৃষিজীবীদের কাছে সেটা স্বপ্ন। বামপন্থী আন্দোলনের অজস্র রক্তপাতে আমরা সে-স্বপ্নকে সর্বজনীন করে তুলতে পারিনি আজও। অথচ এ-নাট্যপ্রযোজনার একমাত্র অর্থ হতে পারে, এই স্বপ্নে এই সচেতনতার গভীরে মানুষকে পৌঁছে দেওয়া, যেখানে মূলত কৃষক সত্তার ভিতটাই পাকাপোক্ত হয়। রুদ্রপ্রসাদ তাই নিজের মতো করেই গড়ে তুলেছেন তার মুখবন্ধের কাঠামো। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে ধানের চেয়ে মাছের চাষকেই যারা মুনাফার অঙ্কে শ্রেয় মনে করে এমনি এক মালিকের সঙ্গে কৃষকদের বিরোধে তৈরি হয়েছে, 'খড়ির গণ্ডি-র প্রথম ভাগ। ধানক্ষেতে লোকজন ঢুকিয়ে যারা উর্বরা মাটিকে নিষ্ফলা করল এবং যারা প্রাণপাতে সেই পতিত জমিকে উদ্ধার করে ফসল তুলল ঘরে, তখনই প্রশ্ন—এ স্বর্ণসম্পদ কার? জন্মসূত্রে প্রাপ্ত মালিকানার অথবা অসাধ্যসাধনকারী ঘর্মসিক্ত সৃজনশক্তির! প্রারম্ভিক ভূমিকার গণবিক্ষোভ এক সূক্ষ্মসূত্রে গ্রথিত হয়ে যায় মূল পালার সঙ্গে, যখন ভূস্বামীর ভাড়াটে লেঠেলের প্রতি টগরের তীব্র ভর্ৎসনা একই সংলাপে পুনরুচ্চারিত হয় রাষ্ট্রশক্তি সুলতানের ভাড়াটে কাজির উদ্দেশ্যে লুৎফার (একই অভিনেত্রী) সুতীক্ষ্ণ তিরস্কারে—'তুমি একটা রাস্তার কুকুর। তোমার মা কি জন্মের সময় জানত, দুটো টাকার জন্যে তুমি ভাই-এর মাথার টুটি টিপে ধরবে…ইত্যাদি।' (যদিও বিচারের দৃশ্যে লুৎফার বেশভূষাও সবুজ ঘাগরায় টগর হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল)।

এর পর মূল পালার রূপান্তর প্রসঙ্গ। এক্ষেত্রে আরও বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন রুদ্রপ্রসাদ। মধ্যযুগীয় এক জীর্ণ উপকথার বাঙালিকরণে তিনি অনায়াসে চলে গেছেন বাংলার নবাবি আমলে যেখানে অরাজক রাষ্ট্রব্যবস্থার মাৎস্যন্যায় আমাদের ইতিহাসের দগদগে স্মৃতি, দামুন্যার উদ্বাস্তু মুকুন্দরাম পথে পথে ঘুরেছেন, বারোমাস্যা গাইতেন সহস্র ফুল্লরা, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারপ্রহসন যেখানে লোকপ্রবচনে দাঁড়িয়ে যায় 'কাজির বিচার'। 'আজদাক' তাই মুস্তাক হয়ে বিশ্বস্ততার জমি খুঁজে পেয়ে যায় অতি সহজেই। অনেক মুস্তাক অসংখ্য রাজা গণেশকে সহ্য করেই,

আমাদের মধ্যযুগ। 'খড়ির গণ্ডি' তাই কোনো বিশেষ দেশকালের গণ্ডিতে সুনির্দিষ্ট নয়। মোটামুটিভাবে মধ্যযুগের বাংলাদেশ। ইতিহাস নয়, 'ঐতিহাসিক রসই' যেখানে প্রধান।

বিদেশী-আশ্রিত এ-জাতীয় নাট্য প্রযোজনায় একটা গোলমাল থেকেই যায়। গোলমালটা নির্দেশক এবং দর্শক, রসনিবেদন এবং রসাস্বাদনের সমগ্র প্রক্রিয়ার মধ্যেই। অনুস্থতি সত্ত্বেও প্রযোজনা কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলা নাটক, বাংলা থিয়েটার। মূল নাটকের পাঠক কতিপয় বিদ্বজ্জন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত, দৃশ্যের পর দৃশ্যে তারা মগজের সঙ্গে চোখকে মিলিয়ে যাচ্ছেন ঘনিষ্ঠ মনোযোগে। বিচ্যুতিতে ভ্রূকুঞ্চন। অথচ তারই পার্শ্ববর্তী আসনের ভদ্রমহিলা, এসেছেন অনেক ধকল সয়ে, তাঁর কাছে ব্রেশট নেই, অভিনীত নাটক সর্বাংগে, একেবারে শতকরা একশ ভাগই বাংলা থিয়েটার। প্রেক্ষাগৃহে, বলা বাহুল্য, তারাই সংখ্যাধিক হলে থিয়েটার বাঁচে। একই মঞ্চ থেকে দু-তরফের প্রীতিধন্য হওয়া অত্যন্ত কঠিন বলেই হয়তো ছাপার হরফ থেকে যত সরাসরি ব্রেশট এসে যাচ্ছেন আমাদের নাটকে, ব্রেশটীয় নাট্যশাস্ত্র সে-পরিমাণ অনুশীলিত হবার সুযোগ পাচ্ছে না বাংলা-মঞ্চে। যে-বিষন্নীকরণ বা অনন্বয়কে অনুভব না করে কিছু দর্শক পীড়িত, হয়তো সেখানেই সমাজবীক্ষার সঙ্গে কিছুটা মজা, কিছু পরিহাসের স্বাদে খুশিতে ভরে উঠছেন অন্যরা। 'খড়ির গণ্ডি'ও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে লক্ষণীয়, অন্তত একটি ক্ষেত্রে বাঙালিয়ানার সহজ আবেগকে অনেকটাই সচেতন ভাবেই প্রয়োগ করেছেন নির্দেশক রুদ্রপ্রসাদ। বিচারপ্রার্থী দরিদ্র বৃদ্ধাকে বিচারকের আসনে বসিয়ে যখন আবেগে ভেঙে পড়েন মুস্তাক, যুক্তি পারম্পর্যহীন মুস্তাকের আচরণে দৃশ্যটা বিসদৃশ নয় যদিও, প্রেক্ষাগৃহে রোমাঞ্চিত হতে দেখেছি কবিবন্ধুকে। ব্রেশ্‌ট মনন এবং বাঙালিমনের মেলবন্ধনের এই নিরীক্ষা কিছুটা ক্ষতিও করেছে অন্যত্র। কর্পোরেলের মাথায় ডাণ্ডা মেরে পালাবার সময় গায়কবৃন্দ এবং গ্রুসা গান গেয়েছে মূল নাটকে, যে গানের বাণীতে তার অসহায়ত্ব এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তাই স্পষ্ট। দীর্ঘ মঞ্চ জুড়ে লুৎফার গানে গানে ভেসে যাওয়ার দৃশ্যে সেই সঙ্কল্প গৌণ হয়ে ঘুম-পাড়ানি সুরে বাৎসল্যই প্রাধান্য পায় বেশি। ত্রুটিটা অভিনয়ের নয়, দৃশ্য পরিকল্পনারই কোথাও, যেখানে মনে হয়, প্রাণের টানে পলায়ন মুহূর্তে বিলম্বিত পদসঞ্চারে অলস-ভঙ্গির এ গান গাইবার সময় কোথায় লুৎফার; বরং সাঁকো পেরিয়ে নিজের নিরাপত্তা

বুঝে নেবার পর 'আল্লা মেঘ দে পানি দে…' অবাস্তব নয় (যদিও প্রশ্ন, মধ্যযুগে হালআমলের পরিচিত লোকসঙ্গীত কেন)। কনিষ্ক সেন কৃত আলোর কৌশলে অন্ধকার মঞ্চে লুৎফার পশ্চাদ্ধাবনে ফৌজীদের দৌড় এবং সাঁকো অতিক্রমের ঘটনা দৃশ্যত সত্যি সুন্দর। আলোয় অন্ধকারে মঞ্চের মোহিনীমায়া। আকণ্ঠ উদ্বেগে শিরদাঁড়ায় টান ধরিয়ে দেয় দর্শককে। 'বার্লিন আনসম্বল' দেখি নি। যতদূর জানি, এই রুদ্ধশ্বাস শিহরণেই নাকি ব্রেশটের আপত্তি।

অথচ ঢিলেঢালা সহজ 'আন্‌ইনভলভড' অভিনয়ের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন রুদ্রপ্রসাদ নিজেই—মুস্তাক চরিত্রে। অদ্ভুত এক পাগলা কাজি, দিনবদলের স্বপ্নে যতখানি উদ্বেল, বাস্তবতার ধাক্কায় কিছুমাত্র নিরাশ নয়, গরিব মানুষের উপকার করতে আগ্রহী, ঘুষের প্রতি লোভটা আছে। অস্থির নৈরাশ্যে যেন এমন মানুষ আমাদের সকলেরই পরিচিত। এত স্বচ্ছন্দ নাটকীয়তাবিহীন অভিনয়, নিস্পৃহতায় মজা উপভোগ করতে করতে খোঁচাগুলিও সামলে নেন দর্শক। বলা যায়, দ্বিতীয় অঙ্কের শুরু থেকেই মুস্তাকের সঙ্গে সঙ্গে গোটা নাটকটাই যেন এক তীব্র গতিবেগে প্রাণময়তায় ভরাট হয়ে ওঠে। তার মানে এই নয় যে, নাটকের প্রথম অঙ্ক দুর্বল। মূলত দুটি অঙ্কের মেজাজই আলাদা। মুস্তাকের লাফালাফি ঝাঁপাঝাপিতে যে-আবহাওয়া সৃষ্টি সম্ভব, লুৎফার বেদনাময় পথ পরিক্রমায় সেটা বড়ো বিলম্বিত, ধীরলয়ে শান্ত। 'নান্দীকার'কে আন্তরিক অভিনন্দন। স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন কৃতী অভিনেত্রীকে তারা নিয়ে এসেছেন বাংলা থিয়েটারে। লুৎফার চরিত্রাভিনয়ে নাটকের প্রথক অঙ্ককে পুরোপুরি ধরে রেখেছেন তিনি। শ্রেণীশত্রুর সন্তানকে বুকে চেপে লুৎফা রক্ষা করছে যাকে সে-ও তো মানবতারই প্রতীক। মহত্তর মানবিক মূল্যবোধেই প্রান্তর প্রান্তর জুড়ে সে দুঃখকে পেরোতে চায়, অসহায় অশিক্ষিত নারী নিজেও জানে না তার এত শ্রম এত দুঃসাহসের প্রেরণা কোথায়! প্রেমের দৃশ্যে ভীত সলজ্জ চতুরতা, দুঃখে সংকটে বিষাদ, আবার বিচারকক্ষে ক্রোধের বিস্ফোরণে আবরণহীন গ্রাম্যতা—পরতে পরতে নিজেকে ভেঙে, বারবার বদলে একটি সম্পূর্ণ চরিত্রে বিকশিত হয়ে ওঠা একজন জাত-অভিনেত্রীর পক্ষেই সম্ভব। বাংলা থিয়েটার স্বাতীলেখার কাছে আরও অনেক কিছু প্রত্যাশা করতে পারে। নান্দীকারের পুরনো অভিজ্ঞ শিল্পী পশুপতি বসু পুরো নাটকে অন্যূন চারটি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

কিঞ্চিত চিড়-খাওয়া দরাজ কণ্ঠস্বরে বিশিষ্ট পশুপতি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজের স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত।

ছোটবড়ো মাঝারি শতাধিক চরিত্রের সমাবেশে পৌনে তিন ঘণ্টার দীর্ঘ নাটকে একক অভিনয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা শুধু তাদেরই, নাট্যকার যাদের বিশিষ্ট করেছেন। মূলত সমবেত অভিনয়-সংহতি বা টিম্‌ওঅর্কই এ জাতীয় প্রযোজনার নিহিত শক্তি। অসংখ্য আনকোরা নতুন মুখের সমাবেশে 'খড়ির গণ্ডি' যে সংহত মূর্তি পেয়েছে সেখানেই 'নান্দীকার' গোষ্ঠীর বিশেষ গৌরব। তথাপি এরই মধ্যে কিছু অভিনয় সব ছাপিয়ে বিশেষভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ। বিশেষত 'রাজা গণেশ' অভি দাস, 'হাবিলদার সুলেমান' সুমৌলীন্দ্র আচার্য, 'গনসুর' বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী। বাংলা থিয়েটারের প্রথাসিদ্ধ ভিলেনকে কিছুটা ভিন্নভাবে রূপ দিতে চেয়েছেন অভি দাস এবং সুমৌলীন্দ্র আচার্য তার ইচ্ছাকৃত স্টাইলাইজ্‌ড দেহভঙ্গি বাকরীতি নিয়ে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন শুধু স্মার্ট অভিনয়গুণে।

ব্রেশ্‌টের নাটকে গান বিনোদন নয়, অঙ্গীভূত সম্পদ। 'থিয়েটারের গান' সম্বন্ধে বাঙালি দর্শকের যে আজন্মলালিত ধারণা, তাকে পুরোপুরি বরবাদ করেই গানকে ব্যবহার করতে হয় এ সব নাটকে। বাংলা ভাষ্যের নাট্যকার তার নিজস্ব প্রয়োজনে মূল থেকে কোন কোন গান রাখলেন বা বর্জন করলেন সেটা প্রশ্ন নয়, ব্যবহৃত গানগুলি নাটকের শরীরে দ্রবীভূত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'খড়ির গণ্ডি'র মতো এত বড়ো একটি প্রযোজনা এখানেই কিছুটা দুর্বল। কথা এবং সুরের সঙ্গতিতে গানগুলি এমন কিছু হয়ে ওঠে না যা নাটকের প্রবাহিত গতিকে সাহায্য করতে পারে। কিছু গান বড়ো বেশি দ্রুতলয়ে গাওয়া হয়, হয়তো এটাও একটা হেতু। উপসংহারে 'নবান্নের-গানটি' সুচিন্তিত সংযোজন। সমবেত কণ্ঠে প্রায় অর্ধশত যুবক যুবতীর অংশগ্রহণে মঞ্চ ভরে নৃত্যগীত উৎসব, যেখানে শ্রমে আর সেবায় মালিকানা স্বীকৃত, একই সঙ্গে শুভ্র পলিতকেশে এবং উদ্দাম যৌবনে প্রেমের মুক্তি, সর্বাংশে মানুষেরই জয়—এরকম একটি ব্যঞ্জনাময় দৃশ্যের শেষটুকু বড়ো তাড়াহুড়োর মধ্যে শুরু এবং শেষ হয়। দীর্ঘ নাটকের পরিণতিপর্বে এত দ্রুততা বাঞ্ছনীয় নয়। এক্ষেত্রে নির্দেশককে আরও একটু মনোযোগী হতে অনুরোধ করি।

পটভূমি যেহেতু নবাবি-আমল, 'খড়ির গণ্ডি' এক বর্ণাঢ্য প্রযোজনা। কুশীলবের পোশাকে রঙের সঙ্গতি এনেছেন রঘুনাথ গোস্বামী, মঞ্চ পরিকল্পনায় কুমার রায়। দু'জনই শ্রদ্ধেয় শিল্পী। পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণপ্রাচুর্যে

ভারসাম্য রক্ষায় (একমাত্র প্রথম দৃশ্য ছাড়া) মঞ্চ নির্মাণে রঙের ব্যবহার সংযত। বিচারকক্ষের দৃশ্যপট সমগ্র দৃশ্যটিকেই নতুন মাত্রা দিয়েছে। কনিষ্ক সেন কৃত আলোর প্রয়োগ অভিনয়গতির সঙ্গে সুসমঞ্জস।

'খড়ির গণ্ডি' এ সময়ের একটি বিশিষ্ট প্রযোজনা। প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্দেশক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত স্বেচ্ছাকৃতভাবেই কিছু বিতর্ককে প্রশ্রয় দিয়েছেন। আমাদের ব্রেশট-চর্চা পুরোপুরি একটা চেহারা না পেলে এ বিতর্ক চলবে। ইতিমধ্যে 'খড়ির গণ্ডি' অভিনীত হোক আরও। বাংলা মঞ্চে একদিকে যখন বিপ্লবের অতি-সরলীকরণ প্রবণতা, অন্যদিকে তামসিক মঞ্চমায়া, সেখানে 'খড়ির গণ্ডি' বাঙালি দর্শকের কাছে আরও বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে বিষয়বস্তু গৌরবে।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

'মাটিতে পা রেখে, সূর্যের হাত ধরে'। নীরেন্দু হাজরা। সীমন্ত প্রকাশনী

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় পালা বদল হতে চলেছে এমন কথা কেউ কেউ বলে থাকেন, তিরিশের দশক থেকে বাংলা কবিতায় যে জন্মান্তর হল তাতে ইউরোপীয় কাব্যকথা যথেষ্ট প্রভাব ছিল, সে প্রভাব মূলতঃ বুদ্ধিগত এবং অভিজ্ঞতাপ্রসূত। মানুষের একান্ত করুণ কোমল প্রবৃত্তিগুলিকে কৃত্রিম ও আবেগ ব্যাকুল বলে তা চিন্তাপ্রধান, চেতনার উপর গুরুত্ব দেওয়া আধুনিক কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এরই প্রতিক্রিয়ায় মনোবিকলন তত্ত্বকে কেন্দ্র করে মানসিক বিপর্যয় ও বিকার একালের কাব্যক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করে। এর ফলে কবিরা স্বয়ংসৃষ্ট ছোট ছোট বৃত্তের মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে রইলেন। বাইরে যে বিশাল জনতা ও বৃহৎ দেশ পড়ে আছে তার সঙ্গে অনেকের কোন যোগ রইল না। কিন্তু জীবন বিচিত্র ও বিশাল, তাকে এড়িয়ে গিয়ে স্বপ্নসৌধ রচনা করা যায় না। নীরেন্দু হাজরার 'মাটিতে পা রেখে সূর্যের হাত ধরে' কাব্যগুচ্ছটি সেই বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। তিনি এই সংকলনটিকে উৎসর্গিত করেছেন নজরুল ও সুকান্তকে, এর থেকে তাঁর মানসিক প্রবণতা বোঝা যাবে। কবিতাগুলি জটিল নয়, কোন 'শব্দ-কৈতবের টঙ্কার ধ্বনি তার আয়ুধ নয়। যে শব্দ বহু ব্যবহারে স্বাভাবিক ও সহজ, যে চিত্রকল্প আমাদের প্রতিদিনের বোধের সঙ্গে জড়িত, তিনি তারই সাহায্যে আধুনিক জীবনের অপরিসীম ক্লান্তি এবং সেই ক্লান্তিকে ছাড়িয়ে ওঠার শক্তিকে প্রমাণ করেছেন।

নীরেন্দু হাজরা জীবনের আশা-আনন্দ ও বলিষ্ঠতায় বিশ্বাসী। দুঃখ ও লাঞ্ছনা মানুষেরই ইতিহাসে একটি পরাভব। একালের সাহিত্য তারই উপরে উঠতে চাচ্ছে। নীরেন্দু শুধুই যে স্লোগান সম্বন্ধ কবিতা লিখেছেন, তা নয়, জীবনের আলোছায়া ও সুখদুঃখকে গভীর ভাবে অনুভব করেছেন। জীবনের অর্থ যে শুধু বেঁচে থাকা নয়, বিরোধকে স্বীকৃতি দিয়ে তার মধ্য থেকেই সত্তার আবিষ্কার, এটি তাঁর কবিতায় আশ্চর্য সহজ সুরে বেজে

উঠেছে। কখনো অর্কেস্ট্রার মতো সুরে-বেসুরে ধ্বনি ঝঙ্কার, কখনো বা একটি নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ কণ্ঠের নীরব আর্তনাদ কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আহ্বান করেছেন, 'হাতে হাত দাও সব ভয় কেটে যাবে' এই যে পরম নির্ভরতা, এটি তাঁর কাব্য-কবিতায় আদিম বিশ্বাসের মতো জড়িয়ে গেছে। তিনি 'মধুমাসে'র রক্তিম মুহূর্তে দেখেছেন, পাহাড়ে পর্বতে কৃষ্ণচূড়ার রঙের বন্যা। এবং তখন তিনি নির্জন বিষণ্ণতা ত্যাগ করে পথ চলতে শুরু করেন অরণ্যে পর্বতে নয়, মানুষেরই সংসারের দিকে। এই বলিষ্ঠ আশাবাদী প্রত্যয় তাঁর অনেকগুলি কবিতায় একালের মানব জীবনের বিরোধকে জয় করতে পেরেছে। সেজন্যে তাঁর কবিতা সহৃদয় পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করবে।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যে মাটি সোনা হবে : কৃষ্ণ চক্রবর্তী। চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩। দশ টাকা

এ বইয়ের প্রেক্ষাপট পশ্চিমবাংলার গ্রাম আর সেখানকার শিক্ষিত অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত একদল মেহনতি মানুষ। স্বাধীনতার পর বিগত ত্রিশ বছর ধরে গ্রাম জীবনে যে ভাঙাগড়া চলছে, অন্ধ কুসংস্কার থেকে মুক্তিস্নান করে নতুন রাজনৈতিক চেতনার আলোকে অবগাহন করতে চাইছে যে গ্রাম বা গ্রামের মানুষ—লেখক তাঁদের কথাই বলতে চেয়েছেন। বইটির নামকরণে তারই ইঙ্গিত। কাহিনীর মূলকেন্দ্রে রয়েছে একটি ক্ষয়িষ্ণু চাষী পরিবার। পরিবারের একপ্রান্তে রয়েছেন গুইরাম, একটি প্রজন্মের প্রতিভূ, অপর প্রান্তে অশ্বিনী আর পুষ্প আগের প্রজন্মের প্রতিভূ। এর মাঝখানে রয়েছেন প্রমথ আর তরুবালা। কাহিনীকার হিসেবে আছে কুসংস্কার, দারিদ্র্য, পীড়ন, অত্যাচার আর প্রেম। তারক আর পুষ্পর প্রেমই এই কাহিনীকে আগাগোড়া এক শিল্পরস দিয়ে বেঁধেছে; একে প্রশংসা করতে গিয়ে কোনো কুণ্ঠা বা দ্বিধার অবকাশ থাকে না। সত্যিকারের প্রেমের আবেগ যখন বর্ষার জলধারার মতো স্নিগ্ধ হয়ে মাটিতে নেমে আসে তখন তা ফুল হয়ে ফুটে উঠতে বাধ্য। পুষ্প নামের এই মেয়েটিকে লেখক অত্যন্ত যত্নে, মমতায় এবং সংযমের সঙ্গে গড়ে তুলেছেন। পুষ্পর মানসিক দ্বন্দ্ব এবং তারকের সঙ্গে তার মানসিক যোগসূত্র রচনায় লেখক খুব উঁচুদরের

শিল্প নৈপুণ্যের ছাপ রেখেছেন। তবে ঘোমটার আড়ালে আজন্ম সংস্কারে আত্মগোপন করে থাকা মেয়েটিকে যখন কারখানার গেটে পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামের প্রাক্-মুহূর্তে বলতে শুনি, 'আমি মরতে ভয় পাইনি। ওরা আমাকে মেরে ফেললেও আমি এখান থেকে নড়ব নি।'—তখন মনে হয় এর জন্যে আরও একটু প্রস্তুতি থাকলে ভালো হত। অবশ্য লেখক পুষ্পকে বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এখানে রুশ বিপ্লব বা গোর্কির মা—এর অবতারণা করেছেন। এ রকম বইয়ের প্রয়োজন আছে। শিল্প সাহিত্যের জগতে অবক্ষয় আর নৈরাজ্য যখন মহীরুহ আকার ধারণ করছে তখন সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার জন্যে যে নৈতিক বোধ লেখককে উদ্বুদ্ধ করেছে তাকে অবশ্যই বিপ্লবী অভিনন্দন জানাতে হয়।

পা-টা নামিয়ে বসুন : কৃষ্ণ চক্রবর্তী। চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩। দশ টাকা

চলতি ধারার বাইরে থেকে লেখক এই গ্রন্থে অনেকগুলি নতুন ছাঁদের গল্প বলেছেন। নিছক গল্প বলার মেজাজ নিয়ে নয়, কিছু বক্তব্য পেশ করার অভিপ্রায়েই গল্পগুলির অবতারণা করা হয়েছে। প্রথম গল্প 'পা-টা নামিয়ে বসুন' বেকার মধ্যবিত্ত যুবকের গল্প, চাকরি যার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু চাকরির বিনিময়ে সে আত্মমর্যাদাটুকু হারাতে নারাজ। 'মেঘ' গল্পে মেঘু'-র মৃত্যু অস্বাভাবিক হলেও আমাদের মানবতাবোধকে আহত করে বিশেষ করে যখন লরি-ড্রাইভারকে বলতে শুনি 'শালা জানোয়ারের জীবন...'। 'রাত্রিশেষে' নিঃসন্দেহে একটি অনবদ্য গল্প। বিশেষ করে এই গল্পে বনমালীর মায়ের চরিত্রটি গোর্কির 'মা'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। 'শহীদ' গল্পটি সমকালীন একটি বাস্তব চিত্র, তাই মর্মস্পর্শী। 'সাপ' গল্পটিতে বাঁশির জীবনসংগ্রামের প্রতীক চিহ্নটি সুস্পষ্ট এবং হৃদয়গ্রাহী। 'আতঙ্ক' গল্পের গল্পলেখক তো আমাদের খুবই পরিচিত। সাহিত্যে বাস্তবতার নামে যাঁরা কেবল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যৌনতা, কদাচার আর নীতিহীনতার চিত্র এঁকে যুবচেতনাকে বিভ্রান্ত করছেন কেবল তাঁদের ভাগ্যেই জমছে অর্থ, খ্যাতি আর সম্মানের স্তূপ। লেখক এই চিত্রটি খুব বলিষ্ঠ ভাষায় এঁকেছেন। 'স্বপ্ন' গল্পটি চিরন্তন দারিদ্র্য হতাশা আর বঞ্চনার ছবি।

'আসল কারণ' ও 'প্রত্যাবর্তন' গল্পে চাষীর জীবনসংগ্রাম আর লড়াইয়ের কাহিনী। 'আমার বাসে চড়ার অভিজ্ঞতা' একটি বিদ্রূপাত্মক রূপধর্মী গল্প। 'পশ্চিমবঙ্গ ১৯৪৩'-এ অবক্ষয়ী রাজনীতির যে চেহারা দেখানো হয়েছে আমরা সকলেই তার ভুক্তভোগী। 'আইনের শাসন' গল্পটি সময়োপযোগী। 'পথে দেখা' 'পরিকল্পনা' ও 'রিপোর্ট' গল্পগুলি আমদের মন এবং চেতনাকে গভীর-ভাবে নাড়া দেয়।

বোঝাই যায় লেখক দায়বদ্ধ। তাঁর সমস্ত গল্পেই কিছু বলার কথা থাকে। কিন্তু, শিল্পের শর্তও তিনি সাধ্যমতো মান্য করেন। তার ফলেই সংকলনভুক্ত গল্পগুলিতে সমকালীন জীবনের একটা বিশেষ চেহারা সুন্দর বেরিয়ে আসে।

মুকুল রায়

যুদ্ধে, সঙ্গীতে / দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় / বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯ / তিন টাকা।

দেবকুমার প্রায় সর্বত্রই পাঠকের শ্রুতিকে দারুণ প্রশ্রয়ে কবিতার অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে দিয়েছেন। তারপর দক্ষ স্থপতির মতো গেঁথে তুলেছেন এক একটি 'ইমেজারি', "এভাবেই তোমার দুহাত থেকে খসে পড়ে ছেঁড়া ধারাপাত / কোথায় হারায় বুড়ো কচ্ছপের দল, / বাজ-পড়া তালগাছ, পদ্মদীঘি / অতি ধীরে কাঁপতে কাঁপতে চলে যায় বেহুলার ভেলা / পাছে নষ্ট হও তুমি, নষ্ট হয়ে সাজানো পোষাক" (এভাবেই)। আমরা ক্রমশ শৈশব থেকে যৌবন, যৌবন থেকে অনন্ত স্রোতে প্রবেশ করি। প্রবেশ করি দেবকুমারের কবিতা তথা কবির অন্তর্লোকে।

কবি দেবকুমার কোথাও তাঁর অনন্ত স্মৃতিকে কুড়ি বছরের কাছাকাছি আসতে বলেন। কোথাও কৃষ্ণচূড়ার রাতে আঙুলের পাঁপড়ির মধ্যে 'রামের বোতল' দেখার সাধ। কখনো মূর্খতা জেনেও চোখের জন্য চোখ আর বুকের জন্য বুক ভেসে যায়। এমনি বিচিত্র স্বপ্নের এক উজ্জ্বল গ্যালারি সাজিয়ে রেখেছে- কবি।

এগুলিই কবির জীবনদর্শনের সবখানি নয়। অস্তিত্বের সংগ্রামের মধ্যে মানুষ জীবন ও জগৎকে নতুন করে চেনে। মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ ছিমছাম জীবনে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে যায়। 'টিমওয়ার্ক ভেবে মানুষেরা গড়েছিল দল।

ভেবেছিল এবার ঘায়েল জন্তুরা।…জন্তু নয়, টিমওয়ার্কে আজ খেলছে কেবল / অস্ত্র জন্তু।' বাঞ্ছিত না হলেও দৈনন্দিন জীবনবোধে এই চিন্তার অশুভ-উপস্থিতিকে এড়ানো যায় না।

দেবকুমারের কবিতার আর-একটি উজ্জ্বল দিক তাঁর রূপকল্পনা। ছোটো ছোটো কথায়, ছোটো এক-একটি পংক্তিতে তাঁর নিজস্ব অনুভূতিকে তিনি প্রকাশ করেছেন। 'সারারাত জ্যোৎস্নার ঝড়ে উড়ে যায় পীতাভ পাতারা', 'সারাক্ষণ বুকে ডেকে যায় এক কটকটে ব্যাং', 'ঝির ঝির বৃষ্টির মতো ক্রমশ স্বপ্নেরা', 'ঝর্ণার স্বরের মতো শাড়ী'—এ রকম কয়েকটি নিটোল ছবি তিনি এঁকেছেন তাঁর কবিতায়।

যেহেতু দেবকুমারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক, তাঁর কাছে অনুরোধ অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে আর একটু সাবধানী হোন। 'আদর-বৃষ্টি'র সঙ্গে 'ফষ্টি-নষ্টি' এবং 'ক্রাইম'-এর সঙ্গে 'ফাইন' মনে হয় তাঁর নিছক মিলের 'পরীক্ষা' নয়।

গ্রন্থাকারে আরও কিছু উজ্জ্বল ও অধিকতর পরিণত কবিতা নিকট ভবিষ্যতে দেবকুমার আমাদের উপহার দেবেন—এই আশায় রইলাম।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

বন্যা

অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সারা পশ্চিমবাংলা জলে ডুবেছে, ভেসেছে, ভেঙেছে। আমরা তখন শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের কাজে ব্যস্ত। কলকাতাও ভেসেছিল, আমাদের কাজকর্মও তাতে কিছুটা হয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রকাশের তারিখ পেছিয়ে গেছে, প্রকাশের পরও আমাদের শারদীয় সংখ্যা কলকাতার বাইরে পৌঁছে দিতে পারি নি। মফঃস্বল জিলাগুলিতেও কাগজ যায় নি—উত্তরবাংলার জিলাগুলিতে বন্যা না হলেও যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

বন্যার সময় ও তার পরে যে-খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে কলকাতার বন্যা বা আমাদের এই খুচরো-খাচরা অসুবিধে তুচ্ছ হয়ে গেছে। কারণ এমন আশঙ্কার কারণই ঘটেছে যে শুধু কলকাতাই নয়, সারা পশ্চিমবাংলাই এক চরম ধ্বংসের ভেতর দিয়ে গেছে। আর সে ধ্বংস যে এবারই শেষবারের মতো ঘটল এমন নয়।

যেন, কার্যকারণ ব্যাখ্যাতীত আকস্মিকতায়, প্রাবল্যে ও চণ্ডতায় এই বন্যা কিছুটা এমন এক ধরনের আশঙ্কা সৃষ্টি করছে, যে-আশঙ্কা নিয়ে কোনো জনসমষ্টি তার জীবনের দৈনন্দিনে ফিরে যেতে পারে না। এক পারে শুধু তেমনি করে দিনের পর দিন কাটিয়ে যেতে, প্রিয়তম মানুষের মৃত্যু শিয়রে মানুষের যেমন দৈহিক অভ্যাস চালু থেকে যায়।

মৃত্যু নিয়ে এই বাঁচাটাই যেন একমাত্র অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। বন্যার কারণ নির্ণয়ে, যাঁরা বন্যায় ভেসেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা আর বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানের ভেতর কোনো যোগ নেই। সেই অনৈক্যের কোনো গভীর তাত্ত্বিক বা বাস্তবজ্ঞানভিত্তিক কারণও নেই। বিশেষজ্ঞদের ভেতরও কোনো মতৈক্য নেই। এবং সে মতানৈক্যেরও কোনো কারণ নেই। বিশেষজ্ঞদের ভেতর আবার যাঁরা টেকনিশিয়ান অথচ সরকারি কাজে

নিযুক্ত তাঁদের বিশেষজ্ঞতা ও সরকারি অগ্রাধিকারের বিবেচনার ভেতরও গভীর দ্বন্দ্ব।

ডি-ভি-সি কেন হয়েছে, তার মূল প্রস্তাব কি ছিল, তার কতটা কার্যকর হয়েছে, বাকিটা কার্যকর হয় নি কেন, ডি-ভি-সির জলের উৎস যে বিহার রাজ্য—নদীর উৎসভূমিকে জল সরবরাহের যোগ্য করে রাখার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তার সংযোগের সম্পর্ক কি, রূপনারায়ণের ব্রিজগুলোর মূল নকশা কি ছিল, তা বদলেছে কেন, হিংলো বাঁধ তৈরির ব্যাপারে কারো আপত্তি ছিল কিনা—এইসব প্রশ্নের উত্তর আজ বাঙালির অস্তিত্বের জন্যই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময় বাঙালির সামনে দায় এসেছিল—মানুষের ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে লড়ে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচানোর। আজ আরেকবার দায় এসেছে অত্যন্ত নগদা-লাভের প্রযুক্তি-বিদ্যার উদ্ধত ব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়ে নিজের অস্তিত্ব বাঁচানোর। স্বাধীনতার পর থেকে গত তিরিশ বছরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোনো স্বদেশভিত্তি তৈরি হয় নি—পশ্চিমবাংলার ওপরই বোধহয় দায় চেপেছে মরণাপন্ন লড়াইয়ে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে দেশ ও মানুষের সংলগ্ন করার। যদি তা না হয়, তাহলে এই দেশভ্রষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের মৃত্যুর কারণ হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দেশভ্রষ্টতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের নির্বাচন নির্ভর রাজনীতির গ্রাম্য সংকীর্ণতা। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ভোটের নিশ্চয়তার জন্য বাঁধ বাঁধা বা খাল কাটা বা ব্রিজ বানানোর এমন প্রস্তাব পাশ করে নেন, যা হয়ত একটি অত্যন্ত ছোট অঞ্চলের পক্ষে দরকারি কিন্তু সামগ্রিকভাবে ক্ষতিকর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিদেশী অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নিয়োজিত হচ্ছে সংকীর্ণ গ্রাম্য স্বার্থে।

এই বন্যায় বিপন্ন-অস্তিত্ব বাঙালির প্রাণান্তিক হাহাকারও চাপা পড়ে যায় এই গ্রাম্য কোন্দলের জঘন্য চিৎকারে। জল যখন নেমে যায় নি, তখনই খবরের কাগজের পাতায় বন্যার খবরের পাশাপাশি এলো বন্যার ত্রাণ কোন সংগঠন মারফৎ হবে তা নিয়ে বিতর্ক। রাজ্যস্তর থেকে গ্রামস্তর পর্যন্ত সর্বদলীয় কমিটির দাবি আর নির্বাচিত বিধানসভা আর পঞ্চায়েত মারফৎ ত্রাণের প্রস্তাব। যাঁরা রাজ্যের শাসনক্ষমতায় থাকেন তাঁদেরই ওপর প্রধান দায়িত্ব বর্তায় এমন ধরণের জাতীয় বিপর্যয়ের মুখে সমস্ত তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে ওঠার নেতৃত্ব দেয়ার। তার পরিবর্তে রাজ্য সরকার ও বামফ্রন্ট নেতৃত্ব সেই কোন্দলের বড় অংশীদার হলেন। যুক্তিতর্কের কথা ছেড়ে দিলেও,

শুধুমাত্র গত তিরিশ বছর ধরে বামপন্থী মহলের দাবির সম্মানেই সর্বদলীয় কমিটির গঠন ছিল অনিবার্য।

আর, সর্বদলীয় কমিটি যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলিরই কমিটি তা ত নয়। বিপর্যয়ের গভীরে যখন সরকারি যন্ত্র ব্যর্থ, রাজনৈতিক দলগুলি নিরুপায়, তখন ত এক-একটি অঞ্চলের মানুষ যার যা সম্বল তাই নিয়ে একত্রিত হয়ে বন্যার বিরুদ্ধে লড়েছেন। সর্বদলীয় কমিটির অর্থ বিপর্যয়কালীন সেই বন্ধুত্ব-সৌহার্দের সম্প্রসারণ—ত্রাণ ও পুনর্বাসনের সময়ও।

ভারতবর্ষের একটি রাজ্য যখন এই রকম চরম বিপদের সম্মুখীন, যখন তার অস্তিত্বই হয়ে উঠেছে একটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন—তখন কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবহার ও সর্বভারতীয় দলগুলির ঔদাসীন্য নির্মম। এখনো পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র এই বিপর্যয়ের জন্য কোনো টাকা-পয়সা দেন নি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাও ব্যতীত আর-কোনো সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল এখন পর্যন্ত একথা বলে নি যে পশ্চিমবাংলার এই বিপর্যয় একটি জাতীয় বিপর্যয় ও ত্রাণ ও পুনর্বাসন যে-কোনো রাজ্য-সরকারের শক্তি ও ক্ষমতার বাইরে।

এই গ্রাম্যতা, উদাসীনতা ও ব্যর্থতার ভেতর আশার স্থল ত এই বন্যা-দুর্গত অঞ্চলের অধিবাসীরাই। তাঁরা বুকজলে দাঁড়িয়ে বাঁধ আগলেছেন, জল বের করে দেবার খাল কেটেছেন, খাদ্যদ্রব্য পৌঁছে দিয়েছেন দূর-দূর জায়গায়, ঘর তুলবার আগেই ক্ষেতে নেমেছেন নতুন রবিশস্যের চাষের জন্য। যাঁরা ভেসেছেন, তাঁরাই আবার ভাঙা তুলবেন—এটুকু ভরসা না থাকলে দৈনিক অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে।

দেবেশ রায়

আলিগড়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

গত ২৫ অক্টোবর পি. টি. আই. নয়াদিল্লি থেকে একটি ছোট খবর পাঠিয়েছিল। বিখ্যাত উর্দু কবি গুলাম রব্বানি তাবান আলিগড়ের সাম্প্রতিক দাঙ্গা মোকাবিলায় কেন্দ্র ও উত্তরপ্রদেশ সরকারের নেতিবাচক মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রপতির হাতে তাঁর পাওয়া পদ্মশ্রী খেতাব ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আলিগড়ের প্রতিটি গাছের পাতা প্রতিটি দেয়াল জানে আর. এস. এস-এর গুণ্ডারা কিভাবে পরিকল্পিত উপায়ে সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতা চালিয়েছে। এই সাম্প্রদায়িক হত্যা লুট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা বীভৎসতা ও ব্যাপকতায় সাম্প্রতিক বছরগুলির মধ্যে অক্লেশে প্রধান স্থান অধিকার করেছে।

এখন ত প্রায় সবাই একমত যে জেলা প্রশাসনের একটি অংশের প্রত্যক্ষ সহায়তায় আর. এস. এস আলিগড়ে তাদের জঘন্য ভূমিকা পালন করেছে। স্থানীয় প্রশাসন যন্ত্র এমনভাবে তাদের কব্জায় চলে গিয়েছিল যাতে এটা সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যে আসীন জনতা সরকারের আর. এস. এস-এর কর্মীরা যে-সব গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে আছে তাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে কতখানি ধর্মোন্মাদ দক্ষযজ্ঞ বাঁধানো যেতে পারে, আলিগড়ের ঘটনা তার এক বিপজ্জনক নমুনা।

আলিগড়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উত্তরপ্রদেশের বারানসী, কানপুর, সম্বল ইত্যাদি অঞ্চলে এবং অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুসহ অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত অনুরূপ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই সব এলাকায় একদিকে মুসলিম অন্যদিকে হরিজনদের ওপর ঢালাও বর্বরতা চালিয়ে ব্রাহ্মণ্য শাসিত 'পবিত্র হিন্দুরাজ্য' কায়েম করার কাজ আর. এস. এস আবার পুরোদমে শুরু করে দিয়েছে। অস্বীকার করার উপায় নেই কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন জনতা পার্টির মেরুদণ্ড যেমন জনসংঘ, জনসংঘের মেরুদণ্ড তেমনি এই জবরদস্ত আর. এস. এস.। জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংখ্যা প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর স্বীকার করেছে, জনতা পার্টির শাসনের বিগত ২০ মাসে প্রায় তিন কোটি সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক প্রশাসন ও পুলিশের সক্রিয় অংশগ্রহণে মদত পেয়ে আর. এস. এস. এক চরম তাণ্ডবে মেতেছে। প্রচুর সাক্ষ্যপ্রমাণ সত্ত্বেও জনতা পার্টির কয়েকজন নেতা আর. এস. এস.-কে সৎ চরিত্রের সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এটা একদিকে নির্ভেজাল রাজনৈতিক সুবিধাবাদ অন্যদিকে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক।

চারপাশের চাপে আলিগড়ে একটি বিচার-বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মন্ত্রী প্রশাসনিক অফিসার ও পুলিশ বাহিনীকে বহাল তবিয়তে রেখে এ ধরনের তদন্তে কোনো ফল হয় না, অতীত অভিজ্ঞতায় তা বারবার দেখা গেছে। যাঁরা দাঙ্গার বলি হয়েছেন,

তাঁদের আগুনে পুড়ে যাওয়া বাড়ি ও দোকানঘরের পুনর্গঠন-সহ অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত হয় নি।

আলিগড়ের ঘটনাটিকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখলে মারাত্মক ভুল হবে। আর. এস. এস-এর নেতৃত্বে সাংগঠনিক সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে জেহাদ ঘোষণা করেছে। তারা মুসলমান ও হরিজন নির্যাতনের পুরনো খেলায় আবার পুরোপুরি সামিল হয়েছে এবং আরো আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। দেশের সর্বত্র এদের স্বেচ্ছাসেবকদের জঙ্গী কুচকাওয়াজ ও রণহুংকার জোরালো হয়ে উঠেছে। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক কাঠামো যে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তাতে দলমতনির্বিশেষে সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তির এখনই জাতীয় স্তরে এই প্রশ্নে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলা উচিত। আর. এস. এস-এর বিপজ্জনক কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য কেরালায় যুক্তফ্রণ্ট সরকার যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তাকে আমরা একান্ত সময়োচিত বলে মনে করি। অন্যান্য রাজ্য-সরকারকেও অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে অবিলম্বে।

অরিন্দম সেনগুপ্ত

মহাকবি ভাল্লাথোল

সম্পূর্ণ নাম ভাল্লাথোল নারায়ণ মেনন। জন্ম অক্টোবর ১৮৭৮, মৃত্যু ১৯১৮। ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক মহাকবির স্বীকৃতিদান মালয়ালাম ভাষার এই মহান কবির বিশাল ব্যাপক ও গভীর কবিজীবনেরই স্বীকৃতি। এবং কবিজীবন ছাড়িয়েও ভাল্লাথোলের জীবনের বিচিত্রগামিতা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এ বছর কবির জন্ম-শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে।

'চিত্রযোগম' মহাকাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ভাল্লাথোলের কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তারপর পর পর প্রকাশিত 'অনিরুদ্ধণ', 'ওরু কাথু', 'শিষ্যানাম মাকানাম', 'মেরি ম্যাগডেলিন', 'কোচু সীতা', ইত্যাদি

গীতিকবিতার প্রবাহ মালয়ালাম সাহিত্যের নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে। এই অধ্যায় তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে থাকে। সোভিয়েত ভ্রমণের ফলশ্রুতি তাঁর একটি কবিতা 'রুশ দেশে'। এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভি. আই. লেনিনও তাঁর একাধিক কবিতার উপজীব্য। তাঁর সমস্ত কবিতা সংকলিত হয়েছে 'সাহিত্য মঞ্জরী' নামে, তেরটি খণ্ড এই সংকলন গ্রন্থের। মৌলিক রচনা ছাড়া সাহিত্যে ভাল্লাথোলের অপর অবদান অনুবাদে। তাঁর সংস্কৃতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য মালয়ালাম ভাষাকেই সমৃদ্ধ করেছে এবং অনুবাদের ব্যাপারে তিনি শুধু কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন। তাঁর অনূদিত সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে, যেমন কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম', তেমনি 'পদ্মপুরাণ', 'মৎস্যপুরাণ', 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' ইত্যাদি আবার 'হলগাথা সপ্তশতী' 'বোধিসত্ত্ব পদ্ম কল্পলতা' এবং কিছু সংস্কৃত নাটকও। ঋক্ বেদ অনুবাদের কাজেও তিনি হাত দেন। এরপর আসে ভাল্লাথোলের সম্পাদক জীবনের কথা। তাঁর সম্পাদিত দুটি পত্রিকার নাম 'রামানুজন' ও 'আত্মপোষিনী'।

সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় ভাল্লাথোলের অবদানের বিষয় স্মরণ করলে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে। এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য তাঁর কেরল কথা-মণ্ডলম গঠন। কথাকলি নৃত্যের প্রসার ও প্রচারের দায়িত্ব নেয় এই সংগঠন। তার জন্য তিনি একাধিকবার বিশ্বভ্রমণ করেন। কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে তাঁর কথাকলি নৃত্যগোষ্ঠী আসে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁর জীবনের এক বিশেষ ঘটনা। ভাল্লাথোলের জীবনেও রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রভাব পড়ে। বিশ্বশান্তি সংসদের অন্যতম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন ভাল্লাথোল। ওয়ারশতে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগ দেন। তাঁর ভ্রমণ তালিকায় যেমন রয়েছে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড, তেমনি সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীনও। এই পরিভ্রমণে তিনি ভারতের সংস্কৃতি-দূতের ভূমিকাই গ্রহণ করেন।

একজন সমগ্র মানুষ হিসেবে ভাল্লাথোল, শুধুমাত্র সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। স্বাভাবিকভাবেই পরাধীনতার গ্লানি ও জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয়ে রুদ্ধ ছিল। এই রুদ্ধ দ্বার খুলে যায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতে। ভৈকমে মন্দিরে হরিজন-প্রবেশ আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর প্রিন্স অব ওয়েলস প্রদত্ত পুরস্কার ও খেতাব গ্রহণে অস্বীকৃতি ভাল্লাথোলের স্বাদেশিকতার দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ভাল্লাথোল অল্পবয়সেই সম্পূর্ণ ভাবে বধির হয়ে যান।

ভাল্লাথোল কেরলের সাহিত্য একাডেমির সহ-সভাপতি ও কেরল সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু সংস্কৃতি-অবদানের জন্য তাঁকে 'মণিহারে' ভূষিত করেন। তাঁকে মরণোত্তর নেহরু পুরস্কার দেন সোভিয়েট ল্যাণ্ড পত্রিকা। কিন্তু কবির আসল পুরস্কার রসগ্রাহী পাঠকের হৃদয়-সান্নিধ্য। মালয়ালমবাসী এক অনুবাদের মাধ্যমে ভারত ও বিশ্ববাসীর কাছ থেকে সেই পুরস্কার লাভ ভাল্লাথোল কোনো দিন বঞ্চিত হবেন না।

অপূর্ব মুখোপাধ্যায়

চোমস্কি

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের আসন্ন সমাবর্তনে বিখ্যাত আমেরিকান ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌ নোয়াম চোমস্কিকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সের এই ভাষাতত্ত্ববিদ্‌কে এই সম্মানের জন্য মনোনীত করে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখালেন। ভাষাতত্ত্বেই চোমস্কির প্রধান প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও, ভিয়েতনাম-যুদ্ধের বিরোধিতা করে ও পেন্টাগন পেপার্স সম্পর্কে প্রবন্ধমালা লিখে চোমস্কি তাঁর বিশেষজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন সভ্যতা-সম্পর্কে তাঁর দায়বোধ। বুদ্ধিজীবীর সেই দায়বোধই চোমস্কিকে বিশিষ্ট করেছে।

চোমস্কি নিজেও বলেছেন, রাজনীতিক দায়ই তাঁকে ভাষাতত্ত্বে নিয়ে এসেছে। নিউ ইয়র্কের ইহুদি সমাজের রাজনীতি-সচেতন অংশের সঙ্গেই

ছিল তাঁর রাজনীতিক সহানুভূতি। সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর এক ধরনের পক্ষপাতিত্বও সেই ছেলেবেলা থেকে।

১৯৬৫ সাল থেকে তিনি আমেরিকার পররাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে আসছেন। ১৯৬৯-এ, তাঁর বই 'আমেরিকান পাওয়ার এ্যাণ্ড নিউ ম্যানডারিনস' উৎসর্গ করেন—'যুদ্ধে যাঁরা যোগ দেয় নি সেই সাহসী যুবকদের'। ১৯৭৩-এ বেরয় পেণ্টাগন-পেপার্স নিয়ে লেখা চোমস্কির 'ব্যাকরুম বয়েজ'। আমরা বিশ্বভারতীর সিদ্ধান্ততে আনন্দিত হয়েছি।

দেবেশ রায়

সম্পাদক সমীপেষু

পরিচয়

পরিচয়-এর জুলাই ৭৮ সংখ্যায় শ্রীরুচিরা মুখোপাধ্যায় একটি বইয়ের সমালোচনা করেছেন—সিলুটস অব রাশিয়ান লিটারেচার (লেখিকা অচলা মৌলিক)।

অবশ্য—লেখিকার মন্তব্য লেখিকারই, ও 'পরিচয়' মন্তব্যের এই স্বাধীনতা মানে বলেই নিশ্চয় রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে। তাই সমালোচিকার আর-সব মন্তব্য বিষয়ে আমি কিছু বলছি না। কিন্তু সোলঝেনেতসিন সম্পর্কে বোধহয় একটু সংশোধন নেহাতই দরকার। স্তালিনের বিচ্যুতির ফলাফল বিষয়ে তাঁর প্রথম দু-একটি উপন্যাসে ধ্রুপদী রুশী উপন্যাসের বাস্তবতা চর্চার কিছু উপাদান দেখা গেলেও, পরবর্তীকালে তাঁর রচনা হয়ে দাঁড়ায় সোভিয়েত বিরোধিতার শিল্পগুণবর্জিত উপকরণ। সেখানে শিল্প-সাহিত্যের প্রশ্ন বা গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন তোলাটা অর্থহীন। আর, তা ছাড়া সোলঝেনেতসিন ত তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারেই প্রমাণ করে দিয়েছেন, সভ্যতার প্রশ্নে তাঁর সমর্থন ও পক্ষপাত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দিকে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থারই বিপক্ষে। তাঁকে পীর-লেখক করে তোলাটা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক বহু পুরনো সোভিয়েত-বিরোধী খেলা।

বিনীত

দেবেশ রায়

মহান গণচিত্রশিল্পী

চিত্তপ্রসাদ

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪ জানুয়ারি, রবিবার, সকালে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫।

দীপেন্দ্রনাথ 'পরিচয়'-এর সম্পাদক ছিলেন দশ বৎসরের বেশি। সহ-সম্পাদনা ও সম্পাদনার কাল মিলিয়ে তাঁর সঙ্গে 'পরিচয়'-এর সম্বন্ধ প্রায় বিশ বৎসরের। তার আগেও, ছাত্রজীবনে, তিনি 'পরিচয়'-এর কর্মী ছিলেন।

কিন্তু 'পরিচয়'-এর সঙ্গে তাঁর সংযোগ এই সংগঠন-কর্মের মধ্যেই মাত্র সীমাবদ্ধ নয়।

'পরিচয়' তার প্রায় ৫০ বৎসরের আয়ুষ্কালে সাহিত্য-সংস্কৃতির যথাযথ মান, সমাজ ও ইতিহাসের চেতনা এবং দেশ ও বিশ্বের প্রতি আগ্রহ রক্ষার সাধনায় নানা ব্যর্থতা সত্ত্বেও অনমনীয় থাকতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। এরই সঙ্গে আমাদের চারপাশে চৈতন্যের যে নিয়ত বিকার ঘটে চলেছে, তার বিরুদ্ধে নিরলস লড়াই ও শুদ্ধতার প্রতিষ্ঠাও 'পরিচয়'-এর একটা বড় দায়। দীপেন্দ্রনাথ সেই সাধনা ও দায়িত্ব-বোধেরই প্রতিভূ।

তাঁর স্বল্পজীবনের স্বল্পতর সাহিত্যকর্মকালের শুরুতে ও শেষে 'পরিচয়', শুরু থেকে শেষ 'পরিচয়'। শিল্পসাহিত্যের এক পরিণততর ও চিরকালীন আদর্শে 'পরিচয়' ও দীপেন্দ্রনাথ গ্রথিত হয়ে থাকল।

'পরিচয়'-এর বর্তমান সংখ্যাটি ডিসেম্বরে প্রকাশিত হওয়ার কথা। প্রেসকর্মীদের ধর্মঘটের ফলে তা হয় নি। এই সংখ্যার সম্পাদনার কাজ দীপেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণতই করে গেছেন—তাই তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হলেও দীপেন্দ্রনাথ-ই এই সংখ্যার সম্পাদক।

অনতিবিলম্বে 'পরিচয়'-এর আগামী একটি সংখ্যা দীপেন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি নিবেদিত হবে।

পরিচয়

বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৮৫ ডিসেম্বর ১৯৭৮

প্রচ্ছদ

সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবেশ রায় 'পরিচয়'-এর পরবর্তী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয় ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ থেকে প্রকাশিত।

কর্ণফুলির কবিয়াল

সাধন দাশগুপ্ত

বর্তমান রচনা 'পরিচয়' সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছার ফসল। কবিয়াল রমেশচন্দ্র শীলের সংঘাতময় দীর্ঘ কর্মজীবন সম্পর্কে কিছু লেখা সহজসাধ্য নয়। অনেক তথ্যই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। এই রচনার অনেক উপাদানই অতি পুরাতন শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর। মহান কবিয়াল রমেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার একাধিকবার দেখা হয়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৯৪৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন এবং নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষক সম্মেলন। কৃষক সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বে আমাকে প্রায় দেড় মাস নেত্রকোণায় প্রচার অভিযানে অংশ নিতে হয়েছিল। শেষ এক সপ্তাহ রমেশচন্দ্র শীলের নিবিড় সান্নিধ্যে থেকে তাঁর অনেক কথাই শুনি। তাঁর মাইজভাণ্ডারের সাধনা-পর্বের কথা এই সময়েই জেনেছি। ১৯৫১-৫২ সালে চট্টগ্রামের গণনাট্য কর্মী বন্ধুবর নির্মল দাশের কাছ থেকে এবং ১৯৫৩-৫৪ সাল নাগাদ অগ্রজ প্রতিম শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম সেনের কাছ থেকে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। এই রচনায় স্মৃতির বিভ্রম ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া স্মৃতিচারণপ্রসূত কোনও রচনাই সম্পূর্ণতার দাবি করতে পারে না। রমেশচন্দ্র রচিত গানের সংখ্যা গণনার ঊর্ধ্বে। এখানে উদ্ধৃত গানের কলিগুলি সম্পূর্ণ গানের সামান্য অংশ। এই গানগুলির কিছু স্বয়ং কবির কাছ থেকে পেয়েছিলাম এবং কিছু গান বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত।—লেখক

কর্ণফুলির তরঙ্গবিধৌত চট্টলভূমির সন্তান শ্রদ্ধেয় কবিয়াল আচার্য রমেশচন্দ্র শীলের শততম জন্মবর্ষ নীরবে অতিক্রান্ত হল।

জন্মে কৌলীন্য-রহিত কর্মে বর্ণশ্রেষ্ঠ রমেশচন্দ্র শীল ক্লেদচিত্ত বিলাসী মুৎসুদ্দি কালচারের উচ্ছিষ্টের ভোজ থেকে উদ্ধার করে কবিগানকে গণ-সংস্কৃতির মহান যজ্ঞে সমিধের মর্যাদা দিয়েছিলেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এরকম পাতকী উদ্ধারের নিদর্শন বিরল। এবং এই প্রেরণা গণনাট্য আন্দোলন-সম্ভূত। এক্ষেত্রে আরেকজনের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তিনি হলেন রমেশচন্দ্রের পূর্বসূরী ঢাকার হরিচরণ আচার্য। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ও সমবয়সী। হরিচরণ আচার্যের লক্ষ্য ছিল স্বদেশীয়ানা, স্বদেশীযাত্রার প্রবর্তক মুকুন্দদাসের কাছাকাছি। রমেশচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল গণচেতনার প্রসাদগুণে সমুজ্জ্বল ও মর্মভেদী। গণসংগীতের মাধ্যমে সপ্তসুরের সপ্তডিঙা মধুকরের পাল তুলে নিম্নকোটির মানুষকে শ্রেণীচেতনার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া।

রমেশ শীল প্রবীণ বয়সে গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ষাটের বেড়া ভেঙেছে। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা অনেক আগে থেকেই তাঁর মনকে প্রস্তুত করছিল। গণশিল্পীর প্রতিটি শর্ত তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিঃশঙ্কচিত্তে ও উন্নত শিরে পালন করে গেছেন। এই নিরহঙ্কার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শুদ্ধচিত্ত মানুষটির আত্মোপলব্ধি ছিল অতলস্পর্শী। অনলস কর্মপ্রয়াসের জীবনধর্মী দর্পণে প্রতিবিম্বিত। নিজেকে চিনতে পেরেছিলেন বলেই তিনি গণসঙ্গীত পরিক্রমার পথে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবহেলিত ও নিপীড়িত মানুষের হাতে হাত রাখতে পেরেছিলেন।

মূলত তিনি ছিলেন সাধক। মানবতার, মিলনের, শান্তির, একাত্মতার। সর্বোপরি বিপ্লবের। তিনি কোনও সম্প্রদায়ের নন, কোনও ধর্মের নন। মৃত্যুর পর তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। সেদিন অগণিত শোকার্ত অনুরাগী, নানা বর্ণের, নানা ধর্মের মানুষ, তাঁকে শেষ বিদায় জানাতে সমাধিস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন।

রমেশ শীলের খ্যাতি ও পরিচিতি কবিয়াল হিসাবে। যদিও তিনি লোকগীতির প্রবহমান ধারায় নিজেকে অভিসিঞ্চিত করেছিলেন। প্রধানত কবিগানই ছিল তাঁর জীবন ও জীবিকার অবলম্বন ও আদর্শস্থল এবং সেহেতু তাঁর অভিষেক ঘটেছিল কবিয়ালের মর্যাদায়।

একালে কবিগান লোকগীতির অঙ্গ হিসাবে গণ্য হলেও লোকায়ত

কবিগানের উন্মেষকালের এক শতকের মধ্যেই তার চরিত্র বিভ্রস্ত হল। কবিগানের আদি উৎসের ইতিহাস আজও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। আর আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন কবি-সরকার বা কবিয়ালের কবি-গানকে নথিভুক্ত করা সম্ভব হয় নি আঙ্গিকগত কারণে। তার ছিটেফোঁটা পরিচয় আমরা পেয়েছি। লোকমুখে প্রচারিত ও প্রচলিত কিছু গান এবং তার রচয়িতাদের নাম ও কিছু জীবনেতিহাসই আজও আমাদের একমাত্র সম্বল। আদি কবিয়ালদের অন্যতম বলে পরিচিত গোজলা গুঁই কিংবা তাঁর নিকটতম উত্তরসূরীদের নাম ও তাঁদের খণ্ড খণ্ড চিত্র গবেষকদের প্রসাদে সামান্য হলেও জানতে পেরেছি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় যে বাঙালি বাবু সমাজের সৃষ্টি হল, তারা অঢেল পয়সার অধিকারী হয়ে আদিরসাশ্রিত বিত্তগর্বের তাড়নায় মুরগির লড়াই, বুলবুলির লড়াই-এর মতো কবিগানের লড়াইকে মনন কণ্ডুয়নের কাজে লাগালেন। কবিয়ালদের জীবিকার তাগিদে তাই কবিগান অবতীর্ণ হল বাবুদের ফরাশে। একদল বিকৃত চরিত্র মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য কবিগান ফরমায়েশি কালচারের রূপ নিল। যদিও অন্যান্য পাঁচালী বা মঙ্গল কাব্যের ধারার সঙ্গে যুক্ত হবার ইচ্ছা আদি অনামী কবিয়ালদের ছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলার সংস্কৃতির একটা বড় অংশ কবিগান বর্বর সমাজপতিদের প্রতিপত্তির প্রভাবে এলেবেলে হয়ে গেল খিস্তি খেউড়ের আতিশয্যে। জীবিকার তাড়নায় কবিয়ালরা হয়ে দাঁড়াল মুৎসুদ্দি কালচারের আখড়ার 'গ্ল্যাডিয়েটার'। শুধুমাত্র শহর থেকে দূরে বিদ্যোৎসাহী সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় কবিগানের সৎ অস্তিত্বটা কোনোক্রমে টিঁকে রইল।

কবিগানের আঙ্গিক শুধুমাত্র বাংলার নিজস্ব নয়। উপাদান পৃথক হলেও দেশে দেশে কালে কালে তার অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা ও সুরে লোকগাথার মধ্যে। কাওয়ালি, শায়েরি, ঝুমুর ইত্যাদি গান বা কথার প্রচলিত দিকটা কবিগান থেকে পৃথক নয়। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত কিংবা পশ্চিমী দেশগুলোতে অথবা সোভিয়েত এশিয়ার কিছু অঞ্চলে তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে কবিগানের মতো চাপান-উতোরের কাজ চলে নিজস্ব আঞ্চলিক বিষয়বস্তু নিয়ে।

একটা দেশের সংস্কৃতির সুস্থতা ও রুগ্নতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল সমাজনীতির পরিবেশন, পরিবেশক ও কালপ্রবাহের গতিপ্রকৃতির উপর। বিশেষ,

যখন সমাজপতিদের চাহিদা মেটানোটাই প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের লক্ষ্য। সুতরাং কবিয়ালদের একটা বিরাট অংশ পুঁথি, পুরাণ দেবদেবীদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত প্রাচীন কাব্যগাথা মুৎসুদ্দি সমাজপতিদের মনোরঞ্জনের জন্য বিসর্জন দিল। স্বদেশী যুগে যখন দেশপ্রেমের উন্মাদনার জোয়ার বইতে লাগল তখন সংস্কৃতির অসুস্থতার রাহুমুক্তি সম্ভব হল। ফলত স্বদেশী যাত্রা, স্বদেশীগানের একটা নতুন উৎসমুখ খুলে গেল। আর আমরা মুকুন্দ দাসকেও পেলাম, হরিচরণ আচার্যকেও পেলাম। মুকুন্দদাসের কথা স্বতন্ত্র। তাঁর ভাবধারা সেকালের যাত্রাওয়ালারা গ্রহণ করে নি নানা কারণে। অনেক বাঙালি তখনও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঝোঁক কাটিয়ে উঠতে পারে নি। উপরন্তু ইংরেজ শাসকদের দোর্দণ্ড প্রতাপ উপেক্ষা করাও সহজসাধ্য ছিল না। কবিয়াল হরিচরণের অ্যাপ্রোচ ছিল অন্য ধরনের। মুকুন্দদাসের মতো সরাসরি বিদ্রোহ নয়। তিনি প্রধানত সমাজের দুর্নীতি ও অন্যায় অবিচারের প্রসঙ্গ কবিগানের আসরে টেনে আনলেন। সেযুগে বাঙালি ললনা স্নেহলতার আত্মহত্যা-জনিত মৃত্যু দেশে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। আকাশ-ছোঁয়া বরপণের দাবির হাত থেকে দরিদ্র পিতামাতাকে মুক্তি দেবার জন্য স্নেহলতা বিয়ের আগেই আত্মহনন করে সংসারের জ্বালা মিটিয়েছিলেন। হরিচরণ আচার্য মশায় গাইলেন—

'সংসারের দুঃখে দুঃখিতা—
গরীব পিতামাতার স্নেহলতা, স্নেহলতা ছিল,
আপন বসনে কেরাসিন ঢেলে,
আগুন জ্বেলে দুঃখাগুন নিভাইল।
পেয়ে স্নেহলতার বার্তা,
পড়েছে মরণের পরতা—
যারা সমাজ সংস্কারের কর্তা, তারা কি আজ অন্ধ হল?

দেশাত্মবোধের গান রয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিষয়ক গানে তিনি গাইলেন—

'শোনো শোনো দেশমাতা
ঘুচাইতে হৃদয়ের ব্যাথা
চিত্তরঞ্জন করে এবে শৃঙ্খল বরণ।
শত শত দেশভক্ত

ঢালিয়া বুকের রক্ত
রঞ্জিত করিতে চাহে তোমারি চরণ ॥'

হরিচরণ আচার্য প্রধানত লৌকিক বা শাস্ত্রীয় দেবদেবী সম্পর্কে গান বাঁধতেন। তবে সেই গানের মাঝে মাঝে এই সমস্ত সমসাময়িক প্রসঙ্গের গান জুড়ে দিয়ে তিনি কবিগানের মোড় নতুন খাতে ঘুরিয়ে দিলেন। তখন মুৎসুদ্দি কালচার ধরাশায়ী হয়েছে। স্বদেশী হাওয়া বইছে। প্রবল স্বাদেশিকতার ঝোড়ো হাওয়ায় স্বদেশীগানের পালা সদর্পে প্রতিষ্ঠিত হল। ফলে সাধারণ যাত্রা গানের চেয়ে মুকুন্দ দাসের যাত্রাগান বা হরিচরণ আচার্যের মতো কবিগান জনপ্রিয়তা অর্জন করল।

আমাদের শৈশবোত্তীর্ণ বয়সে যাত্রাপালা দেখার বায়না ধরলে অভিভাবকরা আপত্তি জানাতেন। আমার বাল্যকালের অভিভাবিকা আমার পিতামহীর মুখে হরিচরণ আচার্যি মশাইয়ের গান শুনেছি।

পিতামহী বলতেন—'যাত্রা দেখে ফাত্‌রা লোকে, কবি শোনে ভদ্রলোকে।' পূর্ববঙ্গে হালকা চালের লোকেদের ফাত্‌রা আখ্যা দেওয়া হয়। কবিগান যে সুস্থতা অর্জন করেছে, এই উক্তি তারই সমর্থক।

স্বদেশী যুগের মাঝামাঝি অগ্নিযুগের উদয় হল। বিপ্লবীদের ওপর ইংরেজ শাসক ও এদেশী দালালদের অত্যাচার যখন চরমে উঠল, তখন স্বদেশীগানে ধূলোর আস্তরণ জমতে লাগল নতুন করে। অর্থাৎ স্বদেশীয়ানার প্রভাবে যে সুস্থ সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল তা অন্তরালবর্তী হতে লাগল। তখন বাংলার বীর সন্তানেরা কেউ বা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, কেউ বা ফাঁসির মঞ্চে, কেউ বা সমরে নিহত। সর্ববিষয়ে সামাজিক অসুস্থতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল পরিবেশের প্রভাবে।

ঠিক এই সময়ে গণমুখী সাহিত্যের প্রেরণায় ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ-এ সারা ভারত প্রগতি লেখক সংঘের পত্তন হল। সাধারণ সম্পাদক হলেন সাজ্জাদ জহীর। ক্রমে কলকাতায় তার শাখা সংগঠন গড়ে উঠল। নেতৃত্ব দিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন গোস্বামী, আবু সইয়দ আয়ুব প্রমুখ নবীন প্রবীণ বুদ্ধিজীবীরা। গণমুখী সাহিত্যের তাগিদ অনুভব করেছিলেন সারা বাংলার বুদ্ধিজীবীরা। প্রায় একই সময়ে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট বাহিনী স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারের উচ্ছেদ ঘটাল। বিশ্বের সমস্ত প্রগতিবাদী গণতন্ত্রী সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেড' গঠন করে। যুদ্ধে প্রাণ দিলেন বহু লেখক ও শিল্পী। র‍্যালফ ফক্স, ক্রিস্টোফার কডওয়েল এবং আরও

অনেকে। স্পেনে গণতন্ত্রী সরকারের পতন ঘটলেও সারা বিশ্বে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠল শিল্পী ও সাহিত্যিকদের উদ্যোগে। [দ্র. দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রতিরোধ প্রতিদিন']।

শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চা নয়, সাহিত্য যে শোষণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হাতিয়ার সেই বোধ জাগ্রত হল। 'তিরিশের দশকে লেখক লেখিকারা যে প্রগতি লেখক সংঘের লক্ষ্য ও আদর্শ নির্দিষ্ট করেন, তাতে এসেছিল স্বদেশ ও নিজ অঞ্চলের জনগণের জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের গভীর সংযোগ স্থাপনের তাগিদ। ···প্রগতিমনা লেখক ও লেখিকাদের মুক্তিযোদ্ধা হতে হবে, এ সত্যও তিরিশের দশকের শেষের দিকে বাংলা সাহিত্যের শিল্পীদের চেতনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।' (রণেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ'—পটভূমি)। ১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্মান নাজীবাহিনী সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করল। ফলে সারা পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সমর্থকরা সংঘবদ্ধ হতে লাগল। বীর সোভিয়েটবাহিনী ও সোভিয়েট জনগণের আত্মোৎসর্গে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রার পথ সুগম হল। ইতিমধ্যে এদেশে সোভিয়েট আদর্শে উদ্বুদ্ধ বুদ্ধিজীবীরা 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' গঠন করলেন। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাশিম, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী এবং অন্যান্য প্রখ্যাত ব্যক্তিরা সোভিয়েট জনগণের সমর্থনে এগিয়ে এলেন। ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘও এই আন্দোলনে সামিল হলেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করলেন সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্বপক্ষে। এই সময়ে বিনয় রায়ের নেতৃত্বে বাংলার জেলায় জেলায় শিল্পীরা সংঘবদ্ধ হয়ে গণশিল্পী বাহিনী গড়ে তুলল ছাত্র ফেডারেশন, কৃষক সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও কিশোর বাহিনীর মঞ্চে। ইতিমধ্যে বিনয় রায় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে সারা বাঙলা সফর করে গণসংগীতের স্কোয়াড তৈরির প্রাথমিক পর্ব সম্পন্ন করেছেন। ১৯৪৩ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন থেকে গণসঙ্গীত, গণনৃত্য ও নাটকের যাত্রা শুরু হল। এই সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে যে ছাত্র প্রতিনিধিরা এসেছিলেন তাঁরা এই প্রাথমিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই গণনাট্য আন্দোলনের গোড়াপত্তন হল। গণনাট্য আন্দোলনের আদিপুরুষ বিনয় রায় সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন জেলার মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করে দিলেন।

প্রধানত ফ্যাসিবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গান, নাটিকা ও নাচ দিয়ে কাজ শুরু হল। এই সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী চিত্তপ্রসাদ (খুব সম্ভবত আলোকচিত্রী সুনীল জানা) এবং কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। আর ছিলেন একালের প্রথিতযশা অধ্যাপক, সাংবাদিক, শিল্পী ও প্রচারবিদরা অনেকেই। সেকালে তাঁরা সকলেই ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এইভাবে এক নতুন যুগের সম্ভাবনার সৃষ্টি হল কবিয়াল রমেশ শীল যার সঙ্গে কালক্রমে যুক্ত হলেন। (এই সম্মেলনে বর্তমান লেখকেরও যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল।) এই সময়েরই গান :

ও ভাই ভাইয়েনরে
চলনা ভাইয়েন চলনারে
একসাথে চল ছুলুকের নাও বাইতে ॥
দুই কুলেরি পাসিন্দারে
পানিতে ঝাঁপ দিয়ারে পড়ে।
লইও তারে নয়া নাওয়ে বাত্তিঘরে যাইতে ॥

(কুতুবদিয়ার বাত্তিঘর—বঙ্কিম সেন)

বোয়ালখালি থানার গোমদণ্ডী গ্রামে চণ্ডীচরণ শীলের দরিদ্র সংসারে একালের শ্রেষ্ঠ কবিয়াল রমেশচন্দ্র শীল জন্ম নিলেন ১৮৭৭ সালে। আর প্রায় ৯০ বৎসরের জীবৎকালে জ্ঞানোন্মেষের দিন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মানবতার জয়গান গেয়ে গেলেন। স্বগ্রামে নিজগৃহে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯৬৭ সালের ৬ এপ্রিল। পুত্র যজ্ঞেশ্বর শীল পিতার উত্তরসাধক। রমেশচন্দ্র শীলের কবিগানের বয়ান লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কবিয়ালরা সাধারণত আসরে সওয়াল জবাবের খেলায় মেতে ওঠেন। চাপান ও উতোরের খেলার মধ্যেই কবিগানের আসল রস। এই অবস্থায় সেকালে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের খেলায় স্বতঃস্ফূর্ত গানের বাণীকে কালি-কলমের বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব হত না। প্রত্যক্ষদর্শী শ্রোতাকে স্মৃতির উপর নির্ভর করেই বিবরণ দিতে হয়। রমেশ শীলের কবিগানকে উহ্য রেখে তাঁর অন্যান্য গান সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি অসংখ্য গান লিখেছেন এবং অর্থের সাশ্রয় হলে ছাপিয়েছেন। অনেক গান পাণ্ডুলিপিবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। এ যাবৎ প্রকাশিত গানের বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'রমেশ শীলের শ্রেষ্ঠ

গান ও ছড়া' 'চাটগাঁয়ের পল্লীগীতি', 'দেশের গান', 'লোক কল্যাণ', 'অশোক মালা', 'নূরে দুনিয়া' ইত্যাদি।

জন্মকাল থেকেই দারিদ্র্য ছিল রমেশচন্দ্রের নিত্যসঙ্গী। পিতা চণ্ডীচরণ সামান্য ক্ষৌরকারবৃত্তি, টোটকা চিকিৎসা ইত্যাদি করে কায়ক্লেশে সংসার প্রতিপালন করতেন। বাল্যকাল থেকেই তরজা গানের ওপর রমেশচন্দ্রের প্রবল আকর্ষণ ছিল। আসরের গান শুনে এসে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বাড়িতে তারই অনুকরণ করে গাইতেন। এ বিষয়ে তাঁর অন্যতম উৎসাহী বন্ধু ছিলেন শ্যামাচরণ। চণ্ডীচরণ ছেলেকে উৎসাহ দিতেন। পিতার কিনে দেওয়া একখণ্ড 'বৃহৎ তরজার লড়াই' কণ্ঠস্থ করতে শুরু করলেন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে এবং নিজেরাই এ বাড়ি ও বাড়িতে আসর বসাতে লাগলেন। কিন্তু বেশি দিন তা সম্ভব হল না। এগার বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটলে সংসার চলা দায় হয়ে উঠল। মা, দিদিমা ও তিনবোনকে নিয়ে সংসারে বালক রমেশ একমাত্র পুরুষ। অতএব, জীবিকার তাড়নায় পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ না করেই রমেশ উপার্জনের আশায় পথে বেরুলেন এবং কিছুদিন পরেই ভাগ্যের অন্বেষণে বর্মার পথে পাড়ি দিলেন ও বছর সাতেক বর্মায় থেকে দেশে ফিরে এলেন। একদিকে জীবিকার তাড়না অপরদিকে কবিয়াল হবার প্রবল বাসনা। বাসনাকে বশে আনার জন্য নীরব সাধনা চলল। সে সময়ে ঐ অঞ্চলের সেরা কবিয়াল ছিলেন চিন্তাহরণ ও মোহনবাঁশী। এঁরা দুজনেই ছিলেন সামান্য শিক্ষিত কিন্তু পাদপূরণে অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী। যুবক রমেশ খবর পেলেই ছুটতেন তাঁদের আসরে এক দুর্নিবার আকর্ষণে। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাঁদের গান শুনতেন এবং কবিগানের প্রথা-প্রকরণগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করতেন। নীরবে কঠোর অধ্যবসায় চলল দীর্ঘদিন। ঘরে পাঠ করতেন নানারকম পুঁথি ও পাঁচালী। হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলামী শাস্ত্র, কোরাণ, পুরাণ, হদিস প্রচলিত লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনী ও কেচ্ছা, দেবদেবীদের লীলা। প্রত্যেক কবিয়ালকেই আসরে বুদ্ধি ও স্মৃতিনির্ভর হতে হয়। মনই তার একমাত্র স্মারক ও সহায়ক। তাঁর এই অধ্যবসায়ের ফল লোকমুখে একদিন এক আসরে নাটকীয়ভাবে কাজে লেগে গেল এবং সেইখান থেকেই তাঁর কবিয়ালখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। রমেশচন্দ্র একদিন চট্টগ্রাম শহরে গেলেন কবিগান শুনতে। সদরঘাট জেলেপাড়ায় কবিয়াল মোহনবাঁশী ও চিন্তাহরণের লড়াই। চিন্তাহরণ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় বন্ধুদের আগ্রহে রমেশচন্দ্র আসরে এলেন মোহনবাঁশীর বিপক্ষে। আসরে প্রবল উত্তেজনা। অখ্যাত ও অজ্ঞাত

নবীন রমেশচন্দ্র প্রবীণ মোহনবাঁশীর হাতে কিভাবে নাজেহাল হয় তাই দেখার জন্য শ্রোতারা উদ্‌গ্রীব। কিন্তু নবীন রমেশ ধীরে ধীরে প্রতিপক্ষের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করলেন যে, কবিগান রাত গড়িয়ে দিন গড়িয়ে পরদিন সন্ধ্যায় সাঙ্গ হল জোট মিলিয়ে দেওয়ায়। এই আসরে রমেশচন্দ্র পাঁচ টাকা পুরস্কার পেলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কবিয়াল হিসাবে গণ্য হলেন।

এরপর রমেশচন্দ্র রাতের পর রাত বিভিন্ন আসরে কবি গাইতে লাগলেন। কিন্তু বায়নার টাকায় উদরপূর্তি ঘটে না। সব লোককবিই এই দুর্ভাগ্যের অধিকারী। একদিকে গ্রাম্য কবিয়ালদের চরম দারিদ্র্য, অন্যদিকে কবিখ্যাতি ও আসরে শ্রোতাদের সপ্রশংস অভিনন্দন। এই দুয়ের সঙ্গে আপোষ করে চলা কঠিন। তবুও একটা প্রচণ্ড জেদ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। স্বভাবতই অনেক প্রশ্ন তাঁর চিন্তায় এসেছিল এবং এ সবের উত্তরও পেয়েছিলেন বঙ্কিম সেনের সাহচর্যে কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে এসে। কবিয়াল রমেশচন্দ্র শীলের গণকবিয়াল ও গণশিল্পী হয়ে ওঠার পিছনে বঙ্কিম সেনের অবদান অবিস্মরণীয়। প্রকৃত গণশিল্পীকে রাজনীতি ও সমাজসচেতন হতে হয়। মার্কসবাদ চর্চা বিনা এ চেতনা সম্ভব নয়। বঙ্কিম সেন রমেশচন্দ্রকে মার্কসবাদে দীক্ষা দিলেন। বঙ্কিম সেন প্রথমদিকে নিয়ত তাঁর সঙ্গে থেকে প্রতি আসরে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু, প্রশ্ন ও উত্তরের নোট টুকরো টুকরো কাগজে লিখে লিখে দিতেন।

রমেশচন্দ্রের উৎসাহদাতাদের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকও কম ছিল না, মুসলমানপ্রধান জেলা চট্টগ্রামে মুসলমান অনুরাগী শ্রোতাদের জন্য তাঁকে ইসলামী শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়েছিল। ইসলামী আউল ফকির ও পীরের কাহিনী জানতে হয়েছিল। তাঁদের সুফি মতবাদ তাঁর প্রথম জীবনে রমেশচন্দ্রকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে এবং এই মানবিকতার প্রভাব থেকে তিনি চ্যুত হননি কখনও। প্রকৃতপক্ষে সুফিবাদ ও মার্কসবাদ তাঁর জীবনে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। অন্য অনেক হিন্দুর মতো তিনিও মাইজভাণ্ডারের বিখ্যাত পীর সাহেবের শিষ্য হয়েছিলেন। মাইজভাণ্ডারে পীর সাহেবের জন্মদিনের মেলায় হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যরা সমবেত হয়ে সংগীত বিনিময় করতেন। যেমন অনেকটা কবি জয়দেবের কেন্দুলি মেলায় হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে রমেশচন্দ্রের অনেক গানেই সুফী মতবাদের প্রভাব দেখতে পাই।

'প্রাণ দিয়ে ভাই থা'তে হবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের তরে,
দেশের মানুষ না বাঁচিলে আমরা বাঁচি কি প্রকারে ॥
নরঘটে নারায়ণ,
হাদিসে রসুলের বচন,
নরসেবা করে যে জন এবাদর্ত কই তাহারে ॥'

এ অবশ্য পরবর্তীকালের কথা। তার আগে মাইজভাণ্ডার পর্বে তিনি অনেক দেহতত্ত্বমূলক গান লিখেছেন। তার অধিকাংশই হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির গান এবং মারিফাতি গান। যেমন—

১. তোরা দেখবি যদি ধরায় আয়
এক থামেতে ঘর বেন্ধেছে বন্ধুয়ায়।
ঘরের নয় দরজা উল্টা কলে
বাতাস খেলে সর্বদায় ॥

২. দেখে যারে মাইজভাণ্ডারে আজব রংয়ের ফুল,
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পড়ে আশেক অলিকুল ॥'

রমেশচন্দ্র তাঁর জীবৎকালে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন। আর প্রত্যক্ষ করেছেন বিভিন্ন কালের গণ আন্দোলন। স্বদেশে দেশপ্রেমের উত্তাল ঢেউ থেকে কখনও নিজেকে তিনি সরিয়ে রাখেন নি। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে সংগঠিত আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘটকালে ১৯২২ সালে রমেশ শীলের গান উল্লেখযোগ্য—

'আর যায় না চুপ করে থাকা,
যতীন্দ্রবাবুর নেতৃত্বে বন্ধ হবে রেলের চাকা ॥'

খিলাফৎ আন্দোলনপর্বে তিনি গাইলেন—

'বিভেদ আগুন দিয়া জ্বালি, ভাইয়ে ভাইয়ে ঘর ভাঙালি,
শোষণ করিস পোষণ ভুলি, তোকে তোষণ করা যায় না।'

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিপ্লবী সূর্য সেনের নাম চিরস্মরণীয়। তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এক অগ্নিক্ষরা ঘটনা। সারা চট্টগ্রাম সেই আগুনে জ্বলে উঠেছিল। জালালাবাদ পাহাড়ের সংগ্রামে চট্টগ্রামের বীর সন্তানেরা জীবন আহুতি দিলেন। এই পর্বে রমেশচন্দ্র গাইলেন—

'বীরের দেশে জনম লভেছি, পূর্ণ হয়েছে মনোসাধ,
শহীদের খুনে রাঙা তুমি জালালাবাদ, জালালাবাদ!'

রমেশচন্দ্র ক্রমে মার্কসবাদের সংস্পর্শে এলেন। হীনমন্যতা ও দারিদ্র্যের

গ্লানি থেকে দরিদ্র কবিয়ালদের মুক্ত করার মানসিকতা তাঁর বহু আগেই জন্মেছিল। পেটের দায়ে গ্রাম্য কবিয়ালদের অশ্লীল ভাষায় গান গেয়ে ও অঙ্গভঙ্গী সহকারে নেচে ধনী জমিদারদের মনোরঞ্জন করতে হয়। রমেশ-চন্দ্রকেও এককালে তা করতে হয়েছে বলে বুকে তাঁর আগুন জ্বলত। তাঁর গানে কাজেকর্মে এক ধরনের বিদ্রোহ প্রকাশ পেত। বঙ্কিম সেন এই সময় তাঁকে হাতে ধরে কমিউনিস্ট পার্টির কাছে নিয়ে এলেন। এ যাবৎ রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের যে প্রশ্নে রমেশচন্দ্র সতত উদ্বেলিত হচ্ছিলেন তার উত্তর তিনি পেলেন কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক দর্শন পাঠ করে, তাঁদের কর্মকাণ্ডের সংস্পর্শে এসে। অতপর ১৯৪৩ সালে রমেশচন্দ্র শীল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করলেন। ১৯৪৩ সালেই চট্টগ্রাম কৃষক সমিতির জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বাগোয়ানে এবং এই সম্মেলন মণ্ডপেই রমেশ শীলের উদ্যোগে চট্টগ্রাম জেলা কবি সমিতি গঠন করা হল। এই সমিতির সভাপতি হলেন রমেশ শীল নিজে। নিঃসন্দেহে এই সমিতি গঠন তাঁর জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ফণি বড়ুয়া হলেন সমিতির সম্পাদক।

১৯৪৩ সালের মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সারা বাংলার জনজীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছিল। চট্টগ্রাম ছিল তার এক বীভৎস শিকার। রমেশ শীল তাঁর কবিয়াল গোষ্ঠীকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মজুতদারের বিরুদ্ধে, সরকারি অনাচারের বিরুদ্ধে। যুদ্ধের দরজায় বসে একদিকে মজুতদার ও কন্ট্রাকটাররা লক্ষ লক্ষ টাকা লুটছে আর একদিকে সাধারণ কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় ধুঁকছে। এক অকল্পনীয় দুর্ভিক্ষে সারা বাংলায় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ অসহায় মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। সন্তানের ক্ষুধার অন্নের জন্য সতী নারীর ইজ্জত বিক্রির ইতিহাস বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। সাধারণ বিত্তহীন মানুষ হিসাবে কবিয়ালরাও তখন মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। রমেশ শীলের নেতৃত্বে শুরু হল মন্বন্তরের বিরুদ্ধে অভিযান গণসংগীতের হাতিয়ার নিয়ে। বঙ্কিম সেন হলেন তার দিগদর্শক। রমেশ শীলের গান তখন সারা বাংলার সংগ্রামী মানুষের গান। রমেশ শীল দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে গাইলেন—

> 'দেশ জ্বলে যায় দুর্ভিক্ষের আগুনে
> এখনও লোক জাগিল না কেনে?'

জাপবিরোধী পর্বে গাইলেন—

> 'কোথায় গেলা আমারে ছাড়িয়া ও পরাণের বন্ধুরে,

টাকার আশে রেঙ্গুন গেলা, পুনঃ ফিরে না আসিলা,
দুষ্ট জাপানে রাখিল বান্ধিয়া।'

এরকম অসংখ্য গান চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রমেশচন্দ্রের যে সমস্ত গান পুস্তকাকারে প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্য থেকেই তাঁকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তাছাড়া তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহীর মুখে মুখেও তাঁর গাওয়া কবিগানের অসংখ্য কলি গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। কবি সমিতির সম্পাদক ফণি বড়ুয়া ও রাইমোহন ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য। তাঁরা রমেশচন্দ্রের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন। আর সুধী প্রধান ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদনে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা মারফৎ আমরা তাঁর সঙ্গে একাত্ম হলাম।

১৯৪৫ সালে কলকাতায় মোহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্মেলনে রমেশচন্দ্র শীলের কবিগান ছিল উপস্থিত অগণিত শ্রোতার জীবনে এক পরম প্রশস্তির অভিজ্ঞতা। শেখ গোমহানী ও লম্বোদর চক্রবর্তীর বিপক্ষে তিনি গেয়েছিলেন। তাঁর গানে বেজেছিল এক মহাকাব্য। ইতিপূর্বে তো নয়ই তার পরেও অন্য কোনও কবিয়ালের অন্তর থেকে এত গভীর বাণী নির্গত হয় নি। (ব্যতিক্রম একমাত্র মেটিয়াবুরুজের শ্রমিক-কবিয়াল গুরুদাস পাল ও ময়মনসিংহের চন্দ্র সরকার। গুরুদাস পাল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ছিলেন। চন্দ্র সরকার পাকিস্তানী জেলে বন্দী অবস্থায় পুলিশী অত্যাচারের শহীদ হন।) কলকাতার আসরে বাংলার অগ্রণী বিদগ্ধজনের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় People's War পত্রিকার ১।৪।১৯৪৫ সংখ্যায় লিখলেন—'When Ramesh Seal portrayed the devastation that imperialist exploitation has brought upon our land and sang of national unity, it was obvious that any day Ramesh could beat most speakers hollow......' এই কবিগানের মূল বিষয়বস্তু ছিল মন্বন্তর, সাম্রাজ্যবাদী অপশাসন ও শোষণ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক শক্তির ভূমিকা।

ইতিমধ্যে রশীদ আলি দিবসের এক সংগ্রামী অধ্যায় শেষ হয়েছে। তারও আগে শহীদ রামেশ্বর দিবস, গুলি চালনা ও তার প্রতিরোধে সারা কলকাতা উত্তাল। রমেশ শীল গান গাইলেন—

'তোমরা শুনছনি খবর
গুলি করে ছাত্র মারে কলকাতা শহর।।'

এই ১৯৪৫ সালেই নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত হল সারা ভারত কৃষক সম্মেলন। সেখানে উল্লেখযোগ্য সূচী ছিল রমেশ শীলের কবিগান, প্রবীণ কৃষক নেতা ইরাবৎ সিংয়ের নেতৃত্বে মণিপুরী স্কোয়াডের লাইছা বৌবা ও খাদ্দল নৃত্য, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের পরিচালনায় সুর্মাভ্যালি স্কোয়াড (নির্মলেন্দু চৌধুরী, খালেদ চৌধুরী, গোপাল নন্দী, হেমন্ত মিশ্র)। ঢাকা ময়মনসিংহ ও রংপুরের স্কোয়াড, অন্ধবাদক টগর অধিকারীর অবিস্মরণীয় দোতারাবাদন, নেত্রকোণার পল্লীকবি জামসেদউদ্দীন, রশিদউদ্দীন ও অখিল চক্রবর্তীর গান। রমেশ শীল নিজেই বলেছেন যে, এখানকার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ তাঁর জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। প্রবল বৃষ্টিপাতে জল থৈ থৈ মাঠে সারাক্ষণ শ্রোতারা উবু হয়ে বসে পরম তৃপ্তি সহকারে গান শুনেছিলেন। রাত্রে অধিবেশন শেষে রমেশ শীল ও অন্যান্য সব শিল্পীরা হ্যাজাগ জ্বালিয়ে ঢোল ডাগর বাজিয়ে সারা নেত্রকোণা শহর পরিক্রমা করলেন উদ্দাম আনন্দে। এরপর থেকেই সারা ভারতে সংগ্রামী কৃষকদের মধ্যে রমেশ শীলের নাম ও গান ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর কিছু গানের বই এ সময়ে প্রচারিত হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে অনেক উত্থান, পতন ও মৃত্যুর পথ ধরে দেশভাগ হল বা স্বাধীনতা এল। রমেশ শীল নিজের দেশ বলে পাকিস্তানকে গ্রহণ করলেন। সব দেশেই তো সুখ দুঃখ আছে, সব দেশেই বাঁচার লড়াই আছে। কিন্তু এই দেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ভাই-বেরাদরদের ফেলে তিনি কোথায় যাবেন ? এঁদেরই প্রেম ও প্রীতিতে তিনি ধন্য। (বরিশালের ক্ষীরোদ নট্ট তো নিদারুণ কষ্টের জ্বালাময়ী উদাহরণ)। রমেশচন্দ্র পাকিস্তানকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করলেন এবং স্বভাবতই পাকিস্তানশাহীর জনবিরোধী কার্য-কলাপের সঙ্গে তিনি আপোষ করলেন না। ভাষা আন্দোলনের স্বপক্ষে আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে তিনি গর্জে উঠলেন—

'দুঃখের কথা কারে বলি বাংলা ভাষা গেলে চলি
সাড়ে চার কোটি বাঙালীর আত্মহত্যা করাই ভালো।'

১৯৫৪ সালে তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ হল এবং রমেশচন্দ্র বিনা বিচারে পাকিস্তানী কারাগারে বন্দী হলেন। তখন তাঁর বয়স ৭৭ বৎসর। এই জনপ্রিয় কবিয়ালকে এক বছরের বেশি জেলে আটকে রাখা সম্ভব হল না। এই বছরেই ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে তিনি লোক সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫৬ সালে তাঁকে কাগমারী সম্মেলনে পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিয়ালের সম্মান দেওয়া হল। তারও আট বছর

আগে ১৯৪৮ সালে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক কবিগানের আসরে তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবিয়ালের পদক দেওয়া হয়। সারা পূর্বপাকিস্তানে তিনি অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠ কবিয়ালের সম্মান পেলেন। অসংখ্য স্থানে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হল।

তাঁর সংগ্রামী জীবনের শেষ অধ্যায়ে রমেশচন্দ্র তাঁর স্বদেশের মানুষের কাছ থেকে যে মর্যাদা পেলেন তা তিনি সর্বদাই সকৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করেছেন। এই স্বীকৃতি তিনি সর্বদাই গ্রহণ করেছেন সারা বিশ্বের শোষিত ও অবহেলিত সংগ্রামী লোককবিদের পক্ষ থেকে। রবীন্দ্রনাথ সেকালের কবিয়ালদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন—'নষ্টপরমায়ু কবির দল।' রমেশচন্দ্রের কর্মজীবন ও আদর্শ এই মন্তব্যের মূর্ত প্রতিবাদ। এই মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশ রমেশচন্দ্র শীলের শততম জন্মবর্ষে তাঁর স্মৃতিকে কতটুকু মর্যাদা দিয়েছেন জানিনা। পশ্চিমবঙ্গের স্মৃতির দুয়ার কতটা উন্মুক্ত তাও অজ্ঞাত। তিনি যে এক নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজও অসম্পূর্ণ। আমরা তাঁর যোগ্য উত্তরসাধকদের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছি।

ইরান জার্নাল

দরবেশ

তেহেরানে ক্রস-কানেকশান

তেহরানে আমার দেখভাল করার লোক মহরুখের মত সদাপ্রফুল্ল মহিলার একটি দৃঢ় বিশ্বাস: যে মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না, বেল সাহেবের আবিষ্কৃত যন্ত্রটির খপ্পরে পড়লে সেও কঁকিয়ে উঠবে, খোদা হাফিজ—হরি হে, তুমিই সত্য!

কথাটা এখন মনে পড়ল। কারণ, অ্যারপোর্ট লাগেজ আপিশের নিঃসাড় নাম্বারটিকে কোনো ক্রমেই বাগে আনতে পারছি নে। নাম্বার মিলিয়ে-মিলিয়ে ডায়াল করা মাত্র রিসিভারে একে একে হরেক কিসিমের হরবোলার আবির্ভাব ঘটছে, মায় হাফ-তোতলা এক বেচারা। ঝনঝনিয়ে রেগে উঠে সে বলল, অ্যালো অ্যালো, এই হারামজাদা, তুই আলবৎ সেই অ্যাননিম্যাস ছোকরাটা যে একটু আগে আমার ওয়াইফকে অসভ্য কথা শুনিয়েছিল? তু-তু-ই ইয়ার্কি পেয়েছিস?—অঁ্যা

লাগাতার টেলিফোন করে করে এইরকম হয়। কারো কারো ভুল কানেকশান পাচ্ছি, নয় হঠাৎ-হঠাৎ ক্রস-কানেকশনে তাদের প্রভাতী বার্তালাপ শুনছি যাদের অস্তিত্বটুকুও আমার কাছে এযাবৎ অজানা ছিল। অথচ ওই বেচারা হাফ-তোতলা মানুষটি সমেত ওরাও আছে। আমারই ধারেপাশে। কী ভালোই না হত যদি সবাইকে চিনতাম।

এতক্ষণ খেয়াল ছিল না আমি গামছা পরে বসে, মানে তোয়ালে পরে,

টেলিফোন করছিলাম। কোমরের গামছাটা আচমকা আলগা হতে যেতে সচেতন হই। ভাগ্যিশ এ সময় মহরুখ প্রাতরাশের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। টেলিফোনের মাউথপিস হাতে চেপে ধরে খুব একচোট হেসে নিই।

ঝট মুখের হাসিটা মুখেই শুকিয়ে যায়। ওদিকে হ্যালো-হ্যালোর বদলে কেমন করে যেন ঢুকে পড়েছে পুলিশের বেতার নির্দেশ, 'দানিশগাহ হামলা··· পুলিশ...' পুলিশি রণচাঞ্চল্য কোনো হাসির খোরাক নয়। লাইন ছেড়ে দিই। কি জানি যদি কানে এসে দমাদম বন্দুকের গুলি ফাটে। অবিশ্বাস্য কত রকমারি অত্যাধুনিক সফিস্টিকেটেড মারণাস্ত্র বেরিয়েছে তো।

তা বলে গুলি চলাচলির সংবাদটিও আমার কাছে কোনো জরুরি প্রবলেম নয়। আপাতত আমার একটিই প্রবলেম। এবং সেটি সামান্য একটি ফাইবার স্যুটকেসকে ঘিরে। বহু ব্যবহৃত আমার এই স্যুটকেসটির অস্তিত্ব সম্পর্কে আমি উদ্বিগ্ন। শিরাজ ছাড়বার সময়, পাঁচ দিন আগে, স্যুটকেসটা যথাবিধি লাগেজ-কাউন্টারে জমা দিয়েছিলাম। রেজাদে শাফাকের ট্রাঙ্ককল পেয়ে তড়িঘড়ি আমাকে তেহরান ফিরতে হয়েছিল। নজরুল মুস্তাফি ইস্পাহান থেকে এসেছিল। অ্যারপোর্টের ডেলিভারি কাউন্টারে আমার স্যুটকেস নো পাত্তা। অর্থাৎ জিনিশটা এই ছিল, এই নেই। না ভাই, আমার স্যুটকেস নাড়লে ঝম-ঝম মোহর বেজে উঠবার নয়। স্যুটকেসে আছে আমার যাবতীয় জামাকাপড়। অর্থাৎ আমিই আছি ওতে; আমার পরিচয় তো আমার জামা-কাপড়। সেই ইস্তক সকাল-বিকেল প্রতিদিনই টেলিফোন করি, কী হে আমার স্যুটকেস? এর জবাবে প্রতিদিনই বিমান-বন্দর থেকে বিবিধ কণ্ঠে অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে ওরা আমায় সেলাম জানায়, শুভেচ্ছা জানায়। নানাজনে সমানে আশ্বাস দেয়। বলে, আজই আপনার স্যুটকেস এসে যাচ্ছে; বলুন আপনার জন্যে আর কি করতে পারি? অথচ স্যুটকেসটা যে তিমিরে ছিল সেই তিমির থেকেই দস্তুর মতো এখন আমার পিত্তি-হেঁচকি তুলিয়ে ছাড়ছে। এবং সেইটিই আপাতত আমার একমাত্র সমস্যা। বিমানবন্দরে গেলে ওরা মাখমের মতো গলে পড়ে বলে, 'ফার্দা'। উঁহু, ওটি কোনো লঘু বা হাল্কা শব্দ নয়। ওই একটি ফার্শী শব্দতেই আছে আর্য-ইরানের সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞান। বাকিটা বলার প্রয়োজন হয় না; বুঝে নিতে হয়।—নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে।

অথবা এও সম্ভব, শুধু ওদের কাজকর্মের বিষয়েই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিশিদিন অভিযোগ শুনতে শুনতে ওরা তব্‌র হয়ে গেছে; সুতরাং বাড়তি

ঠাণ্ডাইটা হয়ত আগামী কল্যের জন্যে স্থগিত রাখতে চায়। 'ফার্দা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ তো আগামী কল্য। যে কোনো সরকারি দপ্তরে যে কোনো কাজে যাও, এমনকি ইনকামট্যাক্স জমা দিতেও বা, নির্ঘাৎ ওই শব্দটি শুনবেই শুনবে। মুস্তাফি এসেছিল সরকারি খরচে সরকারি কাজে সরকারি আমন্ত্রণে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বড়-সাবের সেক্রেটারি স্মার্ট মেয়েটি বলে বসে, আজকে নয় স্যার কালকে আসবেন, ফার্দা। মুস্তাফি হেসে জানায়, আমাকে যে আজকের কনফারেন্স ডাকা হয়েছে!

এরা আমার আত্মীয় নয়। কিন্তু তবুও এদের আত্মীয়তায় আমি নিঃসন্দেহ। সন্দেহ হচ্ছে শুধু আমার নো-পাত্তা সুটকেসটি নিয়ে। এটুকু মালুম, সুটকেসটা কেমন করে যেন উল্টো পথে দক্ষিণ-পশ্চিমের তৈলনগরী আবাদানে উড়ে চলে গেছে। একমাত্র রক্ষে, রেজাদের চেষ্টায় কল্য পর্যন্ত স্থগিত না রেখে সেটা ওরা চটপট ট্রেস করে ফেলেছে।

ফের ডায়াল করি। বাড়িটা কিরকম খালি-খালি লাগছে। মুস্তাফি কালকে বিকেলের প্লেনে ইস্পাহান চলে গেল। তার তেহরান আসার আগাম বার্তা পেয়ে ঝটপট আমি শিরাজ থেকে চলে এসেছিলাম। নচেৎ এই সুটকেস বিভ্রাটটা ঘটতই না। ভেবেছিলুম মজাসে টুরিস্ট বাসে আসব। পথের দৃশ্য দেখতে দেখতে, মানুষ চিনতে চিনতে। মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে কি ভালোই না লাগে।

আবার ক্রস-কানেকশান। লাইন ছেড়ে ফের টেলিফোন যন্ত্রের চাকা ঘোরাই। শহরতলি শেমিরান। জানলার বাইরে পাহাড়ের গায়ে ঝরছে স্বচ্ছ জলের ঝরণা। সারিসারি নেবু গাছ। চিনার গাছ। গাছে গাছে টুকটুকে লাল ফুটফুটে কি যেন পাখি। হলুদ রঙের জাম্পার পরে এক দঙ্গল তুলতুলে ছেলেমেয়ে বরফের ওপর করছে বাই বাই স্কেটিং।

দূর-ছাই রং নাম্বার!

আবার ডায়াল করি। আমার টেবিলের ফুলদানিতে একগুচ্ছ সদ্য-ফোটা ভেজা ভেজা রক্তাভ গোলাপ। ভোরের চা দেবার সময় মহরুখ রেখে গেছে নিত্যকার মতো। এদিকে কোমরে গামছা জড়িয়ে ঝুটমুট আমি বসে আছি আমার প্রবলেম নিয়ে। যে প্যান্ট-কোট পরে তেহরানে নেমেছিলাম সেগুলি আবার বুদ্ধি করে তড়িঘড়ি মহরুখখানী লাউনড্রিতে দিয়েছেন। এই অভিজাত পল্লীর সবচেয়ে স্টাইলের বাত্তানুকূল লাউনড্রি। পরের দিন যথা সময়ে ডেলিভারি নিতে গিয়ে দেখি দোকানে পুলিশের ইয়া-বড়কা

এক তালা ঝুলছে। লাউনড্রির মালিককে পুছতাছ করে নয়, সোজা কোতোয়ালিতে গিয়ে রেজাদে জানতে পায়, উরি বাপস্, দোকানে তালা সেঁটেছে পাড়ার কোতোয়াল নয়, কেন্দ্রীয় সিক্রেট পুলিশ সাভাক! সাভাক তো কারোকে ছেড়ে কথা কয় না। ব্যাপারটা ময়ূর সিংহাসনজনিত না হলে সাভাকের কর্মতৎপরতার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং অবস্থা ভয়ঙ্কর খতরনাক। এবং আমার এই দুশ্চিন্তা।

লাউণ্ড্রিতে কাচতে দেওয়া কার যেন কোটের পকেট থেকে বুঝি গেল বুধবারে লণ্ডন 'টাইমস' পত্রিকার একটা ক্লিপিং পেয়েছে সাভাক। ক্লিপিংটির বিষয়বস্তু রাজনৈতিক; এমেনেস্টি ইনটারন্যাশনাল নামক হাড়বজ্জাত সংস্থার মাসিক রিপোর্টে প্রকাশ, ইরানে রাজবন্দীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চলছে। এহেন নির্জলা মিথ্যের প্রচারপত্র যে লাউণ্ড্রির ভুঁই ফুঁড়ে বেরোয় সেই ধোবিখানাকে কোন দায়িত্বশীল সরকার ধোলাই না করে ছাড়ে বলো? এরা ভয়ঙ্কর ভদ্রলোক বলেই না দোকানে শুধু তালা ঝুলিয়ে ছেড়ে দিয়েছে! তবে এই তালা যে কবে খুলবে খোদা মালুম। লাউণ্ড্রি প্রোপ্রাইটারের মুখ শুকিয়ে তো এত্তটুকুন আমসি হয়ে গেছে। বলা যায় না, কোথাকার পানি আখেরতক কোন গভীরে গিয়ে গড়ায়। জামাকাপড় তো খালি কতকগুলো ন্যাতা-ই নয়। ওরও নিজস্ব তাপ আছে, জান আছে, কানও আছে। আর সেই কান টানলে কানের একজন কর্তাও আছে। এবং সেই একজন যে লাউনড্রি-প্রোপ্রাইটার লাখপতি জাকি বাহারের মধ্যমপুত্র ইশান বাহারের কোনো ইয়ারদোস্ত নয়, তারই বা সঠিক গ্যারান্টি কী। ইশান তো শুনি চোঙা-প্যাণ্ট পরা জুলফি-দার সেই ছেলেটি পেশায় যে 'খবরনিগাহগার', অর্থাৎ সাংবাদিক। ওর বয়েসী কয়েকজন মিটমিটে শয়তান সাংবাদিককেও এখন ইস্পিশাল জেলে ঘানি টানতে হচ্ছে। শুধু কি নওজওয়ান সাংবাদিকদের নিয়েই বিপদ। সমাজ-বিজ্ঞানী ঘুঘু একটি তরুণীকেও রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে সাভাক। সমাজবিজ্ঞানী আছ তো আছ। তোমার জ্ঞানটাকে দশজনের মধ্যে চারিয়ে দেবার প্রয়োজনটা কী শুনি? আর, ভিদা তাবরিজি নামের আরকিটেক্ট সেই মেয়েটা? তাকেও তো দিনে দুপুরে তেহরানের রাজপথ থেকে চ্যাঙদোলা করে তুলে নিয়ে গেল সাভাক। তার সঙ্গে আসছিল দশ-এগারো বছরের একটি বালক। দেখেশুনে সে বুঝি ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে-ছিল। সাভাকের মাত্র একটি গুলিতেই মুহূর্তে তার কান্না থেমে যায়, দুহাতে বুক চেপে ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। রাস্তার সবাই চোখে দেখল দৃশ্যটা।

দর্শকরা তো মাথায় গোবর পুরে ঘুরে বেড়ায় না। জানে দুই আর দুইয়ে হয় চার। শুধু বুড়ো মতন একটা বোকাসোকা লোক দর্শকদের দিকে চেয়ে একমুখ থুথু ছিটিয়ে চিৎকার করে ওঠে তওবা-তওবা, শেম্-শেম্! সাভাকের জওয়ানরা ঝাঁপিয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ পেঁদিয়ে তার হাড্ডি এক ঠাঁই আর মাস এক ঠাঁই করে ছেড়েছে। করবে না? তুই এত জেনেছিস দুনিয়ার, বুঝিসনে কিছু? তওবা-তওবা আর বলবি?

নাকি বুড়োটা দর্শকদের বলতে চেয়েছিল, বাস্তব জীবনে কোনো দর্শক নেই, তোমরা সবাই এতে অংশগ্রহণ করছ।

লোকটা বোধকরি মহম্মদ মোসাদ্দেকের অনুরাগী। সাধে কি আর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শনিচক্র সি-আই-এর মদতে সাভাক প্রতিষ্ঠানকে তিলে তিলে গড়ে তুলতে হয়েছে। সারা মধ্যপ্রাচ্যে এর জুড়ি নেই আজ। নেহাৎ সখ করে রিচার্ড হেলম্সের মতো স্পাইমাস্টারকে এদেশে মার্কিন রাষ্ট্র-দূত নিযুক্ত করা হয়নি। তিনিই না জগৎবিখ্যাত সি-আই-এর প্রাক্তন প্রধান অধিনায়ক। জীবনের সর্বোত্তম পঁচিশটি বছর তিনি সিয়ার মহৎকর্মে উৎসর্গিত থেকেছেন। শেষের দিকে তাঁর জীবন বিষময় করে তুলেছিল ওয়াটারগেট কমিশন যার মূলে ছিল দুজন চ্যাঙড়া সাংবাদিক, তাঁরই জাতভাই। রিচার্ড হেলম্সের কর্মজীবনে এই যা খামোকা অপবাদ। তবে তিনি তো ঝিমিয়ে পড়ার নখদন্তহীন সিংহ নন। তেহরানে পোকার খেলায় তাঁর দিল কা দোস্ত জেনারেল নাসেরী মেঘাধাম। এঁরই সুদক্ষ পরিচালনায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ মোসাদ্দেক গ্রেফতার ও পাগলাগারদে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। নইলে তো ময়ুর সিংহাসনটাই চিরতরে শাহেনশার হাতছাড়া হয়ে যেতে বসেছিল। তের বছর ধরে নাসেরী মেঘাধাম সাভাক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। শাহেনশার অবিশ্যি বাল্যবন্ধু এই নাসেরী সাহেব। একই ইস্কুলে দুজনের শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি। মানুষটি এমনিতে ভালো। বুলেট-প্রুফ গাড়ি ছাড়া পথে কোথাও বেরোন না। কারো কোনো পার্টি-ফার্টিতে যান না। কোনো বিয়ে-শাদী অ্যাটেণ্ড করেন না। ঠিক শাহেনশারই মতো। সব ভালো। কিন্তু আমার আপত্তি শুধু তাঁর চেহারা নিয়ে। খেতে অবিকল রামগড়ুরের ছানা; মুখে হাসির লেশমাত্র নেই।

তবে এও বলি, হাসি থাকবেই বা কি করে মুখে। যে দেশে মার্কিনী এমন টেলিফোন সার্ভিস সে দেশে মানুষ হাসে কি করে বুঝে পাই না। টেলিফোন যদি কাজেই না আসে বাড়িতে এটা রাখা কেন। অথচ সকালে

পরদিন তো ঠিকই টেলিফোন করেছিল। এই কয়দিন ওর সঙ্গে দেখাশোনা বেশি হয়নি। মুস্তাফিকে যেদিন খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল সেইদিন, আর একদিন যখন ওর সঙ্গে ছিল লণ্ডনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার করেসপনডেন্ট মিস লিজ থরগুড। অবিশ্যি এই কদিন আমিও এক জায়গায় কোথাও দাঁড়ে বসতুম না। মুস্তাফির সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে ফুরফুরে আনন্দে ছিলাম। মুস্তাফির মিটিং-মাটাং তো মাত্রই ছিল একদিন এক ঘণ্টার। বাকি সময় কি ঘোরাই না ঘুরেছি। সঙ্গে থাকত কখনো ওসমান। কখনো মহক্কথ। কখনো বা রেজাদে। যদিও রেজাদে মানুষটা কাজ-পাগল, তবু কাজ ছেড়ে আমাদের সঙ্গে ঠিকই জুটে যেত। তবে মুশকিল হয়েছে ওর প্যাণ্ট নিয়ে। ওর প্যান্টের ঝুল আমার পক্ষে অন্তত ইঞ্চি তিনেক বেশি। প্যাণ্টের বেড়টা আবার বিঘৎখানেক ঢলঢলে। তার এখানে ওখ'নে সেপ্টিপিন এঁটে এঁটে ঢিলেঢালা প্যাণ্টালুনে নেহাৎ খারাপ চালাচ্ছিলাম না। কিন্তু অদ্য রজনীতে সেটি চলিবে না। কারণ, ইরান সরকারের টপ সার্কেলের একটি ভোজসভা। সুউচ্চ সেই ভোজসভায় সাংবাদিকরা আমন্ত্রিত হয়েছে। উদ্দেশ্য, বিশেষ একটি প্রেস-বিজ্ঞপ্তি বিতরণ। আমন্ত্রিতদের ড্রেসের ব্যাপারে এরা কড়াক্কড়। উপরন্তু, ভোজসভায় স্বয়ং হিসম্যাজেষ্টি শাহেনশা উপস্থিত থাকবেন।

তবে দেখেশুনে এটাও বুঝেছি, অত্যধিক কাজের চাপে শেষমুহূর্তে শাহেনশা নাও আসতে পারেন। আপাতত তিনি প্রাসাদে বসে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অহোরাত্র ভাবিত। কেউ বোঝে না, ভাবে রাজ সিংহাসনটা খুব একটা সুখের গদি। যেন এতে ব্যক্তিগত লাভ। তাই মিলিটারি টাইট এন্তেজাম সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা বড়ই আদেখলেপনা শুরু করে দিয়েছে। দাবি তুলেছে, চাই হিউম্যান রাইটস। যত ধার করা বুলি। কী যে দিনকাল পড়েছে, যেন ইংরেজিতে না চেঁচালে দাবিটা কেউ বুঝবে না। সম্রাট সাইরাসের সময় যখন ইউরোপবাসী অন্ধকার গুহাবাসী ছিল, সেই তখন এদেশের মানুষের মানবিক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। গ্রীকদেশের পণ্ডিতরা এদেশে পড়াশোনার তাগিদে তাদের সন্তানদের পাঠিয়ে দিত। বিশ্বের প্রথম হিউম্যান রাইটস চার্টার কোথায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল? এই পারস্য দেশেই না! কেউ অস্বীকার করুক দেখি! সেই হিউম্যান রাইটস চার্টারের শিলালিপি, নকল নয়—আসলটি, এই বান্দাও সচক্ষে দেখেছে। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে। ইংরেজরা সেটা একশো বছর আগে ব্যাবিলনের মাটি খুঁড়ে বের করে গ্যাঁড়া মেরে দিয়েছে। তাই না ওরা আজ জানে

হিউম্যান রাইটস বস্তুটা কি। কথাটা কেউ অস্বীকার করুক দেখি। শাহেনশা যখন ১৯৭১ সালের হেমন্তকালে পার্সিপোলিস রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন তখন ইথিওপিয়ার সম্রাট হইলে সেলাসী সেখানে এসেছিলেন। বিশ্বের প্রাচীনতম রাজবংশের বংশধর তিনি। এশেছিলেন আফগানিস্তানের জাহির শাহ। মহেঞ্জদড়, আজ যাকে পাকিস্তান বা পবিত্রস্থান বলা হয়, সেই দেশের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান এসেছিলেন। আসেন নি তিনি, কেউ বলুক দেখি? মিসেস ইন্দিরা গান্ধী এই অনুষ্ঠানে হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটেশ্বর গিরিকে পাঠিয়েছিলেন। ফিরিঙ্গিস্তানের রাণী এলিজাবেথ সবিশেষ আমন্ত্রিত হয়েও বিশেষ কারণে আসতে পারেন নি, কিন্তু কি খেয়ালে তাঁর এক কনিষ্ঠ আমলার হাতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত সেই হিউম্যান রাইটস চার্টার শিলালিপিটি এক তপ্তার কড়ারে পাঠিয়ে ছিলেন। বিশ্বের গণ্যমান্য অতিথিরা সেটা দেখেছে স্বচক্ষে। বলুন দেখেন নি?

দেশের ছেলেমেয়েরা তো বোঝে না শাহেনশা দেশের যুবসম্প্রদায়কে প্রাণাধিক স্নেহ করেন। ওদের মন জয় করার জন্যেই না লক্ষ-কোটি টাকা জলের মতো খরচ করে পার্সিপোলিস অনুষ্ঠানটির আয়োজন করতে হয়েছিল। ছেলেমেয়েরাই যে ভবিষ্যতের ভরসা। কালের তো কালাকাল নেই, ওদেরই দেখভাল করার জন্যে শাহেনশা রেখে যাবেন আপন প্রাণতুল্য যুবরাজকে। কিন্তু যত ভড়কি দিচ্ছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড কমিউনিস্টরা আর ওভারগ্রাউণ্ড দক্ষিণপন্থী কট্টর মোল্লারা। কমিউনিস্টরা বলে, মনার্কি চলবে না, চলবে না। মোল্লারা বলে, বাদশাহি হুকুমত চাই না, চাই না। এতে কারই বা মাথার ঠিক থাকে বলো? ধরপাকড় চালাতে হচ্ছে। আইনের বিরুদ্ধে মস্তানি দেখানে কোন দায়িত্বশীল রাষ্ট্র চুপ থাকতে পারে শুনি?

বিনি পয়সায় শিক্ষা পেয়ে এইরকম নেমকহারাম হয়ে যাচ্ছে ছেলে-মেয়েরা। আগাগোড়া ফ্রী এডুকেশন কই সে কুবেরস্তান আমেরিকাতেও তো নেই।

এদিকে এই আক্রাগণ্ডার দিনে বাধ্য হয়ে শাহেনশা এক ক্ষেপে চার হাজার কোটি টাকা খরচ করে গুটিকয়েক ভীষণ-ভীষণ মার্কিন ফাইটার বম্বার, আর ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর ব্রিটিশ চীফটেন-ট্যাঙ্ক আনিয়ে ফেলেছেন।
—এবার?

এবার আর কী। প্রাণ শীতল হয়ে যাবে। কিংবা বলা চলে, খোদা হাফিজ। তবে লণ্ডনের ঠোঁটকাটা সাপ্তাহিক 'পাঞ্চ' পত্রিকা, যার আয়ু একশো বছরেরও বেশি, বিচ্ছু একটি কার্টুন ছেপেছে। মর্মার্থ, ওগো মিস্টার

রিচার্ড হেলম্‌স, তোমার অজানা নয় যত নষ্টের গোড়া সোভিয়েট রাশা। তোমার সিকরেট সংবাদ কী বলে? রাশাও বোধহয় থরথরি কম্পমান? আছে ওদের এত আধুনিক ইমপোর্টেড বম্বার আর ট্যাঙ্ক?

কিন্তু এই সকালে গামছা পরে বসে কার কি আছে না আছে অতশত নিয়ে আমার মাথাব্যথা কিসে! টেবিলের রক্তাভ গোলাপ আর টেকনিকলার টেলিফোনের পাশে বসে আমি ভাবছি আমার হারিয়ে যাওয়া সুটকেসে কিছু কাগজপত্রও আছে। ভাবতে না ভাবতে ওদিকে সদানন্দ মহরুখের তাজা-টাটকা গলা শুনতে পেলাম, 'দরবেশ স্যার ব্রেকফাস্ট রেডি।'

খেতে যাবার আগে আরেকবার দেখি যদি বিমানবন্দরের কানেকশানটা পাই।

ডায়াল করামাত্র এবার মার্কিনী বেদনার্ত স্বর, 'লিসন্ কেট' আই অ্যাম লুকিং ইট ফ্রম অ্যানাদার পয়েন্ট অব ভিউ—আমি বলছি না ব্যাপারটা যেভাবে আমি দেখছি সেটাই ঠিক। হয়ত তোমারটাই ঠিক। হয়ত কেন নিশ্চয়ই তুমিই ঠিক—নাও লিস্‌ন—' উফ্, যন্তর বটে একখানি! আবার ক্রস-কানেকশান। হতাশ হয়ে লাইন ছেড়ে দিই। অপেক্ষা করি। গামছা পরে বসে। ভোরবেলায় সুজ্জিঠাকুরের সঙ্গে সেই কখন উঠেছি। উঠে চা খেয়ে কাগজ-টাগজ পড়ে, শেভ করে, স্নানাদি সেরে এখন গামছা পরে বসে সমানে এই ক্রস-কানেকশানে বিশ্বদর্শন! লিস্‌ন কেট, লিস্‌ন,—অত ভনিতার কী প্রয়োজন? যা বলবার খোলাখুলি বলেই ফ্যাল না!

মহরুখের ডাক শুনছি। খেতে দেওয়া হয়ে গেছে। খাবার-দাবারকে আমি কখনোই হেলাছেদ্দা করবার পাত্র নই। তাছাড়া এদের রান্নার হাত কি অপূর্ব!

চারদিন পরে আজকেই প্রথম মুস্তাফিকে জলখাবার টেবিলে দেখব না। আজ শুধু রেজাদে, মহরুখ আর আমি। বাচ্চাটা অলরেডি ইস্কুলে। মুস্তাফি চলে যাওয়াতে বাড়িটা যেন ফুস করে নিভে গেছে। বলেছে সে আবার আসবে। সঙ্গে আনবে মেরিয়েমকে। সত্যি কী মজা হবে তখন। তদ্দিনে আমিও আজার-বাইজান থেকে ফিরে আসব। পরে যাব কাসপীয়ান সমুদ্রতটে। কাশী থেকে গান্ধার পর্যন্ত ভারতবর্ষ যখন আর্য সভ্যতায় উদ্ভাসিত, সেই তখন ওখানে মহামুনি কাশ্যপের তপোক্ষেত্র ছিল।

আজ অবিশ্যি তপোক্ষেত্রে সবই ইমপোর্টেড কাণ্ডকারখানা। আলু বেগুন সেপ্টিপিন পর্যন্ত ইমপোর্টেড।

বাজারে গেলে প্রায়ই দেখি শিক্ষিত ছেলে মেয়ে, সকলে নয়—কোনো কোনো ছেলে মেয়ে, মাথা নিচু করে হাঁটে লজ্জায়। কেন রে বাপু অত লজ্জা কিসের? ইমপোর্টেড কারবার ভালোই তো। কিছু তৈরি করার দিকদারি নেই, ফ্যাক্টরিতে স্ট্রাইক-ফ্রাইক হবার হুজ্জোত নেই, ট্রেড ইউনিয়নের নেতাগিরি নেই, এমন কি স্বাবলম্বী হবার বালাই পর্যন্ত নেই। দেশের বারো আনা জমিতে সেচ ব্যবস্থা নেই? তাতে কী। খাদ্যদ্রব্যের আশি ভাগ বিদেশ থেকে আনতে হচ্ছে? তাতে লজ্জাটা কিসের? তাছাড়া ওটা আশি ভাগ নয়, মাত্রই ষাট ভাগ। কী বললে? মহম্মদ মোসাদ্দেক যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন আশি ভাগ খাদ্যদ্রব্য তোমরা নিজেরা উৎপন্ন করতে? সো হোয়াট? ভাত ফেললে কাকের অভাব? বিদেশে পেট্রোলিয়ামের টাকা ছড়িয়ে যখন ঘরে বসে সবই পাচ্ছ তখন তোমাদের এই লজ্জাশরম শোভা পায়?

দেখেছ, মনে মনে ওদের কেমন কড়কে দিলাম? তবু জানি ওরা নির্লজ্জ। এখনো মাথা হেঁট করে হাঁটছে বাজারে, যেমন কখনো কখনো হাঁটে পরভিন, মহরুখ, ওসমান, মুস্তাফি। তোমাদের জন্যে সারা বিশ্বের সেরা সেরা জিনিশ বাজার উজাড় করে নিয়ে ওখানে সাজিয়ে রেখেছেন শাহেনশা। বাপের জন্মে সেক্স-স্টিমুলেটার দেখোনি, তাও এখন আমেরিকা থেকে ইমপোর্ট করা হচ্ছে। কোনোকালে রেস কোর্স দেখোনি, তাও এখন বিদেশিরা এসে বানিয়ে দিয়েছে। রেসের ঘোড়া আসছে বিদেশ থেকে। যা চাই তা-ই আসছে বাইরে থেকে; যায় নতুনতর মডেলের মার্কিন টেলিফোন যন্ত্রটি। এতেও মন ভরে না? কী বলছ? সেক্স-স্টিমুলেটার খেলনাটা বড়লোকদের ব্যাপার? দেশের শতকরা দুজন লোকের ভাগেও কোনো ইমপোর্টেড জিনিশ জোটে না? না জুটুক, তাতে তোমার কী এসে যায়? এত এঁড়ে তর্ক!

টেলিফোন ছেড়ে ধার করা প্যাণ্ট পরি। হারানো স্যুটকেশে কেবল আমার জামাকাপড় আছে তা নয়। ওতে আছে এদেশি অসংখ্য পরিসংখ্যান।

স্ট্যাটিসটিকস। দিস্তা দিস্তা ফিগারস। ওগুলো খোয়া গেলে কী করে আমার বই লিখব? লিখলেও সে-বই তো জ্ঞানীগুণীদের কেউ-ই খুলে দেখাব না। স্ট্যাটিসটিকস তাদের চাই-ই। কেনই বা চাইবে না। পরিসংখ্যান দিয়ে না লিখলে সে-বই আবার বই নাকি।

বই হোক না হোক আমি কিন্তু সত্যিই একটা বিপদে পড়ব। স্যুটকেসে আছে আমার পাসপোর্ট। ডামাডোলের দিনকালে বিনা-পাসপোর্টে নড়াচড়া

করা নিরাপদ নয়। অথচ প্রোগ্রাম ছকে রেখেছি এই হপ্তায় আজারবাইজন যাব। দেখেছি তো আগেও, ওই অঞ্চলের স্থানীয় পুলিশ দারুণ ফ্রেণ্ডাল। কিন্তু তাদের ওপরে যে কেন্দ্রীয় মিলিটারি পুলিশ তারা একমাত্র মার্কিন নাগরিক ছাড়া অন্য কারোকে বড় একটা ভালো চোখে দেখে না। সোভিয়েট রাশার একেবারে গা-লাগা প্রদেশ তো আজারবাইজান। গোটা প্রদেশটাই একবার শাহেনশার শাসনের আওতার বাইরেই চলে গিয়েছিল। তাই ওখানে এখনো টাইট ব্যবস্থা। যে সে টাইট নয়, গলা টেপা টাইপ। অলিগলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাভাকের গুপ্তচর। তবে এবার রেজাদের সঙ্গেই আমার ভ্রমণ। উচ্চতর মহলের বেবাক মানুষ ওর জানপহচান! আর কী ঠাণ্ডা মাথার মানুষ!

রেজাদে জানে আমার কোটের পকেটে মালকড়ি তেমন না থাকলেও হরহামেশা সংবাদপত্রের নানাবিধ কাঁচিছাঁট থাকে। সাত তাড়াতাড়িতে মহরুখ যদি ঠিকমতো না দেখেশুনে আমার জামাকাপড় লাউণ্ড্রিতে দিয়ে থাকে, তাই ধ্বক করে মনে একটা সন্দেহ জাগার পর ঠাণ্ডা মাথায় রেজাদে তৎক্ষণাৎ জানপহচান সাভাক-পুলিশের এক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে মোলাকাত করেছিল। পরে একসময় আমাদের খাবার টেবিলে বসে প্রসঙ্গটার উত্থাপন করেছে অতিশয় ঠাণ্ডা মাথায়। ও বলছিল, কোটের বার্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক। অধ্যাপক মশাইকে সসম্মানে সাভাক হেড-কোয়ার্টাসে হাজির করা হয়েছে। সাভাক-পুলিশ অধ্যাপককে পোলাইটলি প্রশ্ন করেছে, রাজবন্দীদের ওপর টরচার করা হচ্ছে এ খবরটা তুমি যে রটিয়ে বেড়াচ্ছ না তার প্রমাণটা কী? সত্যি বলো, তোমার প্রধান চিন্তাটা কী? তুমি কে?

খাবার টেবিলে বসে সমস্ত শুনে টুনে মহরুখ গলগলিয়ে হেসে উঠেছিল। ভাবখানা, আ-হা, আর্যসন্তানের উপযুক্ত গভীর প্রশ্নই বটে। তুমি কে? এই প্রশ্নের উত্তর জল-স্থল-আকাশের কোথাও নেই।

যাকগে, সাভাকের বজ্র-আঁটুনিতে পড়ে অধ্যাপক মশাই এখনো জেরবার হচ্ছে কিনা, অথবা চোখে সর্ষেফুল ফোটানোর তাগিদে তার ওপর সশ্রদ্ধায় কোনো থার্ড-ডিগ্রি মেথড প্র্যাকটিস করা হচ্ছে কিনা, সেসব আমার মতো ঠকঠক কাঁপা দুবলা আদমির জানার বিষয় না। যা এখুনি জানি, তা হল, রেজাদের প্যান্টের কোমরটা বেঢপ ঢলঢলে।

ঢলঢলে প্যান্টের কোমরে আমার গলার রঙদার একটা টাই জড়িয়ে বাঁধি,

বেল্টের বদলে। আরেকবার মরিয়া হয়ে ডায়াল করি অ্যারপোর্টের নাম্বার। গরজ বড় বালাই। সুটকেসে কয়েকটি বিদেশি পত্র-পত্রিকাও আছে। বিশেষ করে 'টাইম' এবং 'নিউজ উইক'-এর দুটি সংখ্যা। এগুলি ইরান সরকার ইতিমধ্যে নাকি বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছে।

আঃ রে, কানে যে বাজে আমারই মাতৃভাষা!—'আমাদের এদিকেও দারুণ গুলিগোলা চলছে—' 'এই, এই, ওসব বলিসনে। কেউ যদি শুনে ফেলে?' 'বাংলায় বলছি কে আর বুঝবে?' 'তবু ওসব বাদ দে।' 'তাহলে ঠিক রইল, অ্যারপোর্টে এখন আর আসতে পারছিনে—আর শোন? ফিরবার সময় আমার জন্তে হিন্দীগানের খানকতক লেটেস্ট ডিস্ক আনতে ভুলবিনি—বুঝলি? দেখলাম এখানকার বাজারে এখনো আসেনি। জগুবাবুর বাজার থেকে কড়াইয়ের ডালের বড়ি মনে থাকবে তো? আর শোন, শুনছিস?' 'শুনছি বল।' 'যদি পারিস তো নীহার গুপ্তর খান-দুই তিন লেটেস্ট নবেল আনবি—বুঝলি?'

ওধারে টুক করে কেটে গিয়ে লাইনে ফট করে একটি পুরুষকণ্ঠের অনুপ্রবেশ, 'অ্যালো, অ্যালো?—মেহেরাবাদ এরপোর্ত ইনকুইরি—লাগেজ—'

পারলে অদৃশ্য আগন্তুককে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরতাম, শরীর মনের সমস্ত উৎসাহ ঢেলে দিয়ে তখুনি বলে উঠি, 'দেখুন আগাসায়েব, আমি ডক্টর রেজাদে শাফারের বাড়ি থেকে বলছি—'

'বালি বালি, ইয়া-ইয়া, কিছুক্ষণ আগে ডুক্তর রেজাদেও তেলিফুন করছিলেন। আপনার সুতকেস? আজকে পেয়ে যাচ্ছেন—'

'আমি আসব এখন?'

'মিস্ পরভিন এরেস্তর আপনার সুতকেস নিতে অলরেডি এসেছেন। বসে আছেন এখনো—'

ও হো, লাগেজের রশিদটা তো পরভিনই আমার কাছ থেকে নিয়েছে। 'আমারও কি আসার প্রয়োজন আছে?'

'আগা ওসমান আলি তিনিও ফজরে তেলিফুন করছিলেন—'

'হ্যালো, হ্যালো, দয়া করে প্রশ্নটা শুনুন। আমার সুটকেসটা আজকে পাবো তো?'

'আলবৎ। তবে কি জানেন, বরং ফার্দা, টুমরো উইল বী বেতার—এই নিন, মিস এরেস্তরের সঙ্গে কথা বলুন—'

আবার সেই আগামী কল্য!

কখন যে সগুস্নাতা মহরুখ আমার পেছনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল টেরও পাইনি, আচমকা আমার হাত থেকে রিসিভারটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে সে বলে, 'সেই কখন থেকে ডাকাডাকি করছি না? এদিকে বাড়িটা বিলকুল সুনশান করে দিয়ে একজন তো দিব্যি কেটে পড়ল—তুমিও—' বলতে বলতে বড় বড় চোখে জানলার বাইরে তাকিয়ে ওর মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল।

চেয়ে দেখি, পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরণার পাশ দিয়ে নেবুগাছের রাস্তায় টহল দিচ্ছে ট্যাঙ্ক!

নদী

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে দু-কূল ভাসিয়ে
চোখে জল ঝরায় বলে কি
ভালোবাসি ওকে ?

আবার যখন
তিরতিরে স্বচ্ছ জল,
ভিতরের সবটুকু বোঝা যায়,
নেহাৎ ঘরোয়া ওর
আটপৌরে স্নিগ্ধতা দিয়ে।
তখনও ভালোবাসিনা কি ?

ভালো শুধু বাসব বলেই
ভালোবাসি ওকে ;
ও আমার নদী।

কবিতা—৩

দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাঁধ ভাঙবে বলেই বাঁধের কাছে বসে থাকে লোক

সব অঙ্ক শেষ হলে এইখানে জমে ওঠে ভীড়
এও অঙ্কের নিয়ম
স্বচ্ছন্দ জলের ঢেউ ওঠে নামে
ঢেউ চায় ঢেউ
ভেসে যায় এতোদিনে আগুনে শরীর
যার মন্ত্র এই জল, এই ভাঙা বাঁধ।

দিগ্বিজয়ী

বাহারউদ্দিন

দুর্দম চেঙ্গিস শব্দের সাতাশি কেল্লা, শহর-নগর গ্রাম
অরণ্যমানস লুটপাট করে ; মাথায় সওয়ার রাগীই বলিস
শব্দের ভেতর ঢুকে চালাচ্ছে শব্দের তুফান। চড়াই উৎরাই
খাড়াই পাহাড়, কয়েক শ ডিজেল ইঞ্জিন, দমকল গাড়ি, পাগলা কুকুর-ঘন্টি
বেপরোয়া ;
লাথির কাঁঠাল ফের মানছে না শাসন ত্রাসন।

বাঙাল বাঙাল মুখ, আব্বার হাতের কঞ্চি চোখ রাঙাল, আম্মাও
বেদরদী, প্রাইমারী ইস্কুলের হেড মিসট্রেস, বলেন, বাইরে শীত-
রাত্তিরে শেয়াল ও ভূতপ্রেত ডাইনীর ভিড়ে আজ একা রেখে দেব ;
মানল না শাসন ত্রাসন মুখ ভ্যাঙচাল।

বিন তুঘলক প্রধান শিক্ষক এসে বললেন 'গাধা হাড় ভেঙে
গুঁড়ো করে দেব'। মক্তবের কাশেম হুজুর কয়েক ঘা বসালেন
পিঠে 'বেশরম লাথির কাঁঠাল !'
তবুও সে মানল না শাসন ত্রাসন !

গ্রামে ফিরে—২

বৌধায়ন মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘ কাঁচা বাঁশে ছায়া পড়ে, ছায়া নড়ে
ওঠে।
ইলুন শেখের জমিতে ঘোলা জলের চাদর
বিছিয়ে দিচ্ছে পাঁচ ঘোড়া পাম্পের একটানা শব্দ
নতুন কিছু ভাবা যাচ্ছে না এ মুহূর্তে
শুধু সাপের জিভের মত লকলকে রোদ
বাঁশপাতা মাড়িয়ে ঢুকতে চাইছে স্যাঁতসেতে অন্ধকারে।
আলের ঘুপসি ফুটোয় ঝাপসা শিশির
মিছরির দানার মত,—গত শীতে, ডাগর করেছিল রবিচাষ
এ খরিপের বাদলে গাছের গতর কেমন হবে ?
দিগন্তের আকাশ
ধরতে ছুটে যায় নাবালক চারার স্রোত—
মাথা হেঁট করে গম খেতে এ্যামোনিয়া চাপাই
কিছু নয়, মাথায় থাকে না কোনো সূক্ষ্ম চেতনা,
শুধু ভাবি, এ বছর ? এ বছর কোন গোপন উচ্চাশা আছে
চারার শরীরে ?
কোনদিন এ অনুভব নতুন জীবনানন্দ খুঁজে পাবে
এক উজ্জ্বল কবিতার প্রাণবন্ত আলিঙ্গনে
কয়েকটি নধর ঘামের ফোঁটা স্থান পাবে
তার কবিতার শরীরে।

ফিরিয়ে দেব

মহীতোষ বিশ্বাস

বিনি কথার মালা জমে আকাশ ছুঁই ছুঁই
এই আকালে বুকের মানিক কোনখানেতে থুই।
সাতটি মন পুড়ল তেল রাধা নাচল না,
গাঁও-গেরামে বর্গী নাচে করবে কে মানা।

দিন-দুপুরে হুক্কা-শিয়াল, শকুন বলে—খা,
সাত আগুনে ঝলসে গেল বুকের আঙরাখা।
হাঁটু-পানি কোমর-পানি কানি ভিজল কী.
চোখের জলের নীলাম হাঁকিস. ছিঃ ভেড়ুয়া ছিঃ !
এ-পার গঙ্গা ও-পার গঙ্গা. গঙ্গা কোথারে,
বাপ-পিতেম'-র ভিটে ডোবে অকুল পাথারে।
অন্ন-খোঁটার মান্য নেই জন্ম-ভিখারী
বুকের পরে খড়্গ হানে হন্তে শিকারী।
সব কেড়ে তোর প্রাসাদ হল ময়ূর কণ্ঠী
এবার তোরে ফিরিয়ে দেব পায়ের বেড়িটি।
এই আকাশের দোহাই তোর, সাত আকালের কিরে,
সব আকালের জ্বালা তোরে দেবই দেব ফিরে।

কখন কতরূপে

ক্রান্তদর্শী

আমায় তুমি দাও যে দেখা কখন কত রূপে,
বন্ধ্যামনে আঁচড় গুনে হিসাব তুলে দেখি,
অনেক সুরে তোলা গানের ঐকতানের মত
আমায় দিয়ে সুরের নেশা তারায় মিলালে কি ?

মনের মাঝে হঠাৎ আশা গানের রেশ যেন
তুমি আমার অনেক শোনা গানের কোন কলি,
তুমি যেন পথের বুকে হঠাৎ পথের নেশা
তুমি ভরা নদীর বুকে পারের হাতছানি ;
তুমি মিছিল মাছে আমার বিপুল আকুলতা।

তোমায় আমি অনেক যুগে. বহু আঁধার রাতে
গহন বনের ভিতর হতে চমক লাগা চোখে

আকাশ হয়ে মিলিয়ে যেতে দেখি অনেকদিন ;
তোমায় দেখি ভোরের আলো হয়ে হঠাৎ এসে,
আমার চোখে চাবুক মেরে তন্দ্রা কেড়ে নিতে !

আমি যখন বর্শা ছুঁড়ি তুমি ফলায় অগ্নি হয়ে জ্বলো,
আমি যখন পাথর ভাঙি লাঙ্গল দিই মাঠে—
আমার দেহে স্বেদের সাথে বাতাস হয়ে এসে
মাটির বুকে মিশে আমায় ফসল হতে বলো !

তোমায় খুঁজে ফেরার পথে, ক্লান্ত বেলার শেষে
দেখি তুমি ছায়ার মত আমার সাথে চল।

এই তো বেশ

সিরাজুদ্দীন আমেদ

এই তো বেশ এই হাজারি তকমা আঁটা বিলাসী বালিশ
ঘরে যেতে দুই পাশে অপরূপ দরোয়াজা সেলাম জানায়

কিন্তু সবাই জানে আমার দু-চোখ জুড়ে ঘুমের কি দুঃসহ অভাব
মানুষের দুঃখ দেখে বুকে জাগে বেদনার বিসমিল্লা খান
আমার ফিটন ঘোড়া অন্ধ চোখে চিনে নেয় পথ ডান বাম
আহা কি দারুণ প্রাপ্তি　　ভুখা মুখ উল্লাসে স্বাগত জানায়

এরি মাঝে আচমকা 'খাবারের গাড়ি লুঠ', 'পিয়ারী পাপোষ ফের ওল্টায়
গণেশ'—
ইত্যাদি সংবাদে নন্দিত ইমেজের মুণ্ড খসে গেলে
আমার শীতল রক্ত জমিদারী ক্রোধে ফেটে বেওকুফ ভুখাদের চাবকে
লাট করে
আমার শান্তিসেনা কারফিউ ছুঁড়ে দিয়ে শ্মশানের খামোশি জালায়

মোটা নেতা হবু নেতা কুর্নিশে নতজানু আহা কি দারুণ সুখ
সহজিয়া সমাধানে আমার হাতের মুদ্রা বরাভয় আঁকে
নতুন মলাট প'রে বিপ্লব দীর্ঘজীবী হয়

এই তো বেশ এই হাজারি তকমা আঁটা বিলাসী বালিশ
ঘরে যেতে প্রতিদিন দেহলির দরোয়াজা সেলাম জানায়

পরিশিষ্টে অন্ধকার

সুজিত বসু

পরিশিষ্টে অন্ধকার, অভ্রের খনিতে বিস্ফোরণ
ঘটেছে কিসের দ্বারা, দিয়া কিংবা কর্তৃক, অভিমানী
তৃতীয় কারক, তরল রক্তের ধারা গলিত আগুন
যেন, এত শিহরিত কেন ; ঈশান কোণের হিমে শুভ্র কুয়াশার
মাঝে সবুজাভ আবরণে সর্বদাই জেগে আছে নিদ্রাহীন
চোখ মেলে অতন্দ্র প্রহরী, মেঘের প্রাসাদে বন্দী সূর্য তো
হয়েছে অচল, আলো ছড়াতেই হবে সেই হীরে-অন্তঃপুরে
মাণিক-মণির দেশে, সর্তাধীন বাধ্যবাধকতা।
বড় কষ্ট পেতো ওরা খনিগর্ভে, তীব্র বিষের ধোঁয়া মুক্তি তাই
দিয়ে গেছে ; মসৃণ এখনো চাকা, এখনো ঘূর্ণনগতি ঠিকই অব্যাহত
তবু কেন পরিশিষ্টে অন্ধকার, যখনই বন্ধ চোখ, তখনই
রুদ্ধগতি, ট্রাফিকের লাল চোখ করে যায় সতর্কীকরণ।
বরণ করবো কাকে, সবাই যে জতুগৃহে, একজন ছিল সেও
চলে গেছে, তাকেও যে উত্তরার জন্য প্রয়োজন আজই
বিরাট প্রাসাদে। অতএব তোমাকেই? তোমাকেই সূতপুত্র!
তোমারই কি কাঁধে ভার, যদিও শুনেছি তুমি নিতান্ত কানীন।

উপন্যাস

যবনিকার আগে

আশীষ বর্মন

আমি ঘরে এলুম অভ্যস্ত চাপা পায়ে। দরজার গোড়াতেই কানে এসেছিল বাবার হাপরের মতো হাঁপের শব্দ। দেয়ালে ওয়াড়হীন বালিশ ঠেস দিয়ে, মুখ ঈষৎ ফাঁক করে, আধবোজা চোখে বাবা হাঁপাচ্ছেন ; পাঁজরার খাড়াখাড়া হাড়গুলোর ভিতরে পেট-বুকের চামড়া ঢুকছে-উঠছে।

আমি চোখ ফিরিয়ে নিই। ঘরের কোণে যেখানে তোলা উনুন, কুকারের বাটি আর দু-একটা রান্নার জিনিস জড়ো করা থাকে সেদিকে একবার তাকাই। তারপর পায়ের চটিটা খুলে, দরজার আংটায় লাগানো দড়ির ফাঁসে টাঙিয়ে দিই। বাবা একটু যেন চোখ খুললেন। আবার নাও হতে পারে, পিছন ফিরে চটি রাখতে রাখতে তা মনে হল হয়তো শুধু। মনে হল একটানা হাঁপের মধ্যে একটা যতির আভাস পেয়ে ; হয়তো সেটাও ঠিক না। এখন অন্তত হাঁপের কোনো বিরাম নেই ; সেই অবিরাম, মুমূর্ষ শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় আওয়াজ আসে।

মা উঠে এসেছেন নীরবে। উনি শোন ছিন্নভিন্ন শতরঞ্চিতে। বাবার ভীষ্মশয্যার পাশেই থাকে দুটো তোবড়ানো টিন, মাঝে মাঝে বেদম কাশি আর টানের মধ্যে, ভেঙে-দুমড়ে গিয়ে, উনি টিনে গয়ের ফেলেন। মাকে

প্রায়ই তাড়াতাড়ি এগিয়ে ধরতে হয় কৌটো, আর অন্যহাতে বাবার পিঠে সমানে হাত বোলান, আস্তে-জোরে মালিশের মতো। সেই টিনচুটোর অন্য-পাশে, বিঘৎ দুই তফাৎ-এ, মা নিজের সতরঞ্চি পাতেন। সকালে সেটা তুলে ফেলেন। এদিকে দরজার গোড়ায় পাতা, ঘাম-তেল-নোংরার চিট ধরা, ছিন্ন, স্থানে স্থানে গর্তওলা আমার তোষকও ওঠান উনিই। তোলা হয় না শুধু বামনপাড়ার দিকের জানলা ঘেঁষে লাগানো বাবার বিছানা। মা উবু হয়ে বসে, ঝাঁটা হাতে, বাবার মাদুর আর তোষকের কানাগুলো তুলে তুলে ঝাঁট দেন। মাঝে মাঝে বাবা যখন ধুঁকতে ধুঁকতে পায়খানায় যান কিংবা দৈবাৎ স্নানে, এবং আমি ঘরে থাকি, তখন মা বলেন, 'তুই তাড়াতাড়ি ওদিকটা ঝাঁট দিয়ে দে।' বাবাকে নিয়ে মার ফিরে আসার আগেই কাজটা সারি। আমি না থাকলে তাও হয় না।

মা হাঁড়িকুড়ির জায়গায় সন্তর্পণে এখন কি সামলে উঠলেন, উঠতে উঠতে অস্ফুটস্বরে বললেন, 'খেয়ে নে...বাসন বের করতে হবে।'

খাবার জায়গায় এগিয়ে যাই; বসে দেখি কুকারের একটা বাটিতে খানিকটা ভাত আর পাশে অল্প ডাল রয়েছে। কুকারের অন্য পাত্রগুলো খালি, একটায় তবু ডালের চিহ্ন আছে, অন্যটা ফর্সা। আমি উঠে পড়ি।

মা বললেন, 'উঠলি যে···খাবি না?'

'ভুলে গেছিলুম, আমার নেমন্তন্ন আছে।'

'নেমন্তন্ন?'

'হ্যা, সন্তোষদের বাড়ি।'

'বাজে বকিস না...শোন, শোন...।'

'আরে! ওর বোনের আজ জন্মদিন...ডাল ভাত তুমি খাও।'

মা কিছু বলার আগে আমি চটি হাতে দরজার বাইরে চলে আসি। পায়ে চটি গলিয়ে সেখান থেকে সোজা রাস্তায় বেরিয়ে যাই। সদর দরজার মুখোমুখি পন্টুর সঙ্গে দেখা, সে বাড়ি ঢুকছে, বলে 'কোথায় চল্লিরে, তুই?

'এই আসছি।'

'সব বাড়ি চলে গেছে, রক ফুটি।'

আমি ঈষৎ হাসি, শুধু অনির্দেশ্য হাত নাড়ি, মুখে কিছু বলি না। ফুটপাতে নামতেই হাওয়ার ঝাপটা পাই। এক নিমেষ কোন দিকে যাব তার ঠিক করতে পারি না। তারপর হাওয়াটা এলো যেদিক থেকে সেদিকেই ফিরি। হাঁটতে শুরু করি অনিশ্চিত পায়ে। দশটা বেজে গেছে। মল্লিকবাড়ির রকে

বুড়োদের আড্ডাও ভাঙা ; মল্লিক কর্তা শুধু নাভির তলায় কাপড়ের কসিটা আলগা করে, উদরে বায়ু বওয়াচ্ছেন। সামনে দিয়ে যাবার সময় স্পষ্ট টের পাই উনি অপাঙ্গে দেখছেন, এবং কিছুটা এগিয়ে গেলে শুনতে পাই ওঁর গলা-খেঁকারি। শুনে হাসি পায়, আমায় দেখলে মল্লিককর্তার নিশ্চয়ই অস্বস্তি হয়। গলাটা উসখুস করে ওঠে স্বতই, তাই হয় একটা যতির পর গলা পরিষ্কার করে নেন, নইলে বিলম্বে থুথু ফেলেন।

একটু এগিয়েই টিউবওয়েল। ভারীতে জল ভরছে। পিছনেই সুকুমারদের বাড়ি। বাইরের দিকের ঘর দুটো অন্ধকার। বোধহয় খেতে গেছে কিংবা ছাদে। ছাদে ওরা অনেকক্ষণ থাকে, গা জুড়োলে নামে শুতে। টিউবওয়েলের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ভারী জিজ্ঞেস করে,

'জল খাবেন, বাবু ?'

'মুখ ধোবো।'

'আসুন।'

আমি দু-পা এগিয়ে, নিচু হয়ে আঁজলায় জল নিয়ে নিয়ে মুখে ঘাড়ে বেশ জল দিই। হাল্কা লাগে, ঠাণ্ডাও ; তারপর মুখ তুলে ঈষৎ হেসে বলি 'জলটা বেশ ঠাণ্ডা... !'

'আর দেবো ?'

'দাও...একটু খেয়েও নি।'

এক পেট জল খেয়ে আমি আর ভারীর দিকে তাকাই না ; হঠাৎ রওনা দিই। দু-পা এগোতেই পিছন থেকে সুকুমার ডাকল 'অ্যাই বাদলা... শোন্।'

ঘুরে দাঁড়াই। সুকু এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'কোথায়, চল্লি কোথায় ?'

'পার্কে।'

'এখন পার্কে !'

'বড্ড গরম···যাবি ?'

'দূর···আবার জামা চড়াতে হবে।'

'যা না, হাতে নিয়ে আয়।'

'দাঁড়া।'

সুকু বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল খানিক। তারপর হঠাৎ সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল, "বাদলা···শোন।"

আমি দু-পা এগিয়ে যাই, সুকুও এগলো একটু।

প্রায় মুখোমুখি এসে ও বলল, 'তুই খেয়েছিস ?'

আমি তখুনি চোখ সরাই, এক পলক নিজেকে লাগে অল্প অগোছালো। তারপর হঠাৎ আমি দু-হাত উপরে তুলে বলি 'আকাশ সাক্ষী...মাইরি খেয়েছি।'

'শালা, ফের !'

আমি হাসি, একপলক চেয়ে থেকে বলি 'ভাতে কম পড়েছে।'

'আয়···রকে তুই বস একটু।'

সুকু ভিতরে চলে গেল। আমি বসি। সামনের বাড়ির অন্ধকার জানলায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে মনে হল। আমি তাকিয়ে থাকায় ছায়া সরে গেল। ও বাড়ির মাতাল ভদ্রলোক এখনো নিশ্চয়ই ফেরেন নি। ফেরেন বারোটা-একটায়, কখনো বা আরো রাতে। এমনিতে আসেন নীরবেই, রিক্সায় উপুড় হয়ে। কিন্তু বাড়ির সামনে রিক্সা থামলেই, রিক্সাওয়ালা 'বাবু' 'বাবু' ডেকে 'ঘর আ গ্যায়া' বললেই, তিনি চোটপাট আরম্ভ করেন। স্ত্রী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলে কর্তার স্বরগ্রাম নীচে নামে। তিনি টলতে টলতে, কখনো প্রায় হামা দিয়ে, ভিতরে যান। ভদ্রমহিলা রোজই অনেক রাত পর্যন্ত অন্ধকার জানালায় আসেন আর মেলান, অনেক সময় বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। কেউ লক্ষ্য করছে টের পেলে সরে যান।

সুকু ফিরে এলো, হাত পাকানো রুটি। পাশে বসতে বসতে, খাবার এগিয়ে দিতে দিতে বলল 'তরকারি নেই···ভেলি গুড় আছে একটুকরো।'

'থ্যাঙ্কস, কার ভাগ থেকে আনলি ?'

'জানি না···সকালের কয়েকটা করা থাকে··· ।'

আমি রুটি চিবোতে চিবোতে বলি 'থাক। আমি তো সাঁটছি...সকালে তুই হুড়ো খাবি।'

'কে নিয়েছে কে জানে !···চারটে রুটি নিয়েছিলুম প্রথমে··· ।'

'এনেছিস তো দুটো··· ।'

'দুটো রেখে দিলুম··· ।'

'ইডিয়েট !'

'সব শালা তোকে গেলাই, না ? সকালে পেট বাজাব ?' আমরা দুজনেই হেসে উঠি চাপা গলায়। রুটি চিবোতে চিবোতেই আমি বলি 'না-রে, জলে-আটায় মাখামাখি হয়ে পেটে রুটি ফুলে উঠছে।'

'চল আর একটু জল খা।'

'চল।'

আবার টিউবওয়েলের সামনে এসে আমি দাঁড়াই। সুকু হ্যাণ্ডেল মারে। প্রথমে মুখ ধুয়ে আরো খানিকটা জল খেয়ে নিই। খেয়ে আরামের আওয়াজ করি 'আঃ।' সুকু বলল 'মাসিমাকে কি বলে এসেছিস?'

'নেমন্তন্ন।'

'তাহলে তো পানও লাগবে।'

'পারবি আনতে?'

'দাঁড়া দেখি।

সুকু আবার বাড়ির ভিতরে গেল। সামনের বাড়ির ওয়ালক্লকে তখন এগারোটা বাজতে থাকল। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। গ্যাঁড়া, পাড়ার গাঁট্টা-গোঁট্টা নেড়ি কুকুরটা শুধু রাস্তার মাঝখানে বসে প্রাণান্তক হাড় চিবোচ্ছে। কট্‌কট্‌ আওয়াজ হচ্ছে অনর্গল। মল্লিকবাড়ির আস্তাকুঁড়ে ওর প্রচুর খাদ্য জোটে, অন্য কুকুরদের ও কাছে সেঁধোতে দেয় না। ওর প্রতিদ্বন্দ্বী কেবল কাঙালি ছেলে-বুড়ো; তাই কাঙালি দেখলেই গ্যাঁড়া ক্ষিপ্ত। ওরাও অনর্গল ওকে বড় বড় ইট মারে; কয়েকজন আস্তাকুঁড় ঘাঁটে আর দু-একজন সমানে ইটোয় ওকে। সেই আক্রোশেই হয়তো, কাঙালিরা সরে গেলেই, প্রথমেই গ্যাঁড়া ছুট্টে যায় একবার আস্তাকুঁড়ের কাছে, দ্রুত ফোঁৎ-ফোঁৎ করে শোঁকে উচ্ছিষ্ট আর আবর্জনা, তারপর পাশের ল্যাম্পপোস্টের গায়ে ঘুরে ঘুরে, পিছনের একটা পা তুলে, পেচ্ছাপ করে। আর গর্জায়, পিছনের দু-পায়ে মাটি আঁচড়ে ধুলো ছেটায়; ছুটে যায় খানিকটা, আবার ফিরতে ফিরতে গর্জায়।

সুকু ফিরল। হাতে দু খিলি পান।

'নে।'

'তুই?'

'একটায় তোর মুখ লাল হবে না…ছোটো খিলি।'

সুকু বসল। আমি বলি 'শুতে যাবি না?'

'বাবারা সব ছাদে...বারোটার আগে নামবে না কেউ।'

আমি একটু চুপ করে থাকি। রাস্তা দিয়ে রামকানাই আগরওয়ালের লরি গেল। মাল পাচার হবে আরো রাতে, কিংবা আসবে কিছু। সারাদিন দামে মারবে, ওজনেও; এবং সঙ্গে বেলাবে ভেজাল; রাত্রে অন্য কারবার। ঠিক কি যে ব্যাপার কেউ জানে না, থানার দারোগা ছাড়া। শুধু বোঝে

এ-এক অস্বাভাবিক যাতায়াত। অথচ ও ব্যাটাই বেঁচে রইল, গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগল না! যখন এ-এলাকা মুক্তাঞ্চল ছিল তখনও আগরওয়ালের ব্যওসা বন্ধ হয় নি, অন্ত রীতি নিয়েছিল। মারা পড়ল কেবল রথীন, কমল, ফটিক, শম্ভু আর দুটো ট্র্যাফিক পুলিশ। আমার হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল এবং পড়ার পর খেয়াল হয়। স্বকু তাকাল, বলল, 'কীরে?'

'কিছু না!'

'এমনি ফোঁস-ফোঁস করছিস!'

আমি হঠাৎ সোজা স্বকুর দিকে ফিরে তাকাই, বলি 'গগনজেঠা কেমন আছেন রে?'

'শালা, এখন গগনজেঠা!...তোদের শেষ করে দিতে হয়।'

'আহা বল না...আমি আর সামনে যাই নি কখনো...।'

'বোমা মারার সময় মনে ছিল না?'

'বোমা আমি মারি নি।'

'ফটিক মেরেছিল...তুই ছিলি স্কোয়াডে।'

'তোরাও ফটিককে মেরেছিস।'

'আমরা না, পুলিশ...।'

'পুলিশ লেলিয়েছিল কারা কারা?'

'কারা? শালা তোরাই না অ্যাকশন করছিলি, শ্রেণীশত্রু মারছিলি।... আর আমার বাবা কি পুলিশ?'

আমি তখুনি জবাব দিই না। কান দুটো তেতে উঠছে, মুখের চামড়া রক্তাভ। স্বকুর দৃষ্টি কঠিন, দ্বেষ যেন জলজল করছে অন্ধকারে। হঠাৎ সে আমার কাঁধে একটা থাপ্পড় মেরে, কাঁধ হাতের তেলোয় চেপে রেখে বলে 'তখন পেলে তোকে কুপিয়ে মারতুম।'

আমি কিছু বলি না। এমন কি কাঁধ ঈষৎ জ্বালা করলেও কাঁধটা নাড়ি না। বসে থাকি যেমন ঠায় বসেছিলুম, শুধু চোখ রাস্তায় ফিরিয়ে নিই। তাকাই সামনের অন্ধকারে; স্বকুর চাউনির মধ্যে নয়। আর আমার মুখের গরম ভাবটা কমে আসে আস্তে আস্তে। টের পাই কানের কলিতেও হাওয়া লাগছে, সেই আগ্নেয় উত্তাপ ম্রিয়মাণ।

হঠাৎ আমার গলা ঠেলে কথা আসে, নির্লিপ্ত গলায় বলি 'আমরা সবাই ক্ষেপে গেছিলুম স্বকু...সব্বাই।'

'তোরাই গেছিলি, শালা! আমরা নয়।'

'বেশ।'

আমি হাসি, সম্ভবত ম্লান। স্বকুও মিইয়ে গেল, চোখ ফিরিয়ে নিল আমার মুখ থেকে। কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছিল আগেই। ওপাশের গ্যাসপোস্টের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলল 'বাঁ হাতটা কেটে ফেলার পরও, আজও বাবার ধারনা ওটা ভুল, তোরা ওঁকে মারতে চাসনি।'

'ভুল, মস্ত ভুল' আমি বলি 'কিন্তু গগনজেঠা যা ভাবেন তা নয়।...ওঁর সামনে আমি আর যেতে পারব না।

স্বকু কিছু বলল না। এ-সব কথা সে জানে। অনেক আগে থেকেই জানত। তার বাবা যখন কাটা হাত ল্যাংলেভিয়ে পুলিশ-কংগ্রেস করে বেড়াচ্ছিলেন আমার মুক্তির জন্যে, তখনও সে জানত বাদলা আর বাবার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। শ্রেণীর সংজ্ঞাই বুঝল ওরা ভুল তো শ্রেণীশত্রু খুঁজে পাবে কোথায়! বাবাই ওকে দেখিয়েছেন মার্কস শ্রেণী বলতে কি বুঝিয়েছিলেন। উৎপাদন ব্যবস্থা ও তার সঙ্গের সম্পর্কেই শ্রেণীর বিন্যাস; ওরা সে বিন্যাস ভেঙে মনগড়া শত্রুমিত্র তৈরি করেছিল। গ্লানি আর ক্ষোভ আর হতাশা সেখানেই।

'এবার বাড়ি যা, মাসিমা ভাববেন।' স্বকু বলল।

'যাই', আমি বলি, তারপর হঠাৎ ওর দিকে সোজা ফিরে জিজ্ঞেস করি 'আমাদের কি হবে বল তো?'

'ভগবান জানেন।'

'তিনি কোথায়?'

'বিড়লা মন্দিরে।'

দুই বন্ধু অপলক, স্তব্ধ তাকিয়ে থাকি পরস্পরের দিকে দু-এক নিমেষ, তারপর একসঙ্গে হেসে উঠি। হাসিটা নৈঃশব্দ্যে ছড়িয়ে যেত হাওয়ায়, কিন্তু তারই তলায় বাতাসে বাজতে থাকল একটা রিক্সার ঠুনঠুন। ঘন্টি নয়, মন্থর পায়ে নিরালায় একাকী রিক্সাওলা যখন হাঁটে, তার সেই শ্রান্ত ধ্বনি। আমাদের হাসি মেলায় কান পেতে থাকতে থাকতে, সেই ফাঁকে, শব্দটুকু এগিয়ে আসে। আমরা দুজনেই নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকি সেদিকে। গ্যাস-পোস্টের নীচে এলে দেখতে পাই এক অন্যমনস্ক, ক্লান্ত, জোয়ান রিক্সাওয়ালা, গামছাটা এখন মাথায় বেঁধেছে। পদক্ষেপ তার গন্তব্যহীন, শ্লথ।

'এরা কোথায় থাকে রে?' হঠাৎ স্বকু বলল।

'কি জানি।'

'রিক্সা কি ফেরত দেয়, না, কাছে রাখে ?'

'জানি না।'

'শোয় কোথায়···লাইনে ?'

'হয় তো।'

ততক্ষণে রিক্সাওলা চোখের প্রায় আড়ালে। বিজলি বাতির বালাই এ রাস্তায় নেই, টিমটিমে গ্যাসপোস্ট পেরলে ক্রমশ মিহি আঁধার গাঢ় অন্ধকারে লোপ পায়। রিক্সাটাও দেখা যায় না। আর পা-পা এগিয়ে আবছায়া থেকে অমানিশায় মেলায়। শুধু চিমটেতে আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো একটিপ লাল আলো আঁধারে দোলে। সেটাও যখন দেখতে দেখতে শেষে অদৃশ্য, চোখের সামনে তখন থাকে শুধু পুঞ্জীভূত কালো; আর আচমকা আমাদের মনে হয় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত দুঃখ। মিহি আঁধারই যে শুধু অন্ধকারে মিলিয়ে একাকার, চিহ্নবিহীন বিস্তারে সামনে ছড়ানো, তা নয়; তার অন্তরালে স্তরে স্তরে রয়েছে অব্যক্ত আর্তি। আর এই নৈর্ব্যক্তিক বোধ, ছড়ানো সর্বব্যাপী দুঃখের সঙ্গে একাত্মতা, এক সঙ্গোপন অজ্ঞাত রহস্যে আমাদের মন আরো গভীর অথচ নির্লিপ্ত করে দেয়। ব্যক্তিগত জ্বালা ও নিরাশা তখন অনেক নিষ্প্রভ, সুদূরের ভাসমান ধ্বনির মতো।

ভোরেই ঘুম ভেঙেছিল আমার। বাবা তখন বেদম কাশছেন। কাশি, কাশি আর হাঁপানির অসহ্য দমক। মাঝে মাঝে গয়ের তুলছেন যেন বুক-পেটের হাপর থেকে, গভীর অন্ত্র মুচড়ে। মা নিশ্চয়ই টিন ধরে আছেন এক হাতে আর অন্য হাত বোলাচ্ছেন পিঠে।

আমি চোখ বুজি। তন্দ্রা তখনো সারা মনে। শরীর অবসাদে ভারি। দেখতে-দেখতে আবার আবছা চৈতন্যের লুপ্তি ঘটে; হয়তো ঠিক ঘুমে নয় কিংবা ঘুমেই। আসলে চেতনা ছেয়ে যায় ছায়ায় ছায়ায়। বোধও প্রায় যাই-যাই কিন্তু ঠিক বিলীন নয়। অন্তঃস্থলে কোথায় যেন একটা অশরীরী অস্বস্তি বিঁধে থাকে। ভাবনা গত অথচ অন্তঃস্থলে অস্ফুট এক কাঁটা টের পাই।

ঘুমটা একেবারে কেটে যায় আরো পরে, গরমে এবং ঘামে; হয়তো বোধের টানাপোড়েনেও। ওয়াড়হীন বালিশ ভিজে, ভিজে খানাখন্দ ওঠা তোষকও, বিশেষত সারা পিঠের তলাটা। গলা থেকে কাঁধ অবধি বিন্দু

বিন্দু ঘাম জড়িয়ে-জাপটে স্রোতের মতো নামছে। চামড়ায় প্যাচপ্যাচানি, আর চিটধরা তোষক-বালিশ কিছুটা পিচ্ছিল। ঘাম-নোংরার পুরু আস্তরন কালো পালিশের মতো চিক চিক করে ও-তুটোয়।

আমি উঠে পড়ি। এখন বিছানা তোলা ভুল, হাওয়া লেগে ঘাম শুকোক কিছুক্ষণ। জানলায় রাখা কৌটো থেকে হাতে অল্প ছাই নিয়ে চৌবাচ্চার দিকে চলে যাই। মা-বাবার দিকে তাকাই না একবারও। মনের গভীরে বিঁধে আছে জড়তা-সঙ্কোচ-ক্ষোভ।

চৌবাচ্চার সামনে পল্টু দাঁত ব্রাশ করছে। দাড়ি তার কামানো সারা। ও একেবারে স্নান সেরে উঠবে; তার আগে নিজের সার্টটি ও কাচে, বলে, 'মা পারে না।'

'প্যান্ট পারে আর সার্ট পারে না?'

'তুই বুঝবি নে...এই যে সার্টের কলারটা না, এই যে পিছন দিকটা··· এটা সাফা করার অন্য আর্ট।'

'প্যান্টের...?'

'দুর প্যান্ট! ও-তো ডার্ক কালার...ও রঙে কিছু বোঝা যায় না।'

অর্থাৎ সার্ট কাচা পল্টুর সখ কিংবা বাতিক। হয়তো ও যা বলে তাও সত্যি, অন্তত কলার কাচার জন্যে ও একটা প্ল্যাস্টিকের ছোট্টো বুরুশ ব্যবহার করে। গুঁড়ো সাবান একসারি দাগের মতো কলারের ঘেমো জায়গাটায় ছড়িয়ে দিয়ে প্রথমে আঙুল দিয়ে দ্রুত রগড়ায়। অতঃপর ঘসে বুরুশ দিয়ে। একটু একটু জল দেয়, এবং দেখে। এই করতে ওর কিছু সময় যায়। তারপর স্নান সেরে ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই চ্যাঁচায়, 'মা খাবার দাও।'

ন-টার মধ্যে পল্টু ট্রামরাস্তায়। সাড়ে ন-টায় অফিস। একবছর হয়ে গেল ওর বিলিতি অফিসে চাকরি, এখন ও কনফার্মড স্টেনো, প্রায় সাড়ে ছশ টাকা মাসে পায়। ওভার টাইম করলে বেশিই হয়। তাতে ওর তেমন সাড়া নেই।

আমায় আসতে দেখে পল্টু মুখের ফেনা ফেলে হাসল, বলল 'কি রে, ঘুম ভাঙল তোর!'

'ভেঙেছে আগেই।'

'মটকা দিচ্ছিলি?'

'ঘেমো দিচ্ছিলুম...যা গরম!'

পল্টু হেসে ফেলল। কুলকুচি করতে করতে বলল 'বেশ আছিস!'

'হুঁ।'

ছাইভর্তি থুথু ফেলি আমি। কথা চালাতে ইচ্ছে করে না। সকালের ভাবনায় মনটা গুমোট হয়ে রয়েছে। তাই মগে জল নিয়ে আমি বসি আড়াআড়ি, পল্টুর চোখ এড়িয়ে।

'কাল রাতে ফিরলি কখন?' পল্টু বলে।

'দেরি হয়েছিল।'

'কোথায় গেছিলি?'

আমি কোনো জবাব দিই না; ঘন ঘন কুলকুচি করতে থাকি। প্রথমটা পল্টু আড়চোখে তাকাল শুধু, দেখল আমার মুখের বাঁ পাশের আদল। তারপর সার্ট খোপাতে আমারই পাশে বসল। খোপাতে খোপাতে আচমকা থেমে হঠাৎ বলল, 'তোদের নাকি রেশন তোলা হয় নি কাল?'

'কে বলল?'

'শুনলুম।'

আমি তখুনি কিছু বলি না। জলের ছোটো বালতিটা হাতে নিয়ে উঠি। মুখে-চোখে আমার জল দেওয়া শেষ। বালতিটা চৌবাচ্চার পাড়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করি,

'তোর জল লাগবে?'

'হ্যাঁ, দে।'

চৌবাচ্চা থেকে বালতি ভর্তি জল পল্টুর পাশে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলি, 'বাড়িতে টাকা নেই।'

'কি খেলি কাল?'

'শুকু খাওয়াল।'

পল্টু সোজা আমার চোখের মধ্যে তাকাল। আমি দৃষ্টি সরাই। হঠাৎ পল্টু উঠে পড়ল, বলল 'দাঁড়া, যাস নি।'

ও ওদের ঘরের দিকে চলে গেল। আগে পুরোটাই ছিল আমাদের জায়গা। পঁয়ত্রিশ বছর আগে, বাবা তিনঘরের এই একতলাটা ভাড়া নিয়েছিলেন তিরিশ টাকায়। বড়দার মৃত্যু, দিদির বিয়ে এ-সব করতে করতে ভাড়া বেড়ে তেত্রিশ টাকা পর্যন্ত হয়। হয় মানে বাড়িওলার অনুরোধে বাবাই বাড়ান। যে বছর আমি সেকেণ্ড ইয়ারে উঠি, সেবারই শেষবার বাড়িয়ে পঞ্চাশে তোলা হয়। তারপর আর বাড়ে নি, বাড়িওলা মৃত, আর তাঁর ছেলেরা জানে বাবা বেঁচে থাকতে এ-ভাড়া আর বাড়বে না।

বাড়ানো তো দূরের কথা, এতদিনে আমাদের রাস্তায় দাঁড়াতে হত। বাবার বিরাশি টাকা পেনসনে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দেওয়া অসম্ভব। বাঁচাল পল্টু, আমি যখন জেলে, তখনই ও একদিন এসে বলল 'মাসীমা, আমায় দুটো ঘর ভাড়া দিন।'

মা অবাক, বললেন 'ঘর নিয়ে তুমি কি করবে ?'

'মা-কে নিয়ে থাকব···আমি চাকরি পেয়েছি।'

'সে কী! তোমাদের বাড়ি···বাবা···?

'আমরা আলাদা হচ্ছি···।'

'কেন ?'

'সে অনেক কথা···আশি নব্বুই টাকা ভাড়া দিতে পারি।'

সেই থেকে দক্ষিণের ঘর দুটো পল্টুদের। কোণের রান্নার জায়গাটুকুও। মার হাতে মাস গেলে ও নব্বুই টাকা দেয়, ভাড়া। আবার তার থেকেই পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আসে বাড়িওলার ছেলেকে। বাবার পেনসনও এনে দেয়। দরকারে অনেক কিছু করে। অদ্ভুত ছেলে। লেখাপড়ায় ভালো ছিল না কোনোদিন, রাজনীতির ধার মাড়ায় নি, বলত, 'আমি ভাই সুদখোরের ছেলে···বাপ শালা এক নম্বরের হারামি। আমার মাথায় গোবর।'

কিন্তু বাদলা বলতে চিরকালই ও অজ্ঞান। কলেজের চার-বছর আমার ছায়ার মত থাকত লেগে। খাওয়াত, পার্টিফাণ্ডে টাকা দিত, সিনেমা দেখাত। আর মাঝে মাঝে হত উধাও। বোঝা যেত কোনো মেয়ের পিছনে ঘুরছে, ব্যস্ত।

সেই পল্টু তার মাকে নিয়ে এই এঁদো কুঠরিতে উঠে এল। আমরা হয়ে গেলুম ফ্রি ভাড়াটে, নিজেদের কিছুই দিতে হয় না, বরং হাতে থাকে চল্লিশ টাকা। বন্ধুরা অবাক হয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল 'কি ব্যাপার রে তোর ?'

'কিসের ?'

'মাকে নিয়ে এখানে চলে এলি ?'

'কি করব ? বাবা তার মাগীকে ঘরে তুলেছে।...সেই থেকে সাপে-নেউলে রোজ...মার লড়াই শুধু বাবার সঙ্গে নয়, মাগীটার সঙ্গেও, রাতদিন...শালা থাকা যায়!'

'সম্পত্তির কি হবে ?...মাগীটা তো মারবে ?'

'সম্পত্তিতে আমি মুতি।'

'তোর ভাইটা সেয়ানা আছে কিন্তু!'

'ও মারাক্ গে যাক্।'

ভাই আসে নি। সে বাবার আশ্রয়েই শুধু থাকল না, কোনোদিন এখানে ঢোকে নি পর্যন্ত। বিয়ে-হওয়া দিদিও বাপের বাড়িতেই যাতায়াত রেখেছে, কচিৎ লুকিয়ে মাকে দেখতে আসে। পল্টু বলে 'সব সমান!'

'তুই ব্যাটা মরবি।'

'রাখ রাখ! বাবা, খাও-দাও কম্মো করো…ব্যস্।'

সবাই হো হো করে হাসে। ওকে দমানো মুস্কিল। শুধু সুন্দরী, চতুর মেয়েদের কাছে ও কেমন হঠাৎ সুবোধ, সংযত হয়ে যায়। নিজেকে সামলে সামলে চলে এবং কথা কয় পরিমিত মাত্রায়। সুশ্রী, বুদ্ধিমতীর প্রেম ওকে অহরহ টানে, কিন্তু নির্বোধ মেয়েদের সম্বন্ধে ও ক্রূর, উদাসও। বলে 'ডব্‌কা হলেই হয় না।'

'কি, চাস কি?'

'সব।'

'সবই তো পাচ্ছিস…।'

'তোরা শালা বুঝবি না…ছদো!'

অলক্ষ্যে, ওর কথা ভাবতে ভাবতে আমার মুখে হাসি ফুটেছিল। সচেতন হয়ে ফের বালতিতে জল নিয়ে ঘাড়ে মুখে জল দিই। জল মুছতে মুছতে পল্টু ফিরল, হাতে দশ টাকার নোট একটা। বলল 'নে, রেশনটা তুলে নিস।'

'থ্যাঙ্কস, ভাড়া কাটবি নাকি?'

'ও আমার বাড়িওলা-রে!'

'দেখিস ভাই!'

'যা-বা, আগে খেগে যা।'

পল্টুর টাকায় রেশন এল। ডিউ স্লিপের গমটাও এবার পেয়ে গেলুম। মা হয়তো এটা মাসীমাকে, পল্টুর মাকেই, বিক্রি করবেন। মাসীমা এমনি ভালো কিন্তু থেকে থেকে যেন বারুদে স্ফুলিঙ্গ লাগে। তখন একটানা চেঁচিয়ে যান, কেউ থাকুক বা নাই থাকুক। নিজের কপালেরই শুধু দোষ দেন না; সামান্য ছুতোয় বিশ্রী ভাবে আমাদের সম্বন্ধে চিৎকার করেন। বিশেষত বাবাকে নিয়ে। বলেন 'অত রোগ নিয়ে মলেই হয়',

শুধু হাঁপাস কেন বাপু! সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তবু কি ভাগাড়ের গরু! হাগবে, জল দেবে না, মুতবে দেওয়ালে...দুর্গন্ধে ভূত পালায়। আমারই কপাল, নইলে এই নরকে আছি...কঙ্কাল নিয়ে ঘর করা! ঘরের ভাড়া দিচ্ছি আমরা আর হেগেমুতে রাখছেন ওঁরা··· আ-মরি।'

এ হেন প্রলয়ের পর মাসীমা আর দু-চারদিন এ-ঘরের দিকে মাড়ান না। কাক ডাকা ভোরে উঠে পায়খানার পাট সেরে নেন। মা যখন কলতলায় বাসন মাজেন বা স্নানে যান, উনি তখন থাকেন ঘরে কিংবা পিঠ ফিরিয়ে রান্নার জায়গায়, একান্ত অভিনিবেশে। মা-ও জড়সড়, প্রায় শব্দহীন আনাগোনায় কাটান্। মনে হয় ভয়ে ভয়ে থাকেন পাছে মাসীমা তাকান, কলতলায় আসেন। এমন-কি মা প্রাণান্ত চেষ্টা করেন আমাদের উনুনের ধোঁয়াটাও যাতে ওদিকে কম যায়। পায়খানায় দু-তিনবার করে চৌবাচ্চা থেকে জল নিয়ে ঢালেন। আমি পায়খানায় জল দিয়ে আসার পরও মা সন্তর্পণে এক সময় গিয়ে ফের জল ঢালেন। বাড়িটা হয়ে যায় নিঝুম, থমথমে। শুধু সেই নৈঃশব্দ্যের মধ্যেই, বাবা ক্লিষ্ট দৃষ্টিতে আমার দিকে যখন তাকান তখন হঠাৎ তাঁর চাউনি দপদপ করে ওঠে। মনে হয় অব্যক্ত দ্বেষ অথবা অপমানবোধ জ্বলছে চাউনিতে ওঁর। তার মায়ের ব্যাপারে গোড়ার দিকে পল্টু বলেছিল 'কিছু মনে করিস না, ভাই।'

আমি বলি 'বাবা-মাকে বল, আমায় কেন?'

'ওঁদের আমি ফেস করতে পারব না।'

'আমিও না...বাবার চোখে আমি অপদার্থ, কুলাঙ্গার।'

'সে-তো আমিও···মা-বাবা দু-জনের চোখেই।'

'তুই তবু চাকরি করিস। সংসার চালাস।'

'বেশ তাহলে ঠেঙিয়ে দেব বুড়িকে।'

আমি ওর দিকে সিধে তাকিয়ে থাকি, কিছু বলি না তখুনি। কিন্তু আমার চাউনি হয়ে যায় শক্ত। এক সেকেণ্ড, অতঃপর আমি চোখ ফিরিয়ে নিই, হঠাৎ বলি 'কিছুতেই কিছু হবে না।' পল্টু তখুনি কিছু বলে না, গালের ওপর চটাং শব্দে একটা মশা মারে, বলে, 'শালা...পালাল!'

'এবার কামান দাগ তুই।'

'মাইরি! মশাই সামলাতে পারি না আমরা, ঘর সামলাব!'

'মাসীমা যা বলেন তা একেবারে মিথ্যে না পল্টু।'

'যা যা... ।'

'বাবা বড্ড পায়খানা নোংরা করেন ।'

'রুগী মানুষ .. ! তোর মাও ওঁকে সামলাতে সামলাতে ভুলে যান ।... এ-বুড়িরই বা এতো তেলানি কিসের ।'

আমি কিছু বলি না। পল্টু একটু থামে। তারপর হঠাৎ বলে 'আসলে কি জানিস, মা সারা জীবন কিছু পায় নি। শুধু সন্দেহ আর ঝগড়া...বাবার মাগীটা বাড়িতে না থাকলে মা ঝি হয়েও থাকতে রাজি ওখানে। কিন্তু ও মাগীর হাতে সম্পত্তি-স্বামী-ছেলেমেয়ে ছাড়তে আপত্তি, রাগে-পরাজয়ে জ্বলে যাচ্ছে।' জীবনই সম্ভবত মানুষকে ভাবতে শেখায়, আমার ইদানিং মনে হয়। নইলে পল্টু, যে কখনো কিছু তলিয়ে ভাবে বিশ্বাস হয় না, বরং সর্বদাই ব্যগ্র সে ভাবনা এড়াতে, সেই এতো অনায়াসে এই মনস্তত্ত্বের জটিলতার মধ্যে যেত না। কেউ কেউ বোধ হয় শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ধাক্কাতেই ভাবে, এবং তাদের ভাবনা এই অভিজ্ঞানের পরিমণ্ডলেই শ্বাস নেয়; আর অন্যেরা, অভিজ্ঞান ও জ্ঞানের চর্চায়, দুটির মিশেলে বাঁচে। পল্টু সম্ভবত প্রথম সারেই পড়ে।

আগে হলে আমি সে-কথাই ভাবতুম। কিংবা এমনও থেকে থেকে ভেবেছি যে ও অমানুষ। চিন্তা-ভাবনাহীন, আত্মসুখী, বর্তমানসর্বস্ব। আসলে ঠুন্‌কো, বাজে; জন্তুর থেকে হয়তো বা কিছুটা পৃথক মাত্র। আজ সে-কথা মনে হয় না; এখন কোনো ব্যাপারেই আমার আগের নিশ্চিতি নেই, মন সদাই সপ্রশ্ন, দ্বিধান্বিত। মৌল সত্যটুকু যেখানে মানি, যেটা জানি ধ্রুব, তারও গন্তব্যপথ সম্বন্ধে আজ আমার নানান জিজ্ঞাসা।

অথচ চারবছর আগে গগনজেঠা যখন আমায় প্রথমদিকে বোঝাতে এসেছিলেন তখন শুধু বক্র হেসেছি। ঘাড় থেকেছে উদ্ধত। উনি বলতেন 'ভুল করিসনে বাদল···ভুল বড় মারাত্মক।'

'আপনি ঠিক করেছেন···কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ?'

'কংগ্রেসেই তো ছিলুম সারাজীবন...পার্টিও তখন কংগ্রেসে।'

'কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়লেন কেন ?'

'ছাড়ি নি।...সরে গেছি, হয়তো পারিনি থাকতে।'

'কেন ?'

'ওই শ্রেণীর ব্যাপারে। আমি ভেবেছি কংগ্রেস পেটি-বুর্জোয়া পার্টি···

বুর্জোয়ারা না করেছে জাতীয় আন্দোলন, না বসেছে গদিতে...ওরা বিশ্ব-ধনতন্ত্রের দালাল ছিল এবং আজও আছে...।'

'তাহলে কংগ্রেস সাম্যবাদ আনল না কেন?'

'পেটি-বুর্জোয়া বলে...পার্টির মধ্যে এবং বাইরে কোনো প্রবল বামপন্থী চাপ নেই বলে।'

'তবে?'

'তবে বামপন্থী চাপ চাই, ভিতরে-বাইরে, কিন্তু ভেবো না শাসকরা বুর্জোয়া, ক্যাপিটালিস্ট...তাতে ক্যাপিটালিস্টদেরই দল ভারি হবে।'

'বোগাস!'

গগনজেঠা আচমকা থমকে গেছিলেন, অপমান করার জন্যেই আমি চেঁচিয়েছিলুম। শ্যামবর্ণ মুখটায় তাঁর একটা পাতলা নীলচে-কালো আভা ছড়িয়ে গেছিল দেখতে দেখতে। কিন্তু খানিকটা আমার উত্তপ্ত মুখ, এড়ানো দৃষ্টির দিকে চেয়ে থেকে উনি সামলে নিয়েছিলেন। মুখে মৃদু হাসি টেনে এনে বলেছিলেন

'আচ্ছা, শ্রেণীর সংজ্ঞা কি...তুইই বল্?'

'জানেনই তো।'

'ভুলও জানতে পারি।'

'ব্যাখ্যা করুন, শুধরে দেব।'

আবার গগনজেঠা থমকে গেছিলেন। তক্তপোষ হাতড়ে বিড়ির কৌটোটা বের করে সেটা খুলেছিলেন আস্তে আস্তে। সম্ভবত নিজেকে সংযত করছিলেন। আর আমার মনে বইছিল ঝড়। অন্ধ, চাপা রাগ আগুনের হল্কার মতো অন্তঃস্থলে ধ্বক ধ্বক করছিল। গগনজ্যাঠা বিড়িটা ধরিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিলেন 'তুই রাগ করছিস খামোখা।'

'না করছি না।'

'কার্ল মার্কসের ব্যাখ্যায় উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্কের মধ্যেই শ্রেণীর জন্ম।'

'বেশ।'

'আমাদের শাসকদের সঙ্গে কোন উৎপাদন ব্যবস্থার সংযোগ, কিসের তাঁরা মালিক ভেবে দেখেছিস।

'আপনার বক্তব্যই শুনি আগে।'

মূলত জমির। জমিদারির নয়। অন্তত যাঁদের শিকড় গ্রামে। অন্যেরা শহুরে মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী। এই গ্রামীণ ও শহুরে মধ্যশ্রেণীর দু-পক্ষেরই

অনেকে, স্বাধীনতার পর শাসক হয়ে, চুরি-চামারি করে ফেঁপেছিল ইদানিং। কিন্তু তাতে শ্রেণী হিসেবে বুর্জোয়া বা জমিদার তাঁরা এখনো হয় নি। অনেকে হয়েছেন মধ্য শ্রেণীর অসৎ অংশ, আর গ্রামে ধনী. কৃষিজীবী, জোতদার, কৃষিদ্রব্যের ব্যবসায়ী ও সুদখোর। ক্ল্যাসিকাল বুর্জোয়া বা জমিদার নয়।' আমি গগনজেঠার কথা শুনে হো-হো করে হেসেছিলুম অবজ্ঞায়, বিদ্রূপ ও শ্লেষ মিশিয়ে বলেছিলুম 'চমৎকার দালালি-তত্ত্ব আপনার·· আস্তাকুঁড়ের রাবিশ।'

ওই কথা ওঁর মুখের উপর ছুঁড়ে আমি আর তখন দাঁড়াইনি, প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিলুম। চৈতন্য-মনে আমার ব্যাপ্ত ছিল বিদ্বেষ ও চাপা ক্রোধ। তার কয়েক মাস পরেই আমাদের দলের একটি ছেলে, শ্রেণী শত্রু জ্ঞানে বোমায় ওঁর হাত উড়িয়ে দিয়েছিল। অতঃপর আমি গগন জেঠাকে দূর থেকেই দেখেছি মাঝে মাঝে, কাছে যাইনি। দেখেছি আগের মতই উনি অফিস যান ভীষণ ভিড়ে। ইদানিং কেবল এক হাতে উনি ট্রামের হাতল ধরেন, আর অন্য, কনুই থেকে কাটা হাতটা, কাঁধে-পিঠে ধাক্কা মেলে আচমকা, ঝুলন্ত লাঠির মতো দোলে অসহায়। কিন্তু ওঁর কোনো বিকার নেই, কিছু গুছিয়েও নেননি নিজে। অথচ কংগ্রেসই করেন, রাজনীতির সঙ্গে যেটুকু ওঁর আজও সংশ্রব তা ও-দলেরই মারফৎ।

জাতীয় আন্দোলন, বুর্জোয়া জমিদারদের নেতৃত্বাধীন এমন ধারণা উনি না মানতে পেরেই নাকি চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে সরে যান। তখন থেকে হয়ে পড়েন কংগ্রেসী বামপন্থী। ওঁর বিশ্বাস ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল শহুরে এবং গ্রামীণ মধ্যবিত্তের, এবং এই মধ্যবিত্ত বা মার্কস-কথিত ইন্টারমিডিয়েট স্ট্রাটা, তার পিছনে জনগণের ক্রমবর্ধমান সমর্থনে শেষ পর্যন্ত দেশ স্বাধীন করে। তাই জওহরলাল নেহেরুর কথাই যথার্থ, অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেস মূলত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বাধীন দল, এমনকি, গগন জেঠার মতে, অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতৃত্বও তাই। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত রাজনীতিবিদদের মধ্যে, বিশেষত কংগ্রেস ও অন্যান্য দক্ষিণ-ঘেঁষা দলে, রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত নেতৃত্বেরই পাল্লা ভারি। এঁরা প্রধানত গ্রাম্য সম্পন্ন-পরিবারভুক্ত, জাতীয়তাবাদী কিন্তু মানসিকতার দিক থেকে পশ্চাৎপদ, চিন্তায় সম্পন্নভূস্বামীর রক্ষণশীল আওতায় জড়িত। অন্যপক্ষে রয়েছে, নানান পার্টিতে বিভক্ত, সংখ্যালঘু মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব, যাঁরা অনেকে মার্কস-এঙ্গেলসের প্রভাবে মননে মুক্তি পেয়েছেন, কিংবা জাতীয় আন্দোলনের টানা পোড়েনেই। রুশ

দেশের অগ্রগতিতে, জওহরলাল এবং কমিউনিস্ট সোশ্যালিস্টদের কাজ-কর্মে, অধ্যয়নে প্রগতিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গগন জেঠার মতে ঘটনাটা কিছু উদ্ভট নয়। এমন-কি প্রায় দুশ বছর আগে, ফরাসী বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়, মার্কস-ও সে দেশের মধ্যশ্রেণীর সাময়িকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের নিদর্শন লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ভারত-ভূমিতেও, সম্পূর্ণ অন্য এবং অনেকটা অনুকূল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সেই ব্যাপারই আরো স্থায়ীভাবে ঘটেছে। এই স্থায়িত্বের উৎস রয়েছে মূলত দুটি ঘটনা, সাম্যবাদী দুনিয়ার অবস্থিতি এবং জনগণ ও নেতৃত্বের একাংশে সাম্যবাদী চিন্তার অনুপ্রবেশ।

কিন্তু মধ্যশ্রেণীর ক্ষমতার এই আপেক্ষিক স্থায়িত্ব, জনগণের সংগঠন ও শক্তি ইতিমধ্যে গড়ে না উঠলে, রক্ষণশীলতার দিকে ঝোঁকার সমূহ সম্ভাবনা। কারণ, জনগণের সংগঠিত শক্তি ব্যতিরেকে, গ্রামীণ সম্পন্ন ভূস্বামী ও শহুরে অসৎ নেতৃত্বের জোট, দেশকে, দেশের অর্থনীতিকে, ডাইনে হেলাতে নিশ্চয়ই সচেষ্ট হবে, এমনকি নির্ভরশীল ধনতন্ত্রে সরাসরি রূপান্তর ঘটবে। অথচ ভবিষ্যতে এ-সম্ভাবনা আছে বলেই বর্তমানে শত্রুমিত্র চেনার দায়িত্ব সমধিক, এবং এ-কথা ভাবা ভুল যে আমাদের জাতীয় আন্দোলন ও এখানকার শাসকবৃন্দ, শ্রেণী হিসেবে বুর্জোয়া-জমিদার। তাহলে মিত্রপক্ষের এক বৃহদংশকেই সাম্যবাদীরা হারাবে।

এ-সব কথা যখন আমি শুনেছি তখন অন্তরে ছিল শুধু শ্লেষ ও নির্বিচার আক্রোশ। আজ আরো দেখেশুনে, মর্মান্তিক ঘা খেয়ে, যখন ভূতপূর্ব নকশালী নেতারাও অনেকে নির্বাচনে নামেন, গণতন্ত্রের সম্প্রসারণে প্রয়াস পান, এবং শুধু সি. পি. আই নয়, সি. পি. এমও তথাকথিত বুর্জোয়া-জমিদারদের পার্টিগুলিতে প্রগতিপন্থী খুঁজে পান, তখন আমি আর আগের নিশ্চিতি খুঁজে পাই নে। আগের প্রত্যয় অথবা অন্ধ বিশ্বাস, নির্বিচার উত্তেজনা, আপাতত আমার অনায়ত্ত। বরং এখন থেকে থেকেই মনের একান্ত নিভৃতিতে, গগন জেঠার অনেক কথা প্রশ্ন হিসেবে ফিরে ফিরে আসে। ইদানিং আমি অনেক চিন্তাই অবজ্ঞায় অবহেলায় এড়িয়ে যেতে অক্ষম।

রেশনের সঙ্গে কাপড় কাচার সাবানও এনেছিলুম কিনে। দুপুরে আমি ধুতিটা কাচতে বসি। জামা কেচে আগেই ইস্ত্রি করেছিলুম। কাপড় কেচে, দুপুরে ছেঁড়া লুঙিটা পরে, গেঞ্জি গায়ে বাইরের রকে বসে রইলুম

অনেকক্ষণ। স্বকু বেরুচ্ছিল, আমায় দেখে কাছে এসে বলল, 'সকালে তুই রেশন তুলছি, না?'

'হ্যাঁ।'

'তোকে যে আমি ডাকলুম অত··· !'

'শুনতে পাইনি, লাইনে যা ঝগড়া হচ্ছিল! তুই ছিলিস কোথায়?'

'হারুদের বৈঠকখানায়, সত্যদা এসেছিলেন···মিটিং।'

'ও।'

'তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব ভেবেছিলুম।'

'হুম্! আগে নিজের চরকায় তেল দে তুই।'

স্বকু একটা চড় মারল আমার পিঠে, হাসিমুখে পাশে বসতে বসতে বলল 'হিংসে করলে কি হবে, তোরা যা পারলি না, আমরা তাই করব।'

'অহিংস বিপ্লব!'

'হ্যাঁ-রে, দেখিস্...সত্যদা বললেন গ্রেন ট্রেড টেক্ ওভার হচ্ছে, তারপর অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য জিনিসেরও...চাকরি-বাকরি হবে অনেক।'

'মুখে তোর ফুল চন্দন পড়ুক।'

'শালা ঠাট্টা।···তখন তো ল্যাং-ল্যাং করে আসবি—চাকরি-দে চাকরি-দে!'

'এখনই দিলে যাই।'

স্বকু আমার মুখের দিকে ভালোভাবে তাকাল। পকেট থেকে চারমিনারের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল 'আমরা, যুবরা আন্দোলন চালিয়ে যাব···।'

'ব্র্যাভো।'

'দেখিস' ও সিগারেটটা বাড়িয়ে ধরে বলল 'একটা টান দিবি নাকি?'

'না, তুই খা।'

'সত্যি বাদলা, ফুড ডিপার্টমেন্টে অনেক লোক নেবে...তুইও ভিড়ে যা।'

'তোরটা হোক আগে।'

'আরে আমি তোর কথাও বলেছি···আজই···এখন নিজের দরখাস্ত দিতে যাচ্ছি···সত্যদাও রেকমেণ্ড করেছে।'

'খুব ভালো...।'

'তুই একটা দরখাস্ত করে রাখ।'

'করব'খন...কিন্তু হবে কি?'

'আমার হাতে দিবি...আগে কয়েকটা টেসটিমনিয়াল জোগাড় করি তোর জন্যে।

'আচ্ছা।'

স্বকু কয়েক-পা এগিয়ে গেছিল, আবার ফিরে এল, গলা নামিয়ে বলল 'দেখিস, জেলফেল যাওয়ার ব্যাপার লিখিস না... ।'

'না-না' আমি হেসে ফেলি, বলি, 'কিন্তু পুলিশ এনকোয়ারি হবে।'

'রাখ-রাখ...সে সব ম্যানেজ দেব।'

স্বকু চলে গেল। গগনজেঠার ছেলে, আশৈশব একসঙ্গে বড় হলুম। সিটি কলেজেও দু-জনে দু বছর ঘনিষ্ঠ অবস্থায় কেটেছে। তারপর ও ছাত্র-পরিষদে ঢুকল আর দেখতে-দেখতে আমাদের দু-জনের মধ্যে একটা আড়াল তৈরি হল। বাক্যালাপ ছিল, এমন কি, হাসি-ঠাট্টাও, কিন্তু সমস্ত নিবিড় আদান-প্রদান শিথিল হয়ে এল। শেষ ছ-মাস কি-কলেজে কি-পাড়ায় দেখাও হত ক্বচিৎ, হলেও দুজনে দুজনকে এড়িয়েছি, না দেখার ভান করে কাটিয়েছি। পরীক্ষার পর তো আমি বেপাত্তা; আর দেড় বছর পর যখন স্বকুর সঙ্গে ফের দেখা হল তখনো ও বেকার। ছাত্র-পরিষদে আর নেই, হয়েছে যুব কংগ্রেসী। ওদের যুবনেতা সত্যদা, সত্যপ্রিয় দস্তিদার, ওর এখন আদর্শ; দেওয়ালে দেওয়ালে প্রায়ই লিখে বেড়ায় 'যুগ যুগ জিও'। আমরাও লিখতুম অন্য নামে, তার মধ্যে লিন পিয়াও আজ মৃত। নিক্সন আর মাও-সে-তুং-এর নাকি দর্শন নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। কি এবং কে তবে পেপার টাইগার ?

আমি উঠে পড়ি। সব শালা সমান, ভাবনার কোনো মানে নেই। ধুতিটা সামান্য স্যাঁতস্যাঁতে থাকতে থাকতেই, পাটে পাটে, হাতে চেপে চেপে মসৃণ করে, বিছানার তলায় রেখে দেব। ছ-টায় টিউশান। এ-কদিন গেছি-এসেছি অসহ্য মালিন্যের মোড়কে। উপায় ছিল না, যদিও ভিতরে ভিতরে সঙ্কোচ দীর্ণ করেছে। আগে অত করত না, কিন্তু ক্রমান্বয়ে করতে আরম্ভ করেছে। গোড়ায় কেমন যান্ত্রিক কাজের মতো ছাত্রকে পড়িয়েছি, মন থাকত নিজেতে নিমজ্জিত। ক্রমে ওদের অধরা সভ্যতায়, অব্যক্ত সৌজন্যে আমি যেন সচেতন হতে থাকি। অল্প কিছু খাবার, জল, কুমারের মা কিংবা বাড়ির লোকটি রোজই রেখে যায়। ভদ্রমহিলা কিংবা কুমারের দিদি, কুন্তলা, মাঝে মাঝে একটু গল্প করে যান। পড়ার মাঝখানে চা পাঠিয়ে দেন। তাছাড়া ছোটোঘরের স্বল্প বেতের আসবাবে, কোণায় পড়ার টেবিল এবং

দুটি কাঠের চেয়ার ও বইয়ের আলমারিতে, অনাড়ম্বর গোছানোয়, ঝুলহীন দেওয়াল আর কুমারের অজস্র কথায় আমার মন যেন ক্রমশ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। অনেক সচেতন ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সংবেদ্য। মনুষ্যত্বের সংস্পর্শে, ক্রমান্বয়ে অনেক সময় নিজেরই অজ্ঞাতে যে চৈতন্যের ব্যাপ্তি ঘটে, বোধাবোধ হয় ঘন, এ তারই রকমফের দৈনন্দিনের আঙিনায়। কিন্তু চৈতন্যের এই উদ্বোধনই, আমার নিজস্ব পরিস্থিতিতে ও অভাবে, ব্রীড়ায় মন ভরায়। ইদানীং নোংরা জামাকাপড়ে কুমারদের বাড়ি যেতে ভিতরে ভিতরে অশান্তি এমন কি অপমান বোধ করি। প্রায়ই ভাবি সামনের মাসের চল্লিশ টাকা পেলে একটা রেডিমেড প্যাণ্ট আর শার্ট কিনব। একবার দোকানে টাঙানো একটা জামা মনে মনে ঠিকই করে রেখেছিলুম, কিন্তু কেনা হয় নি। শুধু কিছুদিন পরে চোখে পড়েছিল সেটা দোকানে আর ঝোলে না, অন্য একটা বিশ্রী দেখতে, সেখানে লটকাচ্ছে।

কুমারের মর্নিং-স্কুল। দেড়টা-দুটোয় বাড়ি ফিরে আসে। আর চারটে বাজতে না বাজতেই বাইরে ছুটে যায়। আশপাশের বন্ধুরা জড়ো হলেই খেলা আরম্ভ হয়। ফুটপাতে বা পিছনের বাড়ির দাওয়ায় ওদের খেলা। ছ-টায় যখন আমি পৌঁছোই, শীতকাল ছাড়া, কুমার তখনো খেলায় মত্ত। মা একবার বকেছিলেন, বলেছিলেন 'মাস্টারমশাই কি রোজ এসে বসে থাকবেন, ছিঃ!' কুমারের মুখ তখনো দৌড়াদৌড়িতে টকটকে লাল, চোখে খেলার বিভোর ভাব, কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ, সে বলল 'বাঃ এখনো তো রোদ আছে!'

'রোদ আছে! এদিকে তো সন্ধ্যে হলেই ঘুম পায়।'

'বাঃ!' কুমার একটু হাসে।

আমি ওর মাথায় হাত রাখি, বলি 'আমি একটু বসবো'খন।...তুমি তাড়া না করলে।'

'এই তো, আপনিই ওকে আহ্লাদ দেন!' মা বলেন।

'না-না, ও দেরি করে এলে দুধটা খেয়ে নেবে তাড়াতাড়ি,...তাই না কুমার?'

কুমার অনায়াসে ঘাড় নাড়ে, বলে 'দাও না দুধ।'

মা হেসে ফেলেন, বলেন 'বাব্বা! এতটা সইলে হয়!'

'বা-রে, আমি কি দুধ খাই না?'

'চিবনো শক্ত তো, ঘণ্টাখানিক লাগে তবু গিলতে!'

'মোটেই না।'

'আচ্ছা মাস্টারমশাই দেখুন আজ…আমি দুধ পাঠাচ্ছি।'

সেদিন দুধ ঠাণ্ডা হতেই যা বিলম্ব ঘটেছিল। অতঃপর কুমার চোঁ-চোঁ টানে গেলাশ শূন্য করে দেয়, দিয়ে বিজয়ীর মতো তাকায়। মুখে আত্ম-প্রসাদের হাসি। কিন্তু সেই হাসিই ওর কাল হল, মা-ও বুঝলেন প্যাঁচটি। বিকেলে আর ওর দুধ নিয়ে পিছন পিছন দৌড়োন না তিনি; কলা-টলা খাইয়ে খেলতে পাঠান। সন্ধ্যায়, আমার জলখাবারের সঙ্গে, কুমারেরও দুধ আসে। ঠাণ্ডা হলেই তাকে অম্লানমুখে সেটা খেতে হয়। সম্ভবত হুটোপাটির পর তার নাড়ীও মোচড়ায়, তাই খাওয়ায় তেমন ব্যাঘাত ঘটে না। আপত্তি তো নয়ই। মা বলেছিলেন 'কলটা ভালোই হয়েছে।'

কুন্তলা বলেছিল 'ক্রেডিট্‌টা মাস্টার মশাই-এর।'

'নিশ্চয়ই।'

আমি চুপ করেছিলুম। বলারও কিছু ছিল না। কুন্তলার কথাবার্তা বেশ লাগে। আগে-আগে যেন কানে যেত না, অথবা যেত, খেয়াল করি নি। রাস্তা পেরোতে পেরোতে, নানান শব্দের আওয়াজের ভিতর যেমন কখনো কখনো ঘাড়ের উপর এসে পড়া গাড়ির হর্নের চিৎকার সময়মত মনে বাজে না। অকস্মাৎ চমকে উঠি, লাফিয়ে পালাই। এক্ষেত্রে কখনো চমকে উঠি নি ঠিকই, কিন্তু অকস্মাৎই একদিন, কুন্তলা যখন সোজা তাকিয়ে কথা বলছিল, আমার খেয়াল হল ওর মুক্ত দৃষ্টি। এই পরিচ্ছন্ন, বৃষ্টিবিন্দুর মতো স্বচ্ছ চাউনি, আমাকে ভিতরে ভিতরে সচকিত করেছিল এবং সেই মুহূর্তে, যখন আচমকা চৈতন্য প্রখর হল, আমি নিজেই ওর চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিলুম।

শুধু চোখেরই না, ক্রমান্বয়ে বুঝেছিলুম, ওর সারা মুখেরই যে খোলামেলা, অবারিত অভিব্যক্তি তা সচরাচর বিরল। ওর কোনো সচেতন ভঙ্গি ছিল না। না চলায়-বসায় দাঁড়ানোয়, না কথার পাটে। ছিল স্বতোৎসারিত, স্বচ্ছন্দ গতি, যার শিকড় নিশ্চয়ই অনাবিল মন এবং হয়তো বা আনন্দে।

খোলামেলা স্বভাব কুমারেরও। তার মনের-মুখের কোনো পার্থক্য আসে নি এখনো, শিশুর সারল্য শাসনে-মানায়-ধমকে অন্তর্হিত নয়। আসলে এ বাড়ির আবহাওয়াই অন্যরকম, আপাত অনুশাসন চোখে পড়ে না; যেটা পড়ে সেটা একটা স্নেহের নিয়ম, যার ছন্দ বাঁধা অব্যক্ত প্রীতির শৃঙ্খলায়। এ-শৃঙ্খলায় কোনো গায়ের জোর নেই, আছে অভ্যস্ত ধারা। সে জন্যেই

সম্ভবত, খেলে এসে, সবে পড়তে বসেই একদিন হঠাৎ কুমার লাফিয়ে উঠেছিল, প্যান্টের সামনেটা চেপে ধরে বলেছিল 'উঃ বড্ড হিসি পেয়েছে !'

'যা, যা শিগ্‌গির।' কুন্তলা বলেছিল।

'মাস্টারমশাই। যাব ?'

'কী আশ্চর্য, যাও! দৌড়োও।'

কুমার দৌড়ুল ; দৌড়তে দৌড়তে বলল 'ইস্, বেরিয়ে যাচ্ছে... !'

কুন্তলা তখন হাসছে। হাসতে হাসতে বলে 'একেবারে পাগল !'

আমিও হেসে ফেলি, বলি 'বেচারা !'

'বেচারা আবার কি, আগে বাথরুম গেলেই হয়।'

'উত্তেজনায় গুলিয়ে যায়···খেলার সময় খেয়াল থাকে না···তারপরেই পড়া।'

'রোজই এই হয় না কি ?'

'প্রায়ই।'

কুন্তলা চুপ করে গেল, মুখটি রইল স্মিত, সহজ। হাসির দমক ওর মিলিয়েছিল আগেই, এবার কুমার ফিরলে সে-ঘর থেকে চলে গেল। কিন্তু অতঃপর প্রতিদিন, পড়তে বসার কেউ-না-কেউ কুমারকে বলত 'আগে বাথরুমে যাও।'

'কেন ?'

'সব সেরে-টেরে এসো।'

কুমার প্রথমদিন ব্যাপারটা বোঝে নি। দিদির দিকে তাকিয়ে ছিল। কুন্তলা ওর হাত ধরে বলেছিল 'চল, হাতমুখ ধুবি।'

'বাঃ, আমরা কাদায় খেলি নি আজ !'

'হাত-পা দেখেছিস ? ভূত হয়ে আছে।'

ওকে নিয়ে যেতে যেতে কুন্তলা বলেছিল 'মুখ হাত ধুয়ে দেখবি ফ্রেশ লাগবে।···ঠাণ্ডা, ভালো।'

সেই থেকে কুমারের এটা একটা নিয়ম হয়ে গেছিল। সাধারণত কোনো ব্যাঘাত ঘটত না, হয় নিজেই যেত কিংবা মনে করালে। শুধু যেদিন ও থাকত কথায় মত্ত, তদ্‌গত, সেদিন বেঁকে বসত। একদিন বলেছিল, 'মাস্টারমশাই, হাতী মেরা সাথী দেখেছেন ?'

'না ভাই।'

'সে কী! রাজেশ খুব ভালো করেছে।'

'রাজেশ ?'

'রাজেশ খান্না…হিরো…হাতীটা আরো ভালো।'

'তুমি দেখেছ ?'

'না, দিদি নিয়ে যায় না।'

কুন্তলা বলে, 'আঃ, আবার বাজে বকছিস।'

'আজ্ঞে, বাজে না।…ববি আরো ভালো হয়েছে, এখনো চলছে।'

'কে বলল ?'

কুন্তলা হেসে বলল 'ওদের স্কুলবাসের এসকর্ট…আপনার ছাত্র রাস্তায় বিজ্ঞাপন পড়তে-পড়তে যায়।'

কুমার সোৎসাহে বলে 'আমি 'জলতে বদন' বানান জানি…ইংরিজি।'

আমার হাসি পায়, চেপে রেখে বলি 'বল দিকি।'

'জে, এ, ল, টি, ই, জাল্‌টে…বি, এ, ডি, এ, এন, বদন…হয় নি ?'

কুন্তলা বলে 'বদনই বটে !'

'তুই চুপ কর…মাস্টারমশাই ?'

'রাইট…বানান নিভুর্ল।'

'তবে ?' ও এবার কুন্তলার দিকে তাকায়, চোখ জল্‌জল্‌ করে বিজয়ে। কুন্তলা বলে 'খুব হয়েছে…এবার চল্‌।'

'কোথায় ?'

'বাথরুমে।'

'আমার হিসি পায় নি।'

'আঃ, হাত-পা ধুবি !'

'পরে ধোব…তুই যা।'

'আবার ! মাকে ডাকব ?'

'ডাক্‌ না, ভারি… ।'

আমি এবার বাধা দিই, বলি 'চলো, আমিও মুখে-চোখে জল দিয়ে আসি।'

কুমার একসেকেণ্ড চুপ করে রইল, তারপর হঠাৎ ওর মুখে লজ্জার আভাস ফুটল। ও আচমকা দৌড় দিয়ে যেতে যেতে বলল 'দাঁড়ান, আমি আগে সেরে নি।' কারুরই বুঝতে বাকি রইল না ওর আদত অবস্থা। কুন্তলার

দিকে চোখ পড়তেই আমাদের দুজনের একসঙ্গে হাসি এল। আমি তাড়াতাড়ি বললুম 'খুব সিনেমা ফ্যান হয়েছে!'

'মাথা! দেখেছে শুধু গুপী গাইন, দুটো টার্জান আর চ্যাপলিনের কিছু...।'

'হিন্দি ছবি তো সব মুখস্থ।'

'সব, শুধু নামই নয়, দু-এক কলি গানও গায়।'

'আপনারা দেখেন না?'

'দৈবাৎ কখনো...প্রায় ছবিই বড্ড বোকা-বোকা, আপনি?'

'না।'

আর কিছু বলে নি। চোখ সরিয়ে নিয়েছিলুম। মনের ভিতর হঠাৎ একটা অস্বস্তি ধাক্কা দেয়। আর দেখতে দেখতে, শত চেষ্টা সত্বেও, আমার মুখ কেমন উষ্ণ হয়ে ওঠে। অকস্মাৎ মনে হয় যেন নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছি; বাতাসে ভাসছে আমার পরিস্থিতি, বাড়ির খবর। আমার অক্ষমতা, অনটন।

'সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখেন?'

'তা দেখি।'

'মৃণাল সেন?'

'মাঝে-মাঝে।'

কোনো জবাবই আমি ওর দিকে তাকিয়ে দিই নি। তবু আমার কান-দুটোয় যেন গরম ছোটে। মিথ্যে কথা যে আমার আসে না তা নয়; অনেক-ক্ষেত্রে অনায়াসেই তা উচ্চারিত, কিছু না ভেবেই। বানিয়ে কথা অজস্র বলি, কখনো বা ভেবেচিন্তে মিথ্যে খাড়া করি। কিন্তু সে-সব ক্ষেত্র ব্যতিক্রম, যেন নদীর বান; নৈর্ব্যক্তিক, বিশাল স্রোত। সেখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনো প্রশ্ন নেই, নেই অন্তরাত্মার পরীক্ষা। এখানে কিন্তু সত্তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়; কেন জানি অন্তরে মর্যাদাবোধ জলে ওঠে স্ফুলিঙ্গের মতো। ক্রমান্বয়ে ভিতরে ভিতরে গুমরোয়, পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে এক চাপা অপমানবোধ এবং রাগ।'

'পদাতিক দেখেছেন?'

'না।'

'ওটা আপনাদেরই ছবি...মানে একই সমস্যা নিয়ে।'

কুন্তলা কথাটা বলে কেমন অগোছালো হয়ে যায়। প্রথমটা বলেছিল একটা স্বতোৎসারিত ছন্দে, কথার পিঠে। কিন্তু আমি যখন তাকাই, বারংবার

মিথ্যে বলার রাগে, তখন আমার দৃষ্টির সেই অনিশ্চিত প্রাখর্য, মুখের প্রতপ্ত শক্ত রেখা, কুন্তলাকে সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত করে দেয়। সে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নত করে, আঙুল দিয়ে আঙুলের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলে 'আই অ্যাম সরি···কিছু মনে করবেন না।'

'ছবিটা খুব বাজে।'

আমি বলি, মূলত ব্যাপারটা সামলানোর চেষ্টায়, তবু আমার গলা কাঁপল আর শোনাল কর্কশ। নিজের গলা শুনে নিজেই ছোট হয়ে গেলুম। মুখ ফেরালুম জানালার দিকে। ভিতরে ভিতরে অনুভব করলুম শ্রান্তির প্রথম আভাস; প্রচণ্ড উত্তেজনার পর যে শ্লথ মন্থর বোধ জাগে তার টান-টান প্রভাব। মন চেঁচিয়ে উঠল, খেতে পাই নে, সিনেমা দেখব? বারবার একই প্রসঙ্গ তোলা কেন অযথা? কিন্তু কথা সরল না, মুখ রাখলুম আড়ালেই। কুন্তলা যখন উঠে গেল তখন ফিরেও তাকাল না।

বাড়ি ফিরতেই মা ইশারায় ডাকলেন। কাপড়ের খুঁট খুলতে খুলতে বললেন 'একবার ডাক্তারখানায় যা।'

'কেন?'

'ওঁর ওষুধটা যদি পাস... ।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই মা খুঁট খুলে একটা একশ টাকার নোট বের করেছিলেন। বাবা হঠাৎ তখন ঘড়ঘড়ে গলায়, টানের মধ্যে বলে উঠলেন 'আমার কিছু চাই না···।'

আমি তাকাই, বাবার সারামুখ ঘর্মাক্ত, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে তেজ। অবুঝ, একরোখা গোঁ অথবা অভিমান। আমি চোখ ফিরিয়ে নিচুগলায় বলি 'মিনিমাসি এসেছিল বুঝি?'

'আসে নি, ড্রাইভার টাকা দিয়ে গেছে।'

'পল্টুকে পাঠিয়েছিলে নাকি?'

'না, পোস্টকার্ড লিখেছিলুম।'

আমার মুখে এসেছিল, কেন, কি দরকার ছিল। কিন্তু কথা বলি নি। হাতের নোটের দিকে তাকাই কেবল। কিন্তু হয়তো আমার মনের কথা মুখে ছায়া ফেলেছিল; আর মার রোগা, ফ্যাকাশে, ক্লিষ্ট অভিব্যক্তি শক্ত হয়ে এল। চাউনিতে এল কাঠিন্য. তিনি সোজা তাকিয়ে থেকে বললেন 'মিনি আমার সম্পর্কে বোন···আমরা পিঠোপিঠি···।'

'সেটা শুধু তোমারই মনে থাকে, মা।'

'ওর-ও থাকে···নইলে আমরা বাঁচতুম না···।'

'একে বাঁচা বলছ?'

'হুঁ। বলছি···এখনো নিশ্বাস নিই আমরা···তুই কি করেছিস্, বল? বল? বিপ্লবই কি হয়েছে?'

আমি চুপ, আর কথা বলি না। বিস্মিত তাকাই একদণ্ড মার আগ্রের মুখের দিকে। ওঁর তাপ, ব্যর্থ চাপা ক্রোধ আমায় বিভ্রান্ত করে দেয়। আমার ভিতরে ভিতরে অহরহ যে ক্ষত দগ দগ করছে সেখানে মা সহজে ঘা দেন না, সে যন্ত্রণার উৎস সাধ্যমত এড়ান। এ মুহূর্তে, সম্ভবত বাবার অন্ধ অভিমানের সঙ্গে লড়ে, নিজে অপমানিত আহত হয়ে, দিনে দিনে ক্ষয়ে নিঃশেষ হওয়ার পর, উনি আমার অন্তঃস্থল দীর্ণ করেন। আমি ঈষৎ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে টাকা হাতে বেরিয়ে যাই।

প্রথমে রাস্তায় নামি অনির্দিষ্ট পায়ে। মনে শুধু থাকে একটা চাপা ভার। চিন্তা নয়। চিন্তার যে স্তর-বিন্যাস, পরস্পর টানা-পোড়েন এবং বিরোধ, সেটা টের পাই না। যন্ত্রবৎ এগোই। কিছুটা হেঁটে যাবার পর বড় রাস্তার আলো চোখে পড়ায়, আচমকা খেয়াল হয় যে ডাক্তারখানায় যেতে হবে। বাবার ওষুধ কেনা দরকার। ওষুধের নামটা তখুনি মনে আসে না, কিন্তু চেতনায় আভাস জাগে। হাঁটতে হাঁটতে নামধাম মনে পড়বে।

চলতে চলতে ভাবি, বলার কিছুই নেই। মিনিমাসি মার মামাতো বোন, সমবয়সী। মেশো মস্ত ব্যারিস্টার। অনেক কাল হলো মিনিমাসি সাহায্য করছেন। পঞ্চাশ-একশ টাকা পাঠিয়ে দেন। দৈবাৎ কখনো এলে, মাকে জড়িয়ে নীরবে কাঁদেন, খুব নিম্নগলায় কথা বলেন কিছুক্ষণ। যাবার সময় ব্যাগ খুলে মার হাতে একটু বেশি টাকাই গুঁজে দেন। বলেন আবার আসব, শিগ্‌গিরই। কিন্তু আসেন না। তিন বছরে কয়েক বার মাত্র এসেছেন মিনিমাসি। একবার আমি প্রথম পলাতক হলুম, গ্রাম থেকে সহর ঘেরার স্বপ্নে নিরুদ্দেশ, তখন, আর আবার যখন আমি জেলে এবং বাবা মরমর। এসে দুইবোনে খুব কেঁদেছেন বসে বসে। কথাও কয়েছেন নিম্নস্বরে।

আসলে মিনিমাসির মন নরম, শুভ ইচ্ছাও কম নয়। মাকে সত্যিই ভালবাসেন। কিন্তু তবু এ-পরিবেশে, এ-নিশ্ছিদ্র দারিদ্র্য ও রোগের নরককুণ্ডে, মিনিমাসির শ্বাসের কষ্ট হয়। মনটা হয়ে যায় ক্ষুদ্র। যে গভীর বিষণ্ণ বেদনা

জাগে হৃদয়ে, যে সহমর্মিতা, তার পিছনে থাকে এক অমোঘ অশান্তি। নিজেদের সাচ্ছল্যের হাল্কা আবেশ, হঠাৎ হয়ত মনকে সঙ্কুচিত করে। মনে হয় মরে যাই, এ-ভাবে মানুষ বাঁচে ! কিছু কি করার নেই, মমতা, স্নেহ, প্রেমের আড়াল দেওয়ার কোনো পথ ?

এই আবেগেই একবার মিনিমাসি খবর পাঠিয়ে ছিলেন। আমার তখন সবে রেজাল্ট বেরিয়েছে। মা নাকি গিয়ে বলেছিলেন 'মিনি, তুই বাঁচা।'

'কি হল কি ?...বস বস।'

'বাদলকে একটা কাজে ঢুকিয়ে দে... ।'

'কাজ ?'

মিনিমাসি মার মুখের দিকে কয়েক নিমেষ চেয়ে ছিলেন। তারপর মার হাল দেখে বলেছিলেন—

'কাজ আমি কোথায় পাব, বেলি ?'

মা বলেছিলেন, 'তুই বীরেশ্বর বাবুকে বল···ওঁর তো অনেক জানাশুনো।'

'দাঁড়া-দাঁড়া', মিনিমাসি উঠতে উঠতে বলেছিলেন 'আগে কি খাবি বল্, ঠাণ্ডা না গরম ?'

মা হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে মিনিমাসি নিজেই সামলে নিয়েছিলেন, বলেছিলেন 'ঠাণ্ডাই খা···সরবৎ বলি।'

মা চুপচাপ বসেছিলেন একা ক্ষণকাল। নেহাত বেপরোয়া অবস্থায় এসেছিলেন তাই মন ছিল আচ্ছন্ন, নইলে হয়ত অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াতেন।

মিনিমাসি ফিরে এসে, মা-কে জড়িয়ে ধরে বসে বলেছিলেন,

'ব্যাপারটা খুলে বল তো ?'

'আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি রে ?'

'ডোণ্ট বি সিলি !'

'সত্যি বলছি···ওঁর আশি টাকা পেনশন। বাদল ছুটো টিউশানি করে আনে নব্বুই টাকা...তাতে ওষুধ, খাওয়া দাওয়া, ঘরভাড়া...তুই না টাকা দিলে আমরা এতদিনে মরেই যেতুম।'

মার চোখে জল। এতক্ষণের চাপা আবেগ, এতদিনের অব্যক্ত, জমানো যন্ত্রণা, প্রাত্যহিকের দুশ্চিন্তা ও অভাবের হাহাকার, মিনিমাসির শান্ত সচ্ছল নম্র পরিবেশে অকস্মাৎ যেন ভেঙে পড়ল। মা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন জোরে এবং আপনা থেকেই নিজের মাথাটা গিয়ে পড়ল মিনিমাসির কাঁধে। মিনিমাসিও ভিতরে ভিতরে অগোছালো, বেসামাল হয়ে গেলেন। মাকে

জড়িয়ে ধরে থাকতে থাকতে তাঁর চোখ হয়ে এল বাষ্পাচ্ছন্ন। অন্তর হু-হু করে উঠল এক অজানা অবোধ কষ্টে। মিনিমাসিও কেঁদে ফেললেন। বারে বারে সশব্দে রুমালে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে নাকের ডগা তাঁর লাল হয়ে উঠল।

তিনি কম্পিতকণ্ঠে বললেন 'শোন শোন বেলি...ওঠ...দেখি কি করা যায়।'

মার সামলে নিতে অল্প সময় লেগেছিল। এবং প্রথমটা কেমন তিনি অধোমুখ হয়ে গেছিলেন। ব্রীড়া জেগেছিল ভিতরে ভিতরে। ভেঙে পড়া তাঁর স্বভাব নয়, স্বভাবের ব্যতিক্রম তাঁকে ঈষৎ আড়ষ্ট করেছিল। তবু তিনি যখন চোখ তুললেন তখন তাঁর চোখে কৃতজ্ঞতার চাউনি।

মিনিমাসি প্রায় স্বগতোক্তি করলেন 'মুস্কিল। আজকালকার দিনে...!' মা তাড়াতাড়ি বললেন, 'বাদল পরীক্ষায় ভালোই করেছে...। একটুর জন্যে ফার্স্ট ক্লাস পায় নি।'

'আর্টস না সায়েন্স?'

'সায়েন্স'

'কত ফার্স্ট ক্লাসই গড়াগড়ি যাচ্ছে...।'

'তবু, বীরেশ্বরবাবু বললে...'

'দেখি।...কিন্তু ও ফার্স্ট ক্লাস পেল না কেন?' মা চুপ করে রইলেন। কিছু বললেন না।

'পড়াশুনা করে না?'

'করত...।'

'তা হলে?'

'সংসারের চাপ, ভাবনা।'

'বিদ্যাসাগরের কথা ভুলিস না বেলি...রাস্তার বাতিতে লেখাপড়া করেছেন।'

মা চোখ ফেরালেন। মিনিমাসির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। চুপচাপ দেখলেন ঈষৎ মার মুখের দিকে। মা হঠাৎ টেবিল থেকে ওঁর বোনাটা তুলে নিলেন, দেখতে থাকলেন। মিনিমাসি সেটার উপর একটা হাত চাপা দিলেন, অন্য হাতে মার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন 'কি লুকোচ্ছিস বল তো?'

'না-না।'

'না-না আবার কি...আমি বুঝি না কিছু?'

মা কাউচে এলিয়ে পড়লেন, চোখ দুটো বন্ধ করে ক্ষীণ গলায় বললেন 'ওর মাথায় ভূত ঢুকেছে···বাদলের।'

'ভূত ?'

'হ্যাঁ, কৃষি বিপ্লবের। গ্রাম থেকে সহর ঘেরার।'

'সে-কী-রে !'

মিনিমাসি প্রায় আর্তনাদ করে ওঠেন। ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে যান। চুপচাপ দুইবোন নিমেষ কয় কাটিয়ে দেন। শেষে মিনিমাসি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন; ফেলে সোজা হয়ে বসেন, বলেন, 'ওর একটা চাকরি জোগাড় করতেই হবে, শিগ্‌গির।' তারপরেই আমার ডাক পড়েছিল। হঠাৎ একদিন মিনিমাসি-দের ড্রাইভার এল, হাতে ওঁর চিঠি। লিখেছিলেন,

বেলি,

বাদলকে কাল অতি অবশ্য পাঠিয়ে দিস। সকালে। সাড়ে আটটার মধ্যে যেন আসে। এখানেই ব্রেকফাস্ট করে নেবে। উনি কথা বলবেন।

কিছু টাকা পাঠালুম (৭৫)। ইচ্ছে ছিল আরো বেশি পাঠানোর। যা আক্রারার বাজার, সংসার চালানোই মুস্কিল। ভাল থাকিস, ইতি—মিনি।

মার সারা অন্তর স্নিগ্ধ প্রীতিতে ভরে গেছিল। যত্ন করে টিনের তোরঙ্গের তলায়, মিনিমাসির অন্যান্য চিঠির সঙ্গে, আমার ঠিকুজির পাশে, এ-চিঠিটাও তুলে রেখেছিলেন। ভোরে আমায় তাড়া দিয়ে তুলেছিলেন। বলছিলেন

'বীরেশ্বরবাবু ব্যস্ত মানুষ...দেরি করিস নে...খেয়ে উঠে মক্কেল নিয়ে বসেন উনি।'

দেরি অবশ্য আমার হয় নি। এমন-কি ট্রাম ডিরেল্ড হওয়ায়, সেটা ছেড়ে বাসে চেপেও আমি সময় মতো পৌঁছে ছিলুম। ইচ্ছে করলে সকাল ছটায়ও আমি আসতে পারতুম।

লন ছাড়িয়ে বারান্দা ; বারান্দা পেরতে পেরতেই ছোটকির সঙ্গে দেখা। ও বলল 'আরে, বাদলদা !'

'কেমন আছিস ?'

'ভালো...তুমি ?'

'এই চলছে···মা কোথায় ?

'ডাইনিং রুমে...চলো।'

'বাবা ?'

'আসছেন···ওয়াশে।'

আমরা ভিতরে এগিয়ে যাই। টের পাই ছোটকি আড়ে-আড়ে আমায় দেখছে। বুঝি ওর চাপা কৌতূহল। ওর দিদি, বড়কি, সাহেব বিয়ে করেছে, বিলেতে। গেছিল ডাক্তারি পড়তে, পড়া সাঙ্গ করে আর ফেরে নি। ওখানেই আছে। দাদা আমেরিকায়, ভাল ছাত্র ছিল। এখন নাকি হার্ভাডে রিসার্চ করছে, বাবা মা আশা করেন সামনের বছরের মাঝামাঝি ফিরবে ছেলে। মিনিমাসি আমায় দেখে বললেন 'আয় আয়, বস।'

'কোথায় ?'

'এই চেয়ারে বস···ওটা তোর মেসোমশাইয়ের...ওঁর পাশেই তোর বসা ভাল।'

ছোটকি হঠাৎ বলল 'তুমি কিন্তু রোগা হয়ে গেছ, বাদলদা ?'

'তুই ?'

'তুমিই বল ?'

'বড় হয়েছিস...অনেকটা।'

'আহা, কি কথাই বল্লে !'

সবাই হেসে ফেলল। ছোটকি হাসতে হাসতেই বলল 'তুমি নাকি কি সব করছ আজকাল ?'

আমি তাকাই। সে কিছু বলার আগেই মিনিমাসি বলে উঠলেন 'আঃ, ছোটকি !'

ছোটকি বলল 'বারে ! তুমিই তো বলছিলে···।'

'ফের !'

'ডোণ্ট বি বসি, মা।'

'স্থাখ্ ছোটকি...।'

'ও-কে, ও-কে...আমি চুপ করছি।'

ছোটকি থেমে গেল, চোখ ফেরাল। না চাইল মার দিকে, না আমার পানে। মুখ ওর অসন্তুষ্ট। উদাসীন হওয়ার চেষ্টা ছাপিয়ে উঠেছে আপাতত চাপা বিরক্তি। মিনিমাসিও খাবার জোগাড় করায়, বাবুর্চিকে উপদেশে, নিজেকে জড়ান। তাঁকেও অল্প আড়ষ্ট, আত্মসচেতন মনে হয়।

আমার মুখ গরম হয়ে আসে। আমায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে সন্দেহ নেই। সেই সুবাদেই, মনের কৌতূহলে, ছোটকি কথা পেড়েছিল। ওর সারল্য এখনো পরিণত বুদ্ধির হিসেব করে না, উচিত-অনুচিত টের পাওয়ার আগেই বেফাঁস উক্তিতে জড়িয়ে পড়ে। দুশ্চিন্তাহীন সুখ ও আহ্লাদে

বড় হতে হতে ও এখনো নানা বিষয়ে পাকে নি। কিছুটা নির্বোধ রয়ে গেছে।

অথচ এ সারল্যও আমার ভাল লাগে না। অন্তত সব সময় নয়; ধ্বংসের উপর দাঁড়িয়ে এহেন নির্বোধকেও ন্যাকা মনে হয়। তাই বোধহয় রাগটা আমার জমতে থাকে, আর শুধু রাগই নয়; অন্তর্নিহিত জ্বালাও। মা নিশ্চয়ই কাঁদুনি গেয়ে গেছেন। মিনিমাসি সেটা নানা সুরে ফেঁদেছেন, বিভিন্ন কাহিনীর আড়ালে। মেসোকে বুঝিয়েছেন কী মর্মান্তিক বিপদ; এবং এ-বিপদে একমাত্র তিনিই পরিত্রাতা। সেই আলাপ-আলোচনা নেপথ্যে কান পেতে শুনে নিশ্চয়ই ছোটকির মন ফুলে ফেঁপে হাঁসফাঁস করছে। ওর মুখ এখন গোঁজ। রাগত এবং ভার হয়ে গেছে মিনিমাসির আকস্মিক ধমকে; কেননা ধমকটা ওর কাছে অবান্তর। মনের মধ্যে নিশ্চয়ই ওর গুরগুর করছে প্রতিবাদ, নিরুক্ত চিন্তা ঘুরে ঘুরে বলছে, আহা, নিজেরা যখন দিনরাত আলোচনা কর! আম কথা বললেই দোষ! তাই আমি হঠাৎ বললুম, 'কি-রে, তুই যে গুম মেরে গেলি!'

'আমার গুম মারাই ভাল।'

'রাগ করলি?'

'প্লিজ বাদলদা, ডোণ্ট প্রিটেণ্ড!'

ওর চোখে একটা অসহিষ্ণু তেজ, অপমানবোধের চাপা রাগ। আমারও মনে জ্বালা, একধরনের একগুঁয়ে রোখ, বলি

'তোর জিজ্ঞাস্য কী?'

'বলতে পারবে?'

'শুনি না।'

ও আমার দিকে সোজা তাকাল, এক নিমেষে স্থির রাখল দৃষ্টি, তারপর ওর নীরব মুখে বক্র হাসি খেলে গেল। মিনিমাসিও ঠিক তখনই আবার রান্নাঘর থেকে ফিরে এলেন, হাতে ট্রে।

ছোটকি মায়ের দিকে তাকিয়েই নিম্নস্বরে বলল 'থাক্।'

মিনিমাসি বললেন 'কি বলছিস তুই?'

'বাবার কথা।'

'বাবার?'

'ওই, লো-প্রেসার'''এমনি ভালই আছেন এখন।'

'সত্যি !' মিনিমাসি কমলালেবুর রসের গ্রাসগুলো সবার সামনে রাখতে রাখতে বলেন 'ওঁর এই এক হ্যাপা !'

তখনই মেসোমশাই ঢুকলেন। সগুস্নাত, ক্লিন শেভড্, সাহেব। আমার স্বতঃই উঠি-উঠি ভাব হয়েছিল, উনি বললেন 'বসো বসো।'

উনি নিজেও বসলেন। ন্যাপকিনটা নিলেন হাতে। সামনে প্লেটে বেকন এ্যাণ্ড এগ্ দিয়ে গেল। উনি কমলালেবুর রসে প্রথমে চুমুক দিলেন, ঠোঁট মুছলেন ন্যাপকিনে, বললেন 'তোমার বুঝি বেকন চলে না ?'

আমি কিছু বলার আগেই মিনিমাসি বললেন 'ওদের আমি চিকেন—অমলেট দিলুম।'

মনে হল মেসোর ঠোঁটে মৃদু হাসির আভাস, উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন 'বাবা আছেন কেমন ?'

'ভালো না।'

'হোট্স্ দ্য ট্রাবল ?'

'হাঁপানি...প্রচণ্ড কষ্ট পান।'

'কাডিয়াক্ না ব্রঙ্কিয়াল ?'

আমি টের পাই আমার মুখভঙ্গি অসহজ হয়ে আসছে, চামড়ার তলায় ছড়িয়ে পড়ছে উষ্ণ আভা। মাথার মধ্যে একটা খরবেগ চাপ অনুভব করি। ঈষৎ অসংলগ্ন লাগে নিজেকে, বলি 'খুব টান···দিনরাত কফ ওঠে।'

মেশো তাকিয়ে রইলেন নির্নিমেষ আমার দিকে, দৃষ্টিতে মনে হল শ্লেষ, পরে চোখ নামিয়ে বেকন এ্যাণ্ড এগ মুখে দিতে দিতে বললেন 'ভালভাবে পরীক্ষা করানো উচিত ছিল।' মিনিমাসি হঠাৎ বললেন 'ওদের যা অসুবিধে···।'

'হ্যাট্স নো এক্সকিউস...বেকারি কষ্ট পাচ্ছেন।'

'ভীষণ' মিনিমাসি বললেন 'কথা বলতে পারেন না, ঘুম হয় না···।'

'পুওর থিং !'

'সত্যি, তুমি দেখলে সহ্য করতে পারবে না।'

'প্রিসাইস্‌লি···তাই বলছি ভাল চিকিৎসা করানো উচিত···কত নামজাদা স্পেশালিস্ট আছেন···।'

আমার গলা ধরে এসেছিল, কথা শোনাল কর্কশ, তবু বললুম 'ঠিকই বলছেন...কিন্তু...।'

'বলো···ডোণ্ট হেসিটেট...।'

'ভীষণ খরচ।'

'সে আর কি করবে...মানুষের জীবন অমূল্য।'

'আমাদের সাধ্যে কুলোয় না।'

'নিজের দায়িত্বের কথা ভেবেছ ?'

আমার কানদুটো তখন তপ্ত অঙ্গার, মুখে রক্তচ্ছটা। মিনিমাসী তাড়াতাড়ি বললেন, 'ও বেচারা কি করবে।'

'সিরিয়াস হবে। বয়স হয়েছে, দায়িত্ব আছে...ওর পাগলামি সাজে না।'

উনি লেবুর রস শেষ করলেন, গ্লাসটা ঠিক রাখলেন টেবিল ম্যাটে; রেখে আবার কাঁটায় খাবার গাঁথলেন। আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললুম 'লক্ষ-লক্ষ সংসারের একই হাল।'

'দেশে বেকারও লক্ষ-লক্ষ···তবু তুমি তো চাকরি খুঁজছ...এ্যাম আই রাইট ?'

'তারাও খুঁজছে।'

'নিশ্চয়ই...তাই বলছি নিজের ইণ্টারেস্ট ছাখো...ডোণ্ট গেট এন্‌মেশট ইন দেশ, পিপ্‌ল্ এ্যাণ্ড অল্ দ্য রেস্ট...।'

'তাহলেই চাকরি হবে ?'

'সবার হবে কি-না জানি না···তোমারটা চেষ্টা করতে পারি।'

'করুন,' আমি উঠে পড়েছিলুম, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলি, 'আপনার জেরা হাইকোর্টকেও লজ্জা দেবে।'

ফিরে আর তাকাইনি, পিছনে কি হয়েছিল জানি না। সোজা রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলুম। মনে মনে গর্জে উঠেছিল হুঙ্কার, শালা! বুভুক্ষুকে জীবনের মূল্য বোঝানো, স্পেশালিস্টের মার! এবং পরের দিন থেকেই আমি উধাও হয়ে গেছিলুম গ্রাম থেকে শহর ঘেরার আশায়।

সকালে উঠতে দেরি হয়েছিল। কাল বিকেলে হঠাৎ কালবৈশাখী আকাশ আঁধার করে এলো। ধুলোর দাপটের পিছনে পিছনে নামল বর্ষা। কিন্তু চকিতে থামল না, আমাদের রাস্তার মোড়ে জল দাঁড়িয়ে গেল। তবুও টিপটিপ করে বৃষ্টি চলল সন্ধ্যে পেরিয়ে। আমি কুমারদের বাড়ি থেকে ফিরতে বেশ ভিজে গেছিলুম। কিন্তু সবারই যেন বৃষ্টিটা ভালো লেগে ছিল, দুঃসহ গরম ছাপিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ওঠে। বিরল গাছের পাতা, টিনের চাল, কালোয়ারদের দোকানের সামনে পড়ে থাকা ধুলো লিপ্ত, ভাঙা মোটরের চাকাহীন বডিটা পর্যন্ত ধুয়ে সজীব দেখায়। আর গুঁড়ি গুঁড়ি

বৃষ্টির জালির ভিতর দিয়ে রাস্তার গ্যাসের আলোগুলোকে লাগে সমুদ্রে, কুয়াশায়-আবছা বাতিঘরের মতো।

আমি ছিলুম আনমনা, তাই বোধহয় শহরটা মিলিয়ে গেছিল মন থেকে। ছিল বনের মধ্যে কপাটহীন দুর্গের শূন্য বাতাস। মোমবাতি নিয়ে অাঁধারে আলোর বৃত্ত কেটে-কেটে একাকী সিঁড়ি ভাঙার অতীন্দ্রিয় বোধ।

বৃষ্টির মধ্যেই কুন্তলার বন্ধু এসেছিল। বাড়ির ঠিক সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতেই, কুন্তলা দ্রুত জানলায় গিয়ে দেখেছিল। তারপর দরজা দিয়েছিল খুলে, ছাঁট বাঁচিয়ে নিজে পাশ ঘেঁষে কপাট ধরে অপেক্ষা করছিল। এবং ট্যাক্সির মিটার তোলার টুং-টাং আওয়াজ হওয়ার পরই, দৌড়ে ঘরে ঢুকেছিল ছেলেটি। মুখে-চোখে জলজলে হাসি।

'ভিজেছ?' কুন্তলা বলেছিল।

'না, হট করে ট্যাক্সি পেয়ে গেলুম।'

'আমি ভাবলুম আসতেই পারবে না।'

'পাগল!...গরমে বৃষ্টি তো ভালোই।'

'অনীতারা কি করল?'

'সিনেমায় ঢুকে পড়েছে।'

ওরা হাসল। কুন্তলা ভিতর দিকে এগোতে গিয়ে থমকে বলল 'এসো আলাপ করিয়ে দিই।'

ছেলেটি স্মিত মুখে এগিয়ে এলো। কুন্তলা বলল 'সুদর্শন ঘোষ...ইনি কুমারের মাস্টারমশাই।'

'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

'আপনি সিটিতে পড়তেন না?'

'হ্যাঁ···কি করে জানলেন?' আমি জিগ্যেস করি।

'সুমিতের সঙ্গে দেখেছি আপনাকে...গল্পও শুনেছি।' মনে হল কুন্তলা ওর জামার হাতায় মৃদু টান দিল, কথাটা ফেরাবার জন্যে বলল 'তোমার কি সবাই চেনা!'

'ওঁকে অনেকেই চেনে।'

আমি দৃষ্টি ফেরালুম, কুমারকে বললুম 'কি কদ্দুর হল?'

কুমার বলল 'dash is red...আমি fill in করেছি 'Rose is red' হয়েছে?'

'Good'

'My father has a dash…আমি লিখেছি car.'

'ঠিক।'

কুন্তলা বলল 'চল…কুমারের অসুবিধে হবে।'

সুদর্শন হাসিমুখে আমায় বলল 'আচ্ছা…।'

আমি ঘাড় নাড়লুম। ওরা ভিতরে চলে গেল। চলে যাবার পরও আমি থাকলুম বিস্রস্ত।

কুমার বলল 'Trains stop at stations না in stations, মাস্টারমশাই?'

'at.'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে রইলুম। ও জিভটা ঈষৎ বের করে, মনোযোগসহ ফিল ইন্ দ ব্ল্যাঙ্ক লেখে। আমার মন এক অজানা হীন-মন্যতায় ভরে যায়। আমারও নাম আছে, সম্পূর্ণ পরিচয় বাদল দাশগুপ্ত। অথচ আলাপ করবার সময় আমি শুধু কুমারের মাষ্টারমশাই…ইনি সুদর্শন ঘোষ। উনি ঘোষ-বোস যাই হোন আমার কি; আমার নিজস্ব ব্যক্তিস্বরূপ মিলিয়ে যায় নি। আজও কিছু আমি আত্মপরিচয়হীন অণুপরমাণু নই। হাওয়ায় উড়ন্ত বালুকণা হতে পারে নাম-রহিত, কোনো ব্যক্তিত্ব নয়। ব্যক্তিত্ব ভাসে না শূন্যে উদাস রেণুর মতো। সুদর্শন তো বললই আমায় সবাই চেনে। হোক না সে চেনা ত্রাসের শঙ্কার, আলো-আঁধারী বা আশা-নিরাশার; তবু তো তা লুপ্তি নয় কিংবা মহাশূন্যে বিলীন দ্যুতি। অথবা বস্তুত সে-কথাই ঠিক, আমরা বিদ্যুৎশিখারই তুল্য। ক্ষণিক আগুনে যা অবসিত।

অথচ সন্দেহ নেই যে কুন্তলার কোনো হিসেব ছিল না মনে। যা বলেছে সেটা স্বতস্ফূর্ত ভাষণ, সচেতন ইঙ্গিত অথবা বক্র তাচ্ছিল্য তো দূরের কথা, আমার অহং-এর বোধই সম্ভবত ওর আকাশে অনুপস্থিত। সেখানে খেলছে অবারিত মুক্তি। তবে কি ব্যক্তিত্বেরও মূলে স্বাবলম্বন? ব্যর্থতা ব্যক্তিত্বকে লুপ্ত করে? অন্তত মুছে দেয় লোকচক্ষু থেকে। অর্থাৎ সামাজিক স্বীকৃতিতেই একমাত্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব? হয় তো তাই, কেননা অনুকম্পা বা করুণা ব্যক্তিত্বের প্রশ্নের মুখোমুখি নিষ্ফল, ক্রিয়াহীন; তা শুধু মনে মনে জাগে অসমর্থের সাহায্যে। বেচারিকে দেখো, অসুস্থের সহায় হও, ভিখারিকে বেলাও

করুণা আর মমতা প্রাপ্য শিশু বৃদ্ধের ও অথর্বের। আমি বোধহয় বিকলাঙ্গই।
হঠাৎ কুমার ডাকল 'মাস্টারমশাই ?'

'হুঁ!'

'আপনি কি ভাবছেন ?'

আমার বক্র হাসি আসে, ওর ঘাড়ে হাত রেখে বলি 'কিছু না।'

'আমি বলব ?'

'বলো ?'

'দশ পয়সা বাজি…?'

'A penny for your thoughts ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, খুব মজার !'

'বেশ, বলো।'

'আপনি ভাবছেন বৃষ্টি কখন থামবে।'

'ঠিক্…তোমার জিত !'

'পেনি ?'

'পেনি তো বিলেতে…এই নাও দশ পয়সা।'

'মা কে কিন্তু বলবেন না !'

'না-না।'

'দিদিকেও না।'

'পাগল !'

ছিল বাইশ, দশ দিয়ে রইল বারো পয়সা। আমি উঠে পড়লুম। কুমার বলল 'মাকে ডাকি ?'

'কি দরকার…কাজ করছেন বোধহয়।'

'দিদিকে বলি...।'

'হ্যাঁ...দরজাটা দিয়ে দিক।'

আমি কিন্তু আর দাঁড়াই নি, যেই কুমার চিৎকার দিল 'দিদি', আমি অমনি রাস্তায় নেমে এলুম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি তখনও পড়ছে। দেখা হয়ে গেলেই অনুরোধ করবে বসে যেতে। আমার এখন বসার, কথা বলার বাসনা নেই। এমনকি নেই বাস-ট্রামের ভিড়ে যাওয়ার কিংবা থিয়েটারে-মেলায়-গাজনে। জনবিরল সিক্ত পথ বরং টানে, টানে নৈঃসঙ্গের সুযোগ ও নিজেতে নিমজ্জিত নির্বাক হাঁটা। হেঁটে হেঁটেই আমি ফিরি। প্রথমটা মাথার চুল ধীরে ধীরে ভেজে, মুখে-ঘাড়ে আর খোলা হাতে জলের মিহি, সিক্ত বিন্দুগুলো

ছড়ায়। গোড়ায় লাগে কেবল বাষ্পময়, শীতল ; পরে ক্রমশঃ জলাভাব অনুভব করি। তারপরই, মাথার চুল ভিজে গিয়ে, কপালে গড়িয়ে, কয়েকটা টলটলে জলবিন্দু ভুরুতে এসে পড়ল। চোখে গড়াবার আগেই আমি মুছে নিলুম।

একটা গাড়ি মোড় ঘুরল। সহস্র চুম্‌কি যেন হঠাৎ পথে জ্বলে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ গেল ধাঁধিয়ে ; ফুটপাতে সরে এলুম। গাড়িটা চলে গেল বিকট হর্ণ দিয়ে এবং তখন, এক মুহূর্ত, আমার সামনেটা লাগল নিকষ কালো। এবং কালোর মধ্যে অজস্র জলজলে নীলাভ দ্রুত-বিলীন ফুটকি।

মন আমার উধাও হল। চলে গেল বনের মাথায় সন্ধ্যা ছায়ায় ; কে যেন সেখানে কিংবা অন্য নিভৃতিতে সেজের আলোর রেখা রেখে যায়। আকাশে, কালো মখমলের গায়ে, মুঠো-মুঠো তারা ঝিকমিক করে। আমার গলা কেমন ধরে আসে।

বাড়িতে ঢুকতেই মা, বলেন 'এ-মা, ভিজে গেছিস্!'

'ও কিছু না।'

'চান করবি, না মাথা-টাথা মুছে নিবি ?'

'চানই করি...।'

'তোর লুঙ্গি গেঞ্জি কেচে রেখেছি, নিয়ে যা।' ও-গুলো নিয়ে আমি চৌবাচ্চার দিকে এগোলে মা বলেন,

'তাড়াতাড়ি নিস্, আলুভাজা ভাজছি...গরম ভাত দেব।' শুনে আমার হাসি এল, মনে পড়ল মিনিমাসীর টাকার কথা। এখন আমরা সচ্ছল। মার চাউনি, গলার স্বর, মুখের অভিব্যক্তি নম্র, প্রায় সহজ। মানুষ কত অল্পেই তৃপ্ত ; আবার নয়ও বটে। যার জীবনই দুঃসহ সে নিশ্বাস নিতে পারলেই তৃপ্ত, যার বিছানো বিস্তীর্ণ কুসুম, সে নক্ষত্রে হাত বাড়ায়। অথচ অসংখ্যের আজ নিশ্বাস নেওয়াই দুষ্কর, জীবনের ন্যূনতম পাওনাও তাদের আয়ত্তের আঙিনায় নেই। একেই কি শ্রেণীবৈষম্য ?

ভালো লাগে না ভাবতে, মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালাই শ্রেয়। সারা শরীর জুড়িয়ে যায়। প্রথমটা আরাম লাগে, পরে গায়ে ভিজে বাতাস লাগলে শরীর শির শির করে। ঠিক ঠাণ্ডা নয়, অনেকটা সুড়সুড়ি লাগার মতো। হঠাৎ সর্দি লেগে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি আমি গা মুছি। খেতে বসে বাস্তবিকই গরম ভাত জোটে, সঙ্গে মুশুরির ডাল। আলু তখুনি ভাজা, হঠাৎ লালচে এবং মুচমুচে। ইন্দ্রলোকের অমৃত সম্ভবত ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন, কিন্তু আমার কাছে এ-খাদ্যের জুড়ি নেই। কতকাল যে খাই নি এমন ;

মিনিমাসীরই দেওয়া গাওয়া-ঘি গলিয়ে গরম করে, আলুভাতের সঙ্গে খেয়েছিলুম পরমানন্দে কয়েক মাস আগে।

খেতে খেতে বলি 'বাবা কি খেলেন ?'

'গরম দুধ আর দু-টুকরো পাঁউরুটি দিয়েছি।'

'দই-চিঁড়ে দিলে পারতে।'

'দুর...দই খেলে ওঁর কফ বাড়ে।'

তাই তো, খেয়াল ছিল না। নিজের সুখে, চিন্তায় ভুল হয়ে যায়। আড়ে তাকাই বাবার দিকে। উনি কেমন নিঝুম, অর্ধনিমীলিত চোখে, দেওয়ালে বালিশ ঠেস দিয়ে প্রায় শোয়া। সম্ভবত তন্দ্রাচ্ছন্ন।

মা বলেন 'আজ সারাদিন একটু একটু ঘুমোচ্ছেন...।'

'ওষুধটার কাজ হয়েছে।'

'ওই...হাঁপটা কমে কিছুক্ষণ...বারবার ওটা খেতে চান।'

'সর্বনাশ...ওটা বিষ।'

'আমি ওটা সরিয়ে রাখি।'

কী ব্যর্থ জীবন বাবার। প্রায় পঁচিশ বছর কেরানীগিরি করে গেলেন অথচ শেষরক্ষা হল না। প্রি-ম্যাচিওড রিটায়ারমেন্ট নিতে হল। অথচ ভাল চিকিৎসা হলে, বিশ্রাম পেলে, কি-যন্ত্রে জানি ইদানীং বুকের জমাট-সর্দি বের করে দেয়, তার সাহায্য জুটলে হয় তো আজও উনি অথর্ব হতেন না। শেষ পাঁচ বছর চাকরীও চালাতে পারতেন। মিনিমাসী বারবারই বলেছেন, 'বেলি, ভালো ডাক্তার দ্যাখা।'

মা বলেছেন 'আমার কপাল !'

'কপাল আবার কি...আমি তোকে টাকা পাঠিয়ে দেব।'

পাঠিয়েওছেন শ-তিনেক টাকা; সে টাকা দুদিন ডাক্তার-ওষুধ করতে, সংসারের উনুন জ্বালাতে, যাতায়াতে, কর্পূরের মত উবে গেছে। মিনিমাসী আর টাকা জোগাতে পারেন নি, বলেছেন, 'কি করব বল...বড্ড টানাটানি। উনি বলেন ইনকাম ট্যাক্সেই সব যায়...এদিকে যা বাজার !'

বাস্তবিকই, স্বল্প সাহায্য মিনিমাসী বরাবরই করছেন, এমন-কি দিদির বিয়ের হার আর চুড়ি উনিই গড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ চিকিৎসার জন্যে হঠাৎ হাজার কয়েক টাকা বের করতে হাত কাঁপে, তার থেকে সহজে পাঠিয়েছেন মার দুটো শাড়ি, আমার ধুতি-জামা আর বাবার লুঙি। পঙ্গু লোকের আর কিই বা লাগে, বাইরে যাওয়া তো বহুদিনই বন্ধ।

খাওয়া হয়তো অন্যদিনের থেকে বেশিই হয়েছিল, উপরন্তু গা-জুড়োন ঠাণ্ডা। বাবারও টান অল্প, সেই হাপরের মতো আওয়াজ অনেক মৃদু, মাঝে মাঝে হয়তো বা ঘুমোচ্ছেনও। অন্তত সেই হৃদয় ছিন্নভিন্ন করা কাশির গমক বিরল, তাই গয়ের তোলার প্রাণান্তক প্রয়াসও। সব মিলিয়ে শুধু শান্তি না, একটা আরামের আবেশ নেমে আসে ঘরে। আমি অচিরে ঘুমিয়ে পড়ি, আর ঘুম ভাঙে বেশ বেলায়।

ঘর থেকে বেরুতেই পল্টুর সঙ্গে দেখা; দাওয়া পেরিয়ে চলেছে, হাতে বাজারের থলি। আমি বললুম 'কি-রে, অফিস নেই?'

'ব্যাটা, আজ কি বার?'

'ওঃ, রবিবার বুঝি!'

'শালা...কিছুই খেয়াল থাকে না।'

আমি চৌবাচ্চার দিকে এগিয়ে যাই, হাসতে হাসতে বলি 'বারে আমার কি...বেকার লোক ভাই।'

'ছাত্র ঠ্যাঙানোও তো বন্ধ আজ!'

তা বটে, তবে সেটা এমন সময় যে প্রায়ই সকালে খেয়াল থাকে না। বেলায় বুঝি, পল্টু আর অফিসযাত্রীদের যখন চোখে পড়ে আলস্যের মধ্যে। ওর কথার কিন্তু আমি জবাব দিই না; হেসে ছাই দিয়ে দাঁত ঘষতে থাকি। পল্টুও এগিয়ে যায়, সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে তখুনি আবার ফেরত আসে, আমার দিকে তাকিয়ে বলে 'আজ দুপুরে তুই আমার সঙ্গে খাস।'

'কি খাওয়াবি?'

'মাংস...নিজে রাঁধব।'

আমি থুতুটা ফেলি, এক নিমেষ ইতঃস্তত করে বলি 'আজ থাক-রে।'

'কেন, থাকবে কেন...রবিবার।'

'কি দরকার অসুবিধের··· ।'

'অসুবিধে, আমার ইয়ে।' ও হাতের ইঙ্গিত করল, এবং অশ্রাব্য কিছু একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। অল্প কাছে এসে গলা নামিয়ে বলল 'বুড়িরও খুব দুঃখু হয়েছে।'

'থাম।'

'মাইরি।...কাল যখন বাবা সম্বন্ধে ভ্যান ভ্যান করছিল তখন দিয়েছি দুরমুশ করে...।'

'ছি ছি, কি দরকার ছিল?'

'লে-লে, ভদ্রঘরের গিন্নিরা কি খিস্তি করে...যা নয় তাই মাসিমাকে বলবে! আমার কথায় নিজেই লজ্জা পেয়েছে।'

'তোর মাথাটা খারাপ পল্টু।'

'বালের মাথা রাখ...শোন, মাসিমার খাবারও ঘরে পৌছে দেব...এখন তো দুজনেরই সামনা-সামনি বাধ বাধ... ।'

ও কথায়, মনের অভিব্যক্তি প্রকাশে, আটকে গেল। শূন্যে নির্বাক হাত নেড়ে বাকিটা বোঝায়। আমি বোধহয় তাকিয়ে ভাবছিলুম ওর মনের ইচ্ছে ও উক্তি ক্ষমতার তারতম্য, নিহিত বিরোধ, তাই কোনো জবাব দিই নি। পল্টুই আবার বলব 'কি রে?'

'তুই আবার প্রেস্টিজ মারাবি না তো?'

'এ্যা?'

আমি হেসে ফেলি, বলি 'না-না···মাথা খারাপ···কিন্তু মাসিমাকে তুই কিছু না বললেই পারতিস।'

'লে লে, পায়ে গিয়ে পড়বখন...যত প্যাঁচ!'

ও আর দাঁড়াল না; কোন জটিলতাই ওর ধাতে সয় না। মুখে যা এসেছে বলেছে; মাসিমা জঘন্য ঝগড়া করলেই ও কয়েকদিন গোঁজ হয়ে থাকে। নিজের মায়ের সঙ্গে কথা বলে না আর আমার মাকে এড়ায়। আমার কাছে ক্ষমা চায় এবং হঠাৎ চটে গিয়ে বলে মাকে ঠ্যাঙাবে। উত্তম-মধ্যম না দিলে ওর হিস্‌টিরিয়া সারবে না, বুড়ি তাড়কা রাক্ষসী হয়ে যায়। মারধোর অবশ্য ও কখনো করে নি; তবে ওর গুমোটভাবে অস্থির হয়ে শেষ পর্যন্ত মাসিমাই যখন ছেলের কাছে ভেঙে পড়েছেন নিজের অদৃষ্টের পরিহাস মেনে, তখন কখনো কখনো হঠাৎই পল্টু তীব্র গঞ্জনা দিয়েছে।

ওর মানবিকতার পরিমণ্ডই ব্যক্তিগত। যাকে ভালবাসে বা পছন্দ তার জন্যে অনেক পা বাড়াবে। আমাকেই ও নানান গোপন আশ্রয়ে রেখেছিল তিন মাস। কোনো শঙ্কা বা দ্বিধা ছিল না ওর সে-কাজে। কিন্তু আমাদেরই আর দুজনকে দিনকয়েক আড়াল দিয়েই জানিয়ে দিয়েছিল, আমি ভাই পারব না...ওদের কেটে পড়তে বলিস।

একথাও বলেছিল নির্দ্বিধায়, অকপট আপত্তিতে। এবং যদিও আমি ভীষণ রেগেছিলুম তবু বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নি যে ওর সিদ্ধান্ত অটল। অমন শালা কত লোক লুকিয়ে ছিল, আমার তাতে কি? পরে বলেছিল। তোর কথা আলাদা, জন্মো থেকে বড় হলুম একসঙ্গে আর তোকে শালা

পুলিশ ধরবে! ওর নিশ্চিত যুক্তি, নিজের কাছে যেমন অকাট্য তেমনি অটল। মনে করানো বৃথা যে ওর-আমার সৌহার্দ্য কলেজে, জন্মের নাড়ি ছিন্ন হয়েছিল পৃথক। ও তৎক্ষণাৎ বলত; তাতে কি-রে, তুই আমার বন্ধু, ফ্রেণ্ড; আমি কি শালা দুনিয়া মাথায় নিয়ে আছি...অত ভাবব কেন?

এ-ও এক আশ্চর্য ক্ষমতা। মানবিকতার কোন ব্যাপক আকার নেই এখানে, আছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নৈকট্যের টান শুধু। অথবা বিরোধ। যেমন ওর বাবার সঙ্গে পল্টুর। সেখানেও ওর কোনো হিসেব নেই, নেই বৈষয়িক বুদ্ধি বা পরিকল্পনা। বিরোধ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং সোজাসুজি। ওর এই সিধে চরিত্রই হয়তো আমায় টানে, কখনও বিস্ময়ে কখনও বিমূঢ় করে। যদিচ ও কোনোদিনই বিপ্লবী নয়, কখনও হবে না সম্ভবত, তবু ওর ব্যক্তিস্বরূপ শুদ্ধ, ঘরের একান্তে মানবিক। আসলে সমষ্টি বা ব্যক্তির কোনো জটিলতাই আমরা ধর্তব্যে আনি নি, চলেছিলুম অন্ধ আক্রোশ আর আবেগে। অন্তর্দৃষ্টি, বিবেচনা, কিংবা অধ্যয়ন ও জিজ্ঞাসা রোমহর্ষের স্রোতে ভাসিয়ে।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

কাজের মেয়েরা

বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়

মাছের হিমঘরে

বহুদিন যাবৎই উৎকৃষ্ট ধরনের বাগদা ও গলদা চিংড়ি বাজার থেকে উধাও হয়েছে। মাঝে মধ্যে মাঝারি সাইজের ঝড়তি-পড়তি সামান্য কিছু চিংড়ি বাজারে উঁকি মারলে বিত্তবানেরা কড়কড়ে একশ টাকার নোট বের করে মুহূর্তের মধ্যে মাছের ঝুড়ি খালি করে দেন। বিভিন্ন উৎসব পার্বনে সেই মাছের দাম হয় আকাশছোঁয়া। উৎকৃষ্ট চিংড়ির মাথাগুলো প্রায়ই বাজারে বিক্রি হতে দেখা যায়। সে সব মাথার দামও অনেক। সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ সেই মাথাও কিনতে পারে না। তারা কুচো বা নরম হয়ে যাওয়া চিংড়িমাছ কিনেই পরিতৃপ্ত হয়।

চিংড়ি মাছের এত আকাল কেন এবং এই মাছের এত দামই বা কেন— তার কারণ চিংড়িমাছের পদমর্যাদা বেড়েছে। চিংড়ি বিদেশের বাজারগুলিতে শোভাবর্ধন করছে। অন্যান্য অনেক জিনিসের মত চিংড়ি মাছও বিদেশী মুদ্রা আমদানি করছে। বাছাই করা উৎকৃষ্ট চিংড়ি ভারতের বাইরে আমেরিকা, ইংলণ্ড, জাপান, জার্মাণ ইত্যাদি সর্বত্র চালান যায়। আর নিকৃষ্ট এবং ছোট চিংড়িগুলো দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রেস্তোরাগুলোতে পাঠান হয়।

চিংড়িমাছের আকাল তো নেই-ই বরং গত কয়েক বছরে চিংড়িমাছের চাষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলের নদীগুলির (হুগলী, সপ্তমুখী, মতিয়া, বিদ্যাধরী ইত্যাদি) মোহানা চিংড়িমাছ চাষের পক্ষে

সবচেয়ে উপযোগী। উড়িষ্যার পারাদ্বীপও চিংড়িমাছ চাষ ও সংগ্রহের একটি অন্যতম ঘাঁটি। কাকদ্বীপে মৎস্যচাষের যে-প্রকল্পটি আছে সেখানে আগে উৎপন্ন হত বছরে প্রতি হেক্টরে ৬০০ কিলোগ্রাম। বর্তমানে উৎপাদন বেড়ে হয়েছে হেক্টর প্রতি ২০০০ কিলোগ্রাম। ভেটকি, কুজো ভেটকি, আর শোল, ভোলা ইত্যাদি অন্যান্য অনেক মাছেরই চাষ হয়। কিন্তু সবচেয়ে লাভজনক হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের চিংড়ির চাষ। কারণ একমাত্র চিংড়িমাছই ব্যাপকভাবে বিদেশে চালান হয়। বিদেশীদের কাছে এর কদর অনেক বেশি।

সরকার বা দেশ এই লাভের গুড়ের কতখানি অংশ পায় জানা নেই। তবে ব্যক্তিগত মালিকানায় মাছ রপ্তানির যে-সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাদের লাভের অঙ্ক যে আকাশ-ছোঁয়া সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই কলকাতা শহরেই সাত আটটা মাছের হিমঘরের কথা জানা আছে—সেই প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় বাজারে মাছ চালান দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার মুনাফা লুটছে।

কোনো একটি সম্ভ্রান্ত অঞ্চলের হিমঘরের প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রতিষ্ঠানটির মালিক একজন বেশ অবস্থাপন্ন এবং বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি। সরকারী বড় চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর নিজের বাড়ির একাংশে গড়ে তুলেছেন বিশাল হিমঘর। সেখানে দুটো বড় ইনসুলেটেড হিমঘর আছে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিশাল উঠোন ও বাগানের মাথার ওপরে এ্যাসবেসটাসের ছাউনি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রসেসিং-এর জন্য সারি-সারি ঘর। বাঁধানো চত্বরের ওপরে সরু লম্বা লম্বা টেবিলে সাজানো থাকে বিভিন্ন সাইজের ট্রে। মাছ সংগ্রহ করে আনার জন্য আছে তিন-চারটে লরি ও ট্রাক। সুন্দরবন অঞ্চল ও পারাদ্বীপ থেকে মাছ সংগ্রহ করে এনে মাছের গুণাগুণ ও সাইজ বিচার করে বাছাই করার পর মাছের মাথাগুলো ছেঁটে ফেলে বিভিন্ন ট্রের মধ্যে গুণে গুণে রাখা হয়। প্রত্যেক ট্রেতে লেবেল লাগানোর পর ট্রেগুলো চলে যায় হিমঘরে। সবশেষে চাহিদা অনুযায়ী চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ চালান যায় বিদেশে।

উপরোক্ত কাজ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১০০ জন শ্রমিক আছে। কাজের বিভাগ অনুযায়ী প্রত্যেকটি কাজের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন মজুরি। বিভিন্ন জায়গা থেকে মাছ সংগ্রহ, মাছের গ্রেডিং, হিমঘরে রাখা, প্যাকিং করা এবং সর্বশেষে চালানের ব্যবস্থা করে ছেলে শ্রমিকরা। এসব কাজের

জন্য কুড়ি-পঁচিশজন ছেলে কর্মী আছে। তারা বেশির ভাগই হচ্ছে কেরালা-বাসী। এরা মোটামুটি স্থায়ী এবং এদের মাইনে ২৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত। প্রতিষ্ঠানটি রেজিষ্ট্রিকৃত সুতরাং সরকারী আইন অনুযায়ী এই শ্রমিকরা স্কেলে মাইনে, ছুটিছাটা প্রভৃতি অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি পায়। আর একদল ছেলে শ্রমিক আছে তাদের কাজ হল মাছ সংরক্ষণের ঘর, ট্রেগুলো পরিষ্কার রাখা, জীবাণুমুক্ত করা। এরা দিনমজুরি পায় দৈনিক ৪ থেকে ৫ টাকা। রবিবার এবং মাসে একদিন সবেতন ছুটিও পায়। এরা সংখ্যায় ২৫।৩০ জন। বাকি ৪০।৫০ জন আছে মেয়ে শ্রমিক। এরা সকলেই ফুরণে কাজ করে। এদের বয়েস চৌদ্দ থেকে তিরিশ পর্যন্ত। বেশির ভাগ মেয়েই অবিবাহিতা। কিছু আছে বিবাহিতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা। এরা বেশির ভাগই আসে কলকাতার আশেপাশের অঞ্চল থেকে। মেয়ে-শ্রমিকদের কাজ হচ্ছে গ্রেডিং-এর পর চিংড়ি মাছের মাথা কেটে, মাছগুলোকে পরিষ্কার করে ধুয়ে সাইজ অনুযায়ী বিভিন্ন ট্রেগুলিতে গুনে গুনে সাজিয়ে রাখা। মেয়েদের কাজ দেখাশোনা করার জন্য একজন মেয়ে সুপারভাইজার আছে তার মাসিক মাইনে ২০০ টাকা। সে ছুটিছাটার প্রয়োজন হলে পায়। আর যেসব মেয়েরা ফুরনে কাজ করে তাদের মজুরি দৈনিক ২ টাকা থেকে ২.৫০ টাকা, কাজের সময় সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত। বাঁধানো চত্বরে সারাক্ষণ মাছের জল পড়ে পড়ে হড়হড়ে হয়ে থাকে। যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টেবিলে কাজ করতে হয়। হাতে রবারের গ্লাবস পরা থাকে ঠিকই। কিন্তু পায়ে সকলের হাজা হয়। রাত্রি ৮টার পরে ১০টা পর্যন্ত ওভারটাইম। সে সময়ে মজুরি ছাড়া বাড়তি ৫০ পয়সার টিফিন দেওয়া হয়। ফুরনে যারা কাজ করে তাদের কাজের স্থায়িত্ব নেই। বছরে দু-মাস (মার্চ-এপ্রিল) মাছ সংগ্রহ কমে যায় বলে ফুরনের শ্রমিকদের বসিয়ে দেওয়া হয়। তখন তারা কোনো মজুরি পায় না। ফুরণের মেয়েদের কোনো ছুটিছাটা নেই। প্রয়োজন হলে বিনা মজুরিতে ছুটি পায়। এদের মধ্যে অনেকেই দু থেকে পাঁচ বছর যাবৎ কাজ করছে। বছরে মজুরি বাড়ে ২৫ থেকে ৫০ পয়সা।

প্রতিষ্ঠানটি রেজিষ্ট্রিকৃত হওয়ায় সরকারের শ্রম আইনগুলি এখানেও প্রযোজ্য। কিন্তু শোনা যায় সরকারী আইন ফাঁকি দেবার জন্যে এক নম্বরি ও দু নম্বরি খাতা রাখা হয়। এক নম্বরি খাতায় শ্রমিকদের যে সব সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য থাকে দু নম্বরি খাতায় তার চিহ্নও থাকে না। শ্রমিকদের প্রাপ্য

টাকার একটা বড় অংশ মালিক এভাবে আত্মসাৎ করেন। মেয়ে শ্রমিকরাই বেশির ভাগই নিরক্ষর। সুতরাং তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় কি উপায়ে তারা দিনের পর দিন বঞ্চিত হচ্ছে।

যুক্তফ্রন্টের রাজত্বকালে এই সমস্ত অস্থায়ী কর্মীরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন করলে মালিক পুলিশের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেন। যুক্তফ্রন্ট পতনের পরে মালিক আবার প্রতিষ্ঠানটি চালু করে নতুন নতুন শ্রমিক নিয়োগ করেন। হেরে যাওয়া পুরনো শ্রমিকরা—বিশেষ করে মেয়ে শ্রমিকরা মালিকের হাতে পায়ে ধরে পুনরায় কাজে বহাল হয়। তাদের দারিদ্র্য ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মালিক আরো কম মজুরির বিনিময়ে এদের কাজ করতে বাধ্য করে। এমন কি কাজ করতে করতে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে চিকিৎসার খরচ তো দূরের কথা মজুরিটুকুও পায় না। একটাই বাঁচোয়া যে কাজটা চলে যায় না। সুস্থ হয়ে ফিরে আসলে আবার কাজ পায়। তাতেই শ্রমিকরা কৃতজ্ঞ থাকে।

বিবাহিতা মেয়েদের সন্তান সম্ভবা হবার উপায় নেই। তাহলেই কাজ চলে যাবে। মাছের জলে হড়হড়ে পেছল চত্বরে কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে মালিক বিপদে পড়তে পারেন ভেবেই এই বিধিনিষেধ। একবার একটি দুর্ঘটনা ঘটার পর থেকে এই নিয়ম চালু করেন।

সুনীতির দিদি সুমতি এই প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে কাজ করত। এখানে কাজ করতে করতেই বিয়ে হয়। একটানা পাঁচবছর কাজ করার পর সুমতি অন্তঃসত্ত্বা হয়। সবেতন প্রসূতিছুটি চাইলে পায় না। বাধ্য হয়ে সুমতি ভারি মাস পর্যন্ত কাজ করতে থাকে। মালিকের বক্তব্য—'কাজ করার দরকার নেই—বাড়ি চলে যাক—যখন পারবে কাজ করবে।' সুমতি কি করে বাড়িতে বসে থাকে? পেটের ভাত যোগাবে কে? সুমতির স্বামী সুমতিদের বস্তিবাড়িতেই থাকে। অন্য একটা ছোট্ট কারখানায় দৈনিক ৩ টাকা মজুরি নিয়ে কাজ করে। বুড়ো বাবা, মা আর চারটি ভাইবোন। সুমতিই সকলের বড়। ছোট বোন সুনীতির বয়স তখন এগারো বছর। সমস্ত সংসারটাই সুমতি আর তার তার স্বামীর রোজগারে চলে। সুমতি অতিরিক্ত খেটে মাস গেলে হাতে পায় ৭০।৮০ টাকা। যদি বসে থাকে তাহলে সকলকে এমনকি পেটের 'শত্তুর'কেও উপোস করতে হবে। পেটের বাচ্চার বয়স তখন ৮ মাস। শরীরে পুষ্টি নেই, রক্ত নেই। অতিরিক্ত খাটুনিতে শরীর আরো ভেঙে পড়ে। একদিন মাছের ট্রে হাতে নিয়ে সর্টিং-এর ঘরে যাবার সময়ে

পা হড়কে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারায়। ছ-মাস হাসপাতালে থাকে সুমতি। বাচ্চাটি মারা যায়। সুমতির কোমরের হাড় ভেঙে দু-টুকরো হয়ে যায়। কাজে আর যেতে পারেনি সুমতি। ওখানে তো দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। মালিক সুমতির ক্ষতিপূরণ তো দূরের কথা-চিকিৎসার খরচ বহন করেন না। তবে মালিক একটি উপকার করেছেন। সুমতির ছোটবোন সুনীতিকে কাজ দিয়েছেন। দু বছর হলো সুনীতি কাজ করছে এখানে।

সম্প্রতি কর্মীরা ইউনিয়ন গঠন করে চাকুরির স্থায়িত্ব, মজুরি বৃদ্ধি, ছুটি, বোনাস ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দাবি জানিয়ে দীর্ঘদিন ধর্মঘট করার পরে মালিক শ্রমিকদের আংশিক দাবি মেনে নেন।

কিন্তু ফুরনের কাজ এখনো চলছে। তবে নতুন করে শ্রমিক নিয়োগ করা আপাতত স্থগিত রেখেছেন। দু-নম্বরি খাতা ভবিষ্যতে চালু করার সুযোগ আসার অপেক্ষা করছেন।

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার

শবানী ভট্টাচার্য

আজ থেকে ঠিক দেড় বছর আগে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলাম। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন তৎকালীন রবীন্দ্র অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায়। রবীন্দ্র-ভবন থেকে নিযুক্ত হয়ে এসেছি প্রভাতকুমারের গবেষণা সহায়িকা হিসাবে। আমার জীবনের এক পরম সৌভাগ্য। বেশ ভয়ে ভয়ে এসে প্রণাম করলাম। দেখলাম এক সুউন্নত পক্ককেশ পঁচাশি-অতিক্রান্ত বৃদ্ধকে। কথায় কোনো বার্দ্ধক্যের লক্ষণ নেই। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন বাড়ি কোথায় ছিল? বললাম চট্টগ্রামে। আবার জিজ্ঞেস করলেন চট্টগ্রামের কোন গ্রামে? বলতে পারলাম না। তারপরে বললেন—'বল তো রবীন্দ্রনাথের গল্পসল্প আর ছোটগল্পের তফাৎ কি'? আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই সত্যেনবাবু বললেন 'আপনার এই প্রশ্নের উত্তর ও পরে দেবে।' বেশ কদিন পরে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম একটি ছোট প্রবন্ধ লিখে।

যাই হোক যথানিয়মে কর্মজীবন শুরু হয়ে গেল। তবে আর-পাঁচজনের কর্মজীবন বলতে যা বোঝায় আমাদের কর্মজীবন তার চেয়ে কিছু পৃথক। দশটা-পাঁচটা আমাদেরও করতে হয়। তবে আর-পাঁচজনে যে-ধরনের কাজ করে আমাদের কাজ সে ধরনের নয়। রবীন্দ্রনাথের আশি বছরের (১৮৬১-১৯৪১) বিচিত্র জীবনে প্রায় প্রতিদিনের কর্মের কার্ড প্রণয়ন করেছেন প্রভাতকুমার। একটু বিস্তৃতভাবেই বলি—রবীন্দ্রনাথ কোন্ তারিখে কখন কোথায় ছিলেন, কোন্ তারিখে কি প্রবন্ধ বা কবিতা লিখেছেন ইত্যাদি

বিষয় নিয়েই কার্ডগুলি প্রণীত হয়েছে। এই কালানুক্রমিক কার্ডগুলিকে বিষয়ানুযায়ী করাই আমাদের কাজ। আমরা দুজন এ কাজের জন্য নিযুক্ত আছি। বিষয়ানুযায়ী করার ফলে রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর এ থেকে পাওয়া যাবে। অনেকটা কমপিউটারের মতো।

এই যে বিশ হাজার কার্ড উনি তৈরি করেছেন—তার পিছনে লুকিয়ে রয়েছে প্রভাতকুমারের অক্লান্ত সাধনা। সে ইতিহাস যদি বলতে হয় তাহলে ফিরে যেতে হবে অনেক পুরনো দিনে। আজ থেকে ঠিক আটষট্টি বছর আগে প্রভাতকুমার শান্তিনিকেতনে আসেন পাকাপাকিভাবে। যে ছেলের শিক্ষাজীবনে তেমন কোনো উজ্জ্বল মার্কা নেই, যিনি ১৯০৭ সালের ৮ই আগষ্ট স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন তিনি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করলেন রবীন্দ্রনাথের। আশ্রয় পেলেন তাঁর আশ্রম শান্তিনিকেতনে। এর আগে কবিকে প্রভাতকুমার সর্বপ্রথম দেখেন গিরিডিতে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে। আশ্রমবাসী আর-সকলের মতো এখানে তাঁর থাকা খাওয়া বিনা পয়সায় হতে লাগল। ইচ্ছামতো পড়াশোনার ব্যবস্থাও তিনি করে দিলেন। প্রভাতকুমার যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। এতদিন ধরে মনে হয় এইরকমই একটা সুযোগের অপেক্ষায় তিনি ছিলেন। দিনে চারবার রান্নাঘরে খেতে যান, বাকি সময় কাটিয়ে দেন লাইব্রেরিতে। তাঁর সৌম্য সুন্দর চেহার জন্য সকলের চোখে তিনি পড়তেন। তাতে সহজেই আশ্রমবাসীদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আশ্রমের আনন্দ-উৎসব, প্রাত্যহিক উপাসনা, মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনার মধ্যে দিয়ে দিন কেটে যেতে লাগল।

এইভাবে কাটল ছ-মাস। প্রভাতকুমারের সমস্ত মন তখন জ্ঞান আহরণে ব্যস্ত। অন্য কোনো চিন্তাকে তিনি স্থান দিতে পারছেন না। কিন্তু এভাবে তো সংসার চলে না। ইতিপূর্বে বাবা মারা গেছেন। দাদার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে কিছু করতে হবে এই তিনি ভাবলেন। তাই আশ্রমত্যাগের কথা জানালেন রবীন্দ্রনাথকে। তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনেক আশীর্বাদ জানিয়ে চিঠি দিলেন। কিন্তু প্রভাতকুমারের চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মন থেকে গেল না। যে ছেলেকে তিনি অত পড়াশোনার মধ্যে নিমগ্ন থাকতে দেখেছেন, তাকে সংসারের রূঢ়তার মধ্যে নিষ্পেষিত হতে দিতে চান না। তাই কিছুদিন বাদে ১৩১৭ সালে ৩রা আষাঢ় তাঁকে কাজে নিয়োগ করলেন। কাজ হল ইতিহাস আর ভূগোল পড়ানো। আর লাইব্রেরির কাজ দেখাশোনা করা। বেতন মাসিক পনের টাকা। তাছাড়া বিনা পয়সায় আহার।

লাইব্রেরিতে কাজ পেয়ে পড়াশোনা করার আরও সুযোগ মিলল। মাঝে মাঝে ক্লাস নিতে যান। আবার এসে পড়েন, বই ঝাড়েন, গোছান, দেন। এখানে বসেই প্রথম লিখলেন 'প্রাচীন ইতিহাসের গল্প'—মিশর, ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ইতিহাস। যদুনাথ সরকার বইটির ভূমিকা লিখে দিলেন। বইটি প্রকাশিত হলো ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর।

এইভাবে কিছুকাল কাজ করার পর তিনি ১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে আশ্রমের কাজ ছেড়ে সিটি কলেজ লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকের পদ গ্রহণ করলেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা সফরে ছিলেন। বিদেশ থেকে ফিরে তিনি প্রভাতকুমারকে পুনরায় শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। ১৯১৮ সালের পূজার ছুটির পর তিনি আবার আশ্রমের কাজে যোগ দিলেন। এই সময় কলকাতাতে থাকাকালীন তাঁর সুধাময়ী দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয়। ১৯১৯ সালে তাঁকে বিবাহ করেন ব্রাহ্মমতে। লাইব্রেরির কাজে যোগ দিয়ে শুরু হলো তাঁর আসল কর্মজীবন। শুরু হল পড়া আর পড়া। ইতিহাসের প্রতিই তাঁর নজর বেশি। মমসেন ওঁর প্রিয় লেখক। নিজে মমসেনের বই কিনলেন চারখণ্ডে। ট্যাসিটাসের বই Jarmania পড়লেন, পড়লেন সীজারের গ্যালিয়া। ল্যাটিন সাহিত্যে ভার্জিলের ঈনিড পড়লেন। ওঁর প্রিয় বই Legacy of Rome। বইটি এখনও ওঁর কাছে আছে। বি. এ ক্লাসে পড়াতে হত ইউরোপের ইতিহাস, গ্রীস ও রোমের ইতিহাস। সেজন্য পড়তে হল অজস্র বই। পড়লেন ফ্রান্সের ইতিহাস। সে বইয়ের ঘটনা তিনি আজও বলে যেতে পারেন। ফ্রান্সের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে পড়লেন গ্রীস ও রোমের সাহিত্য। ইলিয়াড তো বটেই তাছাড়া যত গ্রীক ড্রামা আছে সমস্ত পড়লেন। সফোক্লিসের লেখা যে কতবার পড়েছেন তার ঠিক নেই। গিজোর History of France নিজে কিনলেন। Hallam-এর মধ্যযুগের ইতিহাস পড়লেন। ইতিহাস ছাড়া পড়লেন অ্যাস্ট্রনমির বহু বই। রাত্রে ঘুম থেকে উঠে নক্ষত্রলোকের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, তাদের গতিবিধি পর্যালোচনা করতেন এবং ম্যাপ আঁকতেন। একমাত্র গণিত ছাড়া এমন কোনো বিষয় নেই যা উনি পড়েন নি।

এই পড়ার মাঝেই মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল রবীন্দ্র-জীবনী রচনার ইচ্ছে। সেই ইচ্ছে কখন যে প্রবল হল—সে কথা জিজ্ঞাসা করলে

উনি বলেন যে ১৯২৭ সালে ওঁর একবার কবির সঙ্গে ভরতপুরে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ভরতপুরে কবি যান হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার অনুরোধে। প্রভাতকুমার হলেন কবির ব্যক্তি-সচিব। ভরতপুরের অনুষ্ঠান-শেষে কবি এসে উঠলেন অম্বালাল সরাভাই-এর বাড়িতে। অম্বালালরা বিত্তমান, কিন্তু সংস্কৃতিসম্পন্ন। সেখানে কবি পড়লেন টমসন রচিত 'রবীন্দ্র-জীবনী'। কবির সে জীবনী পছন্দ হয় নি। প্রভাতকুমারও সেই জীবনী পড়লেন। তখন থেকেই রবীন্দ্র-জীবনী রচনার ইচ্ছে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মনে করলেন, একজন সাহেব রবীন্দ্র জীবনী রচনা করে ফেলল, আর উনি কবির এত কাছে থেকে, সমস্ত উপাদান হাতের কাছে পেয়েও কিছু করতে পারছেন না! ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কর্তিকা সংগ্রহ করেছিলেন এবং ১৫ খণ্ডে সেগুলি বাঁধাই করে রেখেছিলেন লাইব্রেরিতে। কর্মস্থলে ফিরে এসে পড়তে শুরু করলেন গভীরভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য এবং রবীন্দ্রসাহিত্য-সম্পর্কিত তথ্যাদি। যে বিশ হাজার কার্ডের কথা আমার প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছি, এই সময় থেকেই এই কার্ডগুলি প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রজীবনী রচনার এইগুলিই প্রধান উপকরণ। ১৯২৭ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর অমিয় চক্রবর্তী ও সুধীর-চন্দ্র করের সম্পাদিত 'রবীন্দ্র পরিচয় সভা' স্থাপিত হয়। সভার পক্ষ থেকে এক আবেদনপত্র প্রচার করা হয়। ঐ সভার জন্য কে কি কাজ করবেন সে সম্বন্ধে নিজ নিজ মত লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ নিয়ে সুধীরচন্দ্র হাজির হন। সেই পত্রে আশ্রমের তৎকালীন প্রায় সকলেরই নাম স্বাক্ষরিত দেখলেন। সেখানে উনি লিখেছিলেন, '১৯১০ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবনী সংকলন করবার ভার গ্রহণ করলাম।' দীর্ঘ চারখণ্ডব্যাপী রবীন্দ্র জীবনী রচনা করতে জীবনের বহু সময় ব্যয়িত হয়েছে। রবীন্দ্র জীবনীর (১ম খণ্ড) কবি দেখে গিয়েছিলেন। এই খণ্ডটি দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, এটি রবীন্দ্রনাথের জীবনী নয়, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্রের কাহিনী। তার উত্তরে প্রভাতকুমার খুব সুন্দর-ভাবে দিয়েছেন। বলেছেন, 'প্রতিভার সহিত প্রাকৃতের পার্থক্য যতই গভীর বলিয়া প্রতিভাত হউক গঙ্গোত্রীর সহিত গঙ্গাসাগরের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্যভাবেই যুক্ত। সেইজন্যই আমরা রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষগণের কাহিনী-পর্বটি অবান্তর জ্ঞানে পরিত্যাগে বা পরিশিষ্টে সংযোজন করিতে পারিলাম না, গঙ্গোত্রী হইতেই আমরা যাত্রা শুরু করিলাম।' সেই রবীন্দ্রজীবনী রবীন্দ্রগবেষকদের কাছে একটি আকরগ্রন্থ। জীবনের অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিলাসকে ত্যাগ

করেছিলেন এই সাধনার জন্য। শান্তিনিকেতনের বহু অনুষ্ঠানে উনি যোগ দিতেন না। কাজ থেকে ফিরে সন্ধ্যেবেলা হ্যারিকেনের আলোয় বসে লিখে যেতেন। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় এই দেখে যে, আজও উনি চশমাহীন পড়াশোনার কাজ করেন। যে চশমাটা ব্যবহার করেন সেটি শৌখিন।

শুধু রবীন্দ্রজীবনী রচনা আর ইতিহাসপাঠেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। বহু বিষয়েই ওঁর আগ্রহ। তাই লিখলেন 'ভারতে জাতীয়তা আন্দোলন' (১৩৬৭) 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' (১৯৭২) ভৌগোলিক জ্ঞানের নিদর্শনস্বরূপ দেখতে পাই 'জ্ঞানভারতী' (১৯৪০) পরে প্রকাশিত হয় 'নবজ্ঞান ভারতী' নামে। এছাড়া তো আছেই রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত কয়েকটি ছোটখাটো বই। লাইব্রেরিতে দীর্ঘদিনের কাজের ফলস্বরূপ রচিত হলো বর্গীকরণ (১৯৫৯)। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ। প্রভাতকুমারের জ্ঞানস্পৃহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস এবং সস্নেহ দৃষ্টি ছিল সবসময়েই। রবীন্দ্রনাথ একবার কালিম্পং থেকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ কি? আর জানতে চাইলেন চক্রপদ্ধতি (cyclopaedia) রচনার কাজ কতদূর হয়েছে? বঙ্গপরিচয়কে সংক্ষিপ্ত করে ছোটদের চক্র-পদ্ধতি রচনা শেষ হলে সেটি 'জ্ঞানভারতী' নামে প্রকাশিত হয় আর বঙ্গ-পরিচয়ে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাবে। এইভাবে একাদিক্রমে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে সাঁইত্রিশ বৎসর কাজ করে ১৯৫৪ সালে, ৬২ বৎসর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

এ তো গেল রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর সঙ্গে প্রভাতকুমারের সম্পর্কের কথা। এবারে কিছু বলি ওঁর পারিবারিক জীবন ও আমাদের সঙ্গে সস্নেহ সম্পর্কের কথা। ১৯১৯ সালের ২৭শে মে সীতানাথ তত্ত্বভূষণের কন্যা সুধাময়ী দেবীকে বিবাহ করেন ব্রাহ্মমতে। বিবাহের পর সস্ত্রীক এলেন শান্তিনিকেতনে। থাকতেন সন্তোষালয়ে। স্ত্রী সুধাময়ী দেবী কিছুদিন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজ করেছিলেন, পরে বোলপুর বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার পদ গ্রহণ করেন। আজ থেকে ষাট বছর আগে বেথুন কলেজের ডিস্টিংশন পাওয়া ছাত্রী। অথচ বিয়ে করলেন এমন একজনকে যার স্কুল কলেজের কোনো ডিগ্রিই নেই। সুধাময়ী দেবী অত্যন্ত সুনিপুণা একজন গৃহিণী, প্রভাতকুমারের খ্যাতির মূলে তাঁর ত্যাগ কম নয়। অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবনযাপন করে

ভুবনডাঙার প্রান্তে একটি বাড়ি তৈরি করেছেন। এই বাড়িতেই ১৯৫৪ সালের ২৭শে জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'রবীন্দ্র একাডেমি' বা গবেষণাগার। চারপুত্রকে সুশিক্ষিত করে তুলেছেন। তাঁরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভুবনডাঙায় এখন তিনি একজন সম্পত্তিসম্পন্ন মানুষ। আদিত্যপুর গ্রামে কিছু ধানের জমি কিনেছিলেন। দেখাশোনার অভাবে সে জমি তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন। একসময়ে তালতোড় গ্রামের প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই গ্রামের উন্নতিকল্পে কিছু উন্নয়নমূলক কাজও করিয়েছিলেন। বর্তমানেও শুধু জ্ঞানসাধনাতেই লিপ্ত থাকেন না, সাংসারিক অর্থাৎ ঘরবাড়ি নির্মাণ-সংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম নিজেই দেখাশোনা করেন।

কাজের ব্যাপারে ওঁকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে উনি বেশির ভাগ সময় স্মৃতি থেকে উত্তর দিয়ে দেন। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথ লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। পরে সেই প্রবন্ধগুলিই বিচিত্রায় পুনর্মুদ্রিত হয়। সে কার্ড নিয়ে কাজ করছি তাতে পূর্ব প্রকাশিত পত্রিকার নাম নেই। ওঁকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বলে দেন, এই প্রবন্ধগুলো প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায়। মূল পত্রিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল সত্যিই, সে প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৬ সালের 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায়। সেই দিনই প্রথম অবাক হলাম ওঁর স্মৃতিশক্তি দেখে।

ছিয়াশি বৎসরের বৃদ্ধ বলতে আমাদের মনে যে ছবিটি ভেসে ওঠে, সেটি তেমন সুখপ্রদ নয়। সে তুলনায় দাদু অনেক বেশি সাবলীল, সতেজ। কোথাও কোনোরকম অসঙ্গতি নেই, কি-কাজে, কি-কথায়। বৃদ্ধ বয়সে মানুষের সে ধরনের বিভ্রান্তি ঘটে, দাদুর কাজে বা কথায় কোথাও এতটুকু ভ্রান্তি চোখে পড়ে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি একসঙ্গে বহু কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেন। একই সঙ্গে লেখেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ, আবার উত্তর দেন বিভিন্ন জিজ্ঞাসু-গবেষকদের প্রশ্নের। কাউকেই বিমুখ করেন না। কখনো বা লিপ্ত থাকেন গবেষকদের সঙ্গে বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনায়।

ভোর পাঁচটার সময় ঘুম থেকে ওঠেন। কিছুক্ষণ সামনের খোলা জায়গায় পায়চারি করেন। তারপর খোলা বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসে প্রকৃতিকে দেখেন। প্রকৃতির এই অফুরন্ত প্রাণশক্তির মধ্যে

তিনি ঈশ্বরকে খুঁজে পান। ঠিক ছ'টায় বি-বি-সি শোনেন—যা থেকে জানতে পারেন সারা বিশ্বের খবর। তিনি হলেন তথ্যের কারবারী। ৬-৩০ মিনিটে শোনেন স্থানীয় সংবাদ। সামান্য কিছু জলযোগের পর বসেন তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে। বহুমুখী মনকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করেন। কখনো থাকেন বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ মহাভারত পাঠে নিমগ্ন, কখনো থাকেন রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত নূতন তথ্য-আহরণে ব্যস্ত, কখনো বা পড়েন শিবকালী ভট্টাচার্য্যের 'বনৌষধি'। ঠিক এগারোটায় স্নানাহারের জন্য উঠে পড়েন। বেলা বারোটা থেকে দু-টা পর্যন্ত বিশ্রাম নেওয়ার পর উঠে বসেন সেই খোলা বারান্দায়। সে বারান্দায় কখনো হু-হু করে বয়ে যায় গরম বাতাস, কখনো বা জোলো, কখনো বা কনকনে ঠাণ্ডা।

রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার হিসাবে তিনি সুপরিচিত হলেও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যে কত গভীর তা তাঁর কাছে থেকেই বুঝতে পেরেছি। একবার ঠিক করলেন 'রাজধানী বদল' সম্পর্কিত একটা প্রবন্ধ লিখবেন। আরম্ভ হল লেখা। বহুবার রাজধানী একস্থান থেকে আরেক স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং বড়লাটদের শৈল-নিবাসও বহুস্থানে স্থাপিত হয়েছে। দাদু সে-সমস্ত ইতিহাস অতি অনায়াসেই লিখে ফেললেন। আমাকে একদিন হঠাৎ বললেন, "রবীন্দ্রনাথের 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধটা বার করত, যেখানে পিয়ের লোটি রাজধানীর বিশৃঙ্খলতা সম্বন্ধে বলেছেন।" কথামতো রচনাবলীর ৩য় খণ্ড বার করলাম। দেখলাম সত্যিই তাই। তখন কিন্তু উনি 'রাজধানী বদল' সম্পর্কিত রচনাটি নিয়ে কাজ করছিলেন না। কাজ করছিলেন ধর্ম নিয়ে। ধর্মের মাঝে মনে এল রাজধানীর কথা।

তিনি কিন্তু নিজেকে সাহিত্যিক মনে করেন না, মনে করেন তিনি একজন ঐতিহাসিক। যদিও সাহিত্যিক হিসাবে তাঁকে এ বৎসর 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দেওয়া হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তত্ত্ব অপেক্ষা তথ্যের তিনি বেশি কারবারী। তাঁর লেখক জীবনে প্রবেশের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে একটি ইতিহাসের বই—সেটি লিখেছিলেন মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে। তারপরেও লিখেছেন 'পৃথিবীর ইতিহাস'। তিনি যে রবীন্দ্র জীবনীকার হিসাবে এত সম্মান লাভ করেছেন, তার মূলেও তো কাজ করেছে তাঁর এই ঐতিহাসিক মন। প্রকৃত ঐতিহাসিকের মতো রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিদিনের ঘটনাপঞ্জী সংগ্রহ করেছিলেন বলেই তো সম্ভব হয়েছিল এই চারখণ্ডব্যাপী বিশাল গ্রন্থ রচনা করা।

বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ বলেই পড়েনও অজস্র বই। প্রচুর পত্র-পত্রিকা আমাদের এখানে আসে। দুপুরে ঘুম থেকে উঠে, সেগুলো পড়া প্রায় প্রতিদিনকার কাজ। তবে গল্প উপন্যাস খুবই কম পড়েন। পড়েন তথ্য ও তত্ত্ব-সংক্রান্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ। অনুসন্ধিৎসু মন সবসময় নূতন তথ্য জানবার জন্য আগ্রহী। রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত নূতন কোন তথ্য পেলেই ডেকে বলেন 'এটার একটা কার্ড করে রেখে দাও'। ইলাসট্রেটেড উইকলি পড়তে পড়তে জানতে পারলেন, রবীন্দ্রনাথ সংগীতজ্ঞা কেসরবাঈ কেরকরকে সুরশ্রী উপাধি দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার একটা কার্ড করে রাখতে হল।

বর্তমানে তিনি ধর্মসাহিত্য নিয়ে ব্যস্ত। বহু বৎসর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আহুত যোগীন্দ্রমোহিনী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতাব বিষয় ছিল 'মধ্যযুগের ধর্ম-সাহিত্য'। এখন সেটির দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ আধুনিক যুগের ধর্মসাহিত্য নিয়ে লিখছেন। অজস্র বই লাইব্রেরি থেকে আনাচ্ছেন আর পড়ছেন। কোন বই বিশ্বভারতী লাইব্রেরির কোনখানে আছে এবং কবেকার সীল দেওয়া তাও বলে দিচ্ছেন। যাতে খুঁজতে অসুবিধা না হয়। বিভিন্ন ধরনের বেদ, উপনিষদ, সংহিতায় টেবিল ভর্তি হয়ে গেছে। তবু বলছেন লাইব্রেরিতে নাকি বই নেই। আমি একদিন বললাম—'এত বই এনেছেন তাও বলছেন বই নেই। আরও কত বইয়ের খবর আপনি জানেন?'

অনেকেই হয়তো জানেন না যে, উনি ছোটদের জন্য সন্দেশ পত্রিকায় লিখে থাকেন। ছোটদের লেখা ছোটদের মতো করেই লিখেছেন। 'সন্দেশ' পত্রিকায় 'ইতিহাস কথা কয়' রচনাগুলো যাঁরা পড়েছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন যে কত তথ্য কত সুন্দরভাবে ছোটদের বলেছেন। যা পড়তে ছোটদের মোটেই ক্লান্তিকর মনে হবে না। দাদু যেমন নাতি-নাতনিদের গল্প বলেন—সেইরকম করেই আমাদের দাদু তাঁদের গল্প বলেছেন।

তাঁর নিজস্ব একটা গ্রন্থাগার আছে রবীন্দ্র অকাদেমিতে, সেখানে বই-এর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল নয়। আপনাদের তো আগেই বলেছি, তিনি নিজে কর্মজীবনে গ্রন্থাগারিক ছিলেন এবং গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একটি মূল্যবান বইও লিখেছেন। আমরা জানি, লাইব্রেরি হচ্ছে একটা growing organism। তিনি সেই নীতিতে বিশ্বাসী বলেই আজও এই ছিয়াশি বৎসর বয়সে ক্রমাগতই নূতন বই সংগ্রহ করে চলেছেন। কিছুদিন আগেই কিনলেন

'The Sea' নামে একটি বই, যার মূল্য একশত টাকা। রবীন্দ্রজীবনীর সঙ্গে এটির কোন সম্পর্কই নেই। সমুদ্রের তলায় জীবজন্তু সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ ওঁর কম নয়। এ ছাড়া উপহার হিসাবে প্রচুর বই পেয়ে থাকেন বিভিন্ন সংস্থা থেকে। তিনি তাঁর এই কর্মক্ষেত্রকে বলেন 'কারখানা'। এবং অনেককেই তাঁর এই 'কারখানা' দেখতে আসতে আমন্ত্রণ জানান।

গাড়োয়ালী লোকগীতে জনজীবন

মানসী মুখোপাধ্যায়

আমরা সমতলের লোকেরা পাহাড়ে বেড়াতে যাই। পাহাড়ের অতুল সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হই। পাহাড়ী তীর্থে মুঠো মুঠো টাকা দিয়ে পুজো করি তারপর পাহাড়ী কিছু জিনিস কিনে পরিতৃপ্ত মনে ঘরে ফিরে আসি। কিন্তু পাহাড়-পর্বতের সৌন্দর্যের নিচে পাহাড়ী অন্ধ গহ্বরের মতো পার্বত্যবাসীদের চরম দারিদ্র্য ও জীবনযুদ্ধের কোনো খবরই আমরা রাখি না। পাহাড়ী খেটে-খাওয়া মানুষদের প্রতি মুহূর্ত জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে দিন যাপন করতে হয়। এ বিষয়ে জানতে হলে কিছু পাহাড়ী-ইতিহাস এবং তাদের আর্থিক জীবন সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

ঐতিহাসিকদের মতে কিরাত-কিন্নর-ভিল-খশ এরাই গাড়োয়ালের আদিম অধিবাসী। আর্যরা এসে এদের পরাভূত করে। তখন বিজিতদের পেশা হল বিজেতাদের মনোরঞ্জন। পুরুষরা ঢাক, ঢোলক ইত্যাদি বাজনা বাজিয়ে আর তাদের বৌ-ঝিরা গান গেয়ে নাচ দেখিয়ে প্রভুদের চিত্ত বিনোদন করত। এরা পরবর্তীকালে হরিজন নামে পরিচিত হয়। শোনা যায় এদের মাধ্যমে গাড়োয়ালী লোকগীতের উৎপত্তি এবং এ-জাতীয় গানের প্রাচীনত্ব অথর্ব বেদের সমসাময়িক। আশ্চর্যের কথা, গাড়োয়ালি লোকগীতের বেশি ভাগ রচনা করেছেন নিরক্ষর গাড়োয়ালি রমণীরা—যাঁদের মতো দুঃখিনী ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে আছে কিনা সন্দেহ। অ্যাটকিন্‌স্ সাহেব তাঁর গ্রন্থ—"ডিস্ট্রিক্ট গেজিটিয়ার অফ উত্তর প্রদেশ"—এ গাড়োয়াল সম্বন্ধে লিখেছেন

যে, ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা ঘটে থাকে এবং দেখা গেছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রমণীরাই আত্মহত্যা করে থাকে।

পরবর্তীকালে পার্বত্য অঞ্চলে সমতলের নানা জায়গার মানুষ এসেছে এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-হরিজনদের নিয়ে গাড়োয়ালি সমাজ গড়ে উঠেছে। সংখ্যায় হরিজনরাই গরিষ্ঠ। ভারত স্বাধীন হবার পর এঁরা নিজেদের 'শিল্পকার' বলে পরিচয় দেন। কামার, কুমোর, তাঁতী, চাষী ইত্যাদিরা শিল্পকারের মধ্যে পড়ে। শিল্পকার চাষীরা ভূমিহীন। এঁরা অন্যদের জমিতে চাষ করে জীবনধারণ করেন। ইংরেজ আমলেও এঁদের অবস্থা ছিল আমেরিকার ক্রীতদাসদের মতো, প্রভু ইচ্ছে করলেই যার কাছে খুশি এদের বিক্রি করে দিতে পারত। বংশানুক্রমে এরা মালিকের জমিতে কাজ করত।

স্বদেশের ধনিক গোষ্ঠী ব্যতীত বহিরাগতদের হাতে গাড়োয়ালের সাধারণ মানুষরা কম অত্যাচারিত হয় নি। মোগল যুগের কথা ধরা যাক। পার্বত্য অঞ্চলও বারবার শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং পরিবেশ অনুযায়ী লোকগীত রচিত হয়েছে। ম্যাকসিম গোর্কি মন্তব্য করেছেন—'জনতাই সৃষ্টির প্রথম দার্শনিক এবং আদি কবি।" মোগল আক্রমণের সময় জন-কবিরা মুখে মুখে যে লোকগীত রচনা করেছিলেন তা যেমন করুণ তেমনি ঐতিহাসিক।

দুণ আর পাবঠে থেকে মোগল এসেছে!
মোগল এসেছে? অনেক না অল্প এসেছে?
মোগল অনেক এসেছে, অগুন্তি এসেছে।

মোগল এসেছে হৈ হৈ পড়ে গেছে।
তাদের পদভরে গজভরে মাটি উড়ে যাচ্ছে।
গণনা হয় না এত মোগল এসেছে।
ছ লাখ মোগল, ন লাখ পাঠান এসেছে।

মোগল মোটা মোটা ছাগল চাইছে
আর ঘড়া ঘড়া ঘি চাইছে।
মোগল-রাজ রোজ এসে ধমক দিচ্ছে।
মাংস, ভাঙা ডাল আর সাদা চাল চাইছে।

মোগলদের দেখে আমার বুক কেঁপে ওঠে,
এমন কেউ খস নেই যে মোগল তাড়াতে পারে ?

ঠিক এই অবস্থা ওদের ঘটেছে গুর্খা এবং ইংরেজ আমলে, যার ওপর লেখা বহু লোকগীত পাওয়া যায়।

গাড়োয়ালি লোকগীতে তাদের আর্থিক জীবনের কথা বারবার এসেছে। গাড়োয়ালবাসীর আর্থিক জীবন ভয়াবহ। তার কারণ সমতলের মতো ওখানে বিস্তীর্ণ শস্যভূমি নেই। যা আছে জনসংখ্যার তুলনায় তা সামান্য। সেই সামান্য জমি আবার দু-ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ নদীর সমতলে, অন্য ভাগ পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির ধাপের মতো ওপরে উঠে গেছে। শেষোক্ত জমি সম্পূর্ণ বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে। অনাবৃষ্টি ঘটলে তখন দেবতাকে প্রসন্ন করার জন্য পুজো, পশুবলি এবং নরবলিও দেওয়া হতো। ষাট-সত্তর বছর আগেও গাড়োয়ালে নরবলি চালু ছিল। 'বেডওয়ার্তা' বলতে নরবলি বোঝায়।

যত নিয়ম ও অত্যাচার অসহায় নিচুতলার লোকেদের ওপর দিয়েই চলেছে, বেডওয়ার্তার বেলাতেও তাই। এর বলি হত হরিজন, এই নিয়ম। হরিজন বাদক বা বেডা থেকে বেডওয়ার্তা শব্দের উৎপত্তি। বেডওয়ার্তা হওয়া অতি পুণ্যের কাজ এবং সেই লোভে হরিজন পরিবারের বৃদ্ধ লোকেরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসত।

জ্যোতিষী একটি শুভদিন স্থির করে দিত। ঐ দিন গ্রামের প্রধান বয়স্ক ব্যক্তি বেডার ডেরায় গিয়ে তাকে স্নান করিয়ে, নতুন জামাকাপড় পরিয়ে, পরমান্ন খাইয়ে গানবাজনাসহ তাকে কাঁধে করে বলির স্থানে নিয়ে আসত।

ইতিমধ্যে বেডার জন্য তৈরি বিশেষ ঘাসের দড়ির এক দিক একটি পাহাড়ের পাদদেশে এবং অন্য দিকটি ঐ পাহাড়ের শিখরে বাঁধা হয়ে যেত। সারা গ্রামের লোক এ পুণ্য দৃশ্য দেখবার জন্য ভেঙে পড়ত। পুরুষরা বাজনা বাজাতে বাজাতে এবং মেয়েরা গান করতে করতে বলির স্থানে উপস্থিত হলে বেডাকে পাহাড়ের শিখরে তোলা হত। তারপর সাইকেলের সিটের মতো একটি কাঠের ওপর তাকে বসিয়ে ঘাসের দড়ির ওপর ছেড়ে দেওয়া হতো। কাঠের নিচে চাকা থাকত। বেডা যখন গড় গড় করে দড়ি বেয়ে নিচের দিকে নামতে থাকত তখন সমবেত কণ্ঠে গান হত। এ দৃশ্য দেখতে সাধারণের কী পরিমাণ উৎসাহ ছিল তা নিম্নোক্ত লোকগীত মারফৎ জানা যাবে :

বেডার (যাকে বলি দেওয়া হবে) রশি তৈরি হয়েছে।
বেডার (বেডার সম্মানে) তোরণ বসান হয়েছে ॥
আমি বাবা মেলায় (বলির স্থানে) যাব তামাশা দেখতে।
ভাণ্ডারী কাণ্ডারী (জাতিরা) সব চলে গেছে ॥
বাগুড়ী বুটোলা (জাতিরা) সব চলে গেছে।
বোমরিয়ার (পরগনা) রানা (জাতি) চলে গেছে ॥
দে বাবা রিঙ্গালের (গাছের ছাল বিশেষ) শাড়ি জামা।
দে বাবা সুন্দর সুন্দর গয়না ॥
তুই বাবা পালকিবাহক ডাক।
আমি মেলায় তামাসা দেখতে যাই ॥

অবশ্য বেডা জীবিত থাকলে (তার সম্ভাবনা প্রায় ছিলই না) তাকে প্রচুর ধনরত্ন দেওয়া হত এবং সে গ্রামের সকলের পূজ্য হয়ে থাকত। মারা গেলে তার প্রাপ্য আত্মীয়স্বজনদের দেওয়া হত।*

গাড়োয়ালে পশু হল তাঁদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন, এজন্য গাড়োয়ালে পশুকে 'পশুধন' বলা হয়ে থাকে। এক এক পরিবারে শ'য়ে শ'য়ে, কারো বা হাজার পশুও থাকে। বাড়িতে বসিয়ে গরু-মোষ-ছাগল-ভেড়া এত জানোয়ার খাওয়াবে সে অবস্থা তাদের কোথায়। তাই পশুর দল নিয়ে পশুপালক পাহাড় থেকে পাহাড়ে তৃণভূমির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এবং আট-দশ হাজার ফিট ওপরে ঝুপড়ি বেঁধে পশুদের নিয়ে মাসের পর মাস কাটায়। সে ভয়াবহ কষ্টের জীবন; দিনে প্রচণ্ড গরম, রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা; কোনো রকম খেয়ে ও শতছিন্ন জামাকাপড়ে জীবন যাপন করে। পশুপালকের জীবন নিয়ে অনেক লোকগীত আছে।

দিনে গুনলুম সূর্য রাতে গুনলুম গগনের তারা,
দিন ভর রইলুম লাঠি হাতে রাতে ঠাণ্ডা গুফা।
হে ভেড়ার পালক তুই রাখাল হোস না।
আর ভেড়ার সাথে কাজও করিস না।
মুঠিভর তো খাবার মিলবে
আর তেষ্টার জন্য স্রোতের ধারা।

মহামারীর সঙ্গে যেমন মৃত্যু তেমনি দারিদ্র্যের সঙ্গে মহাজন যেন ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে থাকে। এ অভিজ্ঞতা গাড়োয়ালিরা মর্মে মর্মে

* প্রথম রাজা সুদর্শন শাহের আমলে তাঁর আগ্রহে এ প্রথা বন্ধ হয়।

জেনে রেখেছে। দারিদ্র্য আর মহাজনের অত্যাচারকে ঘিরে কত যে লোক-গীত আছে তার ঠিক নেই।

ইংরেজ অধিকারের পর গাড়োয়ালিরা চাকরির ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন। কেউ শহরে চলে এসেছেন, কেউ মিলিটারিতে যোগ দিয়েছেন। সকলে চাকরি নেওয়ার পেছনে ঐ এক কারণ—অভাব, মহাজন। চাকরি নিয়ে স্বামী দেশ ছেড়ে যাবার আগে বধূকে আদর করে বলেছেন :—

প্রিয়ে আমি মুসৌরি যাচ্ছি, তুই লক্ষ্মী হয়ে থাকবি।
মহাজনের কাছে ঋণ হয়েছে তাই বিদেশে যাচ্ছি।
নাকের নথ দিচ্ছি প্রিয়, তুই বিদেশ যাস না।
নাকের নথ দিয়ে মহাজনের সুদ-ই পুরো হবে না।

নাকের নথ গাড়োয়ালি রমণীদের এয়োতির চিহ্ন। নথ রুপো দিয়ে তৈরি হয় এবং বেশির ভাগ সংসারে স্ত্রীর ঐ একটিই রুপোর আভরণ। অভাবের সংসারে মহাজনের রুদ্রমূর্তিকে শান্ত করতে তাও তারা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। যদি তা রমণীদের কাছে অমূল্য কিন্তু মহাজনের মূল্য মেটাতে সক্ষম হয় না। তার সুদের পরিমাণই মেটানো যায় না, এমনিই তাদের দারিদ্র্যের বিকট মূর্তি।

কোথাও বা স্বামী বিদেশে গিয়ে চাকরি পান নি বা টাকা পাঠাচ্ছেন না উপার্জন এতই কম। অথবা কাঁচা টাকা হাতে আসার পর তাঁর চরিত্রের পতন ঘটেছে। এদিকে সংসারের অবস্থা মর্মান্তিক। সুযোগ বুঝে মহাজন উপস্থিত হয়ে স্ত্রীকে নানা ভাবে উদব্যস্ত করেছে। এ জাতীয় একটি গান—

যবে থেকে সিটি বাজিয়ে রেল চলেছে।
তবে থেকে নির্দয় স্বামীর চিঠি আসে না!
ও জলের জাহাজ কবে না জানি কোথা গেছে
নির্দয় স্বামী এখন ঘরে আসে না!......
বাবা আমাকে দানে যা বাসন দিয়েছে
মহাজন রাত্তিরে এসে সব উঠিয়ে নিয়ে গেছে!
যেমন আমার স্বামী বিদেশে গিয়েছে
অমনি মহাজন এসে ছাদের ওপর বসে পড়েছে।
এক রাত্তিরের জন্ত হলেও স্বামী ঘরে এসো
নিজের মহাজনকে বুঝিয়ে তো যাও।

মহাজনকে আমি নাকের নথ দেব,
তবু আমার নাথকে ঘরে ডাকব।

আর-একটি বধূর দারিদ্র্য লাঞ্ছিত জীবনের, বলা যায়। করুণতম ছবি লোকগীতের মাধ্যমে আমরা দেখছি। দেশে অকাল দেখা দিয়েছে; স্বামী বিদেশে; মহাজন বধূকে একা পেয়ে অভাবের ঘরের সামান্য সম্বল বাসন-পত্তর যা পাচ্ছে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বধূ চরম অবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত। সকলের পেটে ভাত নেই, দারিদ্র্য যেন ছিন্নমস্তার মত ভয়ঙ্কর রূপে প্রকাশমান। সেই সব দুঃখের কথা জানিয়ে বধূ তার স্বামীকে চিঠি লিখে দিতে বলছে—

—আমাকে চিঠি লিখে দাও যে, ও কবে বাড়ি আসছে?
এখানে দুর্ভিক্ষে ছেলেপুলে না খেতে পেয়ে মরছে।
সপ্তমশ্রেণীতে পড়াশোনা করছিল একটি ছেলে,
হে আর্য ও কাল রাত্তিরে মারা গেছে!
স্বামী তুমি আমার এ খারাপ অবস্থা দেখনি,
আমি অভাগিনী সারা বছর কেঁদেই চলেছি।
আমার শাড়ি ছিঁড়ে গেছে, অঙ্গে ব্লাউজ নেই।
দারিদ্র্য দেখে লোকের অপমান করার শেষ নেই।
দশ বাড়ি আর তিন (মূল্য) দিয়ে মোষ কিনেছিলুম
সেও আজ দুপুরে পড়ে মরেছে।
বাচ্চাদের মুখ চেয়ে নথ বেচে দিয়েছিলুম।
মহাজন যখন তখন এসে হাজিরা দিচ্ছে।...

মোগল-গুর্খার মতো ইংরেজ রাজত্বের একদিন অবসান হল। নিদারুণ দুঃখ-দারিদ্রে নিমজ্জিত মানুষের চোখে এবার নতুন স্বপ্ন! অত্যাচারিত ব্রিটিশরাজ সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। আর বিজেতা এবং তার সামন্তরাজ মিলে অভাব ও কষ্টের আরো অতলে ঠেলে দিতে বা পায়ের তলায় চেপে রাখতে পারবে না। এবার কংগ্রেসিরাজ, নিজেদের সরকার। আর ভাবনা কি, তাদের ঘন অন্ধকার জীবনে এবার নতুন দীপ্ত সূর্যের কিরণছটায় উদ্ভাসিত হবে। ঐ দেখ গাড়োয়ালে দীর্ঘদিনের অত্যাচারি সামন্তযুগ শেষ হয়ে গেল :—

—(মাশু পসারা, হারমোনিয়ম বাজা!)
টিহরি রাজ্যে এখন কংগ্রেস পতাকা উড়ছে!

(থালি কা তলা, হারমোনিয়ম বাজা !)
টিংরিরাজ আমাদের ওপর কত অন্যায় করেছে !
(মুর্গী কা মুর্গা, হারমোনিয়ম বাজা !)
এখন কাউন্সিল ভবনে কংগ্রেসি পতাকা উড়ছে !
(লপবাতী তলবার, হারমোনিয়ম বাজা !)
এখন কাউন্সিল ভবনে আর আসবে না রাজ !
(বট তো কে কাজ, হারমোনিয়ম বাজা !)
এখন কাউন্সিলে পঞ্চায়েতি রাজ !
(বাদল ফটে, হারমোনিয়ম বাজা !
অত্যাচারীর থেকে কেমন মুক্তি পেয়েছি
(আম পকে, হারমোনিয়ম বাজা !)
চাই মরে যাই আর গোলামি না করছি !
(অখরোট কা দুধ হারমোনিয়ম বাজা।)
ভারতের লোক এখন স্বাধীন হয়েছে !
(চক্কিতে চুহা মরা, হারমোনিয়ম বাজা !)
গোলামি-মুক্ত হয়ে থাকলে কত-ও সুখী হয়েছে।*

দেখা যাচ্ছে প্রায়ান্ধকার কুঁড়েঘর থেকে বিশাল রাজনীতিক্ষেত্র কোথাও জনকবি পেছনে পড়ে নেই বা তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে নি; তাঁদের অনুভূতি এবং উপলব্ধি সর্বত্র এবং সমান ভাবেই অতীব আগ্রহশীল। এবার জনকবিদের চোখে স্বাধীন ভারতের নতুন রূপ এবং নতুন উৎসাহের ছবি দেখা যাক। জনতা এবার স্বাধীন ভারতকে নতুন করে গড়ে তুলতে উৎসাহিত—

গাঁয়ে গাঁয়ে পঞ্চায়েত বসাও জল শুদ্ধ কর ভাই !
তোমাদের রাণী-বৌরাণীরা সুখে আরামে থাকবে ভাই !
মোকদ্দমায় যেও না আপসে মিলেমিশে থাক ভাই !
নয় তো কাছারিতে থাক, নুনতেলের পয়সা থাকবে না ভাই !
ভাই সব মদ খেও না জুয়া খেল না ভাই !
নয় তো গলি-গলিতে পড়ে মা-বাপকে ডাকবে ভাই !

* অর্থহীন শব্দ, গানের ছন্দ বজায় রাখতে গাড়োয়ালি গীতিকাররা ব্যবহার করে থাকেন।

পঞ্চায়েতকে গিয়ে বল যেন উৎকোচ না নেয় ভাই!
নিজের সন্তানের প্রতি নজর রেখে সৎ কাজ কর ভাই!
এখন নিজের ক্ষেত নিজেরই রাজত্ব ভাই!
গাছপালা লাগাও বাগানটাগান কর ভাই!
জায়গায় জায়গায় মোটর-পথ কর শ্রমদান কর ভাই!
সব ভাল ভাবে থাক আমরা স্বাধীন হয়েছি ভাই!

প্রথম ধাপ, শ্রমদান আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। জনতা কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তাঁদের সঙ্কল্প—অসাধ্যসাধন করতে হবে নতুন ভারত গড়ে তুলতে। সত্যিই তাদের মহা উৎসাহে পাহাড় ভেঙে ঝাঁঝায় মোটর চলার রাস্তা তৈরি হয়ে গেল! লোকগীতিকার জনতার উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং কর্মসাধনাকে ঘিরে গান রচনা করে ফেললেন, স্বাধীন ভারতে নতুন ধরনের লোকগীত :—

—লোস্তর পঞ্চায়েৎ এই কথা ভাবল,
এবার শ্রমদানের কাজ শুরু করব!
কিন্তু হাতের হাতুড়ি হাতেই রয়ে গেল,
পাহাড়কে দেখে সবার প্রাণ উড়ে গেল।
ওরা পাহাড়ের গায়ে বিছের মত আটকে রইল,
তরুণদের মুখ সব মাটিতে ভরে গেল।
তখন দেখ জনতা এমন সাহস করল,
পাহাড়কে আমরা কাঁসার মত চিরে ফেলব!
তখন হাতুড়ি উঠতে দেরি হল না!
শাবলের আঘাতে পাহাড় কাঁপতেও দেরি হল না!
আর ঝাঁঝায় পাহাড়ী রাস্তা তৈরি হয়ে গেল!
লোকেরা নিজের শ্রমের ফল লাভ করল।
শাবল আর হাতুড়ি তোপের কাজ করেছে!
বীরদের হাত নিজেদের নাম রক্ষা করেছে!

পাহাড়ে রাস্তা তৈরি হবার পর মোটর চলতে শুরু করেছে। মোটর চলতে দেখে জনসাধারণের কী আনন্দ! জন-কবির চিত্তেও সে আনন্দের স্পর্শ লাগল, রচিত হল অপূর্ব ছন্দবদ্ধ একটি লোকগীত।

মাটি পড়ে কম কম, পাথর পড়ে দম দম!
পাহাড়ের ওপর মোটর চলে থরা রা পম পম!

যে পাহাড়ে যেতে বাঁদরেরও থাকত না দম,
ওখানে মোটর দৌড়ে চলে থরা রা পম পম !
খালি পেটে আমরা শাবল বাজাতে রইলুম
মোটর টিহরী পৌছল থরা রা পম পম !
কেউ আট আনি, চৌ আনি, কেউ বা পয়সা।
পাহাড়ের ওপর মোটর চলে যেন কুমার ভৈসা (মোষ) !
মাসের ও বছরের পথ এখন হয়েছে সুগম
দিনেব দিন মোটর আসে থরা রা পম পম !

আর পায়ে ব্যথা হবে না, পিঠের বোঝা হবে কম,
মোটর বসিয়ে আনবে থরা রা পম পম !

এত স্বপ্ন দেখা কিন্তু সফল হল না, এত আনন্দ প্রকাশ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। অভাবের দেশে চির অভাব রয়েই গেল। খাদ্যের অভাব ও মূল্যবৃদ্ধির দরুণ গাড়োয়ালি গ্রাম্যজীবনে দুঃখকষ্টের যেন অন্ত নেই তার একটি ছবি।

শোন শোন সবে ভারতের গান গাই !
কী দশা হয়েছে কী দিন এসেছে ভাই !
টাকায় আধ সের গম চালের দানা হাওয়া
পাঁচ শো টাকায় মোষ বিক্রি দুধের বেলায় কলা।
মোষের দামে গাই বিকোয় গাইয়ের দামে ছাগল।
খাবার আনতে কড়ি নেই কী হয়েছে দুর্মূল্য !
গাঁয়ে গাঁয়ে কন্‌ট্রোল বসেছে চিনি কোথা পাবে।
অন্য জিনিস ছেড়ে দাও চা তো খেতেই হবে।
ঘরে অতিথি আসে কিছু টাকা খরচ হয়েই যায়।
ওরে তুই যা ধান চালের খোঁজ করলি কোথায় ?

স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে এর চেয়েও নিদারুণ অভাব ও মর্মান্তিক দারিদ্রের চিহ্ন গাড়োয়ালের জনগীতকার তাঁর গানের পসরায় সাজিয়ে আমাদের উপঢৌকন দিয়েছেন। সে গানটি হল :—

—মালু গাছ সবুজ হয়ে আছে
নেবুর দানা টেনে নে !
নাকের নথ নেই।
খাবারের থালা নেই।

পরবার কাপড় নেই।
যৌবন একা একা বহে যাচ্ছে
এও তো এক ঝগড়াই (সমস্যা) বটে!

---

১. এই রচনাটি লিখতে শ্রীগোবিন্দ চাতকের 'গড়বালী লোকগীত এবং সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন' বইটির সাহায্য নিয়েছি।

২. 'বেড়া'-র ওপর লেখা লোকগীতটি দিয়ে ক্যাপটেন সুরবীর সিং পাঁবার আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

৩. দু-চারটি ব্যতীত সব গাড়োয়ালি লোকগীতের শেষে মিল আছে। সেগুলির হিন্দী অনুবাদে কিন্তু মিল রক্ষা করার চেষ্টা হয় নি—দু-চারটি বাদে। আমি বাংলায় অনুবাদকালে গানগুলিতে শব্দের একটু হেরফের এবং কোথাও পুনরুক্তি করে মিল বজায় রাখার চেষ্টা করেছি।

৪. 'থরা রা পম পম' গাড়োয়ালী ভাষা।

অরক্ষিত মানুষ

শৈবাল চট্টোপাধ্যায়

[ছোট একটি ঘর। ম্লান আলোয় দেখা যাবে বাঁ দিকের উইংসের কাছাকাছি একটি বন্ধ লোহার দরজা। তিনদিকেই দেয়াল। দর্শকদের মুখোমুখি মঞ্চের ডান-দিকে একটি জানলা। মেঝেতে গোটানো বিছানা। পাশেই এনামেলের থালা ও মগ। একটি যুবক ঘরে পায়চারি করছে। এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়াল পর্যন্ত। অনেকটা মার্চ করবার ভঙ্গী। প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গে আপনমনে গুনছে। যুবকটি বলিষ্ঠ। মাথা ভর্তি চুল। পরিমিত দাড়ি-গোঁফ।]

জগাই—একান্ন, বাহান্ন, তিপ্পান্ন, চুয়ান্ন, পঞ্চান্ন (ঘুরে দাঁড়ায়)

ছাপ্পান্ন, সাতান্ন, আটান্ন, উনষাট, ষাট (ঘুরে দাঁড়ায়)

একষট্টি, বাষট্টি, তিষট্টি, চৌষট্টি, পঁয়ষট্টি (ঘুরে দাঁড়ায়)

ছিষট্টি, সাতষট্টি, আটষট্টি, উনসত্তর, সত্তর (ঘুরে দাঁড়ায়)

একাত্তর, বাহাত্তর, তিয়াত্তর, চুয়াত্তর, পঁচাত্তর (ঘুরে দাঁড়ায়)

ছিয়াত্তর, সাতাত্তর, আটাত্তর, আশি। (একটু আগেই থমকে দাঁড়ায়)

নাহ! আবার সেই একই ভুল। আটাত্তরের পর আশি। কেন বার বার এমনি হচ্ছে?

আমি জানি এটা আটাত্তর সাল। এরপরে আসবে উনাশি। তারপর আশি। আমার মুক্তির সাল। স্পর্ধা? আমার মুক্তি দেবে এরা? হ্যাঃ! এক কামরা থেকে চলে যাব আর-এক কামরায়। (মলিন হাসি) নাঃ! আজ

আর হাঁটবো না। (জানলার কাছে এগিয়ে যায়। এক দৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

পড়ন্ত দিনের বেলা। চারদিক এত কালো কেন? আকাশে কি মেঘ করেছে? এই অন্ধকারের মাঝখানে স্থির-বিদ্যুতের মতো কি ওগুলো? (ভাল করে দর্শকদের দেখতে থাকে) মানুষের চোখ! সারিসারি চোখ। ওঁরা আমাকে দেখছেন। (উত্তেজিত) আমাকে দেখছেন? ন-না আমাকে দেখবেন না। আমি তো একটা—(কথাটা অসমাপ্ত রেখে, প্রশ্ন) আচ্ছা, আপনারা বলুন, অস্তিত্ব থাকলেই কি মানুষ হওয়া যায়? প্রাণ থাকলেই জীবন? হাত থাকলেই শক্তি? মাথা থাকলেই বুদ্ধি? অসম্ভব! কোন্ প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন? আমি কি আপনাদের আদৌ কিছু দিতে পেরেছি? তবু কেন আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে? আপনাদের সামনে এসে দাঁড়ালেই অনেক জিজ্ঞাসা, কৈফিয়েৎ, প্রশ্ন এসে ভীড় জমায়। মিনতি জানাই, দয়া করে চোখ সরিয়ে নিন।

নিজেকে মঞ্চে হাজির করার চেয়ে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখব। বৃষ্টি-ঝরা দিন-শেষের আকাশ। শুনব ভাদ্দরের শেষে শরতের গান। ঘরে ফেরা পাখীদের কলরব। আমার এই একঘেয়ে জীবনে ওরাই বয়ে আনে আনন্দময় কাকলি।

মস্ত শিরিষ গাছটা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে। ওর নিচে বাসস্ট্যাণ্ডে রিক্ত বাসগুলো ফিরে আসছে। ক্লান্ত ড্রাইভার, কণ্ডাকটারের দল ধীর পায়ে এগিয়ে যায় চায়ের দোকানগুলোতে। একটা বাস ছাড়বার সময় হয়ে গেছে। কণ্ডাকটার চীৎকার করছে, শ্যামবাজার! শ্যামবাজার! আর একটা খালি বাস থেকে রোগা কালো মতো একটি ছেলে হাঁক দেয়, জগদ্দল-নৈহাটি-জগদ্দল! ওরা মানুষ ডাকছে। একটি-দুটি করে যাত্রীরা উঠে বসে। অধীর ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে ঘন-ঘন। আপনারা বরং এক-কাজ করুন। ঐ বাসগুলোতে গিয়ে বসুন। উধাও হয়ে যান আর সকলের সঙ্গে। আমি ঐ পাঞ্জাবী দোকানটাতে ভীড় দেখব। ওরা গভীর তৃপ্তি নিয়ে রুটি-সবজি-মাংস খাচ্ছে, দেখব। গল্প করছে, দেখব। বাস ছেড়ে দেবে, দেখব। বাতি নিভিয়ে ট্রিপ শেষ করে ক্লান্ত বাসগুলো দাঁড়িয়ে থাকবে চুপচাপ, দেখব। (ক্লান্ত পায়ে সঙ্গে আসবে। পায়চারি করবে।)

(ছটফট করবে) এত-বড় একটা বাড়ি অথচ কি তুহিন নিস্তব্ধতা! খাড়া পাঁচিলের ওপাশে প্রাণ আছে। সাড়া নেই। নিঃসঙ্গ! নিঃসঙ্গ! আর

নিঃসঙ্গ! একা-একা খাও, ঘুমোও, পায়চারি কর, কথা বল। নিজের সঙ্গে কত কথা আর বলব? ইচ্ছেমতো কিছু লিখব, তারও উপায় নেই। ওরা অনুমতি দেবে না। যৌবনকে এমনি করেই নিঃশেষিত করে দিতে হবে এখানে? ব্যতিক্রম কি হতে পারে না? আর তাই চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু গ্যালিলিওর আমল থেকে বিচারকের দল বসে আছে অনড়—তারা হেসে উঠল আমার চারপাশে। ওদের হাসিতে ধুলোর ঝড়। অন্ধকার ঘিরে ধরল। চারদিকে তৈরি হল মজবুত পাঁচিল। নিঃসঙ্গতায় বাঁধা পড়ে রইলাম আমি। বলতে চেয়েছিলাম, ওরা উঁচু পাকা সড়ক-সেতু বানায় বন্যায় ঘর-বাড়ি ভেসে গেলে হাজার-হাজার মানুষ আশ্রয় পাবে বলে। রেলপথ বানায়, বন্দুক চালায় যে-মানুষ তাদের র‍্যাশন আর গুলি জোগাবে বলে। কোটি-কোটি টাকা খরচা করে বাঁধ তৈরি করে নদীকে খেপিয়ে তুলে মানুষকে ঘর-ছাড়া করে জোতদারদের জিইয়ে রাখবে বলে। ওরা খুশীমতো দেশে আলোকে ডেকে এনে আঁধারে ভাসিয়ে দেয়। মন্দিরে আলো উপচে পড়ে, হাসপাতালে অন্ধকারে রোগী যন্ত্রনায় কাতরায়। আমাকে সবাই পাগল বলল। ধুলোর ঝড় দেখা দিল। আমি চুপ করে গেলাম। চুপ! জগাই ধর চুপ! একদম চুপ!

স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করে চলে যায় গুণ্ডার দল। হাকিমের এজলাসে হিংস্র দানবগুলোর মুখোমুখি ক্রন্দসী ভারত-রমণী, চুপ! হরিজনদের রক্তে হোলি খেলে বর্ণান্ধতার শিকার নির্বোধ উন্মত্ত মানুষ। পল্লীর-পর-পল্লী কবলিত হয় আগুনের লেলিহান শিখায়। চুপ! মুণ্ডু শিকারীর দল পথে পথে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঘুরছে। চুপ! ক্ষেতের ফসল আগলে রাখতে চায় হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তের দল। চুপ! কলে-কারখানার লড়ুয়ে মানুষ নিক্ষিপ্ত হয় অন্ধ বিবরে। চুপ! পাশার দান নিয়ে দুই প্রতিযোগী পর্দার আড়ালে কানাকানি—ফিসফাস। চুপ! সবাই চুপ করে বসে থাকুন। গ্যালিলিওর বিচারকের দল আদালত চালাচ্ছে। প্রতিদিন রায় বের হচ্ছে। টেলিপ্রিন্টারে ছাপা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে। আপনার আমার মধ্যে গড়ে উঠছে নিঃসঙ্গতার সুদীর্ঘ প্রাচীর। ভয়ে সিঁটিয়ে থেকে আমরা সবাই চুপ। (স্থির হয়ে থাকে কিছুক্ষণ)

রাস্তার আলো জ্বলল। সন্ধ্যা আসছে। আমার গাঁয়ে ঘন অন্ধকার নেমে আসছে। সারাদিনের সব কাজ শেষ করে গোস্বামী এতক্ষণে বাড়ি ফিরে এসেছে। ওর দেহে ক্লান্তি, গায়ে ঘামের গন্ধ। গামছা পিঠে জড়িয়ে

ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে। সাঁকো পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে পুকুর ঘাটের দিকে। একা। ওর আগেই আমি পৌঁছে যাই। ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকি। একা। চারদিক সুনসান। ভ্যাপসা গরম। গাছপালার একটা পাতাও নড়ছে না। তারার আলোয় ঘাটটাকে দেখতে থাকি। কালো জলে আলোর বিন্দু-বিন্দু ছায়া। আমি একা। শান-বাঁধানো ঘাটের দুপাশে ছোট-বড় দুটি মন্দির। ঠিক মন্দির নয়। মন্দিরের মতো করে বানানো। আসলে ওগুলো এক-একটি সমাধি। আমারই পূর্বপুরুষদের। ভিতরটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। চওড়া শান-বাঁধানো বেদির নিচে রয়েছে মৃত মানুষের অস্থি-স্মৃতি-ছাই। ছোটবেলায় অনেক লুকোচুরি খেলেছি ঐ সমাধিগুলোতে। আমি, জনার্দন, ভজু, হারু, সুধা আর গোপালী।

শুকনো পাতায়-পাতায় শব্দ। গোপালী আসছে। আমারই মতো পৃথিবী পর্যটন সেরে ফিরে আসছে। ঘাটের পাশে গন্ধরাজ গাছে অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে। তারই মৌ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। অন্ধকারে দুজনেই দুজনকে অনুমান করতে পারি।

শান্ত নিরালা পুকুরে জলের তোলপাড়। গোপালীকে ভাল দেখা যায় না। দূরে তাকিয়ে থাকি। শুনতে পাই বহুদূর থেকে একটানা শোঁশোঁ শব্দ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে হয়ত ওটা একটা বুক-ভাঙা মাটি-চাপা গুমরে গুমরে ওঠা কান্নার আওয়াজ। ভেসে আসছে সমাধিগুলোর নিচ থেকে। অথবা বড় পুকুরটার চারপাশে বাহান্নটা সুপুরিগাছের গায়ে-গায়ে ধাক্কা লেগে ফিরে-আসা উত্তীর্ণ সাতাশ বছরের স্বপ্নের ব্যর্থতার নিঃশ্বাস। নির্বাক আমি। মুখ নেড়ে কিছু বলতে চেষ্টা করি। কথা আসে না। উদগত একটা অজানা অভিমান পৃথিবীরই মতো চারদিকে ছড়িয়ে যায়। পথরোধ করে সব অনুভূতির।

সুপুরি গাছ দুলছে। বাতাসে কিসের মাতন। হয়ত রাতের কালো মেঘ জমেছে। আমাদের বাড়ি ফিরবার আগেই একটা প্রচণ্ড ঝড় আছড়ে পড়বে। সিঁড়িতে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ। গোপালী ভেজা শরীরে নরম পায়ে উঠে আসছে। গোপালী, পুকুর ঘাট, পুরানো সমাধি, সুপুরি গাছের আন্দোলন, ঝড়ো হাওয়া —সমস্ত মন জুড়ে উথালপাথাল শুরু করে দেয়।

(নির্বাক পায়চারি। নেপথ্য থেকে একটা বেতার ঘোষণ—আজকের সভায় রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আমরা কতটা সম্পদ ধনীদের হাতে তুলে দিইছি সেটা বড় কথা নয়। দরিদ্র মানুষদের হাতে কতটা সম্পদ তুলে দিতে পেরেছি

সেটাই বড়। রেডিওর কাঁটা সরে যায়। সানাই বাজনা শোনা যেতে থাকে খুব হালকাভাবে। জগাই ছুটে জানলার কাছে যায়) শুনেছেন আপনারা? ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ! বেতার ঘোষণাটি শুনলেন? দরিদ্রের হাতে সম্পদ! (হাসি) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! দরিদ্র মানুষের হাতে দেশের সম্পদ! তাহলে একটা রূপকথার গল্প বলি, শুনুন। আধুনিক রাজপুত্তুর, মন্ত্রীপুত্তুর বা কোটালপুত্তুরদের কথা নয়। বরং বলতে পারেন ইয়ে (মাথা চুলকে) পেঁচো-টেঁচোদের কাহিনী।

একদিন সকালে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি। আগা সাহেব এসে হাজির। কি করে বাড়ির সন্ধান পেল, কে জানে?

(আগার কণ্ঠ) সালাম জগ্‌গুবাবু, সালাম। হামারা সুদ?

(স্বাভাবিক কণ্ঠে) কি করে এলে আগা সাহেব?

(আগার কণ্ঠ) ও বাত ছোড়িয়ে। তিন মাহিনা হো গিয়া। আভি তক এক পয়সা সুদ নেহি দিয়া। কিঁউ?

(স্বাভাবিক) কোথা থেকে দেব আগা সাহেব? মাইনে আর ওভারটাইম মিলিয়ে যে-কটা টাকা পাই সবই তো শেষ হয়ে যায়। কারখানায় ধার চলছে তিনটে। সে-সবও কেটে রাখে।

(আগা) ফালতু বাত ছোড় দিজিয়ে।

(স্বাভাবিক) ফালতু বাত নয়। দেখতে পাচ্ছ না প্রতি দিন কোন না কোন জিনিষের দাম বেড়ে যাচ্ছে। এত টাকা কোথায় পাব?

(আগা) তিন রোজ পহিলে তুমহারা তনখা মিলা। হম্‌ রোজ কারখানাকা গেট মে ঠাহরতা। লেকিন তুম হমরা কোই গেট সে ছিপাকে ভাগ যাতা। এ কাঁহে বাবু?

(স্বাভাবিক) ভেগে আর কোথায় যাব আগা সাহেব? বউ, ছেলে, চাকরি ফেলে কোথায়ও কি যাবার উপায় আছে? কসুর হো গিয়া। তিন রোজ বাদ তুমহারা পুরা সুদ দিয়ে দেব।

(আগা) নেহি বাবু। হম্‌ ইধার বৈইঠ রহেগা। পহিলে হমারা সুদ দিজিয়ে।—এক কাপ চা পিলাও। ই-অ-অ!

ছোট-খাটো একটা ডিপ্লোমা পাশ করে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় ঢুকেছি আজ পাঁচ বছর। পাঁচ বছর ধরে একটানা খেটে চলেছি। কি সুন্দর সম্পদ—ভারতের সম্পদ উঠে এসেছে আমার হাতে। ভেবে দেখুন, ও মশাইরা! অমন চুপ-চাপ থাকবেন না। ভাবুন—একটু ভাবুন।

সেই থেকে ঐ মানুষটা, আমারই একটা অপচ্ছায়া হয়ে; বাড়ির দরজায় ঠায় বসে রইল। পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে চলে এলাম যদি কোথায়ও কিছু জোটাতে পারি।

এমনি অসংখ্য পাওনাদার দিনরাত ছায়ার মতো আমাকে অনুসরণ করছে। বহু পাওনা ওদের। ট্যাক্স, কর, ভাড়া, চাঁদা, ডোনেশন, সাহায্য। তাছাড়াও আছে। হাওলাত-বাকী-বন্ধক। ওরা সবাই মিলে অনেকগুলো শুঁড় দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। এই তো আমি। বহুর মধ্যে আমি। আর আমার চারপাশে—এই সমাজ। দিনের-পর-দিন ওরা সংখ্যায় বেড়ে চলেছে।

ওরা আমার বিবেকের এক-একটি দংশন। নির্যাতন। ছিন্ন-ছিন্ন তাৎক্ষণিক মৃত্যুর বেদি। আমার জীবনের চারপাশে এমনি বহু বেদি রচনা করে তারই ফাঁকে-ফাঁকে আমি লুকিয়ে বেড়াই। ওরা বিশ্বাস করবে না জানি। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি এসব চাইনি। সত্যি চাইনি।

রাতের ছায়ায়-ছায়ায় চোরের মতো বাঁশবাগানের মধ্য দিয়ে গোপালীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। শুনলাম আগা ওর ভারি দেহটা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে ঘুমুচ্ছে। মাঝে গোপালীকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল ওর মতো জবরদস্ত লেড়কা তার চাই কিনা। তা হলে সে বাড়ির ভিতরে চলে যেতে পারে। উফ্ ফ্! গোপালী ঠোঁট কামড়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে। আমি অসহায় বিমূঢ়ের মতো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। (নীরবতা)

আপনাদের মধ্যে যাদের কলকাতা ময়দানে ফুটবলের সঙ্গে নাড়ির টান রয়েছে, তাঁরা ঠিকই অনুমান করেছেন—আমিই সেই স্টপার জগাই ধর। 'বি' ডিভিশনে খেলতাম। টিম 'এ' ডিভিশনে উঠে গেছে, কিন্তু আমি পারি নি। খেলা ছেড়ে দিইছি। এখনও মাঝে মাঝে স্বপ্নের মতো সেই সব দিনগুলো ফিরে-ফিরে আসে। আসানসোল-মালদা-মুর্শিদাবাদ এমনি কত জায়গায়ই না গিইছি। উফ! হারানো সেইদিনের কথা—। (নীরবতা। পায়চারি)

(নেপথ্যে খেলার বাঁশি বেজে ওঠে। সারা মঞ্চ জুড়ে খেলা শুরু করে দেয়।) এই নিমাই ল্যাং মারতে চেষ্টা করবি না। মেরে ফেলে দেব, মাইরি। কে-র‍্যা? বিশু? তুই পারবি বল নিতে? এই স্থাখ তোকে হুক্কা-হুয়া দিচ্ছি। (এগিয়ে যায় অনেকটা) এই গোপাল! পাস দে মাইরী।

পাস দে। হেড করে বলটা গোলে ঢুকিয়ে দে. ধুম্‌স্‌! মিস্‌ করলি তো! এবারে ছাখ। (জোরে শট মারে) যাহ্‌! বলটা গোলে ঢুকল না। বারে ধাক্কা খেয়ে উপরে উঠে গেল। (থমকে দাঁড়ায়) একি! বলটা নামছে না তো! কি ব্যাপার? উপরে উঠছে তো উঠছেই। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে) দিনের শেষে সোনালী মেঘের ফাঁক দিয়ে বলটা ক্রমেই ধীরে-ধীরে উপরে উঠে যাচ্ছে।

(ঘোষকের কণ্ঠে) অনিবার্য কারণে খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাইশ জন খেলোয়াড় অবাক হয়ে মাঠের মধ্যে যে-যার প্লেসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সবাই তাকিয়ে আছে উপরের দিকে। দর্শক আসনে হাজার-হাজার মানুষও তাই। সবাই বিস্মিত। স্তম্ভিত। মাধ্যাকর্ষণকে পরাস্ত করে বলটা একটানা শূন্যে ছুটে চলেছে।

(স্বাভাবিকভাবে) আচ্ছা ঐ বলটার তো কোন ডানা নেই। ওটা কি করে উপরে উঠছে? বলটা কি আর কোনোদিন নেমে আসবে না? আমরা বাইশজন খেলোয়াড় বল-শূন্য মাঠে শুধু ছুটোছুটি করতে থাকব? (উপরে তাকিয়ে) বাঃ! কি সুন্দর দেখাচ্ছে বলটা! আস্তে-আস্তে ওটা ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে চলেছে একটার পর একটা মেঘের মোহনা পেরিয়ে।

(হঠাৎ মনে পড়ে যায়) ওহো! সেই কাহিনী। অনেকদূরে সরে এসেছি। ঠিক হ্যায়! তারপর গোপালীকে অনেক সান্ত্বনা দিলাম। তিন দিন পরে ওভারটাইমের টাকা পাব। তখন ওকে হটাব ওর সুদ মিটিয়ে। গোপালী শান্ত হয়ে কুলায় ফিরে গেল। অদ্ভুত আনন্দ পেলাম। গর্বও বলা যায়। মনে হল আমি যেন এক মস্ত সাধু। ভক্তকে শান্তির বাণী শুনিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। কিংবা মন্ত্রী নয়ত কারখানার মালিক।

(কাতর মিনতি) বাবা! আর যে পারি না। সংসারে এত দুঃখ! এত কষ্ট! অভাব অনটনে জর্জরিত হয়ে শেষ হয়ে গেলাম। আমাকে রক্ষা করুন বাবা। দৈব ক্ষমতা প্রয়োগ করুন। স্বর্গীয় মহিমা দেখান। আর যে পারি না।

হে বৎসগণ! অমৃতের সন্তানগণ! আমার পুত্রগণ! মন শান্ত কর। চঞ্চলতা নিয়ে কোনো মহৎ কাজ করা যায় না। এ-সবই অদৃষ্টের বিধান। যা দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছ সবই পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফল। গ্রহের ফের। নয়টি গ্রহের তুষ্টি বিধানের জন্য নয়টি রত্ন ধারণ কর। দেখো বাবা, ডানহাতের এই বুড়ো

আঙুলটা শুধু বাকী রেখো। এই দিয়ে সবাইকে কাঁচকলা দেখাবে। একমনে নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করে যাও। তাঁর উপর বিশ্বাস রেখো। এ-জীবনে শান্তি যদি নাইবা মেলে, ভয় পেও না মৃত্যুর পরে অবশ্যি শান্তি পাবে। আমি তো রইলাম। জয় গুরু! জয় গুরু!

টু দি অনারেবল্ মিনিষ্টার, স্যর! আপনাদেরই সংখ্যাতত্ত্ববিদগণ বলছেন, দেশের সত্তর ভাগ মানুষই নাকি দারিদ্র্য-সীমার নিচে ধুঁকছে। দয়া করে ট্রেনভাড়া, বাস-ভাড়াগুলো কমিয়ে দিন। জিনিসপত্তর, মানে গরীব মানুষদের নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু প্রয়োজন—এই যেমন ধরুন চাল-ডাল-তেল-মশলা, কাপড় জামা, কয়লা-কেরোসিনের দাম টামগুলো কমিয়ে দিন স্যর। জল, জমি এসব থেকে ট্যাক্সের বোঝাটা একটু হালকা করে দিন। আর যে পারছি না।

কি সর্বনাশ! আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না, রকেটের গতিতে দেশ এগিয়ে চলেছে? এ-সবই তো জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষণ। সাধারণ মানুষের স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং বাড়ছে। টের পাচ্ছেন না? বিদেশী-মুদ্রা আয় করতে হবে। মালটি-ন্যাশনালদের কাজে সাহায্য করতে হবে। তবেই তো বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্য রমরমা বাজার পাবে। দেশের উন্নতি হবে। দিনরাত মুখ বুজে কাজ করে যান। অত কথা বলেন কেন? খুব শীগগীরই দেখবেন আমাদের দেশে একজনও গরীব থাকবে না। সব শেষ হয়ে যাবে।

টু দি ম্যানেজিং ডাইরেকটর, স্যর। কারখানায় গত তিন বছর যাবৎ মোটা টাকা, মানে ভাল টাকা, মুনাফা হচ্ছে। অথচ গত পাঁচ বছর যাবৎ এক পয়সাও মাইনে বাড়েনি। এদিকে জিনিস পাওয়া তো আগুন। দয়া করে আমাদের মাইনে বাড়িয়ে দিন। আমরা আর পারছি নে স্যর।

কি বলছেন আপনারা? কারখানার মুনাফা হচ্ছে। কাজেই মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে! স্ট্রেঞ্জ দেখুন আমাদের অডিট রিপোর্ট কি বলছে। এসব তো লুকোচুরির ব্যাপার নয়। খোলাখুলি ব্যাপার। কারখানা লোকসানে চলছে। আপনারা যেমন চাল-ডাল-তেল-নুন বেশী দামে কিনছেন, আমরাও তো তেমনি র-মেটেরিয়ালস দ্বিগুণ চারগুণ দামে কিনতে বাধ্য হচ্ছি। এই যে দেখছেন এ্যাসিডটা, আপনারা তো কাজ করেন এ-নিয়ে। এটার দাম ছিল এক লিটার তিরিশ টাকা। আর এখন হয়েছে একশ চল্লিশ টাকা। তাহলে বুঝুন অবস্থা। এই স্টাফ চালাতেই আমি হিম-সিম খাচ্ছি। এর উপর আবার মাইনে বাড়াতে বলছেন? মন লাগিয়ে কাজ করে যান। প্রোডাকসন

বাড়ান। যদি আগামী দু-বছরে অডিট রিপোর্টে দেখা যায় কারখানার মুনাফা হচ্ছে, তাহলে নিশ্চয়ই মাইনে বাড়িয়ে দেব। আই সিমপ্যাথাইজ ইউ।

হায় অডিট রিপোর্ট। কারখানার মুনাফা সোনার হরিণের মতই নেচে বেড়ায়। পাতালে কড়ির পাহাড় হাড়ের পাহাড় জমা হতে থাকে।

হঠাৎ গোলমাল হয়ে গেল। যেমন হয়ে থাকে সবসময়ে। গোপালী পরদিনই মাধবকে নিয়ে কারখানার গেটে এসে হাজির। মাধব জ্বরে বেহুঁশ হয়ে আছে। আপন মনে হাসছে। কথা বলছে। মাঝে-মাঝে চমকে উঠে লাল চোখ দুটো মেলে আকাশে কি দেখছে! (অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট) না—মাধব, না। আমি কিছুতেই তা হতে দেব না। (জোরে ছুটতে থাকে। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলবে)

আগা সাহেব, আগা সাহেব। আমাকে বাঁচাও। না-না আমার ছেলে মাধবকে বাঁচাও। আমাকে দশটা টাকা দাও, আগা সাহেব। (নেপথ্য থেকে আগা সাহেবের ভয়াবহ নিষ্ঠুর হাসি) আমি কোন আপত্তি শুনব না। যেমন করে পারি তোমার টাকা শোধ করে দেব।

(বিদ্রূপ) আমি যে বোকা ভদ্রলোক। লেখাপড়া শিখেছি, এখনও চুরি করতে শিখিনি। ডাকাতও হতে পারিনি। মোটা টাকা ভিজিট দিয়ে হাসপাতালে সিট জোগাড় করব তারও উপায় নেই। অথচ—অথচ আমার মাধবকে বাঁচাতে চাই। তাকে নিয়ে এক্ষুণি ডাক্তারের কাছে যেতে চাই। আগা সাহেব, তোমার কাছে ছাড়া আর কোথায় যাব?

(পরিহাস) এই হল ইনজিনিয়ারিং কারখানার হাফ-ইনজিনিয়ার, ভারতীয় শ্রমিক জগাই ধরের জীবনের কটি ছেঁড়া পাতা এবারে বলুন, এ-যুবককে খাঁচায় পুরে রেখে আপনারা তার কাছ থেকে কি আশা করতে পারেন? সব ভেঙে চুরমার করে বেরিয়ে আসব? আমাকে বাঁচাবেন? এগিয়ে যাবেন, আমার সঙ্গে? এই যে আমার নির্বাক মা-ভাই-বোনেরা, পূজনীয় দাদারা! কিছু বলুন। জবাব দিন। (দুঃখিত) জানি আপনারা কোনো জবাবই দেবেন না। ভাবছেন, যেমন চলছে চলুক না। অযথা ঝামেলায় গিয়ে কি লাভ?

এ-মানসিকতা হঠাৎ আসেনি। একদিনে আসেনি এবং এমনিতেও আসেনি। এর পিছনে দু-একটি কারণ রয়েছে। যা আপনারা জানেন। জানি আমিও। বলব? তখন আবার সবাই মিলে তেড়ে মারতে আসবেন না? কথা দিচ্ছেন?

(চুপ করে যায়। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরায়) এক টাকা ঘুষ দিয়ে কাল দুটো সিগারেট আনিয়েছি। এই হল একটি কারণ। এক-সময় চীনের মত অত বড় দেশের মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল আফিম। আজ আমাদের দেশকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে, আফিমের চেয়েও কড়া নেশা—এই ঘুষ। কত ভাবেই না এই অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে আমরা বেঁচে রয়েছি তৃপ্তিতে। রাস্তার মোড়ে লরি থামানো থেকে শুরু করে লাইসেন্স-পারমিট—ন্যায়-বিচার পর্যন্ত কোথায় না ক্যানসারের জীবাণু ছড়িয়েছে? সমস্ত ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে।

সেদিন রাত্তিরে কলকাতার কার্তিক বোস লেনে গিইছি এক বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুর মা মারা গেছেন। অনেকে একসাথে শ্মশানে এলাম। মৃত-দেহের লাইন এগুচ্ছে। হঠাৎ ক-টি যুবক এল। দাদা দশটা টাকা দেবেন? আগে লাইন পেয়ে যাবেন। বন্ধুটি নীতিবাগীশ। তিনি আপত্তি জানালেন। ওরা বলল, নইলে রাত একটা পর্যন্ত বসে থাকুন। ঘড়িতে তখন মোটে সাড়ে নটা। বাধ্য হয়ে বন্ধুটি রাজী হলেন। মা আধঘণ্টার মধ্যে রিলিজ পেয়ে গেলেন. অনেকেই ব্যাপারটা দেখলেন। মুখ খুললেন না ভয়ে। লজ্জা? ধুস্‌স কাল তো এদের মুখ দেখাতে হবে না। অতএব, সুতরাং ডট্‌ ডট্‌ ডট্‌।

আমার পাশের জমিতে থাকেন এক ঠাকুমা বুড়ি। লাউ-মুলো-কুমড়ো এই সব বিক্রি করে কোনোমতে খেয়ে বেঁচে আছেন। একদিন এসে কেঁদে পড়লেন। বি.ডি.ও অফিস থেকে বলে দিয়েছে নগদ দশ টাকা দিতে হবে। নইলে জমির মালিকানা থাকবে না। গর্জে উঠলাম, খবরদার দেবেন না। সমিতি-অলাদের গিয়ে বলুন। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মাসখানেক বাদে ঠাকুমা বুড়ির সঙ্গে দেখা। ফোকলা মুখে হেসে বললেন, বাবা জগা, তোমার বুদ্ধিতে বিনা ঘুষেই সব হয়েছে। তবে ঐ ছোকরাদের পার্টি ফণ্ডে দশ টাকা চাঁদা দিইছি। দুই কিস্তিতে নিয়েছে।

প্রতিবাদ করলাম। ওরা পাইপগানের কটা গুলি পকেট থেকে বের করে দেখাল। হেসে বলল, আজকাল নাকি এসব মুদি দোকানেই পাওয়া যায়। ভয়ে গোপালীর কাছে চলে এলাম। মাধবকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, এই সমাজ তোমার জন্য রেখে যাচ্ছি মাধব? বিশ্বাস রেখ বদলাবে। বদলাতে হবে।

(ক্লান্তি। নীরব পায়চারি। ঘুরে-ঘুরে জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়

রাত্রি আসছে। প্রেমিকা রাত্রি। নিজের কাছে মানুষের যা-কিছু চাওয়ার বা পাওয়ার, সব বোঝাপড়ার এই তো সময় সুন্দর।

শিরিষ গাছটা নিকষ কালো হয়ে আসছে। অন্ধকার ওর ত্বকের মধ্যে প্রবেশ করছে। ওর ডালে-ডালে বহু আশ্রয়। ও গর্বিত। নিজের অস্তিত্বে আস্থাশীল। কিন্তু আমি? (উদাস দৃষ্টি)

নাহ্! এভাবে রিক্ততা, নিঃস্বতার যন্ত্রনার মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ হতে দেয়া চলবে না। প্রস্তুত করতে হবে। নিজেকে প্রস্তুত! এক্ষুণি ম্যারাথন দৌড় শুরু করতে হবে। ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশ, গ্রাম ছুঁয়েছুঁয়ে যেতে হবে। (একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়াতে হবে। অবশেষে থমকে দাঁড়িয়ে ঘোষকের কণ্ঠে বলতে হবে)

কটপার জগাই ধর এই মাত্র ম্যারাথন দৌড় শেষ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছেন। তার শরীরে কোনো ক্লান্তির ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এলেন তিনি। হাসিমুখে প্যাভিলিয়ানে ফিরে যাচ্ছেন। সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান এতটা পথ আসতে কোনো কষ্টই হয়নি। কোনো দুর্ঘটনা? না দুর্ঘটনার সম্মুখীন হননি তিনি। যে-পথ দিয়ে তিনি গ্যাছেন সবাই তাকে জানিয়েছেন অকুণ্ঠ সমর্থন। এ-যেন তাদেরই দীর্ঘ প্রত্যাশা-পূরণের দিবস। কোনো উল্লেখ্য ঘটনা? হ্যাঁ। আছে। গলায় দড়ি-বাঁধা একটি শান্ত ভেড়া তার দড়ি আর খুঁটি নিয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। তিনি অনায়াসেই গোটা ভেড়াটাকে টপকে চলে যান। ঠিক তক্ষুণি সেটা ভ্যা-ভ্যা করে ডেকে উঠেছিল। আর এক জায়গায় এক বাতিক-গ্রস্ত পাগল তাঁর পথে রুখে দাঁড়ায়। তিনি কাছে চলে আসতেই পথ ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়াতে আরম্ভ করে। জগাই তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে উঠতেই পাগল থমকে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে ঠা ঠা করে হাসতে থাকে।

এমনি করে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে-পড়তে একসময় দৌড় শেষ হয়ে যাবে। চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে পৃথিবীকে। চ্যালেঞ্জ মহাবিশ্বকেও।

রকেট প্রস্তুত! এক্ষুণি চার্জ দেয়া হবে। পৃথিবীর সব বন্ধন সব আকর্ষণকে মাটিতে ফিরিয়ে দিয়ে আমি ছুটে যাব দূর-দূরান্তে ঐ নক্ষত্রলোকে। সুদীর্ঘ পরমায়ু নিয়ে, অনেক আলোকবর্ষ পেরিয়ে ছুটে যাব অজানা অচেনা সব জগতে। সেখানে বাতাস নেই, খাদ্য নেই, মানুষ নেই, গাছপালা, নদ-নদী এমনি এই চেনা পৃথিবীর কিচ্ছু নেই।

ওরা হাতছানি দিয়ে দিনরাত ডাকছে। অসংখ্য সংকেত পাঠাচ্ছে। ঐ সংকেতের অর্থ বুঝবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু আজও কিছু বুঝতে পারিনি। তবু ওরই নিশানা ধরে আমি ছুটে যাব।

আমার গোপালী বৃদ্ধা হয়ে যাবে। একদিন মরে যাবে। মাধব বড় হতে-হতে একদিন বৃদ্ধ হয়ে যাবে। তার পুত্র তখন বড় হয়ে উঠবে। প্রকৃতির নিয়মের কঠিন শাসন ওদের নিয়ন্ত্রণ করতে থাকবে। কিন্তু আমি? হিমশীতল দেহে অনড় অটল হয়ে আমার রকেটে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে বহু আলোক বর্ষ পরে পৌঁছে যাব নতুন সে-সব জগতে। তাজা যৌবনের দেহ নিয়ে উঠে বসব মহাবিস্ময়ে। দেখব নতুন সৃষ্টি, নতুন পৃথিবী, নতুন মানুষ। ওরা সাদরে গ্রহণ করবে আমাকে।

সব যাত্রারই শেষ আছে। তখন কি শুরু হবে আমার ফিরবার পালা? না আমি ফিরব না। নতুন তথ্য নতুন জ্ঞানের সন্ধান জানাতে-জানাতে এগিয়ে যাব চিরদিনেরই জন্য। আর ফিরে যাবই বা কার কাছে? আমার গোপালী নেই, মাধব নেই, আমার শালুক রঙের টিনের বাড়িটা নেই। চেনা পথ-ঘাট, নদ-নদী, গাছগাছালি—নেই-নেই-নেই। সেই অসংখ্য না-থাকার ভীড়ে ফিরে এলেও তো নিজেকে ফিরে পাব না। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ আছে। আছে তাদের অফুরন্ত জ্ঞান তৃষ্ণা। তাই আমার এই ভাল। আবার রকেটে ঘুমিয়ে পড়ব। এগিয়ে যাব ছায়াপথের রাজ্যে—নতুন পথে। জেগে উঠব নতুনই কোনো এক দেশের মাটিতে।

(নেপথ্য থেকে শঙ্খ ধ্বনি। তুমুল হর্ষধ্বনি) বিদায় নেবার সময় এসেছে। দারুণ উত্তেজনা বোধ করছি। ঐ যে সাংবাদিকগণ আসছেন। আসুন নমস্কার। আমার বেশি কথা বলবার সময় নেই। কি বলছেন? পৃথিবীর কাছে আমার শেষ কণ্ঠস্বর? টেপ করবেন? আচ্ছা ঠিক আছে। শুনুন। এই মহাপৃথিবীতে আমরা সব মানুষ, সবাই কমরেড। নমস্কার।

(নেপথ্য থেকে মোটাগলায় ঘোষণা। থেমে-থেমে বলবে টেন-নাইন-এইট……। জিরো বলা পর্যন্ত এটা চলতে থাকবে।)

"আমার প্রণতি গ্রহণ কর পৃথিবী
শেষ নমস্কারে অবনত দিবাবসানের বেদিতলে।"

(চারদিকের আলো কাঁপছে। গুরুগম্ভীর গলায় সংখ্যাগণনা চলছে। জিরো বলবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। মাটির দিকে মুখ করে জগাই শুয়ে পড়বে। একটানা শোঁ-ও-ও-ও করে ছুটে চলার একটা শব্দ

ধীরে ধীরে সব শান্ত। চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। খুব ধীরে-ধীরে টুং টাং করে একটা পিয়ানোর শব্দ। জগাই একইভাবে থাকবে।

এমনি সময় নেপথ্য থেকে ভারী গলায় একটা ডাক—জগুবাবু! জগুবাবু বাড়ি আছেন? জগুবাবু! বহু কণ্ঠে ডাক, জগুবাবু! জগুবাবু! হল্লা—কি ব্যাপার বলতো? যখনই আসি তখনই দেখি বাড়ি নেই। এই জগা বাড়ি আছিস? বের হবি? না ঘরে ঢুকব? নাহ্ কোনো সাড়া নেই। পালাল নাকি?

ধীরে-ধীরে সব হট্টগোল শান্ত হয়ে আসবে। ভয়ে-ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে জগাই উঠে দাঁড়াবে। সঙ্গে-সঙ্গে দুপাশ থেকে পর্দা সরে আসবে। জানলাটা বন্ধ হয়ে যাবে। জগাই চীৎকার করে উঠবে)

একি! কালো অন্ধকার আমাকে ঘিরে ফেলছে কেন? আমার যে সব বলা হয়নি এখনও। (পর্দাটা আবার তুলে উঠতেই জগাই ছুটে যায় হাত তুলে নিষেধ করতে) ন-না-না-না! (স্থির চিত্র। নেপথ্যে মার্চিং সং বাজতে থাকে। সমস্ত মঞ্চ সবুজ আলোয় ভরে যায়)

[ধীরে ধীরে পর্দা চলে আসবে]

চিত্তপ্রসাদ

চিত্তপ্রসাদ (ভট্টাচার্য) সেই চল্লিশ দশকের সাড়াজাগান শিল্পীর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় সুনীল জানার বাড়িতে প্রায় ছত্রিশ বছর আগে। ঋজু দেহ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তার আগেই অবশ্য তার ছবির সঙ্গে পরিচিত হয়ে গিয়েছি।

পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার লোক হয়েও ছেলেবেলা থেকেই তার পিতার সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। ছবি আঁকার অদম্য উৎসাহ থাকা সত্বেও কোনো আর্টস্কুলে শিক্ষালাভের সুযোগ হয়নি।

Peoples' war-এ ধারাবাহিকভাবে ওর ছবি প্রকাশিত হয়েছে। তাই কোথাও শিক্ষালাভ না করেও, এ-ধরনের ছবি আঁকল কি করে ?

আসলে প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ে অসম্ভব ধৈর্য ও ঐকান্তিকতা নিয়ে পাঠ নিয়েছিল এবং তাতেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

তার ছবিতে একটা বলিষ্ঠ ছাপ যেটা মনটাকে নাড়িয়ে তোলে সেই সঙ্গে নান্দনিক অবদানে ভরপুর, এ-ছাড়াও ছবিতে আছে মাটির গন্ধ, প্রাণের আর্তি —যে মাটি আমাদের দেশের মাটি—যে প্রাণ অগণিত অবহেলিত মানুষের প্রাণ। চল্লিশের দশকে তার আঁকা ছবি একটা নতুন উন্মাদনা এনেছিল। লিনোকাট্, উডকাট ও ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটেই বেশির ভাগ আঁকত। কয়েকটি প্রাণবন্ত প্রতিকৃতি চিত্রও দেখেছিলাম।

শিল্পীকে বহুদিন বাংলার বাইরে বোম্বাইতে বহু দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়ে কাটাতে হয়েছে। শরীরটাও তত ভাল যাচ্ছিল না। শেষের কয়েকমাস ত শয্যাশায়ী। বহুদিন ধরেই ছবি আঁকার তাগিদও কম হয়ে এসেছিল। তবে আমাদের ভুললে চলবে না—চিত্তপ্রসাদের ঐতিহাসিক অবদানকে। এবং

তাতেই সে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। চিত্তপ্রসাদের ছবিগুলো জীবনমুখী, চেতনাসমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল ভাবধারায় অভিষিক্ত। রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্যে অনেক বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করেই এসব ছবি আঁকা হয়েছিল। এর তুলি ও কবজির জোর ছিল। বিশ্বাসের জোর তুলির জোর বাড়িয়েছে। বর্তমান শিল্পী সমাজ চিত্তপ্রসাদের ছবি সম্পর্কে কতটুকুই বা জানে। অনেকে হয়ত তার নামই শোনেনি।

তাই মনে হয় আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় চিত্তপ্রসাদের বাছাই ছবির যদি একটা এ্যালবাম প্রকাশিত করা যায় এবং সেই সঙ্গে তাঁর ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করা হলে, শিল্পীর সত্যিকারের স্মৃতি তর্পণ করা হবে বলে মনে করি।

রথীন মৈত্র

রুসো

জাঁ জ্যাক রুসো (১৭১২-১৭৭৮) আধুনিক জগতের নিয়ত স্মরণীয় একটি নাম। রুসো ছিলেন ভোলটেয়ারের বয়ঃকনিষ্ঠ—আঠারো বছরের কনিষ্ঠতা—কিন্তু দুজনেরই জীবনান্ত হয় একই বৎসরে, প্রায় এক মাসের মধ্যে, আজ থেকে দুশো বৎসর পূর্বে। জীবনের শেষভাগে কিছুকাল ভোলটেয়ার জেনিভা হ্রদের তীরবর্তী এক জায়গায় বাড়ি তৈরি করে বাস করছিলেন, তখনই জেনিভা জনপদবাসী রুসোর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে, সে-পরিচয়ও কিছু সৌহার্দ্যমণ্ডিত ছিল না। অথচ ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ভোলটেয়ার ও রুসো—এই দুটি অপরিহার্য নাম। যে আঠারো শতকী সভ্যতায় আধুনিক জগতের বিদ্রোহী চিন্তা ও স্বাধীন চিন্তার উল্লাস শুরু হয়েছিল (যার প্রভাবে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি যাবতীয় ভাববর্গের আমূল পরিবর্তন হতে থাকল) তার মূলে ভোলটেয়ার ও রুসোর চিন্তা ছিল সবচেয়ে বেশি কার্যকরী. ভোলটেয়ারের চিন্তা ছিল মূলতঃ বিদ্রোহী ও ধ্বংসাত্মক, রুসোর চিন্তা ছিল বিদ্রোহী, ধ্বংসাত্মক কিন্তু সেই সঙ্গে নবসৃজনী শক্তিমান। রুসোর মৃত্যুর দুশো বছর পরে আজও মানব-সংস্কৃতির অগণিত অঞ্চলে রুসোর মৌলভাবনাগুলি প্রচ্ছন্ন বা সুস্পষ্ট ভাবেই শাখান্বিত হয়ে আছে।

রুসো শৈশবেই মাতৃহীন হন, উচ্ছৃঙ্খল পিতার কাছে কোনো যত্ন পাননি, সেই পিতাও আবার অপরাধ করে জেল এড়াবার জন্য জেনিভা ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যান। বালক রুসোর পক্ষে প্রাণধারণ করাই কঠিন হত, শিক্ষাদীক্ষা তো দূরস্থান। তাঁর মামাবাড়ির লোকেরা তাঁকে একটি আবাসিক স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন, ক্রমে আইনব্যবসায়ী (নোটারি) শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বালক বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। ষোল বছর বয়সে এই পলায়ন থেকে শুরু করে অন্তত আরো ষোল বছর পর্যন্ত রুসোর জীবনের ঘটনাবলী নানা কারণে অনিশ্চয় অনুমানের ধূসরতায় আচ্ছন্ন। ইতিমধ্যে তিনি কখনো কখনো কোনো কোনো পরিবারে বাড়ির চাকরের কাজ করেছেন, কোনো অভিজাত পরিবারে

থেকেছেন, কোনো অভিজাত বিগতযৌবনা নারীর কাছে বহিরঙ্গ প্রণয় লাভ করেছেন, আবার ছন্নছাড়া ভবঘুরে হয়ে এখানে সেখানে গেছেন। এহেন নিরুদ্দেশ যাত্রার কোনো নির্ভরযোগ্য ঘটনাপঞ্জী পাওয়া যায় না, যে বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, সে বৃত্তান্ত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থত্রয়ীর একটিতে পাওয়া যায়, যেটির নাম 'কনফেশিয়ঁস' অর্থাৎ 'কবুলিয়ৎ'। এই স্মরণনির্ভর গ্রন্থের সব তথ্যই যে বাস্তব তথ্য-ভিত্তিক, পশ্চাদ্দৃষ্টির বর্ণালী রঞ্জিত নয় এমন কথা দৃঢ়স্বরে বলা সম্ভব নয়। সে সময় থেকে রুসো তাঁর ভবঘুরে জীবন ছেড়ে দিয়ে প্যারী নগরীর এখানে সেখানে বাস করতে লাগলেন, কখনো কোনো সাহিত্য-সংস্কৃতিতে রুচিসম্পন্না অর্থবতী মহিলার অতিথি হয়ে কয়েক মাস, অথবা নিজেই কোনো শস্তা বাড়িতে কয়েক মাস। টেরেসে ল্য ভ্যালুর নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক বানিয়ে পাঁচটি সন্তানের জনক হয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংসার ধর্ম পালন করলেন। ব্যক্তিজীবনে কিছুই অনন্যসাধারণ ছিল না, সেকালের আর পাঁচজন ফরাসী বুদ্ধিজীবী যে ধরনের জীবন যাপন করতেন (শুধু ফরাসী কেন, পশ্চিম ইওরোপের সর্বত্র এবং জারশাসিত রুশদেশের ইন্‌টেলেকচুয়ালগণও), রুসোর জীবনও মোটামুটি তেমনটি ছিল।

(২)

কিন্তু বহিরঙ্গ বহিরঙ্গই। বহিরঙ্গ দিয়ে কি আর হদিশ পাওয়া যায় অন্তর্জীবনের, মনঃশক্তির মানবজীবনের সমস্যায় আলোকোদ্ভাস করার যোগ্য মনীষার ? রুসো ছিলেন অসামান্য মনীষার মালিক। তাঁর মনীষা নিছক যুক্তি-নির্ভর ছিলনা, প্রধানত তর্কপরায়ণ বুদ্ধিভিত্তিক ছিল না। তাঁর মনীষায় বুদ্ধির সঙ্গে সম্মিলন ঘটেছিল অনুভূতির, আবেগাশ্রিত অভিজ্ঞতার। রুসো অ্যারিস্টটল এর সগোত্র ছিলেন না, ছিলেন প্লেটোর সগোত্র এবং সে জন্যই উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন বিশ্বের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মূল্যবান বাণী : *Contrat Social* নামক বইয়ের প্রথম বাক্যটি :

> L' homme est ne libre, et partout il est dans les ers.
> [Man is born free, and everywhere he is in chains ;
> মানুষ জন্মেছে স্বাধীন হয়ে, এখন সে সর্বত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ।]

রুসো কয়েকখানা বই লিখেছিলেন, কিন্তু তিনখানা বইয়ের জন্যই তাঁর নাম মানব চিন্তার ইতিহাসে চির-অম্লান হয়ে আছে। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত

হয় তাঁর একটি উপন্যাস : *Julie, ou La Nouvella Heloise*। সে যুগে উপন্যাস একটি নবাগত সাহিত্য শাখা। এই নবাগত শাখাটি আরো নবত্ব লাভ করল রুসোর রচনাশৈলীতে। উপন্যাসটি অনেকগুলি পত্রের সমষ্টি, অনেকগুলি পত্রের মাধ্যমে কাহিনীটি বলা হয়েছে, চরিত্রগুলি উদ্ভাসিত হয়েছে কাহিনীর মূল ভাবনা বিধৃত হয়েছে। উপন্যাস-কাহিনীতে আমরা পাই এক প্রেমিক যুগল, প্রণয়িনী হচ্ছে সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের মেয়ে, প্রণয়ী সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক। মেয়েটির বিয়ে হল সমশ্রেণীর একজনের সঙ্গে, ফলে প্রণয়ীর অপূর্ণ কামনা সহস্রবার বর্ণিত হয়েছে। কাহিনী হিসাবে এই উপন্যাসটি উল্লেখযোগ্য নয়, পত্রাপত্র-নির্ভর কাহিনীও কিছু নতুন নয় কেননা রুসোর এই বইটির কুড়ি বছর পূর্বেই ইংরেজ লেখক স্যামুয়েল রিচার্ডসন্ লিখিত 'প্যামেলা' প্রকাশিত ও বহু-আলোচিত হয়েছিল। তবুও রুসোর উপন্যাসের মস্ত বড় বৈশিষ্ট্য থেকেই যায়, সে-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা। সাইকলজি শাস্ত্র অবশ্য আঠারো শতকেই শুরু হয়েছিল, তবুও সে কালের সাইকলজিতে যে-পরিমাণ তত্ত্বকথা ছিল, সমানুভূতি-উদ্দীপক সূক্ষ্মতা ততটা ছিল না। চিন্তার গভীরতায় এবং সাহসী সূক্ষ্মতায় রুসোর মনস্তত্ত্ব ফ্রয়েড্-ইয়ুঙের মনস্তত্ত্বের, এমন কি তৎপরবর্তী মনস্তত্ত্বেরও সমধর্মী, মার্সেল প্রুসত্-এর অথবা জেম্স্ জয়স্-এর বিস্তৃত মনোবিশ্লেষণাত্মক উপন্যাসের পথিকৃৎ। রুসো আরো একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, 'এমিলে' (*Emile*)। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পরে সরকারী হুকুম জারি হল, লেখককে গ্রেপ্তার করা হোক। হুকুমের কারণ ছিল। ফরাসী পাঠকগণ, বিশেষত প্যারী নগরীর সচ্ছল অবস্থাপন্ন সংস্কৃতিদপ্তী পাঠকগণ মনে করেছিলেন যে রুসো লোকটির রচনাবলী ফরাসী সংস্কৃতির বিরোধী এবং অপব্যাখ্যাকারী। বলা হল যে রুসোর Le Contrat Social (সামাজিক চুক্তি—১৭৬১ সনে প্রকাশিত) নামক তত্ত্বপ্রধান পুস্তকে, এবং তাছাড়া La Nouvelle Heloise (এলোয়ার জীবন উপন্যাস—১৭৬১ সনেই প্রকাশিত) এবং Emile (এমিলে—১৭৬২ সনে প্রকাশিত) নামক উপন্যাস দুটিতে দেশের রাজশক্তি ও ধর্মশক্তির প্রতি জনগণের অবজ্ঞা উদ্দীপিত করার চেষ্টা হয়েছে। তাছাড়া সদ্য প্রকাশিত (১৭৬১ সনে) সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থেও রাজনীতি সংক্রান্ত অনেক ধারণা পাওয়া গেল যার প্রভাবে বুর্বঁ রাজ-পরিবারের দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত শক্তির অমর্যাদা করা হয়েছে। শাসক সম্প্রদায় অবশ্য রাজশক্তিকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত মনে করতেন যদিও ইতিহাসের সর্বাধিক বিখ্যাত বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, শুরু হয়েছিল এই গ্রন্থ প্রকাশের ত্রিশ বছরের

মধ্যেই, এবং সে-বিপ্লবে প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা এসেছিল রুসোর রচনাবলী থেকেই।

সে যুগে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের যোগাযোগ নিবিড় ছিল। ইতিপূর্বে ভোলটেয়ার গিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে, কিছুদিন বাসও করেছিলেন, এখন গেলেন রুসো, তাঁর ইংরেজ বন্ধু ডেভিড্ হিউম ও জেমস্ বজ্‌ওয়েলের সাহায্যে (যদিও বজ্‌ওয়েল যাঁর জীবনী-রচয়িতা বলে প্রসিদ্ধ, সেই ডক্টর জন্‌সন্ রুসোর ধ্যান ধারণা আদৌ পছন্দ করতেন না)। ইংল্যাণ্ডে বছর দুয়েক বাস করে স্বদেশে ফিরলেন রুসো। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরে এতদিনে হয়ে পড়েছেন বায়ু-তাড়িত, ছিটগ্রস্ত ব্যক্তি। ছিট হচ্ছে, 'আমার পিছনে সবাই লেগেছে' 'সবাই আমার অশুভকারী', যে ছিটকে ইংরেজি ভাষায় বলা হয় Persecution Mania। এঁর ওঁর অনুগ্রহে এখানে সেখানে বাস করে অবশেষে এরমেনোভিল্ নামক এক জায়গায় বাসা বাঁধেন ১৭৭৮ সনে কিন্তু মাস দুয়েকের মধ্যে স্ট্রোক হয়ে মারা যান।

রুসোর প্রায় সমকালীন ইংরেজ কবি ছিলেন উইলিয়াম ব্লেইক, তিনি একটি ছড়া রচনা করেছিলেন :

> Mock on, mock on Voltaire, Rousseau :
> Mock on, mock on : 'tis all in vain !
> You throw the sand against the wind,
> And the wind blows it back again.

ব্লেক ছিলেন আবেগনির্ভর অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন কবি, স্বভাবতই সমকালীন প্রাক্-বিপ্লব ফরাসী দেশের বিত্তবান লেখক শ্রেণীর ব্যঙ্গাত্মক আত্মম্ভরী রচনার বিরোধী। সেই বিরোধিতা ফুটে উঠেছে Mock on, mock on কথার পুনরুক্তিতে। কিন্তু ব্লেইক ভুল করেছেন। যিনি স্বমহিমাচেতনা, Superiority Complex থেকে ভুগতেন বিদ্রূপ শাণিত চেতনায়, সেই ভোল্‌টেয়ারকে Mock on, mock on বলে একটা চ্যালেঞ্জ জানানো আদৌ অসঙ্গত হয়নি কিন্তু রুসোর চেতনা পীড়িত হয়নি, না অনুরূপ complex থেকে, না বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গিতে। ভোল্‌টেয়ার ও রুসোর নাম সচরাচর একসঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে, কিন্তু হওয়া সমীচীন নয়, কেননা যদিচ উভয়ে প্রায় সমকালীন, উঁদের মৃত্যুও হয়েছিল একই বৎসরে কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে, তবুও ভোল্‌টেয়ারের নঙর্থক, ব্যঙ্গপ্রবণ, ধ্বংসকামী মনোবৃত্তি রুসোর ছিল না, রুসো বরঞ্চ ইতিহাস-বাহিত মানব

জাতির, ব্যক্তি মানবের, সদর্থক positive চিন্তা ও কর্মের সম্ভাবনাকে বড়ো বলে দেখতেন। ভোলটেয়ার বলেছিলেন : I liked science so long as it did not threaten to overshadow literature. But now that it is dominating all the arts, I can only regard it as an ill-bred tyrant.—রুসোর পক্ষে এহেন চটুল যুক্তি ও চিন্তা সম্ভব ছিল না। অধ্যাত্মবাদী দূরদৃষ্টি প্রসারিত হত অনেক দূর অবধি, যেমন মহাকালের আদি অধ্যায়ে তেমনই ভবিষ্যতের ক্রান্তি সীমায়। সে জন্যই তিনি বলতে পেরেছিলেন (যে বাক্য ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি) : Man is born free and everywhere he is in chains। এই উক্তিটি নিয়ে অনেক পণ্ডিতম্মন্য বিতর্ক অনেক কূটযুক্তি প্রসারিত হয়েছে কিন্তু পৃথিবীর মহত্তম সত্যবাণীগুলির মতো রুসোর এই বাণীও স্বচ্ছ ও সরল। মানুষ জন্মায় স্বাধীন হয়ে। শিশু মানুষকে খাওয়াতে হয়, ঘুম পাড়াতে হয়, চলতে শেখাতে হয়, এসব পরনির্ভরতায় তার জন্মগত স্বাধীনতা খর্ব হয় না, এসব পরনির্ভরতা একটা স্নেহনিষিক্ত সম্পর্কে বলীয়ান, কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা অবাধ থাকছে না খর্ব হয়েছে সে-প্রশ্ন ওঠে যখন বয়স্ক মানুষ স্বেচ্ছায় আপন স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে, হারাতেও পারে, লাঞ্ছিত হতে দিতেও পারে। ইংরেজ লেখক জে বী প্রীস্‌ট্‌লি অনর্থক এই বাক্যটি নিয়ে তর্ক তুলেছেন। আসল কথা, যেকথা রুসো বলেছেন স্বাধীনতা আমার মানবিক অধিকার, সেই মানবিক অধিকারটি আমি কখন প্রকাশ করব কখন ত্যাগ করব সে সিদ্ধান্তে পৌছনোও আমারই মানবিক অধিকার। ইংরেজ গল্পলেখক আলফা অব্‌ দি প্লাউ (এ, জি, গার্ডিনার) একটি ছোট রচনায় লিখছেন যে বোলশেভিক বিপ্লবের কিছুকাল পরে একদিন দেখা গেল মস্কো শহরের একটি শকটাকীর্ণ রাজপথের মাঝখান দিয়ে একজন ঠাকুরমা-শ্রেণীর বৃদ্ধা মহিলা একটি ঝুড়ি বহন করে চলছেন। শকটচালকগণ মহা বিব্রত হয়েছেন কী উপায়ে মহিলাকে চাপা না দিয়ে এগনো যাবে। মহিলাটি একবার রাস্তার ডান দিকে ঝুঁকছেন, একবার বাঁ দিকে ঝুঁকছেন। ট্র্যাফিক পুলিশটি ছুটে গিয়ে বলল, ঠাকুরমা, আপনি ফুটপাত দিয়ে হাঁটুন, এই রাস্তা দিয়ে তো গাড়িগুলি চলবে। বৃদ্ধা বললেন, কেন, আমরা তো এখন স্বাধীন জাতি, আমার যেখান দিয়ে খুশি সেখান দিয়ে চলব।—লেখক এই কল্পিত কাহিনী থেকে স্বাধীনতার স্বরূপচিন্তায় পৌছেছেন। স্বাধীন ব্যক্তি যেমন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে জীবন যাপন করে (রবিন্‌সন ক্রুসোর মতো

নিঃসঙ্গ বৈপ্যজীবন নয়) তখন প্রায় প্রতি পদক্ষেপে তাকে সংযত হয়ে চলতে হয় যাতে তার কার্যো অন্য কারুর কার্যের ব্যাঘাত না হয়। স্বাধীনতা ভোগ এবং স্বাধীনতা ত্যাগ, দুইয়ে একই অধিকারের এপিঠ-ওপিঠ। রুসোর স্বাধীনতা ধারণায় অস্বচ্ছতা কিছু নেই। যে Social Contract-এর কথা রুসো বলেছেন সেই সমাজচুক্তি তো কাগজেকলমে আদালতী চুক্তি নয়, এই সমাজচুক্তি সুন্দর আভাসিত হয়েছে অন্য একজন ইংরেজ আলোচকের ভাষায়: Rousseau postulates the *social contract* as an unformulated agreement by which individuals have pooled their individual liberties in order to form an association (the State) giving them protection against enemies outside and criminals within. The sovereign is the people, which makes laws and decides policy —as far as possible by a general vote. The executive (the 'govermment' or the 'prince') can never initiate policy or legislation; it can only carry out the general will. If the contract is broken—by a foreign conqueror or through seizure of power by a tyrant—the 'natural' basis of the State collapses and each citizen is entitled to recover his individual freedom of action. (Geoffrey Brereton *A Short History of French Literature*, 104n.) এই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার অভ্যাস মানুষের জীবনযাত্রার আদিমকাল থেকেই। রুসো আদি মানবের কথা ভেবেছেন। আঠারো শতকের মনীষীগণ (যেমন, ভোলটেয়ার) ভাবতেন যে সভ্যতার ইতিহাস ক্রমশঃ অধিরোহণের ইতিহাস, অর্থাৎ মানুষের জীবন শুরুতে ছিল নীচ, বিপদাবৃত, নিয়ত ক্লেশকর, নিঃসঙ্গ। সে জীবন ছিল জান্তব জীবন। কিন্তু রুসো বললেন, আসল কথা সম্পূর্ণ উলটো। আদিম মানব ছিল সুখী সৎ। তাঁর থিওরিতে বলা হল আদিম মানবের ছিল Natural Goodness। যাকে আমরা সভ্যতা বলি সে-অবস্থাটি আসলে হল natural বা স্বভাবজ শুভ্র অবস্থা থেকে স্বার্থমণ্ডিত অস্বাভাবিক কালিমাময় অবস্থায় অবরোহণ। স্বভাব হয়েছে বি-স্বভাব, Goodness হয়েছে Evil, সৎ থেকে মানুষ পৌঁছেছে অসতে। অতএব ভারতীয় প্রাচীন আর্য্য প্রার্থনা করলেন, অসতো মা সদ্‌গময়।—রুসোর এই ধারণার ঐশ্বর্য্যময় সুফল দেখতে পাই জীবনের তিন ক্ষেত্রে: (১) ইংরেজিতে যাকে Nature বলা হয়,

আমাদের ভাষায় বলি স্বভাব, প্রকৃতি, নিসর্গ, সহজাত চরিত্র ইত্যাদি, সে বিষয়ে রুশোর চিন্তা এমনই মৌলিক, এমনই যুগান্তকারী এবং একাধারে হৃদয়স্পর্শী ও বুদ্ধিগ্রাহ্য যে প্রকৃতির এই নূতন ধারণা থেকে উদ্ভূত হল নতুন ধরনের কাব্য ও অন্যান্য সাহিত্যশ্রেণী, নতুন ধরনের চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদি চারুকলা, উদ্ভূত হল নতুন ধরনের দার্শনিক দৃষ্টি এবং এই সমস্ত নবত্ব জড়িয়ে একটি মহাপ্রবল ভাবধারা ইওরোপে এসে গেল (ভারতবর্ষেও এসেছিল) যাকে বলা হয়ে থাকে the Romantic Revolt। এই রোমান্টিসিজমের গোড়ার কথা হচ্ছে বহির্জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে নূতন চিন্তা, এবং বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ সমগুণসম্পন্ন হয়েছে বলে রোমান্টিক মন, রোমান্টিক জীবন, রোমান্টিক দর্শন সব একীভূত হয়ে যায়।

প্রকৃতি সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্বটিও দু অর্থে প্রযুক্ত হল। প্রকৃতি হচ্ছে নিসর্গ, মানুষকে আবেষ্টন করে রেখেছে যে জগৎ, অর্থাৎ আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, পরিবর্তনশীল ঋতু; সমুদ্র, নদী, হ্রদ, জলাশয়; পাহাড়, গুহা, অরণ্য, লতা, বৃক্ষ, ফল, ফুল; জন্তু, পাখি ইত্যাদি। এই সব নিসর্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে সাহিত্য, শিল্প রচিত হয়েছে চিরকালই, কিন্তু রুসো—পরবর্তী যুগগুলিতে নিসর্গ-সাহিত্য, নিসর্গ শিল্প উত্তুঙ্গ সৌন্দর্য অর্জন করল ইওরোপের প্রতি ভাষায়, প্রতি সংস্কৃতিতে। শুধু সুন্দর নয়, প্রাণবান। হোরেস্ ও কাটুল্লুসের কাব্যে, স্পেন্সারের কাব্যে, ফরাসী ও স্প্যানিশ ত্রুবাদুর ও মিনেসিঙ্গারদের কাব্যে নিসর্গ উপস্থিত ছিল কিন্তু সে-নিসর্গ মানবিক জগতের পরিচ্ছেদ মাত্র, সে-জগতের সঙ্গে একীভূত নয়। ওয়র্ডস্বার্থ, শেলি, কীট্সের কাব্যে, ভিক্টর ইয়ুগোর কাব্যে, হাইনে, দান্নুৎসিয়োর কাব্যে মানবসত্তা ও নিসর্গ সত্তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেল।

(৪)

কিন্তু 'নেচার' বলতে আমরা নিসর্গ ছাড়া আরো কিছু বুঝলাম, বুঝলাম সেই শক্তিকে যে-স্বভাবতা শক্তি মানুষের মধ্যে বিরাজ করে:—মানব-প্রকৃতি। মানব-প্রকৃতি আর বহিঃপ্রকৃতি, দুইয়ে মিলে এই সর্বধাত্রী জগৎ। এই জগৎকে শিল্পধৃত করা হল উনিশ শতকী ইওরোপীয় সংস্কৃতির প্রধান উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যভিত্তিক শিল্পধারাকে বলা হল ন্যাচারালিজ্ম্। বহির্জগতের পবিত্র সারল্যস্নাত হওয়ার জন্য ওয়র্ডস্বার্থ গ্রাসমেয়ারে বাস করতেন, আমেরিকান লেখক হেন্‌রি ডেভিড্ থোরো একাকী হ্রদতীরে বাস করতেন,

পোল গোগ্যাঁ টাহিটি দ্বীপে চলে গিয়েছিলেন, ইয়েট্স্ আনন্দিত হয়েছিলেন এই কারণে যে দ্বিজেন ঠাকুর নির্জনে বৃক্ষ ছায়ায় বসে থাকতেন এবং কাঠবেড়ালিরা তাঁর নিশ্চল গা বেয়ে ওঠা নামা করত।

(২) প্রকৃতি যদি সৎ হয়, সুন্দর হয়, সরল হয়, তাহলে প্রকৃতির প্রভাব স্পষ্টতম রূপে দেখা যাবে শিশুর মধ্যে। ওয়ার্ডস্বোয়র্থ কবিতার পরে কবিতা লিখলেন শিশুকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত তাঁর 'দমটানিটি ওড্' কবিতায় বললেন যে শিশু জন্মায় দেবত্ব নিয়ে, তারপরে ক্রমে ক্রমে তার প্রারম্ভিক পবিত্রতা থেকে দূরে আরো দূরে সরে যেতে থাকে। শিশুর স্বভাবজ সারল্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথও অবিস্মরণীয় কবিতা লিখেছেন, কিন্তু তাতে দার্শনিকতা, অতীন্দ্রিয়তা প্রবেশ করান নি। ওয়ার্ডস্বোয়র্থ এবং তাঁর অনুগামীগণ তেমনটি প্রবেশ করালেন কেননা শিশুর পবিত্রতাঘটিত ধারণাটি মিশে যাচ্ছে মাতৃক্রোড়ে শিশু যিশুর চিত্রের সঙ্গে। রুসোর চিন্তা থেকে শিল্পীগণ পৌঁছলেন খৃষ্টীয় কাহিনীর গোড়ার কথায়।

(৩) নেচার সম্বন্ধে রুসোর চিন্তার একটি তৃতীয় দিক মহামূল্যবান। যখন মানলাম যে মানুষ জন্মায় natural goodness নিয়ে, তখন মানলাম যে মানবজীবনের শৈশবেই দেবসুলভ পবিত্রতা নিখুঁত। তাহলে শিশুকে যখন আমরা শিক্ষা দিতে চাই তখন তার স্বভাবজ প্রবৃত্তিগুলিকে যেন কোনো-মতেই ব্যাহত না করি। অর্থাৎ শিক্ষার প্রণালী হতে হবে স্বভাবপন্থী, ন্যাচারা-লিজম্-সম্মত। অপাপবিদ্ধ শিশুর শিক্ষায় থাকবে নিষ্পাপ শিক্ষণপ্রণালী, আনন্দ, বাধাবন্ধহীন ক্রীড়াপন্থী জ্ঞানার্জন। রুসোর চিন্তার নির্ভরে পৃথিবীর বহুদেশে নূতন নূতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে মারিয়া মন্তেসরির পদ্ধতি সর্বাধিক প্রশংসিত। আমাদের দেশেও রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষণ পদ্ধতি একটা নবযুগ এনেছিল।

নেচার সম্বন্ধে ধারণা ছাড়াও রুসো আরো যে সব চিন্তাপ্রসবিনী উক্তি করেছিলেন তার একটি হচ্ছে সমাজে সমতাজ্ঞান বা ভেদজ্ঞান সংক্রান্ত। ন্যাচারাল্ গুড্‌নেস্ (অর্থাৎ স্বভাবজ সুচেতনা) সম্বন্ধে রুসো তাঁর প্রথম মূল্যবান উক্তি করেন ১৭৫০ সনে, Discovers sur les science et les arts (বিজ্ঞান ও শিল্প সংক্রান্ত রচনাবলী), নামক গ্রন্থে। এরপরে ১৭৫৪ সনে Discovers sur l'inegalite (অসাম্য সংক্রান্ত রচনাবলী) নামক গ্রন্থে আলোচনা করে মানুষে মানুষে সাম্য সম্ভব কিনা, প্রভেদের কারণ কি? এই আলোচনা প্রসঙ্গেই রুসো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে আদিম মানবের

জীবন প্রণালীতে সাম্যের পন্থা অবলম্বিত হত কিন্তু যখন থেকে ব্যক্তি মানুষ সমাজ গড়ে তুলল তখন থেকেই ছোট বড়, উচ্চ নীচ ইত্যাদি ব্যবধান এসে পড়ল।

রুসোর চিন্তার মূল সূত্রগুলি যে সর্বক্ষেত্রেই নির্ভুল এমন বলা আজকের দিনে সম্ভব নয়, আজকের ইতিহাস জ্ঞান ও সমাজ চিন্তা অনেক নূতন তথ্যের ও ধারনার দিশারী হয়েছে, কিন্তু গোড়ার কথাগুলি আজও গ্রহণযোগ্য বলে মানা যেতে পারে এবং এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তাঁর ভাবনার প্রভাব শিল্পের ক্ষেত্রে সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে চির অমলিন।

অমলেন্দু বসু

ছাপার ভুল

নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত গুণময় মান্না-র প্রবন্ধটির ঠিক নাম হবে
সমাজবাস্তবতা : শরৎচন্দ্র
এই ডিসেম্বর সংখ্যায় 'রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়' প্রবন্ধটির লেখিকার নাম শিবানী ভট্টাচার্য্য।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬১২/১ ব্লক-ও
নিউ আলিপুর
কলকাতা—৫৩

৮.১২.'৮

কল্যাণীয়েষু,

কিছুকাল আগে, সম্ভবত গত বৎসর, আমি 'পরিচয়'-এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমাকে লিখেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, আমার বক্তব্য ছিল—[১] 'পরিচয়'কে আবার ত্রৈমাসিকে পরিণত না করতে হলে একমাত্র উপায় নিয়মিত প্রকাশ—কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে ফাঁক ভরা সম্ভব নয়। [২] 'পরিচয়'কে প্রগতির বাহন করতে হলে প্রগতিমুখীন নানা মত প্রকাশ করতে হবে। ঠিক একই মত ছকের মতন পুনরাবৃত্তি করলে পত্রিকার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। প্রগতির স্রোতের মধ্যে নানা ধারা থাকে, লক্ষ্য একদিকে হলেও তাদের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে লেখকের বিশিষ্ট মত অনুসারে। এতে ভয় পাবার কিছু নেই, বরং এতে পরিণামে প্রগতিই হয় শক্তিশালী, টানতে পারে বহু লোককে। [৩] 'পরিচয়'-এর ঐতিহ্য অনুযায়ী লেখার মান বাড়ানো বাঞ্ছনীয়।

সম্প্রতি দেখছি তোমার ও সহকর্মিদের অমানুষিক পরিশ্রমে 'পরিচয়'-এর উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। পত্রিকার প্রকাশ নিয়মিত হয়ে আসছে। প্রতিফলিত হচ্ছে প্রগতির নানাবিধ চিন্তা। লেখার মানও উন্নততর হয়ে উঠছে। আমি সত্যই আনন্দিত হয়েছি। প্রবন্ধগুলি হচ্ছে আকর্ষণীয়, চিন্তার সহায়। গল্পগুলিও আকর্ষক। কবিতা আমি ঠিক বুঝি না—সে-দোষ নিশ্চয় আমারই। পূজা সংখ্যা তো বহু-প্রশংসিত বলেই আমার বিশ্বাস।

তোমাকে ও সহকর্মিদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সুশোভন সরকার

PARICHAYA December '78 WB/NC-46

গ্রাহক সংক্রান্ত

ডাকখরচ সহ বার্ষিক গ্রাহকচাঁদা : পনের টাকা

ডাকখরচ সহ আজীবন গ্রাহকচাঁদা : একশো টাকা

বর্ধিত মূল্যে বছরে অন্তত তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়
গ্রাহকদের সেজন্য কোনো অতিরিক্ত মূল্য দিতে
হয় না। বছরের যে-কোন সময়
গ্রাহক হওয়া যায়।

এজেন্সি সংক্রান্ত

অন্তত ৫ কপি নিতে হয়

কমিশন শতকরা ২৫ টাকা

পত্রিকা ভি পি তে পাঠানো হয়। ডাকব্যয় আমাদের

কর্মাধ্যক্ষ 'পরিচয়'

ব্যবস্থাপনা দপ্তর

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪।৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট

কলিকাতা-৭৩

দাম : দেড় টাকা

A

বর্তমান ৪৮-বর্ষে এই মার্চ পর্যন্ত 'পরিচয়'-এর চারটি সংখ্যা বেরোল—শারদীয়, নভেম্বর, ডিসেম্বর ৭৮ আর জানুয়ারি ৭৯। পত্রিকা-বর্ষ শেষ হতে আর মাত্র চার মাস বাকি। পাঠক-গ্রাহকদের কাছে এক বছরে তিনটি বিশেষ-সংখ্যাসহ অন্তত ন-দশটি সংখ্যা প্রকাশে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই এপ্রিলেরটি (ফেব্রুয়ারি-মার্চের সংখ্যা) দীপেন্দ্রনাথের স্মরণে আর জুনেরটি (মে-জুনের সংখ্যা) সমালোচনা-বিশেষ সংখ্যারূপে দ্বিগুণ আকারে প্রকাশিত হবে। তাতে একদিকে যেমন আমাদের বিশেষ সংখ্যার ও মোট সংখ্যার প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হবে, তেমনি পাঠকদের আমরা কার্যত আরো দুটি সাধারণ সংখ্যা দিতে পারব। প্রেস-ধর্মঘটের ফলে আমরা যে একটু পেছিয়ে আছি, এই ভাবে জুনে তা সামলে যাবে ও মাসের কাগজ মাসের প্রথমেই বেরোবে।

মে-তে সাধারণ সংখ্যা একটি বেরোবে। বিষ্ণু-দের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে জুলাই সংখ্যাটি সাধারণ সংখ্যার আয়তনে একটি বিশেষ সংখ্যা-রূপে বেরোবে জুলাই-এর প্রথমে। এতে থাকবে—বিষ্ণু দে-র সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত রচনাপঞ্জি, তাঁর জীবনপঞ্জি, কিছু কবিতার পাঠান্তর, আরো কিছু নতুন তথ্য ও বিষ্ণু দে-চর্চায় কৃতবিদ্য প্রবীণ ও নতুন গবেষক-আলোচকদের কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

আগস্টে 'পরিচয়'-এর কোনো সংখ্যা বেরোবে না, সেপ্টেম্বরের প্রথমে শারদীয় সংখ্যাতে হবে ৪৯ বর্ষ শুরু।

আমাদের পাঠক-গ্রাহকরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারেন যে এই পরিকল্পনা নানা কারণে কিছুটা বদলাতেও হতে পারে।

'পরিচয়'-এর গ্রাহক তালিকায় এমন অনেকেরই নাম আছে যাঁদের গ্রাহক-চাঁদা কিছুদিন হল ফুরিয়েছে। তবু আমরা তাঁদের কাগজ পাঠিয়ে যাচ্ছি। এইবার তাঁদের একটু সতর্ক হতে অনুরোধ করছি। আর দেরি না করে চাঁদা জমা দিয়ে দেবেন। কবে চাঁদা ফুরোবে এটা যদি মনে না থাকে আমাদের কাছে এসে যাচাই করে নিতে পারেন বা চিঠি লিখতে পারেন।

বিশেষ ঘোষণা

এখন থেকে 'পরিচয়'-এর কর্ম-সচিব বেলা ১২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত মনীষা গ্রন্থালয়-এ বসবেন ও বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত 'পরিচয়' অফিসে বসবেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান তাঁদের এই সময়ের ভেতর যথাস্থানে দেখা করতে অনুরোধ করছি।

মার্চ, ১৯৭৯ সম্পাদক, 'পরিচয়'

পরিচয়

বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ৬ পৌষ ১৩৮৫ জানুয়ারি ১৯৭৯

প্রবন্ধ

পুস্তক-পরিচয়

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিঠিপত্র

প্রচ্ছদ

সুবোধ দাশগুপ্ত

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। সুশোভন সরকার। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস।

সম্পাদক

দেবেশ রায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয় ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

হো চি-মিনের জেলখানার ডায়েরি থেকে

অনুবাদ : সিদ্ধেশ্বর সেন

দাবার চাল শেখা

১

সময় কাটাতে চলল আমাদের দাবার চাল শেখা ;
হাজারে হাজারে পদাতিক আর ঘোড়ায় করেছে তাড়া,
খুব তাড়াতাড়ি চাই দান, আক্রমণে কিম্বা পিছু-হঠায়,
বুদ্ধি আর দ্রুতগতিতে করতলগত জয়।

২

রাখতে ঢের দূরদৃষ্টি, চিন্তাভাবনা চাই গভীর,
চালাতে সেই আক্রমণ, দুঃসাহসী, নিরবচ্ছিন্ন ;
ভুল নির্দেশ দিলেই দুটো রথ গড়াবে কাদায়,
আর, ঠিক-ঠিক নির্দেশে একটি বড়েও আনবে জয়।

৩

দু-পক্ষেই ব্যূহ-সাজানো, সমানে-সমান,
তবু, জিতবে একটি পক্ষই শেষতক্,
আক্রমণ, পিছু-হটার রণনীতির ভুল নেই,
তবেই মহা-সেনাপতির মতো তোমার জয়।

তলস্তয়ের সঙ্গে কয়েক বছর

১৯০৪-১৯১০

দুশান পেত্রোভিচ মাখোভিত্‌স্কি

সারা জীবনই তলস্তয় মনে মনে এমন এক আশ্রয় খুঁজে ফিরছিলেন, যেখানে তিনি যাপন করবেন এক সরল জীবন, তাঁর প্রত্যয় ও বিশ্বাসের সঙ্গতিতে। আর সেই তাড়নায় মৃত্যুর মাত্র দশদিন আগে, ১০ নভেম্বর ১৯১০, রাত্রিবেলা তলস্তয় ছেড়ে গেলেন ইয়াসনায়া পলিয়ানা। ক-দিনের মধ্যেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। বিশে নভেম্বর, আস্তাপোভো নামে এক ছোট নির্জন রেলওয়ে স্টেশনে বিরাশি বছরে তলস্তয় মারা যান।

১৯০৪ থেকে সেই শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তলস্তয়ের সঙ্গী ছিলেন দুশান মাখোভিত্‌স্কি (১৮৬৬-১৯২২) নামে একজন স্লোভাক চিকিৎসক। মাখোভিত্‌স্কি শেষ ছ-বছর ইয়াসনায়া পলিয়ানাতে তলস্তয়ের কাছে-কাছে ছিলেন প্রতিটি দিন। আর সেই সময়কার সাহচর্যে তলস্তয় হয়ে উঠেছেন মুখর—ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান—বিশেষ করে তখনকার টগবগে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাগুলো বিষয়ে একের পর এক মন্তব্য করে চলেছিলেন। তৎপর মাখোভিত্‌স্কি সেই সমস্ত মন্তব্য লিখে রেখেছেন।

সেই প্রয়াসে গড়ে উঠেছে, রুশ ও স্লোভাক

ভাষায়, টাইপ-করা ও হাতে লেখা ৭,০০০ পাতার একটি ডায়েরি। মাখোভিত্স্কি তার নাম দিয়েছিলেন—"তলস্তয়ের সঙ্গে, ১৯০৪-১০"। এখন সেই রোজনামচা 'ইয়াসনায়া পলিয়ানা নোটবুক' নামেই সবাই জানে।

লেনিন যাকে বলেছিলেন, 'প্রকাশ্য বৈপরীত্য', এবং তলস্তয়ের বাচন আর মননে যা ছিল অব্যবহিত—মাখোভিত্স্কি-র রোজনামচা সেই অনন্য চারিত্র ধরে রেখেছে। এই ডায়েরি কেবল ইয়াসনায়া পলিয়ানাতে তলস্তয়ের প্রতিদিনকার, কখনো কখনো প্রতিঘণ্টার বিবরণ, তাই নয়—তলস্তয়ের ব্যক্তিত্বের প্রতিসরণে এই রোজনামচা সেই সময়েরই দলিল হয়ে ওঠে। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে নামবার পর রাশিয়ার সংকটময় বছরগুলো, ১৯০৫ সালের প্রথম বিপ্লব, পরবর্তীকালের প্রতিবিপ্লবী আঘাত—তলস্তয় কোনো কিছুই বাদ দেন নি।

'ইয়াসনায়া পলিয়ানা নোটবুক' পৃথিবীর জটিলতম ও নির্ভীক সেই মানুষটির জীবনচর্চার অমূল্য আকর। রাশিয়ার এ. এম. গর্কি বিশ্বসাহিত্য সংসদ-এর 'সাহিত্যিক উত্তরাধিকার' (Literaturnoe Nasledstvo) মাখোভিত্স্কি-র এই রোজনামচার প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনায় হাত দিয়েছেন। সঙ্গে আছেন মস্কো-র এল. এন. তলস্তয় স্টেট মিউজিয়ম, প্রাগ-এর চার্লস বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রাতিস্লাভা-র স্লোভাক এ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর সাহিত্য শাখা।

মাখোভিত্স্কি-র এই রোজনামচা এখনও অপ্রকাশিত। তলস্তয়ের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত নির্বাচিত অংশের ইংরেজি অনুবাদ প্যারিস থেকে 'পরিচয়'-এর জন্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। সেই অংশের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হল।

১৯০৫

২০ জানুয়ারি

তলস্তয়: "অতীতে সাহিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল কুক্ষিগত সংগীতের মতো, যা কেবল অলস ধনীদের এক সীমিত অংশকে তুষ্ট করত। এখন তা শ্রমিকদের আওতার ভেতর এসেছে; জনসাধারণ যা চায়, তাকেই সাহিত্যের উপজীব্য করা উচিত। কিন্তু সেইরকম সাহিত্য এখনও অনুপস্থিত।"

৪ ফেব্রুয়ারি

তলস্তয়: "আমি গুরুত্ব দিয়েই বলছি, স্লাভ দেশগুলোতে যাও না কেন? ইতালি, রিভিয়েরা—এতো সব চেনা জগত। কিন্তু নতুন জায়গা, মানুষজন যারা বদলায় নি—তারাই তো কৌতূহলোদ্দীপক। আমি যদি 'তুমি' হতাম, তাহলে সেইসব জায়গায় যেতাম। দুশান পেত্রোভিচ (মাখোভিত স্কি)-র কাছে আমি সব ব্যাপারেই কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে উনি আমাদের স্লাভদের বিষয়ে যা শিক্ষা দেন সেই জন্যে। 'স্লাভোফিল'-রা[১] যারা নিজেদের আবিষ্কারের মূল্য দেয়, তাদের বাদ দিলে, আমরা রুশরা স্লাভদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না; তারা সংখ্যায় কত, তারা কেমন, কোথায় থাকে ইত্যাদি প্রশ্ন আমাদের করা উচিত।"

২৫ এপ্রিল

তলস্তয়: "ইউরোপের বাকি অংশের পেছনে আমরা ছেঁচড়ে চলেছি। আমরা কেন সামনে এগিয়ে যাই না আর দেখিয়ে দিই না কী করতে হবে?"

২৭ এপ্রিল

তলস্তয়: "আমি ভাগ্যবান এই জন্যে যে খুব অল্প বয়সেই আমার মানুষজনকে আমি ভালোবাসতে ও সম্মান করতে শুরু করি। আত্মিক দিক থেকে রুশরা পরিণত হচ্ছে। তারা এগিয়ে চলেছে, যদিও খুব মন্থর গতিতে। লোকজন অনেক কিছু জানে; তাদের কাছ থেকে শেখাটা আমাদেরই হাতে।"

৮ মে

তলস্তয়: দ্বিতীয় আলেকজান্দার নয়, "র‍্যাদিশচেভ, নভিকভ এবং ডিসেম্ব্রিস্ট-রা[২] যাঁরা কৃষকদের মুক্ত করেছেন। ডিসেম্ব্রিস্ট-রা[৩] নিজেদের আহুতি দিয়েছেন।

ডিসেম্বি্স্ট-দের সময় কৃষকদের প্রশ্নটা যেখানে ছিল, এই মুহূর্তে, জমি মুক্তির প্রশ্নটা সেই পর্যায়ে আছে।"

১৭ মে

তলস্তয়: "গেটে বলেন, তিনি কথা বলবার চাইতে চিন্তা করেন ভালো, লেখার চাইতে কথা বলেন ভালো, আর জনসাধারণের জন্য লেখার চাইতে নিজের জন্য লেখেন ভালো। আমার মনে হয়, আমার ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো: যখন আমি নিজের জন্য লিখি বা কথা বলি, তার চাইতে যখন ছাপবার জন্য লিখি তখন ঢের বেশি পরিষ্কার, অনেক সমৃদ্ধ লেখা হয়, প্রতিটি দৃষ্টিকোণ যত্ন করে লালন করি।"

১২ মে

(রুশ-জাপান) যুদ্ধের কোনো সাংস্কৃতিক প্রভাব থাকবে কি না প্রশ্ন করা হলে তলস্তয় জবাব দেন: "প্রবল, কিন্তু সংস্কৃতি-বিরোধী। ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে জারিত হতে একেবারেই বেশি সময় লাগে না—জাপানীদের দেখো। ইউরোপীয় সংস্কৃতির দেশগুলো তাদের মনে নেই—নিজেদের পণ্য বেচবার উপনিবেশের জন্য যুদ্ধ করছে। যুদ্ধসাজে সাজিয়ে চলছে নিজেদের সব সময়। প্রথমে এটা তাদের জাহাজে এক মিটারের একটা বর্ম, তারপর দেড়, দুই মিটার, আড়াই। একদল পুরুষদের জড়ো করছে, আরেক দল মেয়েদেরও ডাকছে সেই সঙ্গে। তাদের সমস্ত চিন্তা আর শক্তি ধ্বংসের দিকে ধাবিত। এটা কি পাগলামি নয়? সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব—প্রকৃত সংস্কৃতি হল এদের নিয়েই।"

২৭ মে

তলস্তয়: "আমার মনে হয় যে রুশ লোকেরা তাদের নৈতিক বিচক্ষণতা হারিয়ে ফেলেছে। তবুও আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। তাদের নিজেদের ধর্ম আছে, নিজেদের দর্শন, নিজেদের শিল্প আছে।" ভ্লাদিমির গ্রিগোরিয়েভিচ (শেরৎ-কোভ) (৩): "জনসাধারণের জন্য আপনি যা লিখেছেন, এক অর্থে সেটা তাদের সম্পদ; কিন্তু তারা সেটা কি সত্যিই বুঝতে পারে?"

তলস্তয়: "না। তারা কেবল বোঝে যা আমি তাদের কাছ থেকে ধার করেছি—তাদের গাথা—আর তাদের ফিরিয়ে দিয়েছি। যা তাদের দরকার রুশ বুদ্ধিজীবীরা তা দিচ্ছে না। ইংল্যাণ্ডের লোকদের যা ছিল ডিকেন্স তার শ্রেষ্ঠ অংশ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। পশ্চিমে, বুদ্ধিজীবীরা লোকজনদের

নিয়ে হাসিঠাট্টা করে, তাদের কথা বলবার ধরনকে ঘৃণা করে ; আমাদের দেশে লোকেরাই আমাদের শেখায় কি করে কথা বলতে হয় ; এবং নিজেদের বাচনের ভেতর দিয়েই তারা আত্মপ্রকাশ করে। আমি জনসাধারণের ভেতর থেকে এসেছি—আমার বিশ্বাস করতে ভালো লাগে আমি জনসাধারণের ভেতর থেকে এসেছি—এবং তাদের জন্য. তাদের নিজস্ব মেজাজে আমি লিখবার চেষ্টা করি।"

১৯০৬

তাঁর স্বর বুজে আসছিল আবেগে, প্রায় অশ্রুসিক্ত—তলস্তয় বলছিলেন : "আমি কি করে নৈতিক মানুষ হতে পারি—আমি অন্যদের এড়িয়ে বাঁচছি ? মুজিক-রা (চাষী) আমাকে শিখিয়েছে কি করে বাঁচতে হয়। নৈতিকতা একমাত্র কায়িক শ্রম আর সরল জীবনযাপনের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু যখন আমি তা শিখলাম, তখন আমার গঙ্গাযাত্রার সময়।"

২৮ জানুয়ারি

শ্লাভেতর জনগণের জাতীয় ভাষার সঙ্গে সংযোগ এবং মাতৃভাষার প্রতি তাদের প্রবল গুরুত্ব আরোপের বিষয়ে তলস্তয় বললেন, "আমরা রুশরা খুব ভাগ্যবান। অন্য কেউ আমাদের দাবিয়ে রাখছে না ; এসব ব্যাপারে আমাদের আলোচনারও প্রয়োজন নেই। অন্য কারও জোয়াল যখন তোমার কাঁধে থাকবে না, এসব বিষয়ে আলোচনা তখনই খুব সহজ হয়ে আসে।"

১১ ফেব্রুয়ারি

আমরা সংগীত নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তলস্তয় বললেন, সংগীত বিশ্বাস ও আশার প্রেরণা জোগায়। সংগীতকে তার আপন চারিত্রে ছেড়ে দেওয়া উচিত, নাট্য বা কবিতার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা উচিত নয়। শিল্পের চরমতম নির্মাণ হল সংগীত। সবচেয়ে রহস্যময় এবং ব্যাখ্যার অতীত।"

১৩ ফেব্রুয়ারি

তলস্তয় : "সঙ্গত একটা জীবনযাপন করতে মানুষের সামনে কত প্রতিবন্ধক। যেমন বর্ণবৈষম্য, শাসনতন্ত্র আর ধর্ম।"

২৮ মার্চ

তলস্তয় : "এই মুহূর্তে, আমি কৃষকদের সম্পর্কে গভীর সমীক্ষা করছি। কিন্তু ইতিহাসের পুঁথিগুলো আমাদের কোন তথ্য জানায় ? কিছুই নয় প্রায়,

যা ব্যবহারে লাগতে পারে। সমগ্র ইতিহাসের ভেতর দিয়ে আমি পেরিয়ে আসছি, শুধু, আমার প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য পাব বলে। অন্তত আজ আমরা জেনেছি, শ্রমিকরাই জনসাধারণ আর আমাদের খাদ্যসম্ভার তাদের শ্রমের ওপরেই টি'কে আছে। অতীতের ইতিবৃত্ত সাধারণ মানুষের কথা বলে না; সেখানে শুধু জার আর অভিজাত সম্প্রদায় আর যুদ্ধবাজ মানুষ আর বণিক।"

১ মে

"আমি দুমা[৪]-র কথা ভাবছিলাম", তলস্তয় আমাকে বললেন, "ভবিষ্যতে এটা কি দাঁড়াবে জানতে আমি উৎসুক। খুব সম্ভবত, রোমানোভদের অপসারণ এবং প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা। দিন পনেরো আগে তুলা-র এক যুবক শ্রমিক জাসেকা অরণ্যে একটি সমাবেশের কথা বলছিল। রাজ্যান্তরের দুমা যথেষ্ট নয়। জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত হল সমাজতন্ত্র।"

৭ মে

শিলার-এর কিছু লেখা, গেটের ছোট কবিতাগুলো এবং তাঁর 'ফাউস্ট'-এর ভূমিকার প্রশংসা করছিলেন তলস্তয়। কিন্তু তিনি বললেন 'ফাউস্ট'-এর দ্বিতীয় অংশটি অর্থহীন এবং তিনি তার এক বর্ণও বোঝেন নি। যদিও রচনাকালে গেটে তাঁর মতোই বয়স্ক হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বললেন, নিজের বৃদ্ধ বয়সে তিনি স্পষ্টতা ও সরলতাকে মূল্য দেন বেশি করে। দুর্জ্ঞেয়তা থেকে তিনি সরে এসেছেন।

১৮ মে

তলস্তয়: "পুরোনো ব্যবস্থা বিদায় নেবার মুখে। আর সেই সঙ্গে চলে যাচ্ছে রুশীদের জাড্য ও সহ্য।"

২১ মে

[একটি সাংগীতিক সন্ধ্যা]...সংগীত ও নৃত্যের দিকে হাসতে হাসতে, এক গ্লাস লেবুর জল পান করে, সাড়ে এগারোটা নাগাদ, তলস্তয় নিজের ঘরে চলে গেলেন। যখন কোনো নতুন নৃত্যছন্দ তাঁর কানে যাচ্ছে, তিনি বেরিয়ে আসছেন দেখবার জন্য। স্পষ্টতই উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি গানে যোগ দিলেন। তিনি একবার আমায় বলেছিলেন, লেখক না-হলে, তিনি নৃত্যশিল্পী হতেন।

১৩ আগস্ট

একদল হা-ঘরে বিপ্লবী সেই অঞ্চল দিয়ে পেরুচ্ছিল। তলস্তয় আজ সকালে তাদের সঙ্গে আলোচনার কথা বলছিলেন আমায়। "এইসব জোয়ান ছোকরা-গুলো সংবাদ পত্রের চাইতে অনেক বেশি খবর রাখে", তিনি বললেন। "তাদের সঙ্গে কথা বললে উপকার হয়। বিপ্লবীদের সব দাবিদাওয়াগুলোর সামনে সরকারকে নতি স্বীকার করতেই হবে—এটা এখন আমার কাছে পরিষ্কার। কালবিলম্ব না করে আর-একটি নতুন দুমা আহ্বান করা দরকার। বর্তমান অবস্থার আর অবনতি হতে দেওয়া যায় না। জনগণ উত্তাল আর সরকার কেবলই তাদের সংযত করার চেষ্টা করছেন। বিপ্লবীদের ভেতর থেকে এক নতুন সরকারের জন্ম হবে। (বিপ্লব কোথায় নিয়ে যাবে তা সম্পূর্ণ অজানা) বর্তমান সরকার যদি পাপ থেকে নিজেদের উদ্ধার ও পরিচ্ছন্ন করে, তাহলেই একমাত্র টি'কতে পারে।

২১ সেপ্টেম্বর

তলস্তয়: "শিক্ষা প্রসার আর পুস্তক প্রচারের দিক থেকে বিপ্লব অনেক মঙ্গল-সাধন করেছে।"

১৭ অক্টোবর

তলস্তয়: "হারজেন—এই একজন লেখক, রুশ পাঠকদের কাছ থেকে দীর্ঘদিন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এঁকে। এখন তিনি আবার আত্মপ্রকাশ করেছেন। একজন বুদ্ধিমান তদ্‌গত মানুষ কী করে প্রগতিশীল হয়ে ওঠেন, হারজেন তার এক উদাহরণ। তিনি পশ্চিমে গেলেন, ভাবলেন সেখানে পরিপাটি জীবন যাপন করা যাবে। কিন্তু বিপ্লবের সময় তিনি যা দেখলেন তাতে পশ্চিমী ব্যবস্থার প্রতি তাঁর মোহভঙ্গ হল এবং তিনি তাঁর সমস্ত আশা ও ভালবাসা ঢেলে দিলেন রুশীদের। ঠিক হোক বা ভুল হোক, সেখানেই তাঁর আস্থা নিহিত ছিল। রুশ রাজনীতিকদের তিনি উদাহরণস্বরূপ। পশ্চিমী ধাঁচে আকৃষ্ট হয়ে একই ভুল করবার হাত থেকে তিনি তাঁদের রক্ষা করতে পারেন।

"ফরাসী বিপ্লবের মতো আমাদের নিজেদের বিপ্লবও একই ফল দিক মানুষ তাই চায়। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত—যদি তা হয়ও, কোনো লাভ তাতে হবে না। আরও বৃহৎ, গভীর চৈতন্যের আলোড়ন, একটা ধর্মীয় জাগরণের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। যে-সব

বীভৎস ঘটনা ঘটছে, মনে হয়, তা মানুষকে তার স্বভাবে ফিরিয়ে আনবে, তাদের হুঁশ হবে যেভাবে তারা বাঁচছে, তা চলতে পারে না। কিন্তু ক্যাডেটদের* পরিকল্পনায় তা হবে না। সম্পূর্ণ নতুন কিছু দরকার।'

১৯০৭

১৯ জানুয়ারি

তলস্তয়: "কোনো জিনিসের ভালো দিক মন্দ দিক মিশিয়ে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করবার ব্যাপারটাই হল শিল্পীর পরীক্ষা আর সেখানেই শিল্প হয়ে ওঠে কঠিন।"

১৪ ফেব্রুয়ারি

তলস্তয়: "তোমার কথা যখন নৈঃশব্দ্যের চাইতেও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে—জনসমক্ষে কথা বলবার সেইটেই প্রকৃত লগ্ন।"

২৭ ফেব্রুয়ারি

তলস্তয়: "ভালো একটি মেয়ে শ্রেষ্ঠতম পুরুষের চাইতে ভালো। কিন্তু খারাপ একটি মেয়ে অধম পুরুষেরও অধম।"

৪ মার্চ

তলস্তয়: "ইংরেজ আর আমেরিকানদের ছাড়িয়ে গেছে জাপানীরা। কয়েক বছরের ভেতরেই তারা পশ্চিমী সভ্যতার ফাঁক-ফোঁকর জেনে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা এগিয়েও গেছে। এতেই বোঝা যায়, পশ্চিমী সভ্যতা ধাতস্থ করা কত সহজ।"

২১ মার্চ

তলস্তয়: "তুর্গেনিভ-এর মতো সূক্ষ্মতাপ্রবণ দস্তয়েভস্কি নয়। সে গম্ভীর। অনেক কিছুর ভেতর দিয়ে এসেছে সে; দীর্ঘকাল কেটে গেছে তার এই সব ভাবনা চিন্তায়। এবং সে জানে, দেখানেপনা কীভাবে সংবরণ করতে হয়।"

৯ এপ্রিল

তলস্তয় বললেন—লোকে যখন তাঁর সৃষ্টিকে উর্বর বলে, তিনি তৃপ্ত হন। যদিও সেটা তাঁর পক্ষে উচিত নয়। "মোসেন কানান্ পৌঁছতে পারেন নি—এরকমই হয়।"

১৫ এপ্রিল

তলস্তয় একবার বলেছিলেন, সমস্ত চিন্তারই একটা নিজস্ব আলোকবলয় আছে—ঔজ্জ্বল্যের একটা বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছে ক্রমে ঝাপসা হয়ে যায়। যখন তা চরমতম বিন্দুতে পৌঁছয়, তখনই সাহিত্য রচনার লগ্ন। তিনি সেরকমই করেন। হাতের কাছে সব সময় নোটবুক তৈরি থাকে—দিনে তাঁর পকেটে, রাতে তাঁর বিছানার পাশে টেবিলে। একই রাতে অন্তত বার ছয়েক ঘুম ভেঙে যায়, বিছানা ছেড়ে ওঠেন, মোমবাতি জ্বালেন আর মাথার ভেতর ঝেঁপে আসা ভাবনা টুকে রাখেন। এতে তাঁর কিছু মনে হয় না।

২৫ এপ্রিল

তলস্তয়: "চীনদেশের এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—কোনো একটিমাত্র শব্দ কী আছে যাতে মানবজাতির সুখের সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্রকাশ করা যায়। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, শব্দটি হচ্ছে 'শু' (Shu), যার অর্থ হল: নিজের প্রতি যে কাজ তুমি করবে না, অন্যের প্রতিও সে কাজ করো না।"

২৬ এপ্রিল

আজ সকালে মোৎসার্টের একটি সোনাটা জি. এবং এস. বাজাচ্ছিলেন। কিছু অসামান্য সুরবাহার ছিল। তারপর শুবার্ট এবং অন্তিমে বিঠোভেনের ক্রুৎসার সোনাটা। খুব ঠাণ্ডাভাবে সহজভাবে বাজাচ্ছিলেন তাঁরা। আজ রাত্রে জি. আর. এস. বাজাবেন না। উত্তেজনাহীন বাদন ছিল তাঁদের, মঞ্চের চাইতে ভালো। তলস্তয় খুশিতে হাসছিলেন; দু-একবার হাততালিও দিয়েছেন। মোৎসার্টের সুরবৈচিত্র্য তাঁর খুব ভালো লেগেছে; কিন্তু সবচাইতে ভালো, বিঠোভেন। পরে তিনি বললেন, ক্রুৎসার সোনাটার এতো ভালো বাদন এর আগে কখনও শোনেন নি। তিনি বললেন, প্রথম অংশটা শুদ্ধ বিঠোভেন ঠাটে হয়েছে—রাজকীয়, গভীর, বিষাদলগ্ন, সুরময়। দ্বিতীয় অংশটি শ্রুতিমধুর সরলতায় ভরা, অনেকটা মোৎসার্টের ঠাটে। পরে তিনি বললেন, হোমার, 'আরব্যরজনী' ও কিছু কিছু রুশ লোকগাথার শিল্পময় বিবরণ তিনি জানেন ও শ্রদ্ধা করেন।

২৮ এপ্রিল

স্কুলের ছেলেমেয়েদের সামনে পড়ার জন্য ভিক্তর উগো-র 'লা মিসারেবল'-এর

যে দৃশ্যে জাঁ ভালজাঁ (Jean Valjean) বিশপের সঙ্গে দেখা করছে, তলস্তয় সেইটে চাইলেন।[৭] বললেন "আমি এটা পড়তে পারি না। এটা আমাকে গভীর নাড়া দেয়। গল্পটা আমার বুকের শেকড় ধরে টানে—আমি পড়তে পারি না।"

১৭ মে

তলস্তয়: "আশি বছরের বুড়ো আমি—এখন স্কুলের ছেলের কাছে শিখছি ছোট বাক্য কী ভাবে লিখতে হয়।"

২২ মে

তলস্তয়: "আমি খ্রীষ্টকে এপিকটেটাস [স্টোইক দার্শনিক] শ্রেণীর মানুষের মতো মনে করি।'

১০ জুন

তলস্তয় বললেন, যুবক হবার চাইতে বৃদ্ধ হওয়া অনেক ভালো। তাঁর বয়স আশি—এখনই কেবলমাত্র শান্তিতে জীবনযাপন করতে শুরু করেছেন। প্রতি বছরই সমস্ত আনন্দময় হয়ে উঠছে। যৌবন হল উত্তেজনা, আত্ম-ধিক্কার, দ্বেষ, কামনার কাল। পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সব মিলিয়ে যায়।

টেবিলের মোমবাতির দিকে নির্দেশ করে বললেন, "এটা নিজের স্ব-ভাবেই জ্বলছে। বিনা আয়াসে। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই—নিজেদের প্রাজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক তারা আত্মমহিমায় দীপ্ত করে তোলে। সব এমনভাবে বিন্যস্ত যে, মানুষ যা নিজের জন্য করে, অপরের জন্যও তা করে থাকে।"

রাত্রিকাল কাব্যচর্চার প্রকৃত সময় কী না জানতে চাওয়া হলে তিনি উত্তর দেন "না। কাব্যচর্চা প্রবলতম সৃষ্টিপ্রক্রিয়া।"

২৪ জুন

চায়ের সময় ছাদে বসে দস্তয়েভস্কি-কে নিয়ে কথা হচ্ছিল। তলস্তয় তেইন (Taine)-এর একটি উক্তি স্মরণ করলেন—দস্তয়েভস্কি পৃথিবীর অনবদ্য লেখক। তিনি নিজে দুঃখ করলেন, নিজের লেখার সংশোধন না করে দস্তয়েভস্কি বড় তড়িঘড়ি কাজ করে ফেলেছেন। তাঁর উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়টিই শ্রেষ্ঠ, গোটা প্রেক্ষিতটাই ধরা থাকে। বাকি অংশগুলো জোলো।

এস. বললেন—সব ক্ষেত্রেই তা সত্যি নয়। অন্তত: তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ব্রাদার্স কারামাজোভ'-এর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

তলস্তয় ব্যঙ্গ করে উত্তর দিলেন যে 'ব্রাদার্স কারামাজোভ' দস্তয়েভস্কির সব চাইতে কাঁচা লেখা। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট' এবং এর প্রথম অধ্যায়টি অতুলনীয়। তলস্তয় বলে চললেন, দস্তয়েভস্কি-র প্রতি তাঁর অভিযোগ—'অবক্ষয়ের' লেখকদের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তিনিই। দস্তয়েভস্কি একজন সংবেদনশীল মানুষ, অন্তরঙ্গ নানা বিষয় নিয়ে তিনি লিখে গেছেন; কিন্তু উত্তরকালের অবক্ষয়বাদী লেখকরা অসৎ।

২৫ জুন

স্কুলের ব্যাপারে কথা বলতে বলতে তলস্তয় জানালেন—গতকাল তিনি বাচ্চাদের কাছে দর্শনের কিছু টুকরো টাকরা বিষয়ে গৌরচন্দ্রিকা করেছেন। ব্যাখ্যার সময় উদাহরণ হিশেবে বলেছেন—ডাল থেকে একটি পাতা ছিঁড়লে তা যেমন সম্পূর্ণ বৃক্ষ থেকে ছিন্ন হয়ে পড়ে, একজন ক্রুদ্ধ লোকও তেমনি কেবল তার রাগের উপলক্ষ থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে, তাই নয়, সবার থেকেই বিযুক্ত হয় সে।

২৬ জুন

তুলা নদীর অপর পারে কোজোলোভকার স্কুলগুলো থেকে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা তাদের শিক্ষকদের সঙ্গে সকাল দশটার সময় এসে উপস্থিত। আমরা আশা করেছিলাম ৩৫০ জন মতো—এসেছিল ৮১০ জন।

তলস্তয় ছেলেদের ভোরোংকা নদীর ধারে স্নানের জন্য নিয়ে গেলেন আর তাদের সঙ্গে খেলাধূলো, ব্যায়াম ও কুস্তিতে সমান তাল দিলেন।

২৭ জুন

'ঠাকুরদা' ইসলেনিয়েভ সম্পর্কে তলস্তয় বলছিলেন। আত্মীয়দের সম্পর্কে তিনি কত দরাজ আলোচনা করেন! তলস্তয়দের প্রায় কোনো পারিবারিক গোপনতা নেই-ই; তাঁরা বন্ধুদের কাছেও কিছু লুকোন না; এমন কি বাড়ির কাজের লোকদের কাছ থেকেও না! তাঁদের দোষত্রুটিকে ইঙ্গিত করবার বদলে, তাঁদের নিয়ে এমন ভঙ্গিতে নির্লিপ্ত আলোচনা করেন যে মনে হয়—অনাত্মীয় কাউকে নিয়ে কথা হচ্ছে।

২৭ অগাস্ট

দুজন লোক গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপন করতে কোজলোভকা-জাসেকা-ডে

এসেছে। (জেলার প্রথম) মোটরগাড়ি চড়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয় পেয়েছে ঘোড়াগুলো। এই বিষয়ে চায়ের সময় কথা হচ্ছিল।

তলস্তয়: "বর্তমান সভ্যতা—পার্থিব অগ্রগতি, নৈতিক নয়—যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে খুব ভরসা হয় না। মানব-কল্যাণই যদি ঈপ্সিত উদ্দেশ্য হয়, তবে কোনো মোটরগাড়ি থাকত না। শৈশব থেকে একটা ঘোড়াকে বড় করে তোলা, তাকে শেখানো, এ-সবের প্রচুর আনন্দ আছে। কিন্তু নৈতিক অগ্রগতি যখন আসবে, আমাদের জীবনযাপন—এই মোটরগাড়ি, ঘোড়া ইত্যাদি বাকি যা আছে—সব বদলে যাবে। নৈতিক আর পার্থিব অগ্রগতি বর্তমানে একসঙ্গে হওয়া উচিত। যখন সেটা হবে—সমস্ত কিছু বাস্তবিক বদলে যাবে। কীভাবে? বলা অসম্ভব।"

২ সেপ্টেম্বর

কৃষক নভিকভ-এর কাছ থেকে পাওয়া চিঠির কথা বলছিলেন তলস্তয়। জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিষয়ে সচেতনতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা থেকে। শেবুৎকভদের ওখানকার সমাবেশ থেকে উনি বুঝতে পেরেছেন—গোটা কৃষকগোষ্ঠীতেই এই সচেতনতার উন্মেষ হচ্ছে।

"এর ব্যতিক্রম কি করেই বা হবে?' তিনি বলে চললেন—'ইয়াসনায়া পলিয়ানার এক কৃষক, এরমিলিন,—চারছেলে, সবারই সুন্দরী বৌ। সেই জোতে পাঁচটা তিন-ঘোড়ার দল ছিল। ছেলেরা সব সম্পত্তি নিজেদের ভেতর ভাগ করে নিল। তাদের বৌদের বাচ্চা হল, তারা আবার সম্পত্তি ভাগ করল। জোত ক্রমশ ছোট হতে লাগল। যত ভাড়া করা লোক ছিল, একজন বাদে সব গেল। পরিবারের পুরোনো ভিতে চিড় খেল, সেই ভগ্নদশা ভরবার মতো কিছু আর রইল না। তিরিশ বছর আগে কেউ ভাবতে পারত যে, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা হেরে যাব, নভিকভ-এর মতো একজন কৃষক ব্যাকরণের একটিও ভুল না করে, মার্ক্সকে উদ্ধৃত করে (প্রসঙ্গক্রমে, জ্ঞান দেখাবার জন্য নয়) এমন দক্ষ চিঠি লিখবে?"

৭ সেপ্টেম্বর

তলস্তয়: "বেশি পালিশ করলে জিনিসেরই ক্ষতি। ভাবনা কতদূর প্রকাশ করা যায় তার একটা সীমা আছে। তোমার মনে কোনো নতুন, কৌতূহলোদ্দীপক ভাবনা আসতে পারে। তারপর, যত তাকে তুমি নিটোল করতে চাইবে, তত সেটা তার নতুনত্ব আর আকর্ষণীক্ষমতা হারাবে। যে তাজা ভাব নিয়ে প্রথমে তা

তোমার মনে এসেছিল, তা হারিয়ে হবে। এক কথায়, তাকে নষ্ট করা হলো।

১২ সেপ্টেম্বর

তলস্তয় বললেন, বর্তমানই হল প্রেমের সময়। কিন্তু এগোবার জন্য মানুষ এত ব্যস্ত যে কথাটা তাদের মনে থাকে না।

১৮ সেপ্টেম্বর

তলস্তয়: "কাউকে প্রভাবিত করতে চাওয়াটা ভালো নয়। একজন প্রকৃত শিল্পী তার প্রয়োজন অনুযায়ী লিখে চলে। ফল কি হল, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু প্রলোভনটা থেকেই যায়। অন্যকে প্রভাবিত করা যায়—এই ভাবনাটাই প্লেগের মতো এড়িয়ে চলা উচিত।"

২৫ সেপ্টেম্বর

"শিল্পের ক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কোনটা?" তলস্তয় জিজ্ঞাসা করলেন, "একাগ্রতা? সততা?" তিনি নিজেই উত্তর দিলেন—"শিল্পে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল পরিমিতিবোধ।"

৮ অক্টোবর

তলস্তয় বললেন—যারা ভাবে অতীতের ধাঁচেই জীবন কাটিয়ে যাবে তাদের চাইতে এবং সমস্ত রকম রক্ষণশীল লোকদের চাইতে বিপ্লবীরা স্বভাবতই শ্রেয়। পুরনো কাঠামো চলতে পারে না। তিনি বললেন, ব্যক্তির মতো মানব জাতিও বড় হয়ে ওঠে। ঘড়ির কাঁটাকে উল্টো দিকে ঘোরানো অসম্ভব।

২০ ডিসেম্বর

তলস্তয়: "শিশুদের জন্য আমার 'সাইকল্ অব রিডিং'-এ, আমি জীবজন্তুদের ভালোবাসবার ব্যাপারে কিছু লিখেছি। শিশুদের পক্ষে, একদিকে যেমন পশুদের ভালোবাসাটা স্বাভাবিক, অন্যদিকে তাদের উত্যক্ত করতেও ছাড়ে না। ওদের ভালোবাসবার দিকে নিয়ে যাওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯০৮

৫ জানুয়ারি

এইচ. এ. রটিয়েছেন যে তলস্তয় দান্তেকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন।

তলস্তয়: "শিল্প বলতে আমি যা আশা করি—রাফায়েল, বিঠোভেন, শেক্সপিয়র, দান্তে, গেটে—কেউই তা পূরণ করেন না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা আমার অত্যন্ত প্রিয়। এটা স্বীকার করতে আমার লজ্জাবোধ হয়।"

২৫

তলস্তয়: "যে কোনো কৃষকের সঙ্গেই কথা বলতে যাও না কেন, তারা এক কথা বলবে: বর্তমান জমি-বণ্টন অন্যায়। আমি বুঝতে পারছি, মানুষের ভেতর বড় একটা পরিবর্তন আসছে। একটা পরিব্যাপ্ত অসন্তোষ বিরাজ করছে।"

১৭ মে

বিপ্লবীদের বিষয়ে আলোচনার সময় তলস্তয় বললেন, একটা নির্দিষ্ট ব্যাপারে তারা খুব বোকা: তারা বলে, 'আমার পার্টি সব ঠিক করে দেবে।' কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিক, অনাচার তাদের একরোখা করেছে।

৫ জুন

গতকাল সারা সন্ধেবেলা বিবেকানন্দ পড়তে পড়তে কেটে গেছে। তলস্তয় বললেন: "একটি অধ্যায় আছে প্রকৃত ক্ষমতার প্রমাণ—সেখানে পাপের অপ্রতিরোধকে সমর্থন করা হয়েছে।" তলস্তয় আরও বললেন, তিনি পুশকিনের জীবনী এবং কিছু কবিতা পড়ছিলেন। "কী দুর্ভাগ্য যে পুশকিন ও লারমনতোভের মতো অসামান্য প্রতিভাবান পুরুষ—যাঁদের মতো মানুষ প্রতি শতাব্দীতে জন্মায় না—তাঁরা দুজনেই ডুয়েলে মারা গেছেন।" পরে, তিনি বললেন, তিনি পুশকিনের গদ্যই পছন্দ করেন বেশি।

২১ জুন

তলস্তয়: "কোনো কিছু যদি এখনও আমাকে ভয়চকিত করে, তা হল একটি ভাবনা—বস্তিতে না জন্মিয়ে রাজপ্রাসাদে জন্মানোর ভয়। জীবন হল একটি মুক্তি প্রক্রিয়া—অপরিহার্য আত্মিক মৌলিক সত্যকে মুক্ত করা—বন্দী পাখির মতো যা সবার ভেতরই বিরাজমান। আমাদের প্রাণশক্তি সেইদিকেই চালিত করতে হবে—পরলোক বা আত্মার ভবিষ্যত পরিণতি চিন্তায় নয়। আত্মার মুক্তিই হল প্রধান; দেখবে, সব জায়গায় এই একই কথা বলা আছে।"

১ জুলাই

কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ না করলেও তলস্তয় এই সম্ভাবনাকেও বাতিল

করেন নি, যে, একদিন, সমগ্র মানব প্রজাতির এক সাধারণ ভাষা হবে। তাঁর কথায় এই ধারণা হল যে সেটা আন্তর্দেশীয় শান্তি ও সমঝোতার দিকে একটি পদক্ষেপ হবে।

১৯০৯

১৪ জুন

তলস্তয়: "বিবেকের মুক্তি…স্বাধীনতাহীন বিবেক দহনহীন শিখার মতোই অচিন্ত্যনীয়।"

২৭ জুন

তলস্তয়: "আমি প্রুগাভিন-এর [একজন রুশ সাংবাদিক] এই বাক্যটা পড়ছিলাম: 'বিপ্লবের ঝড় যখন রাশিয়ার ওপর দিয়ে বয়ে গেল'…ওঃ, হ্যাঁ, ঝড়টা বয়েই গেছে। অন্তত বাইরের চেহারা তো তাই বলে। স্থিতাবস্থা আরও জোরদার হয়েছে, বেশ দীর্ঘমেয়াদেই। ঠিক ফরাসী বিপ্লবের পর যা হয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়—ঘটনা সংঘাত লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে দাগ কেটে গেছে। আমি এখনও কৃষকদের কাছ থেকে চিঠি পাই। তারা জানতে চায় 'আশা করবার মতো কিছু কি হবে?' তারা এখনও কিছু একটার জন্য আশা নিয়ে অপেক্ষমান।"

৮ অগাস্ট

তলস্তয়: "একজন মানুষের বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অতীত বা ভবিষ্যত কী বিস্ময়করভাবে গৌণ হয়ে যায়। বর্তমানের জন্যেই একজন মানুষের বেঁচে-থাকা।'

২১ অগাস্ট

তলস্তয়: "আমি যদি মানুষের সৃষ্টিকর্তা হতাম, তাহলে এমন ব্যবস্থা করতাম যাতে মানুষ বৃদ্ধ হয়ে জন্মিয়ে ক্রমাগত যুবক হয়ে ওঠে। শিশুদের যে চারিত্র আমাদের স্পর্শ করে তা হল সরলতা, অকপট সততা। এর ভেতর প্রধান—সততা।"

২৫ অক্টোবর

তলস্তয়: "আমি বার্নার্ড শ-তে আগ্রহী। তিনি খুব রসিক এবং মৌলিক। শ্রেষ্ঠ আধুনিক লেখকদের একজন।"

১৯১০

১৩ জানুয়ারি

তলস্তয় : "তিনজন লেখককে আমি জানি—পুশকিন, গোগল এবং দস্তয়েভস্কি—নৈতিক প্রশ্ন যাদের কাছে প্রধান। আমি এইরকম লেখকদের কথা ভাবছিলাম। পুশকিন অল্প বয়সে মারা গেলেও গভীরভাবে এসব বিষয়ে অনেক ভেবেছেন। লারমনতোভ-ও অল্প বয়সে মারা গেছেন। নৈতিক প্রশ্নের সমস্যায় তিনিও সচেতন ছিলেন।"

২২ এপ্রিল

তলস্তয় জানালেন—তিনি সিনেম্যাটোগ্রাফের ওপর লিখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২৯ জুলাই

তলস্তয় : "চার্চ যেভাবে খ্রীস্টধর্ম শিখিয়েছে—সেরকম ব্যর্থতা আর হয় নি। ইউরোপীয়রা তাদের উপনিবেশগুলোতে যে-রকম ব্যবহার করছে, তা থেকেও এই বিশ্বাস হয়।"

২৬ অগাস্ট

তলস্তয় : "তারা যে-সব জিনিস ব্যবহার করে সেগুলো কি করে তৈরি হয় তা শিশুদের বোঝাতে 'রবিনসন ক্রুসো'-র মতো শিক্ষাদানের বই আর নেই। গল্পটি খুব সুন্দর।"

২৩ সেপ্টেম্বর

তলস্তয় অশ্বারোহণে গিয়েছেন। কী খাড়াই ঢাল বেয়ে তিনি দ্রুতগতিতে পেরিয়ে যান, কী বিপজ্জনক জায়গার ভেতর দিয়ে, আধপচা সাঁকো টপকিয়ে, খাড়া পাহাড়ের ধার ঘেঁষে তিনি চলেন। নতুন গাছের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সোজা ঘোড়া চালিয়ে দেন তিনি। ঝুঁকে, নোয়ানো ডালের পাশ কাটান। হঠাৎ তাঁর ঘোড়া থমকে যায়। কিন্তু দ্রুতগতি আর কদমচাল তাঁর থামে না। আমি খুব ভারি নই, অশ্বারোহণ আমিও পছন্দ করি। আমার সময়ে প্রচুর ব্যায়ামও করেছি। আমার ৪৩, আর তলস্তয়ের ৮২। কিন্তু তলস্তয়ের মতো কসরৎ দেখানো আমার পক্ষে কঠিন। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি না। আমি আর আমার ঘোড়ার ঘাড় ভাঙবার দশা। কী ঘোড়সওয়ার!

৬ অক্টোবর

তলস্তয় : "পুষ্টি, যন্ত্রণা এবং শিক্ষা—কাজ থেকে মানুষ এগুলো পায়।"

১১ অক্টোবর

মাদাম তলস্তয় আমাকে বলেছিলেন—১৮৯৫ সালে ভানেচ্‌কা৮ যখন মারা যায়, তলস্তয় সোফায় এলিয়ে পড়ে বলেছিলেন, "কি এক আশাহীন সময় জান—আমি ভেবেছিলাম, আমার সন্তানদের ভেতর ওই একমাত্র উত্তরকালে আমার কাজ চালিয়ে যেতে পারত।"

২৫ অক্টোবর

পুস্তক-প্রকাশের ক্রমবর্ধমান হারের কথা বলছিলেন তলস্তয়। তিনি জানালেন, হিসেব করে দেখা গেছে শিশুজন্ম বর্তমান হারে যদি চলতে থাকে, তবে কিছুদিনের ভেতরেই মানুষকে কাঁধে কাঁধে দাঁড়াতে হবে পৃথিবীতে। তেমনি এত বই যদি ছাপা হতে থাকে, তাহলে শীঘ্রই এক আকাশছোঁয়া স্তূপ হয়ে উঠবে। তাই শ্রেষ্ঠটিই নির্বাচিত করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

১. উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে রুশ রাজনৈতিক মানস দুটো মেরুতে ভাগ হয়ে যায়। পশ্চিমী পন্থীরা—পশ্চিমী সভ্যতার ধাঁচে তাঁরা রাশিয়াকে গড়বার কথা ভাবতেন। শ্লাভোফিল—শ্লাভ সভ্যতার প্রগতিই রাশিয়ার একমাত্র আশা বলে তাঁরা মনে করতেন।

২. আলেকজান্দার র‍্যাদিশচেভ (১৭৪৯-১৮০২) এবং নিকোলাই নভিকভ (১৭৪৪-১৮১৮)—দাসপ্রথা নিরসনের আওয়াজ এই দুই রুশ সাহিত্যিকই প্রথম তোলেন। জার প্রথম নিকোলাসের বিরুদ্ধে ১৮২৫-এর এক অসফল অভ্যুত্থান করেন 'ডিসেমব্রিস্ট'-রা। পাঁচজন নেতার ফাঁসি হয়, ১২০ জনকে সাইবেরিয়ার নির্বাসনে পাঠানো হয়।

৩. ভ্লাদিমির শের্ৎকভ (১৮৫৪-১৯৩৬) তলস্তয়ের নিকট বন্ধু ও তাঁর প্রকাশক।

৪. ১৯০৫-এর বিপ্লবের পর নির্বাচিত জাতীয় সভা।

৫. আলেকজান্দার হারজেন (১৮১২-১৮৭০) রুশ লেখক ও বিপ্লবী। তিনি ১৮৪৭ থেকে আমৃত্যু পশ্চিম ইউরোপে রাজনৈতিক নির্বাসনে ছিলেন। ১৮৪৮ সালের বৈপ্লবিক ঘটনাপ্রবাহের তিনি সাক্ষী। ১৯০৫-১৯০৭ এর বিপ্লবের আগে তাঁর লেখা রাশিয়ায় নিষিদ্ধ থাকলেও অবৈধভাবে তা প্রচারিত হত।

৬. সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক দল।

৭. বহু বছর আগে, ইয়াসনায়া পলিয়ানার কৃষক সন্তানদের জন্য স্কুল করেন।

৮. তলস্তয়ের ছোট ছেলে, হামজ্বরে মারা যায় মাত্র সাত বছর বয়সে।

৩

চীনদেশের রাজনীতি ও ভিয়েতনাম

শিবানীকিঙ্কর চৌবে

জাতি সম্বন্ধে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের নীতি অনুসরণ করলে…সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিলিত না হয়ে তার বিরোধিতা করলে, জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মিলিত না হয়ে তাদের বিরোধিতা করলে, কমিউনিস্ট, সর্বহারা এবং জনগণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরোধিতা করলে সমস্ত নিপীড়িত জাতিদের সঙ্গে মিলিত না হয়ে… জাতীয় আন্দোলনগুলির বিরোধিতা করলে তার একমাত্র ফল দাঁড়াবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মিলন, জাতীয় মুক্তি অর্জনে ব্যর্থতা, সমাজতন্ত্রের প্রয়াসে ব্যর্থতা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে নিরন্তর বঞ্চনা ও আক্রমণ ও এ-সমস্তর ফলে স্বদেশের স্বাধীনতা হারিয়ে সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে পরিণতি—লিউ শাও-চি, আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তা (Internationalism and Nationalism, Peking, Foreign Language Press, 1954).

১৯৭০ সালের গোড়ায় যখন মাও সে তুঙ ঘোষণা করেন যে সত্তরের দশক মুক্তির দশক হবে তখন কেউ ভাবে নি যে সত্তরের দশকের শেষ হবে ক্ষুদ্র

এবং নবীন সমাজতান্ত্রিক দেশ ভিয়েতনামের উপর চীনদেশের সেনাবাহিনীর হামলার মধ্য দিয়ে। ব্যাপারটায় দুনিয়ার সমাজতন্ত্রীরা ব্যথিত ও লজ্জিত সন্দেহ নেই। সমাজতন্ত্র বিরোধীরা যে ততোধিক পুলকিত তার প্রমাণ এই আক্রমণের এক সপ্তাহের মধ্যেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভা ডাকা হয় নি। 'সব যুদ্ধেরই উৎস হল রাজনীতি'—রণনীতিবিদ্ ক্লজউইটজ্ একদিন বলেছিলেন এবং লেনিন সে কথা সমর্থন করতেন। ভিয়েতনাম আক্রমণ চীনদেশের আধুনিক রাজনীতির অনিবার্য ফল না হলেও, আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। এ আক্রমণকে বুঝতে হলে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় চীনের সমগ্র ভূমিকাটি বোঝা দরকার।

স্ট্যালিনের উত্তরাধিকার

১৯৫৬ সালের গোড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি অধিবেশনের তাৎপর্য ছিল একাধিক। প্রথমত, এখানে ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সমালোচনা হয়। দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের একচ্ছত্র প্রাধান্যের বিরুদ্ধেও সমালোচনা ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যে বহুকেন্দ্রিকতার প্রস্তাব করে, ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি তাকে সংশোধনবাদী বলে ঘোষণা করে। চীনদেশের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই মস্কোয় পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী বুলগানিনের সঙ্গে আলোচনার শেষে ঘোষণা করেন, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্ব বজায় থাকবে। তবে বিভিন্ন দেশের সমাজবাদী দলগুলি তাদের নিজস্ব কর্মধারা স্থির করবে। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরিতে স্ট্যালিনবাদ-বিরোধী আন্দোলন সমাজবাদ বিরোধিতার দিকে ঝোঁক নেয়। ফলে হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

চীনের ভিতরেও এ-ঘটনার প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটে। ১৯৩৫ সালের পর থেকে সেখানে কমিউনিস্ট আন্দোলনে সর্বময় নেতৃত্ব ছিল মাও সে-তুঙ এর হাতে। ১৯৪৯ সালের পর তিনি ছিলেন একাধারে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও জনগণতান্ত্রিক চীনের রাষ্ট্রপতি। ১৯৫৬ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন তেঙ্ সিয়াও-পিঙ্। এই পদটি ১৯৩৭ সালে অবলুপ্ত হয়েছিল। এর পুনর্জন্ম পার্টির সভাপতির ক্ষমতা-সঙ্কোচনের নির্দেশক। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসে তেঙ্ যে ভাষণ দেন তাতে ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা

করা হয়। এর পর, চীনের গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ডের ব্যর্থতার দরুন মাওকে রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করতে হয়।

এর পর শুরু হয় চীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতান্তর এবং মনান্তর। চীনের ভিতরে শুরু হয় এক নতুন ধরনের গৃহযুদ্ধ। ১৯৬৬ সালে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবে'র মাধ্যমে মাও বিরোধীদের একে একে উৎখাত করেন। মাওয়ের মৃত্যুর আগে অবশ্য এই বিরোধীদের কেউ কেউ, যেমন তেঙ্‌ সিয়াও পিঙ্‌, রাজনৈতিক পুনর্বাসন লাভ করেন। কিন্তু দুটি প্রধান শর্তে—১. মাও-এর ব্যক্তিগত নেতৃত্ব মেনে নেওয়া, ২. সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করা। অবশ্য তেঙের পুনর্বাসনের পিছনে মুখ্য ভূমিকা ছিল চৌ এন লাইয়ের মতো প্র্যাগম্যাটিক নেতাদের—যাঁরা চেয়েছিলেন দ্রুত শিল্পায়নের ভিত্তিতে চীনের আধুনিকীকরণ।

মাও সে তুঙ্‌ শিল্পবিরোধী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল কৃষির উপর। আর উৎপাদনের বিশেষ মজবুত ভিত্তি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের বিরোধী ছিলেন তিনি। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তাঁর বিরূপতার সম্ভাব্য কারণ প্রধানত তিনটি। প্রথম, স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর তিনি হয়তো আশা করেছিলেন যে, বয়স, অভিজ্ঞতা ও বিপ্লবী সাফল্যের সুবাদে তিনিই হবেন আন্তর্জাতিক সমাজবাদের শিরোমণি। জনসংখ্যার হিসাবে চীন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের তিন গুণ সেটাও ভুলতে পারেন না কোনো চীনা নেতা। মাও-এর সে আশা তো পূরণ হলই না; উপরন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তিপূজা-বিরোধী আন্দোলন মাও-নেতৃত্বকে স্বদেশে বিব্রত করে তুলল।

মাও-এর সোভিয়েত-বিরোধিতার দ্বিতীয় কারণ, অর্থনৈতিক। চীনের কৃষি-ব্যবস্থায় কমিউনের প্রবর্তনের সাফল্য সম্পর্কে সোভিয়েত নেতাদের সন্দেহ ছিল। এই সংশয় থেকে জন্ম নেয় এক জটিল দ্বন্দ্ব। কারণ চীনের সমাজতান্ত্রিক গঠনের ব্যয়ভার সোভিয়েত ইউনিয়নকেই বহন করতে হত। গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ডের ব্যর্থতার পর পেঙ্‌ তে-হুয়াই-এর মতো সোভিয়েত সমর্থকরা যখন চীনের অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবি তোলেন, তখন মাও একাধারে তাঁর সমালোচকদের সংস্কারবাদী (revisionist) আখ্যা দেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের দোষে অভিযুক্ত করেন। এর ফলে, যখন ১৯৬০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন থেকে তাদের সাহায্য ও বিশেষজ্ঞ গুটিয়ে নেয়, তখন এটা সোভিয়েত

ইউনিয়নের চীন বিদ্বেষ রূপেই বর্ণিত হয়। চীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে বুর্জোয়া বলে আখ্যা দেয়। চীনের জনগণের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে তখন ক্রুশ্চভের আমল ক্রুশ্চভের রসিকতা ও বিবিধ ক্রিয়াকলাপ চীন-রুশ দ্বন্দ্বে ইন্ধন যোগায় সন্দেহ নেই। ফলে চীনে সোভিয়েত-বিদ্বেষ একটা প্রায় সার্বিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। চীন যে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সমাজতান্ত্রিক দেশ, চীনের বিপ্লব সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবের থেকে অনেক বড় এবং চীনের সমাজতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের থেকে অনেক খাঁটি এই বিশ্বাসকে চীনবাসীর জাতীয় মর্যাদা-বোধের ভিতর গ্রথিত করতে পারা মাও সে তুঙের এক প্রধান সাফল্য।

চীনের যুদ্ধবাজী

চীন-রুশ দ্বন্দ্বের তৃতীয় অধ্যায় আন্তর্জাতিক। বিংশতি কংগ্রেসেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির উপর গুরুত্ব দেয়। এর অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষ পরিহার করে সমাজতন্ত্র গঠনের মাধ্যমে বিশ্বের পটপরিবর্তন ঘটানো। এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের কিছু পরেই নিকিতা ক্রুশ্চভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে যান। সঙ্গে সঙ্গে আলবানিয়া প্রত্যক্ষভাবে এবং চীন পরোক্ষভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমালোচনা শুরু করে। চীনের বক্তব্য ছিল, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের আপস প্রচেষ্টা নিষ্ফল। ১৯৫৭ সালে মস্কোয় যে বারোটি কমিউনিস্ট দেশের পার্টি প্রধানদের সম্মেলন হয়, তাতে মাও সে তুঙ্ বেশ কঠোর মনোভাবই ব্যক্ত করেন।

তবু সোভিয়েত ইউনিয়ন দমে নি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে কাগুজে বাঘ, এবং তাঁর বিরুদ্ধে 'ন্যায়যুদ্ধে' সমাজতন্ত্রের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, এই চীনা তত্ত্বকে ব্যঙ্গ করে ক্রুশ্চভ বলেন যে সাম্রাজ্যবাদ কাগুজে বাঘ হলেও তার দাঁত আনবিক।

চীন অবশ্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সত্যি ন্যায়যুদ্ধে নামে নি। একমাত্র কোরিয়ার যুদ্ধে যখন মার্কিন নেতৃত্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সেনা উত্তর কোরিয়ার ভিতর চীন-কোরিয়া সীমান্তের কাছে চলে আসে, তখনই চীন তার সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল কোরিয়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক গাস হলের লেখা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে সাম্প্রতিক

খোলা চিঠিতে প্রতীয়মান হয় মাওবাদীরা বরাবর প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতাই করেছেন। কদাচিৎ নির্লজ্জ ভিক্ষাও করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধের দায়িত্ব দিয়ে এসেছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে।

১৯৪৯ সাল থেকে চীন বরং লড়ে যাচ্ছে তার 'প্রতিক্রিয়াশীল' প্রতিবেশী-দের সঙ্গে। ১৯৫৯ সালে প্রথম 'শিক্ষা দেয়' সে ভারতকে; ১৯৬২ সালে আরো জোরদার অভিযান করে। ঘটনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরূপ প্রতিক্রিয়া চীন আজও ক্ষমা করতে পারেনি।

খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সীমান্ত-সংঘর্ষ শুরু হয় সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'সোশ্যাল ইম্‌পিরিয়ালিস্ট' (যার বাঙলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই, অর্থও) আখ্যা দেওয়া হয়। এই সীমান্ত দ্বন্দ্বে অবশ্য বিশেষ সুবিধা হয় নি। ভিয়েতনামের উপর 'শিক্ষামূলক অভিযানে' চীন সেই ক্ষোভটা মিটিয়ে নিতে চায়। বেচারা চীন! কয়েক বছর আগেও 'চোরের মার বড় গলা'য় সে দিগ্‌বিদিক ঘোষণা করেছে, সে-ই ভিয়েতনামের প্রকৃত বন্ধু, আর সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ভিয়েতনামের সৈনিকরা অবশ্য চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সমান সম্পর্ক রেখে গেছে। ব্যাপারটা প্রথম ফেঁসে যায় ১৯৭৩ সালে, যখন নয়া মার্কিন দাক্ষিণ্যের জোয়ারে চীন নিক্সনের সঙ্গে ভিয়েতনামের ব্যাপারে একটা 'সমঝোতায়' আসে। এই সমঝোতা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম থেকে সরে যাবে 'পর্যায়ক্রমে'—সম্ভবত ভিয়েতনামকে চীনের তাঁবেদারিতে অর্পণ করে। এই সমঝোতায় সোভিয়েত ইউনিয়ন, এমন কি ভিয়েতনামেরও কোনো ভূমিকা ছিল না। কয়েক মাসের মধ্যেই তাই ভিয়েতনামী যোদ্ধারা নতুন উদ্যমে মার্কিন হানাদারদের তাড়িয়ে দেয়। মার্কিনীদের কাছে চীনের বিপ্লবীদের চক্ষু-লজ্জার অন্ত থাকে না।

অপরপক্ষে কম্বোডিয়ায় চীন বিপ্লবী ভূমিকা নেয়। কারণ সেখানে মার্কিন স্বার্থ ছিল না। সেখানে এক মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে এক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটায় যে লন্‌ নল্‌ গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে খিউ সাম্পান-এর নেতৃত্বে কম্বোডিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। চীন সে বিপ্লবকে সমর্থন জানায় এবং একসঙ্গে কম্বোজরাজ নরোত্তম সিহানুককে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়। চীনের সংবিধান অনুসারে বিদেশে সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক

আন্দোলন করে পীড়িত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেবার নির্দেশ আছে কিনা !

ইন্দোচীনে চীনা স্বার্থ

চীনের আদর্শে অনুপ্রাণিত সাম্পান সরকার চটপট কম্বোডিয়ায় কমিউন প্রবর্তন করার পর যেখানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। একই সঙ্গে কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। সাম্পান সরকারের ক্ষমতা দখলের পর থেকে বিরোধীদের উপর তাদের নিষ্ঠুরতা সারা বিশ্বে কুখ্যাত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় নরমপন্থীরা সাম্পান সরকারের উচ্ছেদ ঘটায় ও কমিউনের বিলোপ করে। ভিয়েতনাম ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই নতুন সরকারের সমর্থনে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে চীন রাষ্ট্রসঙ্ঘে অভিযোগ আনে ভিয়েতনামকে আগ্রাসী বলে। সাম্পান পক্ষের ওকালতি করার জন্য চীনের আশ্রিত কম্বোডিয়া-রাজ নরোত্তম সিংহানুক হাজির হন নিউইয়র্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিটোর ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় নি।

ভিয়েতনাম আগ্রাসী, কারণ সাম্পান-বিরোধীরা ভিয়েতনামের সমর্থনপুষ্ট— এই অভিযোগ ভিয়েতনাম অস্বীকার করেছে। চীন এই অভিযোগ নিয়ে কলরব করলেও, ভিয়েতনাম আক্রমণের পিছনে এটিই তার প্রধান যুক্তি নয়। চীন তো ভারতবর্ষের বিরুদ্ধেও পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের অভিযোগ করেছিল, কিন্তু সে কি পাকিস্তানের সমর্থনে সৈন্য নামিয়েছিল ? মধ্যপ্রাচ্যে ইস্রায়েলীদের বিরুদ্ধে কি চীন লড়ছে ? ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে চীনের প্রকাশ্যে আরো দুটি অভিযোগ আছে। এক, ভিয়েতনামে চীন সীমান্তে অনুপ্রবেশ করেছে। দুই, ভিয়েতনাম চীনা সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন হচ্ছে। তিনটি অভিযোগই অবশ্য বিবেচনা করা যেতে পারে।

যাঁরাই কম্বোডিয়ায় সাম্প্রতিক লড়াই-এর রিপোর্ট দেখেছেন তাঁরাই জানেন সাম্পান সরকারের পতন হয়েছে অতি অল্প সময়ে। এ সাফল্য কোনো সমাজবাদী দেশে বিদেশী আক্রমণের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, রয়টার এবং এ. এফ. পি. সংবাদ দেবার সময় প্রথম দিকে সাম্পান-বিরোধীদের শুধু ভিয়েতনামী সৈন্য বলে বর্ণনা করে। পরে বলে ভিয়েতনামী নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী সাম্পানের বিরুদ্ধে লড়ছে। তৃতীয়ত,

কম্বোডিয়ার লড়াইয়ে ভিয়েতনামী ট্যাঙ্ক নাকি দেখা গেছে। কিন্তু ভিয়েতনামী সেনারা নেমেছে বলে এখনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

ভিয়েতনাম চীন সীমান্তে অনুপ্রবেশ করেছে এ অভিযোগও চীনের ভিয়েতনাম আক্রমণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ এখন এ সত্যটা সর্বস্বীকৃত যে চীনের সমগ্র সীমান্তই অচিহ্নিত, অধিকাংশই জঙ্গলা-পাহাড়ে ঢাকা। এখানে চীনের শাসন এসেছে অতি সম্প্রতিকালে। সমস্যাটা চীনের একার নয়। ভারতবর্ষ সমেত এশিয়া-আফ্রিকার সব নতুন রাষ্ট্রেই এক ব্যাপার। এ সমস্যার সমাধান যুদ্ধে হবে না, হবে আলোচনার মাধ্যমে।

চীনের তৃতীয় অভিযোগটি একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মুখে মানায় না। উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই হাজার হাজার চীনা শ্রমিক ও ব্যবসায়ী ছড়িয়ে পড়েছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এমন কি প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ভিয়েতনাম তো এককালে চীন সাম্রাজ্যের অংশ ছিল! সেই সুবাদে সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামে চীনা সম্পন্ন ব্যবসায়ীরা বহাল তবিয়তে ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাক এবং স্বদেশে টাকা পাঠাক, এটা চীনের বিপ্লবী সরকারের পক্ষে কাম্য হতে পারে, গরীব ভিয়েতনামীদের পক্ষে নয়।

প্রাচ্য গোলার্ধের খবরদারি

ভিয়েতনামের উপর চীনা আক্রমণ আর একদিক থেকে দেখা যেতে পারে। ফরাসীরা ছোট্ট ইন্দোচীনকে তিনভাগে ভাগ করে চলে যায়—ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই এখানে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট পার্টি। ফরাসীরা অবশ্য সরকারীভাবে কখনও ইন্দোচীনকে সংহত করে নি। লাওস ও কাম্বোডিয়ায় দুটি তাঁবেদার রাজতন্ত্র বজায় ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, ফরাসীদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই রাজতন্ত্রের কিছু কিছু সংস্কার ঘটে। আর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ইন্দোচীনে নামে মার্কিন হানাদারী। তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে ভিয়েতনাম ও লাওসের মুক্তিযোদ্ধারা ক্রমশ ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে। কাম্বোডিয়ার 'আলোকপ্রাপ্ত' যুবরাজ দীর্ঘদিন মার্কিন হানাদার আর মুক্তিযোদ্ধাদের পরস্পর লড়িয়ে দিয়ে সুখে রাজত্ব করতে থাকে। শত্রুর শত্রু মিত্রবৎ-বিবেচনায় নরোদম ও খিউ সাম্পান বন্ধু—বিপ্লবী চীন

তাদের মদৎদার। অপরপক্ষে সাম্পান বিরোধীরা সফল হলে গোটা ইন্দোচীনে কমিউনিস্ট আন্দোলন সংহত হতে পারে।

দেখা যাক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এ সম্ভাবনার ফল কি? লেনিনের সংজ্ঞা মতো বিশ শতক যদি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যুগ হয়, সে যুগের বিশিষ্টতম সংগ্রামী ভিয়েতনাম—পঞ্চাশ বছর ধরে ইতিহাসে অতুলনীয় এক লড়াইয়ে যে প্রথমে ফরাসী ও পরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করেছে।

চীনদেশের সীমান্তেই 'চীন সাম্রাজ্যের প্রাক্তন এই প্রজাদের' রাজনৈতিক সাফল্য চীনের বিপ্লবী গৌরবকে ম্লান করে দেবে নিশ্চয়; সেই ভিয়েতনাম যদি অন্য ইন্দোচীন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মিলতে পারে, তার শক্তিবৃদ্ধি অনিবার্য; এই সঙ্গে যদি সোভিয়েত সাহায্য জোটে তা হলে ভিয়েতনাম তৃতীয় বিশ্বের নেতৃত্বেও এসে যেতে পারে—এই সব 'ভয়' চীনের মনের ভেতরে বোধহয় কাজ করে।

ব্যাপার হল, ভৌগোলিকরা যাকে বলেন 'প্রাচ্য গোলার্ধ' তার খবরদারিতে আছে প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে তিন মহাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও জনগণতান্ত্রিক চীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো চীনের প্রধান বন্ধু। গত বৎসর জাপানের সঙ্গেও চীনের একটা বন্ধুত্ব চুক্তি হয়েছে। চীন ও জাপানের পণ্ডিতরা দু হাজার বছরের চীন-জাপান সম্পর্কের উপর গবেষণার জন্য সরকারী চুক্তিতে বদ্ধ হয়েছেন। চীনের স্কুলে এখন জাপানী ভাষা পড়ানো হচ্ছে। চীনে বিদেশী ট্যুরিস্টদের ভিতর জাপানীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। চীন-জাপান বন্ধুত্ব চুক্তির পরই সন্ত্রস্ত ভিয়েতনাম সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি করে। সঙ্গে সঙ্গে চীনের কাছে সোশ্যাল ইম্পিরিয়ালিজমের 'মারাত্মক বিপদ' স্পষ্ট হয়। অতএব আর দেরি করা সঙ্গত নয়। মারো ভিয়েতনামকে।

কিন্তু পঞ্চাশ বছরের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে যারা হারে নি তাদের কি মারা যাবে? চীন হয়তো সঙ্গতভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভিয়েতনামকে শ্রেণীশত্রু মনে করে। প্রশ্ন হল, আধুনিক চীনদেশের রাজনীতির শ্রেণী চরিত্র কি?

অবিস্মরণীয় চিত্তপ্রসাদ

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

এমন একদিন ছিল যখন প্রবাসে বাঙালি সৃজনশীল হত। তাই থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বহুমুখী বাঙলা সংস্কৃতি প্রায় ধারাবাহিকভাবেই প্রবাসী বাঙালি মনীষার সামর্থ্য সমৃদ্ধ ছিল। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্যের মতো বহু-আলোচিত বিষয় ছাড়াও স্থাপত্য, চিত্র, ভাস্কর্যে বাঙলার সৃজনশীল মন ভারত তথা জগতকে সমৃদ্ধতর করেছে তার মানস ঐশ্বর্যে। বৌদ্ধ যুগের নানা শৈলীর স্রষ্টা ধীমান, বীতপাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগের শেষ লগ্নে সমকালীন জগতের বিস্ময় রাজওয়াড়ার জয়পুর নগর-স্রষ্টা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বিদ্যাধর ভট্টাচার্য পর্যন্ত। এমন কি ঢাকাই মুর্শিদাবাদী কলম থেকে শুরু করে কালীঘাটের পোটো পর্যন্ত এ ধারা প্রবাহিত হয়। তারপর বাঙলার ভারতীয় সংস্কৃতির নবজাগরণ শুরু করে অবনীন্দ্র শিষ্য প্রশিষ্যরা ভারতের দিকে দিকে ছড়িয়ে গিয়ে দেশের নবযৌবনকে দীক্ষিত করেছেন নবীনতর শিল্প ভাষায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারত যখন নবীন আশায় কর্মদীপ্ত হয়ে কালোত্তীর্ণ হবার মোহে অনুকরণ-অনুসরণের বন্ধুর পথে অস্থির পদক্ষেপে দ্রুত ধাবমান, ঠিক তখনি বাঙালি মনীষা ক্ষণিক স্তব্ধ বিস্ময়ে ইতস্তত বিভ্রান্ত, বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপে আপন মনের দ্বিধা প্রকাশ করেছে। এমন মুহূর্তে বোম্বাই প্রবাসী কৃৎকৌশলী শিল্পী চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্যের রেখ-মুদ্রণের (গ্রাফিক) চিত্রাবলী শুধু বৈচিত্র্য নয়, পথনির্দেশকের ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। নৈহাটির ছেলে চিত্তপ্রসাদের শৈশব চট্টগ্রামে কাটলেও, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বের কালটি কলকাতা ও বোম্বাই-এ কেটেছে। সমকালীন রসিক চিত্তপ্রসাদের নাম বিস্মৃত হলেও তাঁর শিল্পকর্মকে আজও বিস্মৃত হতে পারে নি। বোম্বাই থেকে প্রকাশিত তৎকালীন বাম ছাত্র-আন্দোলনের মুখপত্র দি স্টুডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত সুনীল জানার তোলা একটি আলোকচিত্র, যার বিষয়বস্তু ছিল 'ধামশা বাদনরত' এক আদিবাসী যুবকের যৌবনদীপ্ত ভঙ্গি। যেটিকে অবলম্বন করে চিত্তপ্রসাদ যে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অনবদ্য প্রতীকচিত্রটি রচনা করেছিলেন সেটি আজও শিল্পীর অমরত্ব রক্ষায় সাহায্য করে, তাছাড়া, সেদিনের 'পিপলস্ ওয়ার' পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙলার দুর্ভিক্ষের ছবিগুলি এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের নৌ-বিদ্রোহের ছবিগুলি এই প্রবাসী শিল্পীকে রসিকমহলে অবিস্মরণীয় করে রাখবে।

তারপর যখন রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তন অনুসরণে চিত্তপ্রসাদ

বটুকদা-স্মরণে

চিত্তপ্রসাদ

কলকাতা

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র মৃত্যু সংবাদে চিত্তপ্রসাদ আপনমনে এই স্কেচটি এঁকে রেখেছিলেম। এই স্কেচটি তাঁর কাগজপত্র থেকে তাঁর বোন আমাদের দিয়েছেন।

কিছুটা নীরব হয়ে গেলেন অর্থাৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর কর্মপ্রেরণা যখন ব্যাহত হলো, তখনো ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে ম্যাগাজিনে বা প্রখ্যাত সাহিত্যিক নবেন্দু ঘোষের সম্পাদনায় প্রবাসী বাঙালি সমিতির মুখপত্র 'প্রবাস', সাইক্লোস্টাইল পদ্ধতিতে মুদ্রিত হাতে লেখা পত্রিকায়, তাঁর বিচিত্র শিল্পকর্ম কচিৎ কখনো প্রকাশিত হত। রসিকসমাজ সেগুলিকেও সানন্দে উপভোগ করত। এমন জনপ্রিয় শিল্পীর হঠাৎ এমন অজ্ঞাতবাসের কার্যকারণ রাজনৈতিক বলেই আমার মনে হয়। একদিন ভারতের শৌর্যবান এবং মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জনপ্রিয় শিল্পীদলের অন্যতম প্রতিভূ রূপেই শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তখন সে-দলে যে কজন প্রতিভাধর শিল্পী ছিলেন তাঁরা হলেন নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন, নীলরতন চট্টোপাধ্যায়, দেবকুমার রায়চৌধুরী, সোমনাথ হোড়, বিজয় চৌধুরী প্রমুখ। এইসব শিল্পীবৃন্দের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন চিত্তপ্রসাদ।

বিগত চৌষট্টি সালে বোম্বাই-প্রবাসী নবীন শিল্পীদের সংগঠন 'শিল্পায়ন' ভারতে প্রথম চিত্তপ্রসাদের লিনো-খোদাই রেখমুদ্রণের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন কলকাতায় একাডেমি অব ফাইন আর্টসে। কিন্তু সেদিন সে প্রদর্শনী রসিকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারলেও বাজারী পত্র-পত্রিকায় বেতনভুক সমালোচকবৃন্দ সভয় সন্তর্পণ সমালোচনায় কার্যোদ্ধার করেছিলেন। বুঝি শিল্পীর রাজনৈতিক পশ্চাদপটের কথা ভেবে। আর সবচেয়ে শোচনীয় হয়েছিল শিল্পীর দলভাঙা সহকর্মীদের নিস্পৃহ অসহযোগিতা। তবু সেদিন এই সিদ্ধ শিল্পীকে কলকাতার রসিকবৃন্দ অভিনন্দন জানাতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। এই সব ব্যবহারই চিত্তপ্রসাদের মনকে ভেঙে দিয়েছিল! বড় স্পর্শকাতর ছিল শিল্পীর মন, তাই প্রতিটি ধাক্কা তাঁকে দমিয়ে দিয়েছিল, প্রতিটি আঘাত তাঁকে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য করেছিল। ক্রমেই শিল্পী ব্যবহারিক জীবনে ও চিত্রকর্মে নীরব ও নিস্পৃহ হয়ে গেলেন। সব বিষয়ে তিনি প্রায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, তাই শেষবার যখন আমার সঙ্গে তাঁর বোম্বাই-এ দেখা হয়েছিল, তখন তাঁর এই অবস্থা দেখে আমিও কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ একদিন হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ফোন এবং সংবাদপত্র মারফৎ জানলাম একজন সহযোদ্ধা শহীদ হলেন। ধনতান্ত্রিক মোর্চা ও এসটাবলিশ্‌মেন্টের আরেক জয় হলো। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস শেষ জয় আমাদেরই। আমরা মরেও মরি না।

হিন্দী উপন্যাসে সমাজবাদী চেতনা

গোপাল কৃষ্ণ শর্মা

পরিস্থিতি ও পরিবেশে আবর্তিত জনজীবনের সমস্যাকে রূপদান করে উপন্যাস। এই রূপায়ন-প্রক্রিয়ায় একদল ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি থাকে ঐতিহ্য-লালিত; শুদ্ধি-বাদী আদর্শ এবং বিশ্বাসকে সামনে রেখে তাঁরা লেখনী চালনা করেন। অন্য ধারার উপন্যাসকার সমাজের যথাযথ রূপটাকেই বিশ্বস্ততার সঙ্গে এঁকে তোলেন; উপন্যাসের অগ্রগতিকে এঁরাই করেন ত্বরান্বিত। হিন্দী উপন্যাসে —কী গ্রামীণ, কী শহুরে সমাজচিত্রণে—সমূহ পরিবর্তন এসেছে প্রেমচন্দের পর, বৈজ্ঞানিক বিশেষত কারিগরী বিজ্ঞানের জটিল বিকাশ এবং সেই সঙ্গে পরিবর্তমান মানদণ্ড ও মূল্যবোধের প্রবল অভিঘাতে। সামাজিক পারিপার্শ্বকে আত্মস্থ করে নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ উপন্যাস-লেখক নতুন পথে পা রেখেছেন, প্রেমচন্দ-সৃষ্ট উন্নত ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন দৃঢ় সক্ষম হাতে, তাকে দিয়েছেন নব্য সমৃদ্ধি।

স্বাধীনতা-উত্তর গ্রামীণ ভূমি-ব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং তার ফলশ্রুত আর্থিক পালাবদল, সরকারী কাজেকর্মে ব্যাপ্ত ভ্রষ্টাচার, কিসান-খেতমজুর শোষণ, কৃষির যান্ত্রিকতাবিধান, জমিদারী প্রথার বিলোপ, (অন্তিম ক্ষণে) জমিদারদের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিসান-খেতমজুরদের আন্দোলন, সবুজ বিপ্লবের ধ্বজাধারী স্থানীয় বহুরূপী নেতা, কানুনের মারপ্যাঁচে মার-খাওয়া কৃষক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দুর্গতি, খেতমজুর এবং দাস-মজুরদের অসহনীয় অবস্থা, নারীজীবনের যন্ত্রণা, তথাকথিত অহিংস কংগ্রেসী নেতাদের অত্যাচার-কণ্টকিত গরিব-খেদাও,

পুলিশের কারচুপি, মানবিক অধিকারের সপক্ষে সংগ্রামরত শ্রেণীসচেতন বিপ্লবী-দের পাইকারী হত্যা, ভেদাভেদ জীইয়ে রাখার উপযোগী ন্যায়-ব্যবস্থা, কিসান-সভার নেতাদের কারাবাস-দণ্ডদানের নিষ্ঠুর কাহিনী, নিরন্তর সংগ্রামে বিজয়ী কৃষকসংগঠনাদির হৃদয়গ্রাহী বিবরণ, ইত্যাদি ইত্যাদি : সমকালীন হিন্দী উপন্যাসের মৌল উপজীব্য ; প্রধান লেখক ফণীশ্বরনাথ রেণু, নাগার্জুন, ভৈরব প্রসাদ গুপ্ত, রাংগেয় রাঘব প্রভৃতি ; মূল সুর—জটিল বিষম অসম স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রোষ ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ এবং কৃষক-শ্রমিকদের প্রতি অপার সহমর্মিতা। নাগার্জুনের বলচনমা (বলচনমা), মাধুরী (বরুণকে বেটে), দিগম্বর (নঈ পৌধ), দয়ানাথ (বাবা বটেশরনাথ), কালীচরণ (রতিনাথ কী চাচী) ; ভৈরবজী-র বটরু (গঙ্গা মাইয়া), চতুরী (জঞ্জীরে অ্যার নয়া আদমী), মন্নে (সতী মাইয়া কা চৌরা) ; রাংগেয় রাঘবের সুখরাম (কব তক পুকারূঁ) —এরা হচ্ছে সেইসব আগুনের ফুলকি যারা স্বাধীনতা আর ন্যায়ের জন্যে স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই চালিয়ে যায় গণসংগঠনের মাধ্যমে। এইসব উপন্যাসে নারীজাতিকে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে—প্রাচীন মানদণ্ডে নয়—সাম্য ও স্বাতন্ত্র্যের আধুনিক স্তরে। এখানে শব্দে-শব্দে বাক্যে জনজীবনের প্রচণ্ড কোলাহল, ক্লান্তির উত্তেজনা, ভারতীয় কৃষকের আত্মবল, এবং যুগচেতনা ও সৌন্দর্যভাবনার সার্থক সম্মিলন।

প্রগতিশীল চেতনাসম্পন্ন হিন্দী ঔপন্যাসিকদের প্রধানতম বিশেষত্ব গোটা সমাজই এঁদের রচনাবলীর প্রস্থানভূমি। তাবৎ সহবেদনা নিবেদিত শোষিত নিপীড়িত জনগণের উদ্দেশে ; সত্য অর্থে, একাত্মতা তাদেরই সঙ্গে। শোষণের প্যাঁচ-পদ্ধতিগুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে। কলম-যোদ্ধা এঁরা নন ; এঁরা সংগ্রামী কৃষক-শ্রমিক বাহিনীর বিপ্লবী যোদ্ধাও। তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক প্রয়োগে সামঞ্জস্য ঘটিয়েছেন। বস্তুত, এই সমঞ্জস চেতনাই ষাটোত্তর হিন্দী উপন্যাসকারদের অনুপ্রাণিত করেছে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক অভিব্যক্তিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, বিস্তৃত সমাজপটের ভেদবস্থা চিত্রায়ণে।

উনিশশো ষাটের পর, নাগার্জুন এবং ভৈরবের অনুগামী, প্রগতিশীল ও সমাজবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ, নতুন জেনরের লেখকদের কথা-কাহিনীতে উদ্‌ঘাটিত সামাজিক কলুষ-কালিমা-অক্ষমতা, ভ্রান্তির মায়া-যবনিকা শতধা-বিচ্ছিন্ন, অগাধ অবারিত জাঁকজমকের নীচে প্রচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর কুশ্রীতা। বাস্তবকে সাহিত্য-মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট-দর্শন করে পাঠক অবিলম্বে

অনিবার্য একাত্মতা অনুভব করে। এইসব লেখক কিন্তু পূর্ব-সিদ্ধান্তের কাঠামোয় সাহিত্য রচনা করেন নি, সাহিত্য-রচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তের তথা তত্ত্বের পুষ্টিসাধন করেছেন। রাহী মাসুম রজার লেখা 'আধা গাঁও' (১৯৬৬) উপন্যাসে ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং শোষক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতা-সম্প্রসারণের কৌশলগুলি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শিবপ্রসাদ সিংহের 'অলগ অলগ বৈতরণী' ('৬৭)-তে চিত্রিত হয়েছে ভূমিহীন কৃষক ও জমিদারের সংঘর্ষ; শ্রীলাল শুক্ল-র 'রাগ দরবারী' ('৬৮)-তে পাই কৃষক-আন্দোলন, সুযোগ-সন্ধানী নেতৃত্ব, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতার লড়াইয়ে প্রতি-ক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র; রামদরশ মিশ্রর 'জল টুটর্তা হুয়া' ('৭১)-তে তেওয়ারি গ্রামের বাতাবরণে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অসংগতি, ভোটের-রাজনীতি-প্রসূত দলবাজির দুষ্পরিণাম; জগদীশচন্দ্রের 'ধরতী ধজন অপ্‌না' ('৭২)-র দুর্বল চামারদের ওপর প্রতাপশালী চৌধুরীদের অত্যাচার, চামারদের অসহায়তা এবং তাদের পরাজিতের মনোভাবের নিপুণ ছবি। জগদীশচন্দ্রের আরেকটি উপন্যাস 'কভী ন ছোড়ে খেত' ('৭৬) এবং মধ্যপ্রদেশের যুবগোষ্ঠীর সমবেত প্রয়াস 'সরপঞ্চ'ও শোষিত জনতার স্বচ্ছ দর্পণ।

স্বাধীনতার পর গ্রামীণ জনজীবনে দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে, একটা নতুন চেতনার জাগরণ হয়েছে; ফলে, শহরের মতো গ্রামের পরিস্থিতিও হয়ে উঠেছে জটিল, ভয়াবহ। আলোচ্য উপন্যাসকাররা বিশ্বাস করেন, বর্তমান যান্ত্রিক-সভ্যতা-সঞ্জাত অরাজকতা, বিবিধ সমস্যা, অসংগতি আর শোষণের বিলোপ ঘটতে পারে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই। এবং একমাত্র এই পথেই অসম উৎপাদন-বিতরণ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে, সমৃদ্ধির সর্বাধিক ও সর্বোত্তম ফল পাবে জনগণ।

গ্রামজীবন-নির্ভর হিন্দী উপন্যাসগুলিতে পাঠক যেমন বাস্তবকে সাক্ষাৎ করে, তেমনি আঙ্গিক ও ভাষার ক্ষেত্রেও সমান আকর্ষণ অনুভব করে। ফলত, 'ময়লা আঁচল', 'কবতক পুকারুঁ', 'রাগ দরবারী', 'আধা গাঁও', 'কভী ন ছোড়ে খেত' প্রভৃতি উপন্যাস পূর্বগামী ঐতিহ্যের অববাহিকা পরিত্যাগ করে শৈল্পিকতার এমন এক অগ্রবিন্দুতে উপনীত হয়েছে, যার মুখোমুখি শহরের অতি-সচেতন পাঠকও সহমর্মিতা অনুভব না করে পারে না।

অনুবাদ: গুরুদাস ভট্টাচার্য

উপন্যাস

যবনিকার আগে

আশীষ বর্মন

দুপুরে আমরা তিনজনে একসঙ্গে খেলুম, রান্নার জায়গার সামনের দাওয়াটায়। সুকুকেও বলেছিল পল্টু। মাসীমা খাবার দিচ্ছিলেন। সুকু খেতে খেতে বলল 'পল্টা রাঁধে দারুণ।'

'এ গুণ ও বাপের কাছ থেকে পেয়েছে।' মাসীমা বলেন।

'যার কাছেই পাক্‌…ফার্স্ট ক্লাস…আমজাদিয়াও কোন্ ছার!'

'উনিও মাংসটাই রাঁধেন ভালো।'

'থামো তো তুমি।' পল্টু খিঁচিয়ে উঠল।

'বাঃ সত্যি কথা বলব না?'

'না, সত্যি-ফত্যি নয়…বাপ আমায় কিছুই দেয়নি।'

'আবার!' সুকু বাধা দিল, কথাটা ঘোরানোর জন্যে আমায় কনুইয়ের গুঁতো মেরে বলল 'কি-রে, তোর কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

'ব্যাটা, শুধু ভালো!'

আমি হাসি, বলি 'দারুণ ভালো, দারুণ!'

'তাই বল্‌…গিভ দ্য ডেভিল হিজ ডিউ।'

'শুয়োর!' দাঁতে হাড় চিবোতে চিবোতে পল্টু বলল।

'গালাগালের কি হলো শুনি?' সুকু তাকায়।

'বাচ্চা শুয়োর।'

'ফের!'

'শালা, আমায় ডেভিল বলি না?'

সুকু এক নিমেষ থমকে গেল, বোধহয় কিছু তার মুখে এল না তৎক্ষণাৎ। আমি চাপা-স্বরে বললাম 'হিজ ডিউ দেওয়ার এই ফল!' সকলে হেসে উঠল, এমন-কি মাসীমাও। মাসীমাও হঠাৎ আমায় বললেন 'তুমি কিছু খাচ্ছ না।'

'সে-কী!'

'ওমা ছাখো তো' উনি বললেন 'দু-দুবার মাংস নিল।'

'বাদলার এ্যামিবায়োসিস।' সুকু বলল।

'কি-যে বলিস তোরা…বুঝি না।' মাসীমা বলেন।

'আমাশা—আমাশা।' পলটু বলল 'খালি পচ্ পচায়।'

'চুপ করবি তোরা, ছিঃ!' মাসীমা বকে ওঠেন 'যত নোংরা কথা খাবার সময়!'

'তুমি ইংরিজি বোঝ না তো কি করব?'

'থাক তোমাদের ইংরিজি' মাসীমা আমার দিকে ফিরে বললেন 'তুমি ওদের কথায় কান দিও না।'

'না, আপনিও যেমন!'

'আমার ওপর রাগ করোনি তো?'

'না-না' আমি অপ্রস্তুত হয়ে ওঁর পানে তাকাই, বলি

'এ আবার কি কথা মাসীমা?'

'না বাবা, সত্যিই। আমার মাথার ঠিক থাকে না, বুঝলে, কি-যে হয় নিজেই জানি নে। কি বলতে কি বলি।'

'ফের আরম্ভ করলে ভ্যানর ভ্যানর?' পলটু তাকায় কটমটিয়ে।

'তা-কি, আমি কথাও বলব না?'

'অন্য কথা বলো…তোমার ওই ঘ্যান্-ঘ্যান্ ছাড়ো দিকি।'

'তুই আমায় খিঁচোবি না সব সময়, বলে দিলুম!'

'তুমিই লোককে খিঁচোও…আমি না।'

'শুনলে বাবা, তোমরা শুনলে তো ..?'

পলটু কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ সুকু বাধা দিল, বলল 'ফের, তোকে এক থাবড়া লাগাবো এবার!'

পলটু নিজেকে সামলে চোখ নামালো, মুখ গোঁজ করে খেতে শুরু করল আবার।

খাওয়া শেষ হলে আঁই-টাঁই অবস্থায় আমরা ঘরে গেলুম। পলটু ভিতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিল। তারপর মাদুর পেতে সটান। মাদুরটা শুধু পড়ল ওরই ভাগে, মাঝামাঝি। সুকু আর আমার কোনাদুটো জোটে।

সুকু বলে 'লে হালুয়া...এর চে ভালো ভাবে তুই মাদুরটা একাই নে না। আমার পিঠে লাগছে।'

'দাঁড়া-দাঁড়া, ওঠ্।' পলটু উঠে দাঁড়াল।

আমি বলি 'আবার কি?'

'আঃ, ওঠ্ না তোরা··· ব্যবস্থা করি।'

'আর ব্যবস্থা করতে হবে না।'

'এ্যাই শালা!' পলটু সুকুর পিছনে একটা লাথি মারে, বলে 'পাশ ফেরা

'আমি আর নড়তে পারছি না।'

'তাহলে গড়িয়ে যা ওদিকটা...যা বলছি।'

সুকু কিছুটা গড়িয়ে গেল, আমি উঠলুম। পলটু তখন মাদুরটা তুলে আড়াআড়ি পাতলো, মাঝখানে শুতে শুতে বলল 'ব্যস, এবার শালা সাম্যবাদ...পিঠ থেকে পাছা অব্দি সবার মাদুর!'

সুকু আবার গড়িয়ে আসতে আসতে বলে...'উঃ, হাসতেও পারছি না!'

'হেগে আয়...নেদে এলে হাল্কা লাগে।'

'তুই যা হারামজাদা।'

'উঁহু, মাংস আমি নাদি না···কষ্টের পয়সা।'

'শালা!'

খালি গায়ে, পিঠ থেকে কোমর পর্যন্ত মাদুর নিয়ে, একটা লম্বা পাশ বালিশে মাথা দিয়ে তিনজনে শুয়ে পড়লুম। গরম কম। মেঘ-মেঘ ভাব আর বাতাস রয়েছে। তিনজনেরই আমেজ লাগে। সুকু একটা সিগারেট ধরিয়ে ছিল, সেটাই হাতে হাতে ঘোরে। আমি দুটো টান দিয়ে পলটুকে দিই, ও সেটা জোরে-জোরে ফোঁকে, জাহাজের চিমনির মতো। সুকু এক নিমেষ তাকিয়ে থেকে বলে 'এ্যাই ..ফোঁপরা করিস নে।'

'নো নো।'

'নো-নো কি, শালা টেনেই যাচ্ছিস!'

'ভাই সুখ টান...।

'আবার! দ্যাখ্ বাদলা, দ্যাখ্।'

'এ্যাই পলটা, ফেরৎ দে ওকে।' আমি বলি।

পলটু ঈষৎ পাশ ফেরে সুকুর দিকে, বলে 'নে ধর...।'

'ইস্স্···এইটুকু বেঁড়ে করে দিলি?'

'হারামী...তোরা টানিস নি?'

'তুই আর বাদলাই শেষ করেছিস।' সুকু বলে।

'বেশ করেছি।...তুই ব্যাটা বাদলার চাকরির কি করলি?'

'ওরে! চাকরি আমার ভাশুর, না, ঘোমটা দিয়ে বল্লেই হয়?' সুকু বলে।

'কংগ্রেস তো তোর ভাশুর।' পলটু বলল।

'যা-ব্যাটা, কংগ্রেস-কংগ্রেস করিস না।'

'আলবাৎ করবো···তুই কংগ্রেস তোর বাপ কংগ্রেস...।'

'আঃ, কী হচ্ছে কী!' আমি উঠে বসি।

সুকুও বসে পড়ে, আমার দিকে তাকিয়ে পলটুকে নির্দেশ করে বলে, 'ও বাপ তুলেছে...তুই সাক্ষী।'

'এটা কী হলো পলটা?' আমি বলি।

'পলটু এক নিমেষ হতবাক্ হয়ে যায়, কিছু বলে না। তারপর ছোট্ট করে বলে 'সরি।'

আমি আবার শুই, শুতে শুতে বলি 'গগন-জ্যাঠার মতো মানুষ কম।' পলটু কিছু বলে না, চোখ বুঁজে থাকে। নড়েও না সামান্য। সুকু রাগ তখনো পুরো যায় নি, সে বিড়বিড় করে। বিড়বিড় করতে করতে শোয়, বলে 'আমরা কোনো কাজ গুছোই নি...না আমার বাবা [illegible] আমি··· ।'

পলটু একভাবেই বলে 'বললুম তো সরি।···মাইরী!'

অকস্মাৎ আবহাওয়াটা গুমোট হয়ে উঠল। শুয়ে-শুয়েই নীরবে সু[illegible] সিগারেট নেভাল। পলটু থাকল টান হয়ে, চোখ বুজে শুয়ে। মাই[illegible] বলার সময় শুধু একবার তাকিয়ে ছিল সুকুর দিকে। কিন্তু ওরও ভিত[illegible] ভিতরে প্রতিবাদ আছে; হেরে যাওয়ার একটা ধাক্কা। আমিও কথ[illegible] বলি না। সেই মুহূর্তে যাই বলি তাই শোনাতো খাপছাড়া। হঠাৎ বলব[illegible] বা কি মাথায় আসে নি। শুধু টের পেয়েছিলুম সবার শ্লথ আবেশট[illegible]

কেটে গেছে। ঘুম-ঘুম ভাব তো বটেই, এমন-কি আগের সেই আয়েসটুকুও অন্তর্হিত। বরং একটা চাপা, অব্যক্ত, ক্ষিপ্র অনুভূতি পরিব্যাপ্ত সারা ঘরে।

সুকুই শেষ পর্যন্ত কথা বলেছিল, ঠিক কথা নয়, স্বগতোক্তি। কড়ি-বরগার দিকে চেয়ে চেয়ে সে বলে 'তোর দরখাস্ত, রেকমেণ্ডেশান্‌ সবই দিয়ে এসেছি...'

আমি তাড়াতাড়ি বলি 'থাক্ না-রে ও-কথা।'

'থাকাথাকি কি···যা ফ্যাক্ট তাই বল্‌ছি।'

'জানি জানি···অন্য কথা বল্‌।'

'অন্য কথা বলবে কি' হঠাৎ পল্টু উঠে বসল, বলল 'ওর নিজের চাকরি হয়েছে যে তোর হবে?' আমি বাধা দেবার আগেই সুকুও উঠে বসে, বলে 'আলবাৎ হবে···দুজনেরই হবে।'

'দেখব···শুধু বাৎ-কে বাৎ!'

'দেখিস—দেখিস...সত্যদা কালই বলেছে।'

'রাখ্‌-রাখ্‌ তোর সত্যদা!'

'ফের!'

'তোর সত্যদা একটি ব্লাফ্‌...বোগাস মাল।'

'তোরা চুপ করবি' এবার আমিও উঠে পড়ি, পল্টুকে বলি, 'কেন মিছিমিছি তর্ক করছিস, তুই থাম্‌ না।' সুকু বলল 'এঁড়ে তকে ওস্তাদ... ইডিয়েট!'

'তোর সত্যদাই এঁড়ে, ইডিয়েট...বোগাস।'

'দেখছিস্‌-দেখছিস্‌ বাদলা। শালা পলিটিক্সের তুই কি বুঝিস-রে?'

'পলিটিক্সে আমি পেচ্ছাপ করি...মুতি!'

'ওই! পেচ্ছাপ আর হাগা, এই শুধু জানিস্‌ তুই···।'

এই অতর্কিত কথার ফেরে পল্টু হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। আমিও আর সময় দিলুম না, একেবারে উঠে দাঁড়ালুম। বললুম 'চল্‌, বাইরে যাই...সুন্দর মেঘ করেছে।'

ওরা দুজনেই একসঙ্গে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল, তখুনি কিছু বলল না। আমি জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতে বললুম, 'শুয়েও আর লাভ নেই... ঘুমের দফা গয়া।' সুকুও উঠে পড়ল, বলল 'যা বলেছিস...আয় দুজনে এ-শালাকে তুলি।'

আমরা তৎক্ষণাৎ পল্টুর দু-হাত ধরে টানতে লাগলুম, ও চ্যাচাল 'ছাড়-ছাড়, উঠছি।'

পার্কে মেঘের ছায়া আর উন্মুক্ত বাতাস। অদূরে দুটো গরু চরছে, তারও পিছনে, বাঁধানো চত্বরে বেশ ছোটোখাটো ভিড়। রোজই হয়, আশপাশের বাড়ির ঠাকুর-চাকরের আড্ডা। সাধারণত তাস আর লুডো চলে এক-এক জটলায়। কচিৎ দাবাও। ওই ভিড়টুকু ছাড়া পার্ক প্রায় খালি ; শুধু দক্ষিণে, বেঞ্চির সামনে ঘাসে একটি ছেলে সটান শুয়ে আছে। ঠিক তার পাশেই, মাথার কাছে, নিজের হাঁটুতে মুখ রেখে, একটি তরুণী। সম্ভবত দুজনেই নিচু-স্বরে কথা বলছে ; একদিকে রয়েছে কিছু খাতা-বই।

পার্কে আমাদের পরিচিত কোণে গিয়ে সুকু সোজা শুয়ে পড়ল, বলল 'আঃ, নাথিং লাইক আউটডোর লাইফ!' পল্টু বসতে বসতে বলল 'ব্যাটার ভাব জেগেছে!'

'হ্যাঁ-রে হুলো,.. জেগেছে।'

'শালা রোদ থাকলে বুঝতিস...পোয়েট্রি...।'

'যাঃ-যাঃ, তোর রস-কস্ সব গেছে· গরু।'

'ব্যাটা গরু তুই ঘাসে মুখ রেখেছিস্। রস দেখ্‌বি তো ওদিকে তাকা।'

সুকু এবার পাশ ফিরল, একহাতে মাথাটা উঁচু করে তাকাল দূরে বসে থাকা ছেলেমেয়ের দিকে। কিছু বলল না, একপলক পরেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

পল্টু বলল, 'দেখলি, মধু গুল্‌গুলি?'

'রাখ বেকারের মধু!' সুকু বলে।

'বেকার ফেকার জানিনা···শালা বান্ধবী নিয়ে আছে।'

'আজ আছে কাল নেই···বিরহের বাঁশি বাজবে।'

'তুই শালা সিনিক্।'

'বেশ। চুপ কর তো···আমি এবার ঘুমোব।'

সুকু পাশ ফিরল, চোখ বন্ধ করে হাত দিয়ে চোখ ঢাকল। পল্টু তখনো বসে বসে সিগারেট টানে, তাকিয়ে থাকে অন্যমনস্কভাবে। হয়তো কিছু ভাবছে কিংবা তাও নয় ; অসংলগ্ন ছেঁড়া-ছেঁড়া চিন্তায় বিমনা। আমি আগেই শুয়ে পড়েছিলুম। চিৎ হয়ে দেখছিলুম মেঘের দৌড়। উপরে খুব জোর বাতাস, মেঘ যাচ্ছে দ্রুত, ছোট ছোট পুঞ্জগুলো যায় পাক খেয়ে খেয়ে, আর

অন্তগুলো সমুদ্রের বৃহৎ বালিয়াড়ির মতো ভাসে। উপরে শূন্যে দেখতে দেখতে নিজেরই মনে হয় নিরালম্ব বয়ে যাচ্ছি হাওয়ায় হাওয়ায়। পাশ ফিরলে কানে আসে ঘাসের আওয়াজ; কচি নিমপাতার ভিতর দিয়ে বাতাস বয়ে এলে যেমন শোনায়। চোখে পড়ে বাতাসের তাড়ায় মাঠের ঘাস, মেঘের আড়ালে সূর্য ডুবে যাওয়া ছুটন্ত ছায়ার মতো, আমারই দিকে দৌড়ে আসছে ক্রমাগত।

হঠাৎ পল্টু কথা কইল, বলল সুকুটা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?'

'বোধহয়।'

'তুইও চুপচাপ মেরে গেলি যে?'

'এম্‌নি।'

'কি ভাবছিস?'

আমি হাসলুম, ওর দিকে তাকিয়ে বললুম 'কিছু না তুই?' পল্টু কিছু বলল না, আমার পাশে শুয়ে পড়ল। শুয়ে অল্পক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। তিনটে চিল তখন উতলা বাতাসের মধ্যে ভাসার চেষ্টা করছে। বারে বারে হাওয়ার দমক উল্টো দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাদের। অনেকটা উজানে সাঁতার দেওয়ার মতো। সে-দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই, যেন আপন মনে, পল্টু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, মেয়েরা কি চায় রে?'

'কি জানি...হঠাৎ?'

'বল্ না, তুই তো অনেক বইপত্তর পড়েছিস।'

'এটা পড়িনি।'

'ঠাট্টা করছিস্?'

'না না' আমি হেসে ওর দিকে তাকাই, দেখি ওর মুখ গম্ভীর, চিন্তাচ্ছন্ন, বলি 'হয়তো আমরা যা চাই তাই-ই, সুখ শান্তি...।'

'নিরাপত্তা?'

'ওটা তো গোড়ার কথা।'

পল্টু অকস্মাৎ উঠে বসল। সিধে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক নিমেষ। চোখে চাপা আলো আর মুখে হাসির আভাস। আমিও হঠাৎ চেয়ে থাকি নীরবে, শেষে হেসে ফেলি। সঙ্গে সঙ্গে ওরও চোখে মুখে হাসি ছড়িয়ে যায়। আমি বলি 'কি-রে কি ব্যাপার?'

'তোকে একটা কথা বলব?'

'বল্।'

'কাউকে বলবি না কিন্তু...মাকেও না।'

'বেশ।'

'আমি ছায়ার প্রেমে পড়েছি।'

'ছায়া?'

'ওই আমার কলিগ্‌...একই অফিসে কাজ করে।'

'গুড্‌ শো...চালিয়ে যা তুই!'

পল্টু হঠাৎ কেমন সলজ্জ হয়ে গেল। আমার চোখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বড় রাস্তার পানে তাকিয়ে থাকল। শুধু তার সারা অভিব্যক্তিতে ছড়িয়ে রইল এক অন্তর্লীন আনন্দের আভা।

স্বকু এসে সকালে হাঁকাহাঁকি করেছিল। আমি তখন কলে কাপড় কাচছি। তাড়াতাড়ি কেচে দিলে সাড়ে এগারোটা-বারোটার মধ্যে ধুতিটা শুকিয়ে যায়। দাওয়ার দু-দিকে দুটো গিঁট দিয়ে, লম্বালম্বি মেলে দিই। তাতে শুকোয় তাড়াতাড়ি। শুকোলে, বড় কাঁসার বাটিটা চেপে-চেপে পাট করি। সেই পাটশুদ্ধ ডাঁই করা বিছানার নিচে কিছুক্ষণ রাখলে কিছুটা পাটভাঙা মসৃণ দেখায়। কিন্তু কাপড় একেবারে কড়কড়ে শুকিয়ে গেলে সুবিধে হয় কম, ভাঁজও হয় না ভালো, না জমিটা দেখায় টান-টান। ধুতি মেলে দিয়ে নজর রাখতে হয় তাই, ফেলে রাখলেই ফ্যাসাদ। স্বল্প আর্দ্র মোলায়েম ভাবটা থাকতে থাকতেই তুলতে হয়। ঠিক ভিজে নয়; একটা শীতল নম্রভাব যখন কাপড়ে ছড়ানো তখনই তোলা ঠিক। সত্যি ভিজে থাকলে শুধু স্যাত্‌প্যাতে থাকে যে তা নয়, উপরন্তু একটা বোঁট্‌কা গন্ধও বেরোয়।

মুস্কিল এই যে দাওয়াটায় ধুতি লম্বালম্বি না মেলে দিলে ব্যাপারটা খাপছাড়া থাকে। দড়িতে কয়েক পাটে শুকোতে দিলে বাইরের দিকটা যায় শুকিয়ে অথচ ভিতরের জমিটা থেকে যায় ভিজে-ভিজে। জায়গায় জায়গায় রীতিমতো সিক্ত। সেটা আরো বিশ্রী। অথচ লম্বালম্বি শুকোতে দিলে পলটুদের দিকের দাওয়ার অংশও ঢেকে যায়, কেননা দাওয়াটা ওদেরই ভাগে প্রায় সবটা। এদিকে দাওয়া ঢেকে গেলে মাসীমার আধো-আঁধার ঘর আরো ঘোলাটে হয়ে যায়। সারাক্ষণের জলজ ভাবটা যেন বাড়ে। গরমে সেটা সহ্য হয় কিন্তু শীতে যেন গায়ে লাগে। তাই মাসীমার মেজাজের উপর নজর রেখে কাজ করতে হয়; তাছাড়া পলটু যেদিন সার বেঁধে তার জামা-কাপড় মেলে যায়, সেদিন তো কথাই নেই। আমি আউট।

একদিন, পল্টুর সঙ্গে রাতে মাসীমার বিতণ্ডার কথা না জেনেই, আমি কাপড় লম্বালম্বি মেলে রেশন তুলতে গেছিলুম। ফিরে এসে শুনি ঝড় বইছে। মাসীমা অজস্র গালমন্দ করছেন। মার কাছে এসে শুনলুম পল্টু বেরোবার পরই উনি গলা তুলেছেন। মা সঙ্গে সঙ্গে কাপড়টা এদিকে তুলে এনে, ছোট করে মেলে দেবার পরও, অবিশ্রাম নিজেকে করাঘাত করে যাচ্ছেন। আমি হঠাৎ বোঝাবো ভেবে এগিয়ে গিয়ে বলেছিলুম—

'মাসীমা, আমার ভুল হয়ে গেছে…।'

'হয় কেন? বাবা, নিজেদের ব্যাপারে তো ভুল হয় না!'

'মাফ করবেন, খেয়াল ছিল না…।'

'খুবই ছিল, ঠিকই ছিল…বলি আমি কি এতই মুখ্যু যে মানুষ চিনি না…এঁ্যা?'

'আপনি বিশ্বাস করুন…আর আমি…।'

'শোন কথা! আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কি আছে…সত্যি, তোমরা নিজের স্বার্থ বোঝো কি বোঝো না বল? বুকে হাত দিয়ে বল তো বাবা?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না…'

'তা বুঝবে কেন…আমার পোড়া কপাল! আমার ছেলে ভাড়া গুনবে, আর রাজ্যির লোক থাকবে খোঁয়াড়ে…।'

'ভগবানের মার আর কাকে বলে গো…তিনিই কি বোঝেন?'

আমি আর কি বলতুম জানিনে, হয়তো কিছুই নয়। শুধু অপমানে আক্রোশে চিৎকার করে উঠতুম। কিন্তু তার আগেই মা এসে আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললেন, বললেন 'কী হচ্ছে বড়…উনি অসুস্থ!'

সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল এরকম অসুস্থ লোক বাঁচে কেন? এদের কী অধিকার দুনিয়ার বাতাস বিষিয়ে তোলার; মরলেই পারে! কিন্তু ঘরে এসে, বাবার দিকে চোখ পড়ায়, আমার অন্ধ ক্রোধ কেমন সিঁটিয়ে গেল। দেখলুম উনি অসহ্য হাঁপের মধ্যে, ক্লেশ আর দুর্ভোগের শেষ প্রান্তে এসেও, আমার দিকে তাকিয়ে আছেন অপলক ভর্ৎসনায়। ভর্ৎসনাই শুধু নয়, প্রথম পলকের পরই আমি বুঝলুম, ওঁর চাউনিতে মাসীমার দৃষ্টির মতোই অবজ্ঞা ও ঘৃণা। কিংবা হয়তো পঙ্গু, নিরুচ্চারিত রাগ।

একটা বিশ্রী বিকট ঘড়ঘড়ে আওয়াজের ভিতর, হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে ওঁর গলা ফুটল, বললেন 'বীরপুরুষ! বন্ধুর মার উপর তড়পাও!'

মা হঠাৎ বলেন 'তুমি থামো তো।'

'না!' বাবা দুঃসহ দম নেন, যেন ওঠার চেষ্টা করতে করতে বলেন 'অপদার্থ...! বেরিয়ে যাও তুমি।' আমি নির্জীবের মতো বেরিয়ে এসেছিলুম। ভয়ে রাগে বা অপমানে নয়; সে-সব সংকুল বোধ ছাপিয়ে হঠাৎ এক দুর্মর আশঙ্কা আমায় ব্যাপ্ত করেছিল। চকিতে, বিদ্যুতের ঝলকের মতো। কিন্তু চৈতন্যে পরিষ্কার হয়নি সে আকাঙ্ক্ষা; শুধু ইন্দ্রিয়ের গভীরে কোথায় চনমন্ করে উঠেছিল তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসার তাগিদ। সেই তাড়াতেই অনেকক্ষণ নিরুদ্দেশ পথ চলার পর, হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল ঘরে আর একমুহূর্ত থাকলে বাবার মৃত্যু অবধারিত হত। হয়তো ইন্দ্রিয়ের এই শঙ্কাতেই, কিছু বোঝার বা ভাবার আগেই, নিজের অজ্ঞাতে আমি বাইরে চলে এসেছিলুম। আসার মুখে শুধু অস্পষ্ট টের পেয়েছিলুম, আচ্ছন্ন অন্ধকারে তারার ক্ষীণ আলোর মতো, যে, মা অকস্মাৎ কাঁদতে শুরু করেছিলেন। ওঁর শরীর থরথর করে কেঁপে অসমর্থ, উপায়হীন কান্নায় আপ্লুত হয়ে গেছিল।

অভিমান বা ক্রোধের কান্না যেমন চেনা যায়, আনন্দ অশ্রুও তাই। আবার কোনো কোনো কান্না থাকে অভিযোগের বা অনুনয়ের, কিছুটা বা বিলম্বিত তার লয়। আর গভীর দুঃখে উৎসারিত কান্নায় জাগে অন্তর্লীন পরিব্যাপ্তির বোধ, এক অমুক্ত ব্যাপকত্ব; এক থেকে বহুকে এবং বহু থেকে এককে একীভূত করার নৈর্ব্যক্তিকতা। কিন্তু মা কাঁদেন একাকী, বনের আড়ালে বয়ে যাওয়া ছোটো নদীর মতো। সেখানে অনুযোগ, আশা বা রাগ নেই; আছে অনির্দিষ্ট অধরা, সমর্পণ। সে সমর্পণে কোথায় কিসে এবং কেন লুপ্ত, এমন কি সেখানে নেই নিজস্ব কোনো ক্ষোভ প্রত্যাশা বা বিলাপ। আশাহীন অক্ষমতাই বোধহয় এর উৎসে; যদিচ মিনিমাসীও যখন মাকে সঙ্গোপনে জড়িয়ে নির্বাক কাঁদেন তখন এর কোনো হেরফের হয় না। বরং দুজনের কান্নাই হয়ে যায় একাকার, অভিন্ন। কোথা থেকে আসে এ-একাত্মতা, এ সহমর্মিতা, আমি বুঝি না। হয়তো এত সহস্র বছরের সভ্যতার পরও, আজো, সব মেয়েরই নিভৃত ব্যক্তিত্বে, একান্ত গভীর আত্মজ্ঞানে রয়ে গেছে অসামর্থ্যের বোধ; অক্ষমতার দিশেহারা অনুভব। সে অনুভব সম্ভবত মায়ের মধ্যে স্পষ্ট ও প্রাত্যহিক, আর মিনিমাসীর অন্তঃস্থল শুধু কাঁপে অকস্মাৎ মাঝে-সাঝে মায়ের সান্নিধ্যে। নিজস্ব দৈনন্দিন জীবনে ভুলে থাকা মানুষের দুর্ভাগ্য, নিরাশা, বঞ্চনা, হয়তো বা মার মুখোমুখি এসে মিনিমাসীর স্থৈর্যের আড়াল দীর্ণ করে। উনি এখন সম্ভবত ভেঙে পড়েন নারীর সঙ্গোপনে লুকোনো

অক্ষমতার বোধে। তাই যাকে যতটা পারেন উনি এড়িয়ে-এড়িয়ে চলেন, অনেকটা আত্মরক্ষার খাতিরেই।

সমাজই কি মেয়েদের এই অসামর্থ্যবোধের উৎসে? নিজের পরনির্ভরতাই অন্তঃস্থল আশঙ্কায় নিয়ত কাঁপায়? হয়তো বা। অন্তত এটুকু পরিষ্কার যে বাবা যতদিন সক্ষম ছিলেন অথবা আজো আমি, এই প্রতিকূল পরিবেশেও, মায়ের মতো ওই নিশ্চুপ, অকপট, অনুযোগহীন কান্নায় আপ্লুত হবো না। কোথাও থাকবে অমুক্ত প্রতিবাদ কি প্রত্যাশা, রাগ অথবা অভিযোগ। হুঙ্কার না দিতে পারি অন্তত অলন্ত অঙ্গারের মতো থাকবে অভিশাপ উষ্ণ অশ্রুবিন্দুতে।

দুপুরে আর সেদিন বাড়ি ফিরি নি। তপ্ত আবেগ এবং মিশ্র, অগোছালো চিন্তা নিয়ে অক্লান্ত হেঁটেছি। গোলদিঘিতে গিয়ে কিছুক্ষণ বসেছিলুম। তখন মধ্যাহ্নে কিছু ন্যাংটো বাচ্চা পুকুরে হৈ-হৈ করছিল। ওদিকটায় স্নান সারছিল দোকানী, হকার, স্টলের মালিক। ঘাটে দু-একজন বৌ-ঝি। গাছের তলায় ভিখারীর সংসার এবং ছায়াচ্ছন্ন বেঞ্চে কলেজ-পালানো, নিভৃতি-বিলাসী ছেলেমেয়ে। ছেলেগুলো প্রেমিক-প্রেমিক ভাব করে আছে আর মেয়ে তিনটি লীলাময়ী। য়ুনিভার্সিটির সিঁড়িতে ভিড়। ভিড় ফুটপাতে এবং অর্ধছায়াঘেরা প্রেসিডেন্সি কলেজ-লাগোয়া সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বইয়ের দোকানের সামনে। সে ভিড়ের বেশির ভাগই যাতায়াতের, দৃষ্টি দেওয়ার। কেনাকাটা প্রায় নেই।

কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের পাশে, কেশব সেন স্ট্রিট যেদিকে চলে গেছে মার্কাস স্কোয়ারে, সেদিকে অল্প ঢুকে, এক ছোট্ট মুসলমান সরাইখানায় তিনটি রুটি আর ক্রি ডাল খেয়েছিলুম আমি। খেয়ে সটান হাঁটা দিয়েছিলুম চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ ধরে। তখন গাড়ি-বাস ঈষৎ কম। রাস্তার হাইড্রেনে, বৌবাজারের মোড়ের কাছাকাছি, অনেকগুলো ঠেলাওলা আর রিক্সাওলা স্নান করছিল। তাদের ওদিকটায় দাঁড়িয়েছিল দুটো জরাজীর্ণ ঘোড়াগাড়ি, এটা স্ট্যাণ্ড। ফুটপাতে উঠলেই ছাতুওলা। ঝুড়িতে ছাতু, কয়েকটা কাঁসার কাঁদাউঁচু কটোরা, ঘটি আর নুন এবং কাঁচালঙ্কা। যার খাওয়া শেষ হচ্ছে সে নিজেই ধুয়ে রাখছে কটোরা, ঘটি। জল খেয়ে একটা আরামের আওয়াজ তুলছে।

ওদিকে গাড়িতে উঠছে ঢ্যাখো ভারতীয় বুর্জোয়াজির বপু জালার মতো পেটে জ্যান্ত বোয়ালমাছ সাঁতরাবে অনায়াসে। মুখে ওর তৈলাক্ত

আত্মপ্রসাদ, হাসিতে লোভ আর হাঁটতে হাঁপায়। দাঁড়িয়ে কিংবা বসে-বসেই, সহস্রের সমুখে বিকারহীন ব্যঞ্জনায়, হাতের চাপে পশ্চাৎদেশ আলগা করে বায়ুত্যাগ করে, অথবা জায়গা বিশেষ চুলকোয়।

এর থেকে এমনকি হৃতগৌরব, বিকলাঙ্গ কার্জান পার্কই ভালো। লাটসাহেবের বাড়ির দিকটায় কিছু গাছ আছে। সেখানে ছায়ার মমতা; কিছু অলস অকর্মণ্য প্রাণীর বিশ্রাম। আমারও আর পা চলছে না, এতক্ষণে টের পাচ্ছি দু-পায়ের গোছ ভার হয়ে আসছে। তাছাড়া ডানপায়ের বুড়ো আঙুলে চটির পেরেকটা আবার খোঁচাচ্ছে; অল্প অল্প কুরে-কুরে খেয়ে এখন জ্বালা ধরিয়েছে ক্ষতটায়। একটু বরং এলাই মাঠে, ঘাসের ঠাণ্ডায় শুয়ে পাতার ফাঁকে আকাশ দেখি।

দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে গেছিলুম জানি না। ঘুম ভাঙল যেন হঠাৎ শব্দে। আসলে হঠাৎ নয় মনুমেণ্টের তলায় কাদের মিটিং আরম্ভ হয়েছে। মনে হল জ্যোতিবসুর উদাত্ত কণ্ঠ। এদিকে কার্জন পার্কের বুক চিরে যে রাস্তা গেছে এসপ্ল্যানেডের ট্রাম গুমটির দিকে, সেটা দিয়ে চলেছে কাতারে কাতারে লোক। বাবু, কেরানী, ছোকরা, সাহেব-সাজা সজ্জন এবং মহিলা।

সবার মধ্যেই গৃহগমনের ঊর্দ্ধশ্বাস অভিব্যক্তি; ট্রাম অথবা আরো এগিয়ে বাস ধরার একাগ্রতা। মাঠে যে মিটিং চলছে, বাতাসের ঝাপটায় থেকে থেকে ভেসে আসছে বক্তৃতার গমক, সে-সম্বন্ধে কোনো সচেতনতাই নেই। কারুর যে কিছু কানে যাচ্ছে না তা নয়, কিন্তু ট্রামে চড়ার কিংবা বাসে ঝোলার তাগিদই সারা চৈতন্য ব্যাপ্ত। কেউ হয়তো পথে-বাজারে নামবে, কেউ দৌড়ুচ্ছে স্টেশানে, কেউ কয়লা বা কেরোসিনের সন্ধান পেয়েছে। ভদ্রমহিলা আমূল বেবিফুডের কৌটোটা জাপ্টে চলেছেন, হয়তো অফিস কো-অপারেটিভের দান। অথচ এ-পরিবেশেও আমরা বিপ্লবী পরিস্থিতি আবিষ্কার করেছিলুম। কো-রিলেশান অফ ফোর্সেস অ্যাণ্ড সাবজেকটিভ-অবজেকটিভ ফ্যাক্টরস্, রেভোলিউশনারি ভেবেছিলুম! বলেছিলুম গ্রামাঞ্চলে নাকি বিপ্লবের দাবাগ্নি জ্বলছে, শহরও বারুদের মতো দাহ্য। দু-একটা স্কুল-কলেজ পোড়ালে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীশত্রু খুন হলে, গেলে কয়েকটা সেপাই বা ক্ষুদে পুলিশ, কলকাতা শহর মুক্ত হবে; গ্রাম ঘিরবে শহর এবং অতঃপর গ্রাম শহরের রাখীবন্ধন ঘটবে!

অথচ গ্রামে গিয়ে দেখলুম সব ধূ ধূ। আমরা যাকে রিভিশানইজম্

বলতুম, সেই দু-মুঠো ফসলের কিংবা একফালি জমির দখল নেওয়ার কথা যদি বা গ্রামের দরিদ্রে বোঝে, সামান্য সাড়া দেয়, তবু ক্ষমতার লড়াই তাদের কানে যায় না। এ-সব সংগ্রাম ইকনমইজম্, শোধনবাদী...আসল শত্রু ইন্দিরা গান্ধী, ভারত সরকার...এহেন কথায় তারা সাধারণত অবোধ চোখে চেয়ে থাকত। আরো বিভ্রান্ত, হতভম্ব হত রেড বুক-এ, যা না ছুঁয়ে, যার হলপ না পেড়ে, নেতা আমাদের কথা বলতেন না। অগত্যা আরম্ভ হল নির্ভেজাল মিথ্যা দিয়ে ব্যর্থতা লুকোনো; অতিরঞ্জন, সন্দেহ ও সত্যের অপলাপে বায়ু বিষাক্ত। নিজেরা বিভক্ত, দ্বিধান্বিত, শত্রুভাবাপন্ন হলুম; মরলুম পরস্পরে হানাহানি করে, পথে বা জঙ্গলে কিংবা পুলিশের হাতে।

অথচ সহস্র সহস্র লোক আজো ছুটছে ট্রাম-বাসের দিকে একাগ্র অভিনিবেশে। সংসারের প্রাত্যহিক বিড়ম্বনায় উর্দ্ধশ্বাস। আমি রয়েছি বসে গাছের তলায়; নেতারা বক্তৃতা দিচ্ছেন। হয়তো গগনজ্যাঠাই ঠিক, কোনো মৌল ভ্রান্তিই আমাদের মরীচিকা। শ্রেণীবিশ্লেষণই ভুল; রাজ্যপাট চালাচ্ছে সত্যিই পেটিবুর্জোয়া। কিন্তু উৎপাদন প্রণালী মূলত বুর্জোয়াজির কব্জায়। ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী তাহলে মধ্যবিত্ত শাসক বুদ্ধিজীবীর অংশ।

হঠাৎ আমার হাসি পেল, কী উদ্ভট, অবাস্তব চিন্তা! উঠে পড়লুম। পিছনটা আপনা থেকেই ঝেড়ে নিয়ে হাঁটা দিলুম চৌরঙ্গির দিকে। বেঙ্গল রেস্তোঁরার সামনের দোকান থেকে একটা চারমিনার ধরালুম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলুম হন্যে মানুষের ফেরার ভিড়। বাসে উঠতে পারলে ভালো হতো; সময়মত টিউশানিতে পৌছুতে পারতুম। হঠাৎ কে পাশ থেকে বলল 'মাস্টারমশাই, আপনি!' ফিরে দেখি কুন্তলা, প্রায় গায়ের কাছে, বলি 'আরে!'

'ভিড় দেখছেন?'

'কী আর করি...!'

'বাসে উঠতে পারবেন না।'

'তাই ভাবছি···আপনি এদিকে?'

'সিনেমায় যাব।' কুন্তলা হাসল, বলল 'এখানে অপেক্ষা করার কথা।'

আমি কিছু বললুম না। চটপট স্বাভাবিক কিছু একটা বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কথা গুলিয়ে গেল। অহেতুক যুক্তিহীন ধাক্কা খেলুম ভিতরে ভিতরে।

ভিড়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েও অকস্মাৎ নামটা মনে স্পষ্ট খেলে গেল। সুদর্শন ঘোষ।

'আজ আপনার পড়ানো হবে না!' হঠাৎ কুন্তলা বলল।

'দেখি .।'

'তার চে আপনিও সিনেমায় চলুন।'

'না না।'

'না-না কেন? পুরোনো ছবি, টিকিট পাওয়া যাবে।'

'আজ থাক্।'

'আপনি মিছিমিছি সঙ্কোচ করছেন।'

'না-না, আসলে শরীরটা ভালো নেই।' কথাটা বলেই মনে হলো ভুল করলুম। কুন্তলা খুঁটিয়ে দেখছে। এতক্ষণ হয়তো ওর চোখে পড়ে নি আমার হাল। নিজের তন্ময়ভাবে ছিল অন্যমনস্ক। এখন হঠাৎ সচেতন হল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলুম আমার গলা থেকে একটা উষ্ণ অনুভূতি ছড়াচ্ছে মুখে। কানদুটো তপ্ত হয়ে আসছে। তারই মধ্যে শুনতে পেলুম 'বাঃ, বাদলবাবু যে!'

ফিরে দেখি সুদর্শন এসে গেছে, হাসিমুখে বলল :

'মিটিং-এ গেছিলেন?'

'না।'

'আমি ঘুরে এলুম।'

'কি শুনলেন?'

'একই কথা, ভিন্ন সুরে।'

আমি হেসে ফেলি, সুদর্শনও। কুন্তলা হঠাৎ বলে 'মাস্টারমশাইকেও ডাকছি আমাদের সঙ্গে।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই...আসুন।...খুব ভালো হয়।'

'আজ পারবো না।'

'আহা, একদিন কাজে নাই গেলেন · !'

'ঠিক তা নয়।'

'তবে?'

'বলছেন ওঁর শরীর ভালো নেই।' কুন্তলা বলল।

সুদর্শন দেখল একপলক, তারপর বলল 'চলুন তাহলে চা খাই।' সবাই ঢুকলুম দোকানে। সুদর্শন তিনটে মটন কবিরাজী বলল চায়ের সঙ্গে।

আমি বললুম 'আপনাদের দেরি হবে না তো?'

'কিসের দেরি···এখনো সতেরো মিনিট···তারপর হাবিজাবি আছে আধঘণ্টা।'

'কি ছবি?'

'Cold Sweat'···থ্রিলার।'

আমি কিছু বললুম না। ছবিই দেখিনি কতকাল। নামও দৃষ্টি এড়ায়। আসলে মন যেখানে নেই, নেই কোনো উৎসাহ, সেটাই মৃতপ্রায়। আছে হয়তো কোথাও কিছু, কখনো অবচেতনায় নাড়া দেয়, অথচ চৈতন্যে উধাও। তার কোনো দাগ নেই।

সুদর্শন কাটলেট কাটতে কাটতে বলল, 'আপনার সঙ্গে একদিন গল্প করব।'

'বেশ তো।'

'কবে সময় হবে বলুন।'

'হলেই হলো···আমি তো নিজ্ঞন ব্রেজনেভ নই।'

সুদর্শন হাসল, বলল 'আমার অনেক জিজ্ঞাস্য আছে।'

'ওরে বাবা।'

'সত্যি।···ভীষণ কৌতূহল।'

আমি তাড়াতাড়ি খাবার মুখে দিলুম। বলার কিছু নেই। মনটা ঈষৎ বক্র হয়ে গেল। আবার সেই জানা রাস্তা; রূপকথার সন্ধান। সেই নকশাল-বাড়ি, ডেবরা, গোপীবল্লভপুর···বাতাসে ছড়ানো নাম। আকাশের নীলের মতো যা মায়া। কাব্যের রহস্যে নয়, আসলে অভিরঞ্জনে ও ইচ্ছাপূরণে যা তৃষ্ণার্তকে দূরের জলাশয়ের মতো ডাকে। যার সত্য ছাপিয়ে পড়ে আছে কেবল আকাঙ্ক্ষার আলো। আমি ওর কোনো জায়গায়ই যাই নি; যেখানে ছিলুম সেখানকার মর্মান্তিক ব্যর্থতায় স্বপ্নের পাণ্ডুর আভাসও নেই; আছে দিক-চক্রবালে একাকার বিস্তীর্ণ ঊষরতা, যাতে সংজ্ঞা হারায়। তবু বারে বারে ফিরে আসতে হয় অর্বাচীনের এই কৌতূহলের মুখোমুখি, একই প্রশ্নে: তারপর? এ আমার ভালো লাগে না, মনকে অকস্মাৎ উত্তেজিত করে, কখনো অবসাদে ক্লান্ত।

আমি চা খেয়ে হঠাৎ উঠে পড়ি, বলি, 'থ্যাঙ্কস্ ..পরে দেখা হবে।'

ওরা ঈষৎ থমকায়। কিন্তু সুদর্শন একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সামলে নেয়। স্মিতমুখে বলে 'আচ্ছা··।'

'চলি।' কুন্তলাকে বলি।

ও নীরবে ঘাড় নাড়ে। বুঝি ওর মন সুদর্শনের মতো অতটা সজাগ নয়। অনেকগুলো স্তরে এখনো ওর চলাচল মন্থর। বেশ গোছানো মজলিশের মাঝে আকস্মিক ছন্দপতন ওকে এখনো বিমূঢ় করে। হয়তো বোঝে সবই, প্রচ্ছন্ন বোধটুকু পরিষ্কার হয় ঈষৎ যতির পর।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আমি দ্রুত ধর্মতলার দিকে হাঁটা দিই। সোজা চলি কোনো দিকে না তাকিয়ে। আর দোকানটা থেকে যত দূরত্ব বাড়ে, তত টের পাই ভিতরে এক ঘনায়মান বিষাদ। ভিড় কোলাহল যানবাহন সব চৈতন্য থেকে মিলিয়ে যেতে থাকে। অথবা ঠিক মেলায় না, থাকে চেতনায় গভীরে, ইন্দ্রিয়ে ঝাপসা হয়ে গিয়ে। স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে অন্য অপরিচিত এক বোধ, যা আমি অস্বীকার করি, লুকোই, মানি না। এবং সে-জন্যেই হয়তো, অন্ধকারে অভ্রের আভার মতো, নিঃসাড়ে এক বিষণ্ন বেদনা ছেয়ে যায় মনে।

সে দিন আর আমি পড়াতে যাই নি।

স্বকুর হাঁকাহাঁকিতে আমি বেরিয়ে এলুম। ও সদরের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে, বলল 'কি-রে, এখনো চান হয় নি?'

'কাপড় কাচছিলুম।'

'নে, তাড়াতাড়ি সার...কাজ আছে।'

'ওঃ, কি আমার কাজি!'

'ফ্যাক্ট...এক জায়গায় যেতে হবে...কুইক্।'

'কোথায়?

'বলছি ..তুই আগে দু-বালতি জল ঢেলে আয়।'

স্বকু রকে গিয়ে বসল। আমি তাড়াতাড়ি স্নান সারলুম। ঠিক বুঝতে পারলুম না ওর কি মতলব। সম্ভবত ক্লাবের চাঁদা তুলতে বেরোবে। ক্লাবের অবশ্য ততটা নয় যতটা ওর নতুন নাটকের। ওর আবার নাটুকে বাই আছে। আগে বছরে একবারই নাটক হতো, ইদানিং সুবিধে পেলেই লাগায়। এবার নাকি বিদেশী নাটক অবলম্বনে কি করবে। বাংলা করেছে নিজেই। ফিমেল পার্ট নিয়ে বা একটু অসুবিধে, তাও নাকি ও নায়িকা পেয়েছে। পল্টু শুনেই বলেছিল 'শালা!'

'কি হলো, কামড়াচ্ছে?'

'ব্যাটা, ডুবে ডুবে জল খাওয়া!'

'তোর সবতাতেই ওই...।'

'হ্যাঁ-রে...তুমি শালা কলির কেষ্ট হবে আর আমরা গোঁফে তা দেবো, না?'

'এই জন্যেই মেয়েরা থিয়েটার করে না। সত্যি, তোরাই ডোবাবি।'

ডোবানোর কথায় পল্টু চুপ করে গেছিল। সেও জানত নায়িকা-বিভ্রাট লেগেই আছে। পাড়ায় কোনো মেয়ের অভিনয় করার ইচ্ছে থাকলেও, মুখ খোলার সাহস নেই। সবারই বাড়িতে আপত্তি। একবার স্বকু মামাতো বোনকে রাজি করিয়েছিল, রিহার্সালও দিয়েছিল কয়েকদিন। কিন্তু হঠাৎ আসা বন্ধ করে দিল সে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল মদন ব্যাপারটা গুলিয়েছে। এমন কিছু নয়, সে নাকি রিহার্সালের দিন বাদেও কয়েকবার একা-একা মেয়েটির বাড়ি গেছিল। মাসীমা-পিসীমা ডেকে অন্দরে সেঁধোবার তাল তুলেছিল। সেই হল কাল। পল্টু খেপে গিয়ে বলেছিল, 'শালা মদনা, ওকে আমি ঠাঁসব।'

'না-না, কিছু বলিস না।' স্বকু বলেছিল।

'কী বলবে না!···ব্যাটা বাড়ির মা-বোনের সঙ্গে ইয়াকি।'

'আহা ও কিছু করে নি···মামীমারা ঘাবড়ে গেছেন।'

'কেন যাবেন কেন···আমার সম্বন্ধে তো ঘাবড়ান নি।'

'শোন্-শোন্···এ-সবে শেষে থিয়েটারটাই পণ্ড হয়ে যাবে। মেয়ে ভাড়াও পাওয়া যায়, পার্ট করার।'

শেষ পর্যন্ত তাই পল্টু কিছু করে নি। শুধু নেপথ্যে মদনকে ওয়ার্নিং দিয়েছিল, বলেছিল 'গ্যাখ মদনা, ভেবেচিন্তে চলবি···রিপোর্ট আছে।'

মদন এমনিতেই ঈষৎ ঘাবড়ে গেছিল, থিয়েটার পণ্ড হওয়ার সব দায়িত্ব তার ঘাড়ে পড়লে সমূহ বিপদ। সে তাই কথাটি বলে নি। থিয়েটার হয়েছিল বাইরের মেয়ে নিয়েই।

স্নান সেরে আমি সদরে এলেই স্বকু উঠে দাঁড়াল। আমি বললুম 'এত তাড়া কিসের...বস্ না।'

'না-না, এগারটায় যেতে বলেছেন।'

'বেশ কিছু ছাড়বে বুঝি?'

'ছাড়বে মানে?'

আমি ওর প্রশ্নে মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ি, ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলি 'কোথায় যাচ্ছিস বল তো?'

'সত্যদার কাছে...তোকে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'কেন?'

'চাকরি-বাকরির ব্যাপার।'

'তোরটা কি হলো?'

'হবে···বলেছেন দুজনেরটাই চেষ্টা করবেন।'

তবু আমার মনে কেমন অস্বস্তি রয়ে গেল। সুকুকে বলতে পারলুম না তোদের দলে আমি শিং ভেঙে ঢুকছি না। শিং থাক বা না থাক অন্তত এখনো ইন্দিরা গান্ধীকে মা ভবানী ভাবতে পারব না। ওঁর বা তোদের পার্টির শ্রেণীচরিত্র যাই হোক, খাস বুর্জোয়া কিংবা পেটি, অন্তত ভারতীয় ধনতন্ত্রকে তোরা জীইয়ে রেখেছিস্। অথবা বলি আধা-ফিউডাল আধা-ক্যাপিটালিজমকে। কয়েকটা ব্যাঙ্ক, কয়লা বা কপার রাষ্ট্রীয়করণ করে কিংবা ইংরেজদের পুতুল করদ রাজ্যের তথাকথিত রাজাদের টাইট দিয়ে, বিপ্লবী হোস নি। কিন্তু কথাগুলো মনে ঘুরপাক খেলেও মুখে বলি নি। এ-ব্যাপারে সুকুর সঙ্গে আলাপ চলে না। ওর দৃঢ় ধারণা ইন্দিরা গান্ধী সাম্যবাদের হোতা এবং যে দুষ্ট চক্র এখনো তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে আছে, দেশের পরিস্থিতি যত আগ্নেয় হবে, তিনি ততই তাদের থেকে সরে যাবেন। হবেন জনগণের নেত্রী, সুকুর মতো লক্ষ লক্ষ প্রগতিকামীর পথিকৃৎ। এ-আশায় সন্দেহ প্রকাশ করলে ও ক্ষেপে যায়, বলে 'ন্যাখ, কম্যুনিস্টরা ভুল করে নি, বল?'

'হয়ত করেছে।' আমি বলি।

'হয়ত-কয়ত নয়···এ আজাদি ঝুটা হ্যায়, বলে নি?'

'সে অনেককাল আগের কথা।'

'আরো আগে ত কখনো গান্ধীজিকে কখনো জাতীয় আন্দোলনকেই ভেবেছে ফাঁকি।'

'যাঃ, বাজে বকিস নে।'

'বেশ···স্বাধীনতার পর বলে নি আমাদের জোট-নিরপেক্ষতার নীতি ভূয়ো...আসলে আমরা সাম্রাজ্যবাদের দলেই ভিড়ব?'

'সব যদি মানিও, তার থেকে কি দাঁড়ায়...তোরা সাম্যবাদী?'

'আলবাৎ···সবাই যদি নাও হয়...সবাই নিশ্চয়ই নয়; কিন্তু জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী এঁরা... ।'

'এঁরাই তো ছাব্বিশ বছর রাজত্ব করছেন···সাম্যবাদ হয়েছে? বল, চুপ করলি কেন?'

এইখানে এসে সুকুর মুখ গন্‌গনে হয়ে যেত, চাপা উত্তেজনায় চোখ করত ধ্বক্ ধ্বক্, চিৎকার করে উঠত, বলত 'শালা, তোরা কোন সাম্যবাদ এনেছিস-রে? সারা দেশে কেউই তো চেনে না···এদিক-ওদিক টিং-টিং করিস···বলি কোনো হেল্প দিয়েছিস তোরা? জনগণকে বুঝিয়েছিস সাম্যবাদ কি? কেবল তো কংগ্রেসের পেছনে কাঠি দিয়েছিস···আবার কথা!'

অগত্যা এ-বিষয়ে কথা অচল। অবশ্য ওর অনেক কথাই বুকে লাগে আমার। মানি বা না মানি, মনের একান্তে তার জবাব খুঁজে পাই না। কেননা সে-সবের জবাব তর্কের মধ্যে নেই, তর্কে কেবল মূল প্রশ্ন মিলিয়ে যায়। বড় হয়ে ওঠে হার-জিৎ-এর গোঁ। অথচ ইদানীং আমার মনেও এ-প্রশ্ন বারংবার জাগে যে নির্ভুল থেকেও, জনসাধারণের মধ্যে এত বছর অক্লান্ত কাজ করেও, কেন কোনো সাম্যবাদী পার্টি সারাদেশ জুড়ে অজগরের মতো বিস্তৃত নয়? কেন খণ্ড খণ্ড শক্তিতে কম্যুনিজম্ এ-বিশাল দেশে নিঃশেষিত, এমনকি শ শ মাইল ব্যেপে অজানা?

হঠাৎ সুকু কথা বলল, সামনের দিকে নির্দেশ করে জানালো 'ওই বাড়িটা।'

'ওটায় যাবি?'

'হ্যাঁ, একা নয়, তুইও।'

সামনের ঘরে অনেক লোক। সুকু বলল 'তুই একটু দাঁড়া...আমি আসছি।'

ও চলে গেল ভিতরের ঘরে। আমি দেখলুম এ-ঘরে যারা তারা বেশির ভাগই যুবা, দু-জনকে শুধু মনে হলো কেউ-কেটা, মধ্যবয়সী। অর্থাৎ পয়সাওলা। ওর মধ্যেই কোণায় সতরঞ্চিতে গিয়ে বসলুম। ওঁরা ছিলেন চেয়ারে, কয়েকটি ছেলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। দেখার আর বেশি সুযোগ হলো না, সুকু এসে ডাকল 'আয়'।

ভিতরের ঘরেও লোক। সেটার পাশের ছোটো কামরায় সুকু ঢুকল, পিছনে আমি।

'এই আমার বন্ধু, বাদল দাশগুপ্ত...সত্যদা।'

'বসুন।' সত্যদা বললেন।

একটা ছোটো টেবিল, গোটা পাঁচেক চেয়ার। দু-জন বসেই ছিল। সত্যপ্রিয়বাবু টেবিলের ওদিকটায়। সামনের লোকদের দিকে এবার তাকিয়ে বললেন 'আচ্ছা...ঐকথা রইল।'

'তাহলে আমরা চারটেয় আসব ?'

'সাড়ে তিনটে করুন...মিটিং আরম্ভের একটু আগে যাওয়াই ভালো।'

'ঠিক আছে।'

ওঁরা চলে গেলেন। সত্যপ্রিয়বাবু আমার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলেন, বললেন 'আপনার কথা আমি শুনেছি···।'

আমি কি বলব ? দৃষ্টি সরিয়ে চুপ করে রইলুম। সুকু বলল 'মাই বেস্ট্ ফ্রেণ্ড।'

'সে তো আগেই বলেছিস...আমার কাছে ওঁদের সেলফ্লেস্নেস্টাই বড় কথা...আমাদেরও নিঃস্বার্থ হতে হবে।'

'আমি ওকে বলেছি আপনি একটা কিছু করবেনই।'

'আমি কি ভগবান !·· দেশের অবস্থাটা তো বুঝিসই ?'

'না, আপনি বলেছিলেন কিনা...।'

সুকু কথাটা শেষ করে নি। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েই বোধহয় থেমে গেছিল। উনি বাধা দেন নি, কিংবা কোনো ইসারাও করেন নি। শুধু অন্যমনস্ক দৃষ্টিটা রেখেছিলেন শূন্যে, সুকুর ঠিক মাথার উপর। আর নিচের ঠোঁটটা ছিল ওঁর ওল্টানো, নীরব। দু-এক সেকেণ্ড মাত্র, কিছুটা আনমনা এবং নিজেতে নিমজ্জিত লেগেছিল সত্যদাকে। তারপর উনি আমার দিকেই প্রথম তাকালেন, পরে সুকুর পানে, ছোট্ট করে, প্রায় স্বগতোক্তির মতো বললেন 'মুস্কিল !'

'মুস্কিল ?' সুকু ঝুঁকে বসল।

'ওপ্নিং যে একটাই।'

'আপনি যে বলেছিলেন দুটো ?'

'ভুল খবর। আই অ্যাম সরি।'

সুকু যেন মুহূর্তে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এমন বিবর্ণ, পাংশু হয়ে যেতে আমি ওকে কখনো দেখি নি। আমার বুকের ভিতরটাও কেমন আচমকা ভারি হয়ে এল। এতক্ষণ মন ছিল এলোমেলো, কিছুটা বিরূপ এবং তির্যক। তাতে সুপ্ত শ্লেষ যেমন ছিল তেমন আবার সঙ্গোপন প্রত্যাশাও। অথবা ঠিক প্রত্যাশা নয়, প্রত্যাশা বড় স্পষ্ট কথা। আমার ছিল একটা

আশক্তার বোধ যা ঝাপসা, সুদূর, তবু অন্তঃস্থলে উপস্থিত। শুধুই একটা অধরা অনুভব। এবার আমি উঠে পড়ি, বলি 'আচ্ছা চলি এখন...।'

'চা খেয়ে যান।'

'আমার একটু তাড়া আছে...আর এক দিন আসব...।'

'বেশ...আপনার কথা মনে থাকবে।'

'অনেক ধন্যবাদ।...নমস্কার।'

'নমস্কার।'

আমি বেরিয়ে এসেছিলুম, স্নকু বসেছিল। ও আর ফিরেও তাকায় নি। কেমন শুদ্ধ, মাথা হেঁট করে, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে স্থাণু, প্রস্তরবৎ ছিল।

হঠাৎ একদিন পল্টুর বাবা এলেন। তাঁর ঢাউস প্লিমাউথ গাড়িটা আমাদের জীর্ণ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই পাড়া উচ্চকিত হয়ে উঠল। এ-পাড়ায় মল্লিকদের বাড়িতে ছাড়া গাড়ির যাতায়াত প্রায় নেই। অন্য কোথাও গাড়ি থামলেই অনেকে কেমন কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তাও যে গাড়ি চেনা হয়ে যায়, যেমন মিনিমাসীদের অ্যামবাসাডর, তাকে নিয়ে আগ্রহ কমে আসে। কিছু কুচোকাঁচা গাড়ির চারপাশে ঘুরঘুর করে শুধু ; প্রহ্লাদের ছোট ভাইটা হর্ণ টিপে পালানোর তাল খোঁজে। কেউ-কেউ গাড়িটায় হাত বুলিয়েই তৃপ্ত, অথবা বড়জোর জানালার তোলা কাচে নাক সেঁটে ভিতরে উঁকি মারে।

প্লিমাউথ দেখতে কিন্তু কম-বেশি সকলেই উৎসুক। বড়রা গাড়িটা তত নয়, যতটা গাড়ির রহস্য নিয়ে ভাবিত। বাড়ির মেয়েরা অনেকেই, কেউ সোজাসুজি, কেউ খড়খড়ির আড়ালে উঁকি মারেন। কথাও হয় নিশ্চয়ই নানাবিধ। বিশেষত যারা পল্টুর বাবাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেছেন, অথবা অন্তত দাবি করছেন সেইরকম, তাঁরা, যাঁরা দেখেন নি তাঁদের সবিস্তারে তাঁর চেহারার বর্ণনা দেন।

পল্টু তখন খেতে বসেছিল। বাবা আচমকা এসে পড়ায় একমুহূর্ত সে বিমূঢ় হয়ে গেছিল, তারপর এঁটো থালা-গেলাস তুলে নিয়ে সোজা পাশের ঘরে চলে আসে। মাটিতে বসে আর কিছু খেয়েছিল কিনা জানিনে, কিন্তু জলের গেলাসটা পাতে উপুড় করে দিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েছিল। হাত ধুয়ে, চপ্পল পায়ে গলিয়ে, অফিস বেরিয়ে যেতে যেতে বাইরে থেকে বলেছিল 'আমি গেলুম মা।'

ঘোষণার উপলক্ষ নিশ্চয়ই ছিলেন মাসীমা, কিন্তু সে দিকে তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি। তিনিও নির্ঘাৎ ছিলেন অভিভূত।

পল্টু অবশ্য দাঁড়ায় নি বিন্দুমাত্র, এমন কি ওর প্রিয় পানও নেয়নি। বরং হন্ হন্ করে, প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে, বেরিয়ে গেছিল। আমার দিকে ওর চোখ পড়েছিল অবশ্যই, কিন্তু দৃষ্টিতে তার নামমাত্র পরিচয়েরও কোনো আভাস ছিল না। ওর চৈতন্য হয়ত ছেয়ে ছিল এক দুর্বার, চাপা বিদ্বেষ। অন্য বোধাবোধ তখন বিলুপ্ত।

ও চলে যাবার পরও পল্টুর বাবা ছিলেন অনেকক্ষণ। আর আশ্চর্য, যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ একটা চাপা গুঞ্জনের শব্দ ছাড়া ও-ঘর থেকে আর কিছু ভেসে আসে নি। সে গুঞ্জনেরও কোনো স্পষ্ট আকার ছিল না। শুধু অনুমানে টের পাওয়া যাচ্ছিল অবিরাম আলাপ; কখনো থেকে থেকে ছেদ। এই যতিগুলোই মাঝে মাঝে রুদ্ধ কান্নার স্বরে ভরে যাচ্ছিল। সে স্বর মাসীমারই। তারপর অনেকক্ষণ কোনোই সাড়া আসে নি। কেমন থমথমে আবহ। শেষে হঠাৎ শোনা গেল পল্টুর বাবার গলা, উনি বললেন, 'আচ্ছা, আজ তবে উঠি··· আবার আসব।'

উনি গেছিলেন প্রায় তিনঘণ্টা পর। উনি চলে যাবার পরও পাড়াতে ঔৎসুক্য কমে নি। চন্দ্রার কাকীমা খানিক পরেই এসেছিলেন পল্টুর মায়ের কাছে। মাসীমা কিন্তু ভীষণ শরীর খারাপ এবং মাথাধরার নামে, চোখ বুজে, গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন। দু-চারটে হ্যাঁ-হুঁ শব্দ করলেও আর কিছু ভাঙেন নি। কাকীমা তাই বিষম বেজার হয়ে ঢুকেছিলেন আমাদের ঘরে। মা-কে একান্তে টেনে নিয়ে গিয়ে শুধিয়েছিলেন 'ভদ্দরলোক কে গো?'

'কার কথা বলছেন?'

'আহা, ওই যে ও-ঘরে এস্‌ছিলেন!'

'পল্টুর বাবা।'

'তাই বুঝি, তা কি হলো?'

মা একপলক অনিমেষ ওঁর দিকে চেয়ে রইলেন, ভদ্রমহিলাকে কোনোদিনই তাঁর পছন্দ নয়, বললেন 'কি হলো মানে?'

'কথা গো কথা?'

'ওঁদের কথা আমি জান্‌বো কি করে!'

'বারে, শোনো নি যেন।'

'না।' মা চটে গেলেন, বললেন 'আমরা আড়ি পাতি না।'

'ও বাব্বা, দেমাক!'

কাকীমা কেমন গমক দিয়ে চলে গেলেন। আর দেখতে দেখতে বাবার হাঁপটা বাড়তে থাকল। চোখের মণিদুটো যেন বেরিয়ে আসে। দম নেওয়ার প্রচণ্ড প্রয়াস। কর্টিজন ওষুধও ওঁর ব্যাধিকে বাগে আনতে পারে না। উপরন্তু শেষ দুটো বড়ি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই মা গিয়ে ওঁর পাঁজরে নীরবে হাত বুলোতে থাকেন। দু-একবার বুলোতে না বুলোতেই বাবা হঠাৎ, দমবন্ধ হয়ে আসা মানুষের ভয়াল কাৎরানির মধ্যে ঝটকা মেরে মার হাতটা ছুঁড়ে দেন। দিয়ে অসহ্য ক্লেশে, চোখ বন্ধ করে, হাঁপ নেন শূন্যে হাত ছুঁড়ে।

আমি চোরের মতো নিঃসাড়ে বেরিয়ে আসি।

বিকেলে টিউশানিতে গিয়েও মন থাকে ভারাক্রান্ত। দুপুরেই পাড়ার ডাক্তার মুকুল তরফদারকে ডেকে এনেছিলুম। এসে উনি একটা ইন্‌জেকশান দিয়েছিলেন বাবাকে। যাবার সময় আমায় সিঁড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন 'কন্‌ডিশান ভালো না···ওঁর এখন congestion ভীষণ···ওষুধ-বিষুধে কিছু হওয়া মুস্কিল।'

'তাহলে ?

'ভিতরের সমস্ত কফ পার্জ করা দরকার...ক্যালকাটা মেডিক্যাল হসপিট্যাল চেন ?'

'না।'

'খিদিরপুরে...ওদের যন্ত্র আছে... পার্জ করে শুনেছি···'

'কিন্তু আমার ওখানে কেউ চেনা নেই।'

'আমারও না...আর ওঁর যা শরীর, ওঁকে নিয়ে যাতায়াত করাও অসম্ভব··· আট টাকা না দশ টাকা লাগে প্রত্যেক সিটিং-এ···outdoor-এ।'

'Indoor-এ ?'

উনি হাসলেন সামান্য, বললেন 'ঢোকাতে পারবে...ছাখো!'

সারাদিন খোঁজ নিয়ে শুনলুম অসম্ভব, বেড নেই। কেবিনে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। বেড পেলেও যে বাবাকে রাখতে পারতুম মনে হয় না, তবু হয়ত মা মিনি-মাসীর দুয়ারে আছড়ে পড়তেন। এবং অবিলম্বে যা প্রয়োজন সেই কটি টাকা হয়ত পাওয়া যেত। কিন্তু সে পথ বন্ধ। বরং এক বেয়ারা একান্তে খবর দিল যে তাদের বড় ডাক্তারের চেম্বারেও যন্ত্রটা আছে, কুড়ি না পঁচিশ টাকা লাগে প্রতি বৈঠকে, উপরন্তু ডাক্তারের দক্ষিণা। সে আমার ক্লিষ্ট মুখ দেখেই সম্ভবত বলেছিল 'বাবু ওখানেই নিয়ে যান।' আমি কিছু বলি নি। পথে বেরিয়ে মনে তোলপাড় করে উঠেছিল, ওখানে কেন, লোকে তো চিকিৎসার

অন্নে ভিয়েনা, সুইজারল্যাণ্ড, ভেলোর কত জায়গায়ই যায়। বাবাকেও নিয়ে যাওয়া যেত অনেক আগেই। চিকিৎসা করে এতদিন নীরোগ হতেন। অথচ তা হল না, উল্টে হলেন প রোগ বাড়তে বাড়তে আজকের এই অবস্থা। কত লক্ষ লক্ষ লোকের একই হাল কেউ খবর রাখে ?

কুমার হঠাৎ খাতাটা এগিয়ে দিয়ে ডাকল 'মাস্টারমশাই !'

'হুঁ।'

'অঙ্ক শেষ।'

'দেখি।'

খাতাটা নিয়ে দেখতে দেখতে বলি 'যোগগুলো ঠিক হয়েছে।'

'মাইনাসের অঙ্ক ?'

'এটা কি করেছ ?'

'কেন, টোয়েন্টি-ওয়ান মাইনাস সেভেন...থার্টিন।'

'থার্টিন হয় ?'

'দাঁড়ান শুনছি···ওয়ান থেকে সেভেন নেওয়া যায় না, তাই ইলেভেন, ইলেভেন থেকে সেভেন নিলে···সরি···ফোর্টিন।'

'তবে ?'

ও আমার দিকে দেখল এক নিমেষ, তারপর জিজ্ঞাসু গলায় বলল 'নম্বর কাটা গেলো ?'

'গেলই তো...অথচ তুমিই নিজে করলে পরে।'

'ধুৎ !'

'ধুৎ না ··মন দিতে হয়।'

'আমার পড়তে ভালো লাগে না।'

'গল্প শুনতে ?'

'গল্প খুব ভালো !'

'তাহলে ? না পড়লে ভালো ভালো বই পড়বে কি করে ?'

'মা পড়ে দেবে।'

'গোঁফ দাড়ি হয়ে যাবে যখন, যখন বাবার মতো অফিস যাবে, তখনও মা পড়ে দেবেন ?'

'ধে-ৎ !'

ধারাবাহিক

অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় উপন্যাসটি শেষ হল না।

কাজের মেয়েরা

বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়

অসংগঠিত নারী শ্রমিকদের একটা বড় অংশ হচ্ছে বাড়ির কাজে নিযুক্ত মেয়েরা। এরাই প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ। আর-একটি পেশায় অনেক মেয়ে প্রায় উত্তরাধিকার সূত্রে যুক্ত রয়েছে—তা হচ্ছে বিড়ি শিল্পে। এরা অবশ্য বেশির ভাগই মুসলমান মেয়ে।

বাড়ির কাজের মেয়ে

প্রথমে বাড়ির কাজে যুক্ত মেয়েদের কথাতেই আসছি। সাধারণত মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকেরা ঠিকে-ঝি নিয়োগ করে। তাদের দিক থেকে সুবিধে হচ্ছে কম মজুরি, অল্প সময়ের মধ্যে মোটামুটি শক্ত কাজগুলো করিয়ে নেওয়া যায়, খেতে পরতে বা আশ্রয় দিতে হয় না। ঠিকে-ঝিরাও কোনো একটি বাড়িতে বিশ পঁচিশ টাকা মাইনেতে আটকে থাকতে চায় না। খাওয়া-পরা পেলেও রাজি হয় না। কারণ এমনিতে দশ বারোটা বাড়িতে কাজ করলে মাসে এককালীন অনেকগুলো নগদ টাকা হাতে আসে। সব বাড়ি থেকেই জল খাবারের নামে টুকটাক যেটুকু খাবার জোটে তাতে একজনের, এমন-কি বাড়িতে ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্যও বাড়তি খাবার হয়ে যায়। আর-একটি সুবিধে আছে। সকাল ৫টা থেকে ডিউটি শুরু হয়ে বেলা ১০½টা ১১টায় শেষ হয়। আবার ডিউটি শুরু হয় বেলা ৩টে থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত। দুপুরবেলা যে দু-তিন ঘণ্টা অবসর পায় তখন প্রয়োজন হলে

বাড়তি রোজগারের জন্য ব্লাউজের হাত সেলাই, ঠোঙা তৈরি, প্লাস্টিকের পুতুলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জোড়া-লাগানো, তাদের পোষাক পরানো—ইত্যাদি অসংখ্য ছোটখাট কাজ করতে পারে। ঠিকে-ঝিদের মধ্যে যারা বিবাহিতা এবং বয়স্কা—তাদের মেয়েরাও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে কাজের ট্রেনিং নিয়ে ৯ বছরে পা দিলেই দু-এক বাড়ির কাজে ঢুকে পড়ে।

করুণার মা একজন ঠিকে ঝি। বাড়ি ক্যানিং-এ। সামান্য জমি জমা আছে—বিক্রি হতে-হতে বর্তমানে বসতবাড়িটুকু আছে। বৃদ্ধা শাশুড়ীকে বাড়ি পাহারায় রেখে স্বামী-স্ত্রী কলকাতায় চলে এসেছে আজ ২০ বছর হল। স্বামী বাজারের কাছে ফুটপাতে বসে নারকেল বিক্রি করে। করুণার ঘরে ১২টি সন্তান। তার মধ্যে ৪টি মারা গেছে। তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে এক মেয়ে স্বামী অত্যাচার করে বলে স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছে। করুণার ঘরে কাছে আছে ১১ বছরের মেয়ে কাঁদুনি, ৮ বছরের মেয়ে মোরি, আর তিনটি ছোট ছেলে। গত দু মাস আগে জন্মেছে আর একটি ছেলে। করুণারা সকলেই ৮।৯ বছর বয়স থেকেই ঠিকে কাজ করেছে মার সঙ্গে। মা ও মেয়েরা মিলে ১৫।১৬টা বাড়ির কাজ নিয়ে একটু-একটু করে আবার ধান-জমি কিনেছে—সেখানে ভাগে চাষ করাচ্ছে। সারা বছরের জামা কাপড়ও ঐ ১৫।১৬টা বাড়ি থেকে পেয়ে যায়। করুণার মা পুজো আসতেই সব বাড়ি থেকে জেনে নেয় কে কত টাকার কাপড় দেবে। টাকার অঙ্কটা জেনে নিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মতো জিনিস কেনার জন্য অনেক বাড়ি থেকেই নগদ টাকা দিয়ে নেয়। সেই টাকা থেকেই মেয়ে জামাইকে জামা কাপড় দেওয়া এবং নিজেদের দরকারি জিনিসপত্র কেনে।

আর-এক প্রকার ঝি আছে তারা বাড়িতে থেকে সব সময়ের কর্মী হিসেবে কাজ করে। এদের খাওয়া পরা বাদে মাসিক মজুরি ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকার মধ্যে। কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড—অর্থাৎ রান্না ও ঝি-এর কাজ—দুই-ই করে। তাদের মাইনেটা ৪০।৫০ টাকার মধ্যে। সাধারণত উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের লোকেরা এই ধরনের কাজের লোক নিয়োগ করে। এই মেয়েদের বয়স সাধারণত ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। আর ঠিকে-ঝিদের বয়স নয় থেকে চল্লিশের মধ্যে। এদের মধ্যে আবার নয় থেকে তেরো চৌদ্দ বছরের মেয়েরাই বেশি। ইদানীং দেখা যাচ্ছে—এই অপ্রাপ্ত-বয়স্কা মেয়েদের নিয়োগ করার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। নিয়োগকারীদের ধারণা বোধহয় এই যে এই সব ছোট ছোট মেয়েদের দিয়ে সহজেই কাজ করানো যায়। দুটো বাড়তি কাজও করিয়ে নেওয়া যায়। আর

প্রয়োজন হলে দু-চারটে ধমকও দেওয়া চলে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কম মজুরিতে এদের পাওয়া যায়। বয়স যত কম কাজ তত বেশি, আর মজুরি ততোধিক কম। সুতরাং এই কমবয়সি ঠিকে-ঝিরা কলকাতার বাজার ছেয়ে ফেলেছে। আগে ছোট ছোট বাচ্চা রাখার জন্য বয়স্কা মহিলাদের আয়া হিসেবে নিয়োগ করা হত। বর্তমানে কিছু বনেদি পরিবার ছাড়া সকলেই বাচ্চা রাখার জন্য বাচ্চা ঝি নিয়োগ করে। উদ্দেশ্যটা একই—কম মজুরিতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষদের যেমন নিজ নিজ কার্যস্থানে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন আছে—গৃহকাজে নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষদের তা নেই। বিশেষ করে আমাদের বাংলা দেশের ঝি-চাকররা দিনের পর দিন শোষিত হয়ে আসছে জেনেও নিজেরা সংগঠিত হচ্ছে না। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। অথচ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে বিশেষ করে দিল্লি ও বম্বে শহরে ঠিক পুরোপুরি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে না তুললেও—তারা মোটামুটি ভাবে সংগঠিত হয়ে শ্রমের বাজারে ন্যূনতম মজুরি ঠিক করে নিয়েছে। সরকার থেকেও এদের বিষয়ে কোনো নীতি নির্ধারণ করেন নি। এরা বেশির ভাগই অশিক্ষিত। রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার সৃষ্টি হয় নি। সুতরাং নিজেদের কাজের মূল্যায়ন. নিম্নতম মজুরি, সরকারি আইন কানুন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে গেছে।

বিড়ি শ্রমিক

বিড়ি একটি বৃহৎ কুটির শিল্প এবং অনেক পুরনো। লক্ষ লক্ষ মানুষ বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। বিড়ি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনও বহু পুরনো। এই কলকাতা শহরেই কয়েক লক্ষ বিড়ি শ্রমিক আছে। উৎপাদনের উপাদান বলতে একটা কাঁচি, কিছু পাতা ও তামাক পাতা এবং সামান্য সুতো। এর জন্য বড় কোনো কারখানার প্রয়োজন হয় না—যে কোন জায়গায় স্বল্প পরিসরের মধ্যে বসেও বিড়ি তৈরি করা যায়। কিন্তু এই বিড়ি শিল্পের মালিকরা মুনাফা করে কোটি কোটি টাকা। ইদানীং আন্তর্জাতিক বাজারেও বিড়ি চালান হচ্ছে। বহু আন্দোলনের পর সরকার থেকে আইন করে নিম্নতম মজুরির হার করেছে' এক হাজার বিড়িতে ১০ টাকা ৭৫ পয়সা। এই মজুরি কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। মজুরি

কোনো জায়গায় ৮ টাকা কোথাও ৭ টাকা আবার কোথাও ৬ টাকা। কোথাও এক রেট নেই। এদের মধ্যে মেয়েদের অবস্থা আরো কাহিল।

রাজাবাজার বস্তিতে গিয়ে দেখলাম প্রায় সব ঘরের মেয়ে ও শিশুরা বিড়ি তৈরি করে। ছোটবেলা থেকেই বিড়ি তৈরির কাজ করে আসছে এরা। কিন্তু এরা যেহেতু, বাইরে বেরিয়ে কাজ করতে পারে না—তাই এরা সবচেয়ে বেশি শোষিত হচ্ছে। আয়েষার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ছেলেবেলা থেকেই বিড়ি বানায়। মা-বাবার কাজে সাহায্য করতে করতে আয়েষা একজন দক্ষ বিড়ি-শ্রমিকে পরিণত হয়। অনেক এজেন্ট আয়েষাকে দিয়ে বিড়ি তৈরি করিয়ে নেয়। হাত খুব দ্রুত চলে আর বিড়িটাও তৈরি করে নিঁখুত। কিন্তু তাই বলে আয়েষা মোটেও বেশি মজুরি পায় না। আয়েষা অনেক অর্ডার পায়। রাতদিন মাথা গুঁজে বিড়ি তৈরি করে। স্বামী বিড়ি তৈরি করতে করতে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। হাসপাতালে দেবার সামর্থ নেই—কোনো যোগাযোগও নেই। একখানা মাত্র ঘরে ৩টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে বাস করে। ইঁটের ওপর ইঁট চাপিয়ে চৌকি উঁচু করা হয়েছে। চৌকির ওপরে অসুস্থ স্বামীকে শুইয়ে রেখেছে। খাটের নিচে ৩টি ছেলেমেয়ে নিয়ে আয়েষার নিজের শোবার ব্যবস্থা। ৫ বছর হল স্বামী অসুস্থ। আয়েষার শরীরও সুস্থ না। রোজই বিকেলের দিকে অল্প-অল্প জ্বর হয়! 'জানিনা কপালে কি আছে। আমিও হয়ত এই চিররোগে আক্রান্ত হব। ছেলেমেয়ে-গুলোর কি উপায় হবে জানি না। দু-বেলা দুটি অন্নের জন্য—এই হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছি। আল্লা কি মুখ তুলে তাকাবে?'

এক হাজার বিড়িতে মজুরি হচ্ছে বর্তমানে দু-টাকা। গত দশ বছরে মাত্র ৫০ পয়সা মজুরি বেড়েছে। আগে ছিল হাজারে ১·৫০ টাকা। বাচ্চাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। ওরা পায় হাজারে ৭৫ পয়সা। অবশ্য দিনে হাজার বিড়ি তৈরি করতে পারে না এরা।

এই হচ্ছে কলকাতার অসংগঠিত নারী শ্রমিকের চেহারা। এরমধ্যে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ পার হয়েছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক নারী দশক চলছে—আবার শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক শিশু দিবস।

আর আমাদের এই ভারতবর্ষের এই সবচেয়ে শিল্পোন্নত মহানগরে নারীরা শ্রমের বাজারে ঢুকেছেন কিন্তু শ্রমের মূল্য দূরের কথা, মানবামূল্যও পাচ্ছেন না। অথচ নাকি, শ্রম আইন আছে, শিল্প-আইন আছে।

হাসো, ফুটপাথের শিশু

(আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ মনে রেখে)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হাসো, ফুটপাথের শিশু !
সারা বছর না হোক, সারা পৃথিবী জুড়ে
উৎসবের আনন্দে এক মিনিট
হাসো, তোমরা যতটা হাসি আনতে পারো
নোংরা মুখের উপোস ঢেকে ।

দেখ, আমরা অনেক কষ্টে বয়ে এনেছি
তালি দেওয়া নতুন প্যান্ট, নতুন জামা—
যা তোমাদের ; সারা বছর তোমরা পরবে,
যদি না তালির ভেতর থেকে ছেঁড়া-ন্যাকড়া
ভেংচি কাটে ।

কিন্তু সে-ও এক রকম হাসি ॥

২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯

তোমার কেমন লাগে ?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

তোমার কেমন লাগে চাঁদ ?
জঙ্গলের অন্তর্গত ফাঁদ—
কী লাগে, কেমন করে লাগে
এলোমেলো হাওয়া আর ধুলো
এবং বিধ্বস্ত চুলগুলো
তোমার কেমন লাগে চাঁদ

চাঁদের কলংক, নোনা হাওয়া
যদি পাও, সেই ফিরে পাওয়া
এলোমেলো হাওয়া আর ধুলো
এবং বিধ্বস্ত চুলগুলো
তোমার কেমন লাগে চাঁদ—
চাঁদের কলংক; নোনা হাওয়া ?

মধ্যবর্তী

শিবশম্ভু পাল

যাও চলে যাও সন্ন্যাসী
অগম নিধুবন
তুমি বিপক্ষ উন্নাসিক
কিন্তু সুশোভন।

পিছু হেঁটে যায় ভোগবতী
তুমি কি বিব্রত ?
ছড়িয়েছে ছায়া দূর অতীত
প্রয়াণ স্পষ্টত ?

তাহলে এবার দ্বৈরথে
লালের সঙ্গে নীলে
অমসৃণ পর্বতে
পুতুল গড়েছিল…

পুতুল ভেঙেছে ছত্রাখান
পোড়ামাটির গুঁড়ো
পতন এবং পরিত্রাণ
মাঝখানে বিমূঢ়!

দয়ালু কবিতা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

বোমারু প্লেনের শব্দে নেমে এলে সজ্জিত কাননে।

এত বেশি শব্দে তুলে শূন্যতায়, কম্পনরেখায়
আসো, যাও, তদারক করো,
আন্দোলিত কক্-পিটে ছডজন মূর্তিমান বোমা
হাত নিসপিস করে—দৃঢ়তর বিস্ফোরণ হতে
মাটি চাই, ইচ্ছা চাই, সমর্পিত পাইলট,
গন্ধকের সফলতা চাই।

নারীরা শস্যের মতো এ-উহার স্কন্ধদেশে এলায়েছে মাথা,
আঁটো ট্রাউজার-পরা যুবকেরা হয়েছে স্থপতি,
প্রবর্ণ লম্পট সে-ও ডোনেশন দিয়েছে হাজার,
তুমি সব ঘুরে ঘুরে তদারক করে গিয়েছিলে,
গোপন পকেটে ছিল ছয় দফা চার্জশীট,
গ্রীনিচের নির্ভুল নিয়মে

ট্রিগারে তর্জনী কাঁপে, পদপিষ্ট ক্ষমা,
ছয় দফা চার্জশীট ছডজন মূর্তিমান বোমা।

সে বছরই কষ্ট ছিলে—বিজ্ঞানবিহীন হাতুড়েরা
অগনন ভ্রূণহত্যা করেছিল পাইকারি রেটে,
রাষ্ট্রনায়কের লোভ জেগেছিল উদর-ধর্ষণে,
আরক্ষা-আতপে
বর্ষণবিহীন দেশ—তুমি সব কিছু
সবুজ পেন্সিলে সার্ভে করে গিয়েছিল।

প্রস্তুতির তিন সন কিরকম ভারী শান্ত ছিল।

ইহুদিরা ততদিন কড়া তেলে ভেজেছে বিবেক,
ব্যবসায়ী-রোদে
      সেয়ানা হয়েছে চর্ম,
মর্মের রহস্য নিয়ে হয় নি অধীর,
কাঁচা ডিম চুরি করে অন্ধকারে ছুঁড়েছে এন্তার,
পোপ-কে মেরেছে লাথি,
রজত-প্রস্রাব ঢেলে ঢেলে
মহানন্দে ভাসিয়েছে হাসপাতাল বিপণি মন্দির।

অমোঘ পেরেক বুকে অবশেষে শূন্যে নেমে এলে,
প্রপেলারে তুলে উঠল ক্ষয়ক্ষতি, কপট জনতা,
ঠুনকো পিরিচের মতো ছুঁড়ে ভাঙলে নিষাদের দয়া.
দয়া
      দয়া
            দয়া
এই শব্দগুলি
ছডজন কালান্তর বোমার গর্জনে
নেমে এল। তুমি ফের
      নতুন প্রজন্ম চেয়েছিলে,
নতুন মাটির প্রেমে প্রতি নদে বন্যা চেয়েছিলে।

জয় বাবা ফেলুনাথ

প্রযোজনা : আর. ডি. বনশল। কাহিনী ও পরিচালনা : সত্যজিৎ রায়।

বিস্মৃতি অনেক ক্ষেত্রে পরিত্রাণের সহজসোপান। একদা 'চিত্রভাষা' নিয়ে স্বয়ং সত্যজিৎ রায় দাপটে চমক এবং চাকচিক্যের প্রচণ্ড বিদগ্ধ আলোচনার সূচনা করেছিলেন তারপর বিচিত্র ভাষায় 'চিত্রভাষা'র ব্যাখ্যা-টীকা সম্বলিত সংহিতা প্রণয়নে আমার মতো নিছক গোলা লোকের মগজ-মেজাজ ভড়কে দিয়েছিলেন মৃণাল সেন, মারী সিটান, অশোক রুদ্র এবং ইত্যাদি প্রমুখেরা। কপালজোরে বিস্মৃতির সহজিয়া সাধনায় সিদ্ধপুরুষ আমি। মাথায় যা কিছুতেই বইতে পারি না—অনায়াসে সেটাকে পথে ফেলে দিয়ে কেটে পড়া আমার মজ্জাগত অভ্যাস। চার্লি চ্যাপলিন চলচ্চিত্র সম্পর্কে সাদামাটা কথায় বলেছিলেন—'সিনেমা ইজ স্টোরি টোল্ড বাই পিকচার'। অর্থাৎ গল্প বলার ভাষাটা এখানে 'চিত্র'। চ্যাপলিন মহোদয়ের দৌলতে বিষয়টা আমার কাছে স্বচ্ছ এবং পরিচ্ছন্নই ছিল (সম্ভবত ঐ প্রত্যয়বোধ থেকেই 'টকি'র যুগেও অধিকাংশ চিত্রে কিছু সামান্য আন্তর্জাতিক অব্যয় পদ ছাড়া অন্য কোনো উচ্চারিত শব্দ ব্যবহার করেননি)। তারপর আমাদের এড়গুরাজ্যে প্রচণ্ড দাপটে চিত্রভাষা নিয়ে বিচিত্র ভাষাপ্রবাহ বোধ-সরোবরের সমস্ত জল ঘুলিয়ে দিয়েছে। বিচক্ষণ ব্যক্তিদের মতো ঘোলাজল পরিপাক করার ক্ষমতা আমার নিতান্তই কম। চ্যাপলিনের ভাষ্যে যে বিষয়টা আমার কাছে ছিল পরিচ্ছন্ন—চতুর-বৈদগ্ধ্যের নিবিড় দক্ষানিতে সেটা হয়ে উঠেছিল মোহাচ্ছন্ন। সৌভাগ্যের বিষয়—আমার বিস্মরণশক্তি রয়ে গেছেন পরিত্রাতার ভূমিকায়। অতএব…

অতএব ভিন্নতর সমাধান সন্ধানে রইলাম। অজস্র বাক্যবিন্যাসের চেয়ে একটি সার্থক দৃশ্যমান উদাহরণ কোনো কিছু বোঝার পক্ষে সহজতম উপায়। ঋষিবাক্য শিরোধার্য করে প্রাণভরে সেই উদাহরণ অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি 'অপরাজিত' এবং 'অযান্ত্রিক'-এ। তারপর দেখলাম—'জয় বাবা

ফেলুনাথ'। এর আগে আমার শেষ দেখা বাংলা ছবি 'সোনার কেল্লা'। ঘটনাটা নিতান্তই কাকতালীয়। তবু আজ এটাই চরম তাৎপর্যপূর্ণ। সত্যজিৎ রায়ের ভক্ত-সংখ্যা গুরুবাদের দেশে এবং বিদেশে অপরিমেয়। পরম শ্রদ্ধেয় আসনে সমাসীন তিনি। সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং কুশলী নির্বাচনে তাঁর দক্ষতা এবং তীক্ষ্ণতা অবিসংবাদী। সুতরাং 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর ইত্যাকার সংক্রান্ত আলোচনা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। সকল দিক থেকে এমন সুষমামণ্ডিত বাংলা ছবি আদৌ দেখি নি। ছবিটি মূলত রহস্যচিত্র। সুতরাং রহস্যচিত্রের কিছুটা উত্তেজনা এবং শিহরণ অবশ্যই আকাঙ্ক্ষিত উপাদান। সত্যজিৎ রায় (ছুরি ছোঁড়ার দৃশ্য, কপট সন্ন্যাসীর ঘরে গোপন অনুসন্ধানের দৃশ্য এবং পরিণামে পাঁচটি গুলি ছোঁড়ার দৃশ্য স্মরণ রেখেই বলছি) কোনো এক অজানিত নেপথ্য প্রেরণায় এমন ছবিকেও আগাগোড়া কাব্যময় করে তুলেছেন। এমনকি ফর্মুলা মাফিক খলচরিত্র উৎপল দত্তের অভিনয়কেও আমার কাব্যময় মনে হয়েছে—শুধু পরিণামে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার অংশটুকু ছাড়া। দ্বিতীয়ত, আজ পর্যন্ত যত বাংলা ছবি আমি দেখেছি—একমাত্র 'অযান্ত্রিক' ছাড়া অন্য কোনো ছবি শুধু পরিবেশ রচনা দ্বারা চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে এমন নান্দনিক উত্তরণে পৌঁছে দেয়নি। ছক-কাটা চিত্রনাট্যে চিরকাল (ক্বচিৎ ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে) দেখেছি অভিনেতৃবৃন্দ দাপটে দৃশ্য-মর্যাদাকে অতিক্রম করে গেছেন অথবা ডুবিয়ে দিয়েছেন। এই ছবিতে দেখলাম, অভিনেতৃবৃন্দ সহজ-সাবলীল অভিনয় করে গেলেন আর তাঁদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যটুকু নিখুঁত সংযমে ধরে রাখল দৃশ্যসম্ভার। চিত্রভাষার এমন নীরবচাতুর্য প্রায় অবিশ্বাস্য। বিভিন্ন লেন্সের ব্যবহার, বর্ণালী সমারোহ এবং লোকাল টাচ আর আলোর তারতম্য প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি চরিত্রের ব্যক্তিত্ব এবং মেজাজকে আপন ভাষায় সাজিয়ে দিয়েছে। অবশ্য মগনলালের ঘরে ফেলুনাথের মনের গভীরে যে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল জটায়ুকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সেই দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের মানস-বিস্ফোরণকে সত্যজিৎবাবু উপেক্ষা করলেন কেন—এটা আমার বিনীত প্রশ্ন। প্রসঙ্গত একটি অনবদ্য দৃশ্যের কথা উল্লেখ করা দরকার। ইদানীং বাংলা ছবিতে জুম লেন্সের ব্যবহার বেড়েছে। সংযমের অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নিছক কারিগরি এবং পরিণামে ব্যর্থ। ওই লেন্সের প্রথম সার্থক প্রয়োগ দেখেছি 'চারুলতা'-য়—মুহূর্তে একটি কাছের মানুষ কত দূরে চলে যেতে পারে তার রসোত্তীর্ণ রূপায়ণ ঘটেছিল ওই লেন্সের সাহায্যে। ওই লেন্সেরই (ভুল করছি না তো ?)

আরেক সাবলীল চতুরালি দেখলাম গঙ্গার ঢেউয়ের দৃশ্যগ্রহণে। চোখ ধাঁধানো ঝিকিমিকি থেকে ধীরে ধীরে ঢেউ স্বরূপে ফিরে গেল। আর ঠিক ঐ সময় থেকেই শুরু হল রহস্য-সমাধানের সূচনা। রহস্যের ধাঁধানি আর সমাধানের প্রাথমিক প্রবাহকে ধরে রাখা হল দৃশ্যের মণ্টাজে। তৃতীয়ত, বর্ণাঢ্য সমারোহ এই ছবির অনন্য সম্পদ। আমার শেষ দেখা বাংলা ছবি 'সোনার কেল্লা'। বর্ণের অবর্ণনীয় মাধুর্য সেখানেও বিদ্যমান। কিন্তু ঐ ছবিতে বর্ণবিন্যাস কিছুটা চড়া দাগের। এখন সঠিক মনে নেই—ফেলুনাথের গায়ে একটি লাল টকটকে চাদর কিংবা ব্লাঙ্কেট বড় বেশি বেমানান লেগেছিল; রঙের বাহার সেখানে চোখ জুড়িয়ে দিলেও মন ভরাতে পারে নি। বার বার মনে হয়েছে ঐ চড়া লাল রঙটা ফেলুনাথকে মানায় না। অথচ আলোচ্য ছবিতে বর্ণটাই বর্ণনায় গাঁথা। রঙিন ছবিতে বর্ণালিটাও চিত্রালিভাষার অনুষঙ্গ। রহস্য-চিত্রকেও যিনি অপার সংযমে কাব্যময় করে তুলতে চেয়েছেন—রঙের পেলবতা তাঁর অবশ্য অন্বিষ্ট। চিত্র ভাষার এই বর্ণ-বর্ণনাও এই ছবির সঙ্গে সংগত। বহুক্ষেত্রে শুধু আলো-আঁধারিকে পাশাপাশি রেখে তিনি রহস্যচিত্রের সাসপেন্সকে ধরে রেখেছেন অথচ কদাপি তথাকথিত এ্যাকশন দিয়ে ভরাট করতে চাননি। 'সোনার কেল্লায়' এ্যাকশন ছিল বেশি। ফলে ওই ছবি যেখানে শেষ হয়েছে—দর্শকের সেখানে বুঝতে অসুবিধা হয় নি। 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ এ্যাকশনকে আদৌ প্রাধান্য দেওয়া হয়নি—সুতরাং তেরো রিলের ছবি দেখেও দর্শক ভেবেছে—বোধহয় কিছু বাকি রয়ে গেল। ফলে, আমার ধারণা, আলোচ্য ছবি সম্ভবত 'সোনার কেল্লা'র মতো ব্যবসায়িক সাফল্য দেবে না। কিন্তু সত্যজিৎবাবু সচেতনভাবে যে নতুন পরীক্ষা শুরু করলেন—ভবিষ্যতের এ্যাকশন চিত্রকে তা হয়তো সংযত করবে। চিত্রভাষার যে অনবদ্য ভারসাম্য তিনি বজায় রেখেছেন তা গর্বের বিষয়। রহস্যচিত্রকে তিনি সংঘাত-তন্ময়তা থেকে কাব্যিক মন্ময়তায় উত্তীর্ণ করেছেন। পরিবেশ-রচনার নিখুঁতবিন্যাসে চরিত্রকে দিয়েছেন ব্যক্তিত্ব। আর তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন প্রত্যেকে। তেরো রিলের ছবি দেখেও বহু দর্শক ভেবেছেন—ছবি শেষ হয়নি। এই বোধের অন্যতম কারণ—তাঁদের রহস্যচিত্রের পরিণামের এবং বিন্যাসের ধারণার সঙ্গে এ ছবি মেলেনি। ঠিক এইখানেই অন্য আরেক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন প্রবল হয়ে উঠেছে। তেরো রিলের ছবিকেও তাহলে তাঁরা ছোট মনে করেছেন—এবং ছবি চলার সময় কখনো বিরক্তি বোধ করেননি। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এর বিপরীত যে কোনো প্রতিক্রিয়া দর্শকদের চঞ্চল করতই। দু-বার পূর্ণ

প্রেক্ষাগৃহে এই ছবি দেখেছি আমি। বেরিয়ে-আসা দর্শকের চোখে সামান্ত হতাশা লক্ষ্য করেছি কিন্তু অতৃপ্তি কিংবা বিরক্তির চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাইনি। বাবা ফেলুনাথের প্রকৃত জয় ঠিক এই জায়গাটাতেই। প্রত্যাশী দর্শককে তেরো রিলের ছবিকে সে 'ছোট' ভাবতে বাধ্য করেছে; রহস্যচিত্রে কাব্যময়তা এনেও সে দর্শককে বিরক্ত হতে দেয়নি।

'জয় বাবা ফেলুনাথে'র চিত্রভাষার জয়জয়কার ঠিক এইখানেই। পরিশেষে একটি বিনীত প্রশ্ন—মগনলালের মতো দাবড়ানো স্মাগলারও কি হাতে পেয়েও একটি রেপ্লিকা (নকল) এবং আসলের তফাৎ ধরতে জানে না? একটি নকল মাল চালান দিতে বা পাচার করতে যাওয়া কি আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য?

অমর গঙ্গোপাধ্যায়

পাপ পুণ্য। টলস্টয়ের নাটক 'দ্য পাওয়ার অব ডার্কনেস' অনুসরণে। প্রযোজনা: নান্দীমুখ। বাংলা রূপান্তর ও নির্দেশনা: অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমালোচিত অভিনয়: অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টস, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯।

যাকে বলে প্রয়োগের দিক, সেখানে অনেক ত্রুটিই অন্তত সেদিন ছিল। অন্তরালের গান দু-দুবার গম্ গম্ করে মাইকে বেজে উঠল, তারপর হঠাৎ সংশোধন করে মঞ্চের পেছন থেকে অনেক নিচু স্বরে শোনানো হলো। স্বগত সংলাপ টেপ্-এ বাজানো হচ্ছিল যখন, প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না (শুনেছি, অন্য দিনের অভিনয়ে এরকম ঘ.ট না: সেদিন ভারপ্রাপ্ত যন্ত্রবিদ্ অনুপস্থিত ছিলেন)। অভিনেতাদের চলন-বলনেও কারো কারো ক্ষেত্রে অন্তত দ্বিধা ছিল। এমনকি ছিল গ্রামীণ ভাষার উচ্চারণে কিছু কিছু অসমতা। আরো নানা রকমের খুচরো গোলমাল। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নান্দীমুখ' কেন, যে কোনো দলের পক্ষেই এই স্খলন নিশ্চয়ই অমার্জনীয়।

এসব কথা অবশ্য আমার পরে মনে এসেছে। দু-চারজন বন্ধুবান্ধবও মনে করিয়ে দিয়েছেন হয়তো। আমি সায় দিয়েছি, বা বিরক্ত হয়েছি। হল-এ বসে থাকার সময় এ-সমস্ত যে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পেরেছিলাম, তার কারণ নাটকটির প্রযোজনায় ছিল অসম্ভব একটা জোর, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের একাগ্রতা ও সংলগ্নতা। ফলে নিঃসংশয়ে মনে হয়েছে 'নান্দীমুখ'-এর 'পাপ পুণ্য' একটি সার্থক প্রযোজনা।

অবশ্যই নাটকটি একটু আলাদা ধরনের। বিষয়ের দিক থেকেও, ফর্মের দিক থেকেও। এর চরিত্র আবহ সংলাপ সমস্ত কিছুতে এমন একটা আপোষহীন একমুখিনতা আছে যে তাকে সামাল দেওয়া যে কোনো প্রযোজকের পক্ষেই দুষ্কর। তাই নাটকটি দেখার পর অবাক হই না এই তথ্যে যে সারা বিশ্বেই এই নাটকটির প্রযোজনা একটি বিরল ঘটনা। এবং দল বেঁধে গ্রামে বাস করে কিংবা গ্রামের ভাষা রেকর্ড করে নিয়ে এসে মহলা দিয়েও নাকি স্তানিস্লাভ্স্কি পর্যন্ত খুশি হতে পারেন নি নিজের

প্রযোজনায়। সত্যিই বিষয় ও ফর্মের তীক্ষ্ণ নগ্ন সারল্যই একটা দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এখানে—শহুরে বিদগ্ধ নাট্য-প্রযোজকদের কাছে, নাট্যদর্শকদের কাছেও।

বিদেশের অভিনয়ের কথা তো জানি না, কিন্তু নান্দীমুখ-এর প্রযোজনার এই সাফল্যে বিস্মিত হয়ে ভাবি, বিখ্যাত টলস্টয়ের এই অল্পখ্যাত নাটক, যার প্রযোজনায় বিদেশী প্রযোজকরা পর্যন্ত কুণ্ঠিত বা অতৃপ্ত, সেই নাটকটিকেই বেছে নিলেন কেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়? টলস্টয়ের জন্মের দেড়শ বছর উদ্‌যাপনের জন্যই শুধু? অবশ্য সেই করণীয় কাজটুকুর জন্যও নিঃসংশয় সাধুবাদই তাঁর প্রাপ্য ছিল। কিন্তু শুধু কি তাই? নাকি আমাদের চারপাশে, জীবনে শিল্পে, ব্যক্তিত্বের সুবিধাবাদী উভচারিতায় যে নীতিহীনতা প্রশ্রয় পায়, তাকে ব্যঙ্গ করার তাগিদ অনুভব করেন তিনি? নাকি বাংলা থিয়েটরের আঙ্গিক-চাতুরিতে ক্লান্ত হয়ে হয়ে (দায়িত্ব তাঁর ওপরও বর্তায়), তিনি প্রত্যক্ষ আকাঁড়া বাস্তবতার রূপায়নের মধ্য দিয়ে আবার চাঙ্গা হতে চান? অথবা টলস্টয়ের নাটকটির প্রযোজনা-অসাফল্যের ইতিহাসই তাঁকে প্ররোচিত করল এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার? সৃষ্টিশীল শিল্পীর এই দুঃসাহসই তো সম্বল।

এর যে-কোনো একটি কারণই যথেষ্ট অজিতেশের তৎপরতার পক্ষে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এলোমেলো কথা বলে মনে হয়, সব কটি কারণই তাঁর কাছে প্রায় সমান জরুরি ছিল। আর প্রেরণাই এই বিশ্বস্ততাই তাঁর প্রযোজনাকে এরকম তীব্রতা দিয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।

নাটকটির বিষয়বস্তু খুব সোজাসুজি—সমস্ত নাটকটি জুড়ে—পাপাচরণ, পাপাচরণের ফলে ব্যক্তির অধঃপতন, অধঃপতনের ফলে আরো পাপাচরণ, অনুতাপের দহন এবং সর্বশেষে আত্মস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে আত্মমোচন। পাপাচরণে লিপ্ত প্রায় প্রধান কয়েকটি চরিত্রই। অবশ্য প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই পাপের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন—ফলে অনুশোচনা বা আত্ম-মোচনও সবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়। পাপের এই আবর্তে বিভিন্ন চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন মুখাবয়ব এবং এ-নাটকের প্রধান চরিত্র নিতাইয়ের পাপাচরণ-অনুতাপ-স্বীকারোক্তির বৃত্তটি নাট্য-আবহকে আচ্ছন্ন করে রাখে। নির্বিকার যৌন ব্যভিচার থেকে কিভাবে নিতাই ক্রমশ জড়িয়ে ফেলল নিজেকে গভীরতর পাপের জালে—চরিত্রের এই অধোগতিকে প্রকাশ করাই ছিল চরিত্রাভিনেতার দায়। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রাণময় অভিনয়ে

চরিত্রের এই ক্ষয়কে যেমন ধাপে ধাপে আভাসিত করে তুলতে পেরেছেন, তেমনি তার উত্তরণকেও।

অজিতেশের প্রযোজনা ও অভিনয়ের আলোকেই কাহিনীটা অনুসরণ করা যাক তা হলে।

জোতদার পরাণ মাহাতোর 'জন' খাটে নিতাই। শক্ত সমর্থ, একটু ফূর্তিবাজ ধরনের, অতীতেও নির্বিচারে নারীসঙ্গ করেছে এবং ভুলে গেছে। তাই গলায় হাল্কা ইতরতার ভাব এনে অজিতেশ বলেন, "অ্যাঃ মায়াবতী—শালা কতো মায়াবতী পার করলাম।" এখন বৃদ্ধ রুগ্ন পরাণের দ্বিতীয় পক্ষের সোমথ স্ত্রী অন্নপূর্ণার সঙ্গে যৌনাচারে লিপ্ত। অবশ্য অন্ন-র কাছে তা হয়তো 'পিরিত'-ই। কিন্তু নিতাই, প্রয়োজন মতো পিরিতের কথা বললেও, সম্পর্কের কোনো রকম গভীরতায় খুব একটা বিশ্বাস করে না। অন্নপূর্ণার আঠালো আদরের ("তুই আমার সোনার জল নেতাই। বড় পুকুরের জল নেতাই" ইত্যাদি) জবাবে অজিতেশ ঝটিতি স্বর পরিবর্তন করে বলেন, "কিসের সাথে কি বেত্তান্ত"। তাই নিতাইয়ের মা-বাবা যখন মায়াবতীর সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে এল—সেই অসহায়া অনাথা মায়াবতী যার সঙ্গে একদা নিতাইয়ের যৌন-সম্পর্ক ও বিবাহের প্রতিশ্রুতি ছিল—তখনই অন্ন-র "কলজেটা টনটন করে" বটে, কিন্তু নিতাইয়ের ভাবটা খানিক, যা হোক একটা হলেই হল।

এ-সময়ে প্রবেশ করে নিতাইয়ের মা মাতৃময়ী। মুহূর্তে সে নিতাই অন্ন-র সম্পর্কটা আঁচ করে নেয়। পুত্রের উন্নতির স্বার্থে যে-কোনো সিদ্ধান্তে, যে কোনো পাপাচরণে সে নির্বিকার। ফলে মায়াবতী বিতাড়িত হয় চোখের জলে। মাতৃময়ীর প্ররোচনায় অন্নপূর্ণা স্বামীকে বিষ খাওয়ায়, স্বামীর মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে লুকোনো টাকাকড়ি-সোনাগয়না হাতাতে চায়। আশা একটিই অন্ন-র এবং মাতৃময়ীর, পরাণ মারা গেলে নিতাই-অন্নর বিয়ে হবে, টাকা হবে, গায়ের "মান্যিগন্যি" জোতদার হবে নিতাই। টাকার থলিটা অন্নপূর্ণা খুঁজে আনতেই স্টেজের ক্ষীণ-হয়ে-আসা আলোয় দুই নারীর হিংস্র জান্তব ঝটাপটি চলে কিছুক্ষণ। অবশেষে নিতাই হাতে তুলে নেয় ঐ সম্পত্তি।

ঠিক এখান থেকেই নিতাই চরিত্রের দ্বিতীয় স্তর শুরু। এর আগে পর্যন্ত নিতাই এক রকম। ফূর্তি করে ঠিকই, কিন্তু পরানের অন্তিমকালের নতজানু কান্নায় সেও চোখের জলে ভাসে। পরাণ যখন অন্তিমকালীন ক্ষমাভিক্ষা চায়,

তখন নিতাই ঘোর কাটিয়ে নিজের পাপের কথা ভাবে, বুঝতে পারে "কি কইরে ফেলেচি"। অজিতেশের কণ্ঠস্বরে এই প্রথম হাহাকারটি যেন ভেঙে পড়ে প্রেক্ষাগৃহে। নিতায়েরই চোখের সামনে পরাণকে বিষদানের চক্রান্ত হয়, কিন্তু সে যেন শুনতেই পায় না। কিন্তু যেই মুহূর্তে সে টাকাতে হাত দেয়, তখনই সেও যেন অংশীদার হয়ে যায় এই পাপচক্রের। অজিতেশের স্তব্ধ ভঙ্গি মূর্ত করে তোলে এই পরিবর্তন। নিতাই যেন অনায়াসে উঠে যায় পাপাচরণের আরেক ধাপে।

এক দিকে সে পরাণের তিলে তিলে সঞ্চিত টাকা ওড়াতে থাকে ফুর্তিতে, মদ্য পান করে। অন্য দিকে হাত বাড়ায় প্রথম পক্ষের কন্যা, সম্পর্কে তো তারও কন্যাই হল, সেই আদরিণীর দিকে। আবার সেই দুর্নীতি, যৌনাচার, মদ্যপান, বেসামাল পদক্ষেপ।

আহত অন্নপূর্ণা ও প্রশ্রয়-পাওয়া আদরিণী—দুজনের অশ্রাব্য খিস্তিতে চুলোচুলিতে পরিবেশটা নরক হয়ে ওঠে। আর তার মর্মান্তিক প্রতিবিম্ব দেখি নিতাইয়ের বাবা সরল-বিবেক হাকিম গরাইয়ের ক্লিষ্ট চোখে-মুখে। সে আর্ত-কণ্ঠে বলে ওঠে, "নেতাই, এত জলদি ফুরিয়ে গ্যালে হে! পাখি যেমন জালে আটকায় তেমনি পয়সার জালে আটকে গ্যালে হে—ও হো হো।" হাকিমের অস্তিত্বের সামনে নিতাইয়ের জোর-করা বিকৃত আত্মপ্রত্যয়ও টাল খায়—নিঃসঙ্গতা তাকে এই প্রথম হানা দিতে থাকে। কিন্তু ফেরার পথ নেই নিতাইয়ের। সে অন্ধকারে ডুবছে। অজিতেশও শরীর এলিয়ে দিতে থাকে। চোখের সামনে আদরিণীর হাতের লণ্ঠনটা দুলে উঠতেই তিনি কর্কশকণ্ঠে হল কাঁপিয়ে চিৎকার করে ওঠেন: "আলোটা চোখের ছামু থে সরা"। আলোটা মাটিতে সরিয়ে নিয়ে যায় আদরিণী। আরো অন্ধকার নেমে আসে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন অজিতেশ। নিতাই অবসন্ন ভাঙা গলায় বলে, "আমি ঘুমোব। ও বাবাগো, এট্টু কোলে ন্যাও, আমার জ্বর আসতিচে।"

পরের ধাপে অনিবার্য পরিণতি: আদরিণীর গর্ভে নিতাইয়ের সন্তান। এবার অন্নপূর্ণার হিংস্র মূর্তি। শুধু মাতৃময়ী নির্বিকার—ঠাণ্ডা মাথায়, ছেলের পথের কাঁটা সরাতে, পাপের চিহ্ন মুছে ফেলতে ব্যস্ত। ফলে আদরিণীর সদ্যো-জাত সন্তানকে নিতাইয়ের হাত দিয়েই হত্যা করার কথা যখন ওঠে, তখন মাতৃময়ীর গলা কাঁপে না, অন্নপূর্ণার গলায় উন্মত্ত প্রতিহিংসা।

শুধু ধসে পড়ে নিতাই। নিজের হাতে পিঁড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করতে হয় নিজেরই সন্তানকে, মাটি চাপা দিতে হয়। নিতাইয়ের কণ্ঠের ভয়ার্ত আর্তনাদেই

সেই নৃশংস হত্যার ধারাবিবরণী। নিতাই যতখানি ভেঙেচুরে যায়, ততখানিই ভাঙেচোরে দর্শক। নৃশংস এই হত্যাদৃশ্যটি দর্শকদের চোখের সামনে ছায়া-সম্পাতে শুধু দেখানোই হয় না, নিতাই সেই দৃশ্যটিকে বর্ণনা করে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, অসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খতায় ও পুনরাবৃত্তিতে, শব্দকে ভেঙে ভেঙে, ছড়িয়ে-ছড়িয়ে, অজিতেশের কণ্ঠস্বরের ভঙ্গুর কারুণ্যে ও বন্ধ্যা অস্থিরতায়—যেন সে উপস্থিত পাত্রপাত্রী বা দর্শকদের উদ্দেশ্যে শুধু নয়, নিজেকেও শোনায়—প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণ, চাবুকের মতো, আঘাতে জর্জর করে নিজেকেও।

তারপর টানা দীর্ঘ মর্মান্তিক দহন নিতাইয়ের। আছাড়ি-পিছাড়ি খান অজিতেশ স্টেজে। মাতৃময়ী তো অবিচল বটেই, অন্নপূর্ণাও সব পাপ সাফ হয়ে যাওয়ার পরে তাজা তরতরে, আবার লালসার হাসি ফিরে আসে তার, মাঝখানের ছোট্ট একটা গোলমাল তো বটে, "এই তো মিটে গেল"।

কিন্তু নিতাইয়ের মেটে না, ঝড় বয়ে যায় তাঁর অস্তিত্বে, নরকের দহন সেখানে অনির্বাণ। আবার কি করেই বা জোড়া লাগবে সব কিছু? সে তো শেষ হয়ে গেছে। নিতাই বুঝতে পারে না, "কিসের জন্যি কি"। অপার ক্লান্তি অজিতেশের উচ্চারণে। তাই অন্নপূর্ণাকে বলেন, "তোর সাথে শোব কি করে আমি? তোরে ছোঁব কি করে?"

মিটমাটের পথ আরো পরিষ্কার হয়, শুধু ছেলে খালাসই নয়, আদরিণীর বিয়ের ব্যবস্থাও হয়—অনিচ্ছুক অপ্রকৃতিস্থ আদরিণীকে জোর করে, পাত্রপক্ষকে ভুল বুঝিয়ে।

কিন্তু না, নিতাই আর সহ্য করবে না। আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টার পর আকস্মিকভাবে সে কোথা থেকে যেন জোর পেয়ে যায়। বিবাহ-সভার জমাট আসরে সে একে একে, সর্বসমক্ষে, নিজের পাপের বিবরণ সবিস্তারে বলে—সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। মনের ভেতরকার জমাট অন্ধকারকে বাইরে প্রকাশ করে। আর অন্ধকার কেটে যাওয়ার ছবিটি দর্শক দেখতে পায় হাকিমের প্রস্ফুটিত মুখাবয়বে।

টলস্টয়ের উপন্যাস, তাঁর খ্রীষ্টীয় নীতিবোধ, ব্যক্তিজীবনের সন্তাপ ইত্যাদির আলোকে নাটকের এই মর্ম ও বিন্যাস যতখানি গ্রাহ্য নিশ্চয়ই শাদা চোখে দেখলে নাটকটিকে একটু অস্বস্তিকরই বোধ হবে। এ-কথা সত্যি টলস্টয়ের জীবন ও রচনার সাক্ষ্যে, যে, যৌনতার ব্যক্তিসমস্যারই সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত খুঁজতে চেয়েছিলেন তিনি এখানে। কিন্তু তা বলে এটা নিছক ব্যক্তির

ট্র্যাজেডিও নয়—ব্যক্তিগত পাপ, অপরাধবোধ ও তার খালনই শুধু নয়—এখানকার বাস্তবের সর্বগ্রাসী রূঢ়তায় ব্যক্তির দুর্নীতির মধ্য দিয়ে পরিবেশের পচনটাও প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। অর্থ বা লোভ কিভাবে মানুষের নৈতিক অবনয়নকে ত্বরান্বিত করে, সমাজের কোন্ অসহায়তায় নারীদেহকে ছিনিমিনি খেলে পরিত্যাগ করে আসা যায়, অসম বিবাহবন্ধন কিভাবে লালসার বাঁকা পথে তার মুক্তি খোঁজে, অন্ধ মাতৃস্নেহ কতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে—এইসব অমোঘ প্রশ্ন আরোপিত নয়, টলস্টয়ের পাপপুণ্যের বোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নাটকটিতে অনিবার্যভাবেই আসে—হয়তো আজকের পাঠক বা দর্শকের কাছে নাটকের প্রাসঙ্গিকতা এখানেই আজ বেশি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। শরীর-সর্বস্বতা, শরীরের অতিরিক্ত টান-ভালোবাসা (মায়াবতী-র সঙ্গে পরবর্তী সম্পর্কে যা আভাসিত হয়), নৈতিকতা, টাকার যুক্তিহীন ভূমিকা—এ সব কিছুর যে বিচ্ছিন্ন ও গোলমেলে সম্পর্ক ফিউডাল সমাজে, তারই আলেখ্য রূপে দর্শক দেখতে পারে নাটকটিকে। আর তখনই বোঝা যায় কেন লেনিন উদ্দীপিত মুহূর্তে বলেছিলেন, আমাদের কোনো ভয় নেই, টলস্টয় আমাদের সঙ্গে আছেন!

নাটকটির জোর এই বাস্তবতার জোরেই। বাস্তবতার জগৎ এতই আমূল যে তাতে আঞ্চলিকতা বা দেশের বেড়া প্রায় অবান্তর হয়ে গিয়েছে। মোটামুটি আক্ষরিক অনুবাদ-রূপান্তর এবং গভীর নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে—কিন্তু বলবার কথা এটাই যে, বিপ্লবপূর্ব রুশ চাষীর বাস্তবতা আর আমাদের অভিজ্ঞতার চাষীর বাস্তবতাকে কোনো প্যাঁচ-পয়জারে মেলাতে হয় নি—অনায়াসে অভেদ হয়ে গেছে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা দেশের গ্রামের জোতদার-ভূমিহীন চাষীর সম্পর্কের যে পরিবেশটি গড়ে তুলেছেন তাঁর সংলাপে দৃশ্য-আবহে সব কিছুতেই, তা বাংলা থিয়েটরে এত অবিকলভাবে এর আগে ঘটেছে কিনা জানা নেই। প্রতিটি অভিনেতার নড়ায় চড়ায়, পোশাকে, গায়ের চামড়ার মাটি জমা বিবর্ণতায় ঐ কঠিন লালিত্যহীন বাস্তবতাকে যেন স্টেজের মাঝখানে হাজির করেছেন তিনি। উচ্চারণে কোনো আপোস করা হয় নি, দর্শকদের বোধগম্যতাকেও যেন ভ্রূক্ষেপ করা হয় নি—বাস্তবজীবনের মতোই এখানেও সংলাপ জড়ানো ব্যস্ত, কখনো আলগা, কখনো শ্রুতির খুব কাছে, কখনো আড়ালে। রূঢ় বাস্তবতাকে এরকম প্রবলভাবে হাজির করে বোঝা যায় নান্দীমুখ টলস্টয়ের মেজাজটাই ধরেছেন। এবং তাকে প্রকাশ করার জন্য যতটা সাহসের

প্রয়োজন ছিল প্রযোজকের পক্ষে, এই বেপরোয়া বাস্তবতাকে সহ্য করার জন্য প্রায় ততটা সাহসেরই প্রয়োজন দর্শকদের। সুতরাং আশ্চর্য কি, বহু দর্শকই মানসিক রুগ্নতার কারণে আসনত্যাগও করতেও চাইবেন! সংলাপের ভাষায় বেপরোয়াভাবে যৌন খিস্তি ব্যবহৃত বলে কেউ কেউ যদি একে অশ্লীল মনে করেন, তাতেও আশ্চর্য হওয়ার নেই—কুরুচির শিক্ষায় চাষী-জীবনের নরক এবং মধ্যবিত্তের বারবধূ-যৌনবিলাস তুলনীয় মনে হতেই তো পারে! কারণ নাটকটি সত্যিই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য!

অবশ্য অসুবিধাটাও বোঝা যায়—শুধু সাধারণ দর্শকের কাছেই নয়, বিদগ্ধজনের কাছেও। এখানে নাটকীয় দ্বন্দ্বের পরিচিত সুবোধ্য চেহারা নেই। পরিব্যাপ্ত অন্ধকার, এক টেনশনের পর আরেক টেনশন ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে দর্শকদের ওপর। অভিনয়ের অনেকটাই ঘটে স্টেজের এই আলো-আঁধারিতে। কোনো ফাঁক নেই, বিশ্রাম নেই, প্রসঙ্গান্তর নেই। আজকের দর্শক তো নাটকের অভিনয়ের সঙ্গে দূরত্ব বা বিচ্ছিন্নতায় অভ্যস্ত হচ্ছে, ঠিকভাবেই হোক কিংবা ভুলভাবে—এখানে কিন্তু অভিনয়ের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে পড়ার পুরোনো অভ্যাসই প্রশ্রয় পায়। কিন্তু শিল্পের সত্য যে কোনো তত্ত্বে নেই, তারই প্রমাণ বোধহয় এই যে, ব্রেখটীয় নাটকের উৎসাহের জগতেই এই আবেগনাট্যে আপ্লুত হই আমরা।

আপ্লুত হওয়ার আরও একটি বড় কারণ, চেকভের জগতের মতোই, টলস্টয়ের জগৎ, রুশ নাটকের জগৎ শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে, এই এশীয় মানসে, যতখানি অন্তরঙ্গ ততখানি সম্ভবত পশ্চিম ইওরোপের কেউ নয়। এর চরিত্রগুলি অনায়াসেই আদল পেয়ে যায় আমাদের পরিচিত চরিত্রে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাট্য-প্রযোজনার গোড়ার যুগেই রুশ নাটকের প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাত ও অনুরাগ বারবার দেখিয়েছেন। তাই কি টলস্টয়ও তাঁর কাছে সহজেই ধরা পড়ে—যিনি চাষীর জীবনকে চাষীর সহজ দৃষ্টিতেই দেখতে চেয়েছিলেন? চাষীর সহজ কিন্তু প্রচণ্ড দৃষ্টিতে। তাই অজিতেশের প্রযোজনায় নিতাইয়ের পিতা হাকিমের উক্তির ও আচরণের আহত সারল্য আমাদের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যায়—যেমন পৌঁছয় জোতদার পরাণের মৃত্যুর মুখেও টনটনে হিসেবী বুদ্ধি ও ক্ষমাভিক্ষার কারুণ্যের সহাবস্থান। তাই তো হাকিম যখন সন্তানের তৈরি কলুষিত পরিবেশে হাতটা শূন্যে তোলে বিমূঢ় অসহায়তায়, তখন উদাস বিষাদের ঐ চেহারা আমাদের খুবই চেনা লাগে।

অথচ মুহূর্তে মুহূর্তে খ্রীস্টানী পাপপুণ্যবোধের যে প্রাসঙ্গিকতা আছেই নাটকে, তাকেও যেমন অজিতেশ অগ্রাহ্য করতে পারেন না, তেমনি অস্বীকার করতে পারেন না নাটকের বহুস্থানে প্রায় শেক্‌সপীয়রীয় নাট্য-উত্তেজনা। প্রকাশ্যত সেক্‌সপীর-বিরোধী হয়েও টলস্টয় এড়াতে পারেন নি শেক্‌সপীয়রীয় নাটকের বিন্যাস ও নাট্যমুহূর্ত রচনার শিক্ষা—আমার তো তাই বেশি করে মনে হল অজিতেশের প্রযোজনা দেখে। অথচ সেই ঐতিহাসিক বিশ্বস্ততার সঙ্গে তিনি মেলালেন আমাদের রূপকহীন যথার্থতাকে।

পেছনের শাদা পর্দায় প্রলম্বিত ছায়াসম্পাতে চরিত্রগুলির ব্যস্ত চলাফেরা, কুৎসিৎ লড়াই—প্রায় খ্রীষ্টীয় আলো-আঁধারি পরিবেশে—নাটকটির মনস্তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনাকেই আভাসিত করে না, বাস্তবতারও আরো দরজা খুলে দেয়, চরিত্র-গুলির ছায়া সহ বাস্তবতা।

অজিতেশের অভিনয় এ-নাটকে নিভুর্ল লক্ষ্যভেদী। নিতাই চরিত্রের সঙ্গে তিনি যেভাবে একাত্মতা স্থাপন করেছেন তা বিশেষভাবেই প্রশংসাযোগ্য। এই চরিত্রের রূপান্তরের ধরন, তার শাদাসিধে গাড়োল অস্তিত্ব থেকে হঠাৎ পাপাচরণের সচেতনতায় মুখে ভাঁজ, তারপর অনুশোচনার দমবন্ধ পুনরাবৃত্তিতে বিধ্বস্ত ক্লান্তি—পলকে পলকে মুখাবয়বে এই পরিবর্তন, এই কুঞ্চন অজিতেশের মুখে এখনও যতটা আসে, তাতে আমাদের বিস্ময়ই বাড়ে। অনুশোচনার দীর্ঘ বিস্তারিত অভিনয়ে যখন তিনি স্টেজের ওপর ছটফট করতে করতে ওলোটপালট খান, তখন এক-একবার হয়তো তাঁর শারীরিক তৎপরতার হ্রাসের কথা মনে ওঠে, হয়তো ভাবা যায় আগে হলে তিনি শরীরকে আরো নির্দয়ভাবে ভেঙেচুরে দিয়ে যন্ত্রণাকে দৃশ্যগ্রাহ্য করতেন, মাঝে মাঝে হাতের ওপর মাথাটা যত্নে রাখতেন না—কিন্তু সে সব ক্ষণিকের জন্য মনে হলেও তাঁর গোঙানি ও আর্তনাদ দর্শককে স্তব্ধ করে দেয়। তারপর আত্মস্বীকৃতির মুহূর্তে তাঁরও গলায় আসে ক্ষমাভিক্ষার কারুণ্য—প্রায় পরাণেরই ভাষায়। যন্ত্রণা-থেকে-উঠে-আসা ক্লান্তিতে-ঘেরা প্রত্যয়, যেন দূর থেকে।

অভিনয় অবশ্য সকলেরই খুব ভালো। গ্রামীণ বাস্তবতাকে তাঁরা কিভাবে এক সঙ্গে সবাই মিলে মুদ্রিত করে দিতে পারলেন সেটা ভাবতেই বরং অবাক লাগে। বীণা মুখোপাধ্যায় যে এত সাবলীল দক্ষ অভিনয় করতে পারেন (অন্নপূর্ণা চরিত্রে) তা আগে কখনো মনে হয় নি। যেমন চিনতে পারি নি রঞ্জিত চক্রবর্তীকে। তিনি যে ভালো অভিনেতা তা বোঝা গিয়েছিল 'ফুটবল'-এর হরি পুরকায়স্থ চরিত্রে—কিন্তু এ-নাটকেই পরাণ মাহাত্তো-র

সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য আরো স্ফুরিত। প্রায় প্রতিভাদীপ্ত অভিনয় বলা চলে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও এ-দুজনের কথা তুলতেই হয়—নচেৎ অভিনয় ভালো তো সকলেরই—শ্যামলী ঘোষ (মাতৃময়ী), অসিত কুণ্ডু (হাকিম গরাঁই), সন্ধ্যা দে (আদরিণী) সকলেরই।

গানগুলি নাট্যআবহ ও নাট্যমর্ম সৃষ্টিতে সার্থক। অমল রায়-এর আলোকসম্পাতে নাটকের আলো-অন্ধকারের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে অকারণ উজ্জ্বল আলো ফেলে তিনি যে কিছুটা অসাবধানী তারও প্রমাণ রেখেছেন। মঞ্চ ও রূপসজ্জায় রাধারমণ তপাদার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

অরুণ সেন

মহাকালীর বাচ্চা। প্রযোজনা : থিয়েটার ওঅর্কশপ। পরিচালনা : বিভাস চক্রবর্তী। আলোচিত অভিনয় : ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯, অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টস।

থিয়েটার ওঅর্কশপের বয়স হলো প্রায় সাড়ে বারো বছর। এর মধ্যে তারা পাঁচটি একাঙ্ক এবং নটি পূর্ণাঙ্গ, মোট চোদ্দটি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। মাঝখানে দু-বছর—আটষট্টি এবং তিয়াত্তর ছাড়া প্রত্যেক বছরই কোনো-না-কোনো নতুন নাটকে হাত দিয়েছেন, কোনো বছর বা একাধিকে। এইসব প্রযোজনার মধ্যে মিলেমিশে আছে বিদেশী আর স্বদেশী নাটক। যে-নাটকগুলি এঁদের হাতে সবচেয়ে ভাল উৎরেছে, কিংবা জনপ্রিয়তা পেয়েছে তার সবকটিই মৌলিক বাংলা নাটক—এবং আধুনিক নাট্যকারদেরই রচনা। সেদিক থেকে এঁদের নাট্যপ্রয়াস কিছুটা বিশিষ্ট। তাঁদের শেষ নাটক 'মহাকালীর বাচ্চা' মোহিত চট্টোপাধ্যায়-এর লেখা মৌলিক বাংলা নাটক।

জমিদারের প্রাসাদের অলংকার-ভার ঘাড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নেংটিপরার দল—তারাই আবার হয়ে যায় ইতিহাস কিংবা মহাকাল। তারা উঁকি মারে, ব্যঙ্গ করে, অট্টহাসি হাসে। জমিদারের দরকারি সিন্দুকের পাশেই পাতা থাকে নড়বড়ে বেঞ্চি, গা-ভরা গহনা নিয়ে জমিদারগিন্নিকে তার ওপরেই বসতে হয়। …গোটা-পাঁচেক গাছের কাঠামো পোজিশন বদলে নেয়, তার ওপর আলো পড়ে, আলো নামে, ওঠে, গভীর অরণ্যে ঢাকা পড়ে যায় মঞ্চ। সেই অরণ্যে মহাকালীর বাচ্চার খোঁজে অন্ধকার চিরে টর্চের আলো পড়তেই গা ছমছম করে ওঠে।

আলো নিভিয়ে, পাড়া কুমবিং!···ক্ষেতুচৌকিদারকে টেনে নিয়ে যায় বনমালী, অন্ধকারে, তার লাঠি বনমালীর হাতে, হ্যারিকেন হাতছাড়া-বাবু, আমাকে যেন বলি দিতে—তার কথা শেষ হওয়ার আগেই কোথায় যেন ঢাকে কাঠি পড়ে, পুজোর বাজনা বেজে ওঠে। ঢাকের বাজনাতেও এমন হাহাকার আনা যায়! বলিশেষে, যেন তারই প্রতিফলে সেণ্টার উদ্বোধনের দৃশ্যে আর কোনো আড়াল থাকে না, ঢাক চলে আসে প্রকাশ্যে, মঞ্চে। কাঠি নেই, আঙুলে-ঢাকে বোল ফুটতেই স্পষ্ট দেখা যায় জমিদারের উদ্বোধিনী হাতের আঙুলে আর ফটোক-তোলা-হাসির দাঁতের ফাঁকে রক্ত।···কমিশনের দৃশ্যে পণ্ডিতদের দুর্বোধ্য শব্দ আওড়ে যাওয়ার পাশে একথালা ভাতের গান, ছেলে-মেয়েদুটির নিষ্পাপ মুখ—অসাধারণ এফেক্ট্ সৃষ্টি করে।···মিনিটখানেকের দৃশ্যে ছাতা মাথায় বাবুটি মধ্যবিত্তের অর্থহীন, সংকীর্ণ এবং স্বার্থপর অস্তিত্ব প্রকট করে যান—শহরও আর নিরাপদ থাকছে না। বীভৎস!···ক্ষমতার কেন্দ্রে হাজির হওয়ার জন্যে কি না করা যায়! মাথার ওপর খড়্গের মতো মহাকালীর বাচ্চা—তাকেও মূলধন করে গবেষণার সেণ্টার খোলা চলে। উদ্বোধনের দৃশ্যে চক্রীরা মাঝে মাঝেই ফ্রিজ্‌ড্ হয়ে যায়, ক্যামেরাম্যান এবং রিপোর্টারও, শুধু সঙের গানের আদলে রাম মুখোপাধ্যায় এবং রমাবাই দে নেচেই চলেন, গেয়েই চলেন, সেণ্টারের খুঁটি আর ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নেংটি পরার দল। সুরে, কথায়, বাতাসে ব্যঙ্গ হাসে খিলখিল করে।···অথবা সেই অসম্ভব দৃশ্যটি—বোবা, বিকৃতমুখ চৌকিদার স্তম্ভিত নীরবতার মাঝখানে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে হেঁটে আসে কাঁপা পায়ে, একবার থুতু দেয় জমিদারের মুখে। তার অস্তিত্বের সার্থকতা! (দোহাই বিভাস, অন্তত এই দৃশ্যে কোরাসকে দিয়ে থুতু দেওয়ার প্রতিধ্বনি করাবেন না, কত কিছু যে মাটি হয়ে যায়। অশোকের অমন করে বলা ফটোক তুলবেন না-টাও!)।

পরিচালকের সৎ পরিশ্রম এবং সাহসী কল্পনার এমনি অনেক প্রমাণ আর উদাহরণ দেখাতে দেখাতে নাটক এগোয়, এগোতে এগোতে ভেঙে যায়, মুখোস নামিয়ে রেখে চরিত্রের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে চরিত্র—কখনও বিপরীত মেজাজেরও বা। সরু সরু রেখার টানে ছবি ফুটে ওঠে, ছোট ছোট চরিত্র, ছোট ছোট কথা অসম্ভব তাৎপর্য পেয়ে জমিদার, তার গ্রাম, তার লোলুপ বাসনা পার হয়ে নাটকের মাঝখানে টেনে নামায় খবরের কাগজ, রেডিও, টি-ভি, চৌকিদার থেকে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত নিখুঁত বোনা

গোটা জালটাকে যার নাম রাষ্ট্র। প্রযোজনার সমগ্র ব্যাপারটাকেই বিভাস চক্রবর্তী এ নাটকে এক নতুন স্তরে নিয়ে যেতে পেরেছেন, সন্দেহ নেই।

গান—যা এ নাটকের বড় সম্পদ—একার গলা থেকে ছড়িয়ে যায় বহুর মধ্যে, সমাজভাঙার সামাজিক ঐক্যের সূত্র হয়ে ওঠে। নাটকের গানে দেবাশিষ দাশগুপ্ত-র নাম তো বেশ জোরদার। মহাকালীর বাচ্চাতেও তাঁর কাজ খুবই উঁচু মানের। চমৎকার কথাতে জুৎসই সুর লাগিয়ে তিনি যে গান বেঁধেছেন এবং রাম মুখোপাধ্যায় যেভাবে গেয়েছেন তাতে নাটক নতুন মাত্রা পেয়েছে। তবে গানের কিছু অতিব্যবহারও ঘটেছে। কাহিনীতে এমন কিছু নেই যে দর্শককে বোঝাবার জন্যেও গান শোনাতে হবে।

অভিনয়ের কাজে একক এবং দলগত—থিয়েটার ওঅর্কশপ একটি মান প্রতিষ্ঠা করেছেন ইতিমধ্যেই। বর্তমান নাটকেও তা প্রায় অক্ষুন্ন। এক-মাত্রিক চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও জমিদারটি জীবন পায় অশোক মুখোপাধ্যায়-এর অভিনয়শক্তিতে। অনবদ্য অভিনয় করেন ডাক্তারের ভূমিকায় রণজিত চক্রবর্তী। টেপ রেকর্ডারের মাইক্রোফোন সামনে পেয়েই, প্রায় হামা দিয়ে তাঁর 'শৈশব থেকেই আমার বাসনা ছিল…' ভোলা যায় না। তবে তাঁর অ্যা-টা চলে না। ঐ দৃশ্যের পরে আর একবারও চলেও নি। অঞ্জন দেব-এর ক্ষেতু, শরদিন্দু রায়-এর কৈলাস, শিবনাথ চৌধুরীর সাধুচরণ, কমিশনের বিমলেন্দু ঘোষ, কমল মান্না, আশিস মুখোপাধ্যায় কিংবা রজত সেনগুপ্ত-র বনমালীও খুব ভালো। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় জয়তী ঘোষ-এর পদ্ম। মাণিক রায়চৌধুরী অত্যন্ত শক্তিশালী অভিনেতা। কনস্টেবল থাকার সময় তিনি যা করতেন অফিসার হওয়ার পর তা আর হচ্ছে না। অথচ তাঁর অফিসার হওয়াই উচিত। এ ব্যাপারে কিছু করা যায় কি ?

সবার কাছ থেকে সব কাজ ঠিক ঠিক আদায় করে কাজে লাগাতে গিয়ে পরিচালক যেন প্রতিজ্ঞা করেছেন, ব্যাপারটিকে কিছুতেই 'নাটক' হতে দেবেন না। নরক গুলজার-এর উল্টোরথ কিনা কে জানে! নাটকীয় মুহূর্ত গড়ে তুলে, গড়ে উঠতেই তিনি শক্ত হাতে ভেঙে দেন সব মায়া। এমনকি শেষ মুহূর্তেও, মঞ্চে যখন অনবদ্য ফ্যান্টাসির দৃশ্য—ঢেউ-এর মতো মানুষ আর মানুষ, ব্যালের ভঙ্গিতে বিপুল সমুদ্র, জমিদার তার দলবল নিয়ে ডুবছে, মহাকালীর বাচ্চারা তাদের টেনে নামাচ্ছে নরকের দিকে, দ্রুত, অনিবার্য—উইংসের পাশ থেকে লাইট মারতে মারতে মঞ্চে ঢুকে পড়েন

লাইটম্যানরা ফুলপ্যান্ট আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে। কিন্তু পরিচালকের এত অ-নাটকীয় চেষ্টা সত্ত্বেও নাটকেরই তাপ কিন্তু দর্শকদের ছুঁয়েই দেয়।

দুর্ভাগ্য, ছোঁয়ই শুধু, ভেতর থেকে দর্শককে নাড়িয়ে দিতে পারে না।

তার প্রধান কারণ, এ-নাটকে নিতান্ত বাস্তব, প্রবল এবং প্রতিষ্ঠিত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই-এর সেনাপতি এতই প্রতীকী, এমনই অনির্দিষ্ট এবং নেতৃত্বগুণরহিত যে সমগ্র বিপ্লবটার পায়ের তলায় ম্যাজিক ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এবং ম্যাজিক তো বিপ্লব নয়।

কাহিনীর ভেতরের টেনশন, নাটকের ভেতরের নাটকই গতির আসল উৎস। 'মহাকালীর বাচ্চা'র ভেতরে সেই টেনশনটা না থাকার ফলে বাইরের সব কলহ-ই ফর্মুলা-মাফিক এগোয়, শুরুতেই যেন ধরা পড়ে যায় কি ঘটতে যাচ্ছে, এখন শুধু দেখা পরিচালক কিভাবে ঘটান। সমস্ত ব্যাপারটা নাটকের স্থূল হয়ে যায়। কোনো কোনো দর্শকের একঘেয়েও লাগে। জরুরি চরিত্রগুলোও তাই ফ্ল্যাট হয়ে যায়। 'চাকভাঙা মধু'-র জোতদার প্রায় সারাক্ষণ মরা হয়ে শুয়ে থাকে, তবু শেষ পর্যন্ত তার প্রতি ঘৃণায় গা রি-রি করে। ইন্দুশেখরের বেলায় তা হয় না কিছুতেই।

এত জটিল ও নাটকীয় ফর্ম, অথচ গল্পটা এমন সাদামাঠা, অতি সরল গাঁথুনি-র! খারাপ লোকেরা বেজায় খারাপ, ভালো লোকেরা বড্ড মার খায়। শেষ পর্যন্ত ওর খারাপ লোকের বিরুদ্ধে সব ভালো লোক জোট বাঁধে এবং জিতে যায়। দুই শিবিরে কোথাও কোনো দ্বন্দ্ব নেই, জটিলতা নেই, গোটা সমাজে শুধু দুটো মোটা লাঠির ঠোকাঠুকি। অথচ নাটকের শুরুতেই জটিলতার ইঙ্গিত ছিল। জেলেরা জমিদার এবং সরকারকে অস্বীকার করে বিল দখলে রেখেছে, লাঠি হাতে নিয়েই। যে-গ্রামে এমন জেলেরা থাকে সে গ্রামের জমিদার—তাকে দেখেশুনে যদিও মাঝারি সাইজের জোতদার ছাড়া অন্য কিছুই মনে হয় না—ইচ্ছেমতো চৌকিদারকে বলি দিতে পারে? চৌকিদারের আপত্তি টেঁকে না, জেলেদের সঙ্গে এক ছিলিমে সে তামাক খায়—তবু তারা ছুটে আসে না, ঠেকাতে বা প্রতিবাদে? এটা কোনো টেকনিক্যাল ত্রুটি নয়। বস্তুত সময়ের জটিলতা এবং জীবনের সত্যকে ধরতে চাওয়া-না-চাওয়া, পারা-না-পারার প্রশ্ন। সেই কারণেই বর্তমান ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয় না, অতীতের ছায়া হয়ে যায়। যে পটভূমিতে শ্রেণী-সংগ্রামের যে রূপ এই নাটকে দেখানো হয়েছে তা এই দেশেরই কোথাও কোথাও ইতিমধ্যেই অতীতের ব্যাপার হয়ে গেছে (কেরালার

ভূমিসংস্কার ও ক্ষেত মজুর আইন, পশ্চিমবঙ্গের জমি দখল ও অপারেশন বর্গা, পাঞ্জাবের 'সবুজ বিপ্লব')।

পরিচালক তাঁর দক্ষতায় প্রযোজনার নানা যাদুতে অনেক ফাঁক ভরেছেন। কিন্তু গোলমাল তবু থেকেই যায়। আজকের গ্রাম-জীবনের জটিলতা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিকণ সুতোগুলো ধরতে না চাইলে বা না পারলে আটাত্তরের নাটকও আটাত্তরে, এমন কি আটচল্লিশেই থেকে যাবে, থেমে যাবে, উপায় নেই। এবং সেই কারণেই বোধহয় সম্ভাবনাময় সব মুহূর্ত সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ঘৃণা, ভালোবাসা, মজা, প্রতিবাদ, ভয়, লোভ, বিদ্রোহের সার্থক সব মুহূর্ত—সব মিলিয়ে এমন এক জটিল সমগ্রতার সৃষ্টি হওয়ার বাসনা যা ভাসাবে, ভাবাবে—যেন অপূর্ণই থেকে যায়। হয়তো সেই কারণেই ফ্যান্টাসি দিয়েই নাটক শেষ করতে হয় এবং শেষ হওয়ার পর দর্শক তাঁর বুকে অথবা মাথায় অথবা উভয় স্থানেই শুধু অসাধারণ প্রযোজনার এক উদাহরণ বহন করে নিয়ে যান। কিন্তু তাই কি 'অন্য থিয়েটার'?

আর এখানেই থিয়েটার ওঅর্কশপ—সব কিছু সত্ত্বেও—তাঁদের আগেকার সাফল্য পার হয়ে যেতে পারেন না।

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

নাম জীবন: নাট্যকার-নির্দেশক: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়॥ আলোচিত অভিনয়: জানুয়ারি, ১৯৭৯, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ।

সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের দুটি ভিন্ন স্রোতের সমান্তরাল প্রবহমানতা আমাদের বিস্মিত করে। একদিকে গ্রুপ থিয়েটারগুলি জীবনবাদী নাটককে তাদের সংগ্রামের শাণিত অস্ত্র করে তুলে সাধারণ মানুষের মধ্যে গণচেতনার সঞ্চারে প্রয়াসী, অন্যদিকে পেশাদারী নাট্যব্যবসায়ীরা নাটকের নামে আশুতোষ দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে ঘুমপাড়ানী বুলেট। পেশাদারী মঞ্চের এই হাঁফসানো অবস্থার মধ্যে ফুসফুস ভরে অক্সিজেন নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চের সাম্প্রতিকতম প্রযোজনা 'নাম জীবন'।

এ নাটকের রচনা, নির্দেশনা এবং প্রধান ভূমিকায় অভিনয়ের দায়িত্ব পালন

করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। পাঁচজনে-মিলেজুলে-চল্‌-ভাই-নাটক-করি গোছের প্রচেষ্টা আদৌ নয়। অথচ স্পষ্টতই এটি একটি কমার্শিয়াল উদ্যোগ। কোনো অভিনব বিষয়বস্তু নয়, কোনো দুঃসাহসিক পরীক্ষা নয়, কোনো আঙ্গিকের চমক নয় কিন্তু কমার্শিয়াল নাটকের 'নর্ম'-টি ধরে ফেলেছেন নাট্যকার-নির্দেশক। শিল্পের প্রয়োজন আর বাণিজ্যিক দায়কে আশ্চর্য দক্ষতায় মিলিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

কলকাতার এক মধ্যবিত্ত অঞ্চলের পাঁচমিশেলি ভাড়াটে-অধ্যুষিত একটি বাড়ির কার্বন-কপি হাজির করা হয়েছে মঞ্চে। সামান্য ক-টি চরিত্র। বাড়ির চার ভাড়াটে।—বিশ্ব (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়), বাণী (লিলি চক্রবর্তী), অমরনাথ (নির্মল ঘোষ) এবং তাঁর স্ত্রী বাসনা (নীলিমা দাশ) ও মেয়ে রুণি (স্বর্ণালী গঙ্গোপাধ্যায়) আর নমিতা (সুচেতা দাস)। এছাড়া এই বাড়ির ও একটি কারখানার মালিক নেপাল সরকার এবং আধা-গেরস্ত মেয়ে নমিতার বাবু (মিন্টু চক্রবর্তী)। চার ভাড়াটের জীবনযাপনের দৈনন্দিনতার মধ্যে দিয়ে আঁকা হয়ে যায় মধ্যবিত্ত সমাজের গ্লানি, হতাশা, যন্ত্রণা ও স্বপ্ন। এ বাড়ির উঠোনটি যেন মিনিয়েচার বাংলা।

এ নাটকের ছন্দিত টিমওয়ার্ক প্রযোজনাকে সম্পূর্ণতই সফল করেছে। অভিনয়ের মধ্যে কোথাও হাততালি পাবার উচ্চকিত অপচেষ্টা নেই। মিন্টু চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে দর্শক যে রিলিফ পেয়ে যান তা ছকে বাঁধা রিলিফ নয়, চরিত্রটির প্যাটার্ন থেকেই রিলিফ উঠে আসে এবং সেই সঙ্গে সুচেতা দাসের অভিনয়ে কৌতুকবোধের আড়ালে তার স্বপ্নভঙ্গের বেদনা দর্শকদের মন স্পর্শ করে যায়। প্রধান দুটি চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও লিলি চক্রবর্তী অত্যন্ত স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। সৌমিত্রবাবু দু-একটি জায়গা ছাড়া কোথাও আমাদের বুঝতে দেন নি যে তিনি অভিনয় করেছেন। সবচেয়ে অবাক করে দেন নীলিমা দাশ। বিশ্ব-র এই বৌদিকে আমরা ঠিক এইভাবেই আমাদের আশেপাশে অহরহ দেখে থাকি। বাসনার কাছে টাকা চুরির ঘটনা বলার সময় নির্মল ঘোষের অভিনয় অসাধারণ। আর ছোট্ট মেয়ে স্বর্ণালি—সে কি করে যেন তার চরিত্রটিকে ঠিক-ঠিক বুঝে ফেলেছে।

নির্দেশক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের দক্ষতার নজির ছড়িয়ে রয়েছে নাটকের অনেক জায়গায়। সংলাপের সঙ্গে আঙ্গিক অভিনয়ের বোঝাপড়া সুন্দরভাবে প্রকাশ পায় যখন প্রাক্তন ক্রিকেটার অমরনাথের ব্যাটটি হাতে নিয়ে শূন্যে বোঁ করে একবার ঘুরিয়ে দেন তিনি। নীলিমা দাশের অনুচ্চ কণ্ঠে 'আমার অনেক

কাজ পড়ে রয়েছে মা' সংলাপ প্রক্ষেপণ, বিশের সঙ্গে বাণীর বাদবিতণ্ডার সময়ে রুণির মুখে হ্রস্বতম সংলাপ 'ছিঃ', স্বীকারোক্তির সময়ে অমরনাথ ও বাসনার কম্পোজিশন, পাশের বাড়ির মেয়ের নেপথ্য কণ্ঠকে উদ্দেশ্য করে রুনির অভিনয়—এ-রকম আরো কিছু জায়গায় নির্দেশক তার যোগ্যতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন।

তাপস সেনের আলোকসম্পাত, সুরেশ দত্তের মঞ্চসজ্জা, ভাস্কর মিত্রের আবহসৃজন ও সন্তু মুখোপাধ্যায়ের নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত এ নাটকে যোগ্য সাথ-সঙ্গতের ভূমিকা পালন করছে। তাপস সেনের আলোর কাজে কোনো গিমিক নেই অথচ এ-নাটকের বিষয় অনুযায়ী এর চেয়ে ভালো আলোর ব্যবহার আশা করা যায় না। বিশেষ করে অমরনাথের স্বীকারোক্তির মুহূর্তে তাঁর আলোর ব্যবহার স্মরণীয়। সুরেশ দত্ত প্রসেনিয়ম-কে ব্যবহার করে এবং বিশুর দেড় তলা ঘরের সেটে 'পুলি সিস্টেমে' একটি স্ক্রিন ব্যবহার করে অপরিসর মঞ্চকে সুন্দর কাজে লাগিয়েছেন। দেওয়ালে ভাঙা ইটের গর্ত, ঘরের ছাদে টুকিটাকি বাড়তি জিনিস, উঠোনে কল, নমিতার ঘরের জানলা দিয়ে সস্তা ছবির ক্যালেণ্ডার দেখিয়ে দেওয়া—সবই লক্ষ্য করবার মতো।

এ-নাটকে সোচ্চার প্রতিবাদ নেই ঠিক কিন্তু সদর্থক অঙ্গীকার আছে। নাটকের মুখ্য চরিত্র বিশু প্রথম দিকে তার এই দমবন্ধ-করা জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে সমস্যা এড়াতে চায় বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পালায় না এবং নাটক শেষ হয় বিশু ও বানীর মিলিত প্রচেষ্টায় একটি জীবন সৃষ্টির অঙ্গীকারে। তবে নাটকের শেষ সংলাপটির পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের নামটি বড্ড সোজা। এ যেন স্কুলপাঠ্য রচনায় নামকরণের সার্থকতা বুঝিয়ে দেওয়া। তাছাড়া বিশের মানসিক পরিবর্তন যেন কিছুটা প্রস্তুতিনিরপেক্ষ।

শুভাশিস্ গোস্বামী

তুঘলক। বেগম কা তাকিয়া। আধে অধূরে। মুখ্যমন্ত্রী।
প্রযোজনা: ন্যাশনাল স্কুল অব্ ড্রামা, নয়া দিল্লি। অনামিকা কলা সঙ্গম আয়োজিত নাট্যোৎসব (পোলার ফ্যান ইণ্ডাস্ট্রিস-এর সাহায্যে)। ৯-১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯। স্থান: ডালহৌসি ইন্‌স্টিটিউট ও বিদ্যামন্দির, কলকাতা।

কলকাতা শহরে এই নাট্যোৎসব খুবই উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। কারণ এর উদ্যোক্তা দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকারের

সাংস্কৃতিক দপ্তর সংগীত-নাটক-অকাদেমি-র অধীনে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। নাটক-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে তালিম দেওয়াই ছিল এই স্কুলের প্রধান কাজ। শম্ভু সেন বা ই আলকাজি-র মতো ব্যক্তি কোনো না কোনো সময়ে এই স্কুলের প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৬৩ সাল থেকে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা-র রেপ্যারটরি গ্রুপ, অর্থাৎ অভিনয়ের স্থায়ী দল তৈরি হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ২৫ জন শিল্পীকে নিয়ে।

ফলে সরকারী আনুকূল্যে আর্থিক কৃচ্ছ্রতার স্পর্শমুক্ত এই সর্ব ভারতীয় দলটি যখন কলকাতায় পাঁচটি নাটক নিয়ে হাজির হয়, তখন, বলাই বাহুল্য, এখানকার হিন্দী-ভাষী দর্শকই শুধু নয়, বাঙালি নাট্যপ্রিয় দর্শকরাও উন্মুখ হয়ে থাকেন। এরকম একটা জাতীয় স্তরের প্রচেষ্টার ফলাফল কি, তা জানবার জন্য যেমন, তেমনি এর সঙ্গে আলকাজি-র নাম জড়িয়ে আছে বলেও।

প্রথম দুটি নাটক—'তুঘলক' এবং 'বেগম কা তাকিয়া'—অনুষ্ঠিত হয় ডালহৌসি ইনস্টিটিউটের খোলা মঞ্চে। দর্শকদের ডান পাশে ক্লাব-হাউস, বাঁ-পাশে একটা অসম্পূর্ণ ইমারত। মাঝখানের প্রশস্ত মাঠ এবং সুইমিং পুলের ওপর, খোলা আকাশের নীচে তৈরি করা হয়েছে বিশাল মঞ্চ। ওপর-নীচে এবং পাশাপাশি দু-দিকেই বিস্তৃত। জায়গাটা খুব ভালো, যদিও দূরে বাতি-জ্বলা কলকাতার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল এবং তার চেয়েও বড় কথা পেছন থেকে প্রায় রোজই ধর্মীয় গান ও বক্তৃতার রেশ ভেসে আসত—তবু সব মিলিয়ে পরিবেশটা যথেষ্ট নির্জন ও অন্ধকার। তবে দিল্লির পুরানা কিল্লা—যেখানে এঁদের নিয়মিত অভিনয় হয়—তার পরিবেশ পাওয়া যাবে কোথায় এখানে! বাকি তিনটি নাটকের অভিনয় রীতিমাফিক ঢাকা সংকীর্ণ স্টেজে।

'তুঘলক' প্রখ্যাত কন্নাড় নাট্যকার গিরিশ কারনাড-এর লেখা। কন্না ভাষা থেকে উর্দু-প্রধান হিন্দিতে অনুবাদ করে অভিনীত হচ্ছে। আলকা স্বয়ং এর পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর ঐ পরিচালনার ভিত্তিতেই নাটক এখনো প্রযোজিত হয়ে থাকে।

ইনস্টিটিউটের ঐ খোলা আকাশের নীচে বিশাল মঞ্চে ছ-শ বছর আগেকা ইতিহাসকে প্রকাশ করার জন্য দৃশ্যবিধান যেমন সাংকেতিক, তেমা বাস্তব। পুরানা কিল্লা-তে নিশ্চয়ই আরো জীবন্ত হয়, কিন্তু এখানে

মঞ্চসংস্থান—ফাঁকা জায়গার এরকম অঢেল ব্যবহার—ঐতিহাসিক বিশালত্ব ভালোই এনেছে। মঞ্চ-উপস্থাপনার এই লক্ষ্যের কথা ভুলে গিয়ে একে ক্রিকেট খেলা দেখার সঙ্গে তুলনা করা নেহাতই বদ রসিকতা (অনেক সমালোচক তা-ই করেছেন)।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটকে স্পষ্ট করার জন্য যা যা করা দরকার, তা সবই নিপুণ ও সূক্ষ্মভাবে করা হয়েছে—বিশ্বস্ততা বা প্রামাণিকতার একটা আবহাওয়া গড়ে উঠেছে তার ফলে। এ ব্যাপারে প্রায় কোনো গলদ বা খামতিই নেই।

বিশাল মঞ্চকে ভাগ করা হয়েছে কয়েকটি ভাগে। বাদশাহের পাঠগৃহ; বাদশাহের প্রবেশ তোরণ ও বেগমের প্রবেশপথ এবং দর্শকদের একেবারে ডান দিকে তুঘলকাবাদ, তার পেছনে তুঘলকাবাদের বাহির। সামনের প্রশস্ত চত্বর। বাদশাহের পাঠগৃহ ও প্রবেশতোরণের জমকালো ভাবের পাশে তুঘলকাবাদের অংশটিতে নির্জন পরিত্যক্ত একটা ভাব আসে।

ঠিক এরকমই সংগত বৈপরীত্য ফুটে ওঠে পোশাক-নির্বাচনে, বিশেষত পোশাকের রং-ব্যবহারে। জনসাধারণের পোশাকে মেটে রং আর বাদশা বেগমদের পোশাকে ফিরোজা, গোলাপী। বিশেষভাবে তুঘলকের পোশাক তো চোখ কাড়েই—শাদা, কালো, জরি দিয়ে তৈরি তার শাহী পোষাক। সংগীত-ব্যবহারেও এই সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়—নাটকের আবহাওয়ার অনুকূল এই সংগীত।

এতগুলো তৃপ্তিদায়ক সাফল্য সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত একটা ব্যাপারে খট্‌কা থেকেই যায়। নাটকটিকে তো শুধু ঐতিহাসিক বিশালত্ব ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করার জন্যই উপস্থিত করা নি। গিরিশ কারনাডের নাটকের মূল ব্যাপার নিশ্চয়ই মহম্মদ বিন্ তুঘলকের কৌতুহলোদ্দীপক ও ট্র্যাজিক চরিত্রটি। সেই যে নানা বৈপরীত্যে জড়ানো চরিত্র—একদিকে তাঁর প্রচণ্ড স্বপ্ন ও দুর্বোধ্য মিস্টিক সত্তা, অন্যদিকে প্রায় অসুস্থ নৃশংসতা এবং পরিণামে তাঁর পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গতা—তুঘলক চরিত্রের এতগুলো স্তরকে প্রকাশ করার যোগ্যতা অন্তত মনোহর সিং দেখাতে পারেন নি। এবং অন্যান্য অনেকেরই অভিনয়, এমনকি বলা যায় সামূহিক অভিনয় যথাযথ ও স্তরীয় হওয়া সত্ত্বেও প্রধান চরিত্রাভিনেতার এই ব্যর্থতা নাটকটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ভালো অভিনয়ের জন্য বিশেষভাবেই নাম করা যায়: নাজীব চরিত্রে রাজেশ বিবেক,

সৎ মা-র চরিত্রে উত্তরা বাওকর এবং আজীজ (ব্রাহ্মণ বা ছদ্ম খলিফা)-এর চরিত্রে পঙ্কজ কাপুর।

নাটকটির আলোক-সম্পাতকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলেই মনে হয়। অনেক প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আলো ছিল অপ্রতুল।

পরবর্তী অভিনয় 'বেগম কা তাকিয়া'। একই স্থানে, একই রকম খোলা মঞ্চে। পণ্ডিত আনন্দ কুমার-এর উপন্যাস থেকে নাট্য-রূপান্তর করেন রঞ্জিৎ কাপুর। পরিচালকও তিনি।

নানা কারণেই এই নাটকটিই ছিল এ-উৎসবে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সমসাময়িক লোকজীবন ও গ্রামীণ সমাজকে দেখানো হয়েছে—যদিচ রূপকের আশ্রয়ে। রাজমিস্ত্রিদের জীবন ও আচরণের মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষকে নাটকে তুলে ধরার অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ন্যাশনাল স্কুল। ভাষাও খুব জীবন্ত—একেবারে আনুগড় সংলাপ—প্রধানত দিল্লি-হরিয়ানার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দেহাতী-উর্দু-আশ্রিত, মূলত মুসলিম সম্প্রদায় ব্যবহৃত ডায়লেক্ট।

প্রথমেই বিস্ময়কর লাগে এর মঞ্চ-সংস্থান। খোলা বড় মঞ্চকে ব্যবহারের চূড়ান্ত করা হয়েছে। মঞ্চকে প্রায় ৮টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—পাশাপাশি ও ওপর নীচে নানা স্তরে। এর উপযোগ যেমন কাজের হয়েছে, তেমনি দৃষ্টি-আকর্ষক। মিস্ত্রি পীর আলীর বাড়ি, পীরের তাকিয়া, চায়ের দোকান, তার ওপর দোতলায় ভাই মীর আলীর বাড়ি, পীর সাহেবের বাড়ি, ইত্যাদি সমস্ত মিলিয়ে যে জগৎ তৈরি হয়েছিল মঞ্চে, তা যেমন অন্তরঙ্গ, উপভোগ্য, তেমনি বাস্তব। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কলকাতার আকাশ, চাঁদ, তারা। গ্রামের এই আবহকে আরো বিশ্বাস্য করে তুলেছে এই সংযোজন। পেছন থেকে পেট্রোম্যাক্সসহ বরযাত্রী আসার দৃশ্যটি এই মঞ্চ-সংস্থানে চমকপ্রদ মনে হচ্ছিল।

সব মিলিয়ে খানিকটা মহাকাব্যিক বিস্তার, খানিকটা আর্কিটাইপাল থিমের যে আভাস আছে নাটকটিতে, তার যোগ্য এই মঞ্চ, সন্দেহ নেই। গল্পটা, আগেই বলা হয়েছে, কিছুটা রূপকাশ্রিত। রাজমিস্ত্রি পীর আলি সরল, সৎ ধার্মিক—ফকির দরিয়া শাহ্-এর নির্দেশে পীরের তাকিয়া বানাবে। বেকার মজুররা আধা মজুরিতে কাজে রাজি হল, অনেক তর্কবিতর্কের পর।

ভাই মীর আলী-ও রাজমিস্ত্রি—কিন্তু সে লোভী। তাকিয়ার জায়গা খুঁড়তে খুঁড়তে সে গুপ্তধন পেল, বড়লোক হল, নাচনেওয়ালী রওনক বেগমকে বিয়ে করে নিয়ে এল গাঁয়ে। সঙ্গে দুই সঙ্গী—তবলা ও হারমোনিয়ম বাদক। বিয়ে করার জন্য পীর আলী মীর আলীর টাকা নিল বটে, কিন্তু বিয়ের দিন রওনক বেগমের অপমান-সূচক আচরণে দুই ভাই আলাদা হল। রওনক বেগম চায় পীরের তাকিয়ার জায়গায় তৈরি হবে রওনাকাবাদ অট্টালিকা। ইমানদার পীর আলী তা হতে দেবে না। ফলে সংঘর্ষ, পীর আলী-র পুত্রকে হত্যা। জনতা প্রথমে ভুল বুঝলেও শেষ পর্যন্ত তাদের রোষে ও বিক্ষোভে রওগক ও তার দুষ্ট পার্শ্বচর-বাদকদের পালাতে হল। মীর আলীর শ্রমজীবীদের দলে যোগদান, রওনাকাবাদ ভাঙা, পীরের তাকিয়া গড়ে তোলা। ভালোমন্দ-র লড়াইয়ের মিলনান্তক সমাপ্তি।

চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন পীর আলীর ভূমিকায় কাশ্মীরী অভিনেতা কে কে রায়না এবং বিস্ময়কর অভিনয় রওনক-এর ভূমিকায় মহারাষ্ট্রী প্রখ্যাত অভিনেত্রী উত্তরা বাওকর-এর। উত্তরপ্রদেশের রাজেশ বিবেকও চমৎকার দরিয়া শাহ্-র ভূমিকায়। পীর আলী-র স্ত্রী আমিনা বেগমের চরিত্রটির অভিনয় বেশ কঠিন—তাতেও মর্মস্পর্শী ও বাস্তবধর্মী অভিনয় করেছেন মধু মালতী।

কোরাসের মাধ্যমে লোকসংগীতের ব্যবহার খুব ভালো লেগেছে। দর্শকদের বাঁ দিকে পেছনে কোরাসের অবস্থান ছিল।

সব মিলিয়ে নাটকটিতে একটা দেহাতী ভাব ছিল—ছিল মাটির গন্ধ। এ-কারণেই অন্তত নাটকটি মুগ্ধ করেছিল সবচেয়ে বেশি।

এই অবধি লিখেই এ-প্রসঙ্গ শেষ করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু ইণ্টারভ্যাল-এর পর রঞ্জিৎ কাপুর ডোবালেন। এরকম একটা চমৎকার প্রযোজনা তিনি ঝুলিয়ে দিলেন মাত্রাজ্ঞানের অভাবে। যে গানগুলি ছিল ইণ্টারভ্যালের আগে শ্রুতিসুখকর—পরে তারই প্রলম্বিত ব্যবহার ভার হয়ে উঠল। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও এখন গানগুলি নিরেশ। ভালো পরিচালক কব্জির জোরে যে চুস্ত্ ছিমছাম প্রযোজনা ঘটিয়ে তোলেন, সে জোর এই পরিচালকের ছিল না। ফলে দ্বিতীয়ার্ধে নাটকটি যেন তাঁর হাতের বাইরে চলে যায়—ফলে অকারণ পুনরাবৃত্তিবহুল দৈর্ঘ্যে প্রথমার্ধের বিস্ময়ের

রেশ উবে গিয়ে ক্লান্তি বোধ হতে থাকে। রঞ্জিৎ কাপুর এরকম একটা সম্ভাবনাকে নষ্ট করলেন দেখে মন বেদনায় ভরে যায়।

পরের নাটক 'আধে আধুরে'। স্থান: বিত্তামন্দির। হিন্দি নাট্য আন্দোলনে প্রথম আধুনিক নাটক হিসেবে এর একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। মোহন রাকেশকেই প্রথম হিন্দি আধুনিক নাট্যকার বলা চলে, এবং তাঁর এটাই প্রথম স্বীকৃত আধুনিক নাটক। এর বহু প্রযোজনা হয়েছে, প্রধানত কলকাতা দিল্লি বোম্বাই, হিন্দি নাটকের এই তিনটি মূল কেন্দ্রে। প্রশংসিত প্রযোজকদের মধ্যে আছেন: ওম শিবপুরী পরিচালিত দিল্লি-র 'দিশান্তর', সত্যদেব দুবে পরিচালিত বোম্বাই-এর 'থিয়েটর ইউনিট' এবং শ্যামানন্দ জালান পরিচালিত কলকাতার 'অনামিকা'। অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে মোহন রাকেশ-এর বিখ্যাত এই নাটক।

ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা-র রেপ্যার্‌টরি গ্রুপ নাটকটিকে ঢেলে সাজিয়েছেন। পরিচালক এখানে আলাকাজি-র মেয়ে আমাল্ আল্লানা। নবীকরণের ব্যাপারে যেটা প্রধান ব্যাপার তা হল, দর্শকদের বাঁ দিকে কালো পোশাক পরিহিত একদল গায়ক-গায়িকা বাদক-বাদিকাকে কোরাস রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। তারা কণ্ঠস্বর যন্ত্রসংগীত আবৃত্তি গান ও কখনো নিছক সংলাপ-এর সাহায্যে নাটককে ব্যাখ্যার দায়িত্ব নিয়েছে। ন্যাশনাল স্কুলের প্রয়োগের এটাই নতুন বৈশিষ্ট্য।

থিম বোঝাতে সুরের, আবৃত্তির বা যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার কিছুটা অভিনব, চমকপ্রদ—হয়তো কোথাও কোথাও নতুন ব্যাখার সীমারেখা ছোঁয়েও কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সুষম হয় না। বরঞ্চ অনেক টেনশনের মুহূর্ত যা হয়তো তৈরি হতে যাচ্ছিল তাকে নষ্ট করে দেয়।

আগের সমস্ত অভিনয়ই ছিল মূলত ন্যাচারালিস্টিক। নাটকের মেজাজের সঙ্গে তার মিলও ছিল। ন্যাশনাল স্কুলের এই নতুন ভাবে উপস্থাপনার চিন্তা নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ, কিন্তু নাটকের মেজাজের সঙ্গে তা খাপ খায় কিনা তাও তো দেখা দরকার। এখানেই মূল গণ্ডগোল—ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার অত্যাধুনিক প্রয়োগকুশলতা এবং নাটকের মর্মবস্তুর মধ্যকার বিসংগতি। অর্থাৎ এক কথায়, এর টেকনিক্ নাটকের মনোস্থিতি বা মুড্-এর অনুকূল নয়। এর একটা বড় উদাহরণ, সংলাপের উজ্জ্বল মুহূর্তে সুরের ডিসকর্ড প্রয়োগ বড়ই

আরোপিত ও বেমানান ঠেকেছে। মনে হয় অনাবশ্যক গায়ে-পড়া ব্যাখ্যা দেওয়াতে তাঁরা বড় বেশি উৎসাহী।

অথচ নাটকটির নিজস্ব শক্তিই রয়েছে তার থিমে ও সংলাপে। তার প্রতি মনোযোগই ছিল বাঞ্ছিত। সাবিত্রী নামক এক নারীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। সাবিত্রী তার মধ্যবিত্ত জীবন, তার নৈরাশ্যজনক তিক্ত পরিবেশ, স্বামী ও বিভিন্ন সম্পর্কের নানা পুরুষ এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিধ্বস্ত ও দিশেহারা। অথচ সে কিন্তু বেরিয়ে আসতে চায় মধ্যবিত্ত জীবনের এই গণ্ডীর বাইরে—জীবনের সম্পূর্ণতা চায়—অন্য জীবনের আস্বাদ চায়। কিন্তু তার চাওয়ারও একটা সঠিক রূপ গড়ে ওঠে না। ফলে তার ওপর স্নায়বিক জটিলতার চাপ ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। পরিণামে ব্যর্থতা মেনে সে তার ঐ সংকীর্ণ গণ্ডীতেই ফিরে আসে। আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের এই ট্র্যাজিক আলেখ্য বিষয়-মহিমাতেই প্রচণ্ড। তার উপর এই সব অহেতুক আরোপ বড়ই বিরক্তিকর ঠেকে। একেই বোধহয় ফর্মালিজ্‌ম্ বলে। এন্‌-এস্‌-ডি-র প্রযোজনা এই দোষেই দুষ্ট।

তবে প্রসেনিয়ম থিয়েটরের মঞ্চসজ্জাতেও তাঁরা বেশ দড়। ব্রাউন কাগজ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে নোনা-ধরা দেওয়াল। নাটক শুরু হওয়া মাত্র তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাঙনের জীর্ণতার চেহারা দর্শকের মনে ছাপ রেখে যায়—এ নাটকের যেটা বিষয়বস্তু।

চারটি পুরুষ চরিত্র (সাবিত্রী-র স্বামী মহেন্দ্রনাথ, বস্‌ সিংঘানিয়া, প্রাক্তন প্রেমিক জগমোহন ও স্বামীর বন্ধু জুনেজা) এ-নাটকে একজনকেই করতে হয়। কেননা সাবিত্রী-র জীবনে তার একেরই প্রক্ষেপ। প্রবীণ অভিনেতা মনোহর সিং কিন্তু এই চারটি চরিত্রের আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব, আলাদা আলাদা ম্যানারিজ্‌মকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি (যা কিনা অন্যান্য অভিনয়ে হয়েছে বলে শোনা যায়)। এমনকি কণ্ঠস্বরেরও প্রায় কোনো পার্থক্য ছিল না। সিগারেট খাওয়া বা না-খাওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে চরিত্রের তফাৎ বোঝাতে হয়েছে। সিংঘানিয়া চরিত্রটির রূপায়ন ছাড়া অন্যত্র তিনি ব্যর্থ। ঠিক তেমনি সাবিত্রী চরিত্রে সুরেখা সিকরি চরিত্রের দুটি মাত্রা-র মধ্যে একটি মাত্রাকে ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। সাবিত্রীর সংবেদনশীল স্বপ্নলীন সত্তাটি তো ফোটেই নি, এমনকি চরিত্রের মধ্যে যে চাপা উত্তেজনার দিকটি আছে, তাকেও যেন তিনি ওপর-ওপর দেখেছেন। ফলে সে দিক থেকেও তাঁর রূপায়ণে চরিত্রটি হয়েছে রাগী, খিটখিটে, এই মাত্র। বড় মেয়ের

চরিত্রে উত্তরা বাওকর এখানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। হুড়মুড় করে সংলাপ আওড়েই গেছেন, চরিত্রটি ধরতে পারেন নি। ছোট মেয়ে ও ছেলের চরিত্রে অনিতা সিং ও কে. কে. রায়নাও কোনো ছাপ রাখেন নি।

তবে আমার দেখা নাটক কটির মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল 'মুখ্যমন্ত্রী'। এটাও বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চাণক্য সেনের বাংলা উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে এই হিন্দি নাটকটি রচিত। সমসাময়িক রাজনীতির ক্লেদ ও মোহভঙ্গকে প্রকাশ করাই ছিল এই প্রযোজনার উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রীর জীবনের সংকট, পার্টির অন্তর্কলহ, স্বজন ও সমর্থক পোষণ ইত্যাদি এর বিষয়।

বর্তমান আলোচক যেদিন এই নাটকটি দেখেন, সেটি অভিনয়ের দ্বিতীয় দিন। এন্‌-এস্‌-ডি-র দুটি পৃথক দল দু-দিন নাটকটিতে অংশ নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয় দল। শোনা গেছে, প্রথম দিনের প্রথম দলই নাকি অধিকতর শক্তিশালী।

সংলাপ, অভিনয়, নির্দেশনা সবই এ নাটকের নিচুমান। কোনো কোনো চরিত্র পার্ট পর্যন্ত ভুলে গেছিল। মূল চরিত্রের অভিনেতা মহারাষ্ট্রী বসন্ত যোসালকার-এর হিন্দি উচ্চারণেও ছিল কিছু কিছু ত্রুটি।

অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এমনকি এই নাটকেও প্রয়োগের দিকটা ছিল উন্নত। মঞ্চ, আলো, সংগীত ইত্যাদি সব কিছুই প্রায় সমানই নিখুঁত। অর্থাৎ বোঝা যায় ন্যাশনাল স্কুলের কাছে থিয়েটরের প্রয়োগের দিকটিই মুখ্য। বিষয়বস্তুর সমকালীনতার দিকে বাহ্যত দৃষ্টি দিলেও প্রকৃত-অর্থে তার গুরুত্ব তাঁদের কাছে নেই। নচেৎ সমসাময়িক রাজনীতিকে প্রকাশ করতে এরকম একটা শিশুসুলভ বিষয়কে তাঁরা বাছবেন কেন? আরেকটু বেশি সাহিত্যরুচি কি প্রত্যাশা করা যায় না? এই নাটকটিরও প্রযোজক ছিলেন রঞ্জিৎ কাপুর।

বর্তমান আলোচক পঞ্চম ও শেষ নাটক 'সন্ধ্যা ছায়া' দেখে উঠতে পারেন নি। সেটি হয়েছিল বিদ্যামন্দিরে, ১৯ ফেব্রুয়ারি।

একটাই কথা শুধু ভাবি, ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা অনেক সরকারী আনুকূল্য পাচ্ছেন, সুযোগ পাচ্ছেন অনেক অর্থব্যয়ের। সবটাই যে বিফলে যাচ্ছে তা

হয়তো নয়। তাঁরা প্রায় সব নাটকেই একটা প্রয়োগগত দক্ষতা আনতে পেরেছেন ঠিকই। কিন্তু কি জন্য? এই কি সব?

আমাদের দেশের গ্রুপ থিয়েটরগুলি অনেক লড়াই অনিশ্চয়তা ও দারিদ্র্যের মধ্যেও প্রযোজনার যে পরিচ্ছন্নতা ও উদ্দেশ্যমূলকতা আনতে পেরেছেন, তা কি এঁদের প্রযোজনায় পাওয়া যাচ্ছে?

তা ছাড়া, হিন্দি থিয়েটরের জগতে রুচি প্রতিষ্ঠাই যেখানে বড় সমস্যা, সেখানে এই দরিদ্র দেশে এত খরচ করে এত উপকরণের ওপর জোর দিয়ে তাক্ লাগানোই বড় কথা, না কি সামান্য উপকরণে শাদাসিধে দৃশ্যসজ্জায় আরো বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছনো, আরো বেশি দর্শককে তৈরি করাই বেশি জরুরি? এই সব প্রশ্ন মনে আসে এন্-এস্-ডি র উৎসবে যোগ দিয়ে।

উষা গঙ্গোপাধ্যায়

কাগজের বৌ—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স। দাম দশ টাকা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'কাগজের বৌ' ১৩৮৩ সালে লেখা।

'কাগজের বৌ' উপন্যাসের কাহিনী অভিনব। কাহিনীর অভিনবত্বে অনেক পাঠক মুগ্ধ হয়েছেন, জিজ্ঞাসা করে জেনেছি। সুবিনয় তার শ্যালিকা প্রীতিকে বিয়ে করবে বলে স্ত্রী ক্ষণার সঙ্গে ডাইভোর্স চেয়েছে এবং একটি ক্লিন-ডাইভোর্স পাওয়ার জন্য বন্ধু ও আশ্রিত উপলকে টাকা দিয়ে নিয়োগ করেছে স্ত্রী ক্ষণার সঙ্গে প্রেম করতে—অ্যাডাল্‌ট্রির প্রমাণ রাখার জন্য। সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে টেপ-রেকর্ডার ও সেলফ স্টার্টার ক্যামেরা। ব্যাপারটায় কল্পনা-শক্তি সপ্রমাণ এবং এ-জটিল প্লটেই অনেক পাঠকই মজেছেন। উপন্যাসটার উপরিতলের ঘটনাটুকুতেই যে অনেকে মজেছেন সেটা হয়ত আমাদের ইদানীংকার উপন্যাস পাঠকের রগ্‌রগে আঁতা গার্দ কাহিনীতে অভ্যাসই দায়ী কিংবা শীর্ষেন্দুবাবুই হয়ত সচেতন ভাবে হোক বা অসতর্কতায় কিংবা সেই অভ্যাসের সুযোগ নিতে চেয়ে অভিনব ঘটনা নির্মাণের ডিটেলে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। ঘটনার বাস্তবতার অস্বীকার যদি বাস্তবের কোনো স্তর আবিষ্কারের সহায়ক হয় তাতে আপত্তি ওঠে না, কিন্তু চমৎকারিত্ব যদি চমৎকারিত্বেই সীমাবদ্ধ থাকে, যদি তা উপন্যাসের মূল বার্তা পৌছে দেওয়ার পরিপন্থী হয়ে ওঠে তাহলে ভাবতে হয়। প্রসঙ্গটায় পরে মনোযোগ দেওয়া যাবে।

'কাগজের বৌ' উপন্যাসের নায়ক উপলচন্দ্র একজন ক্ষুধার্ত মানুষ। উপন্যাসটা সেই মানুষটিকে ব্যবহারের কাহিনী। লোকটা এখন খিদে ছাড়া কিছু বুঝতে চায় না প্রেম-ভালোবাসা হৃদয়ের সমস্যা তার কাছে এখন অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তর। একসময় সে ছবি আঁকত, গান করত, অভিনয়েও পটুত্ব ছিল। কিন্তু সে সব সূক্ষ্মবোধবুদ্ধি কাজে লাগে নি,

এ সমাজে সে ব্যর্থ। ক্ষিদের সমস্যাটাই সে সমাধান করতে পারে নি। এখনো পেট ভরলে তার সে সবের কথা মনে উদয় হয়, কিন্তু সেরকম ঘটে কদাচিৎ। ক্ষিদের সমস্যার সমাধান করতে চেয়ে সে-অবশ্য এই সমাজ ব্যবস্থায় গুছিয়ে থাকা মানুষদের সঙ্গে অভিযোজনে, সমঝোতায় সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঝামেলা বেধে গেছে। এই সমাজব্যবস্থায় আপাতদৃষ্টিতে সুখীজনদের ভেতরের তালিতাপ্পিতে জড়িয়ে গেছে বা সেই-সব ব্যবস্থার ভেতরের স্ববিরোধ ঐ ক্ষুধার্ত মানুষটাকে ব্যবহার করতে চেয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উপলচন্দ্র ব্যর্থ হয়েছে। যে-চাতুরী এই ব্যবস্থায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সেটা উপলচন্দ্রের ছিল না বা সেইসব ব্যবস্থা আপনিই ভাঙত, উপলচন্দ্র উপলক্ষ হয়েছে মাত্র। যে-সমাজব্যবস্থা প্রেম, ভালবাসা, অশ্রুজল, এ সবকিছুকেই পণ্যে পরিণত করে সেখানে পয়সা খুঁজে ব্যর্থ এই ক্ষুধার্ত মানুষটা উপন্যাসের প্রারম্ভেই এঁটোকাটা খেয়ে তৃপ্ত একটা ছুঁচোর সঙ্গে আত্ম-সনাক্তীকরণ করেছে। সেই ছুঁচোটাকে মারতে ছিমছাম সংসারে আপাত-তৃপ্ত ক্ষণা বিষ আনতে বলে, ছুঁচো-ইঁদুর-মারা বিষ আবিষ্কার করে সুবিনয় নোবেল প্রাইজ পাওয়ার স্বপ্ন দেখে, ক্ষণা উপলকেও তাড়াতে চায়। কেননা সুখের এই সাজানো সংসারে ছুঁচো ও উপলচন্দ্র বিরক্তিকর। কিন্তু আসলে তো সুখের নয়, এই ছিমছাম আয়োজনের ভেতরে 'আসলে লাফায় বুড়ো ব্যাঙ্'। তাই চাপা দেওয়া ঘা যখন পচে, তখন উপলচন্দ্রকে দরকার হয়। কারণ তার ক্ষিদে আছে, পয়সা নেই, তাকে ব্যবহার করা যায়।

তাই উপলচন্দ্র ব্যবহৃত হয়েছে, সুবিনয় করেছে, বিরোধী পক্ষ প্রীতির চকচকে প্রেমিকও করেছে। এই ব্যবস্থার বিভিন্ন বিন্যাসে যখন সংঘাত বাঁধে, ব্যবহৃত হয় ক্ষুধার্ত মানুষ উপলচন্দ্র। তার সঙ্গে প্রীতির বিয়ে দেওয়া হয় রেজিস্ট্রি করে, সুবিনয়কে পরাস্ত করতে। কিন্তু সে-পরিণয় সীমাবদ্ধ কাগজে-কলমে, সে বউ শুধু কাগুজে বউ, পেপার ওয়াইফ— একটা ধাপ্পা—একটা সূক্ষ্ম কৌশল, পয়সার বিনিময়ে। মানবিক সম্পর্কের দাবি নেই, অধিকার নেই। ন্যায্য স্বাভাবিক সে-অধিকার অর্জন করতে উপল যখন ব্যগ্র তখন সে বাধা পায়, পেয়ে তাজ্জব বনে যায়। প্রাপ্ত টাকাগুলো উড়িয়ে দেয় রাস্তায়। চলে যায় গ্রামে। কোনোদিন বৌ-এর কাছে যাবে, যেতে পারবে পৌছে, প্রত্যাশায় থাকে। তাই, 'কাগজের বউ' উপন্যাসের বিষয় এই সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত চাতুর্যে ও মূলধনে বঞ্চিত

একটা মানুষের অভিযোজনে ব্যর্থতায় এবং একই সঙ্গে সেই ব্যবস্থা কর্তৃক সেই ব্যর্থ মানুষটার ব্যবহার। উপন্যাসটায় উপলচন্দ্র যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানেই ফিরে আসে বলে মনে হয়। আসলে সেটা সত্য নয়। এ পৃথিবীতে তো সব কিছু সম্পর্কে বলতে হয় যে তারা 'আছে' নয়, 'হচ্ছে'। চরিত্রগুলোর এই হওয়াটার বৃত্তান্ত কতদূর, তার সন্ধান নিলে দেখা যায় উপলচন্দ্র বদলেছে, সঙ্গে সঙ্গে আরো কাউকে সে বদলেছে, সাময়িকভাবেই হয়ত। উপলচন্দ্র যে নিষ্ক্রিয় জড়ভরত ক্ষিদেসর্বস্ব অপমান-জ্ঞানহীন চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেই-ই শেষ দিকে কেতকীকে গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে মহৎ হতে চায় 'একটু মহৎ হতে ইচ্ছে করল। অনেক কাল মহৎ হই নি।" ক্ষণাকে অ্যাডলট্রিতে প্রমাণসহ জড়িয়ে দারিদ্র্যের মুক্তিপণ অনেক টাকা পেয়েও সে বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অস্বস্তিবোধ করে। ছুঁচোটাকে বিষমাখানো আটার গুলি খাওয়া থেকে নিরস্ত করে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলে 'আমিও কি নই তোমাদের মতো? সব কিছু খেতে নেই। আমারও চারধারে কত বিষমাখানো খাবার ছড়িয়ে রেখেছে কে যেন। মাঝে মাঝে খেয়ে ফেলি। বড় জ্বালা।' উপলচন্দ্র তো প্রথমে বলেছিল তার নৈতিকতার বালাই নেই। শুধু ক্ষিদে আছে। কিন্তু প্রীতির সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে দেখে আনন্দে কেঁদে ফেলে। বিয়েটা কাগজে জানার পর বৌ-এর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে উপলচন্দ্র গর্জন করে। শেষে কেতকী তার জন্য কেঁদেছিল কিনা জানতে চায়।

উপলচন্দ্র এই সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অভিযোজনে ব্যর্থ হয়। ব্যবহৃত-ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হয় মাত্র। ফলে তার খিদেটা থেকে যায়। যে পয়সার বিনিময়ে তার মানবিক মূল্যবোধগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল—সে সব সে অন্যের উপকারার্থে দিয়ে এসেছে বা স্বপ্নে দেখা মানুষের মতো রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে। যে পয়সা তার বাবা খুঁজতেন, পান নি, সেও খুঁজত পেত না, যেভাবে পাওয়া গেল, সেটা তাকে বাস্তবতার অন্য স্তরে নিয়ে যায়। সে টাকা ছড়িয়ে দিয়ে কলকাতার বুকে অতিবাস্তব কাণ্ড ঘটিয়ে দেয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে চলে যায় অচেনা ছাড়া পাওয়া খুনী কয়েদি মানুষটার সঙ্গে খেটে খেতে। ভাবে 'এই মাটি চলে গেছে বরাবর সব মানুষের পায়ের নিচ দিয়ে। যোগ রেখেছে সকলের সঙ্গে সকলের। ভাবতে বড় ভাল লাগে।' এবং শেষ পর্যন্ত তার ক্ষিদেটা থেকে যায়।

এখন তার ক্ষুধার্ত আইডেন্টিটি খুঁজে পায় শুধু ছুঁচোয় নয়, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, মানুষেও। কিন্তু শুধু খিদে! দর্শন বিজ্ঞান প্রেমভালোবাসাহীন ক্ষিদে? তাহলে উপলচন্দ্র বদলায় নি? আমরা যখন ভাবছিলাম সে এগিয়েছে, সে শুধু আবর্তন করেছিল মাত্র? তাহলে কেন সব মানুষের সাযুজ্যে তার ভালো লাগে? সমাজব্যবস্থার নিষ্ঠুরতা যদি তাকে পুনরায় গভীরভাবে প্রোথিত করে দিল যেখানে ছিল সেখানেই আবার?

কিংবা ক্ষণা কিংবা সুবিনয় তারাও তো বদলায়। ক্ষণা ভালবাসার আস্বাদে ঘৃণা ভুলে যায়। সুবিনয় কি অধিকারবোধ থেকে ক্ষেপে যায় উপলের প্রতি ক্ষণার ভালবাসার সংবাদে নাকি তার ভালবাসা জেগে ওঠে?

শেষে সংবাদ মেলে সবাই আবার জুড়ে গেছে। উপলচন্দ্র ছাড়া। এই ছোট মানুষ উপল ব্যবহৃত হয়েছে বটে, কিন্তু প্রতিবাদ করেছে, শেষ পর্যন্ত আমাদের সহানুভূতি তৈরি করেছে, সুবিনয়দের প্রতি ঘেন্নাও।

সমস্ত উপন্যাসটা উপলচন্দ্রের আত্মকথন। কিন্তু উপলচন্দ্র যেহেতু ক্ষিদে আর পয়সা আর আশ্রয় জোটানয় ব্যস্ত তাই জটিল আবর্তময় চৈতন্যের স্রোত উপন্যাসে নেই। বরং বহির্ঘটনার নাটকীয় বর্ণনাই উপন্যাসটাকে ক্ষিপ্রগতি দিয়েছে। খুব চোখা, মাজা ঘষা মিসচিফ্ ছড়িয়ে আছে। কানা মাসির চরিত্রটা পজিটিভ বলেই—এ সবের থেকে আলাদা।

সুবিনয়ের কাছ থেকে ক্ষণাকে অ্যাডালট্রিতে জড়িয়ে ফেলার কাজের দায়িত্ব পাবার পর থেকেই উপলচন্দ্রের বিবেকবাবার আবির্ভাব। তার সঙ্গে উপলের সংলাপে মনের খবর মিলতে থাকে। ঘটনাটা উপলের মানসিক গতির মোড় ফেরায়। ক্ষণাকেও বদলে দেয় কিছু সময়ের জন্য। সে-কারণেই কি ঔপন্যাসিক সে-ঘটনার এত ডিটেলে যান? কিন্তু আগেই বলেছি অনেক পাঠকই ঘটনাটার অভিনবত্বে, প্রায়-বিদেশী চমৎকারিত্বে উপন্যাসের মূল বার্তার খেই হারিয়েছেন। ক্ষণাকে উপলচন্দ্র যে-চাতুর্য ও সুযোগসন্ধানী ক্ষিপ্রতায় পটিয়ে ফেলে সেটা কি তার চরিত্রের লজিকেও স্বাভাবিক? এতকাল না পেরে অকস্মাৎ এখন কি করে হল সে এমন? ক্ষণার ভেতরেই অভাববোধ ছিল যদি, সে যদি নিমিত্তই, সুবিনয় ক্ষণার দাম্পত্যজীবন যদি ভেতরে ভেতরে ফোঁপরাই ছিল, তবে কেন এত চাতুর্যের ডিটেল? উদ্দেশ্য?

ট্রেনে ডাকাতির বর্ণনাও মনে হয়েছে খুচরো ঔজ্জ্বল্য দেখাতে দিশেহারা। অস্বাভাবিক বুড়োবুড়ির কথাবার্তা অথচ সে-অবাস্তবতা শিল্পের বা উপন্যাসের বক্তব্যের কোনো উদ্দেশ্যই পুরণ করে না।

এবম্বিধ বিষয়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অবহিত হোন, আমরা চাই।

আশীষ মজুমদার

শূন্যস্থান—মণীন্দ্র ঘটক। সংহিতা সাহিত্য প্রকাশনী, কলকাতা-৫৩। দাম সাতটাকা।

বাংলা উপন্যাসের জগতে মণীন্দ্র ঘটক একটি নতুন নাম। নতুন হলেও প্রতিশ্রুতিতে ভরা। খুব সম্ভব 'শূন্যস্থান' তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। এই দ্বিতীয় উপন্যাসে তিনি অনেকখানি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। 'শূন্যস্থান' উপন্যাসটিতে মণীন্দ্র ঘটক এক বিচ্ছিন্নতাকামীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই বিচ্ছিন্নতাকামী হলেন এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গুরুপদ ভট্টাচার্য। ১০৪ পাতার এই উপন্যাসটিতে গুরুপদর বিচ্ছিন্নতাবোধ পাঠককে কৌতূহলী করে। ব্যাপারটা যে-কোনো লেখকের পক্ষে শ্লাঘার।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে একটি স্বপ্নের আদালতের দৃশ্যের অবতারণার মাধ্যমে। কাকভোরে উঠে গুরুপদ কোথায় যেন চলে গেছে। দরজা হাট করে খোলা। সেই দরজা খোলা ঘরের বিছানায় শুয়ে গুরুপদর স্ত্রী শোভারাণী স্বপ্নের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমার অভিযোগ, আসামী আমার স্বামী…,আমাকে সর্বস্বান্ত করিয়া আমার স্বাভাবিক জীবনের যাবতীয় সম্ভাবনাকে বিধ্বস্ত করিয়া…।'

এ শুধু স্বপ্ন। কিন্তু অলস নয় এ স্বপ্ন। বড় নিষ্ঠুর বাস্তব এই সংসার—তার দায় ও দায়িত্ব। শোভা মনে করে, এই দায় ও দায়িত্ব সম্পর্কে গুরুপদ উদাসীন। শোভার কাছে গুরুপদ খেয়ালী। কিন্তু গুরুপদর কাছে শোভা বড় বেশি স্বার্থপর, বড় বেশি সাংসারিক। গুরুপদ পছন্দ করেন এই সাংসারিকতা। তাই সে দূরে থাকতে চায় সংসার থেকে লোকজন ও কোলাহল থেকে। সে বিচ্ছিন্ন মানসিকতায় পুষ্ট। এই পুষ্টি যোগায় তাকে সংসার বৈরাগ্য। গুরুপদ এই বৈরাগ্যে অস্থির ও চঞ্চল। অর্থ, কীর্তি, সচ্ছলতা, প্রেম—কোনো কিছুই তাকে ঘরের দেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখতে পারে

না। মণীন্দ্র ঘটক এই চঞ্চলহৃদয় মানুষের ছবি আঁকতে চেয়েছেন 'শূন্যস্থান' উপন্যাসে। গুরুপদ সেই উদ্দিষ্ট মানুষ। এই মানুষের কথায় ভরা বলে উপন্যাসখানির নামকরণও সার্থক।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় নানা দিক থেকে। প্রথমত বিচ্ছিন্নতাবাদের সংজ্ঞা এতখানি সহজ ও সাবলীল নয়। সংসার বৈরাগ্য ও বিচ্ছিন্নতাবাদ—এক কথা কিনা, লেখক তাঁর উপন্যাসে তারও সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলা যায়। এমন কি কোনো বিপন্ন বিস্ময়ের বোধ গুরুপদর হৃদয়ের মধ্যে কাজ করছিল কিনা আমরা তার খবর পাই নি। সেই দিক থেকে উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রকাশ-দুর্বলতা পাঠককে এই উপন্যাসপাঠে অসহিষ্ণু করে তুললে কিছু করার নেই। আর একটি কথা। আমরা উপন্যাসটির ভাষাপ্রয়োগের কথাই বলতে চাইছি। লেখক যে চরিত্রকে বিচ্ছিন্ন, বিরাগী ও বিমর্ষ করে আঁকতে চেয়েছেন, তা যে যান্ত্রিক ও কৃত্রিম হয়ে উঠেছে, তার একমাত্র কারণ যে ভাষাপ্রয়োগে লেখকের অদক্ষতা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ আশ্চর্য লেখকের পরবর্তী উপন্যাস প্রকাশের অপেক্ষায়। উপন্যাস রচনায় অন্যান্য প্রধান উপাদানের মধ্যে অন্যতম হল ভাষা। সেই ভাষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব যথেষ্ট পীড়াদায়ক। লেখক সেই অভাববোধ কাটিয়ে উঠবেন তাঁর পরবর্তী গ্রন্থে।

জগন্নাথ ঘোষ

কবিতা

শুধু রাতের শব্দ নয়। অরুণ মিত্র। নবপত্র প্রকাশন। দাম : পাঁচ টাকা।

'উৎসের দিকে' চলা ছিল আজ থেকে অনেক অনেকদিন আগে। তখন তাঁর বলবার ছিল :

আমি জনতার মধ্যে শিশুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছি
আমি কোলাহলের খরজে আমাকে বেঁধে নিয়েছি
এই তো নিঃশ্বাস নেওয়ার মত উচ্চারণ করেছি মানুষ
আমি তোমার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে পেরেছি
তুমি প্রসন্ন হও।

('আর এক আরম্ভের জন্য', 'উৎসের দিকে')

তখন সহজ ছিল এ-রকম অনুভব :

এখন তো ধান তুলবার সময়
স্বপ্নগুলোকে স্তবকে স্তবকে ফুটিয়ে তুলবার
পাথরের চিকণ রঙ
এখনই ফেটে পড়তে পারে

('ভরা পৌঁছোয় না', 'উৎসের দিকে')

তারপর অনেকগুলো দিন অনেকগুলো রাত কেটে গেছে। 'উৎসের দিকে'র পর 'ঘনিষ্ঠ তাপ', তারপর 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' আর শেষে, উনিশশো আটাত্তরে 'শুধু রাতের শব্দ নয়'। এর মধ্যে কত বদল হয়ে গেছে তাঁর চারপাশটায়। 'উৎসের দিকে'তে যে বিরুদ্ধতার অস্বস্তি আর তাকে জয় করবার নাছোড় আবেগ ছিল অনেকটা নিশ্চিতির বিশ্বাসে তা অনেকটা ছড়ে গেল পরের দিনগুলোতে। কয়েক বছর পেরোতে না পেরোতেই :

আমার সামনে
সমস্ত মেয়ে পুরুষের মেলায় মেলবার পথ
প্রত্যেক প্রত্যুষে আর গোধূলিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে

('একই তৃষ্ণায়', 'ঘনিষ্ঠ তাপ')

তারপরে সেই উনিশশো সত্তরের 'বেনামা সময়ে' তাঁর প্রিয় আন্দোলন আর বিশ্বাসের ছবিগুলোর অনেক চেহারা যখন এক বিপন্ন অথচ স্পষ্ট আলোয় দেখা গেল তখন যদিও তাঁর জানা হয়ে গেছে "আমার ভাবনা হয় আমি কি ভাবে আবার নিজেকে মানিয়ে নেব। যে কয়টা স্থির বিন্দু ছিল ছাড়িয়ে এসেছি" ('পোল পার হওয়ার সময়', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে'), বোঝা হয়ে গেছে 'আমার মুখে ছাই-এর আস্বাদ' ('কথা এখনো ফোটেনি', ঐ) তবুও যে স্বস্তি বা প্রশান্তি তাঁর সমস্ত কবিতার অনবদ্য সম্পদ তা তাঁকে ভুলতে দেয় নি :

"একগাদা ছেলেমেয়ে আদুড় গায়ে ধুলো মেখে তাদের মিতালিকে কেবলই জিজ্ঞাসায় তুলে ধরে। তারা জানে না, ছোট উৎস থেকে বেরিয়ে ভালোবাসা পৃথিবীর চওড়া মোহানায় বিস্তৃত হয়েছে।"

('ন্যাতাপড়া ছেলেমেয়ে', 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে')

এই সম্পদের সম্পন্নতাই আটাত্তরে পৌঁছে, সময় যখন আরও অনেক জটিল, যখন চেনামুখগুলোয় আরও অনেক বদল, যখন তাঁর বয়স তাঁকে অনেক তেতো আর কড়া অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পৌঁছে দিয়েছে প্রায় সত্তর বছরের

উঠোনে তখনও এক আশ্চর্য দীপ্তির বোধে অরুণ মিত্র তাঁর নূতন কাব্যগ্রন্থের নাম রাখেন 'শুধু রাতের শব্দ নয়'। চারিদিকে রাতের শব্দ, আমরা জেনে গেছি। জেনে গেছি 'কোটর ছেড়ে একে একে প্যাচারা গভীর শহরে ওড়ে' ('গভীর শহরে', 'শুধু রাতের শব্দ নয়')। তবু বিপরীত এক মহৎ জানার জন্য আমাদের বড় কবির কাছে যেতে হয়। তাঁর মমতাময় গভীর উচ্চারণের কাছে কান পাতলে শোনা যায় 'শুধু কি রাতের শব্দ? আমি নিশ্চিত শুনি ভোরবেলার যাত্রার আয়োজন আমার শেষ সমুদ্রে" ("শুধু রাতের শব্দ নয়)।

তাই, প্রায় সত্তরে পৌঁছেও যখন তাঁর চেয়ে ঢের অনুজ কবির কণ্ঠস্বর হতাশ্বাস প্রাজ্ঞতায় ভারি হয়ে আসে, তখনও তিনি দিব্য খুশিতে হেসে বলতে পারেন যে বার্ধক্য তাঁকে ছোঁয় নি। অতি তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমাতে পারেন এমন কি ময়দানের ঘাসেও। আর এ ব্যাপারটার ব্যাখ্যা পেতে শুধু তাঁর দার্শনিক বিশ্বাসের দিকে যান্ত্রিকভাবে আঙুল তুললেই চলবে না। কারণ, ঐ একই দার্শনিক বিশ্বাসের অংশীদার অনেককে আমরা বুড়ো হতে দেখেছি। হয়তো বক্তব্য নয়, মেজাজের প্রাজ্ঞতায়।

বরং এখানে পৌঁছেও অরুণ মিত্র যেমন তাজা ভঙ্গিতে কথা বলেন তাতে খুব কম খবর রাখেন এমন পাঠকের মনে হয়েও যেতে পারে যে, তিনি একজন তরুণ কবি।

আসলে চিরদিনই দর্শন-সমাজ-ইতিহাসের প্রশ্নগুলো অরুণ মিত্র লুকিয়ে রাখেন আড়ালে। আড়াল থেকে তারা হয়তো তাঁর কবিতাকে নিয়ন্ত্রিত করে—অস্তিত্বকে। কিন্তু তাঁর প্রায় সমসাময়িক কালের অন্যান্য কবির কবিতায় নানা ইণ্টেলেকচুয়াল প্রশ্ন যেমন সোজাসুজি আলোচিত হয়, তাঁর কবিতায় তেমন হয় না। বাস্তবের সমগ্রতাকে তিনি কখনো রূপক বা প্রতীক বা পুরাণপ্রতিমার মধ্যে ধরবার চেষ্টা করেন না। বা বিভিন্ন প্রসঙ্গের প্রায় নৈয়ায়িক অবতারণাও কবিতায় তাঁর অভিপ্রেত নয়। এমনকি তাঁর কবিতার গড়নে প্রথাসিদ্ধ আঙ্গিক, ছন্দ বা সাংগীতিক গড়নের আলোচনাও অনাবশ্যক।

এই বৈশিষ্ট্যই অরুণ মিত্রকে চিহ্নিত করে দেয়। যেন একজন মানুষ গাঢ় কণ্ঠে অনেক ভালোবাসা নিয়ে গল্প শোনাচ্ছেন। নিজের গল্প, চারপাশের মানুষজনের গল্প, কলকাতার গল্প, অনেকভাবে অনেক পাওয়া অভিজ্ঞতার গল্প। সেসব শুনতে শুনতে তাঁর নিজের মুখের আদল যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর চারপাশের জীবনটা—সে জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর

ভালোবাসা, ভয়, উদ্বেগ সমস্ত। এই বলার ভঙ্গির ভেতর কোথাও ভার নেই। যেন নেহাতই ব্যক্তিগত গল্প, আটপৌরে ভাষায়। সমাসোক্তির বৈভব সে ভাষার কোনো কিছুতেই জড় হয়ে থাকতে দেয় না। যেন তাঁর ভালোবাসাই প্রত্যক্ষ। আমাদের রোজকার চারপাশের জগতে তারা স্পষ্ট, উজ্জ্বল। তত্ত্ববিশ্বের সংকট বা সাফল্য নিরপেক্ষভাবেই এই চারপাশের গল্পের মধ্যে স্বভাবতই সম্ভব হয়ে ওঠে সেই প্রাণস্পন্দন যা তাঁর কবিতাকে এক স্মরণীয় সজীব লাবণ্যে ধন্য করে।

'শুধু রাতের শব্দ নয়' বইটিতেও জীবন ও পৃথিবীর বহু জটিল প্রসঙ্গ এমন এক আশ্চর্য প্রসাদগুণেই স্মরণীয় হয়ে থাকে। স্মরণীয় হয়ে থাকে বাংলাদেশ আর তার প্রকৃতি ও মানুষের জন্য গুঞ্জরিত এক ভালোবাসার স্মারক হিসেবে। আর তা ধরা পড়ে বই-এর শুরুতেই 'ছাখো এই আমি এলাম', 'বদলটা অন্ধকারে হয়', বা 'ফিরে আসা'-র মতো কবিতায় যেখানে দীর্ঘ প্রবাস জীবন শেষে হয় 'আমার কেন্দ্রে বাংলায় আমার বাংলাদেশে' শিশুর মতো প্রেমিকের মতো গলায় প্রশ্ন তুলে 'আছে দাঁড়াবার একটু ঠাঁই?' ('ফিরে আসা') জন্মস্থানের মানুষকে ভালোবেসে সেই আশ্চর্য শুদ্ধ উচ্চারণে :

তোমরা আমাকে ছোঁও
তাহলে আমি আমার শৈশবের নদীকে পাব,
আমাকে শুইয়ে দেবার মাটি তার দুই ধারে।

('ছাখো এই আমি এলাম')

অথচ যে স্বপ্ন অনেকদিন আগে থেকেই বুকের মধ্যে লেগে রয়েছে তাকে খুব চারপাশে প্রতিফলিত দেখতে চাইলেও তো তা খুব সহজ হিসেবে হবার নয়। অনেক ভালোবাসা থাকলেও নয়। কারণ, সময় আরো অনেক মানুষ আর করুণ মানবিক সত্য উন্মোচিত করে দিয়ে গেছে। জানা হয়ে গেছে 'এক কুটিল প্রণালী / কথা ভাঙে, বুকে খেলে বাঁকা চতুরালি' ('কথা'), কিংবা

কিছু কচি হাতপায়ে ঘুণ লাগে
মাথার ওপর থেকে চাল খসে গেলে
শিশুরা আকাশে দেবদূতের হাত ধরে
ঈশ্বর সকাশে যায়,
ঝোপঝাড়ে বুঝিবা তখন পুণ্য
একতান শুরু হয়। ('রহস্য')

আসলে সেই নির্বিকল্প বিষণ্ণতা বহু কবিতাকেই ঘিরে রাখে। 'দেয়ালের বাইরে' 'অন্ধ স্রোত' 'গভীর শহরে' 'থেকে থেকে যে ডাক শুনি' 'স্বস্তির কথা কে বলবে' 'অথচ জলের জন্যই' এ-রকম কবিতাগুলোতে বারবার ফিরে ফিরে আসে সেই কবির গহন আর্তি যিনি অনেকদিন আগে একদা বলেছিলেন 'হে বন্ধ্যা, তোমার গর্ভে যন্ত্রণা এবার নড়ুক' ('রাতের পর দিন', 'উৎসের দিকে')। সে প্রার্থনার পর আজ অনেকদিন হয়ে গেলেও এখনো

এত নড়াচড়া তবু বুকের মধ্য থেকে উঠে আসার শব্দ নেই,
অন্ধকার রক্তে কোনো সূর্যের জন্ম নেই।
('একি কোনো নির্জনতা')

হেলে পড়া সূর্যের প্রহরে এখনো প্রায় অসহায় নায়কের মতো বলতে হয় "আমাকে স্বস্তির কথা কে বলে? আমার দিন আর রাতগুলো বাঘ নখ বসা" ('স্বস্তির কথা কে বলে'), কিম্বা 'হায়রে সূর্য! হায়রে স্রোত! এখন আমি দেয়ালের বাইরে ঘুরছি। আমি বন্ধ মুখের কথা ভাবছি। আমি আঙুল মুঠো করে ইঁটের ওপর মারছি আর আমার বুকের রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে।' ('দেয়ালের বাইরে')।

খুব গভীর অমোঘ আর তীব্র হয়ে ওঠে অস্তিত্ব সংকট 'গর্জনের সামনে' মতো কবিতায় যেখানে বুলার হাত ধরে হেঁটে যেতে যেতে তাঁর জানা হয়ে যায় 'আমরাও গর্জনের সামনে' ('গর্জনের সামনে')।

কিন্তু যাঁর সারা জীবনের দিনরাতগুলো এক অতন্দ্র আশার সুরে বাঁধার প্রতিশ্রুতি ছিল সংকট নিশ্চয় তাঁর কাছে সমগ্র হতে পারে না। আরও গাঢ়তর সঙ্কটেও নিজেদের জাগিয়ে রেখেছিলেন আরাগঁ বা ব্রেখট কিম্বা চ্যাপলিন বা রোবসন। তাই খুব একটা প্রদীপের মতো অরুণ মিত্রের পংক্তিগুলি অন্ধকারে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এক আশ্চর্য ভালোবাসায়:

সারারাত জ্বালিয়ে রাখি তোমার গান
সারারাত হাহাকারের ঝাপটায়
নিভতে নিভতেও তা নেভে না। ('নির্জনে')

কেননা, অভিজ্ঞতাতেই তাঁর জানা হয়ে গেছে

নষ্ট রাস্তায় কেউ একজন
পাগলের মতো রাতের টুঁটি ধরবার চেষ্টা করে।
('ঠাসবুনোনের শহরটা')

'তারিখ' 'ঘুরে ফিরে এইখানে' 'লক্ষ লক্ষ শিশু' 'এই একটা রাত্তির'

'সেই ভেজা মাটির ওপর'—এইসব কবিতায় সেই অনুভবগুলি ছড়ানো রয়েছে অভিজ্ঞতারই ওপর, যেখান থেকেই সব শব্দ যে 'শুধু রাতের শব্দ নয়' সেই সত্য জেগে ওঠে।

বস্তুত 'শুধু রাতের শব্দ নয়' বইটিতে পাশাপাশি জায়গা পেয়েছে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মেজাজের কবিতা। একই কবিতায় বিরোধী প্রসঙ্গের সমাবেশে তিনি প্রতীকী সত্যে পৌছোতে চান নি। পরন্তু একজন কবি, যিনি বীজের ফসলে রূপান্তরিত হওয়ার সত্যকেই দেখতে চান আমর্ত্য, তাঁর অভিজ্ঞতার নেতি তাকে বহু সময়েই অন্ধকারের কথা বলেছে। কিন্তু সত্তরের কাছাকাছি পৌঁছেও ভালোবাসায় যাঁর কণ্ঠস্বর রঙিন হয়ে ওঠে, যিনি এখনও লক্ষ করেন "গয়নায় কাপড়ে সঙ্গে রাতটা রাণীর মত লাগে / তার মুকুটের তারা বুঝি আকাশে" তাঁর মনে রয়ে যায় সেই বৈভব যার সামর্থ্যে তিনি অভিজ্ঞতার অন্য সত্যটাও দেখতে পান :

সন্তান সন্ততির মুখ
তুমুল জলের ওপর ঝুঁকে থাকে,
আমি কি তাদের যন্ত্রণার ছাঁচে দেখি?
অগণ্য দোসরের পাশাপাশি
তারা আমার মমতায় সংলগ্ন,
সেখানে কোনো আসা কখনো মরে না।

('শুধু রাতের শব্দ নয়')

শুভ বসু

ধ্যানে, ব্যবধানে। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। দাম : চার টাকা।

কবি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'যে কোনো নিঃশ্বাসে'-ই তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিটি খুঁজে পেয়েছিলেন, এটা যে কোনো কবির ক্ষেত্রেই নিতান্ত শ্লাঘার বিষয়। সমরেন্দ্র কখনো-সখনো মাত্রাবৃত্তে বা স্বরবৃত্তে কবিতা লিখলেও অক্ষরবৃত্তেই তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। অক্ষরবৃত্তের গথিক গাম্ভীর্যের পরিচ্ছদে সজ্জিত ব্যক্তিস্বসম্পন্ন শব্দাবলীর সংশ্লেষে অনায়াসেই সমরেন্দ্রর

কবিতাকে সনাক্ত করে দেয়। শব্দ ব্যবহারে প্রতুল সংযম, বিশেষণ ব্যবহারে মৌলিকতা, চিত্রকল্প নির্মাণে দূরবিস্তারী কল্পনাশক্তির ব্যবহার—এ সমস্তই সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতার প্রতি আগ্রহী করে তোলে পাঠককে।

সমরেন্দ্র এই কাব্যগ্রন্থের 'আমি' কবিতায় লিখেছেন: "একে কি বাঁচা বলে, শব্দকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে, নারীকে / ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে / দু-পংক্তি বেদনা লেখা, / তাও সেই পয়ার অথবা ব্যস্ত পাঁচ-মাত্রা ছ-মাত্রা।" এই উদ্ধৃতি যুগপৎ কবির বিনয় ও আত্মসমীক্ষার সাক্ষ্য। দগদগে জীবনের কথা, পরিবর্তমান পৃথিবীতে শোষণের চক্রান্ত এবং মুমূর্ষু মানুষের প্রতিবাদও হয়ে ওঠে তাঁর কবিতার বিষয়।

'সরল প্রাণী', 'আমি দায়ী নই', 'শনি', 'অভিমন্যু'—এরকমই কয়েকটি কবিতা। 'সরল প্রাণী' কবিতায় আমাদের কারো কারো আশ্চর্য স্ববিরোধিতা কিংবা পারিবেশিক বিরুদ্ধতার মধ্যেও মানুষের সামঞ্জস্যবিধানের দুর্মর প্রয়াসকে লক্ষ্য করে কবি লেখেন: "মানুষের মতো এমন সরল প্রাণী আর নেই, / সে এখনও বিশ্বাসপ্রবণ, এখনো সে পেঁপে ও শসা, নিটোল বেগুন / কিনে আনে বৌ-এর জন্য / বিপ্লবীর স্ত্রী করে লক্ষ্মীপুজা; / মন্ত্রীর পরিবার রবিবার হাত দেখায় হরিশ আচার্যকে" এবং আরো লেখেন: "তারপর একদিন হাসি-হাসি মুখে রাষ্ট্রসঙ্ঘে / দেশের বাঁধানো নাম সামনে নিয়ে গদিতে বসল মানুষ, / কিন্তু এক গ্রাস জল খেতে না খেতেই শুনল / ভাই ভাইকে মারছে, সঞ্জয় বললেন: 'দেখছি' / শকুনক্রান্তিতে ভরে গেল বৈদুর্য আকাশ—সঞ্জয় বললেন, 'দেখেছি' / "পথের ওপর মরে পড়ে থাকা ভিক্ষুকের দিকে তাকিয়ে কবি লেখেন: "আমি এই মৃত্যুর জন্যে দায়ী নই; আমি তো আকাশ-লিখি / লিখি না মানুষ;" —অভিমানের ছদ্মবেশে কবি আসলে তুমুল অভিযোগ প্রকাশ করেন। এই মানসিকতার পেছনে কোনো বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক দর্শন ক্রিয়াশীল কিনা তা বলা মুশকিল, তবে নেহাৎ মানবিক কারণেই এ-সমস্ত ব্যাপারে কবি বিচলিত বোধ করেন বোঝা যায়। নবজাত শিশুর মধ্যে কবি সঙ্গতভাবেই খুঁজে পান এ কালের অভিমন্যুকে। তিনি জানেন আজকের প্রতিটি শিশুকে বেড়ে উঠতে হবে আর এক কুরুক্ষেত্রে আকাশ-আছড়ানো প্রতিবাদে জেগে ওঠার মানসিক প্রস্তুতিকে সম্বল করে।

'ধ্যানে-ব্যবধানে'-এর শেষের দিকের কিছু কবিতা আমাকে যে পরিমাণে

কবির সম্পর্কে উৎসাহিত করে, প্রথম দিকের অধিকাংশ কবিতাই কিন্তু সেই পরিমাণে হতাশ করে। তাঁর অধিকাংশ কবিতার প্রেক্ষাপটে এক দুর্বোধ্য আধ্যাত্মিকতার কুয়াশা ছড়িয়ে রয়েছে। দেবতা, ঈশ্বর, যেশাস, মন্দির, ভগবান, সন্ন্যাসী, পূজারী ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষঙ্গের পৌনপুনিক ব্যবহারে তাঁর কবিতা প্রায়শই জীবনের উত্তাপবর্জিত বিশুদ্ধ শিল্পের ছটায় পর্যবসিত হয়ে যায়। ফর্মের ব্যাপারেও কবির সচেতন হবার সময় এসেছে মনে করি।

শুভাশিস গোস্বামী

রূপকথা

মণিকুমার ফুলকুমার। অনুবাদ বীণা মিশ্র। প্রকাশক : হেমন্ত মিশ্র। দাম : দু টাকা।
ঠাকুরমার রূপকথা। অনুবাদ বীণা মিশ্র। প্রকাশক : বাণীপ্রকাশ। দাম : দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

উপর্যুল্লিখিত গ্রন্থ দুটি, যথাক্রমে শ্রীপ্রফুল্ল মিশ্র সম্পাদিত অসমীয়া রূপকথা 'পখী ঘোঁরার সাধু' ও লক্ষ্মীনাথ বেজ বরুয়াকৃত 'অসমীয়া রূপকথা'র স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। অনুবাদিকা শ্রীযুক্তা বীণা মিশ্র বাঙলার কন্যা এবং আসামের বধূ। আন্তরিক মমতায় তিনি এসব কাহিনী-সংগ্রহ ও অনুবাদ করে তাঁর পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল দুজনাকেই আরো কাছে এনে তাঁর একটি মহৎ কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন বলে বলা যায়। বইগুলির অন্তর্নিহিত সম্পদ অমূল্য; সেই কারণে হয়ত তার বইয়ের মূল্য খুবই কম। বাঙালি পাঠকসমাজ, সুধীসমাজ এতে উপকৃত হবেন। শিশুগোষ্ঠী এবং তাঁদের অভিভাবকরাও আগ্রহ ও আনন্দে এ-বইগুলি পড়বেন এই আমাদের আশা। ব্যক্তিগত ভাবেও শ্রীমতী বীণা মিশ্র ও শ্রীহেমন্ত মিশ্র আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। গ্রাম-আসামের মর্মকথা ও স্নিগ্ধরূপ হেমন্ত মিশ্র ব্যতীত অন্য কারুর তুলিতে চিত্রায়িত হতে পারত কি? এই গুণী দম্পতি তাঁদের জীবনের সংযুক্ত পরিশীলিত মন নিয়ে চিরায়ত লোকজীবনের আশ্চর্য সম্পদগুলিকে পাঠকসমাজ ও গুণীজনসহ একত্রে আস্বাদ করার সুযোগ দিয়েছেন বলে তাঁরা আমার ধন্যবাদার্হ।

'মণিকুমার ফুলকুমার' বা অসমীয় রূপকথার গল্পগুলি পড়তে পড়তে মনে একটা প্রশ্ন জাগে। ছাত্রজীবন থেকে আমরা চিরায়ত সাহিত্য তথা লোক-সাহিত্য নিয়ে যেভাবে বিচ্ছিন্ন ধারায় বিচার করি, তাই কি ঠিক? অথবা, দ্বান্দ্বিক চিন্তাপদ্ধতি অনুসারে বলা যেতে পারে, চিরায়তরূপেও লোককথার বীজ উপনিহিত থাকে এবং লোককথার বীজই একদিন শাখাপল্লব সুদ্ধ সামগ্রিকতা নিয়ে মহীরুহের আপাতগ্রাহ্য চিরায়তরূপ গ্রহণ করে। একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে মানবীয় ছোটখাটো প্রয়াস-প্রযত্ন, সুখদুঃখ, সংগ্রাম ও সাধনা এবং এইসবগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের দ্বন্দ্ব সংকটোত্তীর্ণ শুভরূপই উভয়েরই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। প্রভেদ যা কিছু তা হল উদ্দেশ্য কি-ভাবে সাধিত হবে তাই নিয়ে। পূর্বোক্ত প্রয়াস-প্রযত্ন-সংগ্রাম শুরু অবশ্যই হয় খাদ্যসংগ্রহ ও জীবনসংরক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু সেই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সার্থক হতে পারে না যতক্ষণ বিবেকসত্তা জাগ্রত না হয়। সৌভাগ্যবশত মানুষের মধ্যেই সেই দ্বন্দ্ব ও বিবেক পরিলক্ষিত হয়েছে। সেই প্রাপ্তির চিত্রই উজ্জ্বল হয়ে ফোটে লোককথায়। আলোচ্য গ্রন্থদ্বয়ে বিধৃত লোককথাগুলিতেও সেই শাশ্বত চিত্র সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। এই সত্যের চিত্র শুধু ভারত উপ-মহাদেশের পুর্ব বা পশ্চিমাঞ্চলেই দেখা যায় তা নয়; সুদূর এস্কিমোদের উপকথা (৺শেফালি নন্দীর অনুবাদ), পারস্য তুরস্কের কাহিনী (আরব্যোপন্যাসের গল্প), চীনীয় এবং সমগ্র ইয়োরোপীয় লোকসাহিত্য এবং প্রাচীন আমেরিণ্ডিয়ান উপকথা সাহিত্যেরও মর্মবাণীতে এই একটি সত্যই উদ্ভাসিত। আমরা দেখি, মানুষ কেমন করে বাঁচে—বাঁচার তাগিদে সে ভালবাসে এবং শেষ পর্যন্ত ভালমন্দের দ্বন্দ্বে সে মন্দ পেরিয়ে ভালতে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে আরও একটা সত্যও দেখা দেয়। সেটা হল মানুষের চির-অভিযাত্রী রোমান্টিকতা যা তার বুদ্ধি ও বাসনাকে পরিব্যাপ্ত করে ও অনুরঞ্জিত করে। লোকজীবনের সামগ্রিক এই রূপ আমাদের কাছে লোকসংহতির আশাপ্রদ একটা উপায় বলে মনে হয়। আরও একটা কথা মনে হয় সেটা হল মানবীয়তা যে দুর্মর সেই দুর্লভ সত্যের পরমতম উপলব্ধি। এই সার্বজনীন বা ইউনিভার্সাল সত্যই আবার আমরা দেখতে পেলাম শ্রীমতী বীণা মিশ্রের অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেসী অসমীয় ভাষায় লেখা রূপকথাগুলির মধ্যে। সেখানেও অনুরণিত হচ্ছে একটিই কথা: 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। সর্বশেষে মনে হয় আমাদের সবার মধ্যেই আছে মণিকুমার বা ফুলকুমারেরা। তাদের মা-বাবার আদর-আবদার, রাজার বাড়িই হোক দরিদ্র

ঘরেই হোক, প্রায় এক। মা-বাবা সাধ্যানুসারে তাদের দাবি মেটাতে যান। সেজন্য মূল্যও দিতে হয়। ধনীগৃহের ছেলে নানা কর্মবিপাকের মধ্যে অভিযাত্রী-রূপে নিজেকে স্বরূপে খুঁজে পায়। গরিবের ছেলে অসামান্য হয়ে ওঠে আপনাপন সাধের সাধনায়। অর্থাৎ, স্বল্পকথায় কর্মবাদের (nemesis) স্বয়ম্পূর্ণ একটা অভিব্যক্তি এইসব অভিযানের মধ্যে প্রকাশ পায়। আর, সঙ্গে সঙ্গেই সেইসব প্রয়াস গাঁথা হয়ে যায় গানে—রূপ হয় তার অপৌরুষেয় বাঙ্‌ময়। কোনো জাতির 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা'-কে আমরা পুরুষানুক্রমে বয়ে আনি—বংশরক্তের মতোই ; এক জাতির জীবনধারা থেকে অবশেষে তা অনায়াসে সংক্রমিত হয় অন্যান্য জাতির জনজীবনে।

পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসারে বিচার করলে আমরা দেখি, মণিকুমার ফুলকুমার প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে সেই জনজীবনের ধনী-দরিদ্রগৃহের অনুভূতি ও অনুস্মৃতি। আমরা পাই সেইসব কত বিস্মৃত যুগের রসসুরভিত মানবহৃদয়ের হাসি-কান্না, লাভ-ক্ষতি অভিলাষ এবং অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতর হবার দুর্মর ইচ্ছা ও শুভ-শক্তির উপলব্ধি। অসমীয় রূপকথার মধ্যেকার খলেন বা নাগদেবতা কখনও ভয়ঙ্কর কখনও বা সহানুভূতিশীল। সর্বত্র দেখতে পাই অধিদেবতারূপে বিদ্যমান সর্বনিয়ন্তা এক শুভশক্তিকে—যার হাতে সতত অশুভ দৈত্যদানব নাগপিশাচ দলিত হয়ে নির্জিত হয়ে পরাজয় স্বীকার করছে এবং আবারও রক্তবীজের মতো নূতনতর বল লাভ করছে। এই দ্বন্দ্বসংহতির আশ্চর্য রূপ এইসকল অসমীয় লোককথার মধ্যে বেগব্যঞ্জনায় প্রবাহিত। এই সকল কাহিনীর রূপ এবং এইসব কাহিনীর চরিত্রগুলির মেজাজ ঠিক যেন অসমীয় প্রকৃতি তীব্রধারা নদী, পার্বত্য উপত্যকা অধিত্যকার মতোই মনে হয়েছে। তাতে করে আরও পরিস্ফুট হয়েছে পূর্বাঞ্চলের আশ্চর্য সুন্দরশ্রী, যা সামান্যকেও অসামান্য সৌন্দর্য সম্পদে ভূষিত করতে পারে। গল্পগুলি তাই ভাবে, ভাষায়, অন্তরৈশ্বর্যে ও রুচিতে চিত্রধর্মী হয়ে উঠেছে। ১৯৫২ সালে দেখা আসামের উজ্জ্বল স্মৃতিকে এই কাব্যসুষমামণ্ডিত কাহিনীগুলির মাধ্যমে যেন আবার ফিরে পেলাম !

শ্রীমতী মিশ্র বাঙালা ও অসমীয়া দুটি ভগিনীভাষাই ভালোভাবে জানেন। সাধারণভাবে আমাদের মতো অজ্ঞ লোকের পক্ষে ভালোভাবে জানা সম্ভব না হলেও একেবারে না জানা অসম্ভব। ভারতবর্ষ বহুজাতিক বহু ভাষাভাষী দেশ। এরও মধ্যে বাঙালি কান কোঙ্কনী বা মহারাষ্ট্রী স্বরে শুনে চমকিত হয় "তুমি বসা"। তাতে কি "তুমি বস" অচেনা থাকে ? আবার অত দূরে না গেলেও পূর্বী বা প্রাচ্য মাগধীর সন্তান ছয়টি ভাষা, মগহী, মৈথিলী, ভোজপুরিয়া, অসমীয়া

ওড়িয়া ও বাঙলা এরা যে সহোদরা। একটিকে অস্বীকার করলে যে নিজেকেই অস্বীকার করা হয়। দৃষ্টি আরও সন্নিবিষ্ট করে দেখতে পাই প্রাচীন মিথিলাক্ষর, বঙ্গাক্ষর আর অসমীয় অক্ষর প্রায় একরূপ। দু-একটি মাত্র অক্ষরের ব্যবধান সহজেই অতিক্রম করার মতো। অপরদিকে ভারতে সন্নিবিষ্ট কয়েকটি নৃকুল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি চিহ্ন ভারতে এনেছে। সেই সকল নৃকুলবর্গকে পৃথকভাবে আজ আর চিহ্নিত করা যাবে না। মহাকবির কথাই সেখানে সত্য হয়ে আছে :

"হেথায় আর্য হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন
শকহূনদল পাঠান মোগল
একই দেহে হলো লীন।"

কোনো একটি পৃথকীকৃত জাতির অস্তিত্ব না থাকলেও আমরা অস্তিত্বের মধ্যেও প্রায়-বিস্মৃত অস্তিত্বের আস্বাদ পাই বৈকি! অসমীয় ক্ষাত্রশক্তির কথা পাই মহাভারতে। যেখানে প্রাগজ্যোতিষপুরের নৃপতি ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দেন। জানতে পারি অর্জুনপত্নী চিত্রাঙ্গদা ও পুত্র বভ্রুবাহনের কীর্তি। শুনতে পাই তাঁদের সাথে যোগ দিচ্ছিলেন নাগ-রাজকন্যা উলুপীও। সে-সকল কথাও তো লোককথা। সেই সব বিন্দু দিয়েই তো রচিত হয়েছে মানব-মহাসমুদ্রের মতো মহাভারত। বৌদ্ধসংস্কৃতির যুগে দেখি স্বয়ং গু এন্ শাং (হুয়েন্‌সাং)—সুবর্ণসপ্ততি বলে সাংখ্যের উপর লেখা একটি গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেন চীনা ভাষায়। তৎকালীন আসামরাজ সেই সংস্কৃত গ্রন্থ আবারও প্রার্থনা করে ফিরিয়ে আনেন। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক নিরিখে অহোম্, আসাম ও অসমীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন নৃবর্গের নব-মূল্যায়ন করেছেন মদ্‌গুরু ৺আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। আমাদের ঘরের কাছে নয়, আমরা ঘরেই, নিজেদের মধ্যেই অবলোকন করি সানন্দে সাগ্রহে 'কিরা ত-জন-কৃতি'। প্রকারান্তরে বলা যায় এক আসামেই আশ্চর্য এক নৃবর্গ সংমিশ্রণ দেখা যায়। কিরাত জাতিকুলের সঙ্গে সমন্বিত সংহত পশ্চিম ভারতীয় আর্য, তথা দ্রাবিড়নৃবর্গেরও সংযোজন ঘটে। এই কিরাতজন থেকেই আমরা পেয়েছি কতকাংশে তা বলা শক্ত। আমাদের দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রমথ পতিরূপে আবার হৈমবতী পার্বতী পতিরূপেও। কিরাত এই পার্বত্য জাতি উপজাতির কথাও মহাভারতে বিধৃত আছে যেখানে কিরাতবেশী মহাদেবের প্রসাদ লাভ করে অর্জুন ধন্য হন। মহাভারত

তথা রামায়ণ উভয়েই যে পরশুরামের কথা পাই তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত তীর্থের ধাম হল লৌহিত্য উপত্যকায়।

শেষোক্ত বর্ণানুসারে আমরা বুঝতে পারি, কত ধারার কত নদীর মতো সংস্কৃতি এসে ঐ লৌহিত্য উপত্যকাময় আসাম-ভূমিতে সন্নিবিষ্ট। সেদিক দিয়েও শ্রীমতী বীণা মিশ্রের কাজ উল্লেখ করার মতো। তাঁর অনুবাদে বিধৃত বিভিন্ন গল্পে আমরা পাই বিভিন্ন সংস্কৃতির স্বাদ। তাঁর গল্পে উল্লিখিত সাপ, নাগ, বানর-বানরজননীদের মেজাজ সহজেই আমাদের পরিচিত হয়ে ওঠে। অসমীয় সংসারের ছোটখাট সুখদুঃখ, খাদ্যাখাদ্য দৈনন্দিন ঘটনাপঞ্জীর লৌকিক চিত্র ও অলৌকিক মাধুর্য তিনি আমাদের অমৃতের মতো পরিবেশন করেছেন। এসব নিসর্গ-চিত্র ব্যতীতও তিনি মাঝে মাঝে সুললিত কবিতাংশের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। তাতে করে আমরা ভাষার স্বরূপ ও ভাষার মাধ্যমে কয়েকটি নূতন শব্দও পেয়ে যাই। এগুলির পরিচয়ও শ্রীমতী মিশ্র দিয়েছেন। যেমন 'তামুলী' (বাংলায় তাম্বুলী বা পান-ব্যবসায়ী), খারচা (বাঁশের চারার গুঁড়ো দিয়ে তৈরি খাদ্য), বাবরি (শাক) (ভূমিকা, পৃ ৩, 'মণিকুমার ফুলকুমার')। তিনি যথাযথ অসমীয় শব্দটি ব্যবহার করাতে তাঁর প্রয়োগকুশলতার নৈপুণ্যই সূচিত হয়।

এতদ্ব্যতীত, শ্রীমতী মিশ্র ভূমিকায় একটি মূল্যবান লোকগীতি-পরিচিতি দিয়েছেন। অসমীয় লোকসংগীত ব্যতীত অসমীয় অনুষ্ঠান যে অঙ্গহীন এ-পরিচিতি পড়লে তা বোঝা যায়। এগুলি হল অনুষ্ঠানমূলক, যেমন বহু গীত আইনাম, বিয়ানাম প্রভৃতি; আখ্যানমূলক, যেমন মণিকুমার ইত্যাদির গীত এবং নিচুকনি বা বিবিধ বিষয়ক গীত। মনে হয় দ্বিতীয় সংস্করণে লেখিকা এ-বিষয়ে আরো অবহিত হবেন। আমরা আশা করব তিনি এই সূচি ধরেই আরো 'গীত' বা এরূপ স্বাদু অসমীয় লোককথা আমাদের কাছে উত্তরোত্তর পরিবেশন করবেন। এবং স্বাভাবিক কারণেই আমরা শিল্পী শ্রীহেমন্ত মিশ্রের তুলি-চালনায় বিধৃত আনুষঙ্গিক অলঙ্করণও দেখবার আশায় থাকব।

শ্রীমতী অরুণা দেবী (হালদার)

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

পালযুগের চিত্রকলা। সরসীকুমার সরস্বতী। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দাম চল্লিশ টাকা।

ইদানীং কালের বাংলা প্রকাশনা-জগতের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী-র 'পালযুগের চিত্রকলা' নামক গ্রন্থটির প্রকাশ। রচনাগুণ, বিষয়গৌরব এবং মুদ্রণপরিপাট্য—সবদিক থেকেই এই গ্রন্থটি সংস্কৃতিভাবাপন্ন সকল বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য। সরসীকুমার ভারতীয় শিল্প-ইতিহাস চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ। এবং একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে অন্য কোনো বাঙালি তাঁর মতো একখানি একনিষ্ঠভাবে ভারত-শিল্পের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন নি। ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ে তিনি দেশে-বিদেশে অগ্রগণ্য বিশেষজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃত। আর বাংলাদেশের শিল্প-ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান বহুমুখী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' গ্রন্থে তিনি প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য বিষয়ে যে নিবন্ধটি লিখেছেন তা আজ অবধি ঐ বিষয়ে সব থেকে নির্ভরযোগ্য কাজ হয়ে রয়েছে। তাঁর 'আর্লি স্কাল্‌পচার অব বেঙ্গল' গ্রন্থটিতে পাওয়া যায় বাংলার আদিকালের ভাস্কর্য ও পোড়ামাটির রূপশিল্পের বিশ্লেষণাত্মক পরিচয়। আর আলোচ্য গ্রন্থটিতে প্রাচীন বাংলার চিত্রকলার প্রামাণিক আলোচনা সম্পন্ন করে তিনি একই হাতে প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ইতিহাস পঠন-পাঠনের পথ সুগম করে দিলেন। এইভাবে, অক্ষয়কুমার মৈত্র, রমাপ্রসাদ চন্দ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাগোবিন্দ বসাক প্রমুখ, ঐতিহাসিকের কর্মতৎপরতায় প্রসিদ্ধ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে গবেষকের জীবন শুরু করে সরসীকুমার তাঁর শ্রমের ফসলে বাঙালি সংস্কৃতি ও তার আলোচনাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কিন্তু সম্ভবত তাঁর অধিকাংশ রচনাই ইংরেজিতে বলে সাধারণ বাঙালির কাছে তাঁর পরিচয় সীমাবদ্ধ। সেই দিক থেকে বাংলা ভাষায় 'পালযুগের চিত্রকলা' লিখে তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর অনেক কাছাকাছি এলেন।

গত দু-শ বছরে বাংলা-ভাষার প্রসার ও সমৃদ্ধি নিঃসন্দেহেই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ভাষা গবেষণা ও আলোচনার সমস্ত বিভাগে ব্যবহৃত হয় না। এই সব বিষয়ের অন্যতম হল শিল্প-ইতিহাস। কেননা, যদিও কোনো কোনো শিল্প-ঐতিহাসিক শিল্প-বিষয়ে ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় লিখেছেন

এবং বইও প্রকাশ করেছেন, তাঁরা সর্বদাই তাঁদের পাঠক হিসাবে সামনে রেখেছেন এক 'সাধারণ' বর্গের মানুষকে। ফলে তাঁদের রচনা দৈবাৎই সার্থক বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 'পালযুগের চিত্রকলা' সেদিক থেকেও এক ব্যতিক্রম; এবং নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে নির্মলকুমার বসু লিখিত 'কণারকের বিবরণ' ছাড়া বাংলা ভাষায় এ-জাতীয় বিশেষজ্ঞ-লিখিত শিল্প-ইতিহাস আর নেই। সরসীকুমার বাংলা-ভাষী পাঠককে সাবালকত্বদান করে কেবলমাত্র শিক্ষকসুলভ ঔদার্যই প্রকাশ করলেন না, নতুন নতুন পরিভাষার ব্যবহারে বাংলা ভাষাকে তার যুগসন্ধিক্ষণে সমৃদ্ধও করলেন।

সরসীকুমার চারটি অধ্যায়ে—যথা কথা-মুখ, নিদর্শন-কথা, আঙ্গিক-কথা ও চিত্র-কথা—পালযুগের চিত্রকলা আলোচনা করেছেন। কথা-মুখে সপ্তদশ শতকের তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথ পূর্ব-ভারতীয় শিল্পরীতি সম্পর্কে যে তথ্য রেখে গেছেন তার আলোচনার পর তিনি উনবিংশ শতকে কিভাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বি. এইচ. হজসন ও সিসিল বেন্ডাল কর্তৃক পূর্ব ভারতীয় পুঁথিচিত্রের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। নিদর্শন-কথায় তিনি পালযুগের পুঁথিচিত্রের এক পূর্ণাঙ্গ তালিকা উপস্থাপিত করেছেন। এই তালিকায় তিনি ২৮টি তারিখ-সহ এবং ১৪টি তারিখ-হীন চিত্র-সংযুক্ত পূর্বভারতীয় পুঁথি উল্লিখিত হয়েছে। তা ছাড়া এই পর্যায়ে তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজনে তারিখ-যুক্ত সচিত্র নেপালী পুঁথির তালিকাও তিনি দিয়েছেন। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালা ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিক্ষিপ্ত পূর্ব ভারতীয় চিত্র-যুক্ত পুঁথির বিবরণ ও প্রতিলিপি একত্রিত করার ব্যাপারে সরসীকুমার যে অনলস অধ্যাবসায় দেখিয়েছেন, তাও আলাদা-ভাবে শ্রদ্ধা দাবি করে। অর্ধ-শতাব্দীকাল আগে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহে অবহেলিত অবস্থায় কয়েকটি তালপাতায় তিনি প্রথম পাল চিত্র-কলার সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। তারপর যখনই সম্ভব হয়েছে এ বিষয়ে তিনি তথ্য সংগ্রহ করে গেছেন। পরিশেষে ১৯৬৭ সালে তিনি য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের সুযোগে তাঁর তথ্যসংগ্রহ অনেকটা পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে সক্ষম হলেন। এবং তারপরও তিনি সেই সংগ্রহকে সম্পূর্ণতর করেছেন নানা সূত্র থেকে। পূর্বভারতীয় চিত্রকলা প্রসঙ্গে দিল্লীর কুমারস্বামী স্মারক বক্তৃতার সময় (১৯৬৯) তাঁর হাতে এসেছিল ২২টি তারিখ-যুক্ত সচিত্র পুঁথি, আর 'পালযুগের চিত্রকলা' লেখার সময় তিনি ব্যবহার করেছেন ২৮টি তারিখযুক্ত

সচিত্র পুঁথি। তারিখ-যুক্ত চিত্রিত পুঁথির আলোচনায় সরসীকুমার তাঁর তথ্য-নিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মানসিকতার পরিচয় দিয়ে পাল চিত্রকলা তথা পাল রাজাদের কালক্রমকে সঠিকভাবে নির্ধারিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই আলোচনা পরোক্ষভাবে পালযুগের স্বল্পালোকিত কালক্রমকে উজ্জ্বলতর করে সে-যুগের ইতিহাসকে সামগ্রিকভাবে স্পষ্ট করে তুলতে সক্ষম হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

আঙ্গিক-কথায় পুঁথি-লেখন ও চিত্রণের প্রকরণ-বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমত তিনি সচিত্র পুঁথিগুলির ব্যক্তিগত পরীক্ষার ওপর নির্ভর করেছেন। তারপর আঙ্গিকের বিভিন্ন পর্যায়কে সুচিহ্নিত করার প্রয়োজনে শিল্পশাস্ত্রে প্রাপ্ত তথ্যের আলোচনাও প্রসঙ্গক্রমে এনেছেন। সমরাঙ্গণ সূত্রধার, মানসোল্লাস ও শিল্পরত্নের চিত্রাধ্যায়গুলিতে মুখ্যত ভিত্তিচিত্রের প্রকরণ আলোচিত হলেও, অঙ্কণ পর্যায়ে ঐ সব শিল্পগ্রন্থের সূত্রগুলি পুঁথিচিত্রের ক্ষেত্রেও প্রায় সমানভাবেই কার্যকরী। বিশেষত পালযুগের চিত্রকলা যতদিন পর্যন্ত গুপ্তকালীন মার্গরীতি অনুসরণ করে চলেছে, ততদিন পর্যন্ত শিল্পশাস্ত্রে বর্ণিত প্রকরণ ও পদ্ধতি তাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু পাল আমলের শেষ দিকে, যখন বর্তনার ভার কমে এসেছে, এবং রেখামাত্রিকতাই শিল্পীর প্রধান উপজীব্য, অর্থাৎ যখন মার্গরীতিকে পরিহার করে শিল্পী মধ্যযুগীয় শিল্পরীতির সমতল অভিব্যক্তির পথ নিয়েছেন, তখন হয়তো শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ আর ততখানি কার্যকরী থাকে নি। এই অধ্যায়টিতে চিত্ররচনায় সকল অনুষঙ্গ বিষয়ই, যেমন, বর্ণ, রেখা, বর্তনা ইত্যাদি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

চিত্রকথায় আলোচিত হয়েছে চিত্রে অঙ্কিত বিষয় এবং চিত্রের শৈলী। পালযুগের পুঁথিগুলি বৌদ্ধধর্মসম্পর্কিত এবং এই পুঁথিগুলিতে যে চিত্রাবলী প্রস্ফুটিত করা হয়েছে, তা হয় বুদ্ধের জীবন সম্পর্কিত, নয় মহাযান-তন্ত্রযান বৌদ্ধমতের দেব-দেবীর রূপায়ণ। সেই কারণে পালযুগের পুঁথিচিত্রগুলি যুগ-ধর্ম অনুযায়ী নির্বিশেষেই তৎকালীন ধর্মসাধনার অঙ্গবিশেষ। কিন্তু বিষয়গত এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, শিল্পগত বিচারে যা তাৎপর্যপূর্ণ তা হল এই সব চিত্রে নানাভাবে বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। এবং কি বস্তু সংস্থাপনায়, কি নারী বা পুরুষ মূর্তির অবয়ব রচনায়, কোনো ক্ষেত্রেই পুনরাবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলে সকল চিত্রেই শিল্পীর সৃষ্টিশীল মনের প্রসার পরিলক্ষিত হয়। একথা মনুষ্য-মূর্তিকে বিভিন্ন দিক থেকে, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় তুলে ধরার ক্ষেত্রে

যেমন সত্য, তেমন সত্য তার পশ্চাদপট রচনার ক্ষেত্রেও। যেখানে লতা-পাতা-মন্দির তোরণ ইত্যাদির অলংকরণ বিধৃত দেখা যায়।

পাল আমলের চিত্রকলার শৈলী বিশ্লেষণে সরসীকুমার তাঁর পরিণত মনের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি পাল চিত্রকলাকে প্রাচীন ও আদি-মধ্য যুগের ভারতীয় চিত্রকলার প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে গুপ্তকালীন মার্গরীতির অজন্তা, বাঘ ইত্যাদি গুহাচিত্রগুলির সঙ্গে তার যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তা নির্দেশ করেছেন। পাশাপাশি, পশ্চিম ভারতের মধ্যযুগীয় দ্বিমাত্রিক ধারায় রচিত জৈন পুঁথিচিত্রের সঙ্গে পূর্ব ভারতীয় পুঁথিচিত্রের যে রীতিগত প্রভেদ তাও তিনি তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলেছেন। এ ছাড়াও পালযুগের চিত্রকলার নিজস্ব যে বিবর্তন তার প্রতিও আলোকপাত করেছেন। এইভাবে, যেমন একদিন স্টেলা ক্রামরিশ তাঁর বিখ্যাত ‘দি পাল-সেন স্কাল্‌পচার’ লিখে পাল আমলের পূর্বভারতীয় ভাস্কর্যকে একটি স্বতন্ত্র শিল্প-বিষয়ের মর্যাদা দিয়েছিলেন, সরসীকুমার পাল চিত্রকলাকে একটি মর্যাদা-সম্পন্ন শিল্প-ইতিহাসের বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

পরিশেষে প্রকাশককে ধন্যবাদ দেব তাঁদের এই সাহসী উদ্যমের জন্য, যে উদ্যমের ফলে বাঙালি সৃজন-প্রতিভার এক অনুদ্ভাসিত দিক আজ বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করল। ৫ খানি বহু-বর্ণ ও ১০টি এক-বর্ণ চিত্র সম্বলিত এই সুমুদ্রিত গ্রন্থটি সত্যই সুলভ। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথা না বলেও পারা যায় না যে মুদ্রণের বড় ত্রুটি হল পরিবর্ধিত আকারে পুঁথি-চিত্রগুলিকে পরিবেশনায়। কেননা এর ফলে চিত্রগুলির বর্ণেরই যে শুধু গাঢ়ত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা নয়, রেখার যে মিনিয়েচার চরিত্র, তার যে সূক্ষ্মতা তাও বিনষ্ট হয়েছে। ফলে শুদ্ধ বর্ণে অথবা মিশ্র-বর্ণে পরিবেশিত, সূক্ষ্ম রেখায় অলংকৃত পাল-চিত্রকলা দর্শনের চক্ষু-ইন্দ্রিয়গত যে আনন্দ তা বহুলাংশেই মুদ্রিত চিত্রগুলি থেকে লাভ করা যায় না।

অশোক ভট্টাচার্য

•

বন্দীহত্যা, বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ। দিলীপ মজুমদার। নবাঙ্কুর প্রকাশনী। দাম দশ টাকা।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রবীন্দ্রনাথ—দুই প্রসঙ্গেই বাঙালি পাঠকের একান্ত আগ্রহ আর এ দুইয়ের একত্র বিচার হলে তো কথাই নেই। কাজেই দিলীপ মজুমদার মহাশয়ের বইটি স্বভাবতই জনপ্রিয় হবে বলে আশা করা যায়।

কিন্তু শুধু বিষয়-মাহাত্ম্যই এর একমাত্র আকর্ষণ নয়। এ প্রসঙ্গে উৎসাহীদের দিলীপবাবুর বই ভালো লাগবে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এবং কাজে লাগবে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু দলিল এতে সন্নিবিষ্ট করার দরুন। যেমন বিভিন্ন সময়ে সরকারী দমনবিধির মূল বয়ান এবং সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক ঘটনার বিবরণ থেকে বেশ কিছু মূল্যবান উদ্ধৃতি এ বইয়ের গৌরববৃদ্ধি করেছে। তেমনই রংপুরের আত্মঘাতী বিপ্লবী তরুণ শচীন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্তের অন্তিম পত্রটি এখানে প্রকাশ করে দিলীপবাবু আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। ১৯৩০ সালের মে মাসে শোলাপুরের ঘটনা প্রসঙ্গে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপের বিবরণটিও তাই উল্লেখযোগ্য।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, দ্বীপান্তরিত বন্দীদের দেশে প্রত্যাবর্তন বা তাঁদের মর্মান্তিক অবস্থার উন্নতিসাধনকল্পে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার কতকগুলি উদাহরণও এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে দৃষ্টান্তের তালিকা সম্পূর্ণ নয়, যেমন, ৫১-৫২ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ('মাস্টারমশাই') পুলিসী পীড়নে শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের উল্লেখ থাকলেও এ-ক্ষেত্রে তাঁকে মুক্ত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের চেষ্টার কথা নেই (কৃষ্ণ কৃপালনির 'Rabindranath Tagore: A Biography'-র পৃ. ২৬১-৬২ দ্রষ্টব্য), তেমনি নেই কল্পনা দত্তের মুক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথের চেষ্টার কথা।

দিলীপবাবুর বইয়ের পরিশিষ্টাংশে একটি 'কারা-শহীদদের তালিকা'র সংযোজনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে এর সূচনা ১৮৮৪ সাল থেকে কেন করা হল জানিনা। তারও আগের পর্বের কথা বাদ দিলেও ১৮৫৭ সালের সশস্ত্র অভ্যুত্থান, ওয়াহাবি এবং বহু কৃষক ও আদিবাসী বিদ্রোহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদ্রোহী থেকে শুরু করে বাসুদেও বলবন্ত ফাড়কের শহীদত্ব বরণ ঘটেছে এ-দেশের কারাগারে, আন্দামানে এবং এডেন জেলে ১৮৫৭ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যে। আর যে পর্বের তালিকা দেওয়া হয়েছে সেখানেও কিছু নাম বাদ পড়েছে মনে হল। খুব খুঁটিয়ে না দেখেও যেমন বলতে পারি বড়লাট হার্ডিঞ্জের উপরে বোমা ফেলার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের মধ্যে অবোধ-বিহারী ('বিহারী আভদ' নয়), বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাদ পড়েছে মাস্টার আমীরচাঁদের নাম; ১৯১৯ সালে আন্দামানে অনশনে রামরক্ষার ('রাম রাখা' নয়) মৃত্যুর উল্লেখ আছে, কিন্তু সম্ভবত তার কিছু আগেই সেখানে রক্ষীদের নির্যাতনে ভান সিং-এর

মৃত্যুর কথা নেই ; ১৯১৬ সালে মান্দালয় জেলে সোহনলাল পাঠক প্রভৃতির ফাঁসির কথা আছে, কিন্তু এঞ্জিনিয়র অমর সিং এবং সিঙ্গাপুর বিদ্রোহের নেতাদের মৃত্যুদণ্ডের উল্লেখ নেই (আমার মনে হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার গদর শহীদদের তালিকাটি অসম্পূর্ণ—এমনকি সুপরিচিত বিপ্লবী নেতা, কর্তার সিং সরাভার নামও বাদ পড়েছে) ; ১৯৩১ সালের শোলাপুর অভ্যুত্থানের চারজন শহীদদের মধ্যে মাল্লাপ্পা ধনশেট্টি ও শ্রীকৃষ্ণ সারদার নাম আছে, জগন্নাথ শিন্দের নাম সম্ভবত ভুল করে লেখা হয়েছে 'যদুনাথ সিন্ধে' আর চতুর্থ জন 'আবদুল রসুলের' নাম নেই।

এছাড়া প্রফুল্ল চাকীর ফাঁসি হয়নি, তিনি যে ধরা পড়ার আগেই আত্মঘাতী হয়েছিলেন এ-কথা সর্বজনবিদিত। তেমনি ইন্দুভূষণ রায়েরও ফাঁসি হয়নি, তিনিও আত্মহত্যা করেছিলেন আন্দামান সেলুলার জেলে। রোহিনী বড়ুয়ার মৃত্যু কিভাবে ঘটেছিল এখানে তা দেওয়া হয়নি, অন্তরীন অবস্থায় থাকার সময়ে অত্যাচারী দারোগাকে হত্যার জন্য তাঁর ফাঁসি হয়েছিল ফরিদপুর জেলে।

খুঁত ধরার জন্য এ-সব কথা বলিনি, বললাম দিলীপবাবুর চমৎকার বইটির পরবর্তী সংস্করণ যাতে নিখুঁত হয় এই আশায়। আমি ধরেই নিচ্ছি এ-বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে হবে অচিরেই।

চিন্মোহন সেহানবীশ

আমার জীবনী—মীর মশাররফ হোসেন। সম্পাদনা : অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য। প্রকাশক : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা। দাম ২০ টাকা.

আজও বঙ্গদেশের মুসলমান সমাজের 'বিদ্যাসাগর' রূপে বর্ণিত মীর মশাররফ হোসেন 'বিষাদ-সিন্ধু'-র রচয়িতা রূপেই আমাদের কাছে পরিচিত। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের ঔদাসীন্য আজও দূর হয়নি। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ একাধিক গ্রন্থ প্রকাশে পশ্চিমবঙ্গের কোনো প্রকাশক আগ্রহ দেখান নি। কিছুকাল আগে পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির পক্ষ থেকে মীর মশাররফ হোসেনের রচনাবলি প্রকাশের বিজ্ঞাপন দেওয়া হলে আশান্বিত হয়েছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করা হয় নি। এই অবস্থায়

অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত মীর মশাররফ হোসেনের 'আমার জীবনী' হাতে পেয়ে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি।

মীর মশাররফ হোসেনের রচনাবলির সাহিত্য-মূল্য ছাড়াও একটা ইতিহাস-মূল্য আছে যা উপেক্ষা করা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু এই অপরাধ-বোধ আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মনে আজও জাগে নি। মীর মশাররফ হোসেনের 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' ও 'আমার জীবনী' তৎকালীন বাংলার মুসলমান সমাজের এক অনবদ্য চিত্র তুলে ধরেছে। কিন্তু শিক্ষিত মুসলমান সমাজও এ-সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। ফলে এ-সব বই একেবারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংক্রান্ত পুস্তিকায় পরিষদের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ-সংগ্রহের তালিকায় 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' স্থান পেয়েছিল, কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় পরিষদ কর্তৃপক্ষের অবহেলায় বেশ কয়েক বছর আগেই সেটি উধাও হয়ে গেছে। আর 'আমার জীবনী'-র কোনো কপি এ-দেশে উদ্ধার করার কোনো আশা ছিল না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য বহু আয়াস স্বীকার করে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে গ্রন্থটির ফটোস্টাট কপি আনিয়ে গ্রন্থটি আবার প্রকাশ করে দেশবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এ-বিষয়ে প্রকাশকও প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

'আমার জীবনী'-র ভাষা খুব ভালো নয়, রচনারীতিও ক্রটিপূর্ণ—তবু সরল সহজ ভাবে তৎকালীন মুসলমান সমাজ তথা বাংলা দেশের যে ছবি এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে তা বিশেষ অাগ্রহোদ্দীপক। লেখক তাঁর জীবনী সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। মাত্র যৌবনারম্ভ কাল পর্যন্ত তাঁর নিজের জীবনের ও সমাজের চিত্র তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরতে পেরেছেন।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' ও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'-র সঙ্গে 'আমার জীবনী' অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। কাজেই এই দুটি গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশে অধ্যাপক ভট্টাচার্য উদ্যোগী হবেন বলে আশা করি। বিশেষ করে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' শুধু মুসলমান সমাজের চিত্র রূপে নয়, নীলকর-বিরোধী জঙ্গী আন্দোলনের সঠিক চিত্র রূপেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'আমার জীবনী' মীর মশাররফ হোসেনের স্ববিরোধিতাকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। যে দীনবন্ধু মিত্র-র প্রশংসায় তিনি অন্যত্র মুখর, এই গ্রন্থে তিনি সেই দীনবন্ধু মিত্রকে 'নেমকহারাম' বলতেও কুণ্ঠিত হন নি।

বর্তমান গ্রন্থের ছাপা-বাঁধাই প্রশংসনীয়। শব্দসূচিতে 'পাঁপর' কথাটির যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা ঠিক নয়। 'পাঁপর' কথাটি ইংরাজী 'পপার' শব্দের বাংলা রূপ। 'ফাঁপরে'র সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। 'পপার' বা বিত্তহীন কোনো ফরিয়াদী মামলা করতে চাইলে সরকার তাকে সাহায্য করেন। যতদূর জানি এ আইন এখনও বলবৎ আছে।

সুকুমার মিত্র

নাটক

নান ইজ রেসপনসিবল। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুবাদ : অবনী মুখার্জি। মনীষা গ্রন্থালয়। দাম : পাঁচ টাকা।

'কেউ দায়ী নয়' (১৩৭২) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু পঠিত নাটক। বিষয়বস্তুর সমস্যাজটিলতা, সামাজিক পরিবেশের রূপান্তরে ব্যক্তির মানসিকতার পরিবর্তন, শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজে দেহকারাগার থেকে নারীর মুক্তি, সমষ্টির কল্যাণের জন্যে ব্যক্তির ত্যাগ-স্বীকারের ভূমিকা, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে সতীত্বের জটিল প্রশ্নের মীমাংসা, সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদের সংগ্রামী চেতনা ইত্যাদি নাটকটির মধ্যে লভ্য। বুদ্ধিগ্রাহ্য পদ্ধতিতে নাট্যকার নানা প্রসঙ্গকে এই নাটকে অন্তর্মুখী তাৎপর্যে অন্বিত করেছেন। সুধা চরিত্রের মধ্য দিয়ে ছিন্নমূল জীবনে নারীত্বের নবমূল্যায়ন প্রয়াস বিস্ময়কর। দুই মহাযুদ্ধোত্তর যুগের নাটকে নারীর সতীত্বের জটিল সূত্র মীমাংসা প্রসঙ্গে প্রেমের একনিষ্ঠতার সঙ্গে নারীর মনন-শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ষাটের দশকে সতীত্বের সংস্কার কোনো অভিমান-বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলেও মনের সংস্কার একেবারে অন্তর্হিত হল না। পুঁজিবাদী সমাজ সামাজিক প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক সমুন্নতির কারণে পরিবর্তিত লোভী ও তির্যক দৃষ্টিকোণে নারীকে সেই আপাত-সংকোচ বা বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। আপন স্ত্রী-কন্যা বা ভগিনীকে ধনসম্পদ বৃদ্ধির কারণে বা উচ্চাভিলাষ চরিতার্থতার জন্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনোরঞ্জনে বলি দেয় পুঁজিবাদী সমাজের অর্থগৃধ্নু ব্যক্তিরা। কাঞ্চন-মূল্যে নারীর দেহের শুচিতা বিনষ্ট হয়। অথচ পারিবারিক সম্পর্কে তা কোনো গৃহবিবাদকে

অনিবার্য করে তোলে না। হরিশরণের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে ভ্রষ্ট ও অবিবেকী রমেন জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে বোন সুধার সতীত্বের বিনিময়ে অর্জিত অর্থের জন্যে দ্বিধাহীন হাত অবলীলায় বাড়িয়ে দিয়েছে। দেহ-বিনিময়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এনে সুধা মায়ের ভরণ-পোষণ করে মানবিক কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেছে। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ ও সংস্কৃতির শোষণ ও বঞ্চনাকে পটভূমিকায় এনেও নাট্যকার এখানে শ্রেণীসংগ্রামের ভূমিকা নির্ধারণের চেয়েও মননের প্রকট সংকটের ও দ্বন্দ্বের প্রতিই অধিকতর যত্নশীল। সমাজ-বাস্তবতার স্থূলতা বুদ্ধিগ্রাহ্য পদ্ধতিতে সূক্ষ্মতার আশ্রয় নিয়েছে। নাট্যকার যুগের দ্বান্দ্বিক রূপটিকে ব্যক্তিসত্তায় প্রতিফলিত করে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সূত্রে মানুষের অন্তর-বাহির, স্বপ্ন-চিন্তা, রূপ-রঙ, বিচ্ছিন্নতা-বিবিক্ততা, গ্লানি, মৃত্যু-অনুভূতি ইত্যাদিকে নানা চরিত্রের চেতনার চলস্রোতে শিল্পরূপ দিয়েছেন। নাটকের সমাপ্তিতে সুধার গুরুত্বপূর্ণ জীবন জিজ্ঞাসার সুস্পষ্ট উত্তর নাট্যকার দেন নি। সুধা নিজের মহীয়সী শক্তিকে দেহ-মন দিয়ে উপলব্ধি করতে না পারলেও আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার তাৎপর্যে সে মহীয়সী। সুধা দেহগত সতীত্বের সংকীর্ণ ধারণা ভেঙেছে—স্বভাবগত জীবনধর্ম পালনের মধ্যে সে কোনো অন্যায় দেখে নি। তথাপি সে বলেছে—'আত্মা মরে নি।'

দিগিন্দ্রচন্দ্রের এই প্রখ্যাত নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ 'নান ইজ রেসপনসিবল'। অনুবাদক নাট্যকারের সত্তা ও অনুভূতির সহযাত্রী হয়ে অনুবাদেও মূল নাটকের সমানুভূতি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। চরিত্র-গুলির ক্রিয়া, ভাব ও পরিবেশ-সচেতনতা বজায় রেখেছেন অনুবাদক।

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

ভিয়েতনাম

ভিয়েতনাম সঙ বুক। বারবারা ডেন ও আরউইন সিলবার সংকলিত ও সম্পাদিত। গার্ডিয়ান, ন্যুয়র্ক কর্তৃক প্রকাশিত ও মান্থলি রিভিয়ু প্রেস, ন্যুয়র্ক কর্তৃক পরিবেশিত। দ্বিতীয় মুদ্রণ। দাম ৩.৯৫ ডলার।

'কোন ভাষায় ভিয়েতনামের বর্ণনা দেয়া যায় দুনিয়ায়—আমরা গত কয়েক বছর ধরে তাকে যেমন জেনেছি, জানছি, ভবিষ্যতের মানুষও যাতে তার

কিছুটা আঁচ পায়। ..ভিয়েতনামের লোক তো মাত্র তিন কোটি—তার মধ্যে কত শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম, বন্দুক ধরতে পারে না; জীবনযাত্রার নানা কাজে বাধ্যতই ব্যস্ত থাকতে হয় কত জনকে ; শিক্ষার কাজে, খাদ্য-উৎপাদনে, সরবরাহ চালু রাখতেও কত জনকে দরকার হয়—এদের বাদ দিয়ে তিন কোটি লোকের বাকি অংশ হারিয়ে দিল প্রায় পাঁচ লাখ মার্কিন সৈন্য, তাঁবেদার বাহিনীর হাজার-হাজার সৈন্য, কোরিয়া-অস্ট্রেলিয়া-ন্যুজিল্যাণ্ড-থাইল্যাণ্ড-ফিলিপাইনস এর হাজার হাজার ভাড়াটে সৈন্যের মিলিত বাহিনীকে।

'ভিয়েতনামের মানুষ তাঁদের সংগ্রাম ও শক্তি দিয়ে আমাদেরও মহত্ব দিয়েছে।...যুদ্ধের প্রতিবাদ করে আমরা জগতের সম্মুখে আমাদের মানবতা পুনপ্রমাণের সুযোগ পেয়েছি...।'

ভিয়েতনাম নিয়ে সারা দুনিয়ার একশটির কিছু বেশি গানের স্বরলিপি-সহ সংকলনের সম্পাদকদের এই কথাগুলি আজকের মুহূর্তে আরো প্রাসঙ্গিক ঠেকে। ভিয়েতনাম আক্রমণের প্রতিবাদ করে জগতের সম্মুখে মানবতা পুনপ্রমাণের দায় চীনের জনসাধারণের ওপর বর্তে গেল। চীনের জনগণ একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছেন। তাই তাঁদের দায় শুধু মানবতারই নয়—সমাজতন্ত্রের, মার্কসবাদের, শ্রমিক-শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার, কমিউনিস্ট আন্দোলনের, চীনদেশের কমিউনিস্ট পার্টির। কিন্তু চীনদেশের সরকারকে, পার্টিকে বা জনসাধারণের আরো কোনো সমাবেশ-সংগঠনকে 'মানবতা' থেকেই শুরু করতে হবে। তাঁরা 'মানবতা'কেই লঙ্ঘন করেছেন—শ্রমিক শ্রেণী ও তার সংগঠন কমিউনিস্ট পার্টি তো সভ্যতার আরো অনেক উন্নত সচেতন অবস্থা।

আর প্রতিদিনই ভিয়েতনাম সেই প্রবল উন্নত মানবিক তাৎপর্যেই অধিকতর প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। এই প্রাসঙ্গিকতার ভেতরই নিহিত আছে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে আমাদের সমকালীন ইতিহাসের গতির অনিবার্যতা। ভিয়েতনামকে যে তার দৈনন্দিনে সভ্যতারই দায় বহন করতে হয়, করে যেতে হয়, তা-ই তাকে দেয় বর্তমান বিশ্বের প্রধান নৈতিক শক্তির মর্যাদা।

ভিয়েতনামের এই নৈতিকতাই আমেরিকায় এক বিকল্প সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল, সেই বছরগুলিতেই, যখন আমেরিকার সরকার আণবিক অস্ত্র ব্যতিরেকে আর সব অস্ত্রই ব্যবহার করেছিল ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে। আর ভিয়েতনাম সেই আক্রমণ রুখছিল।

সেই যুদ্ধের সময়, ভিয়েতনামের এক নেতা বলেছিলেন, ভিয়েতনামের পক্ষে আমেরিকায় গাওয়া একটি গান, দিল্লির একটি মিছিল, ঘানার কোনো কাগজের একটি লেখা, লণ্ডনের একটি বক্তৃতা—এগুলোও আমাদের অস্ত্র।

ভিয়েতনামের যুদ্ধে মানবিক-নৈতিক প্রশ্ন প্রধান হয়ে উঠেছিল। আজ আবারও উঠেছে। তার উত্তর খোঁজার এক নান্দনিক প্রয়াসে, আমেরিকায় বিশেষ করে, প্রতিবাদের সংস্কৃতি ধীরে ধীরে কয়েক বছর ধরে গড়ে ওঠে—শেষ পর্যন্ত তাকে খুব পরিষ্কার চিনেও নেয়া যায়। অন্যান্য দেশে প্রতিবাদের এই সংস্কৃতি হয়তো আকারে-প্রকারে তত নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে নি, কিন্তু সেখানেও ভিয়েতনামের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপন সমকালীন রাজনীতির সীমানা ভেঙে ফেলে মানবশক্তির চিরন্তন জয়ের পুরুষার্থে শিল্পেরই বিষয় হয়ে ওঠে। ইতিহাসে ভিয়েতনাম অনেক কিছুই প্রমাণ করেছে। মানবিক-অভিপ্রেরণাই শিল্পসৃষ্টির প্রধান প্রেরণা। নান্দনিক সৃষ্টির এই নিয়মটি পুনপ্রমাণিত হল ভিয়েতনামেরই রক্তের মূল্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মানব-অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত যে-সব দার্শনিক প্রশ্ন বড় বেশি তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে তার নিরসনে এই উদাহরণ হয়তো সাহায্য করবে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের শতাধিক ছবিসহ এই গানের বইটিতে তখনকার ইতিহাস যেন মূর্তিমান—সঙ্গে গানের কথা ও স্বরলিপি—পাতায় পাতায় সংগীতের বিমূর্ততায় সেই ইতিহাসের আরেক মূর্তি। ছবিতে ভিয়েতনামের ওপর আমেরিকার অত্যাচার-আক্রমণের ছবি—গার্ডিয়ানে বেরোনো এর কিছু-কিছু তো বিখ্যাত—আর আমেরিকার যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের ছবি মিলে-মিশে আছে—যেন ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ আর আমেরিকার যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন একটাই লড়াই। আমেরিকা-কানাডা থেকে ৭৫টি গান—তার ভেতর ১৪টিই তো বিখ্যাত সেই ভ্যাংচানো গান—প্যারডি। এই প্যারডিও হয়ে উঠেছিল মারাত্মক অস্ত্র গানে গানে। এই প্যারডিগুলোর ভেতরে আছে আর্নি মার্স-এর 'জনমনের যুদ্ধে মুতে দাও' (প্রচলিত 'ব্রিং গিং ইন দ্য শিভ্‌স'-এর সুরে), আর কোনো অজ্ঞাত মার্কিন সৈনিকের বানানো 'সাইগনকে সেলাম':

সফর খতম!
বলে দিও, চললাম!
দেশে ফিরলাম

জেনারেল কী-কে সেলাম
বলো, বেন আমার গাধাকে চুমু খান!

মুখে মুখে বানানো-ছড়ানো এই ছড়া ও গানগুলির পাশাপাশি ফিল ওক্‌স্‌, পিট সিগার, জো ম্যাকডোনাল্ড, টম প্যাক্সটন, জুলিয়াস লেস্টার, লেন চ্যাণ্ডলার, নিনা সিমোন, রিচার্ড ফ্যারিনা, তুলি কুপফারবার্গ ও আরো অনেকের বিখ্যাত সব যুদ্ধ-বিরোধী গানগুলি পড়লে-দেখলে আর কিছু কিছু গানের সুর আর গাওয়া স্মৃতি থেকে কানে এলে মহৎ সেই উজ্জীবনের মানসচিত্র দেখতেই পাওয়া যায় যেন।

সিণ্টের জর্জ মাক গভার্ন সাতষট্টিতে সিনেটের বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'মেরে ধরে খুন করে, তাদের দেশ ধ্বংস করেও এই ভিয়েতনামীদের আমরা শিক্ষা দিতে চাই, যাতে তারা হো চি মিন থেকে বাঁচে।' আজ তো ভিয়েতনাম-কে আরো এক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে! এই কথাগুলি লেখার সময়, কাগজে পড়ছি, চীন থেকে বলা হয়েছে, তারা এবার সরে আসতে চায়। কিন্তু যেন সরে পড়ার পথ পাচ্ছে না। আর, এখন, এই বইয়ে, চোখের সামনে খোলা পিট সিগারের গান :

সেপাই বলল, 'স্যার, আপনি কি ঠিক জানেন,
এ-পথ দিয়ে এগোলে ঠিক ফেরার রাস্তা পাবেন?'
'আরে সেপাই, আগে বাঢ়ো, এ-নদীর সব জানি
আগের বারও পার হয়েছি মাইল-টাক উজানি।
একটু-আধটু পিছল, কিন্তু পিছলে গেলেই ডাঙা।'

আমাদের কোমর-অব্দি কাদা
'আগে বাঢ়ো', 'আগে বাঢ়ো', চেঁচিয়ে যাচ্ছে হাঁদা।

আমেরিকার এই সংগীতগুলোকে একসঙ্গে দেখলে সংগীতের দিক থেকে নতুনত্ব কতটাই ঘটেছে নজরে না পড়ে পারে না। জ্যাজের নাটকীয়তার সঙ্গে মিশেছে ব্যালাডের গাথা-কাহিনী, আবার লোকসংগীতের ধরতাই এসে মিশে যায় শহুরে স্ল্যাং-এর সঙ্গে। শুধু বিষয়ের গৌরবেই এই গান যেন আমেরিকার শহুরে মানুষের, শ্রমিকদের, দম-ফাটানো রাগ আর থুথু ছেটানো ঘৃণার কোরাস—

জনসনের এই যুদ্ধে মুতে দাও,
　　মুতে দাও জনসনের এই যুদ্ধে
ভিয়েতনাম জলছে এখন,
　　জনসনের এই যুদ্ধে মুতে দাও

এর পরের অংশটি বাংলায় অনুবাদ করলে বোধহয় অশ্লীলতা হবে

We need your assistance. From your
　　backyard station,
Point your trusty roger at that
　　foreign shore ;
Calculate the distance, Let your elevetion,
Turn loose your water···piss on Johnson's War !

অস্ট্রেলিয়া ও হ্যাক্সিল্যাণ্ড থেকে ন-টি, ইংল্যাণ্ড থেকে আট-টি, জার্মানি-হল্যাণ্ড থেকে ছ-টি, ইতালি-জাপান-উরুগুয়ে থেকে ছ-টি—মোট এই উনত্রিশটি গান বাদ দিয়ে, আছে কিউবা থেকে দুটি আর ভিয়েতনামের সাতটি গান।

'টাইম'-পত্রে খবর বেরিয়েছিল হ্যানয় রেডিওতে সবচেয়ে বেশি বাজে একটি গান, সে গানের নাম 'মুক্তির অভিযান'। এ গানের রচয়িতা লু নুগুয়েন ও লঙ হাও। সুর দিয়েছেন তাঁরাই। কিন্তু ভিয়েতনামের মুক্তি-সেনাদের মুখে-মুখে এ-গান হয়ে উঠেছে সবারই গান, বোধহয় সমস্ত পৃথিবীরই গান,

অত্যাচারীকে ঘৃণায় পূর্ণ প্রাণে
বেপথু জননী, ব্যথিতা জন্মভূমি।
'প্রতিশোধ', হাঁকে ব্যথিতা জন্মভূমি
রক্তের ঋণ শুধবার ডাক এল।
শ্রমিক-কৃষক, কবি ও লেখক জাগো।
চীন-সমুদ্রে ঝড়ের প্রবল মেঘ,
নিচে জোয়ারের ঢেউ ওঠে উত্তুঙ্গ
সমস্ত জাতি একদেহ, একপ্রাণ
সেই তরঙ্গ সমান তীব্র তুঙ্গ।

এই লেখাটি শেষ করতে হয় কিউবাকে দিয়ে। হাভানায় অ্যানটিলিসের